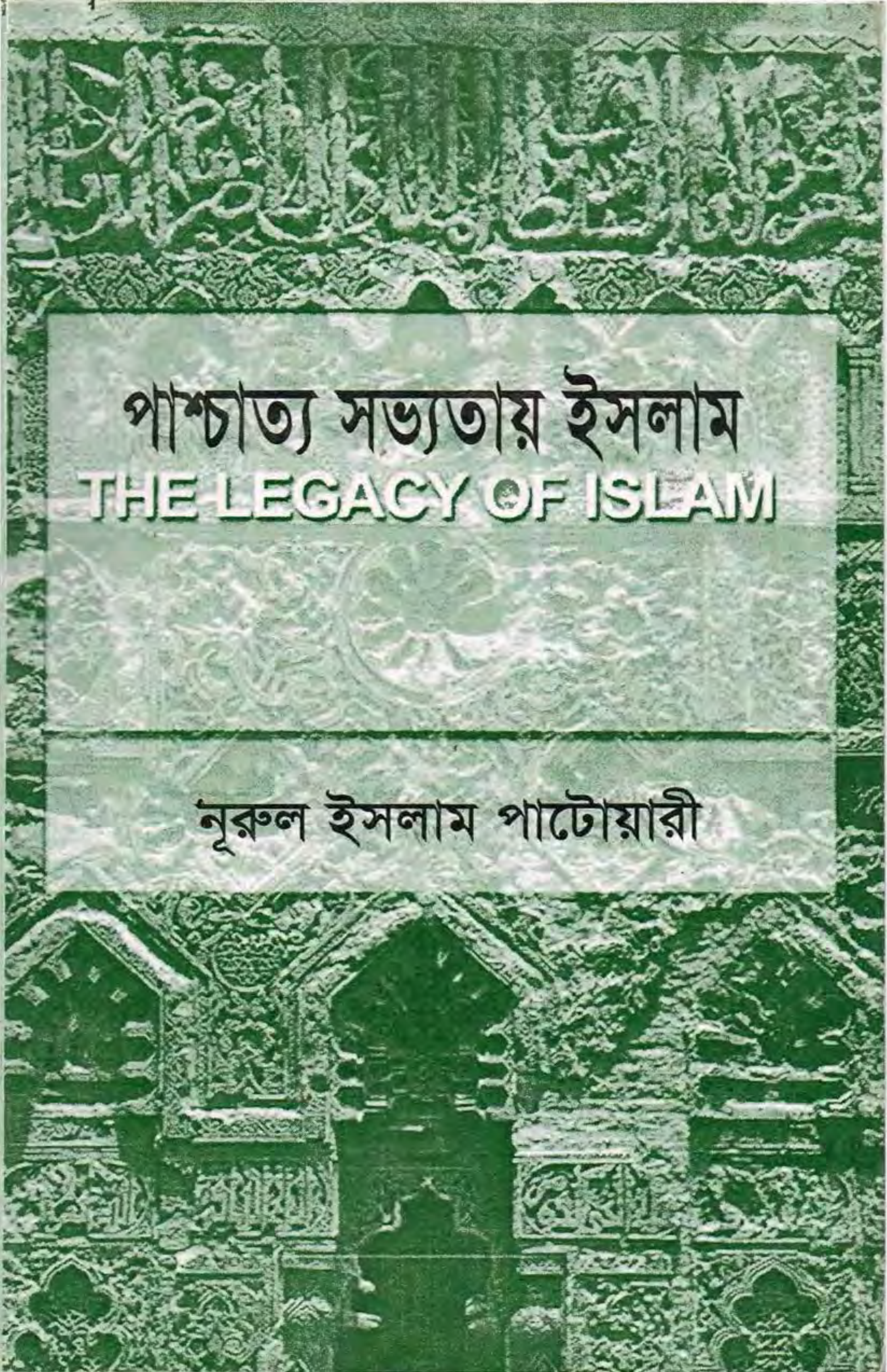

পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম

THE LEGACY OF ISLAM

নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী

পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম

THE LEGACY OF ISLAM

www.waytojannah.com

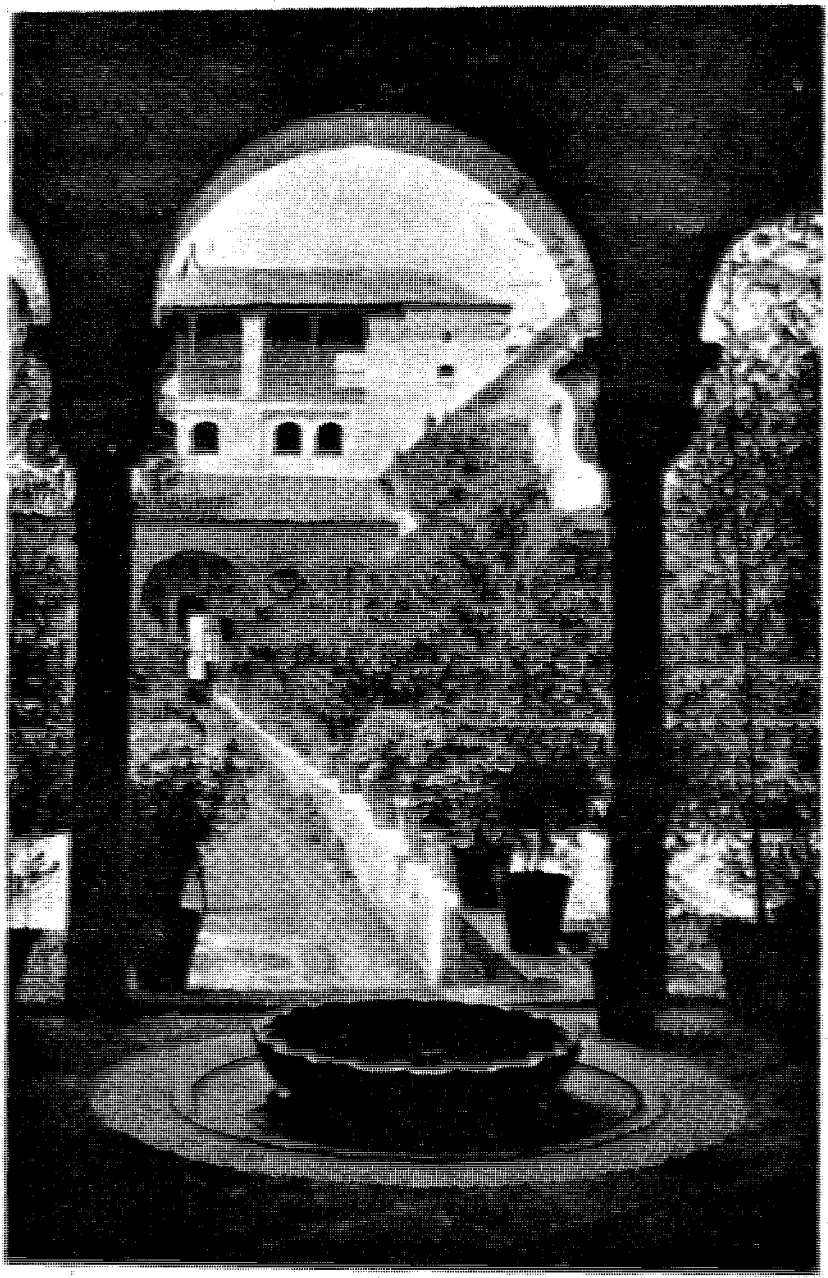

গ্রানাডার জেনারালাইফের উদ্যান

www.waytojannah.com

পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম
THE LEGACY OF ISLAM

স্যার টমাস আর্নল্ড
সি আইই, এফবিএ, লিট্ ডি

আলফ্রেড গিল্ম
এম এ অক্সন, কালহ্যাম কলেজের অধ্যক্ষ
ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষার
প্রাক্তন অধ্যাপক
সম্পাদিত

নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী
সাবেক সম্পাদক, দৈনিক বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.waytojannah.com

পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম (The Legacy of Islam)
স্যার টমাস আর্নল্ড এবং আলফ্রেড গিলুম সম্পাদিত
নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী অনূদিত
ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১৯০
ইফাবা প্রকাশনা : ২০২৬/১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.০৯
ISBN : 984-06-0628-0

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০০০
দ্বিতীয় সংস্করণ
অক্টোবর ২০০৭
কার্তিক ১৪১৪
শাওয়াল ১৪২৮

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ১২০.০০ টাকা

PASCHATTYA SAVAATYA ISLAM (The Legacy of Islam) : Compiled and Edited by Sir Thomas Arnold and Alfred Guillaume in English, translated by Nurul Islam Patwari into Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar Dhaka-1207, Phone : 8128068 October 2007

E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com
Website : www. islamicfoundation.org.bd

Price : Tk 120.00 ; US Dollar : 4.00

www.waytojannah.com

সূচিপত্র

চিত্র তালিকা ১৫

স্পেন ও পর্তুগাল ১৯

জে বি টেন্ড

ক্রুসেড ৫৮

আর্নেস্ট বার্কার, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক

ভূগোল ও বাণিজ্য ৯৪

জে এইচ ক্রেমার্স, লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের *ফার্সী ও তুর্কী ভাষার লেকচারার*

ইসলামী লঘু শিল্পকলা এবং ইউরোপীয় শিল্পকর্মে এর প্রভাব ১১৮

এ এইচ ক্রিস্টি

ইসলামী শিল্পকলা এবং ইউরোপের চিত্রকলার ওপর এর প্রভাব ১৭৫

পরলোকগত *স্যার টমাস আর্নল্ড*

স্থাপত্য শিল্প ১৭৯

মার্টিন এস ব্রিগ্স, এফ আর আই বি এ

সাহিত্য ২০৮

এইচ এ আর গিব, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবীর প্রফেসর

আধ্যাত্মিকতা ২৩২

আর এ নিকলসন, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবীর স্যার টমাস অ্যাডামস প্রফেসর

দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব ২৫৯

আলফ্রেড গিল্ম, কালহ্যাম কলেজের অধ্যক্ষ

আইন ও সমাজ ২৯৭

ডেভিড ডি স্যান্টিলানা, রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিধিবিধানের ইতিহাসের অধ্যক্ষ

বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যা ৩২০

ম্যাক্স মেয়ারহফ, এম ডি, পিএইচ ডি

সঙ্গীত ৩৬২

এইচ জি ফার্মার, গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্নেগী রিসার্চ ফেলো

জ্যোতির্বিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্র ৩৮১

ব্যারন কারা ডি ভক্স

নির্ঘণ্ট ৪০০

www.waytojannah.com

চিত্র তালিকা

গ্রানাডা। জেনারেলাইফের উদ্যান। ফটো ঃ মিঃ পার্সিভ্যাল হার্ট
১. আলহামরা। কোর্ট অব লায়ন্সের একটি গ্যালারী ২৮
২. ক্রিস্টো ডি লা লুয, টলেডো। ফটো ঃ মি পার্সিভ্যাল হার্ট ৩১
৩. ডারহ্যাম গির্জায় পরস্পর ছেদী তোরণের দ্বারা সৃষ্ট ফাঁকা খিলান শ্রেণী।
ফটো ঃ এডিস ৩১
৪. টরে ডি সান গিল, সারাগোসা। ফটো ঃ জে রুইয ভার্নাক্কী, মাদ্রিদ। ৩২
৫. আলকাযারে অ্যাম্বাসাডার হল। ফটো ঃ মিঃ পার্সিভ্যাল হার্ট ৩৫
৬. খৃষ্টান উৎকীর্ণ লিপি সমন্বিত স্পেনীয় মরক্কো নকশার কাজ ৫১
৭. মনীষী আলফন্সোর পাণ্ডুলিপি থেকে দাবা সমস্যা। ফটো ঃ কাসা মরেনো, মাদ্রিদ। ৫১
৮. ফোডিংটনে (ডর্সেট) অবস্থিত নর্ম্যান টিম্প্যানাম (স্থাপত্য নিদর্শন)
আন্তাকিয়ার যুদ্ধে সেন্ট জর্জের হস্তক্ষেপের দৃশ্য। ফটো ঃ ক্রেটন। ৬৪
৯. আলেপ্পোর দুর্গ। ফটো ঃ ক্যাপ্টেন কে এ সি ক্রেসওয়েল। ৭৫
১০. আরব যোদ্ধাদের বর্মে খোদিত কুলজী চিহ্নের কতিপয় দৃষ্টান্ত।
ডঃ এল এ মায়ারের সৌজন্যে। ৭৭
১১. নর্দাম্পটনের রাউন্ড টেম্পল চার্চ। ফটো ঃ ক্রেটন ৮১
১২. ইসলামী শাসনের ভৌগোলিক বিস্তৃতি এবং খৃষ্টীয় দশম শতকে
ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এর প্রভাব নির্দেশক মানচিত্র ৯৩
১৩. ইবনে হাউকলের একটি পাণ্ডুলিপি থেকে ১০৮৭ খৃষ্টাব্দে কপি করা বিশ্ব মানচিত্র ১০০
১৪. মার্সিয়ার রাজা ওফ্‌ফার আমলে (৭৫৭-৯৬) নির্মিত একটি স্বর্ণমুদ্রা, আরব দিনারের
অনুকরণ করা হয়েছে। *এ গাইড টু দি ডিপার্টমেন্ট অব কয়েন্স এণ্ড মেডাল্‌স,* ৩য়
সংস্করণ (বৃটিশ জাদুঘর) প্লেট ৩, নং ১ দ্র। ১১৬
১৫. অ্যাস্টলেব। ফটো ঃ জে রুইয ভার্নাক্কী, মাদ্রিদ ১২৫
১৬. অ্যাস্টলেব। ভি এণ্ড এ মিউজিয়াম। রাজকীয় স্বত্ব সংরক্ষিত। ১২৫
১৭. রৌপ্যমণ্ডিত কাস্কেট। ১২৫
১৮. পিসার ক্যাম্পো সান্টোতে অবস্থিত ব্রঞ্জ গ্রিফিন। ফটো ঃ পি ই চৌফুরিয়ার, রোম। ১২৬
১৯. রৌপ্যখচিত পিতলের কলসি। ১২৯
২০. রৌপ্য ও স্বর্ণখচিত পিতলের রাইটিং কেস। ১৩০
২১. রৌপ্যখচিত পিতলের থালা। ১৩০
২২. রাইটিং কেসের ভেতরের ব্যবস্থাসমন্বিত নক্শা। ১৩১
২৩. পিতলের বেসিনের রৌপ্যখচিত বিস্তারিত নক্শা। ১৩২
২৪. রৌপ্যখচিত পিতলের বাটির ঢাকনা। ১৩৫
২৫. রং ও স্বর্ণরঞ্জিত পোড়া মাটির পেয়ালা। ১৩৫
২৬. উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত পোড়ামাটির পাত্র। ১৩৫
২৭. পোড়ামাটির ওষুধের পাত্র। ভি এণ্ড এ মিউজিয়াম। রাজকীয় স্বত্ব সংরক্ষিত ১৩৬
২৮. পোড়ামাটির ওষুধের পাত্র। ভি এণ্ড এ মিউজিয়াম। রাজকীয় স্বত্ব সংরক্ষিত ১৩৬

www.waytojannah.com

২৯. পোড়ামাটির থালা। ভি এণ্ড এ মিউজিয়াম। রাজকীয় স্বত্ব সংরক্ষিত ১৩৬
৩০. পোড়ামাটির রংকরা থালা। ১৩৭
৩১. খোদাই ও রংকরা নক্‌শাসমন্বিত পোড়ামাটির পাত্রের ঢাকনি। ১৩৮
৩২. উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত পোড়ামাটির থালা। ১৩৯
৩৩, ৩৪ ও ৩৫. রংকরা পোড়ামাটির টালি। ১৪১
৩৬. রংকরা পোড়ামাটির টালির প্যানেল। ১৪২
৩৭. রংকরা পোড়ামাটির বোতল। ১৪৩
৩৮. রংকরা পোড়ামাটির পাত্র। ১৪৪
৩৯. মিনাকরা কাচের পাত্র। ১৪৬
৪০. মিনাকরা কাচের প্রদীপ। ফটো ঃ জিরডন ১৪৬
৪১. মিনাকরা কাচের বোতল। ফটো ঃ জিরডন ১৪৬
৪২. মিনাকরা কাচের বাটি ও ঢাকনি। ১৪৭
৪৩. রেশমী বস্ত্র। ১৪৭
৪৪. মিনাকরা কাচের প্রদীপ। ১৪৮
৪৫. মুসলমানদের বর্মে পরিহিত মর্যাদাসূচক কুলজী চিহ্ন। ১৪৯
৪৬. রেশমী বস্ত্র। ভি এণ্ড এ মিউজিয়াম। রাজকীয় স্বত্ব সংরক্ষিত ১৫৩
৪৭. রেশমী বস্ত্র। ভি এণ্ড এ মিউজিয়াম। রাজকীয় স্বত্ব সংরক্ষিত ১৫৩
৪৮. পারস্যের বুটিদার রেশমের তৈরি মস্তকাবরণের পোশাক। ১৫৪
৪৯. একটি বোনা রেশমী বস্ত্রের বিস্তারিত কারুকার্য। ১৫৫
৫০. রেশমী বস্ত্র। ১৫৭
৫১. রেশমী মখমল। ভি এণ্ড এ মিউজিয়াম। রাজকীয় স্বত্ব সংরক্ষিত ১৫৭
৫২. রেশমী মখমল। ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে উইলিয়াম মরিস কর্তৃক বোনা।
মেসার্স মরিস এণ্ড কোং এবং ভি এণ্ড এ মিউজিয়াম। রাজকীয় স্বত্ব সংরক্ষিত ১৫৭
৫৩. আরদাবিল মসজিদ থেকে সংগৃহীত নরম লোমের গালিচা।
ভি এণ্ড এ মিউজিয়াম। রাজকীয় স্বত্ব সংরক্ষিত ১৫৮
৫৪. খোদাই করা কাঠের খোব। ১৫৯
৫৫. মার্বেলের তৈরি ফাউন্টেন বেসিন। ভি এণ্ড এ মিউজিয়াম। রাজকীয় স্বত্ব সংরক্ষিত ১৬০
৫৬. কায়রোর একটি সমাধি স্তম্ভে খোদাই করা কাঠের প্যানেল।
ভি এণ্ড এ মিউজিয়াম। রাজকীয় স্বত্ব সংরক্ষিত ১৬০
৫৭. খোদাই করা কাঠের সীলিং। ফটো ঃ আলিনারী ১৬১
৫৮ ও ৫৯. দরজার পাল্লায় খোদাই ও খচিত আইভরি সমন্বিত প্যানেল।
ভি এণ্ড এ মিউজিয়াম। রাজকীয় স্বত্ব সংরক্ষিত ১৬১
৬০. ইসলামী জ্যামিতিক নক্‌শা। ১৬২
৬১. ৬০ নং চিত্রের কাঠামোগত ভিত্তি ১৬৩
৬২. খোদাই করা আইভরি কৌটা। ফটো ঃ কাসা মারেনো, মাদ্রিদ ১৬৪
৬৩. খোদাই করা আইভরি কৌটা। ১৬৪
৬৪. ছিদ্র করা আইভরি বাক্স ১৬৪

www.waytojannah.com

৬৫. স্ফটিক পাথরে খোদাই করা বদনা। ১৬৫
৬৬. চিত্রিত আইভরি বাক্স। ১৬৬
৬৭. বইর চামড়ার মলাটের ভেতরের দিক। ভি এণ্ড এ মিউজিয়াম।
রাজকীয় স্বত্ব সংরক্ষিত ১৬৯
৬৮, ৬৯, ৭০ ও ৭১. বইর চামড়ার মলাট। ভি এণ্ড এ মিউজিয়াম।
রাজকীয় স্বত্ব সংরক্ষিত ১৭০
৭২. ইসলামী ডিজাইন। ১৭৩
৭৩. শোভা বর্ধনের জন্য আরবী লিপি পদ্ধতি ব্যবহার। ফটো ঃ অ্যান্ডারসন। ১৭৮
৭৪. কায়রোর কায়েত বে *এক্সট্রামুরস* মসজিদের অভ্যন্তর ভাগ। ১৮৩
৭৫. ডোম অব দি রক–এর অভ্যন্তর ভাগ, জেরুজালেম।
ফটো ঃ আমেরিকান কলোনি, জেরুজালেম ১৮৫
৭৬. জামে মসজিদ, দামেস্ক। ফটো ঃ আমেরিকান কলোনি, জেরুজালেম ১৮৮
৭৭. কর্ডোভা মসজিদের অভ্যন্তর ভাগ। ১৯১
৭৮. সূক্ষ্মাগ্র খিলানের তুলনা। ১৯২
৭৯. ইবনে তুলুন মসজিদ, কায়রো। অন্যতম খিলান শ্রেণী,
ফটো ঃ নিউ ফটোগ্রাফিশ, গেসেলশ্যাফট, বার্লিন। ১৯৪
৮০. বাব আল–নাস্‌র, কায়রো। ফটো ঃ ক্যাপ্টেন কে এ সি ক্রেসওয়েল ১৯৭
৮১. ভিলেনিউভ–লেস–আভিগ্‌নন দুর্গের প্রবেশ দ্বার।
ফটো ঃ লেভী এট নিউরডিন, প্যারিস। ১৯৭
৮২. পাথরের ওপর কারুকার্য সমন্বিত টাওয়ারের তুলনা। ২০০
৮৩. ফোক্‌রা বিশিষ্ট প্রাচীর ও খিলানের তুলনা ২০২
৮৪. মিনার ও বেল টাওয়ারের তুলনা। ২০৪
৮৫. কুফী ও গথিক উৎকীর্ণলিপির তুলনা। ২০৬
৮৬. 'স্নান' ৩৩৬
৮৭. মিশ্রণের প্রতীক চিত্র। ৩৩৬
৮৮. ইবনে সিনা অ্যানাটমী সম্পর্কে ভাষণ দিচ্ছেন। ৩৪০
৮৯. ১০ম –১১শ শতকের স্পেনীয় মুরীয় সঙ্গীতজ্ঞ। ৩৬৭
৯০. দ্বাদশ শতকের পারসিক সঙ্গীতজ্ঞ। ৩৬৭
৯১. চতুর্দশ শতকের মিসরীয় সামরিক বাদক দল। ৩৭৯

www.waytojannah.com

মহাপরিচালকের কথা

পশ্চাৎপদ আরব-সমাজের অবক্ষয়দীর্ণ পরিবেশে রাহমাতুললিল আ'লামীন হযরত মুহাম্মদ (সা) ইসলামের সর্বব্যাপী এবং বৈপ্লবিক শিক্ষা ও জীবন-ব্যবস্থার চরমতম বিকাশ ঘটান। এর প্রচার ও প্রায়োগিক বাস্তবায়ন সম্পন্ন করেন অসামান্য নিপুণতায়, দক্ষতায়। বস্তুত মহানবী (সা)-এর অনুপম তাকওয়া, সাবধানতা, আল্লাহ্র প্রতি পরম নির্ভরতা, সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা, ক্ষমা, ঔদার্য, সহৃদয়তা, মানবতা এবং শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ নীতি-আদর্শ মানুষের দৈহিক ও আত্মিক সত্তায় অভূতপূর্ব উৎকর্ষের উৎসারণ ঘটায়। তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা ও সাংগঠনিক নৈপুণ্যে ইসলাম শুধু আরব জাহানে নয়, অচিরেই বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ফিলিপ কে, হিট্টি তাঁর 'হিস্টরি অব দি এ্যারাবস' গ্রন্থে বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর মাত্র একটি শাসনামলের শেষ পাদে ইসলামী খেলাফত অক্সাস থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার সিরটিস মাইনর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। শূন্য অবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করে মুসলিম আরব খেলাফত এ সময় বিশ্বের সবচেয়ে পরাক্রমশালী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়।" বিশ্ব সভ্যতায় ইসলাম তার অমোঘ কল্যাণময়তার স্বাক্ষর রাখে। মানুষ লাভ করে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের পূর্ণাঙ্গ ও সফল দিকনির্দেশনা। ইসলামের এই সামগ্রিকতাপূর্ণ উৎকর্ষ ও বিকাশের কারণে মুসলমানগণ একদিকে যেমন আধ্যাত্মিকতার চরম শীর্ষে আরোহণ করতে সক্ষম হন, তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জাগতিক কর্মকাণ্ডেও প্রভূত উন্নতি-সমৃদ্ধি ও সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে বিশ্বসভ্যতাকে অগ্রগতির পথে চালিত করেন।

ইসলামী আদর্শের সোনালি স্পর্শে সৃষ্ট, লালিত, বর্ধিত ইসলামী সভ্যতার প্রভাব প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের মতো পাশ্চাত্যেও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। মুসলিম স্পেন এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ৭১১ খৃস্টাব্দে মুসলিম সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদের স্পেন বিজয়ের মধ্য দিয়ে স্পেনে মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। সেখানে ইসলামী আদর্শ ও শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়। মুসলিম শাসনামলে স্পেন বিশ্বসভ্যতার গৌরবময় পীঠস্থানে পরিণত হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁর 'গ্লিম্স্ অব ওয়ার্ল্ড হিস্টরি' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "মূরগণ কর্ডোভার সেই বিস্ময়কর সাম্রাজ্যের পত্তন করেছিলেন, যা ছিল মধ্যযুগের বিস্ময় এবং সমগ্র ইউরোপ যখন পাশবিক অজ্ঞতা ও দ্বন্দ্ব-কলহের নোংরা পংকে ডুবেছিল, এই কর্ডোভা তখন একাই পাশ্চাত্য জগতের সামনে জ্ঞান ও সভ্যতার প্রোজ্জ্বল আলোকবর্তিকা তুলে ধরেছিল।"

পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সমাজ-জীবনে ইসলামের সুদূরপ্রসারী ও বহুমাত্রিক প্রভাব এবং অবদানের অনন্য দলিল স্যার টমাস আর্নল্ড ও আলফ্রেড গিল্ম সম্পাদিত 'The Legacy of Islam' গ্রন্থটি। এই মূল্যবান প্রামাণ্য গ্রন্থটি 'পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম' শিরোনামে বাংলায় অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক, লেখক, গ্রন্থকার ও অনুবাদক মরহুম নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী। বর্তমানের হতাশাদীর্ণ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় পশ্চাৎপদ মুসলমানদের সামনে সোনালি ঐতিহ্যের প্রোজ্জ্বল দীপশিখা জ্বালিয়ে তাদেরকে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির ধারায় শামিল হতে উজ্জীবিত করার প্রত্যাশায় আমরা এই মূল্যবান গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ ২০০০ সালে প্রথম প্রকাশ করি। গ্রন্থটি আমাদের প্রত্যাশা পূরণে প্রভূত অবদান রাখতে সক্ষম হওয়ায় এবং জনগণের চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার এর দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা মরহুম অনুবাদকের রূহের মাগফেরাত কামনা করি এবং এই গ্রন্থ প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

আল্লাহ্ আমাদের এই প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.waytojannah.com

প্রকাশকের কথা

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (সা) যে সময় পৃথিবীতে আগমন করেন, তা ছিল ঘোর অন্ধকারের যুগ। এ সময় পৃথিবীর কোথাও ন্যায়, ইনসাফ, সৌহার্দ্য ও মানবিক মূল্যবোধের অস্তিত্ব ছিল না। সভ্যতা, সংস্কৃতি ও নৈতিকতা ছিল পাশবিকতায় আচ্ছন্ন বিশেষ করে আরব তথা সেমিটিক জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে। মানবতার এ দুঃসময় মহানবী (সা) মানবজাতির কাছে এমন এক জীবনদর্শন উপস্থাপন করেন যা তাঁর মহান আবির্ভাবের একশ বছরের মধ্যে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্রসার লাভ করে।

মহানবী (সা)-এর প্রদর্শিত এ জীবন বিধান কেবল মানুষের আধ্যাত্মিকতার উন্নতি করেনি, মানুষের জাগতিক জীবনেরও প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ উন্নতির নিশ্চয়তা বিধান করে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ভূগোল, বাণিজ্য, নৌবিদ্যা, সমরবিদ্যা, শিল্পকলা, স্থাপত্য, দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব, আইন ও সমাজ, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, অংকশাস্ত্র ও সঙ্গীতে অভূতপূর্ব সাফল্য এনে দেয়। এর উপর ভিত্তি করে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছে।

প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা ও প্রাচ্যবিদ স্যার টমাস আর্নল্ড এবং আলফ্রেড গিল্ম সম্পাদিত 'The Legacy of Islam' শীর্ষক প্রামাণ্য গ্রন্থটিতে এ সত্যটি বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামী বিশ্বের যেসব উপাদান ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে তার একটি বিশ্লেষণধর্মী বিবরণ রয়েছে এ গ্রন্থটিতে। বইটি 'পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম' শিরোনামে অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক, লেখক ও অনুবাদক মরহুম নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী।

সভ্যতা বিকাশে মুসলমানদের অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য ও অবদানের কথা জানা ও তা থেকে অনুপ্রেরণা লাভের জন্য আমাদের প্রত্যেকেরই গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। আর এই প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যেই ২০০০ সালে বইটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে প্রথম প্রকাশ করা হয়। সুধী পাঠকমহলের চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার এর দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করা হলো। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বইটি এবারও আগের মতোই সর্বমহলে সমাদৃত হবে।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.waytojannah.com

অনুবাদকের কথা

মুসলিম শাসনামলে মধ্যএশিয়া থেকে স্পেন পর্যন্ত যে শিল্পকলা, চিন্তাধারা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসার লাভ করে এবং ইউরোপ যার উত্তরাধিকারী হয় 'পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম' গ্রন্থে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ইবনে সিনা ও ইবনে রুশদ-এর মতো বিখ্যাত নামগুলি এবং 'লাইল্যাক' ও 'অ্যাডমিরাল'-এর মতো অতি পরিচিত মূল আরবী শব্দগুলি ইতস্তভাবে প্রত্যেকের চোখে পড়বে। কিন্তু ইসলামী বিশ্বের প্রভাব ছিল আরো সুদূরপ্রসারী ও জটিল এবং যেসব ক্ষেত্রে সাধারণত আশা করা যায় না, সেখানেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে। যেমন বাণিজ্যিক শব্দভাণ্ডারে দেখা যাবে আরব বণিকদের সঙ্গে মধ্যযুগের ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে এসেছে 'চেক', 'ট্যারিফ', 'ডোয়েন' প্রভৃতির মতো বহু শব্দ। সঙ্গীতে বিরাট তাত্ত্বিক অবদান ছাড়াও আরব্য বীণা ও গিটারের এবং মূরীয় নৃত্য শিল্পীদের সন্ধান পাওয়া যাবে। স্থাপত্যের কারুকার্যে ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবের বেদীর উপরিভাগের মতো কুফী হস্তলিপিভিত্তিক আরব স্থাপত্য ও কারুকার্যের নিদর্শন পাওয়া যাবে। এছাড়া আরও বহু প্রমাণ পাওয়া যাবে এই গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায়। গ্রন্থের অধ্যায়গুলো হচ্ছে ঃ

স্পেন ও পর্তুগাল ঃ জে বি ট্রেন্ড; ক্রুসেড ঃ স্যার আর্নেস্ট বার্কার; ভূগোল ও বাণিজ্য ঃ জে এইচ ক্রেমার্স ; ইসলামী লঘু শিল্পকলা এবং ইউরোপীয় শিল্পকর্মে তার প্রভাব ঃ এ এইচ ক্রিস্টি ; ইসলামী শিল্পকলা এবং ইউরোপের চিত্রকলার ওপর এর প্রভাব ঃ পরলোকগত স্যার টমাস আর্নল্ড ; স্থাপত্য শিল্প ঃ এম এস ব্রিগ্স ; সাহিত্য ঃ এইচ এ আর গিব্ ; আধ্যাত্মিকতা ঃ আর এ নিকলসন ; দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব ঃ আলফ্রেড গিল্ম ; আইন ও সমাজ ঃ ডেভিড ডি স্যান্টিলানা ; বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যা ঃ ম্যাক্স মেয়ারহফ ; সঙ্গীত ঃ এইচ জি ফার্মার ; এবং জ্যোতির্বিদ্যা ও অংকশাস্ত্র ঃ কারা ডি ভক্স।

নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী

www.waytojannah.com

ইংরেজি সংস্করণের ভূমিকা

পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম ('দি লেগ্যাসি অব ইসলাম') বইটি *দি লেগ্যাসি অব গ্রীস, দি লেগ্যাসি অব রোম, দি লেগ্যাসি অব মিডল এজেস* এবং *দি লেগ্যাসি অব ইসরাইল*–এর একটি সহযোগী গ্রন্থ। *ইসলামী বিশ্বের যেসব উপাদান ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে তার একটি বিবরণ দেওয়াই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। সাধারণভাবে বলতে গেলে গ্রীস ও রোমের অবদান দুটি সাদৃশ্যপূর্ণ মৌল সংস্কৃতি থেকে এসেছে।* এদের প্রত্যেকটি একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক কেন্দ্র থেকে উদ্ভূত। মধ্যযুগীয় অবদান এসেছে পশ্চিম ইউরোপীয় সভ্যতা বিকাশের একটি যুগ থেকে। ইসরাইলের অবদান হচ্ছে 'মানুষের সামগ্রিক চিন্তাধারায় ইহুদী ধর্ম ও ইহুদী মতবাদের অবদান'। ইসলামের অবদানকে এসব দৃষ্টিকোণ থেকে আলাদাভাবে দেখতে হবে। এটি একটি উদ্ভাবিত শিরোনাম এবং এর তাৎপর্য কেবল বইটিতেই পুরোপুরিভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর সবচাইতে কাছাকাছি মিল রয়েছে ইসরাইলের অবদানের সঙ্গে। কিন্তু ইসরাইলের অবদানের অবয়বটি গ্রহণ করা হয়েছে ইহুদীদের ধর্ম থেকে, অথচ ইসলামের অবদানে আমরা ধর্মীয় দিক থেকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধর্ম নিয়ে আলোচনা করিনি ঃ এই গ্রন্থ থেকে পাঠকরা বুঝতে পারবেন যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মুসলমানরা ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে যে অবদান রেখেছে তাতে *বিশেষভাবে* ইসলামী বলতে তেমন কিছু নেই। বরং মুসলিম আইনের ন্যায় যেসব ক্ষেত্রে ধর্ম গভীরতম প্রভাব সৃষ্টি করেছে সেখানে এই অবদানের মূল্য অত্যন্ত কম বলে প্রতীয়মান হয়েছে। অবশ্য অবদানকে সম্ভব করে তোলার জন্য ইসলামই হচ্ছে মৌল কারণ। এই গ্রন্থে শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের যে বর্ণনা রয়েছে তা মুসলিম সাম্রাজ্যের ছত্রছায়ায় এবং পৃষ্ঠপোষকতায়ই সমৃদ্ধি লাভ করে।

ইসলামের জন্মভূমি আরব আর এই বইতে যা কিছু লেখা হয়েছে তার পিছনে রয়েছে এই আরবের ভাষা। প্রায় ক্ষেত্রেই ইসলামী এবং আরবী পারস্পরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এবং মুসলিম খলীফাদের সুবর্ণ যুগে ভাষা ও ধর্ম অবিচ্ছেদ্য ছিল। আরবীকে সেমিটিক বিশ্বের গ্রীক বলা হয় এবং ইসলামের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় যে, আরবীভাষা যখন উন্নতির চূড়ান্ত শিখরে তখনই এর বাণী সম্যকভাবে প্রচারিত হয়। অ্যারেমেইক[১] ছিল আরবীর তুলনায় অনেক দুর্বল ভাষা। এমনকি চরম সমৃদ্ধির যুগে ক্লাসিক্যাল হিব্রুও বিস্ময়কর প্রাণশক্তির দিক দিয়ে আরবীর কাছাকাছি পৌঁছতে পারেনি। নতুন নতুন শিল্পকলা ও

---

১ . বাইবেলের আমলে কথ্য সেমিটিক ভাষা, যে ভাষায় হযরত ঈসা (আ) কথা বলতেন। –অনুবাদক।

www.waytojannah.com

বিজ্ঞানের জ্ঞানদীপ্তভাব প্রকাশে আরবী ভাষা নিজস্ব সম্পদ থেকে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে যথোপযুক্ত শব্দ উদ্ভাবন করতে পারতো।

সেমিটিক ভাষাগুলির একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সেখানে ক্রিয়া পদের জন্য মাত্র ৩টি ব্যাঞ্জন বর্ণ থাকে। বিভিন্ন ভাষায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম থাকলেও সেই ব্যতিক্রম তুলনামূলকভাবে কদাচিৎ দেখা যায়। এরপর প্রায় অবধারিতভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, আরবীতে জটিল ভাব প্রকাশের জন্য যৌগিক শব্দ কার্যত অপরিজ্ঞাত। তাই এটি বিশেষ কৌতূহলজনক ও লক্ষণীয় বিষয় যে, যে ভাষা এতটা পরিসীমিত সে ভাষা অবাধে গ্রীক বিশ্বের সর্বপ্রকার পাণ্ডিত্যের মুকাবিলা করেছে এবং তাতে নিঃসন্দেহে তার নিজস্ব সম্পদের ওপর এতটুকু চাপ পড়েনি।

ক্রিয়া ও বিশেষ্যের অসাধারণ নমনীয়তার দরুন আরবী ভাষা আর্য ভাষা থেকে অনেক সংক্ষিপ্তভাবে সম্পর্কযুক্ত ভাব প্রকাশ করতে পারে। তাই মূল ক্রিয়ার বহু রকমের রূপের মধ্যে ভেঙে ফেলা, চূর্ণবিচূর্ণ করা, ভাঙার চেষ্টা করা, ভাঙতে সাহায্য করা, ভাঙতে দেওয়া, পারস্পরিক ভাঙা, কাউকে ভাঙতে বলা, ভাঙার ভান করা প্রভৃতি ভাবগুলি স্বরবর্ণ পরিবর্তন ও ব্যাঞ্জন বর্ণ পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। ইংরেজি ভাষা এসব ভাব প্রকাশে আমরা যে অতিরিক্ত ক্রিয়া ও সর্বনাম ব্যবহার করি এখানে তার প্রয়োজন হয় না। বিশেষ্যের কোন কাজের সময় ও স্থান, দৈহিক দোষত্রুটি, রোগ, যন্ত্রপাতি, রং, বৃত্তি প্রভৃতি বিচিত্র ব্যাপার বোঝানোর একটি যথোপযুক্ত রূপ রয়েছে। একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট হবে। মূল দ-ও-র (দাল-ওয়াও-রে) শব্দটিকেই ধরা যাক, সাধারণ আকারে যার অর্থ ঘোরানো বা ঘোরা (অকর্মক)।

দাওয়ারা, কোন জিনিসকে চতুর্দিকে ঘোরানো,

আদারা, চারদিকে ঘুরতে দেওয়া অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ করা।

দাওর, ঘূর্ণন (বিশেষ্য)।

দাওয়ারান, প্রদক্ষিণ।

দাওওয়ার, ফেরিওয়ালা বা ভবঘুরে।

মাদার, অক্ষ।

মুদির, নিয়ন্ত্রক।

দাওয়ারা, কারো সঙ্গে ঘোরাফেরা করা

তাদাওওয়ারা/ইসতাদারা, আকারে গোলাকার হওয়া।

দাওরাহ্, যে ঘুরছে।

দুয়ার, ঘূর্ণিরোগ।

দাওওয়ারাহ্, নাবিকের কম্পাস।

মুদারাহ, গোলাকার ভিত্তি।

এসব রূপের কোনটিই আকস্মিক নয়, বরং এগুলি আরবী ভাষার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পূর্ব নির্ধারিত। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, প্রত্যেক ক্রিয়া ও বিশেষ্যের এ ধরনের বহুমুখী কিঞ্চিৎ পার্থক্যের সাহায্যে আরবী ভাষাকে ক্লাসিক্যাল বিশ্বের বৈজ্ঞানিক পরিভাষার

www.waytojannah.com

উপযোগী করা যেতো। আরবরা ছিল একটি পর্যবেক্ষণশীল জাতি। বিশ্লেষণমূলক যুক্তি তাদের ভাষায় অপরিজ্ঞাত থাকলেও তারা বিভিন্ন ধরনের প্রতিটি জিনিসের বিশেষ নাম প্রদান করে সে অভাব পূরণ করে। এতো বয়সের উট, এতো শাবকের মাতা, ভালোগতি সম্পন্ন উট, দুগ্ধবতী উট প্রভৃতির জন্য যথোপযুক্ত নাম রয়েছে। আর এ কারণে আরবী কাব্যের সঠিক ও যথোপযুক্ত অনুবাদ অত্যন্ত দুঃসাধ্য।

তিন অক্ষরের মূল শব্দটি রূপান্তরের মাধ্যমে হাজারো রকমের রূপ লাভ করে। অন্য মূল শব্দের একই রূপের সঙ্গে তাদের ধ্বনিগত মিল থাকে। এর ফলে আরবী ভাষায় এমন এক সুষম ছন্দের সৃষ্টি হয় যা যেমন স্বাভাবিক তেমনি অপরিহার্য। আমরা কোন জটিল ধারণা প্রকাশ করতে গিয়ে যে শব্দটি প্রয়োগ করি তার আদিম অর্থ আমাদের চিন্তায় আসে না। 'এসোসিয়েশন' শব্দটি বলতে গেলে বক্তার মনে *সোসিয়াস* কথাটি কদাচিৎ উদিত হয়। ইংরেজিতে *সোসিয়াস* বা *অ্যাড* কথাটি নেই। কিন্তু আরবীতে জটিল কথার মধ্যেও মূল কথাটি হারিয়ে যায় না। তার উপস্থিতি সবসময় অনুভব করা যায়। ইংরেজিতে যা বড় জোর একটা অসচেতন শ্লেষালংকার বলে মনে হবে। একজন আরবের কাছে তা নিছক শব্দতাত্ত্বিক ব্যাপার। তিনি ড্যানিয়েল ৫.২৫-এ উদ্ধৃত *মেনে, মেনে, টেকেল আপহারসিন* কথাটির বিশ্লেষণমূলক যথার্থতা সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করবেন। ওল্ড টেস্টামেন্টের ভাষা শব্দ তাত্ত্বিকভাবে কদাচিৎ কৃত্রিমতামুক্ত ছিল। সেখানে আত্মসচেতনভাবেই এমনসব নামের একটি মৌল যুক্তি অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয় যেগুলির আদিম তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু জনৈক আরবী লেখক একজন প্রাচীন আরব সর্দারের নামের যে সহজ সরল ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা সত্যি অতুলনীয়। নামটি 'মুযাইকিয়া' এবং ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-- যে ক্ষুদে লোকটি প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় তার পোশাক ছিঁড়তেন *(মাযাকা)*।

সাংস্কৃতিক মহলে আরবী ব্যাকরণের সম্যক জ্ঞান যেমন একজন ভদ্রলোকের বিশেষ পরিচয় বহন করে, তেমনি আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি আস্থা মুসলমানদের বিশ্বাসের একটি অঙ্গ। এতদসত্ত্বেও হিজরীর প্রথম শতক শেষ হওয়ার আগে জনৈক উমাইয়া খলীফা মরুভূমির খাঁটি আরবদের কাছে তাঁর বক্তব্য বিশ্লেষণে ব্যর্থ হন। প্রাচীন আরবদের খাঁটি ভাষা কেবল ইসলাম-পূর্ব যুগের ও ইসলামের প্রাথমিক যুগের প্রাচীন লেখকদের লেখায় পাওয়া যায় একথা জানা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশের মুসলিম পণ্ডিতগণ এই ভাষার জটিল বিষয়াদি সম্পর্কে দক্ষতা অর্জনের জন্য আরবী ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়নে কঠোর সাধনায় বিমুখ হননি। তাদের সাধনা বিফলও হয়নি। ইউরোপের পণ্ডিত সমাজের জন্য যদি সিসেরো যুগের অনুসরণ লাভজনক হয় তাহলে একজন প্রাচ্য দেশীর জন্যও তার নিজস্ব ভাষার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সূক্ষ্মদর্শীর জ্ঞানস্পৃহা লাভজনক।[১]

---

১. প্রফেসর নিকলসনের ট্রান্সলেশন্স অব ইস্টার্ন পোয়েট্রি এন্ড প্রোজ কেম্ব্রিজ ১৯১২ গ্রন্থটি ইসলামী সাহিত্যে পাঠ থেকে যে আনন্দ ও উপকারিতা পাওয়া যায় সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে অমূল্য।

www.waytojannah.com

অনুরাগী পাঠকদের উপর আরবীভাষা ও সাহিত্য অবধারিতভাবে যে মোহনীয় প্রভাব সৃষ্টি করে তা এর অপ্রত্যাশিত উপাদান, এর অকপটতা এবং এর সরাসরি বক্তব্য তুলে ধরার প্রবণতার মধ্যে নিহিত। ইউরোপের ভাষাসমূহে আরবী ভাষার অবদান কতখানি তার দৃষ্টান্ত এই বইর অন্যত্র পাওয়া যাবে। এর মধ্যে কত শব্দ কেবল একদিনের জন্য টিকে ছিল কিংবা কতো শব্দকে ইউরোপীয় রেনেসাঁ হত্যা করেছিল তা কেবল বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, *যে সোডা* এক সময় ইবনে সিনার 'কানুনের'[১] তৃতীয় খণ্ড *সার্মো ইউনিভার্সালিস ডি সোডা–র* প্রারম্ভিক নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় ছিল, চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের হাতে তার কি পরিণতি ঘটেছে? এটি *'সুদা'* শব্দের রূঢ় নকল। *সুদা* অর্থ মাথাধরা, এবং এটি বিদীর্ণ করা অর্থে মূল *সাদা'আ থেকে* উদ্ভূত। এ ধরনের অবদান ছাড়াও আমরা ওল্ড টেস্টামেন্ট অধ্যয়নের ক্ষেত্রে আরবী ভাষার কাছে অনেকখানি ঋণী। আরবী রাজকীয় ভাষা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহুদীরা হিব্রুর সঙ্গে এর সামঞ্জস্য আবিষ্কার করে। হিজরী তৃতীয় শতকে ইহুদীরা আরবদের, কিংবা বরং অনারব মুসলমানদের অনুকরণ করে, এবং তাদের ভাষাকে ব্যাকরণগত বিশ্লেষণের আওতায় নিয়ে আসে। রাব্বি ডেভিড কিমহির (মৃত্যু আনু. ১২৩৫ খৃ.) যে ব্যাকরণ পরবর্তীকালে হিব্রুভাষা অধ্যয়নে খৃষ্টানদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে তার অনেকখানি আরবী সূত্র থেকে ধার করা হয়েছে। তাঁর ব্যাকরণের ওপর ভিত্তি করে তিনি বাইবেলের যে সব টিকা রচনা করেছেন সেগুলি প্রায়ই ওল্ড টেস্টামেন্টের অনুমোদিত সংস্করণে পাওয়া যায়।

উনবিংশ শতকের শুরু থেকে হিব্রুভাষার দুরূহ শব্দ ও রূপের ব্যাখ্যার জন্য ক্রমাগত আরবীর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। কারণ সাহিত্যের ভাষা হিসাবে আরবী এক হাজার বছরেরও বেশি কনিষ্ঠ হলেও ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে বহু শতকের জ্যেষ্ঠ। হিব্রুর অনেক দুরূহ সমস্যা প্রায় সমগোত্রীয় আরবীয় সহায়তায় সমাধান করা যায়। কারণ সেই পরিত্যক্ত ও প্রাচীন রূপগুলি আরবীতে সাধারণভাবে প্রচলিত। যে সব শব্দ ও বাগধারার সঠিক অর্থ ইহুদী জীবনধারা থেকে হারিয়ে গেছে একই সূত্র থেকে সেগুলির যথাযথ বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। বস্তুত ওল্ড টেস্টামেন্টের যেকোন নিষ্ঠাবান ছাত্রের জন্য আরবী সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অপরিহার্য। বাইবেলের ভাষ্যসমূহ আরবীর কাছে কতটা ঋণী ওল্ড টেস্টামেন্টের পৃষ্ঠাগুলির যে কোন সমালোচনামূলক টিকা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে এবং এই অবদান এখনো নিঃশেষিত হয়নি। ওল্ড টেস্টামেন্টের ওপর জুলিয়াস ওয়েলহসেনের লেখা এখনো প্রাধান্য বজায় রেখেছে। কিন্তু তিনি যখন আরবী সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর লেখা বন্ধ করেন তখন থেকে আরবী ও ইসলামী বিধি–বিধান পর্যালোচনা একজন প্রতিভাবান লেখকের অবদান থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু ইগনায গোল্ডযিহার যখন হিব্রুর স্থলে আরবী চর্চা শুরু করেন তখন এই ক্ষতির অনেকটা পূরণ হয়। যিনি

১. আরো দ্রষ্টব্য পৃ (৩৩৭)।

www.waytojannah.com

ভারসাম্যকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন, তিনি কি অবদান রাখতে পারেন তার অপরূপ দৃষ্টান্ত হচ্ছে রবার্টসন স্মিথের রচনা। তাঁর *রিলিজিয়ান অব দি সেমাইটস* প্রাচীন আরবী ও কেনানী ভাষার এক অপূর্ব সমবায়।

আমার সহযোগী সম্পাদক স্যার টমাচ আর্নল্ডের অকাল মৃত্যুতে আমাদের এই গ্রন্থের কতটা ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা অবিচলিতভাবে বলা দুষ্কর।

এই গ্রন্থের প্রত্যেক লেখকেরই তিনি ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। তাঁর মৃত্যু কেবলমাত্র প্রাচ্যের জ্ঞানচর্চায় একটি অপূরণীয় ক্ষতিই নয়, এতে তার বন্ধুদের হৃদয়ে এমন এক ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে যা শুধু সময়ই নিরাময় করতে পারে। ইসলামী চিত্রকলার অবদান সম্পর্কে তিনি যে অধ্যায়টি লিখতে শুরু করেন তা অসমাপ্ত রয়ে গেছে। ইংল্যাণ্ডে এ বিষয়ে তাঁর জ্ঞান অতুলনীয়, তাই তাঁর অসমাপ্ত লেখার সঙ্গে অন্য কিছু যোগ না করে সেটিকে ঐ অবস্থায়ই লঘু শিল্পকলা সংকান্ত অধ্যায়ের পরিশিষ্ট হিসাবে দেওয়া আমরা যুক্তযুক্ত মনে করি।[১]

স্যার টমাস আর্নল্ড এবং আমি এই গ্রন্থের পরিকল্পনা তৈরি করি এবং তিনি অধিকাংশ প্রবন্ধের প্রুফ কপি দেখে যান। এরপর থেকে প্রফেসর নিকলসন আমার সঙ্গে প্রত্যেকটি অধ্যায় পড়ে দেখে অত্যন্ত সহৃদয়তার পরিচয় দেন। তিনি কতিপয় মূল্যবান পরামর্শ প্রদান ছাড়াও কোন বিশেষ সন্দেহ দেখা দিলে তাঁর সহায়তা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

লঘু শিল্পকলা ও স্থাপত্য সংক্রান্ত নিবন্ধগুলির চিত্র সংশ্লিষ্ট নিবন্ধকারগণ সরবরাহ করেছেন। এ ছাড়া এই গ্রন্থের অন্যান্য ছবির ব্যবস্থাপনার জন্য আমি ক্ল্যারেণ্ডন প্রেসের মিঃ এ এল পি নরিংটনের কাছে ঋণী।

এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু অতীতের কার্যকলাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা সংগত বলে মনে করা হয়। বর্তমান সময়ে আধুনিকতা ইসলামের ধর্মীয় জগতে সংস্কার আন্দোলনের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে প্রাচ্যের চিন্তাধারা ও সাহিত্যে প্রতিদিনই বস্তুবাদের অনধিকার প্রবেশ ঘটছে। এই অবস্থায় ঘটনাবলীর গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা অত্যন্ত হঠকারিতা হবে। একদিকে ভেতর ও বাইর থেকে হামলা সত্ত্বেও আরবীয় ও ইসলামী বিধি-বিধানের অতীত ইতিহাস তাদের অসাধারণ প্রাণশক্তির পরিচয় দিচ্ছে এবং অপরদিকে বিগত কয়েক বছরে মুসলিম দেশগুলিতে বহু সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এই গ্রন্থ তার পাঠককে এসব পরিবর্তনের গুরুত্ব উপলব্ধিতে এবং আগ্রহ ও সহানুভূতির সঙ্গে তার ফলাফল অনুসরণে সাহায্য করবে।

এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় অক্ষরান্তরের ক্ষেত্রে রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী বিভিন্ন অধ্যায়ে মাঝে মাঝে কিছুটা

---

১. এই ব্যবস্থা এ কারণে আরো যুক্তিযুক্ত যে, লেখকের মতে ইউরোপীয় চিত্রকলার ওপর মুসলিম চিত্রকলার প্রভাব নগণ্য।

www.waytojannah.com

Contents

রদবদল করা হয়েছে। যেমন, 'হুনায়ন' শব্দে যুক্ত স্বরধ্বনী *আর আই* রূপে (হুনাইন) লেখা হয়েছে। 'মক্কা' ও 'খলীফার' মতো অতিপরিচিত শব্দগুলির সঙ্গে পুরুষাণুক্রমে যেভাবে পরিচিত সেভাবেই লেখা হয়েছে। অপর পক্ষে 'মুহাম্মদ (সা)' নামটি আরবীতে যেভাবে উচ্চারিত হয় সাধারণত সেভাবেই লেখা হয়েছে।

এ ধরনের রচনায় প্রত্যেকটি অধ্যায়ই স্বয়ংসম্পূর্ণ। একই লেখক এবং একই বিষয়বস্তু নিয়ে একাধিকবার আলোচনা হতে পারে। একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে প্রতিনির্দেশ, অর্থাৎ এক লেখায় অন্য লেখার উল্লেখ, মাঝে মাঝে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কতিপয় সাধারণ বিষয়ের তাৎপর্য সম্পর্কে এক লেখকের সঙ্গে অন্য লেখকের মতপার্থক্য রয়েছে। এই মতপার্থক্য এ জন্যে রাখা হয়েছে যাতে পাঠক বিষয়টির উভয় দিক দেখে নিজস্ব মতামত গ্রহণ করতে পারেন।

এ জি

www.waytojannah.com

স্পেন ও পর্তুগাল

স্পেনের আধুনিক ইতিহাস বিশেষজ্ঞদের ইসলামের উত্তরাধিকার তথা অবদান সম্পর্কে মনোভাব অনুকূল নয়। স্পেনে মূরদের অবদানকে একশ' বছর আগেও দেখা হতো অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে। বর্তমানে কিছু জাঁদরেল লেখকের কাছে তা হয়ে উঠেছে সেকেলে আর চতুর পাঠকদের মধ্যে দানা বেঁধেছে অবজ্ঞা প্রবণতা। প্রাচ্য চর্চায় স্পেনের ইতিহাসবিদদের মধ্যে ভ্রমাত্মক ধারণার সৃষ্টি করেছে যে সব কারণগুলো তা হচ্ছে ঃ কোঁদের *হিস্টোরিয়া দ্য লা দোমিনাসিয়ান দ্য লস্ অ্যারাবেস এন্ এস্পানা* গ্রন্থে বিধৃত ভুল তথ্যসমূহ, সিড তথা সৈয়দ সম্পর্কে আলোচনায় ডোযি-র কিছু আপত্তিকর মন্তব্য-যা পরে অবশ্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে প্রমাণিত হয়েছে। সর্বশেষ যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহের ফরাসী ও মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের লাতীন সূত্র অনুসরণের প্রবণতা। একজন আসিন (Asin) কিম্বা একজন রিবেরার নির্ভরযোগ্য রচনা কীর্তি ও তাদের ভ্রমাত্মক মনোভাব থেকে উদ্ধার করতে পারেনি।

আধুনিক স্পেনের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে অন্যান্য প্রভাবও এর পিছনে কাজ করেছে। এ ধরনের একটি ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, প্রাচ্য চর্চা এবং স্পেনীয় ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব ও শিল্পকর্মের সমস্যাগুলির ইসলামী সমাধান সেই রোমান্টিক অথচ দুর্ভাগ্যজনক ঐতিহ্যের অন্তর্গত যা উনবিংশ শতকের হামলা, গৃহযুদ্ধ ও বিশৃংখলার পর ১৮৯৮ খৃস্টাব্দের স্পেনীয় আমেরিকান সংঘর্ষে পর্যবসিত হয়। ফ্রান্সিস্কো গিনারের শিক্ষা ও নিষ্কলুষ জীবনে উদ্বুদ্ধ হয়ে '১৮৯৮ খৃস্টাব্দের স্পেনীয়রা' যে সংস্কার ও পুনরুদ্ধার আন্দোলন শুরু করে তার ফলে একটি নির্ভুল জ্ঞানচর্চার ধারণা সৃষ্টি হয়। এই ধারণা প্রফেসর মেনেন্ডেয পিডালের রচনায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবুও এটি এককভাবে দুর্ভাগ্যজনক যে, প্রফেসর পিডাল যা কিছু পর্যালোচনা করেছেন প্রাচীন গাথা, সিডের কাব্য, স্পেনীয় ভাষার মূল সূত্র—তাতেই 'মূরীয় ব্যুৎপত্তি' সম্পর্কে অসমর্থিত ধ্যান-ধারণার সমাবেশ দেখতে পেয়েছেন। সত্যিকার অগ্রগতির আগে এসব ধ্যান-ধারণাকে সন্দেহমুক্ত করতে হয়। মেনেণ্ডেয পিডাল তাঁর সমসাময়িক লেখকদের যে কারো চাইতে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে এরূপ সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, স্পেনে একজন রোমান্স[১] ভাষাতত্ত্ববিদ অপরিহার্যভাবে একজন প্রাচ্যবিদের চাইতে নির্ভরযোগ্য, এবং স্পেনীয় ভাষাতত্ত্ব বা

১. লো ল্যাটিন থেকে উদ্ভূত পর্তুগীজ স্পেনীয় প্রভৃতি ভাষা। -অনুবাদক

www.waytojannah.com

স্পেনীয় শিল্পকলার যেকোন সমস্যার রোমান্স ব্যাখ্যা প্রাচ্য শিল্প থেকে উদ্ভূত সমাধানের চাইতেও অন্তর্নিহিতভাবে বেশি গ্রহণযোগ্য। অবশ্য স্পেনীয় ভাষাতত্ত্বে আরবী শিক্ষার মূল্য বা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পিডালের নিজস্ব কোন বিভ্রম ছিলো না। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রিভিসটা ডি ফিলোলজিয়া এস্পানোলার প্রথম সংখ্যার প্রধান লেখাটি ছিলো প্রফেসর মিগুয়েল আসিনের।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে ইসলামের প্রভাব

স্পেনে ইসলামের অবদানের বিরোধিতার আর একটি দিক রয়েছে এবং তা হচ্ছে এই ধারণা যে, পরবর্তীকালে এদেশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যা কিছু অমঙ্গলজনক ঘটেছে তার জন্য মুসলমানরাই দায়ী। 'স্পেন ইসলাম ছাড়া (মধ্যযুগীয় স্পেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তরুণ পণ্ডিত লিখেছেন) ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী ও ইংল্যাণ্ডের ন্যায় একই পথ অনুসরণ করতো; এবং এ ক্ষেত্রে কয়েক শতকের মধ্যে যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে সেখানে স্পেন হয়তো নেতৃত্ব দিতে পারত। কিন্তু তা হতে পারেনি। ইসলাম সমগ্র উপদ্বীপ জয় করে, আইবেরিয়ার ভাগ্যকে বিকৃত করে এবং সেখানে ইতিহাসের হর্ষ-বিষাদ মিশ্রিত নাটকের একটি অধ্যায় চাপিয়ে দেয়—যে অধ্যায়ের ভূমিকা ছিলো ত্যাগ ও সতর্কতার এবং প্রহরী ও শিক্ষকের। ইউরোপীয় জীবন ধারায় এই ভূমিকার গুরুত্ব অপরিসীম হলেও স্পেনকে সে জন্যে অনেক বেশি মূল্য দিতে হয়।'[১]

৭১১ খৃস্টাব্দে মুসলিম বিজয়ের প্রথম প্রতিক্রিয়া যেটি ছিল তা হচ্ছে আইবেরীয় বৈশিষ্ট্য আর একবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আটলান্টিক থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর স্পেনের পার্বত্য অঞ্চলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ কেন্দ্র গড়ে ওঠে, এই কেন্দ্রগুলো যথাসময়ে অ্যাস্টুরিয়া ও নেভার সাম্রাজ্য এবং পিরেনিজের এলাকায় পরিণত হয়। নতুন রাজ্যগুলো প্রায় আট শতক পর্যন্ত নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা অক্ষুণ্ন রাখে। তাদের মধ্যে সাধারণ ব্যাপার বলতে ছিলো বিশ্বাস এবং এমন একটি আঞ্চলিক কথ্যভাষা যা এক সময়ে এক ধরনের লো ল্যাটিন রূপে পরিগণিত হয়। বলকান রাজ্যগুলোর ন্যায় খৃস্টান প্রতিরোধ কেন্দ্র হিসাবে তাদের সূত্রপাত হয়। শেষ পর্যন্ত ইসলাম যখন আর বিপজ্জনক প্রতিবেশী ছিল না তখন এসব খৃস্টান রাজ্যের দৃষ্টি অন্যদিকে নিবদ্ধ হয়। তারা বারবার একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, বিচ্ছিন্নতার মধ্যে তারা পৃথক পৃথক আঞ্চলিক ভাষা ও ঐতিহ্য সৃষ্টি করে। এসব নতুন রাজ্যের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো ক্যাস্টিল রাজ্য;

১. সি সানচেয আলবর্নুয এস্পানা ই এল ইসলাম (রিভিসটা ডি অক্সিডেন্টে, ৭ নং ৭০, পৃ ৪ এপ্রিল, ১৯২৯)। এই বিখ্যাত নামটিও যে আরবী ভাষা উদ্ভূত (আল-বুর্নুসী, বর্নুস বা মস্তকাবরণ সমন্বিত আরবী পোশাক পরিহিত লোক) তা কারো দৃষ্টি এড়াবার কথা নয়।

www.waytojannah.com

কিন্তু সুদীর্ঘকাল ইসলামের সংস্পর্শে থাকার দরুন এটিও মধ্যযুগীয় ইউরোপের বৈশিষ্ট্য অর্জনের ক্ষেত্রে প্রায় তিন শতক পিছিয়ে ছিলো। ইতিমধ্যে পুনর্বিজয় অভিযান দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়, খৃষ্টান নৃপতিগণ মুসলিম কৃষিশ্রমিক অধ্যুষিত বিস্তীর্ণ এলাকা অধিকার করেন এবং অন্যদিকে তাদের খৃষ্টান প্রজারা ক্রমে ক্রমে একটি বিশেষ সামরিক শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়। পুনর্বিজয়ের অর্থনৈতিক পরিণাম মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। এর কারণ এ নয় যে, ইসলামের প্রভাব সরাসরি ক্ষতিকর ছিলো। কিন্তু এটি নিশ্চিত যে, এতে খৃষ্টান রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছিলো। পাঁচ শতাব্দী পর্যন্ত খৃষ্টান স্পেন ইসলামী দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনৈতিক কক্ষপথে আবর্তিত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য মুসলমান ও ইহুদীর একচেটিয়া অধিকারে ছিলো। স্পেনের খৃষ্টান রাজ্যগুলো প্রায় চারশ বছর পর্যন্ত আরব ও ফরাসী মুদ্রা ছাড়া অন্য কোন মুদ্রা ব্যবহার করেনি। আরো দু'শ বছর পর্যন্ত ক্যাস্টিলের রাজাদের নিজস্ব কোন স্বর্ণমুদ্রা ছিলো না। অর্থনৈতিক তৎপরতায় 'প্রাচীন খৃষ্টানদের' কোন আগ্রহ ছিল না; সচেতন আদর্শ থাকুক আর না থাকুক পুনর্বিজয় সব কর্মক্ষম মানুষকে সামরিক অভিযানে আকৃষ্ট ও সংশ্লিষ্ট করে। ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত পুনর্বিজয় যখন বাধাগ্রস্ত হয় তখন দুঃসাহসিক অভিযানের প্রেরণা অ্যারাগনকে ইটালী ও প্রাচ্যে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় এবং পর্তুগালকে আফ্রিকা ও আটলান্টিক মহাসাগর অঞ্চলে আবিষ্কার অভিযানে উদ্বুদ্ধ করে। সমুদ্রের সাথে কোন সংযোগ না থাকায় ক্যাস্টিল রাজবংশগত বিরোধ ও সামন্ত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকে।

ফার্ডিন্যান্ড ও ইসাবেলার অধীনে অ্যারাগন ও ক্যাস্টিলের সংযুক্তির পর গ্রানাডা শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ করে এবং ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে *রিকঙ্কুইস্টা* তথা পুনর্বিজয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে, ঠিক একই সময়ে আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়। এবং এই আবিষ্কার স্পেনীয়দের সবচাইতে তেজোদ্দীপ্ত অংশকে ইতিহাসের বৃহত্তম দুঃসাহসিক অভিযানে আর একবার বাইরের দিকে আকৃষ্ট করে। একই বছরে সংঘটিত ইহুদী নির্বাসন' 'প্রাচীন খৃষ্টানদের' কাছে অপ্রিয় ছিলো না। কিন্তু *মরিস্কোস*[১] বিতাড়ন কখনো সংখ্যাগরিষ্ঠ খৃষ্টানদের সমর্থন লাভ করেনি। এই ব্যবস্থার ফলে সপ্তদশ শতকের সূচনায় দেশ যখন আকস্মিকভাবে তার সমগ্র দক্ষকর্মী ও কয়েক লক্ষ কৃষি শ্রমিক থেকে বঞ্চিত হয় তখনি স্পেনের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

এতদসত্ত্বেও একটি মুসলিম জাতির সংস্পর্শে বসবাসের ফলে তাদের অন্তত একটি লাভ হয়েছিল। এতে খৃষ্টান রাজ্যগুলির মার্জিত রুচিসম্পন্ন একটি ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে সহনশীলতার এমন একটি মনোভাব গড়ে ওঠে যা মধ্যযুগীয় ইউরোপে কদাচিৎ দেখা যায়। লাসা নাভাস ডি টলোসার যুদ্ধ বিজয়ে (১২১২) যেসব ফরাসী ক্রুসেডার অষ্টম

---

১. স্পেনীয় মূর। এসব মুসলিম ধর্মাবলম্বীর যে কোনভাবে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। -অনুবাদক

www.waytojannah.com

আলফন্সোকে সাহায্য করে তারা বিজিত মুসলমানদের প্রতি তাঁর সদয় আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করেন। অ্যারাগনের দ্বিতীয় পেড্রো আলবিজেনসী 'ধর্মবিরোধীদের' পক্ষে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দেন। ক্যাস্টিলও অ্যারাগনের কতিপয় নৃপতি মূর ও ইহুদী বিদ্বজনদের দ্বারা পরিবৃত্ত থাকতেন। তাঁরা মুসলিম স্থপতিদের চাকরিতে নিয়োগ করেন, মুসলিম সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গীত উপভোগ করেন এবং মুসলিম সংস্কৃতির মার্জিত রুচি আয়ত্ত করেন। কিন্তু একই সময়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রমাগত 'ধর্মযুদ্ধ' শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় ভাবাবেগজনিত একটি তিক্ততা সৃষ্টি করে। স্পেনে পাদ্রীগণ ক্ষমতা ও প্রভাবের দিক দিয়ে মর্যাদার যে আসনে উন্নীত হন তার সঙ্গে ইউরোপের আর কোন দেশের পাদ্রীদের তুলনা করা যায় না। এই দেশটি এমন একটি যাজকীয় সংখ্যালঘুদের দ্বারা শাসিত হয় যাদের কাছে স্পেনের সত্যিকার স্বার্থ দ্বিতীয় মর্যাদা লাভ করে; স্পেন ক্যাথলিক ধর্মমতের বেদীমূলে তার প্রাণ চেতনার স্বাধীনতা ও জাতীয় মহত্ত্বকে বিসর্জন দেয়।'

'আল-আন্দালুসে মুসলিম শাসনের অবসানে স্পেন বিষাক্ত হয়ে ওঠে ফার্ডিন্যান্ড ও ইসাবেলা অচিরেই তার শিকারে পরিণত হন, এবং তাঁরা নিজেদের অজান্তেই এই বিষ বাষ্প ছড়িয়ে দেন সারা রাজ্যে, তাঁরা প্রথমে ক্যাস্টিল ও অ্যারাগন নৃপতিদের ঐতিহ্যগত সহনশীলতা পরিহার করেন। এরপর তাঁরা সংখ্যালঘু যাজক সম্প্রদায়ের ধ্যান-ধারণা ও ভাবাবেগের কাছে নতি স্বীকার করেন। এবং জাতীয় ঐক্যকে এমন এক ঐক্যে রূপান্তরের মাধ্যমে তাদের অসংলগ্ন রাজ্যগুলির সংহতি সৃষ্টির প্রয়াস পান, সে ঐক্য যতোটা ধর্মীয় ছিলো ততটা রাজনৈতিক ছিলো না।.... দ্বিতীয় ফিলিপ সংখ্যালঘু যাজক শ্রেণী তাঁর মনে যে ধ্যান-ধারণা বদ্ধমূল করেন তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ফার্ডিন্যান্ড ইসাবেলার নীতিকে অসহনশীলতা ও অসম্ভবের শেষ সীমায় নিয়ে যান, এবং এই পন্থা অনুসরণ করে পরবর্তী ফিলিপগণ কয়েক যুগের মধ্যেই ইসলাম যে একটি মাত্র অনুকূল উত্তরাধিকারিত্ব দিয়ে যায়, হিস্পানিক চিন্তাধারার সেই অলৌকিক কুসুমটির ধ্বংস সাধন করেন।'[১]

মুসলিম স্পেনে উপজাতি ও ভাষা

এ হচ্ছে একজন আধুনিক স্পেনীয় ইতিহাসবিদের লিখিত অভিযোগ। এতদসত্ত্বেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ইউরোপ যে সময় বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক দিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্বিপাক ও অবক্ষয়ে নিপতিত ছিলো সে সময় স্পেনীয় মুসলমানগণ এক অপরূপ সভ্যতা ও একটি সুসংগঠিত অর্থনৈতিক জীবন গড়ে তোলে। শিল্পকলা, বিজ্ঞান, দর্শন ও কাব্য সাহিত্যের বিকাশে মুসলিম স্পেনের ভূমিকা ছিলো চূড়ান্ত এবং এর প্রভাব ত্রয়োদশ শতকের খৃস্টান চিন্তাধারার উচ্চতম শিখর পর্যন্ত, এমনকি টমাস

১. রিভিসটা দি অকসিডেন্টে, খণ্ড ৭, নং ৭০, পৃ ২৮ (এপ্রিল ১৯২৯)।

www.waytojannah.com

অ্যাকিনাস এবং দান্তে পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। এবং তারপর স্পেন ছিল 'ইউরোপের আলোকবর্তিকা।'

কিন্তু আলোকবর্তিকা বহনকারী ছিলো কারা? তাদেরকে মূর অথবা আরব নামে অভিহিত করার রেওয়াজ পূর্বে চালু ছিলো, এরূপ বিকৃতি দ্বারা তাদের নাম-নিশানা মিটিয়ে দেয়া ছিলো সুদূর পরাহত। স্পেনে প্রথম সফল অভিযানের নেতা তারিক আরব ছিলেন না। তিনি ছিলেন বার্বার।[১] তাঁর অনুসারীদের একটি বিরাট অংশও ছিলো তাই। প্রকৃত সংখ্যা ছিলো ৩০০ আরব ও ৭০০০ বার্বার। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ৭১২ খৃষ্টাব্দে মুসা ইবনে নুসায়রের নেতৃত্বে যে বাহিনীর আবির্ভাব ঘটে তাও ছিলো আরব (আরব ভূখণ্ডের বিভিন্ন অংশের), সিরীয়, কপট[২] ও বার্বারদের মিলিত বাহিনী। প্রাচীন রেকর্ডপত্র ও আধুনিক স্থানের নাম (বিশেষ করে ভ্যালেনসিয়া রাজ্যে) পর্যালোচনা করে স্পেন অভিযানের অব্যবহিত পরে এবং পরবর্তীকালে স্পেনে আরব উপজাতীয়দের শ্রেণী বিন্যাস সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। অভিযানকারী বা উপজাতীয় নাম ছাড়া উপজাতীয় বিরোধও নিয়ে আসে, এবং মূল ভূ-খণ্ডের ন্যায় স্পেনেও তাদের বিরোধ একই রূপ তীব্রতার সঙ্গে অব্যাহত থাকে। স্পেনে বসবাসকারী বহু খৃষ্টান পরিবার ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবারগুলো এবং যারা খৃষ্টান থেকে যায় তাদের কেউ কেউ নামের আগে আরবী উপসর্গ *বনু বা বনী* (-এর পুত্র) ব্যবহার করেন।

মুসলমান ও খৃষ্টানদের মধ্যে বহু আন্তবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। মুসা ইবনে নুসায়রের পুত্র এবং অভিযানে অংশগ্রহণকারী অন্য নেতৃবৃন্দ ভিসিগথিক স্পেনের সর্বশেষ বৈধ রাজা উইটিযার পরিবারে বিয়ে করেন, এবং সমগ্র দেশে মুসলমান খৃষ্টান নির্বিশেষে পরবর্তী বংশধরদের মায়েরা সবাই ছিলেন স্পেনীয়। এরপর পুরুষানুক্রমে মুসলমানরা তাদের স্বজাতীয় রমণীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার চাইতে কিংবা স্বজাতীয় স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তাদের সন্তানদের মা হিসেবে উত্তর স্পেন থেকে ধৃত শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাসীদের একাধিক স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার প্রবণতা ছিলো। অধ্যাপক রিবেরা বিভিন্ন যুগে কর্ডোভার ক্রীতদাসের বাজার সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করেন।[৩] একজন ক্রীতদাস ক্রয় সাধারণত যা ধারণা করা হয় তেমন সহজ ব্যাপার ছিলো না। এ কাজটি একজন দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারীর উপস্থিতিতে সম্পন্ন করতে হতো, কি উদ্দেশ্যে একজন ক্রীতদাসীর প্রয়োজন এবং তার সক্ষমতা ও তার প্রতি কি ধরনের ব্যবহার করা হবে প্রভৃতি সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করা হতো। বাগদাদের অধিবাসীদের তুলনায় স্পেনে উমাইয়াদের অধীনে মেয়েরা অধিক

---

১. উত্তর আফ্রিকার মুসলমান।-অনুবাদক

২. মিসরের মূল অধিবাসী। -অনুবাদক

৩. জুলিয়ান রিবেরা, ডিজারটেকশনস ওপাসকিউলস,। ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭-২৫ (মাদ্রিদ, ১৯২৮)

www.waytojannah.com

Contents

স্বাধীনতা ও সদয় আচরণ লাভ করতো। এতদসত্ত্বেও যাদের ভালো পরিবারে মা হিসাবে নেওয়া হতো তারা যাতে শ্বেতাঙ্গ এবং সম্ভব হলে গ্যালিসিয়ার অধিবাসী হয় তা বিশেষভাবে বিবেচনা করা হতো, তাই তাদের বংশধররা কেবল পিতার দিক দিয়ে পূর্ব পুরুষের নাম ব্যবহার করলেও স্পেনীয় রক্তের সংমিশ্রণে তাদের আরব বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন হয়, এবং পুরুষানুক্রমে তারা যতো বেশি আরব নাম ব্যবহার করতো তাদের দেহে ততো কম আরব রক্ত প্রবাহিত হতো। অতএব এরূপ ধারণা ভুল যে, স্পেনে সব মুসলমানই আরব ছিলেন এবং সব খৃষ্টানই রোমান বা গথ ছিলেন। এ ধারণাও ভুল যে, বিজয় অভিযানের সময় এদের সবাই আশ্রয়ের জন্য উত্তরাঞ্চলে পালিয়ে যায়, কিংবা 'পুনর্বিজয় অভিযান' উত্তরে 'ল্যাটিনো–গথ' ও দক্ষিণে আন্দালুসীয় 'আরবদের' মধ্যকার আট শতক স্থায়ী যুদ্ধ ছিলো।

বিজয়ের পর তৃতীয় বা চতুর্থ পুরুষ থেকে আরব বংশোদ্ভূত (ইতিমধ্যে একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু) এবং স্পেনীয় খৃষ্টান বংশোদ্ভূত উভয় শ্রেণীর স্পেনীয় মুসলমানদের অধিকাংশই ছিলেন দ্বিভাষিক। সরকারী ভাষা আরবী ছাড়াও তারা একটি গ্রাম্য রোমান্স ভাষা ব্যবহার করতেন। তখনো মুসলিম শাসনাধীনে বসবাসকারী মুযারিব (*মুসতা'রিব*, 'আরবী কৃত' বা 'ভাবী আরব') নামে পরিচিত। খৃষ্টানরা শেষোক্ত ভাষায় কথা বলতো। আল–খুশানী (আলজোস্কানী) তার কর্ডোভার কাজীদের ইতিহাসে[১] এই রোমান্স আঞ্চলিক ভাষা কতোটা সাধারণভাবে প্রচলিত ছিলো তা বর্ণনা করেন। এতে দেখা যায় যে, কর্ডোভার সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এমনকি আইন–আদালতে এবং রাজপ্রাসাদেও এই ভাষার প্রচলন ছিলো, বস্তুত মুসলিম স্পেনে চারটি ভাষার প্রচলন ছিলো ঃ

১. ক্লাসিক্যাল আরবী, শিক্ষিত শ্রেণীর ভাষা;

২. চলিত আরবী, প্রশাসন ও সরকারের ভাষা;

৩. যাজকীয় ল্যাটিন, বিশেষ ধরনের উপাসনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেবলমাত্র আচার–অনুষ্ঠানের একটি ভাষা; এবং

৪. প্রধানত লো ল্যাটিন থেকে উদ্ভূত একটি রোমান্স আঞ্চলিক ভাষা যা পরবর্তীকালে (*রোমান্স ক্যাস্টেলানো* বা স্পেনীয় নামে পরিচিত) ইংরেজী ও আরবীর পাশাপাশি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক ভাষায় পরিণত হয়।

উপদ্বীপের অশিক্ষিত মূল অধিবাসীদের পক্ষে প্রথমে নিজেদের ভাব প্রকাশের জন্য যে কোন রকমের আরবীভাষা শেখা দুঃসাধ্য ছিলো। বিজয়ের পর প্রথম কয়েক শতকে স্পেনে নতুনভাবে দীক্ষিত বহু মুসলমান ইসলামের মৌলিক বিধি–বিধান শেখার উপযোগী আরবী

---

১. হিস্টোরিয়া ডি লস জুয়েসেস ডি কর্ডোভা, মূল গ্রন্থাংশ, অনুবাদ এবং পরিচিতি জুলিয়ান রিবেরা, (মাদ্রিদ, ১৯১৪।)

www.waytojannah.com

ভাষা সম্পর্কে অত্যন্ত অজ্ঞ ছিলেন, এমনকি পরবর্তী সময়েও আরবী না জানা সত্ত্বেও কোন লোককে কাজী নিয়োগ তেমন বিস্ময়ের ব্যাপার ছিলো না। তৃতীয় আবদুর রহমান ও তাঁর সভাসদগণ জনসাধারণ যেসব অদ্ভুত ধ্বনীর শব্দ ব্যবহার করতেন সেগুলি নিয়ে রসিকতা করতেন।[১] আল–খুশানী বর্ণনা করেন যে, ঐ সময় কর্ডোভায় ইয়ানায়র, বা জিনার নামে এক বৃদ্ধ বাস করতেন, এমন একটি নাম যা আধুনিক স্পেনের বিকাশের সঙ্গে গভীরভাবে আদৌ পরিচিত কোন লোক ভাবাবেগ ছাড়া উচ্চারণ করতে পারেন না। তিনি কেবলমাত্র রোমান্স (*আল–আজামিয়া* 'বিজাতীয় ভাষা') ভাষায় কথা বলতেন। কিন্তু তাঁর সততা ও আন্তরিকতা সম্পর্কে এতটা সুনাম ছিলো যে, তাঁর সাক্ষ্য আদালতে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করা হতো। সদগুণ ও মুসলিম বিশ্বাসের প্রতি নিষ্ঠার জন্য কর্ডোভার লোকদের তিনি অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন। একদিন সরকারী কর্মচারীরা তাকে জনৈক কাজীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আহ্বান জানান। বৃদ্ধ *আজামিয়া* ভাষায় জবাব দেন ঃ "আমি তাকে চিনি না, কিন্তু তার সম্পর্কে জনসাধারণকে বলতে শুনেছি যে, তিনি কিছুটা.... ....।" তিনি *আজামিয়া* ভাষায় এই শব্দটির একটি ক্ষুদ্রত্ববাচক শব্দ ব্যবহার করেন। তাই অফিসারগণ যখন আমীরকে (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাঁর বক্তব্য জানান তখন আমীর তার বক্তব্যে সন্তুষ্ট হয়ে মন্তব্য করেন ঃ "বিশ্বাসযোগ্য না হলে ঐ সাধু ব্যক্তির মুখ থেকে এ ধরনের শব্দ বের হতো না।" তিনি *কাজীকে* সঙ্গে সঙ্গে বরখাস্ত করেন।[২]

মুযারাবা ও মুসলিম সংস্কৃতি

স্পেনে বহু মুসলমান স্পেনের মূল অধিবাসী ছিলেন এবং তারা কোনক্রমেই সামগ্রিকভাবে আরবীভাষা জানতেন না কিংবা ভাল করে আরবী বলতে পারতেন না, এমনকি নবম শতকেও প্রাচ্যের জনৈক পর্যটক (আল–মুকাদ্দাসী) স্পেনের আরবী ভাষাকে 'অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য' আখ্যা দেন। এরূপ অবস্থা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও ইসলাম সেখানে তার অবদান সৃষ্টি গভীরতরভাবে অব্যাহত রাখে, সংস্কৃতিবান মুযারাবাগণ দ্বিভাষিক হলেও তাদের অধিকাংশই ছিলেন অশিক্ষিত। যে দু'–একজন লিখতে ও পড়তে পারতেন তারা ল্যাটিনের চাইতে আরবীতে লেখাপড়া অধিক পছন্দ করতেন। লেখার ব্যাপারে আরবীর তুলনায় ল্যাটিন ছিল একটি অপরিচ্ছন্ন ভাষা এবং ঐ সময়কার ল্যাটিন সাহিত্যও তেমন আকর্ষণীয় ছিল না, তাই আমরা দেখতে পাই যে, কর্ডোভার জনৈক বিশপ পাদ্রীদের জ্ঞানগর্ভ ধর্মীয় উপদেশের চাইতে আরবী পদ্য ও গদ্যের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হওয়ার জন্য

---

১. আর মেনেণ্ডেয পিডাল, অরিজেনস ডেল এসপানল, পৃ. ৪৪২। (মাদ্রিদ, ১৯২৬)
২. জে রিবেরা, লক, ইট., পৃ. ১১৮, এবং আরবী টেক্সট, পৃ. ৯৭।

www.waytojannah.com

তার অনুগামীদের কঠোরভাবে তিরস্কার করেন—যতোটা তিরস্কার ধর্মবিশ্বাসের অভাবের জন্য তিনি করতেন না।

এ ছাড়া মুসলমানরা কাগজ প্রবর্তন করেন। ল্যাটিনের তুলনায় আরবীতে অধিকতর দ্রুত ও সস্তায় বই বের করা হতো। দশম শতকে কর্ডোভা ছিলো ইউরোপে তিলোত্তমা নগরী, সব চাইতে উত্তম সুসভ্য নগরী। কর্ডোভা ছিলো বিশ্বের বিস্ময় ও মোহনীয় নগরী, বলকান রাজ্যগুলোর মধ্যে এক ভিয়েনা। উত্তর দিক থেকে আগত ভ্রমণকারীরা এই নগরীকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন। এখানে ছিলো ৭০টি গ্রন্থাগার এবং ৯০০ সাধারণ হাম্মাম খানা (গোসলখানা)। এমন কি লিওন, নাভারে কিংবা বার্সেলোনার নৃপতিদের যখন শল্যচিকিৎসক প্রয়োজন হতো, স্থপতি, পোশাক নির্মাতা কিংবা সঙ্গীতের ওস্তাদের প্রয়োজন হতো তখন তাঁরা কর্ডোভারই দ্বারস্থ হতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, নাভারের রানী টোটা তাঁর পুত্র মোটা সাঞ্চোর অস্বাভাবিক স্থূলত্ব নিরাময়ের জন্য তাকে এখানে নিয়ে আসেন। তাঁকে জনৈক বিখ্যাত ইহুদী চিকিৎসকের কাছে পাঠানো হয়, এতে চিকিৎসাই কেবল সফল হয়নি; রানীর সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি সম্পাদনের মধ্যস্থতার কাজে সরকার উক্ত চিকিৎসককে ব্যবহার করেন। এছাড়াও পর্যটকদের কল্পনাকে সবচাইতে বেশি আকৃষ্ট করে কর্ডোভার প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদ মদীনাতুয্ যাহ্‌রার বিবরণ। বহু বছর পরে আল–মাক্কারীর সংযত লেখাতেও মনে হয় যে, এটি ছিলো 'সহস্র ও এক রজনীর' এক স্বপ্নপুরী প্রাসাদ, অথচ আধুনিক খননকারীরা কতগুলি প্রাসাদের নর্দমা ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাননি।[১]

নির্মাণকার্য সমাপ্তির পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই মদীনাতুয্ যাহ্‌রা ধ্বংস হয়। কিন্তু খিলাফতের পতনের অর্থ ছিলো বিজয়ীদের এর সংস্কৃতির কিংবা অন্তত তার কিছুটার উত্তরাধিকারীত্ব লাভ। দশম শতক ছিলো মুসলিম নগর ভিত্তিক রাষ্ট্রসমূহের কিংবা 'দলীয় রাজাদের' (আর *মুলুকুআল–তাওয়াইফ*, স্পেনীয় *রিইস ডি টাইফাস*) যুগ। যদিও আব্বাডাইট বংশের (যেমন, কবি মু'তামিদ) শাসনাধীনে সেভিল এক শতক আগের কর্ডোভার চাইতে কোন অংশে কম উন্নত ছিলো না তথাপি এ সময় মুসলিম রাজ্যগুলি উত্তরাঞ্চলের খৃস্টানদের কাছে অধিকতর উন্মুক্ত হয়, এবং এগুলির রাজনৈতিক শক্তি খর্ব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক প্রভাব সম্প্রসারিত হয়। উত্তরাঞ্চলে মুসলিম সংস্কৃতির প্রসার মুযারিবদের দেশত্যাগের ফলে আরো উৎসাহিত হয়। বারবার রাজবংশ আলমোরাবাইড *(আলমুরাবিতুন)* ও আলমোহাডেস *(আল–মুওয়াহহিদুন)*–এর শাসনামলে, বিশেষ করে

---

১. আর ভেল্গাযকোয়েয বস্কো, মেডিনা আয্‌যাবরা ই আল–আমিরিয়া। (মাদ্রিদ, ১৯১২)

www.waytojannah.com

১০৯০ থেকে ১১৪৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্যাতন ও নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়েই মুযারাবাগণ দেশত্যাগ করেন। স্পেনের ইতিহাসে এই প্রথম অসহনশীলতার উদ্ভব হয়। কিন্তু এ এক অদ্ভুত ব্যাপার যে, উভয় শিবিরেই প্রায় যুগপৎভাবে এর আবির্ভাব ঘটে। ধর্মান্ধ বারবাররা দক্ষিণাঞ্চলে এবং ক্লুনিয়াক সন্ন্যাসীরা উত্তরাঞ্চলে এটি প্রবর্তন করে। আল মুরাবিতদের অধীনে বসবাস করা ভ্যালেন্‌সিয়ার মুযারাবাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে; সিডের মৃত্যুর পর ১১০২ খৃষ্টাব্দে জিমেনা যখন নগরী ত্যাগ করেন তখন সমগ্র মুযারাবারাও দেশ ত্যাগ করে ক্যাস্টিলে চলে যায়। অন্যরাও এই ব্যাপক দেশত্যাগের পথ অনুসরণ করে। আলমোহাদেসদের শাসনাধীনে (১১৪৩ খৃ) মুযারিবদের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে ওঠে। আবদুল মু'মিন যেসব খৃষ্টান ও ইহুদী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে না তাদের বহিষ্কারের জন্য ফরমান জারি করেন। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, স্পেনে বার্বার আধিপত্যের ঠিক এসময়েই (মোটামুটি ১০৫৬ থেকে ১২৬৯ খৃ) মুসলিম স্পেনীয় সংস্কৃতিতে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে। আলমুরাবিতদের আমলে ছিলেন ভূগোলবিদ আল–বাক্‌রী ও ইদ্রিসী এবং চিকিৎসাবিদ ইবনে যুহ্‌র (আভেনযোয়ার) এবং পরবর্তী রাজবংশের আমলে ছিলেন দার্শনিক ইবনে বাজ্জা (আবেসপেস), ইবনে রুশ্‌দ (আবেররোস) ও ইবনে তুফাইল, অধ্যাত্মবাদী মুর্সিয়ার আরাবী, ইহুদী পণ্ডিত মায়মুনাইড এবং ভূপর্যটক ইবনে জুবাইর।

নির্বাসিত মুযারিবগণ তাদের সঙ্গে বিভিন্ন গৃহনির্মাণ পদ্ধতি ও পোশাকের স্টাইল, মুসলিম রীতিনীতি ও বক্তব্য প্রকাশের ধারাও নিয়ে আসেন (যেমন, *কোয়েম ডিউস স্যালভেট, কুইসিট বিয়েটা, রিকুইস কুইডিয়োস মেনটেনগা)*।[১] কিন্তু স্পেনে মুসলিম সভ্যতার যে ব্যবহারিক উত্তরাধিকার অব্যাহত ছিলো তা ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে খৃষ্টান বিজয়ের মাধ্যমেই এবং ইহুদী প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিজয়ের ফলে বহু মুসলিম কারুশিল্পী খৃষ্টান শাসনাধীনে আসে। টলেডো অধিকার (১০৮৫) এবং কর্ডোভা (১২৩৬) ও সেভিলের (১২৪৮) পতনের ফলে সমগ্র ইউরোপের জন্য মুসলিম জ্ঞান–বিজ্ঞানের পথ উন্মুক্ত হয় এবং তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। গ্রানাডা বিজয়ের (১৪৯২) মধ্য দিয়ে মৃৎশিল্প ও অন্য কয়েকটি ক্ষুদ্রশিল্প ছাড়া অপরাপর ক্ষেত্রে এই উত্তরাধিকারের পরিসমাপ্তি ঘটেছে বলা যেতে পারে।

আরব্য নবজাগরণের আগে একটি ফরাসী নবজাগরণের সৃষ্টি হয় এবং ইটালীয় নবজাগরণ এর অনুসরণ করে। তাই এখানেই আরব্য প্রভাবের যুগের অবসান ঘটে।

---

১. মেনেণ্ডেয পিডাল, লক, সিট।

www.waytojannah.com

Contents

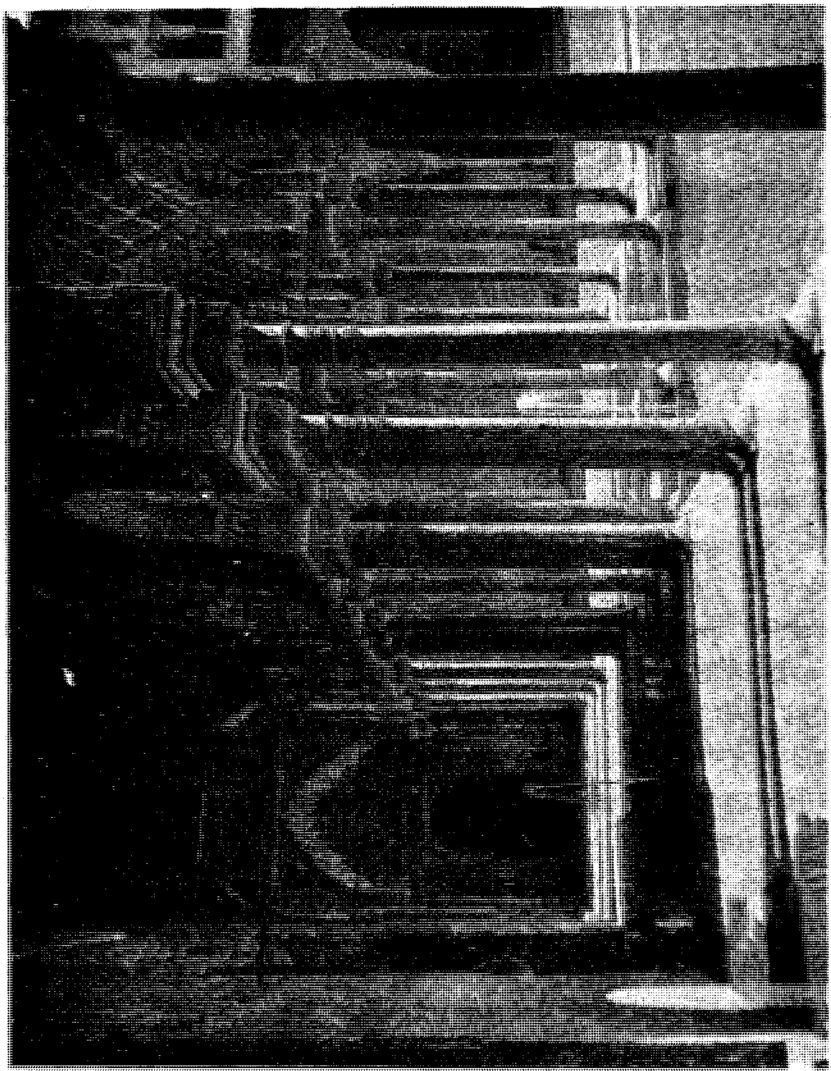

চিত্র-১. আলহামরা-কোর্ট অব লায়ন্সের একটি গ্যালারী

www.waytojannah.com

স্থাপত্য ঃ মুযারাবা ও মুদিজার

মুসলিম স্থাপত্য সম্পর্কে অন্য একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমীর ও খলীফাগণের যুগের প্রতিনিধিত্বশীল স্থাপত্য হচ্ছে কর্ডোভার জামে মসজিদ (চিত্র ৭৭)। 'দলীর রাজাদের' অন্যতম স্মৃতিচিহ্ন (দু-একটির মধ্যে অন্যতম) হচ্ছে সারাগোসায় অবস্থিত আলজাফারিয়ার ধ্বংসাবশেষ, জিরাল্ডা টাওয়ার এবং সেভিলে অবস্থিত আলকাযারের (পেশিও ডেল ইয়েসো) প্রাচীনতম অংশ আলমোহেড যুগের স্মৃতি বহন করছে। অপরদিকে আল হামরা (চিত্র ১) এবং জেনারেলাইফ (গ্রন্থ শিরোনামের বিপরীত পাতা) গ্রানাডার নসর রাজ বংশের কীর্তি।

অবশ্য, বৈশিষ্ট্যগতভাবে স্পেনীয় আরো দুটি স্থাপত্য রীতি রয়েছে যা এখানে বিশষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ মুযারাবা ও মুদিজার।

মুযারাবা স্থাপত্য কোন কোন দিক দিয়ে ইসলামী স্থাপত্যের বৈসাদৃশ্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দক্ষিণের অধিকতর শক্তিশালী ও অধিকতর সভ্য প্রতিবেশীর প্রভাবে এটি প্রভাবিত হয়। ৭১১ খৃষ্টাব্দে আরব অভিযানের পূর্বে স্পেনে প্রচলিত স্টাইল থেকে এর উদ্ভব। ঐ সময় থেকে শুরু করে একাদশ শতকের শেষের দিকে রোমানেস্ক স্টাইল প্রবর্তিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটি উত্তরাঞ্চলের খৃস্টান রাজ্যগুলোর আদর্শ স্টাইল ছিলো। 'বাইযেন্টাইন শিল্পকলার একটি পূরবর্তী ঘাঁটি' হিসাবে এর মধ্যে এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা যুগল *আজিমেয* গবাক্ষ (আল-শামাস) ও অশ্বনাল খিলানের ন্যায় মুসলিম স্থাপত্যেও দেখা যায়। এই 'মূরীয়' খিলান একটি চমকপ্রদ সমস্যা, কারণ এটি মুসলিম অট্টালিকা ছাড়া মোযারেবীয় গির্জায়ও দেখা যায়। কারো কারো মতে কর্ডোভা থেকে খৃস্টান দেশত্যাগীরা, বিশেষত সন্ন্যাসীরা এমন একটি উন্নত সংস্কৃতির ধ্যান-ধারণা নিয়ে আসেন যা উত্তরাঞ্চলে অপরিজ্ঞাত ছিলো। প্রাসাদ তৈরির নতুন পদ্ধতি এর অন্তর্ভুক্ত। এই যুগে নির্মিত গির্জাগুলিতে কতিপয় মূল বাইযেন্টাইন বৈশিষ্ট্য দেখা গেলেও খিলানের কাঠামোতে এবং খিলান করা ছাদ নির্মাণ পদ্ধতিতে (যেমন ৯১৩ খৃস্টাব্দে মুসলিম রাজধানী থেকে নির্বাসিত সন্ন্যাসীদের দ্বারা তৈরি সান মিগুয়েল ডি এস্কালাডা) কর্ডোভার প্রভাব অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন, কর্ডোভা খৃস্টান এবং মুসলমান উভয়কেই 'মূরীয়' খিলানের সঙ্গে পরিচিত করে, কিন্তু এটি মূলত কর্ডোভার অবদান নয়, কারণ নিঃসন্দেহে বিজয়ের আগেও স্পেনের অস্তিত্ব ছিলো। এমনকি শেষের দিকে রোমান সমাধিস্তম্ভেও এর পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য স্পেনীয় মুসলমানরা কাঠামোগত আলঙ্কারিক দিক দিয়ে এর সম্ভাবনা দ্রুত উপলব্ধি করে, এবং সাধারণভাবে পার্শ্বগুলির 'চিমটি' (পিঞ্চ) পরিবর্ধন ও শেষ পর্যন্ত খিলানের ফাঁপা অংশ অর্ধপূর্ণ করে এটিকে চালু করে। অশ্বনাল খিলানসহ কর্ডোভার প্রভাব মোযারেবীয় উজ্জ্বল বর্ণ হস্তলিপিতেও (যেমন লিবানার বীটাসের ভাষ্য) দেখা যায়। এ

www.waytojannah.com

ধরনের অন্যান্য ল্যাটিন হস্তলিপিও রয়েছে। যেগুলি ল্যাটিন শব্দ বিশ্লেষণ করে আরবীতে পার্শ্ববর্তী টীকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু স্থাপত্যের ক্ষেত্রে কর্ডোভার সবচাইতে মৌলিক অবদান হচ্ছে পরস্পর ছেদী খিলানের দৃশ্যমান পরস্পর ছেদী পোলিন্দের উপর ভিত্তি করে খিলানের ছাদ তৈরি করা। এই পদ্ধতিটি স্থাপত্যের প্রধান সমস্যার (শূন্য স্থান ছাদ দিয়ে আবৃত) পালেমোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। দুই শতক পরে গথিক খিলানের ছাদ সৃষ্টি ব্যবস্থাও একইভাবে বিকাশ লাভ করে।

কর্ডোভায় বিকশিত স্থাপত্য রীতি টলেডো এবং সারাগোসে বহন করে যাওয়া হয়, এখানে ইটের কাজে তার অপরূপ পরিচয় পাওয়া যায় 'ক্রিস্টো ডি লা লুয (চিত্র ২) মূলত একটি ভিসি গথিক গির্জা ছিলো। অধিকারের সময় এটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়। প্রাসাদে একটি উৎকীর্ণ লিপির বর্ণনা অনুযায়ী ৯৮০ খৃস্টাব্দে জনৈক মূরীয় স্থপতি এটি পুনরুদ্ধার করেন। অভ্যন্তরভাগে প্রাচীরের সঙ্গে লাইন করা ফাঁকা খিলানশ্রেণী তথা 'ডামি' খিলানশ্রেণী সর্বত্রই চোখে পড়ে। এটিকে এ ধরনের স্থাপত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে ধরা হয়। পরবর্তী নিদর্শন হচ্ছে ডারহাম (১০৯৩. চিত্র ৩) এবং নরউইচ (১১১৯) গির্জা। খৃস্টানদের নিকট আত্মসমর্পণ করার পর পরস্পরছেদী আলংকারিক খিলান শ্রেণী মুসলিম স্থাপত্য শিল্পীদের একটি প্রিয় কৌশল ছিল।

মুদিজার *(মুদাজ্জানীন)* নামে পরিচিত এসব স্থাপত্যকর্মীরাই স্পেনীয় জাতীয় রীতির উদ্ভাবক। এটি ইউরোপীয় শিল্পকলায় সম্ভবত সবচাইতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্পেনীয় অবদান। স্পেনের সর্বত্র এর পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এর প্রকৃত আবাস হচ্ছে টলেডো। সেখানে আমরা ইটের তৈরি গির্জার এমনসব সুদর্শন টাওয়ার দেখতে পাই যেখানে ক্রমাগত ফাঁকা খিলান শ্রেণী রয়েছে। একটির উপর আরেকটি খিলান শ্রেণীর স্তরগুলো হচ্ছে এর প্রধান আলংকারিক সৌন্দর্য। অপরদিকে প্রত্যেক তালায় বিভিন্ন আকারের জানালা রয়েছে (চিত্র ৪)। অ্যারাগণে মুডেজার টাওয়ারগুলি মিনারের ন্যায় গির্জা থেকে বিচ্ছিন্ন। এগুলি কোন কোন সময়ে উজ্জ্বল বর্ণের টালি এবং ইটের কাজ দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে। টেরুয়েলে রাস্তার উপর আড়াআড়িভাবে চারটি টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছে। নীচের একটি খীলান পথের মধ্য দিয়ে যানবাহন চলাচল করে। ক্যালাটায়ুতে *(কালয়াত আইয়ুব)* টাওয়ারগুলি অষ্টভুজ।[১] টলেডোর মুডেজার গির্জাসমূহের ইটের তৈরি উদ্গত অংশগুলি (অ্যাপস্) বিশেষভাবে ইটের গাঁথুনির অপরূপ দৃষ্টান্ত। অপরদিকে সারাগোসার প্রাচীনতর গির্জাটির উত্তরদিকের প্রাচীর এ ধরনের অলংকরণের আর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। গির্জাও ব্যক্তিগত ভবনের সাজসজ্জার জন্য মুডেজার কর্মীদের স্পেনের সর্বত্র নিয়োগ করা হতো। গুয়াডালাজারার *(ওয়াদিউল হিজারা)* ইনক্যান্টাডো প্রাসাদের অদ্ভুত অঙ্গনটি এর প্রকৃষ্ট

১. বার্নার্ড বিভান, দি মুডেজার টাওয়ার্স অব অ্যারাগণ (সচিত্র), 'অ্যাপোলো ; ৯ নং ৫৩ (মে ১৯২৯)।

www.waytojannah.com

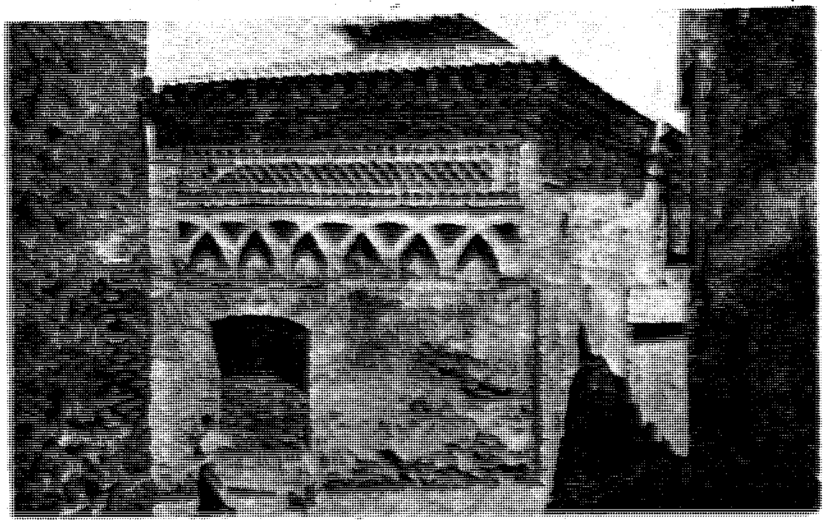

চিত্র-২. টলেডোর ক্রিস্টো লা-লুজ

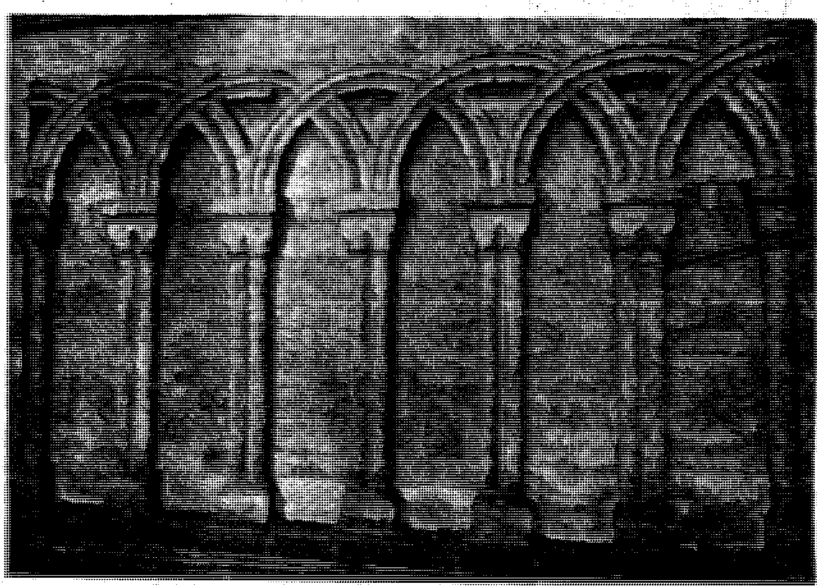

চিত্র-৩. ডারহামের প্রধান গির্জায় পরস্পর ছেদী ফাঁকা খিলান শ্রেণী

www.waytojannah.com

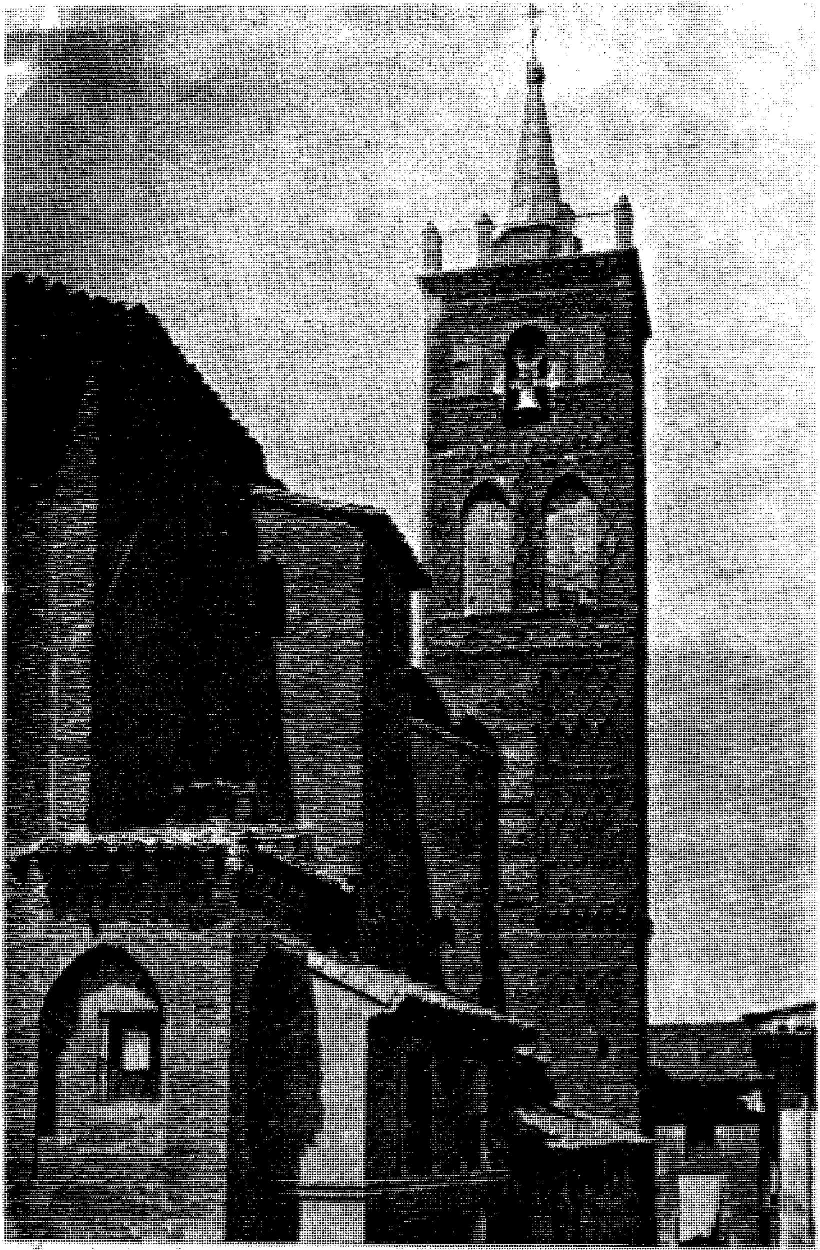

চিত্র-৪. মূদাজ্জানীন নির্মিত সারাগোসার সান জিল বুরুজে ইটের কারুকাজ

www.waytojannah.com

দৃষ্টান্ত। সমাধির চন্দ্রাতপ এবং গির্জার উপাসনা কক্ষ (সিনাগগ) নির্মাণের জন্য তাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হতো। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, বর্তমানে *'এল ট্রানসিটো'* এবং *'সান্টা মেরিয়া লা ব্ল্যাংকা'* নামে পরিচিত টলেডোর প্রাসাদগুলো। সেভিলের আলকাযার প্রাসাদটি রাজা পেড্রো দি ক্রুয়েলের জন্য মুডেজার স্থাপত্য কর্মীগণ কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে মুসলিম রীতিতে তৈরি, এটি এখনো রাজকীয় বাসভবন হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কাষ্ঠশিল্প, মৃৎশিল্প, বস্ত্রশিল্প ও সঙ্গীত

মুদিজার শিল্পীগণ সবকিছুর উর্ধে ছোটখাটো শিল্পে সর্বাধিক দক্ষতা অর্জন করে। কাষ্ঠশিল্প, মৃৎশিল্প, বস্ত্র। পালেরমোর (সিসিলি) কাপেলা প্যালাটিনার সিলিং বাদ দিলে স্পেনীয় খোবওয়ালা (আর্টেসোনাডো) সিলিংয়ের তুলনা ইউরোপে নেই এবং প্রথমোক্তটিও মুসলমানদেরই অবদান। তাদের খচিত দরজাও কোন অংশে কম সুন্দর ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয়। বর্তমান সময়েও কাঠমিস্ত্রিদের পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্পেনীয় পরিভাষা প্রধানত আরবী। বর্তমানে স্পেনে ও পর্তুগালে অত্যন্ত পরিচিত বিভিন্ন ধরনের রঙিন টালি *(আযুলেজো)* যে মুসলমানদেরই অবদান তা নাম থেকে বোঝা যায়। (পৃ ৩৯–৪০)। পুনর্বিজয়ের পর পূর্ববর্তী সময়ের জ্যামিতিক কারুকার্য ও উৎকীর্ণলিপির স্থলে চিত্রের অথবা টালির তৈরি বিশাল প্রাচীর চিত্রের প্রচলন হয় (চিত্র ৫)। সেভিলে বেদী, রেলিংযুক্ত ছোট ছোট থাম, ফোয়ারা (সেখানে পানি এমনভাবে রাখা হতো যাতে বেসিনের প্রান্তভাগে তা বিন্দু বিন্দুভাবে পড়ে এবং নীচের টালিগুলিকে ভেজা ও চকচকে রাখে) প্রভৃতির জন্য টালি ব্যবহার করা হতো। সরকারী উদ্যানে আসন এবং বইর তাক (সরকারী উদ্যানে ফ্রি লাইব্রেরি বৈশিষ্ট্যপূর্ণভাবে একটি স্পেনীয় প্রতিষ্ঠান) নির্মাণের টালি ব্যবহৃত হতো, পর্তুগালে আরো ব্যাপকক্ষেত্রে রঙিন টালি ও টালিচিত্র ব্যবহৃত হয়: এভোরার একটি গির্জার অভ্যন্তরভাগ নীল ও শ্বেত টালির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত।

মুদিজার শিল্পদক্ষতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে স্পেনীয়–মূরীয় উজ্জ্বল মৃৎশিল্পে, সংগ্রাহকদের মতে চীনের চীনামাটির পাত্রের পরই এর স্থান। এর প্রাচীনতম উল্লেখ একাদশ শতকে (টলেডো ১০৬৬, কর্ডোভা ১০৬৮)। ইদ্রিসীর বিবরণ অনুযায়ী ১১৫৪ খৃষ্টাব্দের আগে ক্যালাটায়ুডে এই মৃৎপাত্র নির্মাণ করা হতো। স্পেনে পরস্পর থেকে বহুদূরে বিচ্ছিন্ন আরো দুটি এলাকা এই মৃৎপাত্রের জন্য বিখ্যাত ছিলো। এলাকা দুটি হচ্ছে ভ্যালেনসিয়া রাজ্যের অধীন মালাগা ও ম্যানিসেস। মৃৎপাত্রের প্রাচীনতম নিদর্শন হচ্ছে চতুর্দশ শতকের, কিন্তু মদিনাতুয্যাহরার খননকার্যের সময় মৃৎপাত্রের যেসব টুকরা পাওয়া যায় সেগুলি অবশ্যই আরো চারশ' বছরের প্রাচীন। আদর্শ স্পেনীয়–মূরীয় মৃৎপাত্রে একটি চকচকে সোনালি রং থাকে, এই রং চুনী থেকে রামধনু মুক্তা এবং সবুজ আভাযুক্ত হলদে

৩—

www.waytojannah.com

বর্ণও হয়ে থাকে। নকশার প্রাচীনতম আকার বাইজেনটিয়াম যুগের, কিন্তু অলংকরণের জন্য শীঘ্রই বর্গাকৃতির কুফী বৈশিষ্ট্য প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীকালে অত্যন্ত জনপ্রিয় *আল–'আফিয়া* (ভালো স্বাস্থ্য; স্পেনীয় *আলাফিয়া*, সমৃদ্ধি, ভাগ্য বা আশীর্বাদ) উৎকীর্ণলিপির প্রচলন করা হয়। সার্বজনীনভাবে ধারণা করা হয় যে, মৃৎশিল্পীরা আল্লাহর পবিত্র নামের বিকল্প হিসেবেই এই সূত্রটির প্রচলন করেন। তাঁরা মনে করতেন যে, এতে ঐ পবিত্র নামের দরুন পাত্রটি ভাঙবে না এবং পরিণামে শিল্পী নিজেও নিরাশ হবে না। প্রধানত ওষুধের পাত্রেই *আল–'আফিয়া* উৎকীর্ণলিপি দেখা যায়। ভ্যালেনসীয় মৃৎশিল্পীরা তাদের এলাকার অতি পরিচিত লতাগুল্ম ব্রাইওনির (*আর আল্–ঘালিবা, স্পে, আল্ গালাবা*) উপর ভিত্তি করে অন্যান্য নক্শা রীতিও আবিষ্কার করেন। দ্রাক্ষাপত্রের নকশাও ব্যবহার করা হতো। তাদের এসব পরিচয় কুলজীচিহ্নেও (চিত্র ৬) পাওয়া যায় এবং এত দ্বারা এটিই প্রমাণিত হয়েছে যে, স্পেনীয় মূরীয় মৃৎপাত্র পোপ, কার্ডিন্যাল এবং স্পেন, পর্তুগাল, ইটালী ও ফ্রান্সের সেরা পরিবারগুলির জন্য তৈরি করা হয়।[১] ' এসব ধর্ম–বিরোধী কারুশিল্পীদের সম্পর্কে কার্ডিন্যাল যিমেনেয মন্তব্য করেন ঃ 'তাদের মধ্যে আমাদের ধর্মবিশ্বাসের অভাব রয়েছে, আবার আমাদের মধ্যেও তাদের কর্মদক্ষতার অভাব রয়েছে।'

স্পেনীয়–মূরীয় রেশমী বস্ত্রের চাহিদা স্পেনীয়–মূরীয় মৃৎ শিল্পের চাইতে কম ছিলো না। এ সম্পদের সমাবেশ বিশেষভাবে খৃস্টান গির্জাগুলোতে দেখা যায়। এমনকি ক্যান্টারবারি গির্জায় যে কয়টি ছোট ছোট রেশমী থলেতে ১২৬৪–১৩৬৬ পর্যন্ত সময়ের রেকর্ড পত্রের সীলমোহর রাখা হয়েছে সেগুলিও প্রাচীন স্পেনীয় রেশমী বস্ত্রের তৈরি জটিল সূক্ষ্ম কারুকার্যের দিক দিয়ে এগুলি নির্ভুল ও অতুলনীয়। সর্বোৎকৃষ্ট রেশমীবস্ত্রের যেসব নিদর্শন এখনো পাওয়া যায় সেগুলির তারিখ দ্বাদশ শতকের সমাপ্তি থেকে ত্রয়োদশ শতকের সূচনা পর্যন্ত। চতুর্দশ শতক থেকে আরো সূক্ষ্ম বুনন সম্বলিত নতুন নতুন নকশার উদ্ভব হয়। স্পেনে মুসলিম শাসনের পরেও এগুলি টিকে থাকে এবং পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে মুদিজার শিল্পের আর একটি অভিব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়।

কর্ডোভা ও 'কর্ডোভান বা কর্ডওয়াইন' নামে পরিচিত চামড়ার জন্য খ্যাতি লাভ করে, তাই 'কর্ডওয়াইনার্স' কোম্পানীকে বা অন্তত এই নামটিকে আরব উত্তরাধিকারের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে মুদিজার বুকবাইণ্ডারগণ সূক্ষ্ম ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিল্প সৌকর্য প্রদর্শন করেন। মুসলিম স্পেনীয় স্বর্ণকারগণও সুখ্যাতি অর্জন করেন। এসব কারুশিল্পী অন্যান্য ধাতব পদার্থের উপর কারুকার্যেও কম দক্ষতার পরিচয় দেননি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মিনা করা ও খোদাই করা তরবারির বাঁট এবং দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত লোহার তালাচাবি ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে তালার রেপের উপর বর্গাকৃতির কুফী হস্তলিপির অনুরূপ লেখা খোদাই করা হতো।

---

১. সি ভ্যান ভার পুট, স্পেনিশ আর্ট : ব্যার্লিংটন ম্যাগাজিন মনোগ্রাফ (১৯২৭) এবং অন্যান্য পৃথক পর্যালোচনা।

www.waytojannah.com

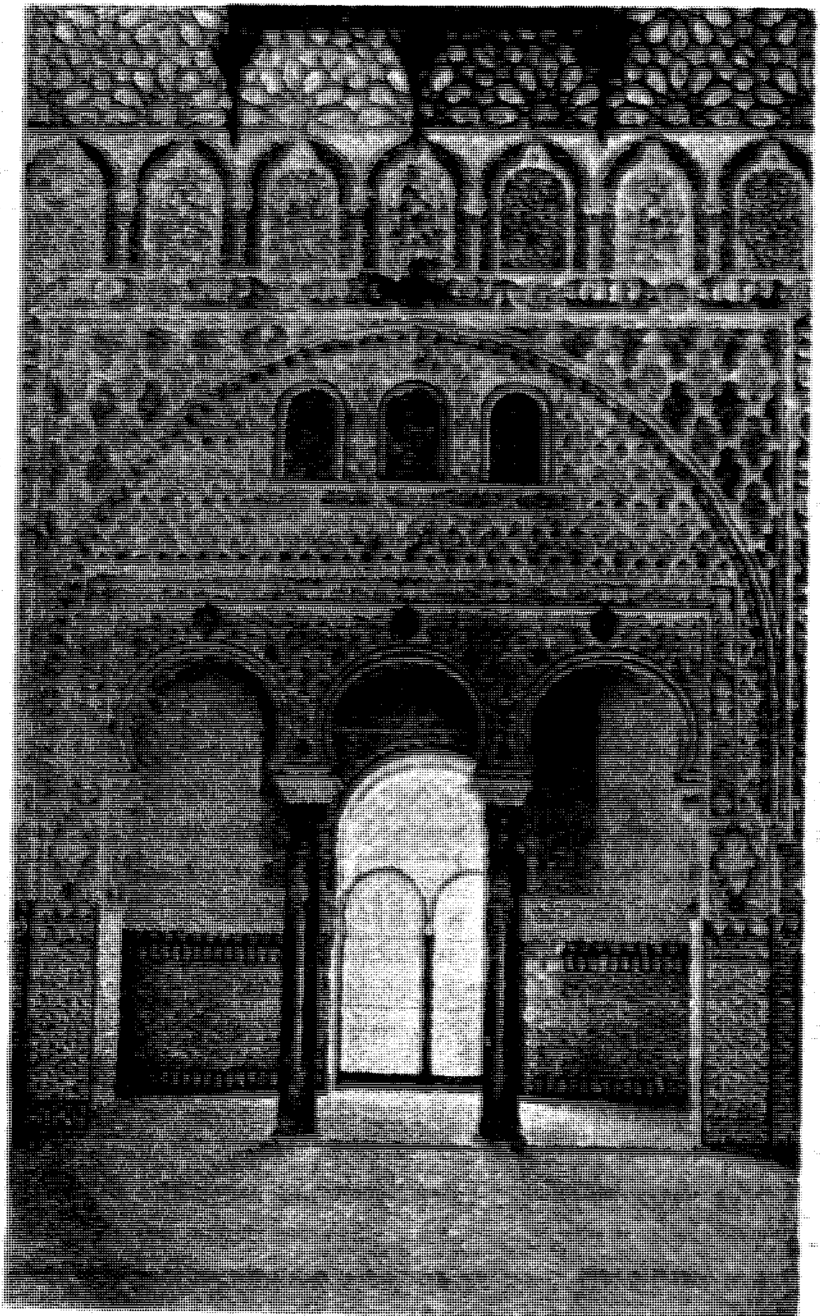

চিত্র-৫. স্পেনের আলাকাযারের রাষ্ট্রদূত ভবনে রঙিন টালি

www.waytojannah.com

স্পেনীয় মুসলমানদের কারিগরি শিল্পকলার (ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস) ব্যাপারে যথোচিত বলা দুরূহ। অথচ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাদের প্রভাবকে সম্ভবত অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলে যে জনপ্রিয় সঙ্গীত শোনা যায় তার সঙ্গে মরক্কো ও অন্যান্য মুসলিম দেশের সঙ্গীতের বাহ্যিক মিল বহু পর্যবেক্ষককে বিভ্রান্ত করেছে। নৃত্য ও নৃত্যের ছন্দের ক্ষেত্রে আধুনিক স্পেন ও আধুনিক মরক্কোর মধ্যে নিঃসন্দেহে একটি সম্পর্ক রয়েছে। ফেয–এর সঙ্গীত ভাণ্ডারের (রিপার্টরি) কতিপয় সুর গ্রানাডা থেকে আমদানি করা হয়েছে বলে মনে করা হয়। এতদসত্ত্বেও অন্যান্য সঙ্গীতে এর ধারা ও ধরনের চাইতে পরিবেশনেই মিল রয়েছে। ক্যাস্টিল ও অ্যারাগনের মধ্যযুগীয় রাজাদের দরবারে নিঃসন্দেহে বহু মুসলিম সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাদের ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় সঙ্গীদের ন্যায় তাদের নামও সংরক্ষণ করা হয়েছে, কিন্তু মধ্যযুগের শেষার্ধে (যেমন হিটার আর্কপ্রিস্টের আমলে) 'মূরদের প্রায়ই বাদ্যযন্ত্রীর চাইতে নৃত্য শিল্পী হিসাবে উল্লেখ করা হয়। অথচ স্পেনে এবং তথা ইউরোপে বহুক্ষেত্রে মুসলমানরাই বাদ্যযন্ত্র আমদানি করেন ঃ লিউট (বীণা) *আল–'উদ,* গিটার কিতারা এবং চসারের প্রিয় বাদ্যযন্ত্র রীবেক অথবা রিবিব্ল আরবী *রাবাব,* স্পেনীয় রাবেল, পর্তুগীজ বারেকা। শেষোক্ত নামটি এখনো বেহালা অর্থে পর্তুগালে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়।

উপদ্বীপের আরো বহু বাদ্যযন্ত্রের নাম আরবী থেকে উদ্ভূত, যেমন টামবারীন ইংরেজী *ট্যাম্বোরিন, (স্পেনীয় পান্ডেরো পান্ডেরেটা, কথ্য আরবী বান্দায়র)* এবং স্পেনে *সোনাজাস* নামে পরিচিত ঝন্ঝন্ শব্দ (*ইং জিংগল্স্,* আরবী বহুবচন সূনূজ পারস্য *সান্জ*), প্রাচীন স্পেনীয় তুরী আনাফিল আরবী আননাফির থেকে উদ্ভূত। কতিপয় শিঙ্গাধ্বনির মিলিত সঙ্গীত 'ফ্যানফেয়ার' (ভেরীনিনাদ) ড. ফার্মারের মতে আরবী নাফির বহুবচন আন্ফার থেকে উদ্ভূত, স্পেনীয় ব্যাগ–পাইপ্স *গাইটা* আরবী আলগায়তা (সানাইজাতীয় বাঁশীবিশেষ) থেকে উদ্ভূত। পশ্চিম আফ্রিকার এটি *'অ্যালিগেটর'* নামে পরিচিত, আরবী কথ্য উচ্চারণের অত্যন্ত কাছাকাছি ইংরেজী শব্দ। *আলবগ* এবং *আলবুগন* (আরবী *আল–বাক,* ল্যাটিন *বুক্কিনাম)* নামে পরিচিত প্রাচীন স্পেনীয় বাদ্যযন্ত্রের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বহুদিন পর্যন্ত এটি রহস্যাবৃত ছিলো, কিন্তু বর্তমানে *বাস্ক্* প্রদেশগুলিতে প্রচলিত এই বাদ্যযন্ত্রের রহস্য উন্মোচিত হয়েছে।[১] সর্বশেষে (অন্য একটি অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে) *'ট্রব্যাডুর'* (গীতিকবি) এবং *ট্রবার* শব্দগুলিও প্রায় নিশ্চিতভাবে আরবী থেকে এসেছে। গান করা অথবা সঙ্গীত সৃষ্টি করা অর্থে *তাররাবা* শব্দ থেকে।

ষোড়ষ শতকে স্পেনীয় মূরদের উপর নির্যাতন এবং তাদের ধীরে ধীরে বিতারণের সময় জিপসীদের (এরা প্রথমে ১৪৪২ খৃষ্টাব্দে বার্সিলোনায় অবতরণ করে বলে জানা যায়) ক্রমে ক্রমে আবির্ভাব ঘটে। তারা স্পেনীয় মূরদের স্থান দখল করে, এমনকি কেউ কেউ

---

১. রডনী গ্যালপ, এ বুক অব দি বাস্কস্ (১৯৩০), পৃ. ১৮৩।

www.waytojannah.com

নিজেদের ভবঘুরে স্বভাব ত্যাগ করে গ্রানাডার পরিত্যক্ত বাড়িঘরে বসবাস শুরু করে। তারা মাঝে মাঝে বাসনকোশন ঝালাই বা ছোটখাটো মেরামতের কাজ করলেও তাদের নিজস্ব কোন শিল্প বা কারুশিল্প ছিল না। তারা সবদিক দিয়ে স্পেনীয় মূরদের অভাব পূরণে অযোগ্য ছিলো, কিন্তু তারা ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের গায়ক হয়ে ওঠে। তারা ভবঘুরে জীবনে যেভাবে গান শুনেছেন সেভাবেই গান করতেন। কিন্তু তারা অত্যন্ত দ্রুত ও উচ্চস্বরে গানবাদ্য করতেন এবং এটুকুই ছিলো তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। সূচনায় *যামরা* (আরবী যামারা) নামে পরিচিত এই পদ্ধতিটি–এই পদ্ধতিতে শ্রোতারাও *ওলি! ওলি! (ওয়াল্লাহি?)* চিৎকার ধ্বনিতে ভেঙে পড়ে তাল মিলাতো––মুসলিম আমলের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। গিটারবাদক একাকী গৌরচন্দ্রিকা হিসাবে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত গিটার বাজাতেন, যে পর্যন্ত না শ্রোতা ও অন্যান্য সঙ্গীতজ্ঞের মেজাজ নির্দিষ্টমাত্রায় গিয়ে পৌঁছুতো। অতঃপর গায়ক বা গায়িকা আসরে প্রবেশ করতেন এবং একই উদ্দেশ্যে গলা সাধার জন্য দীর্ঘ *আই*! ধ্বনীতে গান শুরু করতেন। অথবা (১৯২২ খৃষ্টাব্দের দিকেও যা শোনা গেছে) লেলি, লেলি (আরবী *লাইলি*) ধ্বনীতে তীব্র চিৎকারের মাধ্যমে গান শুরু করতেন, যা মুসলমানদের ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এরূপ ক্ষীণ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, মধ্যযুগীয় ইউরোপে জ্ঞান–বিজ্ঞানের অন্যান্য প্রত্যেকটি শাখার ন্যায় ইউরোপীয় সঙ্গীতের থিওরিও মুসলিম লেখকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়।[১] অষ্টম থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত সঙ্গীত বিষয়ক বহু গ্রীক পুস্তিকা আরবীতে অনূদিত হয়। এছাড়া আল–কিন্দি, আল–ফারাবী, ইবনে বাজ্জা, ইবনে সিনা প্রমুখ লেখক বহু গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গ্রন্থও রচনা করেন। উত্তরাঞ্চলের জ্ঞানার্থীরা যখন টলেডো যেতে শুরু করেন তখন ধীরে ধীরে এসব আরবীগ্রন্থ ল্যাটিন অনুবাদের মাধ্যমে ইউরোপে পরিচিত হয়। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, ঠিক এ সময়েই (দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধে) উত্তরাঞ্চলের সঙ্গীতে একটি মৌলিক উপাদানের উদ্ভব হয়। এই মৌলিক উপাদান হচ্ছে একক সুরগুলির নিজেদের মধ্যে সাধারণ গানের ন্যায় বিগলিত তালের পরিবর্তে একটি সঠিক তাল বা অনুপাত থাকে।[২] কলোনের ফ্রাঙ্কোকে কখনো কখনো এই ছন্দোবদ্ধ সঙ্গীতের' আবিষ্কর্তা বলে মনে করা হয়। কিন্তু তিনি নিজেই বলেছেন যে, ছন্দোবদ্ধ সঙ্গীতের ন্যায় ব্যাপারের অস্তিত্ব আগেও ছিলো এবং মনে হয় সুদূর অষ্টম শতকে আল–খালিলও এ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। দশম শতকে আল–ফারাবীর লেখায় এর পরিচয় পাওয়া যায়। আলফারাবিয়াস নামে তার এই লেখা ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয় এবং উত্তরাঞ্চলের সঙ্গীতজ্ঞগণ তা ব্যাপকভাবে পাঠ করেন। ত্রয়োদশ শতকের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ ওয়াল্টার ওডিংটন আরব

---

১. এইচ জি ফার্মার, 'ক্লুজ ফর দি অ্যারাবিয়ান ইনফ্লুয়েন্স অন ইউরোপীয়ান মিউজিক্যাল থিওরী।' এফ আর এ এস, জানুয়ারি ১৯২৫, পৃ. ৬১–৮০।
২. গ্রোভস ডিকশনারী অব মিউজিক এণ্ড মিউজিসিয়ান্স ,৩য় সংস্করণ (১৯২৭), আর্ট ফ্রাঙ্কো।'

www.waytojannah.com

উস্তাদদের কথা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বলতেন। সঙ্গীতের তাত্ত্বিক বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ লেখক ঐ যুগের আরেকজন ইংরেজ সঙ্গীতজ্ঞ এতটা এগিয়ে যান যে, তিনি নতুন সুরের আরবী নাম প্রদান করেন। তার দেওয়া নাম হচ্ছে *'এলমুয়াহিম'* এবং *'এলমুয়ারিফা'*।[১]

মধ্যযুগীয় সঙ্গীত বর্তমানে এমন একটি বিষয় যেখানে তাত্ত্বিক বিষয় সম্পর্কে অনেককিছু জানা গেলেও ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায় না। দি অক্সফোর্ড হিস্টরি অব মিউজিক (১৯২৯)–এর প্রাথমিক খণ্ডে 'মধ্যযুগে সঙ্গীতের সামাজিক দিক' সংক্রান্ত অধ্যায়ে সম্পূর্ণ নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও 'ছন্দোবদ্ধ সঙ্গীতের' ব্যবহারিক মূল্য অপরিসীম, কারণ এতে কয়েকটি কণ্ঠের একত্রে গান করার জন্য সহজ পাঠ্যভাবে সঙ্গীত রচনা ও লেখা যায়। আলফারাবিয়াস ও অন্যান্য মুসলিম তাত্ত্বিকের কাছে এ ধরনের ব্যবহারিক সঙ্গীত সম্ভবত সম্পূর্ণ অবোধ্য ছিলো এবং তারা হয়তো কখনো এ কথা উপলব্ধি করেননি যে, উত্তরাঞ্চলের সঙ্গীতজ্ঞগণ এমন একটি মূলনীতি প্রয়োগ করছেন যে তারা নিজেরাই প্রথম বিবৃত করেন। ছয় কণ্ঠে গাওয়ার জন্য *'সুমার ইজ ইক্যুমেন ইন'* সঙ্গীতটি ১২৪০ খৃষ্টাব্দের দিকে রিডিংয়ের জনৈক সন্ন্যাসী রচনা করেন। ঐ সময়কার যেকোন সঙ্গীতের চাইতে এটি অগ্রগামী ছিলো। এটি ট্রবাডুরদের এবং স্পেনীয় রাজা বিজ্ঞ আলফন্সোর (আনু ১২৮৩) *ক্যান্টিগাসদের* সঙ্গীতের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের সঙ্গীত। শেষোক্ত সঙ্গীতগুলি সম্ভবত মুসলমানদের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল।

স্পেনীয় ও পর্তুগীজ ভাষায় আরবী শব্দ

স্পেনে স্পেনীয় ভাষার চাইতে অন্য কোথাও এতো সুস্পষ্টভাবে ইসলাম ধর্মের নজীর পাওয়া যায় না। তবুও অতিরঞ্জন পরিহার করা এবং এই ঋণের পরিমাণ কতখানি তা যতটা সম্ভব সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা এখানে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ৭৭১ খৃষ্টাব্দে মুসলিম অভিযানের সময় এখানে লো–ল্যাটিন থেকে উদ্ভুত একটি রোমান্স আঞ্চলিক ভাষা গড়ে উঠেছিল। এই উপদ্বীপে একসময় এটিই ছিলো কথ্য ভাষা। মুসলিম শাসনামলে খৃষ্টানরা (যা আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি) এবং এরপর কিছুকাল পর্যন্ত কিছু সংখ্যক মুসলমানও এই ভাষা ব্যবহার করে বলে জানা যায়।

এই রোমান্স আঞ্চলিক ভাষায় বেশ কিছু সংখ্যক আরবী শব্দ প্রবেশ করে, এক্ষেত্রে আরবী শব্দ সরাসরি ততোটা ধার করা হয়নি। বরং স্পেনীয় আঞ্চলিক ভাষাগুলি অনিশ্চিত ও অসংলগ্ন হওয়ায় এবং অপরদিকে উপদ্বীপে আরবী ভাষাভাষী লোক থাকায় অনেকটা স্বাভাবিকভাবেই আরবী শব্দ প্রবেশ করে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধার করা আরবী শব্দগুলি বিশেষ্য এবং সেগুলি এমন সব জিনিস ও ধ্যান–ধারণা, আধুনিক স্পেনীয় ভাষায় যেগুলির নাম ছিলো (এবং বহুক্ষেত্রে এখনো

---

১. কোসেমেকার, স্ক্রিপটর ডি মিউজিকা মেডি এভি ১. ৩৩৯।

www.waytojannah.com

আছে) আরবী, যেমন ঃ *ফন্ডা*–হোটেল (আরবী *ফুন্দুক*), *টাহোনা*–বেকারী (আরবী *তাহ্না*, কারখানা), *টারিফা*–ট্যারিফ (আরবী *তা'রিফ* বিজ্ঞপ্তি, সংজ্ঞা)।

অবশ্য নিয়মানুযায়ী স্পেনীয় ভাষায় আরবী শব্দের সঙ্গে এর সাথে যুক্ত আরবী বিশিষ্ট বিশেষণও গ্রহণ করা হয় এবং তার পর তার পাশে স্পেনীয় বিশিষ্ট বিশেষণ যোগ করা হয়, যেমন, *লা আলহাজা*[১] মনি (আরবী *আল–হাজা*), *এল আররোষ* চাউল *(আল রুয)*,লা *এসেকিয়া* খাল বা পরিখা *(আল সাকিয়া)*, *এল আনাকালো*–রুটিওয়ালার মুটে বালক (*আল–নাককাল* বাহক)। বলাবাহুল্য, স্পেনীয় শব্দগুলি ক্ল্যাসিক্যাল লিখিত ভাষা থেকে উদ্ভুত না হয়ে দক্ষিণ স্পেনের কথ্য আরবী থেকে উদ্ভুত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে উচ্চারণের বেলায় কোন কোন সময় বিশিষ্ট বিশেষণ ল *(লাম)* পরবর্তী শব্দের প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে দ্বিত্ব হয়ে যুক্ত হয়, যেমন *আর–রুয, আস্–সাকিয়া, আন্–নাককাল*, কিন্তু *আল–হাজা, আল–কুব্বা* প্রভৃতি ক্ষেত্রে তা হয় না।[২] মিশনারী পেড্রো ডি আলকালা ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে গ্যানাডার আরবী কথ্য ভাষা সম্পর্কে দুখানি বই লেখেন। *এ দার*—ঘর, *এ জেম্স*—সূর্য, *এ সোলতান*—সুলতান প্রভৃতি শব্দের পরিচয় তার গ্রন্থে পাওয়া যায়। তবুও এরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছা ঠিক হবে না যে, প্রথমে আলযুক্ত প্রতিটি অদ্ভুত স্পেনীয় শব্দ মূলত আরবী : *আলমুয়ের্যো*—মধ্যাহ্নভোজ, *আলামেডা*—এভেন্যু, *আলাম্বার*—তার, *আলমেনড্রা*—বাদাম প্রভৃতি শব্দ নিঃসন্দেহে মূলত ল্যাটিন, অপরদিকে *আলবারিকোক*—খোবানি, আলবার্চিগো—একশ্রেণীর পীচ ফল, মূলত ল্যাটিন শব্দ, এগুলি গ্রীক ও আরবী ভাষা অতিক্রম করার পর শেষ পর্যন্ত স্পেনীয় ভাষায় স্থান লাভ করে।

এতদসত্ত্বেও একথা সত্য যে, যেসব স্পেনীয় শব্দ আরবী থেকে ধার করা হয়েছে তার মধ্যে প্রাত্যহিক জীবনের অত্যন্ত সাধারণ কতিপয় বস্তু সামগ্রীও রয়েছে ঃ

ঘরের প্রবেশপথ *যাগুয়ান*...........	আরবী উস্তুয়ান গ্রীক ওজুয়া
সমতলছাদ *আযোতিয়া*.......	*আল–সুতায়হা*, সাত–এর ক্ষুদ্রত্ববাচক ছাদ
সামিয়ানা *তলদো*.................	*যুল্লা* চাঁদোয়া
শয়নকক্ষ *আলকোবা*.............	*আল–কুব্বা* অর্ধগোলাকার ছাদ
তাকওয়ালা আলমারি *আলাসেনা*....	*আল–খিযানা* তাকওয়ালা আলমারি
তাক *আনাকোয়েল*................	*আল–নাককাল* বাহক
মঞ্চ, পাদানি *তারিমা*.............	*তারিমা*
মধ্যবর্তী প্রাচীর *তাবিক*............	*তাবাক* স্তর, পৃষ্ঠ

১. ষোড়শ শতকে এর সাধারণ রূপ ছিলো এল আলহাজা।

২. প্রকৃত পক্ষে আরবী বর্ণমালা *হরফে শামসী* (যেমন আশ–শাম্‌স) ও *হরফে কামরী* (যেমন, আল–কামার) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমোক্ত শ্রেণীর বর্ণ শব্দের প্রথমে থাকলে বিশিষ্ট বিশেষণের লাম পরবর্তী শব্দের প্রথম ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে দ্বিত্ব হয়ে যুক্ত হয় এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষেত্রে তা অবিকল থাকে।—অনুবাদক।

www.waytojannah.com

গালিচা বা মাদুর *আল ফোমরা*....	*আল–খুমরা* খেজুর পাতার মাদুর
বালিশ *আলমোহাদা*............	*আল–মুখাদ্দা* বালিশ
পিন *আলফিলার*................	*আল–খিলাল*
ঢিলা জামা *বাতা*...............	*বাত্তা* মোটা পোশাক, অস্তর
ওভারকোট *গাবান*.............	*কাবা'* বাইরের পোশাক
গৃহ নির্মাতা *আলবানিল*.........	*আল–বান্না*
মাচার খুঁটি *আন্দামিও*.........	*আদ–দা'আ'ইম* থাম, খুটি
গুদামঘর *আলমাসেন*...........	*আল–মাখযান*
রাস্তা তৈরীর পাথর *আদোকুইন*..	*আল–দুক্কান* দোকান, পাথরের বেঞ্চি
আলকাতরা *আলকিতারান*.......	*আল–কাত্রান*
ভাড়া *আলকিলার*..............	*আলকিরা'*
ক্ষতি *আভেরিয়া*.................	*'আওয়ার*
পৌঁছা, ধরে ফেলা *আলকানযার*.....	*আলকান্য্* লুকায়িত সম্পদ
রাস্তার গর্ত *বাড়েন*..............	*বাতিন* ধসে যাওয়া মাটি
কাস্টম হাউজ *আদুয়ানা*.........	*আলদিওয়ান*
টিকেট অফিস (স্টেশন বা প্রেক্ষাগৃহ) *তাকিল্লা*	*তাকা*
মেয়র *আলকালদে*................	*আল কাজী* বিচারক
নির্বাহক, অছি *আল বাসিয়া*.....	*আল ওয়াসি* অছি
বিজ্ঞপ্তি, ইনভয়েস *আলবারান*....	*আল–বারা'আ* অব্যাহতিপত্র
অমুক *ফুলানো*.................	*ফুলান*
যে পর্যন্ত না *হাস্তা*.................	*হাত্তা*

এগুলি প্রাত্যহিক ব্যবহৃত সাধারণ শব্দ এবং এর তালিকা আরো দীর্ঘ করা যায়। উপশহর, গ্রাম, খামার প্রভৃতি আরবী শব্দ দ্বারা পরিচিত। গ্রামের লোকেরা দেড় বুশেল পরিমাপের *ফানেগা*–র (আরবী *ফানিকা* বড় থলে) সাহায্যে তাদের শস্য ওজন করে। এটিকে তারা বারো *সেলিমিন*–এ বিভক্ত করে, প্রত্যেক সেলিমিন এক গ্যালনের সমান (আরবী *সামানী*, কথ্য *সেমেনী*, আট)। তাদের আরো একটি পরিমাপ রয়েছে যাকে *আররোবা* (আরবী আর–রুব'আ, স্ত্রী লিঙ্গ) বলা হয়, এটি হচ্ছে এক 'কোয়ার্টার' (এক হন্দরের এক চতুর্থাংশ) শুক্‌নো মাপ বা চার গ্যালন তরল মাপ। তাদের সেচ কার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবগুলি শব্দ আরবী। তেমনি ফুল, ফল, শাকসব্জী, লতা–গুল্ম এবং গাছগাছড়ার নামও আরবী। চিনির স্পেনীয় শব্দ *আযুকার* স্পেনীয়, পর্তুগীজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় আরবী আল–সুক্কার, ফার্সী সাক্কার শব্দ থেকেই এসেছে। ল্যাটিন *সাখ্খারুম* শব্দ

www.waytojannah.com

Contents

থেকে নয় (যদিও স্পেনে প্রায়ই একথা বলা হয়) প্রথমোক্ত দুটি শব্দও ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় একই সংস্কৃত শব্দ থেকে এসেছে।[১] দক্ষিণ স্পেনের পর্যটকরা বিজ্ঞাপনে প্রায়ই যে *জেরেব* শব্দটি দেখতে পান তা ইংরেজী 'সিরাপ' (শরবত এবং রাম 'শ্রাব-এর ক্ষেত্রেও তাই) এবং আরবী শব্দ *শারাব*, পানীয় থেকে উদ্ভূত। জেরেব শব্দটি পূর্বে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত শেরেবরূপে উচ্চারিত হতো এবং ক্যাটালান এবং পর্তুগীজ ভাষায় তাই উচ্চারিত হয়। একথা বিস্ময়কর মনে হবে যে, স্পেনীয় ভাষাভাষি লোকেরা এখনো আরবী *ইন-শা'আল্লাহ* কথাটি ব্যবহার করেন। স্পেনে সাধারণভাবে প্রচলিত *ওজালা* শব্দটির ব্যাখ্যা তাই। পূর্বে এই শব্দটি *ওশালা* রূপে উচ্চারিত হতো, যা স্পষ্টত *ইন-শা-আল্লাহর* অপভ্রংশ।

অন্যান্য যেসব শব্দ আরবী থেকে নেওয়া হয়েছে[২], তা স্পেনীয় সাহিত্যের ভাষায় টিকে থাকলেও সাংবাদিকতার প্রভাবে ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। স্পেনীয় সাংবাদিকতা এবং বিশেষ করে স্পেনীয় মার্কিন সাংবাদিকতা প্যারিসের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। তথাকথিত 'ল্যাটিন সংবাদপত্রের' *(প্রেন্‌সা ল্যাটিনা)* কোন ল্যাটিন দেশে সঙ্গে সঙ্গে বোধগম্য নয় এমন শব্দসমূহের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। এ ব্যাপারে আধুনিক লেখকদের মধ্যে সবচাইতে ব্যতিক্রম হচ্ছে জোসে মার্টিনেয রুইয। তিনি একজন নিবন্ধকার এবং সবসময় 'এযোরিন' ছদ্মনামে লিখতেন। স্পেনে তার মত 'ফ্রাঙ্কোফিল' (ফরাসী ভক্ত) আর কেউ ছিলো না, তবুও প্রাচীন স্পেনীয় লেখকদের প্রতি তার আকর্ষণ এবং তার প্রাথমিক জীবনের পরিবেশ—প্রফেসর রিবেরার মত তিনিও ছিলেন সেই ভ্যালেনসিয়ার অধিবাসী যা মূরীয় সেচ ব্যবস্থায় এবং তার বর্ণনামূলক আরবী শব্দ ও স্থানের নামে সমৃদ্ধ ছিলো—তাঁকে অসাধারণ নৈপুণ্য ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে সেই ভাষা ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করে। অপরদিকে 'অভ্যন্তরের' জন্য তার হৃদয়াবেগ, অত্যন্ত সাধারণ জিনিসের গভীর ও বিশদ বর্ণনা এবং এগুলির নামে তাঁর আনন্দ তাঁর প্রাথমিক রচনাবলীতে আধুনিক স্পেনে আরবদের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে এক বিরাট অবদানে পরিণত করেছে।

সত্যিকারের সংস্কৃতিবান স্পেনীয়রা এখনো মূল স্পেনীয় আরবী মিশ্রিত শব্দ সানন্দে ব্যবহার করেন এবং এই আকর্ষণ মূল স্পেনীয়-ল্যাটিন মিশ্রিত শব্দের চাইতে কম নয়। মুযারেবীয় আমল থেকেই তাদের এই মনোভাব লক্ষণীয়। ভবঘুরে চারণ কবিরা যেসব

---

১. মূল সংস্কৃত শব্দ শর্করা। -অনুবাদক।

২. আর ডোযি ও ডব্ল্যু এইচ এঞ্জেলম্যান, গ্লসেয়ার ডেস মট্‌শ এসপানোলস এটপর্টুগেইস ডোরবিস ডি লারাবে, দ্বিতীয় সং (লিডেন, ১৮৬৯) ; ডি এল ডি ইগুইলায, গ্লসারিও এস্টিমেল জিকো ডিলাস পালাব্রাস এসপানোলেস ডি অরিজেন ওরিয়েন্টাল (গ্রানাডা, ১৮৮৬) ; আর একাডেমিয়া এসপানোলা, ডিকসিওনারিও ডিলা লেংগুয়া এসপানোলা, ১৫ শ সং (মাদ্রিদ, ১৯২৫) ; কে লকোৎস, এটিমোলজিচেস ওরটার বুশ ডের ইউরোপাইশেন ওরটার ওরিয়েন্টালিশেন উরস্প্রাংগস (হাইডেলবার্গ, ১৯২৭)।

www.waytojannah.com

'আমার সিডের কবিতা' ও প্রাচীন স্পেনীয় গাথা, গোনযালো ডি বার্সিও ও হিটার আর্কবিশপের কবিতা এবং বিজ্ঞ আলফন্সো ও ডন জুয়ান ম্যানুয়েলের গদ্য আবৃত্তি করতেন সেগুলিই 'অকলূষিত ক্যাস্টিলিও ভাষার উৎস', মূল লো ল্যাটিন এবং আরবী থেকে ধার করা শব্দে সমৃদ্ধ হয়ে এই ভাষাই স্পেনীয়দের বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাষার রূপ লাভ করে। এতদসত্ত্বেও মনের যে অবস্থা, প্যারিস থেকে আগত নয় এমন কোন ভালো জিনিস কল্পনা করতে পারে না, সে অবস্থায় সেস্থলে আকর্ষণহীন ফরাসীরীতিই প্রবর্তন করেন। স্পেনে চল্লিশ বছরের নীচে কোন লোক কোন বিদেশীর কাছে চামড়া বাঁধাইর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে সম্ভবত আনন্দ পাবে না। কারণ এই জিনিসটির বার্বার নাম *টাফিলেট* এবং এখনো এ নামে পরিচিত, তেমনি করুণার জেলেনীরা *আলমুযারিফাযগো* নামে যে কর জোর করে আদায় করে (আমেরিকা থেকে কোন যাত্রী এলেই এই করের জন্য তারা তার মালপত্র পাকড়াও করে) তাও বিশ্লেষণ করতে তারা আনন্দবোধ করবে না। কারণ এটি এমন এক ধরনের শুল্ক যা আরবী নাম বহন করে (আরবী *আল–মুশরিফা* রোমান্স বিভক্তি–*আযগো*, ল্যাটিন আটিকাম)

শহুরে 'ল্যাটিন' সাংবাদিকতার যে সর্বনাশা প্রতিক্রিয়ার' কথা বলা হয়েছে তা পর্তুগীজ ভাষার ক্ষেত্রেও কম সত্য নয়। এই ভাষাতেও কিছু সংখ্যক প্রাচ্য শব্দ প্রবেশ করেছে কিন্তু সেটি পর্তুগালে মুসলিম শাসনের ফলে নয়, বরং ভারত ও পূর্ব আফ্রিকা এবং দূরপ্রাচ্যের পর্তুগীজ উপনিবেশ থেকে এসব শব্দ এসেছে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, সেখানে ঐ সময় থেকে কিছু কিছু আরবী শব্দ টিকে থাকলেও স্পেনে সেগুলি হয় বিলুপ্ত হয়েছে কিংবা কখনো স্বকীয়তা রক্ষা করতে পারেনি। পূর্ববর্তী তালিকার বহু স্পেনীয় শব্দ কোন না কোন আকারে পর্তুগীজ ভাষায়ও দেখা যায় (যেমন 'যতক্ষণ না' স্পেনীয় *হাসতা*, পর্তুগীজ *আতে* ; 'গুদামঘর' স্পেনীয় *আলমাসেন*, পর্তুগীজ *আরমাযেম*, ইত্যাদি, ইত্যাদি), সাধারণভাবে ব্যবহৃত নিম্নোক্ত পর্তুগীজ শব্দগুলি আধুনিক স্পেনীয় ভাষায় কখনো ব্যবহৃত হয় না ঃ

পর্তুগীজ	আরবী
গালিচা *আলকাটিফা*..........	*আল–কাতিফা* কম্বল, মখমল
দর্জি *আলফেইয়েট*.........	*আল–খাইয়াত*
শুল্ক ভবন *আলফাণ্ডেগা*........	*আল–ফুন্দুক* হোটেল, সরাইখানা
পকেট *আলজিবিরা*...........	*আল–জায়ব* (কথ্য আল–জাবিরা পর্তুগীজ থেকে আরবীতে ফিরে এসেছে)
ফুটপাত *আযিনহাগা*..........	*আল যানাকা*, কথ্য *আয্‌যানাকা*
অনুর্বর প্রান্তর *সাফারা*.....	*সাহ্‌রা*

www.waytojannah.com

ফসল কাটার মওসুম, ফসল *সাফ্‌রা*.........*ইসফাররা* পক্ক হওয়া
এবং *সীফা, আসিফা*........... *সায়ফ* গ্রীষ্মকাল
লেটুস্ *আলফাসা*............. *আল–খাস*
পাউণ্ড ওজন *আর রাটেল*...... *আর–রাত্‌ল*

মনে হয় 'বারোক' শব্দটি মূলত আরবী (*বারগা*—অসমানভূমি) এবং *বাররোকো*–এর মাধ্যমে ইউরোপে পৌঁছেছে, এটি পর্তুগীজ মুক্তা আহরণকারী ও মুক্তা ব্যবসায়িগণ কর্তৃক ব্যবহৃত একটি বিশেষ শব্দ।

স্পেন ও পর্তুগালের স্থানের আরবী নাম

স্থানের নামগুলো সাংবাদিকতার দ্বারা প্রভাবিত হয়নি, এবং স্পেন ও পর্তুগালের মানচিত্র একজন আরবী শিক্ষার্থীর কাছে বিশেষ আগ্রহের বিষয়।[১] প্রাচীনতর আইবেরীয় ও ফনিসীয় নাম থেকে কোন কোন নামের আরবীকরণ করা হয়েছে, এবং বহু নাম মূলত বৈশিষ্ট্যগতভাবে আরবী ও রোমান্সের সংমিশ্রণে গঠিত। কিন্তু এগুলিকে একসঙ্গে বিবেচনা করা হলে, মুসলমানরাই এই উপদ্বীপে যে চিহ্ন রেখে গেছেন তার রূপই বিশেষভাবে চোখে পড়বে। পাহাড়, পর্বত, অন্তরীপ, দ্বীপপুঞ্জ, বালিয়াড়ি, নদী, হ্রদ ও উষ্ণ প্রস্রবণ, সমতল ভূমি, মাঠ, বন, উদ্যান, গাছপালা ও ফুল, গুহা ও খনি, বিভিন্ন ধরনের রং; এবং মানুষের সৃষ্ট খামার, গ্রাম, শহর, বাজার, মসজিদ, পাকা রাস্তা, সেতু, প্রাসাদ, দুর্গ, কারখানা, টাওয়ার প্রভৃতি ভৌগোলিক নামে পরিণত হয়েছে, তাই *জাবাল* (পর্বত) শব্দটি নিম্নোক্ত পর্বতগুলির নামের মধ্যে দেখা যায়ঃ মন্টি জাবালকুয, জাবালকন, জাবালয়াস, জাবালকিন্টো, জাবালিওন এবং পিকো এণ্ড সিয়েরা ডি জাবালাম্বর। এ ধরনের আরো নাম হচ্ছে সিয়েরা ডি জিব্রালবিন, জিব্রালিওন, জিব্রালফারো (ফেরসের পর্বত) এবং জিব্রাল্টার (*জাবালুত তারিক*–তারিক পর্বত)। শেষোক্ত পর্বতটি যে বার্বার নেতা স্পেনে প্রথম সফল অভিযান পরিচালনা করেন তারই নামানুসারে রাখা হয়েছে।[২] *আল–কুদিয়া* (পাহাড়) শব্দটি আলকুড়িয়া নামে পরিচিত নয়–দশটি স্থানের নামে দেখা যায়। মেনোর্কাতে অবস্থিত কুডিয়া ক্রেমাডা (দগ্ধ পাহাড়)–তেও এই শব্দটি দেখা যায়। আলকোর ও আরকোরাতে *আল–কুর* (*কারা* শব্দের বহুবচন, টিলা) শব্দটির পরিচয় পাওয়া যায়। *আল–মুদাওওয়ার* (গোলাকার দ্বারা আবর্ত থেকে উদ্ভূত) অবলম্বনে পাহাড়িয়া শহর আলমোডোভার ডেলরিও, আলমোডোভার ডেলক্যাম্পো প্রভৃতির নামকরণ করা হয়েছে। *আল–মারিয়্যা* (পর্যবেক্ষণ টাওয়ার) থেকে আলমেরিয়া বন্দরের নাম এসেছে। সেররো ডি

---

১. এস আর ডেলগাডো, গ্লসারিওলুসো–আসিয়াটিকো, ২ খণ্ড (কয়ম্ব্রা ১৯১৯, ১৯২১)।
২. মূল আরবী নাম জাবালুত তারেক; সেনাপতি তারেকের নেতৃত্বে ইউরোপ ভূখণ্ডে মুসলমানরা এখানেই প্রথম অবতরণ করেন। —অনুবাদক

www.waytojannah.com

আলমেনারা, সিয়েরা ডি আলমেনারা এবং পোয়েৰ্টো ডি লা আলমেনারা পোতাশ্রয়ের নাম *আল–মানারা* (আলোকস্তম্ভ) থেকে এসেছে। অবশ্য স্পেনীয় শব্দ *আলমেনা* (ফোকরবিশিষ্ট প্রাচীর) আরবী *আল–মান'আ* নয়, বরং এটি ল্যাটিন *মিনে* থেকে এসেছে এবং এর সঙ্গে আরবী বিশিষ্ট বিশেষণ *আল* যুক্ত হয়েছে। অ্যারাগনে *আলমেনার* (আল–মানহার) শব্দটি সেচকার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। *তারাফ* (অন্তরীপ) থেকে ট্রাফালগার, *তারাফ আল–ঘার*, গুহার অন্তরীপ হয়েছে। আলজেসিরাস ও আলসিরাতে আল–জাযিরা–এর (দ্বীপ) পরিচয় পাওয়া যায়। *কাল্লা* নোঙ্গরস্থল (*কালা'আ* আশ্রয়দান থেকে) পৃথকভাবে কালা (সৈকত)–তে এবং যুক্তভাবে কালাবার্কা, কালাব্লাঙ্কবা, কালা ডি সান ডিসেন্ট, কালা সান্টানি, পুন্টা ডি লা কালা, টোরে ডি লা কালা হোণ্ডা, লা কানেটা প্রভৃতিতে দেখা যায়। এব্রো নদীর মোহনার বালিয়ারিগুলি লস্ আলফাক্স নামে পরিচিত। এটি সম্ভবত *আল–ফাক*, বোয়াল থেকে এসেছে।

বালুকাময় নদীগর্ভ *রামলা* বার্সেলোনার প্রধান রাজপথ লা–রাম্বলার নামকরণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু নদীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে শব্দটি স্পেনে সবচাইতে পরিচিত সেটি হচ্ছে *ওয়াদি*। স্পেনীয় ভাষায় এর উচ্চারণ হচ্ছে *গুয়াড*। এরই ভিত্তিতে আমরা দেখতে পাই গুয়াডানকিভির, *ওয়াদি–আল* কাবির, বড়নদী; গুয়াডালাজারা, *ওয়াদি আল–হিজারা*, পাথুরে নদী; গুয়াডালাভিয়ার, ওয়াদি–আল আবিয়াদ, শ্বেতনদী; গুয়াডাল কাযার, *ওয়াদি আল–কাসর*, দুর্গের নদী; গুয়াডালকটন, *ওয়াদি–আল–কুত্ন*, তুলার নদী; গুয়াডাল মেডিনা, *ওয়াদি–আল–মাদিনা*, শহুরে নদী; গুয়াডারয়ামা, *ওয়াদি–আল–রামলা*, বালুকাময় নদী; এবং গুয়াররোমান, *ওয়াদি–আল–রুম্মান*, ডালিম নদী; অন্যগুলি আরবীর ছদ্মবেশে প্রাচীন স্থানের নাম সংরক্ষণ করেছে ঃ যেমন—গুয়াডিয়ানা, *ওয়াদি আনাস*, গুয়াডিক্স, *ওয়াদি আক্সী*, গুয়াডালুপ, *ওয়াদি আললুব*, নেকড়ে নদী (*ল্যাটিন লুপুস*), পর্তুগালে আরবী শব্দটি গুডি কিংবা ওডে–রূপ লাভ করেছে, যেমন—ওডিয়ানা (গুয়াডিয়ানা), ওড়িভেল্লাস, রিভেইরা ডি ওডেলোকা এবং ওডেলেইট।

স্পেন ও পর্তুগালে হ্রদ এবং উপহ্রদগুলি প্রায়ই তাদের আরবী নাম *আল–বুহাইরা* (*বাহর*, সমুদ্র–এর ক্ষুদ্রত্ববাচক) সংরক্ষণ করেছে। তাই আমরা পাচ্ছি আল বুয়েরা, আল বুফেরা, আল বুফেইরা, আল বুহেরা এবং বানাল বুফার। জলাধার, পুকুর বা জলাশয় অর্থে *আল–বিরকা* শব্দের পরিচয় পাওয়া যায় আলবেরকা এবং আলভেরকায়; কূপ বা চৌবাচ্চা অর্থে *আল–জুব্ব*–এর পরিচয় আলজিব–এ; পানির নল অর্থে *আস–সাকিয়া*–এর পরিচয় আসেকিয়ায়। স্পেনে এগুলি সবই সাধারণ ভৌগোলিক শব্দ। লাগুনা ডি লা জাণ্ডা, জান্ডুলা, জাণ্ডুলিল্লা ফার্সী *খন্দক*–এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ৭১১ খৃষ্টাব্দে তারিকের চূড়ান্ত বিজয়ের প্রথমোক্ত স্থানেই ভিসিগথিক সেনাবাহিনীর প্রধান অংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। একটি পরিচিত স্থানের নাম হচ্ছে উষ্ণ প্রস্রবণ, *আল–হাম্মা*, আলহামা।

www.waytojannah.com

বন–বনানীর আরবী নাম বহন করছে আলগাবা, আল–গাব এবং *আলগায়ডা*, আল্–গায়দা। তৃণক্ষেত্র আরবী শব্দ *আল–মারুজ–*কে সংরক্ষণ করেছে যেমন–আলমারজেম (লিসবন), আলমারজেন (মালাগা), আলমারচা (লা মান্‌চা)। যেসব উদ্যান তাদের নামে মূল আরবীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় সেগুলো হচ্ছে জেনারেলাইফ, *জান্নাত–আল–আরিফ,* স্থপতি বা পরিদর্শকের উদ্যান এবং আলমুনিয়া ডি ডোনা গোডিনা, আল–মুনিয়া, বাজার উদ্যান। যবের ক্ষেতের *আল–কাসিল,* নাম বহন করছে পর্তুগালে 'আলকাসের ডু সাল'। পর্তুগাল ও জাফ্‌রার পোয়েটা ডেল আসেবুচে নিম্নোক্ত নামগুলি আরবী শব্দের স্মৃতি বহন করছে ঃ সূর্যমুখী ফুল, *আল–'উসফুর,* ডেন্টা ডি লস আলাযোরস ; ঝাউগাছ, *আল–তারফা,* টারফে; বুনো জলপাই, *আয–যানবুজ,* আযাম্‌বুজা এবং যাম্বুজিরা। রং–এর মধ্যে একটি জনপ্রিয় ভৌগোলিক নাম হচ্ছে আলবাইডা, *আল–বাইদা,* সাদা (স্ত্রীলিঙ্গ)। অপরপক্ষে আলহাম্বরা, *আল–হামরা* লাল (প্রাসাদ) ছিলো *আল–আহমার,* লাল (রাজা)–এর বাসস্থান।

নিম্নোক্তভাবে আরবী থেকে কতগুলি পরিচিত ভৌগোলিক নামের উদ্ভব হয়েছে। খনি, *আল–মা'দিন,* আলমাডেন; খামার, *আল–কারিয়া,* আলকারিয়া ডো কিউম ও আলকারিয়া রুইভা (পর্তুগাল), এবং আলকেরিয়া (স্পন); গ্রাম, *আল দাই'আ,* সমগ্র উপদ্বীপে সাধারণ নাম *আলদিয়া*। মেডিনা, মেডিনা ডেল ক্যাম্পো, মেডিনা ডি পোমার, মেডিনা ডি রায়োসেকো, মেডিনাসেলি, মেডিনা সিডোনিয়া, ল্যাগুনা ডি মেডিনা প্রভৃতি নামের অর্ধেকে সুস্পষ্টভাবে আরবী *মাদীনা* (শহর) শব্দ বহন করছে। কয়েকটি নামে মসজিদ, *মাসজিদ,* মেযকিটারও স্বাক্ষর পাওয়া যায়। বাজার *আস–সুক* সরকারীভাবে এল–মার্কেডো হিসাবে পরিচিত হলেও গ্রামাঞ্চলের লোকেরা এখনো এটিকে *এল আযোগ* (পর্তুগীজ *আযৌগ*) বলে থাকে। একটি বিখ্যাত প্রবাদ[১] এবং নিম্নোক্ত নামবাচক নামে এটি এখনো টিকে আছে ঃ অযোগ্যো (সেগোভিয়া), আযোকেকা ডি হেনারেস এবং টলেডোর যোকোডোভার। সুক–*আদ–দাওয়াব,* গরুর বাজার, মধ্যযুগে *যোকো ডি লাস বেস্টিয়াস* (পশুদের *সুক*) নামে পরিচিত ছিলো।

দুর্গের আরবী শব্দগুলি স্পেনে বহু ভৌগোলিক নাম সৃষ্টি করেছে। *আল–কাল'আ* থেকে আলকালা (ডি হেনারেস, ডি গুয়াডায়রা, ডি চিমবার্ট প্রভৃতি) এসেছে। আবার বিশিষ্ট বিশেষণ ছাড়া এই শব্দটি থেকে এসেছে কালাটায়ুড, *কাল'আত আইয়ুব,* জোব (আইয়ুব)–এর দুর্গ, কালাটানাযোর, কালট্রাডা, কালাটোরাও। ক্ষুদ্রত্ববাচক *আল–*

---

১. এন এল আযোগ

কুইয়েন মাল ডাইস মালওঙ্গ

(বাজারে যিনি খারাপ কথা বলেন, তিনি খারাপ কথা শোনেন।)

অবশ্য *আযোগ*–এর সাধারণ অর্থ হচ্ছে পারদ (আরবী *আল–যাওউক,* এবং আয্–যাওকা

www.waytojannah.com

Contents

কুলাই'আ থেকে এসেছে আলকোলিয়া। একইভাবে *আল-কাস্‌র* (ল্যাটিন ক্যাস্ট্রাম?) থেকে আলকাযার নামে যাবতীয় স্পেনীয় স্থানের নামের সৃষ্টি হয়েছে। এর ক্ষুদ্রত্ববাচক *আল-কুসাইর* থেকে এসেছে আলকোসার। আল-কাসাবা নামক একটি দুর্গ থেকে স্পেনীয় আলকাযাবা এবং পর্তুগীজ আলকাসোভাস শব্দের উদ্ভব হয়েছে। একইভাবে *আল-কানতারা*, সেতু, অনুসারে স্পেনে কতিপয় স্থানের নাম হয়েছে যা বর্তমানে আল-কানটারা নামে পরিচিত। এখানে মুসলিম বিজয়ীরা একটি রোমান সেতু দেখতে পেয়েছিলো। ওয়াচ-টাওয়ার, *আল-তালি'আ* স্পেনীয় ভাষায় আটালায়া হয়েছে। এই নামটি আটালায়াস ডি আলকালাসহ কতিপয় স্থানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আবার বিশিষ্ট বিশেষণ বর্জিত হয়ে এর দ্বারা টালায়েরো, টালায়ুয়েলা, টালায়ুয়েলাস নামগুলির উদ্ভব হয়েছে। সম্ভবত মূল রোমান কিন্তু মুসলিম বিজয়ীগণ কর্তৃক *আল-রাসিফ* নামে অভিহিত একটি পাকা রাস্তা বা পাথুরে বাঁধাই উঁচু রাস্তা থেকে আর্ রেসিফ, আররিযাফা এবং রুযাফা নামগুলি এসেছে। শহরতলি *আল-রাবাদ* সাধারণ স্পেনীয় নাম আররাবাল-এর উদ্ভব ঘটিয়েছে। অপরদিকে *আল-রাবিতা* ছিলো 'ফকিরের আশ্রম' সেখানে একজন মারাবুট, *মুরাবিত*, ফকিরই আশা করা হতো যদিও ফকির সম্ভবত সশস্ত্র থাকতেন এবং আশ্রমটিতে থাকতো একদল সদাসতর্ক সৈন্য। এই নামটি দেখা যায় আররাবিডা, রাবিডা, রাপিটা, রাবেডা প্রভৃতিতে। কোন শহরের শহরতলি *আল-বাররা* এবং *আল-বালাদ* নামেও পরিচিত ছিলো এবং এর কোন একটি থেকেই *আল-বালাট*, আলবালেট, আলবোলোট নামগুলির উদ্ভব হয়েছে। যেসব টাওয়ার প্রাচীরের বাইরে থাকতো সেগুলিকে কখনো কখনো আল-বাররানাস, *আল-বার্‌রানী* বলা হতো। কিন্তু আলবাররাসিন নামটি এই স্মৃতিই বহন করে যে, এটি বারবার উপজাতি বানু রাযিনদের এলাকা ছিলো। প্রথমে *বেনা, বেনি, বিনি* যুক্ত নামগুলি বিশেষ করে ভ্যালেনসিয়া ও বালিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জে অত্যন্ত সাধারণ ঃ বেনাডালিড, বেনালগালবন, বেনাগুয়াসিল, বেনাজারেফ, বেনামেজি, বেনাওজান, বেনাররাবা, বেনাওডাল্লা; বেনিয়া জান, বেনিকারলো, বেনিকাসিম, বেনিফায়ো, বেনিগানেম, বেনি মামেট; বিনাসেড, বিনিসালেম, বিনিয়া ডিস; বিনিকালাফ, বিনিমাইমুট, বিনিসাফুয়া, বিনিস্কয়ার্ন এবং আরো বহু।

জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র টলেডো

স্পেনীয় ভাষা তার বিকাশের অত্যন্ত কৈশোরে আরবী দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছিল, যে সমস্ত স্থানের নাম ও সাধারণ শব্দ এখনো টিকে আছে তার থেকে সেটি বোঝা যায়। দশম শতকের মধ্যে স্পেনের সর্বত্র জীবনের সামগ্রিক ভিত্তি ইসলামের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয় ঃ টলেডো অধিকারের পর এই প্রভাব ইউরোপের অবশিষ্টাংশে সম্প্রসারিত

www.waytojannah.com

হয়। একাদশ শতকের সূচনায় বার্বারদের দ্বারা কর্ডোভা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর টলেডো ধীরে ধীরে স্পেনে মুসলিম জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ১০৮৫ খৃস্টাব্দে খৃস্টান বিজয়ের পরে এটি তার ঐ মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখে। নামেমাত্র খৃস্টান হলেও ষষ্ঠ আলফন্সোর দরবার, প্রায় দুইশ বছর পরে পালের্মোর দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের দরবারের ন্যায়, মুসলিম সভ্যতায় অনেকখানি প্রভাবিত হয়। আলফন্সো নিজেকে 'দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সম্রাট' ঘোষণা করেন। টলেডোর জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রগুলি ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডসহ ইউরোপের সকল অংশের জ্ঞানীদের আকৃষ্ট করে। এদের মধ্যে ছিলেন 'ইংলিশম্যান' রবার্ট, *কুরআনের* প্রথম অনুবাদক রবার্টাস অ্যাংলিকাস, মাইকেল স্কট, ড্যানিয়েল মর্লি এবং বার্থের অ্যাডেলার্ড। তাদের দুঃসাহসিক কার্যকলাপ ও সাধনা এবং এরিস্টটল, ইউক্লিড ও অন্যদের যেসব রচনা কেবল আরবীতে পড়তে হতো সেগুলোর ল্যাটিন অনুবাদ পাওয়ার জন্য তাদের নতুন নতুন প্রচেষ্টা ও কলাকৌশলের বিস্তারিত বর্ণনা এই গ্রন্থ সিরিজের অন্য একটি খণ্ডে[১] পাওয়া যাবে। তাই এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা হলো না।

ইউরোপীয় চিন্তাধারায় স্পেনে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠতম অবদান (অন্য একটি অধ্যায়েও উল্লেখ করা হয়েছে) হচ্ছে দার্শনিকদের রচনা। তাঁরা মুসলিম ধর্মতত্ত্বের অত্যন্ত সংকীর্ণ ও নিষ্ঠামূলক পন্থা অনুসরণ করলেও দার্শনিক ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে অবাধ বিচরণের লাগাম রেখে যান। আলমুরাবাইড ও আলমোহাডেস বংশের বার্বার নৃপতিগণ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হওয়া সত্ত্বেও দার্শনিকদের ধ্যান-ধারণাকে কেবল সহ্যই করেননি, উৎসাহিতও করেছেন। এসব দার্শনিকের শিক্ষা যাতে বাইরে সাধারণভাবে ছড়িয়ে না পড়ে, এটুকু ব্যতিক্রম ছাড়া তারা দার্শনিকদের অবাধে ও স্বাধীনভাবে জ্ঞানচর্চা করতে দেন।

কর্ডোভার খিলাফতের আমলে নয়, বরং এর পরবর্তী রাজনৈতিক বিভ্রান্তি ও বিশৃংখলার সময়েই মুসলিম স্পেনে বড় বড় চিন্তাবিদের আবির্ভাব ঘটে। তারা গ্রীক দর্শন এবং সর্বোপরি এরিস্টটলের রচনা পুনরাবিষ্কার করেন। ইতিহাসবিদ ও নাট্যকাররা স্পষ্টত তাদের কাছে অজ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে পুনরুজ্জীবন সরাসরি 'রেনেসাঁর' সূত্রপাত করে এবং যা 'রিফরমেশনের' অন্যতম কারণ ছিলো তার কয়েক শতক আগে তারাই এরিস্টটলকে পাশ্চাত্যের কাছে পরিচিত করে। মনে হয় তারা প্রাথমিকভাবে গ্রীক রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। কিংবা গ্রীক রচনা থেকে সরাসরি অনুবাদ করেননি; বরং মধ্যবর্তী প্রাচীন সিরীয় ভাষার সংস্করণ থেকেই যথা নিয়মে অনুবাদকার্য সম্পন্ন করেন। তাই একজন ইংরেজ বা স্কটিশ ছাত্র তার সীমাবদ্ধ ল্যাটিন সংস্করণের চাইতেও অধিক পরিমাণে এরিস্টটলের রচনার সঙ্গে পরিচিত হতে চাইলে তিনি টলেডো গমন করতেন এবং সেখানে আরবী ভাষায় গ্রীক লেখকদের রচনা পড়তেন। পাশ্চাত্যে গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারের সূচনা হয় বাগদাদে। এখান থেকে ইহুদী বা

১. দি লেগ্যাসি অব ইসরাইল, পৃ. ২০৪,.

www.waytojannah.com

Contents

মুসলিম প্রতিনিধিগণ তা মুসলিম স্পেনে নিয়ে আসেন এবং আবার এখান থেকেই ইহুদী প্রতিনিধিরা খৃস্টান ইউরোপের ভ্রাম্যমাণ পণ্ডিতদের কাছে তা পৌছান।'

প্রাথমিক স্পেনীয় সাহিত্যে আরবীর প্রভাব

স্পেনে মুসলিম সভ্যতার প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও শৈল্পিক দিক ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে। ইউরোপীয় সাহিত্যে এর প্রভাব অন্য একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু স্পেনের সাহিত্যে মুসলিম চিন্তাধারার প্রভাব সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা দরকার।

বীরত্বমূলক কাব্যের যুগে (আনু. ১০৫০–১২৫০) আরবীর চাইতে ফরাসী ও টিউটনিক প্রভাবই ছিল প্রধান। ক্যাস্টিলের জাতীয় মহাকাব্য 'দি পোয়েম অব মাইসিড' *শান–সোন ডে যেস্ট*[১] রীতিতে রচিত, যদিও এর নায়ক তার বীরত্ব কাহিনীর গায়ক প্রথম চারণ কবির প্রায় সমসাময়িক ছিলেন এবং তিনি কোন অর্ধপৌরাণিক নায়কের ন্যায় (যেমন রোল্যাণ্ড) শত শত বছর আগে ধ্বংস হননি। রচনাকাল ১১৪০ খৃস্টাব্দ এবং 'সিড' নামে অভিহিত রুই ডায়ায ডি বিভারের মৃত্যু ১০৯৯ খৃস্টাব্দে। অবশ্য তাঁর উপাধি আরবী ঃ *সাইয়িদ* (কথ্য *সাইদ*) প্রভু। সিডকে তার অনুসারীরা যে ভাষায় সম্বোধন করতেন তার চাইতে ভালোভাবে ঐ সময়কার ভাষার সংমিশ্রণের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় না ঃ *ইয়া মিয়ো সিড'*। এ কথাটিই একজন আরবী ভাষাভাষী প্রজা এভাবে বলতেন ঃ *ইয়া সাইদি*।

দ্বিতীয় যুগে (আনু. ১২৫০–১৪০০) স্পেনীয় সাহিত্যে প্রধান বেদেশী প্রভাব ছিলো আরবীর প্রভাব। টলেডো অধিকারের (১০৮৫) মাধ্যমে স্পেন এবং সমগ্র ইউরোপের জন্য প্রাচ্যের জ্ঞান–বিজ্ঞান ও কাহিনীর দ্বার উন্মুক্ত হয়। এটি প্রাচ্য ভাষাগুলি অনুবাদের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ১১২০ খৃস্টাব্দে পেট্রোস আলফন্সী নামে জনৈক স্পেনীয় ইহুদী স্পেনে ভারতীয় উপকথা প্রবর্তন করেন। তার এই বিখ্যাত গল্প সংগ্রহ *ডিসিপ্লিনা ক্লিরিকালিস* নামে পরিচিত ছিলো। তিনি খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন এবং সপ্তম আলফন্সো তার ধর্মপিতা ছিলেন। 'ভারতীয় কাহিনী *কালিলা ই ডিমনা–র* স্পেনীয় অনুবাদ হয় ১২৫১ খৃস্টাব্দে সরাসরি আরবী থেকে।[২] এটি স্পেনীয় ভাষায় গল্প বলার সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা। সপ্ত বিজ্ঞের কাহিনী (সিন্ডিবাড অথবা সেণ্ডেবার) ইনফ্যান্টে ডন ফ্যাড্রিকের জন্য সরাসরি আরবী থেকে অনূদিত হয় ১২৫৩ খৃস্টাব্দের দিকে এবং এর নাম দেওয়া হয় *লিব্রো ডি লস এংগানোস ই অ্যাসেয়ামিয়েনটস ডি লাস মুজেরেস* (মেয়েদের ছলনা ও প্রতারণার গ্রন্থ)।[৩] ত্রয়োদশ

---

১. বীরত্ব গাথা, পদ্যে রচিত একটি প্রাচীন ফরাসী মাহাকাব্য কাহিনী। –অনুবাদক।
২. সম্পাদনা জে আলেমনি (মাদ্রিদ, ১৯১৫) এবং এর্জি সোলালিন্ডে (মাদ্রিদ ১৯১৭)।
৩. সম্পাদনা ডি কমপারেটি রিসার্চেস রিসপেকটিং দি বুক অব সিন্ডিবাড (লন্ডন, ১৮৮২), এবং এ বনিল্লা ই সান মার্টিন (মাদ্রিদ, ১৯০৪)।

www.waytojannah.com

শতকের শেষার্ধ থেকে স্পেনে বহু প্রবাদ ও উপদেশমূলক কাহিনী সংগৃহীত হয়। এগুলির মধ্যে রয়েছে ক্লিমেন্টে সানচেয ডি ভার্সিয়াল কর্তৃক সংগৃহীত 'বার্লাম ও জোসাফট্' এর বৌদ্ধ কাহিনী *লিব্রো ডি এনজেমপলস পর এবিসি* যা বর্তমানে বিলুপ্ত; এবং অদ্ভুত শিরোনামযুক্ত।

লিব্রো ডি লস গ্যাটোস, 'বুক অব ক্যাটস' (বিড়ালের বই)। এই নামটি বোধ হয় ভুল এবং প্রকৃত নাম হবে *লিব্রো ডি লস কিটোস* (কোয়েনটোস), 'বুক অব স্টোরিজ' (গল্পের বই)। এটি ইংরেজ সন্ন্যাসী ওডো অব চেরিটনের *ন্যারেশন্স*–এর মাধ্যমে একটি আরবী সূত্র থেকে নেওয়া হয়েছে।[২] এ সমস্ত সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলি সপ্তদশ শতকের নাট্যকারদের যুগ পর্যন্ত স্পেনীয় সাহিত্যে বারবার আবির্ভূত হয়েছে। স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক লা ভিডা এস সুয়েনো (লাইফ ইজ এ ড্রীম, জীবন একটি স্বপ্ন) ক্রিস্টোফার স্লাই–এর কাহিনী যা 'থাউজেন্ড এন্ড ওয়ান নাইট্স–এ 'দি টেকিং অব দি শ্রু' এবং 'দি স্লিপার ওয়েকেন্ড'–এ রয়েছে এবং এটি শেষ পর্যন্ত 'বার্লাম ' থেকে নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞ আলফন্সো

খৃষ্টান স্পেনে মুসলিম জ্ঞান–বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ ছিলেন দশম আলফন্সো, *এল সাবিয়ো*। ১২৫২ থেকে ১২৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ক্যাস্টিল ও লিওনের রাজা ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বস্তুত তার সরাসরি তত্ত্বাবধানে বহু বড় বড় গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু হয়। এর অনেকগুলি আরবী সূত্র থেকে সংকলিত হয়, যা তিনি ইহুদি সহকারীদের[৩] মাধ্যমে সংগ্রহ করেন। তাঁর গদ্য রচনার মধ্যে তার সহজ–সরল ও অর্ধ প্রাচ্য গদ্য রচনা মধ্যযুগীয় স্পেনীয় ভাষার অন্যতম উপভোগ্য বিষয় ছিলো। একটি আইনের সার–গ্রন্থ, *লাস সিয়েট পার্টিডাস*, ছিলো। এটি ঐ সময়কার স্পেনীয় জীবনধারা ও রীতিনীতির অদ্ভুত তথ্য সমৃদ্ধ একটি খনি। ক্রনিকা জেনারেল নামক গ্রন্থের ৪৬৬ থেকে ৪৯৪ পর্যন্ত অধ্যায়ে হযরত মুহাম্মদ (সা)–এর একটি চমৎকার জীবন প্রতিফলিত করা হয়।[৪] অপর একটি বিরাট গ্রন্থ হচ্ছে, *গ্রাণ্ডিই জেনারেল এস্টোরিয়া* 'একটি বিরাট ও সাধারণ ইতিহাস'। এটি প্রথমবারের

---

১. সম্পাদনা এ মোরেল ফ্যাশিয়ো, রোমানিয়া (১৮৮৮)।

২. সম্পাদনা এস ই নর্দান, *মডার্ন ফিললজি* (১৯০৮)

৩. দি লেগ্যাসি অব ইসরাইল, পৃ. ২২২–৫।

৪. আর মেনেণ্ডেয পিডাল, প্রাইমেরা ক্রনিকা জেনারেল পৃ ২৬১–৭৫ (মাদ্রিদ, ১৯০৬), এবং এজি সোলালিন্ডে, *আলফন্সো টেনথ এল সাবিয়ো এন্টোলজিয়া* ১, পৃ. ১৫২–৭২ (মাদ্রিদ, ১৯২১)।

www.waytojannah.com

জন্য মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।[১] বিজ্ঞ আলফন্সোর জ্যোতিঃশাস্ত্র বিষয়ক পর্যালোচনার মধ্যে রয়েছে 'আলফন্সাইন টেবল্স'। এটি টলেডোতে গৃহীত পর্যবেক্ষণের একটি সংগ্রহ। ইউরোপের সর্বত্র কয়েক শতক পর্যন্ত এটিকে ব্যবহার করা হয়। তিনি মূল্যবান পাথরের গুণাগুণ সংক্রান্ত পুস্তিকা *ল্যাপিডারিও* এবং একটি 'খেলাধুলার গ্রন্থ' *লিব্রো ডি লস জুয়েগসও* সংকলিত করেন। শোষোক্ত গ্রন্থে পাশাখেলা, অক্ষক্রীড়া (ব্যাকুলমন) এবং নানাপ্রকার আকারের বোর্ডের উপর বিভিন্ন ধরনের দাবা খেলার বর্ণনা রয়েছে।

দাবা খেলা ইসলামের উত্তরাধিকারিত্বের এমন একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান যা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। আধুনিক ইউরোপীয় দাবা খেলা একটি প্রাচীন ভারতীয় খেলার সরাসরি বংশধর। পারসিকরা এটিকে লালিত পালিত করে মুসলিম বিশ্বের হাতে দেয় এবং শেষ পর্যন্ত খৃষ্টান ইউরোপ মুসলমানদের কাছ থেকে তা ধার করে।[২] অধিকাংশ ইউরোপীয় ভাষায় রাজার নামানুসারে খেলাটির নামকরণ করা হয়েছে (ফার্সী *শাহ;* মধ্যযুগীয় ল্যাটিন *সাসি,* চেসমেন)। কিন্তু এর স্পেনীয় শব্দ *আযেডরেয্* (পূর্ববর্তী উচ্চারণ *আক্সেডরেয* বা *আসেডরেক্স)* এবং পর্তুগীজ শব্দ *য্যাডরেয্* খেলাটির আরবী নাম *আল–শাতরান্জ* থেকে উদ্ভূত। আরবী শব্দটিও ফার্সি এবং শেষ পর্যন্ত সংস্কৃত থেকে ধার করা। দাবা খেলা এখনো প্রচলিত কতিপয় শব্দ ফার্সী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'চেক্মেট' *শাহমাত* থেকে এসেছে। এতদ্বারা রাজা মৃত' না বুঝিয়ে বরং তিনি অপমানিত বা পরাজিত বোঝায়।[৩] 'ক্যাস্ল' বা 'রুক' হচ্ছে স্পেনীয় রোক এবং ফার্সী রুখ– নাবিক সিন্দাবাদ যে ভয়াবহ 'রক' পাখির মুকাবিলা করেছিলো, তাই। অবশ্য অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে, স্পেনে চ্যারিটি (রথ) অর্থে মুসলমানরা এ শব্দটি ব্যবহার করতেন। চ্যারিয়টের ধারণা থেকে আধুনিক দাবা খেলায় 'রুক'–এর সরাসরি চাল ও অসামান্য ক্ষমতার ইঙ্গিত বহন করে। চেসমেনের একটি প্রাথমিক ব্যবস্থায় যে ব্যবস্থা শার্লেমেনের আমলে প্রচলিত ছিলো বলে মনে করা হয় 'রুক্' প্রকৃতপক্ষে একটি চ্যারিয়ট, যার অভ্যন্তরে একজন মানুষ থাকে। ভ্যালেনসিয়ায় এই বিজয়দীপ্ত শকটটি কোন কোন ধর্মীয় উৎসবে ব্যবহৃত হতো এবং এখনো এটি *রোকা* নামে পরিচিত। এদিকে বিশপ *স্পেনে এল আলফিল* (আরবী *আলফিল,* হাতি) নামে পরিচিত। ফরাসী ফউ (দাবা খেলার ক্ষেত্রে) একই শব্দের অপভ্রংশ। এবং এর সঙ্গে গির্জার একজন সম্মানিত ব্যক্তির চাল ও ক্ষমতার কোন সম্পর্ক নেই।

---

১. মাদ্রিদ, সেন্ট্রো ডি এসটু ডিস্তস হিস্টোরিকোস, ১ম খণ্ড, ১৯৩০।

২. এইচ জে আর মারে, এ হিস্টোরি অব চেস (অক্সফোর্ড, ১৯১৩)।

৩. চেক (যেক্) আইনগতভাবে প্রভুর প্রতি এক ধরনের অপমান; এবং তারা যখন তাঁকে মেট প্রদান করে তখন তা বিরাট সম্মানসূচক, অনেকটা তাকে পরাজিত বা হত্যা করার সামিল। আলফন্সো এল সাবিয়ো, লিব্রো ডি লস জুয়েগোস, ফল ২ বি।

www.waytojannah.com

চিত্র-৬. খৃষ্টীয় খোদাই করা লেখা সম্বলিক স্পেনোমূরীয় থালা

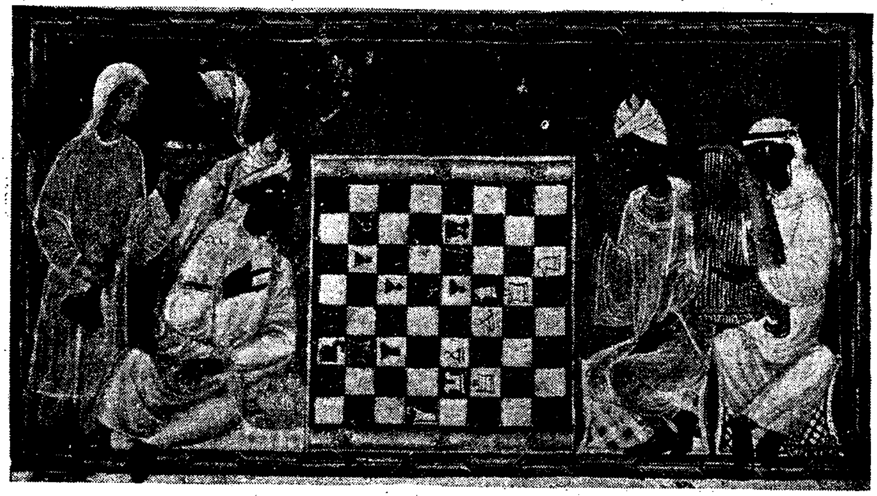

চিত্র-৭. দাবা খেলায় সমস্যা (আলফসো দা সোজ-এর পাণ্ডুলিপি থেকে)

www.waytojannah.com

ইউরোপে দাবা খেলার প্রাচীনতম উল্লেখ স্পেনেই দেখা যায়। কাউন্টস অব বার্সেলোনা পরিবারের দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তি 'চেসমেন' উইল হিসাবে রেখে যান এবং এর সময় হচ্ছে ১০০৮ (বা ১০১০) এবং ১০১৭ খৃষ্টাব্দ। বিজ্ঞ আলফন্সোই সর্বপ্রথম ইউরোপীয় ভাষায় এই খেলার বর্ণনা প্রদান করেন। স্পষ্টত তার বইটি[১] আরবী সূত্র থেকে সংকলিত হয়েছে এবং এর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবিতে সাধারণত প্রাচ্য পোশাক পরিহিত খেলোয়াড়দের দেখানো হয়েছে। কোন কোন সময় খেলোয়াড়দের সঙ্গী হিসেবে প্রাচ্য বাদকদেরও দেখা যায়। এমনকি দুই-এক সময় বাম হাতে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বাদকদেরও খেলতে দেখা যায়। ভাবখানা এই যে, অকস্মাৎ ডাক পড়লে তারা সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করবেন (চিত্র ৭)। আলফন্সো এই খেলার যে বর্ণনা প্রদান করেছেন তার সঙ্গে মুসলমানদের অনুসৃত রীতির তেমন কোন মিল নেই। কিন্তু তিনি যে সব সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন তা প্রায় সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের খেলায় উদ্ভূত সমস্যা। কারণ দাবা-সমস্যা এমন একটি মানসিক ব্যাপার যা ইউরোপে ইসলামী উত্তরাধিকারের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। একটি ছাড়া তাদের ঘুঁটিগুলো আমাদেরই মত। কোন কুইন (রাণী) নেই। সসার যাকে 'ফার্স' এবং আলফন্সো *এল আলফেরযা* (*আল-ফিরযান*, উপদেষ্টা বা মন্ত্রী, *আল-ফারাস*, অশ্বারোহী বা নাইট নয়) বলতেন সেটিই কুইনের স্থান দখল করেছে। ফার্স কোনাকোনি একঘর চলতে পারতো, কিন্তু প্রথম চালে সেটি কোনাকোনি অথবা সোজাসুজি তৃতীয় ঘরে লাফ দিয়ে যেতে পারতো। এটি আধুনিক কুইনের পূর্বসূরি এবং এক্ষেত্রে তার ক্ষমতার বিকাশ ঘটে প্রধানত লুসেনা (১৪৯৭) ও রুই লোপেয নামক দুজন স্পেনীয় খেলোয়াড়ের সৌজন্যে।

বর্তমানে সিনিয়র ক্যাপাব্ল্যাঙ্কা প্রমুখ মাস্টার যখন দাবা খেলার আরো উন্নতি বিধানের (ড্রয়ের সম্ভাবনা হ্রাস করে) পরামর্শ দিচ্ছেন, তখন প্রচলিত ঘরের চাইতে অনেক বেশি ঘরে দশম আলফন্সোর দাবা খেলা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এসব পরামর্শের মধ্যে একটি হচ্ছে প্রচলিত ৬৪টি ঘরের স্থলে ১০০টি ঘড়ের বোর্ড ব্যবহার। অপর একটি হচ্ছে এক ধরনের ডবল দাবা, যাতে বোর্ডের প্রত্যেক দিকে ১৬টি করে এবং পার্শ্বে ১২টি করে ঘর থাকবে। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, এসব পরিকল্পনার আলোচনায় আলফন্সো সাবিয়োর নাম কখনো উল্লিখিত হয়নি। কারণ তিনি যে খেলা জানতেন তা ১০০ ঘরের বোর্ডের উপর খেলা হতো এবং তাতে প্রত্যেক দিকে দুটি অতিরিক্ত ঘুঁটি (যেগুলিকে তিনি 'বিচারক' বলতেন) এবং দুটি অতিরিক্ত 'বোড়ে' থাকতো। অবশ্য যে খেলাটি তাকে বেশি আনন্দ দিতো তা ছিলো 'বড় দাবা *(গ্রান্ডি এসেড্রেক্স)*। এর বোর্ডে ছিলো ১৪৪ ঘর এবং সে সঙ্গে ছিলো ১২টি ঘুঁটি ও ১২টি বোড়ে। কিং-এর পরেই থাকতো একটি গ্রিফন, এবং তারপর

---

১. জে জি হোয়াইট, দি স্পেনীশ টিটীজ অন চেস-প্লে রিটেন বাই অর্ডার অব কিং আলফন্সো দি সেজ ইন দি ইয়ার ১২৮৩। ১৯৪টি ফটোগ্রাফিক প্লেটে এসকোরিয়াল পাণ্ডুলিপি পুনর্মুদ্রণ (লিপযিগ্ ১৯১৩)।

www.waytojannah.com

Contents

প্রত্যেক পাশে থাকতো একটি কোকাট্রিস, একটি জিরাফ, একটি ইউনিকর্ন, একটি সিংহ ও একটি রুক। কিং আধুনিক খেলার ন্যায় যেকোন পাশের ঘরে চলত। ঐ সময় 'ক্যাসলিং' আবিষ্কৃত না হলেও কিং প্রথম চালে তৃতীয় ঘরে লাফ দিয়ে যেতে পারতো। গ্রিফন (স্পেনীয় *আনকা* আরবী *আন্‌কা*) কোনাকোনি একঘরে এবং তারপর সোজাসুজি যেকোন সংখ্যক ঘরে চলতো। কোকাট্রিসের চাল দেওয়া হতো আধুনিক বিশপের মতো, যদিও বিরাট বোর্ডে তাদের দূরুত্ব ও ক্ষমতা ছিলো অনেক বেশি। জিরাফের চাল ছিলো আধুনিক নাইটের মত, তবে তার লাফ ছিলো দীর্ঘতর। কারণ নাইটের চাল হচ্ছে কোনাকোনি একঘর ও সোজাসুজি দুই ঘর, আর জিরাফের চাল ছিল কোনাকোনি এক ঘর ও সোর্জাসুজি চার ঘর। ইউনিকর্ণের চালও ছিলো জটিল এবং এটিকে গ্রিফনের পরেই বোর্ডে সবচাইতে শক্তিশালী ঘুঁটি মনে করা হতো। তাদের চাল শুরু হতো নাইটের মত এবং চলত বিশপের মতো তবে শর্ত ছিলো যে, চাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা অন্য ঘুঁটি খেতে পারতো না। সিংহ যেকোন দিকে চতুর্থ ঘরে লাফ দিয়ে যেতে পারতো। রুক-এর চাল ছিলো চিরাচরিত। যেকোন দিকে সোজাসুজি। বোড়ের চাল সাধারণ খেলার মতই ছিলো। এক সময়ে সামনে একঘর। প্রথম চালে তাদের দুঘর এগিয়ে যাবার কোন অধিকার ছিলো না, তবে এর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাদের চাল শুরু হতো দ্বিতীয় সারির পরিবর্তে চতুর্থ সারি থেকে এবং তারা যদি তাদের লাইনের দ্বাদশ ঘরে পৌঁছে 'কুইণ্ড' হতো তাহলে তারা যে লাইন থেকে অগ্রসর হতে শুরু করেছে সে লাইনের ঘুঁটির মর্যাদা ও ক্ষমতা পেতো।

স্পেনে ইসলামের উত্তরাধিকারিত্বের সঙ্গে বিজ্ঞ আলফন্সোর আরো একটি সম্পর্ক ছিলো। মধ্যযুগীয় কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ, *ক্যান্টিগাস ডি সান্টামেরিয়া*, তারই অবদান। এটি সমসাময়িক স্বরলিপিসহ দুটি পাণ্ডুলিপি আকারে এসকোরিয়ায় ও মাদ্রিদে সংরক্ষিত হয়েছে। এসব কবিতার ভাষা ক্যাস্টিলিয়ান নয়, বরং উত্তর পর্তুগালের গ্যালিসিয়াম আঞ্চলিক ভাষা। ত্রয়োদশ শতকে এই ভাষা ক্যাস্টিল ও অ্যারাগনের এবং পর্তুগালের রাজদরবারের কবিতার ভাষা ছিলো এবং ক্যাস্টিলিয়ান স্পেনীয় ভাষা উচ্চাঙ্গের গীতিকাব্যের উপযোগী নমনীয়তা লাভ না করা পর্যন্ত ঐভাবেই অব্যাহত থাকে। প্রফেসর রিবেরার মতে এর সঙ্গীত মূলত মুসলমানদের আন্দালুসীয় সঙ্গীত। কিন্তু সঙ্গীতের ইতিহাসবিদগণ তা পুরোপুরি মেনে নিতে রাজি নন। তবুও ছোট ছোট চিত্রে যেসব বাদ্যযন্ত্র এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যেসব বাদক দেখা যায় তা স্পষ্টভাবে মূলত মুসলিম। কিন্তু এর কাব্যিক অবয়ব মুসলিম স্পেনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এতে প্রায় সামগ্রিকভাবে *মুওয়াশ্‌শাহ* ও *যাজাল* রীতির স্তবক রয়েছে। এই রীতি ইবনে কুযমান (আবেন কুযমান) সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন এবং এ বিষয়টি অন্য একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এরূপ যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, এসব কবিতা সম্পূর্ণরূপে খৃষ্টান অনুপ্রেরণা, তাই এর সঙ্গে ইসলামী কলাকৌশলের কোন স্পর্শ থাকতে পারে না। কিন্তু *মুওয়াশ্‌শাহ* ও *যাজাল* রীতি

www.waytojannah.com

ভিলানসিসোর জনপ্রিয় ক্যাস্টিলিয়ান কাব্য–রীতিতে আদর্শরূপে রূপায়িত হয়েছে। এটি ক্রিসমাস ক্যাব্‌লসহ সর্বপ্রকার খৃস্টান কবিতায় ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়েছে। এর বিষয়বস্তু–ভার্জিন মেরির প্রশংসা–ট্রুবাডুরের সম্ভ্রান্ত মহিলার ভাবমূর্তির স্বাভাবিক বিকাশ। ট্রুবাডুরের কাব্য (তৃতীয় অধ্যায়ে যা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে) সারবস্তু, অবয়ব ও রচনাশৈলীর দিক দিয়ে আরবী আদর্শবাদ এবং স্পেনে লিখিত আরবী কবিতার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

ডন জুয়ান ম্যানুয়েল ও হিটার আর্কপ্রিস্ট

বিজ্ঞ আলফন্সোর যুগ ছিলো প্রাচ্য সূত্র থেকে অনুবাদ ও সংকলনের যুগ। এরপর গদ্যের ক্ষেত্রে ইনফ্যান্টে ডন জুয়ান ম্যানুয়েল (১২৮২–১৩৪৯) এবং পদ্যের ক্ষেত্রে হিটার আর্কপ্রিস্টের (মৃ ১৩৫১ খৃস্টাব্দের পূর্বে) মৌলিক রচনার একটি সুবর্ণ যুগের আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা উভয়েই প্রাচ্যের গল্প–কাহিনী থেকে নৈতিক শিক্ষা প্রদানের জন্য কিভাবে উপকথা সৃষ্টি করতে হবে কেবল তাই আয়ত্ত করেননি, এগুলির উপযুক্ত কাঠামো তৈরীও আয়ত্ত করেন। ডন জুয়ান ম্যানুয়েলের *কন্ডে লুকানোর*[১] গ্রন্থে কাউন্ট জীবন ও সরকার সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্নে তার মন্ত্রী প্যাটোনিওর পরামর্শ চান। প্যাটোনিও তার বক্তব্য সুস্পষ্ট করার জন্য এক একটি গল্প বলে প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দেন। বহু ক্ষেত্রে এসব গল্প প্রাচ্য সূত্র থেকে উদ্ভূত এবং দুই–একটি ক্ষেত্রে এগুলিতে ঐ সময়কার কথ্য আরবীর শব্দগুচ্ছ গ্রহণ করা হয় এবং তা ধ্বনীগতভাবে স্পেনীয় ভাষায় লেখা হয়। গল্পগুলির নৈতিক উপদেশ সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অত্যন্ত উন্নতমানের। লেখক বিজ্ঞ আলফন্সোর জনৈক ভ্রাতুষ্পুত্র, তাই অত্যন্ত সচেতন ছিলেন যে, এসব গল্প লিখে তিনি একটি সরকারী দায়িত্ব পালন করছেন। হিটার আর্কপ্রিস্ট জুয়ান রুইয ছিলেন সাধারণের লোক। তিনি সরকারী দায়িত্ব বা সমাজের প্রতি ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে আদৌ সচেতন ছিলেন না। কোন ধর্মীয় পেশার বাধ্যবাধকতাও তাঁর ছিলো না। এতদসত্ত্বেও তিনি একজন সত্যিকার কবি এবং স্পেনীয় ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর *লিব্রো ডি বুয়েন* আমোর[২] (সত্যিকারের প্রেমের বই,–*বুয়েন আমোর*–এর সঙ্গে পার্থিব প্রেম *লকো আমোর*–এর তুলনা করা হয়েছে) একটি ব্যাঙ্গাত্মক আত্মজীবনী যাতে তিনি অত্যন্ত অকপটে নিজের প্রেমের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এতে রূপক সৃষ্টির কোন মনোভাব নেই। যে প্রেম আর্কপ্রিস্টকে পরিচালিত করে তা হচ্ছে পার্থিব প্রেম, যদিও আবেগপূর্ণ আন্তরিকতাসহকারে গীতি কবিতার মাধ্যমে ভার্জিন মেরির প্রতি তার ভক্তি–শ্রদ্ধার তিনি প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর সবগুলি আকাঙ্ক্ষা

১. সম্পাদনা এইচ নাষ্ট (লিপযিগ, ১৯০০) এবং এফ জে সানচেয ক্যান্টন (মাদ্রিদ ১৯২০) আরো দ্রষ্টব্য ব্রডওয়ে ট্রান্সলেশন্স (লণ্ডন, ১৯২৪।)
২. সম্পাদনা জে সেজোডোর ই ফ্রাউকা, 'ক্লাসিকস ক্যাস্টেলানোস নং ১৪ এবং ১৭, (মাদ্রিদ, ১৯১৩।)

www.waytojannah.com

চরিতার্থ হয়নি। কিন্তু তাঁর কোন কোন মানসী, যেমন ডোনা এনড্রিনা, অত্যন্ত বিশদ ও মোহনীয়ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর প্রেয়সীর দূতী–ট্রটেকনভেনটস (লা সেনোস্টিনার সরাসরি পূর্বপুরুষ এবং জুলিয়েটের সেবিকা) ইতিমধ্যে উপন্যাস সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র হিসেবে পরিগণিত। আর্কপ্রিস্ট সমাজের নিম্নতর শ্রেণীর মধ্যে বিচরণ করতেন। তিনি সমাজচ্যুত অসতী রমণীদের মধ্যে এবং সমাজ নিন্দিত গায়ক ও মূরীয় নর্তকীদের মধ্যে পৌরহিত্য করতেন। তিনি এদের কথাবার্তা এবং অশিষ্ট আরবীতে প্রদত্ত জবাবের নকল তুলে ধরেন। তার রচনা রীতি কিছুটা প্রাচ্য ধরনের। রচনার এই কাঠামোতে বিভিন্ন ধরনের উপকথা ও নীতিমূলক গল্প সুবিন্যস্ত রয়েছে। আরবী থেকে ধার করা শব্দসম্ভারে সমৃদ্ধ। কিন্তু আর্কপ্রিস্ট ফরাসী এবং মধ্যযুগীয় ল্যাটিন থেকেও বিষয়বস্তু ধার করেন। যাজাল–এর বৈশিষ্ট্য পরিহার না করে তিনি তার জ্ঞাত প্রতিটি ছন্দ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করতেন। কারণ তার মনে সবসময় এই চিন্তা কাজ করতো যে, কোন একদিন কোন এক চারণ কবি তার কবিতার কোন একটি কবিতার অংশ রাস্তায় সুর করে আবৃত্তি করবে এবং বস্তুত তার মৃত্যুর পর অর্ধ–শতাব্দীকাল তাই ঘটেছিলো। জনৈক হতবুদ্ধি লিপিকর তার কক্ষে বসে ঘটনাপঞ্জি নকল করতে গিয়ে একদিন বাইরের রাস্তায় একজন ভবঘুরে চারণ কবির কবিগানের বিষয় লিপিবদ্ধ করেন। লোকটি পরপর ছোট ছোট উপাখ্যানের মাধ্যমে কবিগান গাইছিল। মাঝে মাঝে ওলট–পালট খাচ্ছিলো। এরি মধ্যে শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তাকে বলতে শোনা যায় ঃ এবার আমরা আর্কপ্রিস্টের বই থেকে শুরু করছি।'[১]

ইনফ্যান্টে ডন জুয়ান ম্যানুয়েল ও হিটার আর্কপ্রিস্টের সমসাময়িক ছিলেন *হিস্টোরিয়া ডেল ক্যাভেল্লেরো সিফার*[২] গ্রন্থের রচয়িতা; এটি বীরত্ব বিষয়ক প্রাচীনতম স্পেনীয় গ্রন্থ। সম্ভবত ১২৯৯ থেকে ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়। বীরত্ব বিষয়ক সবগুলি গ্রন্থের ন্যায় এটিও মূলত 'কালডিয়ান' (অর্থাৎ আরবী) থেকে গৃহীত বলে মনে করা হয়। বিস্তারিত বিষয় 'গোল্ডেন লিজেণ্ড' আর্থারীয় রোমান্স ও প্রাচ্য উপকথার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ হলেও কাহিনীর মূল ধারণা 'আরব্য রজনীর' একটি গল্প। সিফার নামটি আরবী (*সফর*–ভ্রমণ; কিংবা *সিফারা*, দূতাবাস)। তাই ক্যাবেল্লেরো সিফার কথাটি নাইট এর‍্যান্ট (ভ্রাম্যমাণ যোদ্ধা)–এর সমার্থক। তার স্ত্রীর নাম ছিলো গ্রিমা (*কারিমা*, মুসলিম মহিলাদের একটি সাধারণ নাম এবং এর অর্থ হচ্ছে 'মূল্যবান জিনিস, 'উচ্চ বংশজাত' কিংবা 'কন্যা')। অন্যান্য প্রাচ্য বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা গেছে।[৩]

---

১. আর মেনেণ্ডেয পিডাল, পোয়েসিয়া জাগলারেস্কা ই জাগালারেস (মাদ্রিদ, ১৯২৪), পৃ. ২৭০–১ এবং ৪৬২–৭।
২. সম্পাদনা এইচ মাইকেলান্ট, বিব্‌ল্, ডেসলিট ভেরিন্‌স্ ইন স্টুটগার্ট ১১২, টুবিঙ্গেন, ১৮৭২), এবং সিপি ওয়েগনার (মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৯)।
৩. এ গোনযালেয প্যালেনসিয়া, হিস্টোরিয়া ডি লা লিটারেচুরা এরাবিগো–এসপানোলা (মাদ্রিদ, ১৯২৮), পৃ ৩১৬–১৭।

www.waytojannah.com

আরবী বর্ণমালায় লেখা স্পেনীয় ভাষা

আর্কপ্রিস্টের আর একজন সমসাময়িক লেখক ছিলেন পোয়েমা ডি ইউসুফ[১]-এর গ্রন্থকার। গ্রন্থকারের পরিচয়হীন এই কাব্যটি ইউসুফের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে রচিত। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, শব্দগুলি স্পেনীয় (অ্যারাগণের আঞ্চলিক ভাষা) এবং কাব্য-রীতি ফরাসী হলেও এটি আরবী বর্ণমালায় লেখা হয়েছে। কাব্যের বিষয়বস্তু *কুরআন* ও অন্যান্য মুসলিম সূত্র থেকে নেওয়া হয়েছে। স্পেন ও পর্তুগাল যা *লিটারেচুরা আল জামিয়াডা* রূপে পরিচিত এটি তার একটি দৃষ্টান্ত। '*আজামা* অর্থ খারাপ আরবী বলা, তাই '*আজামী*' একজন অনারব, এবং আল-আজামিয়া অনারবের ভাষা। স্পেনে আরবী ভাষাভাষী স্পেনীয়রা স্পেনীয় ভাষা প্রকাশ করার জন্য মূলত এই রীতি অনুসরণ করেন। পরবর্তীকালে স্পেনীয় মূরগণ স্পেনীয় শব্দ প্রকাশের জন্য আরবী বর্ণমালা ব্যবহার করতেন। এ ধরনের বহু পাণ্ডুলিপি রয়েছে। কিছুকাল আগে অ্যারাগনের আলমোনাসিড ডি লা সিয়েরায় একটি প্রাচীন বাড়ির ছাদের নীচে লুকোনো অবস্থায় কিছু পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। ইনকুইজিশনের[২] চরদের' দৃষ্টি এড়ানোর জন্যই এগুলো ওভাবে রাখা হয়েছিল। এগুলি বর্তমানে মাদ্রিদের জুন্টা পারা এম্ প্লিয়াসিয়ন ডি এসটুডিয়োসের লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।[৩] এসব পাণ্ডুলিপির মধ্যে রয়েছে, দলিলপত্র, চতুর্দশ শতকে *মুওয়াশ্শাহ* রীতিতে মহানবীর প্রশংসায় রচিত কবিতা। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের ধর্মীয় উপদেশ, রূপকথা, গল্প ও কুসংস্কার। এসময়কার সবচাইতে তাৎপর্যপূর্ণ পাণ্ডুলিপি হচ্ছে ওরানের *মুফতীর* একখানি ধর্মীয় উপদেশ সম্বলিত চিঠি।[৪] এই চিঠিতে গ্রানাডা বিজয়ের পরবর্তী শতকের নির্যাতিত স্পেনীয় মূরদের কি পরিমাণে তারা বিজয়ীদের আদেশ পালন করবে, সে সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ বিজয়ীরা এ সময় মুসলমানদের প্রতিটি সুন্দর কাজকে এমনকি ওযু করাকেও ধর্মদ্রোহিতা ও কঠোর দণ্ডনীয় বলে মনে করতো।

বিজিত মুসলমান স্পেনীয়রা একটি রোমান্স আঞ্চলিক ভাষায় কথাবলা সত্ত্বেও এবং বহুক্ষেত্রে খৃস্টান স্পেনীয় বংশোদ্ভুত হওয়া সত্ত্বেও তাদের ধর্মীয় হস্তলিপির প্রতি কতটা অনুগত ছিলো, গ্রানাডার পতনের পরও আরবী বর্ণমালার ব্যবহার থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আরবী বর্ণমালায় স্পেনীয় ধ্বনি নকল বহু দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। স্পেনে মুসলমানরা কিভাবে সেদেশের ভাষা স্পেনীয় ও আরবী উচ্চারণ করতো সেদিক দিয়েও

---

১. সম্পাদনা মেনেণ্ডেয পিডাল (মাদ্রিদ, ১৯০২) [আরবী ও ল্যাটিন বর্ণমালায় লিখিত]

২. (ক) রোমান ক্যাথলিক ধর্মমত অনুসারে (ত্রয়োদশ শতকে) অবিশ্বাসী বা ধর্মবিরোধীদের অনুসন্ধান ও শাস্তি প্রদান, (খ) এদের খুঁজে বের করে শাস্তি প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত সাধারণ ট্রাইবুন্যাল।-অনুবাদক।

৩. এম এস এস (অ্যারাবেস ই আলজামিয়াডোস ডি লা বিবলিওতেকা ডি লা জুনটা। (মাদ্রিদ, ১৯১২।) আরো দ্রষ্টব্য ডি লোপ্স, টেক্সটস এম আলজামিয়া পর্টুগেসা। (লিসবন, ১৮৯৭।)

৪. পেড্রো লঙ্গাস, ভিডা রিলিজিওসা ডি লস মরিসকোস (মাদ্রিদ, ১৯১৫), পৃ ৩০৫-৭, এবং জার্ন এসিয়াটিক, টি. ২১০, পৃ. ১-১৭ [জানুয়ারী-মার্চ ১৯২৭]।

www.waytojannah.com

(পেড্রো ডি আশকালা প্রায় ১৫০০ খৃষ্টাব্দে গ্রানাডার কথ্য আরবী থেকে রোমান অক্ষরের যে প্রতিলিপি তৈরি করেন তার দ্বারা সমর্থিত) এটি অত্যন্ত মূল্যবান। স্পেনীয় মূরদের উচ্চারণের প্রভাব বর্তমানেও লক্ষ্য করা যায়।

স্পেনীয় মূরদের (মরিস্কো) বিতাড়নের মর্মন্তুদ কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। ১৬১৪ খৃষ্টাব্দের আগ পর্যন্ত তারা চূড়ান্তভাবে বিতাড়িত হয়নি, তাই এই উপদ্বীপে আরবী ভাষা তখনো সারভ্যান্টিযের[১] জীবিতকাল পর্যন্ত কথ্য হিসেবে প্রচলিত ছিলো এবং স্বভাবতই তার সমসাময়িক লেখকদের কাছে তা অদ্ভুত বা অসম্ভব মনে হতে পারে না। আমরা আরো জানি যে, একটি আরবী বা 'কালডিয়েন' গ্রন্থ থেকে বীরত্বমূলক রোমান্টিক কাহিনীগুলি গৃহীত হয়েছে বলে সাধারণত উল্লেখ করা হয়। এবং তিনি ঘোষণা করেন যে, মূল *ডন কুইক্সট* ছিলো 'সিদি হামেতি বেন এন্‌জেলি' নামক জনৈক মূরের রচনা এবং তাও ছিলো মূলত আরবী ভাষায় লিখিত।

জে. বি. ট্রেণ্ড

---

১. ডন কুইক্সটের রচয়িতা স্পেনীয় ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার।—অনুবাদক

www.waytojannah.com

ক্রুসেড

১

মানুষ প্রায়ই ইতিহাসের অমোঘ বিধির কথা চিন্তা করেছে। এই চিন্তার মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দ্বন্দ্বের কথা সব সময় ছিলো। হেরোডোটাস তার ইতিহাসের সূচনায় প্রশ্ন রাখেন, কেন তারা পরস্পর যুদ্ধ করে। আমাদের কবিরা এখনো পাশ্চাত্যের বজ্রনিনাদী কাহিনীর প্রতি প্রাচ্যের নীরব ও গভীর ঘৃণার কথা বলে থাকে কিংবা যে আপোসহীন বৈরিতা এ দুটিকে চিরন্তনভাবে পৃথক করে রেখেছে তা সাড়ম্বরে বর্ণনা করে। প্রাচীনকালের ট্রজান ও পারস্য–যুদ্ধ, সিরিয়ায় ক্রেসাস ও হেরাক্লিয়াসের যুদ্ধ, ক্রুসেড এবং উসমানীয় বিজয় সবগুলি মিলে এক ছন্দের সৃষ্টি করেছে এবং নিয়মিত পুনরাবৃত্তির ইঙ্গিত বহন করছে। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব জটিলতাপূর্ণ ধারাবাহিক ঐতিহাসিক ঘটনার ভৌগোলিক পরিণতি, ইতিহাসে বাইরের সংঘাতের অতিরিক্ত বিষয়ও স্থান লাভ করে। যে সংঘাত প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম, জাতি ও সভ্যতার মধ্যে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ লাভ করেছে। আমরা যদি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দৃশ্যমান সেই সংঘাতকে হ্রাস করে সত্যিকারের সংঘাতে রূপায়িত করতে পারি, তাহলেই আমাদের বিবরণ বাস্তব রূপ ও আকৃতি লাভ করবে। বস্তুত এ কথা সত্য যে, বিচিত্র ভৌগোলিক কারণে কনস্টান্টিনোপল থেকে আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরীয় পূর্ব উপকূল দীর্ঘকাল ইতিহাসের অত্যন্ত বিতর্কপূর্ণ একটি অঞ্চল ছিলো। এখানে কৃষ্ণ সাগরের পথে লোহিত সাগরের পথে কিংবা মরুভূমির অপর পারে বৈরুত থেকে ইউরোপ, এশিয়া এবং এশিয়ার পণ্যও রহস্যের সংস্পর্শে আসে। এখানে মিসর, ক্রীট, জেরুজালেম বা এথেন্স ছিলো সভ্যতা, ধর্ম ও দর্শনের দোলনা–লালনভূমি। এ ধরনের এলাকায় বহু সংঘাতের উদ্ভব হওয়া অবধারিত ছিলো। এগুলোর কোনটি ছিলো অর্থনৈতিক, কোনটি ধর্মীয়, কোনটি রাজনৈতিক এবং কোনটি ছিলো বর্ণগত। আবার বহু সংঘাত ছিলো এগুলির সংমিশ্রণ জনিত। প্রত্যেকটি সংঘাতকে তার নিজস্ব পর্যায়ে ও নিজস্ব পরিসরে প্রকৃষ্টভাবে বোঝা যায়। বৃহত্তম সংঘাতগুলির অন্যতম হচ্ছে, একদিকে পাশ্চাত্য খৃষ্ট ধর্ম, সভ্যতা ও সম্প্রদায় এবং অন্যদিকে মুসলিম বিশ্বাস, সভ্যতা ও সম্প্রদায়ের মধ্যেকার সংঘাত। আমরা বলতে পারি যে, এর সূচনা হয় ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে

www.waytojannah.com

ইয়ারমূকে হযরত উমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আন্হুর সেনাবাহিনীর নিকট 'প্রথম ক্রুসেডার' হেরাক্লিয়াসের পরাজয় থেকে। এর সমাপ্তি তারিখ কেউ বলতে পারে না। এটি এক সময় ছিলো প্রাথমিকভাবে ধর্মীয় এবং অন্য এক সময় প্রধানত রাজনৈতিক। এই সংঘাত ছিলো বিভিন্ন জাতির মধ্যে একদিকে প্রধানত রোম্যান্স ও স্লাভোনিক এবং অন্যদিকে আরব ও তুর্কী, কিন্তু এটি সবসময় একটি মিশ্র সংঘাত হিসাবে অব্যাহত থাকে, যাতে দুটি সভ্যতা মৌলিকভাবে ব্যাপৃত হয়। এর অন্যতম অধ্যায় হচ্ছে ক্রুসেডের যুদ্ধ। এই অধ্যায়ের সূচনা ১০৯৬ খৃষ্টাব্দে। মূল সিরীয় ভূখণ্ডে সর্বশেষ খৃষ্টান ঘাঁটির পতনকে যদি আমরা সমাপ্তি মনে করি তাহলে এর সমাপ্তি ঘটে ১২৯১ খৃষ্টাব্দে—আমরা যদি ক্রুসেডের প্রেরণার রেশটুকু বিবেচনা করি তাহলে পর্তুগীজ সমুদ্র অভিযান ও কলোম্বাসের আবিষ্কার পর্যন্ত এটি অব্যাহত ছিলো।

ক্রুসেডগুলোর দুটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। মূল আবেগের দিক দিয়ে (এ কথা সত্য যে, অন্যান্য প্রবণতাও এর সঙ্গে যুক্ত হয়) এগুলি হচ্ছে একটি আত্মিক আন্দোলন যা নিজস্ব পন্থায় একটি আত্মিক প্রতিষ্ঠানের বাস্তবরূপ গ্রহণ করে। খৃষ্টান যাজকরা এ যুদ্ধকে পুতযুদ্ধ এবং ন্যায় বলেই শুধু ব্যাখ্যা করেনি ; তারা এও ঘোষণা করে যে, এর দ্বারা বিশপের উচ্চ পদমর্যাদায় উন্নীত হওয়া যায়। এ যুদ্ধ *রেস খৃষ্টিয়ানা*, যা খৃষ্টান জগতকে তাদের ধর্ম বিশ্বাসের প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করে। পবিত্র ভূমি পুনরুদ্ধারে প্রলুব্ধ করে। এটি মুসলিম প্রাচ্যে খৃষ্টান পাশ্চাত্যের একটি প্রতিফলন। এটি 'জেরুজালেমের ল্যাটিন রাজ্য' নামে একটি খৃষ্টান রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে, যার দৃষ্টি লেভ্যান্টের[১] উপকূল থেকে পূর্ব দিকে মসুল ও বাগদাদের প্রতি এবং দক্ষিণ দিকে কায়রো ও মিসরের প্রতি প্রসারিত হয়। প্রথমোক্ত ধারণাটি হচ্ছে ব্যাপকতর এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে বিশেষ ও অদ্ভুত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। জেরুজালেমের ল্যাটিন রাজ্যে ক্রুসেড তার সুনির্দিষ্টরূপ গ্রহণ করে এবং এখানে তার সুনির্দিষ্ট ফলাফলও প্রদর্শন করে, সামরিক শৃংখলার উদ্ভব হয়, ভেনিস ও জেনোয়ার বণিকগণ কর্তৃক সিরীয় বন্দরগুলিতে বাণিজ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দূরবর্তী এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক ও মিশনারী সম্পর্কের বিকাশ লাভ করে। এখানে (যেমনটি স্পেনেও, কিন্তু এখানকার ব্যাপারে যেভাবে ইউরোপের সাধারণ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় স্পেনের ব্যাপারে তা কখনো হয়নি) খৃষ্ট ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে ক্রমাগত সংঘাত ও স্থায়ী সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। ল্যাটিন রাজ্যটির প্রতি যখন দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় তখনি সাধারণ পটভূমি

১. লেভ্যান্ট; আক্ষরিক অর্থ উদয়, সাধারণভাবে উদয়ের দেশ প্রাচ্য বোঝায় বিশেষভাবে সিরিয়া, লেবানন ও ফিলিস্তিনসহ পূর্বভূমধ্য সাগর এবং ইজিয়ান সাগর এলাকা বোঝায়।—অনুবাদক,

www.waytojannah.com

অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় (দৃশ্যমান দিগন্তের পাহাড়ের চূড়ার ন্যায়) ভূমধ্যসাগরীয় অববাহিকার ভৌগোলিক পটভূমি এবং এই অববাহিকায় পূর্ববর্তী শতকগুলিতে খৃষ্টান ও মুসলিম শক্তির দোদুল্যমান অবস্থার ঐতিহাসিক পটভূমি।

ভৌগোলিকভাবে দুটি ভূমধ্যসাগরের কথা আমরা বলতে পারি। একটি হচ্ছে পশ্চিমের ভূমধ্যসাগর, যা সিসিলির দক্ষিণ পশ্চিমে সরেল্লো অন্তরীপ এবং উত্তর–পূর্ব তিউনিসের বন অন্তরীপের মধ্যবর্তী প্রায় ১০০ মাইল প্রশস্ত সমুদ্র পথ দ্বারা পূর্বদিকে ইটালী ও সিসিলির সঙ্গে যুক্ত। অপরটি হচ্ছে পূর্বের ভূমধ্যসাগর, যা সিসিলির পূর্ব উপকূল (ইতিহাসে এ স্থানটি বার বার দুই ভূমধ্যসাগরের রণাঙ্গন বা সংযোগ স্থল ছিল) থেকে এশিয়া মাইনর ও সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। একটি সমুদ্রের দুটি অংশ পূর্ব ও পশ্চিম ভূমধ্যসাগর প্রাচীনকালে দুটি সভ্যতার লীলাভূমিতে পরিণত হয়। পশ্চিমে ছিল ল্যাটিন সভ্যতা। এই সভ্যতার ভিত্তিতে খৃষ্টধর্ম বিজয়মণ্ডিত হওয়ার পর রোমান ধর্মমত ও পশ্চিমের হোলি রোমান সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়। পূর্বে ছিলো গ্রীক সভ্যতা। এখানে বিকাশ লাভ করে গ্রীক ধর্মমত ও বাইযেন্টাইন সাম্রাজ্য। এই অংশেই সপ্তম শতকে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। মক্কায় অবস্থিত এর শক্তি কেন্দ্র থেকে বৈদ্যুতিক শক্তির দ্রুততায় সম্প্রসারিত হয়ে এটি সিরিয়াকে আলোকিত করে, উত্তর আফ্রিকার সমগ্র বিস্তার অতিক্রম করে এবং সেখান থেকে একলাফে জিব্রাল্টার প্রণালী পার হয়ে পিরেনিজের দ্বারদেশে গিয়ে উপনীত হয়। আদি মধ্যযুগেই এটি উভয় ভূমধ্যসাগরে তার স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত করে–পশ্চিমের দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূলে এবং পূর্বের দক্ষিণ ও পূর্ব উপকূলে ভূমধ্যসাগরীয় অববাহিকার উভয় অংশেই খৃষ্টান শক্তি এর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং এসব সংঘর্ষ, এমনকি ক্রুসেডের আগেই, ক্রুসেডের কিছুটা বৈশিষ্ট্য লাভ করে। কিন্তু ক্রুসেডের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একাদশ শতকের শেষের দিকে অভিযান শুরু হলে পাশ্চাত্যের ল্যাটিন খৃষ্টান শক্তি এতদিন পর্যন্ত তার থেকে বিচ্ছিন্ন প্রাচ্যে অগ্রসর হয়, এবং এখানে একদিকে এটি তার নামমাত্র মিত্র গ্রীক খৃষ্টান শক্তি ও প্রাচ্য সাম্রাজ্যের সংস্পর্শে আসে এবং অন্যদিকে প্রাচ্যের মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। পাশ্চাত্যের প্রাচ্যে প্রবেশের এই সহজ সত্যটিই সম্ভবত ক্রুসেডের প্রাথমিক ও সবচাইতে বিশ্বস্ত দিক। কিন্তু এই সহজ সত্যেরও কতিপয় জটিলতা রয়েছে। কারণ পাশ্চাত্য যে প্রাচ্যে প্রবেশ করে তাও জটিলতাপূর্ণ ছিলো। কেবলমাত্র ল্যাটিন খৃষ্টান শক্তিকেই বাইযেন্টিয়ামের গ্রীক খৃষ্টান শক্তির সংগে চুক্তি করে তার সম্পর্ক স্থির করতে হয়নি, এসময় মুসলমানরাও নিজেদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন ছিলো। উত্তরে কৃষ্ণ সাগর থেকে দক্ষিণে

www.waytojannah.com

লোহিত সাগর পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়ার সুন্নী তুর্কীরা বিতর্কমূলক সিরীয় ভূ-খণ্ডে ফাতেমী বংশীয় মিসরীয় শিয়াদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ক্রুসেডে অংশগ্রহণকারী পাশ্চাত্য এমন এক বিরোধিতা আবিষ্কার ও সর্বশক্তি দিয়ে মুকাবিলা করে, যার সম্পর্কে সে আদৌ অবহিত ছিলো না।[১]

ঐতিহাসিকভাবে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ল্যাটিন খৃষ্টান শক্তির বিদেশে গমন পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যেকার সুদীর্ঘকালীন যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায় হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। আর এটাই হচ্ছে ঐতিহাসিক পটভূমির এক বিরাট উপাদান যাকে আমরা অবশ্য ক্রুসেডের জন্য বসাতে পারি। সপ্তম শতাব্দির শেষেরদিকে আরবরা উত্তর আফ্রিকার বারবারদের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ৭১১ থেকে ৭১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আরব ও বার্বাররা পিরেনিজ পর্যন্ত স্পেন জয় করে। নবম শতকে ৮২৭ থেকে ৮৭৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে (যখন সিরাকুজের পতন হয়) উত্তর আফ্রিকার কাইরোওয়ানের আঘলাবীরা সিসিলি জয় করেন। তারা আকস্মিক আক্রমণ ও ছোট ছোট ঘাঁটি স্থাপনের মাধ্যমে ইটালীর দক্ষিণে ক্যাম্পাগনা ও আবরুয্যী পর্যন্ত এলাকায় অভিযান চালায়। স্পেনের মুসলমানরা প্রভেন্স, উত্তর ইটালী এবং এমনকি সুইজারল্যাণ্ডেও অভিযান চালায়। শত্রু জাহাজ ধ্বংস করার জন্য নিযুক্ত নৌবহরের হাতে কর্সিকা ও সার্ডিনিয়া বারবার পর্যুদস্ত হয়। কেবলমাত্র স্পেন এবং সিসিলিতেই মুসলিম সভ্যতার বিকাশ লাভ করে এবং দুটি এলাকা থেকেই এর প্রভাব ফ্রান্স ও ইটালীতে বিস্তার লাভ করে। কর্ডোভার দর্শন এবং এর মহান শিক্ষক ইবনে রুশদ (আবেররোস) প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। আরব বাগানবাড়ি (ভিল্যা), আরব ভূগোলবিদ ও আরব কবিরা নর্ম্যান রাজণ্যবর্গ ও তাদের উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের আমলে পালের্মোর শোভা বর্ধন করে। বলা হয়, ইসলামের সাময়িক অবদানের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য যে আশীর্বাদ লাভ

---

১. ১০৯৬ খৃষ্টাব্দের অবস্থার সঙ্গে খৃষ্টপূর্ব ২০১-এর অবস্থার কতিপয় সামঞ্জস্য রয়েছে। রোমানরা যখন প্রাচ্যে তৎপর হতে শুরু করে তখন তাদেরও তিনটি শক্তির মোকাবেলা করতে হয়--গ্রীস ও বসফরাস পর্যন্ত উত্তর ঈজিয়ানে ক্ষমতাসীন মেসিডোনিয়ান সাম্রাজ্য, এশিয়া মাইনরের সেলিউসিড সাম্রাজ্যের এবং মিসরের টলেমী সাম্রাজ্য। অপরদিকে মৌলিক পার্থক্যও ছিলো। রোমানরা শিক্ষাগ্রহণের এবং গ্রীক সস্কৃতির প্রত্যেকটি জিনিসের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব নিয়ে এসেছিলো। একাদশ শতকের শেষের দিকে ল্যাটিন খৃষ্টান শক্তির একটি নিজস্ব উন্নত সংস্কৃতি ছিলো। এবং মুসলমানদের কাছ থেকে তারা যতটুকু শিক্ষালাভ করেছে তা তারা নিজেদের দেশ স্পেন এবং সিসিলিতে পেয়েছে। তা ছাড়া রোমানরা এসেছিল একটি নতুন ও পৃথক জগতে। আর একাদশ শতকের ফাঙ্করা বাইযেন্টিয়ামে যাদের সাক্ষাৎ পেয়েছে তাদের উন্নতির ধারা পৃথক হলেও ঐতিহ্যগতভাবে উভয়ের মিল ছিলো। এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো যে, তারা সিরিয়া ও মিসরের মুসলমানদের কাছ থেকে যতটা শিক্ষা লাভ করেছে সম্ভবত তার চাইতে বেশি শিক্ষালাভ করেছে বাইযেন্টাইনদের কাছ থেকে।

www.waytojannah.com

করেছে তা অন্ততপক্ষে ক্রুসেডের সামনে প্রাচ্যের প্রভাবের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ।[১] কিন্তু যতটা লাভবানই হোক না কেন, অন্য একটি ধর্মবিশ্বাসের অনুসারীদের দ্বারা খৃস্টান ভূমি অধিকারকে পাশ্চাত্য সহ্য করতে পারেনি। একাদশ শতকে খৃস্টান অভিযানের আগেই পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে মুসলিম সামরিক শক্তির ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা যায়। ১০০২ খৃস্টাব্দে খলীফা আল্–মনসুরের ইন্তিকালের পর স্পেনে উত্তরাঞ্চলের লিওন, ক্যাস্টিল, অ্যারাগন ও নাভারের ছোট ছোট খৃস্টান রাজ্যগুলি তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারে ব্যাপৃত হয়। ১০৮৫ খৃস্টাব্দে ক্যাস্টিলের ষষ্ঠ আলফন্সোর হাতে টলেডোর পতন ঘটে[২] এবং ১১১৮ খৃস্টাব্দে অ্যারাগণ কর্তৃক সারাগোসা অধিকৃত হয়। একাদশ শতকের প্রথমার্ধে বাইযেন্টাইন গভর্নর ও আরব আক্রমণকারীদের বিরোধে জর্জরিত দক্ষিণ ইটালী নর্ম্যানদের অধিকারে যায়। তারা ১০৬০ ও ১০৯০ খৃস্টাব্দে মধ্য সিসিলিও জয় করেন। ১০১৬ খৃস্টাব্দের দিকে অষ্টম বেনেডিক্ট সার্ডিনিয়া অধিকারের জন্যে পিসানদের প্ররোচিত করেন। জেনোয়া ও ভেনিসের নাবিকদের আবির্ভাবের ফলে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে মুসলিম নৌবহরের তৎপরতা হ্রাস পায়। একাদশ শতকের শেষ দিকে কেবলমাত্র দক্ষিণ স্পেন এবং উত্তর আফ্রিকাই মুসলমানদের অধিকারে থাকে। দ্বাদশ শতকে সিসিলির নর্ম্যানরা তাদের উপর, এমন কি তাদের আফ্রিকার সুরক্ষিত এলাকায়ও আক্রমণ চালায়। অধিকতর সংঘবদ্ধ ও উন্নত পাশ্চাত্য তাদের নিজস্ব এলাকায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে থাকে।

এটাই ছিলো পাশ্চাত্যের ক্রান্তিকাল। কারণ এক হলেও এই আহবান এসেছে দুদিক থেকে। সেলজুক তুর্কীরা বেতনভোগী সৈনিক হিসাবে শুরু করলেও বাস্তব ক্ষেত্রে বাগদাদের খলীফাদের উপর সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। তাদের চাপে একদিকে সিরিয়ায় কায়রোর নরমপন্থী ফাতেমী খলীফাদের কাছ থেকে জেরুজালেম অধিকৃত হয় (১০৭০) এবং অন্য দিকে এশিয়া মাইনরে মানযিকার্টে বাইযেন্টাইন বাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে (১০৭১)। জেরুজালেমের প্রয়োজন ও বাইযেন্টিয়ামের প্রয়োজনীয়তা উভয়টিই পাশ্চাত্যের প্রতি জোর আহবান জানায়। প্রথম ক্রুসেড (১০৯৬–৯৯) এই দ্বৈত আহবানেরই একটি সাড়া।

পশ্চিম ইউরোপের ধর্মীয় অভ্যাস এবং সামাজিক ব্যবস্থা একযোগে এই সাড়া তৈরির জন্য কাজ করতে থাকে। পাপ স্খালনের জন্য প্রায়শ্চিত্তমূলক তীর্থ যাত্রা প্রাচীনকাল থেকে পাশ্চাত্যের একটি রীতি ছিলো। জেরুজালেম সবচাইতে পবিত্র এবং সবচাইতে দূরবর্তী পবিত্র স্থান। তাই এতে দ্বিগুণ পুণ্য সঞ্চয় হয়। জেরুজালেমে এ ধরনের তীর্থযাত্রা বহু

১. প্রফেসর বেকার, কেম্ব্রিজ মিডিয়েভ্যাল হিস্টরি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯০।
২. ১০৮৬ খৃস্টাব্দে আলমোরাভিডদের নতুন অভিযানের ফলে তাঁর অগ্রগতি গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়, কিন্তু এই বাধা সাময়িক বলে প্রমাণিত হয়।

www.waytojannah.com

দিনের লক্ষ্য ছিলো। এই লক্ষ্য বর্তমানে হুমকির সম্মুখীন, কাজেই এই হুমকি অবশ্যই অপসারিত করতে হবে। অতএব যাত্রাপথ নিরাপদ করে ভবিষ্যৎ তীর্থযাত্রার লক্ষ্যস্থলকে মুক্ত করার জন্য ক্রুসেড এক বিরাট সশস্ত্র তীর্থযাত্রায় রূপায়িত হয়। পরবর্তীকালে যে তীর্থ যাত্রী নাইটরা (যোদ্ধা) জেরুজালেম রক্ষা করার জন্য বছরে বছরে এখানে আগমন করতেন, তারাই এটি প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রুসেডের অপর একটি সমতুল্য কারণ ছিলো যাজক সম্প্রদায়ের প্রভাবে সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থা। একাদশ শতকের সূচনা থেকে ব্যক্তিগত যুদ্ধের *(গুয়েররা)* জন্য একটি সামরিক সম্প্রদায়ের যুদ্ধপ্রিয়তা ধর্মসভা (সিনড) ও পোপদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমে তারা *প্যাক্স ও টিউগা ডী* প্রবর্তন করে এই প্রবণতা প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। পরবর্তীকালে তারা এই মনোভাবকে 'ন্যায়' ও 'পবিত্র' যুদ্ধের দিকে পরিচালিত করার প্রয়াস পান। এই উদ্দেশ্যে তারা আংশিকভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য দীক্ষা অনুষ্ঠানে নাইটের অস্ত্র উৎসর্গ করেন (এতদ্বারা একটি নতুন শিভল্‌রি সৃষ্টিতে সহায়তা করা হয়), এবং আংশিকভাবে ১০৯৫ খৃষ্টাব্দে ক্লারমন্টে ক্রুসেড প্রচার করতে গিয়ে দ্বিতীয় আরবান যেভাবে দাবি করেন, সেভাবে ভ্রাতৃঘাতী ব্যক্তিগত যুদ্ধকে ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে 'পবিত্র যুদ্ধের' দিকে পরিচালিত করার দাবি জানান। এমনিভাবে আভ্যন্তরীণ শান্তির একটি উদ্দেশ্যকে একটি 'পবিত্র যুদ্ধের' উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং একইভাবে ধর্মসভাগুলি উপর্যুপরি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে খৃষ্টান ক্রুসেডের উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত করে ফরমান জারি করে।

এ পর্যন্ত ক্রুসেডের দুটি দিক প্রতিভাত হয় 'তীর্থযাত্রীর অগ্রগতি' (পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস) এবং 'পবিত্র যুদ্ধ' কিন্তু এটি এর বাইরেও অন্য কিছু। প্রথমত এটি ছিলো সামন্ততান্ত্রিক অতি জনশক্তির একটি সমাধান। একটি সামন্ত অভিজাত পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তানদের স্বদেশে কোন ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ছিলো না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সিসিলির একটি নর্ম্যান সাম্রাজ্য এবং জেরুজালেমের একটি ল্যাটিন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত না হলে 'ট্যানক্রিড ডি' হাউটিভিলের[১] বংশধরদের অনেকের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়তো। এই রাজ্যগুলি ছিলো সামন্ত উপনিবেশ, যা সামন্ত দেশত্যাগীদের জন্য সুযোগের সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়ত ক্রুসেড ইটালীর বর্ধনশীল বন্দরগুলির বাণিজ্যিক উচ্চাভিলাষ পূরণের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে। এশীয় বাণিজ্য পথের আমদানী-রপ্তানী কেন্দ্র হিসাবে অবস্থিত সিরীয় উপকূল ভেনিসিয়ান, পিসান ও জেনোয়ান প্রতিষ্ঠানগুলির অবদান ল্যাটিন বসতি স্থাপনের ইতিহাসে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইটালীয় জাহাজগুলো প্রথম ক্রুসেডের সহগামী হয়, এমনকি এর অগ্রগতিতে সাহায্য করে। যে অবরোধ যুদ্ধের পরিণতিতে জেরুজালেম রাজ্যের সৃষ্টি হয়, সেখানে ইটালীয় শহরগুলির সাহায্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিলো। যেসব তীর্থযাত্রী বছরে বছরে আগমন করে, ইটালীয় জাহাজগুলি তাদের বহন করে। এমনিভাবে ক্রুসেডের আধ্যাত্মিক প্রেরণার সঙ্গে ভালোমন্দ উভয় রকমের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য যুক্ত হয়।

---

১. প্রথম ক্রুসেডে অংশগ্রহণকারী নর্ম্যান নেতা। -অনুবাদক।

www.waytojannah.com

চিত্র-৮. ফোর্ডিংটনে নর্মান টিম্প্যানাম কর্তৃক নির্মিত এন্টিওকের পবিত্র ধর্মযুদ্ধে সেন্ট জর্জের হস্তক্ষেপ-এর প্রতিকৃতি

www.waytojannah.com

এসব বিবিধ কারণে এবং সে সঙ্গে সিরিয়ায় মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধের সুবর্ণ সুযোগে প্রথম বাল্ডউইন ও দ্বিতীয় বাল্ডউইনের পক্ষে ১১০০ থেকে ১১৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে জেরুজালেম রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও সংগঠিত করা সম্ভব হয়। কিন্তু রাজ্যটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। খৃষ্টানদের চাপের মুখে মুসলমানদের মধ্যে একটি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রস্থল ছিলো মসুল। এখানে প্রথম ক্রুসেড আরম্ভ হওয়ার আগেই যে সেলজুক সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যায় তার ধ্বংসাবশেষ থেকে ১১২৭ খৃষ্টাব্দের দিকে আতাবেগ জঙ্গী নামে এক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে। তিনি তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, এবং ১১৪৪ খৃষ্টাব্দে ল্যাটিনদের কাছ থেকে এডেসা অধিকার করে নেন। এটি ল্যাটিনদের জন্য প্রথম গুরুতর বিপর্যয়। তার উত্তরাধিকারী নূরুদ্দীন (১১৪৬–৭৪) ইতিমধ্যেই ক্রুসেডের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। তাঁর রাজত্বকালে তার সহচর কুর্দ সিরকুহ ও সিরকুহ্‌র ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহ্‌উদ্দীন মিসরকে তার অধিকারভুক্ত করেন। মসুল ও কায়রো উভয়দিক থেকে বিপন্ন হয়ে এবং নিজেদের ক্রুসেডের অবসন্ন আবেগের মুকাবিলায় নতুন জিহাদী প্রেরণার মুখে রাজ্যের ল্যাটিনরা নাস্তানাবুদ হয়ে যায়। ১১৮৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে হিট্টাইনের যুদ্ধে তারা পরাজিত হয়। একই বছরের অক্টোবরে জেরুজালেম শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ করে। সালাহ্‌উদ্দীনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় এবং যে আল–আকসা মসজিদে আল্লাহ্ একরাতে তার বান্দা মুহাম্মদ (সা)–কে ভ্রমণ করান তিনি তা মুক্ত করেন।

তৃতীয় ক্রুসেড সাল্যাহ্‌উদ্দীনের অপ্রতিরোধ্য গতি রোধ করতে ব্যর্থ হয়। ল্যাটিনরা তখনো কিছু কালের জন্য উত্তর সিরিয়ার এন্টিয়ক ও ত্রিপোলির ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি তাদের অধিকারে রাখে। সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক অস্ত্রবলে না হলেও তাঁর কূটনীতির সাহায্যে স্বল্পকালের জন্য (১২২৭–৪৪) জেরুজালেম নগরী পুনরুদ্ধারে সক্ষম হন। কিন্তু জেরুজালেম রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ত্রয়োদশ শতকে আগাগোড়াই ক্রুসেড যুদ্ধ হয়, কিন্তু এসব যুদ্ধ যেমন অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলা হয়েছে, 'ফিলিস্তিন ছাড়া সর্বত্র' সংঘটিত হয়। নিজেদের লক্ষ্য সম্পর্কে তারা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তারা অনিশ্চিতভাবে কনস্ট্যান্টিনোপল (১২০২–৪) থেকে মিসর (১২১৮–২১ ও ১২৪৯–৫০) এবং সেখান থেকে এমনকি তিউনিসে (১২৭০) ঘুরে বেড়ায়। একটি ক্রুসেড সফল হয়েছিলো এবং তাও কেবলমাত্র খৃষ্টান শহর কনস্টান্টিনোপল দখলে এবং কিছুকালের জন্য (১২০৪–৬১) বাইযেন্টাইন সাম্রাজ্যকে ফরাসী ও ভেনিসীয়দের মধ্যে বিভক্ত করার ব্যাপারে সফলতা অর্জন করে। কনস্টান্টিনোপল ক্রুসেডকে প্ররোচিত করলেও তাদের দ্বারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; এবং এটি ১২৬১ থেকে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দুই শতাব্দির জন্য পুনরায় ক্ষীণভাবে পুনরুজ্জীবিত হলেও এরপর ফরাসীদের মোরিয়ায় এবং ভেনিসীয়দের ক্রীট ও দ্বীপাঞ্চলের অন্যান্য দ্বীপে পরিত্যাগ করে। প্রথম ক্রুসেড ছিলো ফরাসী সামন্ততন্ত্র ও ইটালীয় শহরগুলির নৌশক্তির

www.waytojannah.com

একটি যৌথ জোট। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে ফরাসী সামন্ততন্ত্র গ্রীসে গতি পরিবর্তন করে এবং ভেনেসীয় এবং জেনোয়ীরা ক্রিমিয়া এবং আযোভ সাগরে তাদের প্রাচ্য বাণিজ্যের নতুন আমদানী–রপ্তানী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। মনে হয়, অপ্রয়োজনীয় বলে ফিলিস্তিন পরিত্যক্ত হয় এবং ক্ষমতার ভার–কেন্দ্র প্রাচ্য সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষে স্থানান্তরিত হয়।

কিন্তু ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগের আগে একটি নতুন আশার আলো দেখা দেয় এবং এশীয় ঘটনাবলীর একটি নতুন অবস্থান্তর পাশ্চাত্যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা হিসাবে অভিনন্দিত হয়। চেঙ্গিস খান কর্তৃক খৃষ্টানও নয় মুসলমানও নয় এরূপ এক বিশাল মঙ্গোল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি পূর্বে পিকিং থেকে পশ্চিমে নিপার ও ইউফ্রেটিশ নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। যে চারটি খানশাসিত এলাকায় এটি বিভক্ত হয় তার প্রত্যেকটি এক একটি সাম্রাজ্যের মর্যাদাসম্পন্ন ছিলো। এর মধ্যে বিশেষভাবে তাব্রিযে রাজধানী সমন্বিত পারসিক খানশাসিত এলাকা পূর্ব ভূমধ্যসাগরের এতোটা নিককবর্তী ছিলো যে, এই অঞ্চলের ঘটনাবলীর সঙ্গে তাকে সংশ্লিষ্ট করা যেতো। মঙ্গোলরা ছিলো সহনশীল। তাদের শাসনাধীনে নেস্টোরিয়ান খৃষ্টানরা সমৃদ্ধি লাভ করে। তাহলে কেন তাদের খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করা যাবে না, এবং কেন আগের চেয়ে বৃহত্তর পরিসরে ক্রুসেডের মূল উদ্দেশ্য আরোপিত করা যাবে না? দূতদের গমনাগমন চলতে থাকে। চতুর্থ ইনোসেন্ট ১২৪৫ খৃষ্টাব্দে জন ডি পিয়ান ক্যার্পাইনকে এবং সেন্ট লুই ১২৫০ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম অব রুব্রুকুইসকে দুটি বিরাট মিশনে প্রেরণ করেন। এসব মিশন অত্যন্ত কর্মতৎপর ছিলো এবং সুদূর চীনে পর্যন্ত গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এর সবই ছিলো স্বপ্ন। ফিলিস্তিনের জন্য কোন সাহায্য আসেনি। কিছুকালের জন্য এন্টিয়ক, ত্রিপোলি এবং ল্যাটিনদের অধিকারভুক্ত পুরাতন জেরুজালেম রাজ্যের উপকূলবর্তী কয়েকটি এলাকা বিপদমুক্ত ছিলো। সালাহ্উদ্দীনের উত্তরাধিকারীরা পারস্পরিক বিরোধে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং এই বিরোধের ফলে ল্যাটিনরা বেঁচে যায়। কিন্তু মিসরে মামলুক সুলতানদের আবির্ভাবের ফলে একটি নতুন ও সামরিক মুসলিম শক্তির উদ্ভব হয়। ১২৫০ খৃষ্টাব্দে তারা কায়রোর মস্নদ অধিকার করে। পারস্যের মঙ্গোল খান শাসিত এলাকার অধিপতি একবার সিরিয়ায় পদার্পণের চেষ্টা করলে এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুলতান বাইবার্স সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। তিনি দামেস্কে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন (১২৬০) এবং এন্টিয়ক রাজ্যটিকে পর্যুদস্ত করে তাঁর অধিকারভুক্ত করেন (১২৬৮)। তার উত্তরাধিকারী কালাউন ত্রিপোলি অধিকার করেন (১২৮৯) এবং তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী খলীল সিরীয় উপকূলে ল্যাটিনদের সর্বশেষ ঘাঁটি একার দখল করেন (১২৯১)। ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে এশিয়ার মূল ভূখণ্ড থেকে ল্যাটিন খৃষ্টান শক্তি সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হয়।

এই শক্তি বিভিন্ন দ্বীপে টিকে থাকে। তৃতীয় ক্রুসেডের সময় প্রথম রিচার্ড কর্তৃক গ্রীকদের কাছ থেকে অধিকৃত সাইপ্রাস–এর লুসিগনান রাজাদের অধীনে ফিলিস্তিনের

www.waytojannah.com

Contents

ল্যাটিন সামন্তরাজাদের আশ্রয়স্থল হয়। এখানেই জেরুজালেমের অ্যাসিযদের সামন্ত আইন–বিজ্ঞান অব্যাহত থাকে এবং বিধিবদ্ধ হয়। সাইপ্রাস রাজ্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত টিকে থাকে। ঐ সময় এটি ভেনিসের অধিকারে যায়।[১] একইভাবে একারের চূড়ান্ত পতনের পর নাইটস হসপিট্যালারগণ[২] ১৩০৯ খৃষ্টাব্দে রোড্‌স্ দ্বীপ অধিকার করেন। তারা ১৫২৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে অবস্থান করেন এবং তারপর পশ্চিম দিকে মাল্টায় যান। এই দুটি দ্বীপেই মধ্যযুগে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে ল্যাটিনদের কতিপয় অপরূপ কীর্তিচিহ্ন এখনো টিকে আছে।

সাইপ্রাস ও রোড্‌স দ্বীপে যখন এভাবে সামন্ত শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ভেনিসীয়রা চতুর্থ ক্রুসেডের সুযোগে অর্জিত সম্পদ হিসাবে ক্রিট এবং উত্তরে আরো কতিপয় দ্বীপ দখল করে। জেনোয়ীরা ১২৬১ খৃষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলের সিংহাসন পুনরুদ্ধারে প্যালিওলগিকে সাহায্য করে এবং তার প্রতিদান হিসাবে তাঁরা কেবল পেরার উপকণ্ঠই লাভ করেনি লেস্‌বস এবং চিওস্ দ্বীপও তাদের অধিকারভুক্ত করে। এমনিভাবে মধ্যযুগের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত ল্যাটিন খৃষ্টান শক্তি পূর্ব ভূমধ্যসাগরে তাদের একটি অধিকার অব্যাহত রাখে। এই অধিকার সংশ্লিষ্ট দ্বীপগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও এবং মুসলিম শক্তির কাছ থেকে জয় না করে বাইযেন্টাইন সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও তারা তখনো নিজেদের বিচ্ছিন্ন ঘাঁটি থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখে। উসমানীয় তুর্কীদের বিজয়ের ফলে পূর্ব ভূমধ্যসাগর একটি *মেয়ার ক্লসেম*[৩] হওয়ার পরেই তাঁরা তাদের এই সংগ্রাম ত্যাগ করে। বস্তুত ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দের পরেই ক্যাণ্ডিয়ার পতন হয় এবং ভেনিস লেভান্টে তার সর্বশেষ বৃহৎ দুর্গ হারায়।

২

পূর্ব ভূমধ্যসাগরে পাশ্চাত্য খৃষ্টান শক্তির সুদীর্ঘ কালের দুঃসাহসিক অভিযান এবং প্রাচ্যের মুসলমানদের সঙ্গে তাদের সুদীর্ঘ যোগাযোগের ফলাফল কি? প্রশ্নটি বাস্তবিকই দ্বিবিধ। প্রশ্নটি প্রথমত ক্রুসেডকে সহজভাবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে যোগাযোগের একটি ধরন হিসাবে বিবেচনা করা হলে তার ফলাফল সম্পর্কে পাশ্চাত্যের উপর প্রাচ্য থেকে লব্ধ বাস্তব বিষয় ও আবেগের প্রভাব সংক্রান্ত প্রশ্ন। দ্বিতীয়ত ক্রুসেডকে পাশ্চাত্য সমাজের আওতায় তৎপরতামূলক একটি সাধারণ আন্দোলন হিসাবে বিবেচনা করা হলে তার ফলাফল সম্পর্কে যে আন্দোলন একটি সমাজ থেকে উদ্ভূত হয় এবং তার উপর গভীর

---

১. স্টারস এর লেকচার্স অন মেডিয়ীভ্যাল এণ্ড মডার্ন হিস্টরির সাইপ্রাস সংক্রান্ত দুটি ভাষণ দ্রষ্টব্য।
২. মধ্যযুগে জেরুজালেমে রুগ্ন ও অভাবগ্রস্ত লোকের সেবার উদ্দেশ্যে গঠিত একটি সামরিক ধর্মীয় সম্প্রদায়। –অনুবাদক।
৩. এককভাবে কোন জাতির আওতাধীন একটি সমুদ্র যা অন্য কারো জন্যে উন্মুক্ত নয়।–অনুবাদক

www.waytojannah.com

Contents

প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে সেই সমাজের উপর তার প্রভাব সংক্রান্ত প্রশ্ন। ইতিহাসবিদরা এই দুটি প্রশ্নকে প্রায়ই জড়িয়ে ফেলেছেন, এবং এই জড়ানোর ফলে যে অতিরঞ্জনের সৃষ্টি হয়েছে, তা পার্থক্য সৃষ্টির মাধ্যমে এড়ানো যেতো।

এ ধরনের অতিরঞ্জনের একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা ক্রুসেড সংক্রান্ত হেনি–অ্যাম রাইনের *আলগেমিন কুলটুর গ্যাচিচ্‌টে* থেকে অংশ বিশেষ তুলে ধরতে পারি।[১] এখানে আমরা ক্রুসেডের প্রেক্ষিতে মধ্যযুগের সামগ্রিক ঘটনা দেখতে পাই। ধর্মীয় ক্ষেত্রে ক্রুসেড পোপতন্ত্রের মর্যাদা হ্রাস করেছে, সন্ন্যাসজীবনের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে এবং ধর্মদ্রোহিতার বিকাশকে উৎসাহিত করেছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অধিকতর সমতা সৃষ্টি হয়েছে, একটি স্বাধীন কৃষক সমাজ ও কারুশিল্পী সংগঠনের বিকাশ ঘটেছে এবং শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধিত হয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমানভাবে সরকারী ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় এবং লিখিত আইন ও বিচার বিভাগীয় প্রশাসন প্রবর্তনের ফলে এস্টেট্‌স্[২] (সামাজিক শ্রেণী) ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। বিশাল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ক্রুসেডের আরবদের সংস্পর্শ লাভের পর দর্শন শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আবির্ভাব ঘটে। এমনকি আধ্যাত্মিকতা একটি বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য লাভ করে। প্রাচীন ভাষাসমূহের গবেষণা ও পর্যালোচনার বিস্তৃতি ও বিকাশ ঘটে। ইতিহাস ও ভূগোল বিজ্ঞান নতুন প্রাণশক্তি পায়। মাতৃভাষায় কাব্যচর্চার উদ্ভব হয়। গথিক স্থাপত্য রোমানেস্কের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করে এবং ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কনে সূক্ষ্ম রুচিবোধের সৃষ্টি হয়।

এমনকি হ্যান্‌স প্রুট্‌সের *কুলটুর গ্যাচিচ্‌টে ডার ক্রিউযগ*[৩] গ্রন্থেও একই বিভ্রান্তি, একই অতিরঞ্জন এবং *পোস্ট হক, আর্গো প্রোপটার হক*[৪]–এর ভ্রমাত্মক ধারণা দেখা যায়। এটি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ রচনা হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের অভাব রয়েছে। প্রথমত, প্রুট্‌স্‌কে এজন্যেই লিখতে হয়েছে, যেন ১১০০ থেকে ১৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দুই শতকে ইউরোপে যা ঘটেছে ক্রুসেডই ছিলো তার একটি কারণ, যেন ঐ দুই শত বছরের সবগুলি কজাই–কজেন্টেস–রেনেসাঁ যুগের, আবিষ্কার যুগের ও সংস্কার যুগের নতুন ইউরোপ সৃষ্টির কারণসমূহ—ঐ একটি মাত্র কারণের মধ্যে সম্পৃক্ত ও নিহিত। প্রকৃতপক্ষে ক্রুসেড ছিলো বহু কারণের মধ্যে একটি এবং আমরা যখন এসব কারণের একটি একক ও সার্বজনীন বিশ্লেষণ প্রদান করি তখনি *পোস্ট হক, আর্গো প্রোপটার হক*–এর ভ্রমাত্মক যুক্তির সঙ্গে

---

১. ৩য় খণ্ড, কুলটুরগ্যাচিচ্‌টে ভেসমিটেলটার্স, বুক ৭, বিশেষত পৃ. ৪৯৮–৫০০।

২. সামন্ত যুগে বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন তিনটি শ্রেণী, যথা–যাজক, অভিজাত ও বুর্জোয়া শ্রেণী। পরবর্তীকালে সাংবাদিকতা বা সাংবাদিকরা চতুর্থ শ্রেণী হিসাবে গণ্য হয়।–অনুবাদক

৩. বার্লিন, ১৮৮৩, পাঁচ খণ্ডে যার মধ্যে চতুর্থ খণ্ড (অর্থনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে) ও পঞ্চম খণ্ড (সংস্কৃতির ইতিহাসে ক্রুসেডের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে) বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

৪. এই ল্যাটিন কথাটির অর্থ হচ্ছে, এর পরে, কাজেই এর ফলে ঃ *তর্কশাস্ত্রে* একটি ঘটনার পরে আর একটি ঘটনা ঘটলে সেটি অবশ্যই প্রথমোক্তটির ফল–এরূপ ভ্রমাত্মক যুক্তি। –অনুবাদক

www.waytojannah.com

'একক কারণের' ভ্রমাত্মক ধারণা যুক্ত হয়। দ্বিতীয়ত, প্রুট্স্ স্বীকার করেন যে, স্পেন এবং সিসিলি আরব্য প্রভাবের গুরুত্বপূর্ণ বাহন ছিলো, কিন্তু পরক্ষণেই তিনি তার এই স্বীকৃতি বেমালুম ভুলে গিয়ে বলেন যে, এই প্রভাবের ক্ষেত্রে ফিলিস্তিনই সবচাইতে বড়ো এবং প্রায় একমাত্র কারণ। তিনি লিখেছেন, সাংস্কৃতিক বিকাশের অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা ফ্রান্‌ক্‌দের (ফিলিস্তিনের) মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অবদানের প্রথম স্থায়ী সম্পর্ক দেখতে পাই, এবং এই মিশ্রিত জাতিই ..... যাকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমঝোতা সৃষ্টির অগ্রনায়ক হিসাবে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।[১] এখানেও আমরা 'একক কারণের' ভ্রমাত্মক ধারণা লক্ষ্য না করে পারি না। এবং এই ভ্রমাত্মক ধারণা আরো বড়ো হয়ে দেখা দেয় যখন আমরা দেখতে পাই যে, অপর কারণ (স্পেন ও সিসিলিতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের উপাদানগুলির সংমিশ্রণ) এর চাইতে অনেক প্রবল ও গভীর। শেষত, প্রুট্সের লেখা পড়তে গিয়ে এরূপ ধারণা পরিহার করা অসম্ভব যে, তিনি প্রায় ১১০০ খৃষ্টাব্দের দিকে এক পক্ষে ল্যাটিন পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিকে ছোট করে দেখিয়েছেন এবং অন্য পক্ষে আরব্য প্রাচ্যের সংস্কৃতিকে অতিরঞ্জিত করেছেন। এরূপ করার উদ্দেশ্য ছিলো ক্রুসেডের প্রভাব প্রদর্শনের জন্য একটি বৃহত্তর পরিসর সৃষ্টি করা এবং আমরা সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে যতোটা গ্রহণ করতে পারি তার চাইতে বেশি জিনিসের জন্য একটি খালি মার্কেট দেখানো। যে পাশ্চাত্য ইউরোপ তখন গ্রেগরিয়ান যুগের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিলো—যে যুগ আবেলার্ডের[২] পর্যায়ে চিন্তাধারার বিকাশ, ফরাসী কম্যুনের উদ্ভব, নর্ম্যান আন্দোলন ও নর্ম্যান স্থাপত্যের প্রাণশক্তি এবং একাদশ শতকের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত শিল্প ও বাণিজ্য বিপ্লব অবলোকন করে—সে অবস্থায় তা *টেবুলারাসা*[৩] ছিলো না। তেমনি ১১০০ খৃষ্টাব্দের দিকে আরব সংস্কৃতিও সমৃদ্ধির চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিলো না। বরং আমরা দেখতে পাবো যে, ক্রুসেডের যখন সূচনা হয় তখন এর সূর্য ছিলো অস্তগামী। আমাদের সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, *কুলটুরগ্যাচিচ্‌টেতে* যাই থাকুক না কেন এটি ছিলো একটি নতুন ও বর্ধিষ্ণু পাশ্চাত্য যা ম্রিয়মাণ প্রাচ্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ক্রুসেড একটি যাদুকরি শব্দ এবং যাদুকরি শব্দের এমন চুম্বক শক্তি থাকতে পারে যা বহু অপ্রাসঙ্গিক বিষয়কে তার প্রভাবের আওতায় আকৃষ্ট করে। তেমনি ক্রুসেডের সময় পশ্চিম ইউরোপে যা ঘটেছে তার প্রত্যেকটি ক্রুসেডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলো না এবং তার অনেক কিছু ক্রুসেডের দরুন ঘটেনি। এমনকি কোন ক্রুসেড না হলেও একাদশ শতকের শেষার্ধে যে পাশ্চাত্য খৃষ্টান জগতে শহর জীবন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত বিকাশ হচ্ছিলো

---

১. পৃ. ৪৫২, ন্যায়বিচারের খাতিরে একথা অবশ্যি বলা দরকার যে, প্রুট্স্ স্বীকার করেন যে, 'সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক জীবনের ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ পৃথক পদ্ধতির উদ্ভব হয়।'

২. পিয়ের আবেলার্ড (১০৭৯-১১৪২), ফরাসী পণ্ডিত, দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ। -অনুবাদক

৩. ল্যাটিন কথাটির আক্ষরিক অর্থ, খালি টেবলেট; পরিষ্কার মন, অভিজ্ঞতার দ্বারা ধারণা সৃষ্টির আগের মন।-অনুবাদক

www.waytojannah.com

Contents

সেই খৃস্টান শক্তি সম্ভবত তার ব্যবসা-বাণিজ্যকে পূর্ব ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতো। এটি হয়তো কৃষ্ণ সাগরের উত্তর উপকূলে প্রাচ্যের স্থল বাণিজ্য পথের শেষ সীমায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতো। এখানে এটি কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরে ও আরব সাগরের পশ্চিমে বোখারা এবং সমরকন্দগামী বাণিজ্য পথের সংস্পর্শে আসতে পারতো। কিংবা পুনরায় সিরীয় বন্দরগুলিতে আসতে পারতো, সেখান থেকে পারস্য ও পারস্য উপসাগরে পৌঁছে যে সমুদ্রপথ ভারত হয়ে চীন অভিমুখে গিয়েছে তার সংস্পর্শে আসতে পারতো। ক্রুসেড যা করেছে তা ছিলো একটি সামন্ততান্ত্রিক সিরীয় রাষ্ট্র-যা আংশিকভাবে সামন্ত রাজারা এবং আংশিকভাবে সামন্ত চরিত্রের টেম্পলার[১] ও হসপিটালারদের কোম্পানীগুলি অধিকার করে—সেখানে কিছু কালের জন্য বাণিজ্যিক প্রেরণা সংশ্লিষ্ট হয় এবং এতদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের 'কোয়ার্টারের' সৃষ্টি হয়। উপকূলবর্তী এসব কোয়ার্টার ভেনেসীয়, জেনোয়ী ও পিসানদের অধিকারে ছিলো। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, এই বাণিজ্যিক প্রেরণা একান্তভাবে সিরীয় কোয়ার্টারগুলির সঙ্গে সংযুক্ত ছিলো না, কনস্টান্টিনোপল এবং কৃষ্ণ সাগরের সঙ্গেও এর যোগাযোগ ছিলো। চতুর্থ ক্রুসেডের পর এবং ত্রয়োদশ শতকে এসব যোগাযোগ আরো গভীর এবং বহুমুখী হয়। কিন্তু যে কোনভাবেই হোক না কেন প্রথম ও তৃতীয় ক্রুসেডের মধ্যবর্তী দ্বাদশ শতকে সিরিয়া ছিলো পূর্ব ভূমধ্যসাগরে খৃস্ট ধর্ম ও ইসলামের মধ্যেকার সম্পর্কের বিশেষ কেন্দ্রবিন্দু। এখানে ইসলাম আংশিকভাবে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপর তার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির এবং পাশ্চাত্যের উপর সেই প্রতিক্রিয়া প্রতিফলনের মাধ্যমে, এবং আংশিকভাবে বাণিজ্য পথে প্রবেশের একটি পদ্ধতির মাধ্যমে পাশ্চাত্য খৃস্টান শক্তিকে প্রভাবিত করতে পারে। এই ক্রিয়াটিই আমাদের পর্যালোচনা করতে হবে।

কিন্তু আমাদের একথাও স্মরণ রাখতে এবং পুনরাবৃত্তি করতে হবে যে, ইসলাম স্পেন এবং সিসিলিতেও প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানে থেকেও পাশ্চাত্যকে প্রভাবিত করতে পারে। দুটি ধারা একযোগে ক্রিয়াশীল হয়। আমরা প্রত্যেকটি ধারাকে সঠিক ও পৃথকভাবে পরিমাপ করতে না পারলেও এরূপ ধারণা করতে পারি যে, ইসলাম তার মসুল, বাগদাদ ও কায়রোর ভিত্তি ভূমির চাইতে স্পেন ও সিসিলির ভিত্তিভূমি থেকে পাশ্চাত্য খৃস্টান জগতের উপর অনেক গভীরতর প্রভাব সৃষ্টি করে। এই ধারণার পিছনে দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে, আমরা সিসিলিতে ২য় রজার ও ২য় ফ্রেডারিকের আমলে একটি সংমিশ্রিত সংস্কৃতির যে গভীর প্রভাব দেখতে পাই সিরিয়ায় তা কখনো ঘটেনি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের খৃস্টানরা যেভাবে তাদের গভীর সংশ্লিষ্টতা থেকে কর্ডোভা ও মুসলিম

---

১. তীর্থযাত্রী ও যীশু খৃস্টের সমাধিগৃহ রক্ষার জন্য ১১১৮ খৃস্টাব্দে জেরুজালেমে ক্রুসেডারগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি ধর্মীয় সামাজিক সম্প্রদায়। -অনুবাদক

www.waytojannah.com

স্পেনের সাংস্কৃতিক সম্পদ আহরণে সক্ষম হয় সিরিয়ার ল্যাটিনরা সেভাবে তা আহরণ করতে পারেনি।

একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে যে, জেরুজালেমের ল্যাটিন সাম্রাজ্যে সংস্কৃতির কোন সংমিশ্রণ ঘটেনি কিংবা কোন প্রকারের সংস্কৃতিরই তেমন বিকাশ হয়নি। সিসিলিতে বিভিন্ন জাতির –গ্রীক, নর্ম্যান, লম্বার্ড এবং আরব বার্‌বার–সংমিশ্রণে একটি উল্লেখযোগ্য মিশ্র সভ্যতার উদ্ভব হয়। নর্ম্যান রাজাদের দরবারে আমরা কেবল আরব ভূগোলবিদ এবং কবিদেরই উৎসাহিত হতে দেখি না, একজন রাজসচিবকে (চ্যান্সেলর) ১ম উইলিয়ামের জন্য প্লেটোর *ফাইডো* এবং *মেনো*, এরিস্টটলের *মিটিওরলজিকার* অংশবিশেষ এবং ডায়োজেনিস লায়েরটিয়াসের রচনা অনুবাদ করতেও দেখি। দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের দরবার আরো বিখ্যাত ছিলো। দাঁতের *ডি ভালগারী এলোকিওর* বর্ণনা অনুযায়ী এখানে ইটালীয় কাব্য চর্চার সূচনা হয়। এখানে রাজা নিজের ব্যবহারের জন্য এরিস্টটলীয় দর্শনের বিশ্লেষণমূলক জটিল প্রশ্নাবলী (কোয়েশনস সিসিলিয়ানে) সাজিয়ে নিতে পারতেন বা সাজিয়ে নিয়েছেন। আরবী পাণ্ডুলিপি আকারে এর প্রমাণ এখনো বড্‌লিয়ান লাইব্রেরিতে রয়েছে। জেরুজালেমের ল্যাটিন সাম্রাজ্য ছিলো একটি রুক্ষ সাময়িক বসতি। এখানে সভ্যতার কোন অবদান সৃষ্টির না ছিলো প্রেরণা, না ছিলো সময়, এখানে একটি বিদেশী বাহিনী দুর্গ ও ছাউনিতে অবস্থান করতো। এরা সিরীয় গ্রামাঞ্চলের ভূমি কর্ষণকারী কৃষকদের কিংবা যেসব কারুশিল্পী বর্তমানের ন্যায় তখনো শহরাঞ্চলে গালিচা তৈরী, মৃৎপাত্র তৈরী এবং স্বর্ণকারের কাজ করতো তাদের কারো সংস্পর্শে আসেনি। ল্যাটিন ভাষীরা একটি সঙ্কীর্ণ উপকূলবর্তী অঞ্চলে হালকাভাবে ছড়িয়ে ছিলো। বিরাট মুসলিম শক্তির পটভূমিতে এই অঞ্চলের প্রতিরক্ষায় তাদের ব্যস্ত থাকতে হতো। এবং যদিও তারা অনুভব করতো যে, তারা তাদের ধর্মবিশ্বাসের পুণ্যভূমিতে এবং গোলাকার পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে *(আমবিলিকাসটিরে)* বাস করছে, তথাপি একথা সত্য যে, তারা মধ্যযুগীয় সভ্যতার কেন্দ্রস্থল রোম ও প্যারিস থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলো।

তাদের আকর্ষণ করার ক্ষমতা থাকলেও (যদিও তা করার জন্য তাদের সময় ছিলো অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং অবস্থান ছিলো অত্যন্ত বিপজ্জনক) তারা আকর্ষণ করতে পারে এমন কোন মুসলিম সভ্যতা আশেপাশে ছিলো না। পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে আরব্য স্পেনের সংস্কৃতি তাদের চোখের সামনে ছিলো। এখানে আইনশাস্ত্রবিদ, চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিক ইবনে রুশ্‌দ দ্বাদশ শতকের সমাপ্তি পর্যন্ত তার জ্ঞান বিতরণ অব্যাহত রাখেন। এখানে ইহুদীরা আরবী দর্শনের সংস্পর্শে আসে, এবং এর প্রভাবে মাইমোনেডিয়[১] ওল্ড টেস্ট্যামেন্টের সঙ্গে এরিস্টটলের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেন। এবং এখানে ১২০০ খৃস্টাব্দের দিকে

---

১. স্পেনীয় রাব্বি, ধর্মতত্ত্ববিদ ও দার্শনিক (১১৩৫–১২০৪); তাঁকে মোসেস বেন মাইমনও বলা হতো।–অনুবাদক

www.waytojannah.com

পাশ্চাত্যের ল্যাটিন খৃষ্টান সম্প্রদায় এরিস্টটল সম্পর্কে এর আগে বোইথিয়াসের[১] *অর্গ্যানন* অনুবাদের একমাত্র সূত্র থেকে যতটুকু জানতেন তার চাইতে অনেক গভীর জ্ঞান লাভ করেন। টলেডো বিজয়ের পর স্পেনীয়রা এর যে মসজিদ গ্রন্থাগার লাভ করেন তা পণ্ডিতদের জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এবং স্পেনের আরব্য এরিস্টটল ত্রয়োদশ শতকের জ্ঞান চর্চার অন্যতম সূত্র ছিলো।[২] এখানেই শেষ নয়। পিরেনিজের দক্ষিণে সীমান্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ কাব্যের অন্যতম বিষয়বস্তু হয়। ইংরেজ ও স্কটদের সীমান্ত যুদ্ধ যেভাবে আমাদের নিজস্ব সীমান্ত গাথা সাহিত্যের জন্ম দেয়, কিংবা গ্রীক ও তুর্কীদের মধ্যে টৌরাসের যুদ্ধ যেভাবে বাইযেন্টাইন *চ্যান্‌সন্‌স ডি গেস্টের* সৃষ্টি করে, তেমনি স্পেনে খৃষ্টান ও পেনিস[৩] এর মধ্যকার যুদ্ধ-বিগ্রহ *সং অব রোল্যাণ্ড* ও সিড ক্যাম্পিডোর-এর রূপকথার বিষয়বস্তু হয়। প্রাচ্যের দৃশ্য ছিলো অন্য রকম। এখানে প্রথম ক্রুসেডের সময় আরব দর্শনের ক্ষয়িষ্ণুতা শুরু হয়; এবং দ্বাদশ শতকের সর্বপ্রকার সীমান্ত যুদ্ধে কোন দেশীয় কাব্য গাঁথার উদ্ভব হয়নি। ১০৩৭ খৃষ্টাব্দে হামাদানে মহান ইবনে সিনা ইন্তিকাল করেন। সূফী দার্শনিক আল গাজ্জালী ১১১১ খৃষ্টাব্দে খোরাসানে ইন্তিকাল করেন। ১১৫০ খৃষ্টাব্দে বাগদাদের জনৈক খলীফা দর্শনশাস্ত্রের একটি গ্রন্থাগার পুড়িয়ে দেন, যার মধ্যে ইবনে সিনার নিজস্ব রচনাবলীও ছিলো। এ ধরনের অবস্থার যুগে প্রাচ্যের ল্যাটিন ভাষীদের পক্ষে মুসলমানদের সংস্পর্শে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধক হওয়া স্বাভাবিক ছিলো না। তারা মৌলিক কিছু সৃষ্টির জন্য তাদের পারিপার্শ্বিক নতুনত্ব থেকেও প্রেরণা লাভ করেনি। 'পবিত্র ভূমিতে' কোন নতুন কাব্য বা শিল্পকলারও উদ্ভব হয়নি। যে চারণ কবিরা ক্রুসেডের প্রশস্তি গান গায়, তারাও ছিলো পাশ্চাত্যের চারণ কবি। চারট্রেসের ফালচার কিংবা টায়ারের উইলিয়ামের মাধ্যমে যদি ইতিহাস বিজ্ঞানের উন্নতি হয়ে থাকে; অথবা আইবেলিনের জনৈক জন কিংবা নোভারার জনৈক ফিলিপ যদি আইনগ্রন্থ সংকলন করে থাকেন তাহলে একমাত্র সেগুলিই আমাদের অভিনন্দন লাভ করতে পারে।

অতএব সংস্কৃতি জগতে সাম্রাজ্যের ল্যাটিনভাষীরা প্রাচ্যের মুসলমানদের কাছ থেকে খুব সামান্যই শিখতে পেরেছে এবং পাশ্চাত্যকে প্রভাবিত করার মত তাদের নিজস্ব অবদানও ছিলো অতি সামান্য। বস্তুত প্রায় বিতর্কমূলকভাবে এটুকু বলা যেতে পারে যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকাশে ক্রুসেডের প্রধান অবদান ল্যাটিন খৃষ্টান শক্তির মুসলিম প্রাচ্যের সঙ্গে যোগাযোগ থেকে যতখানি এসেছে, তার অনেক বেশি এসেছে বাইযেন্টাইন সাম্রাজ্য

---

১. আনিসিয়াস মানলিয়াস সেভেরিনাস বোইথিয়াস (খৃ. ৪৮০?–৫২৪?); রোমান দার্শনিক ও রাষ্ট্রনীতিক।–অনুবাদক

২. তুলনা টি জে ডি বোয়ার, গেশ্চিষ্টে ডের ফিলোসফি ইন ইসলাম এবং ই রেনান, আভেররোস এট এল আভের রুইজমে।

৩. অ-খৃষ্টান, বিশেষত মুসলমান, এক সময় বাংলায় মুসলমানদের সম্পর্কে ব্যবহৃত হিন্দুদের 'যবন' শব্দের সঙ্গে তুলনীয়। –অনুবাদক

www.waytojannah.com

ও গ্রীক খৃষ্টান শক্তির সংগে এর সম্পর্ক থেকে। প্রথম ক্রুসেডের আগে পাশ্চাত্যের খৃষ্টধর্ম ও সাম্রাজ্য বিস্মৃতির এক বিরাট ব্যবধানে প্রাচ্যের খৃষ্টধর্ম ও সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলো। প্রথম অটোর পক্ষে বিখ্যাত দৌত্য কার্যে ক্রোমোনার লুইটপ্রাণ্ড ৯৬৮ খৃষ্টাব্দে এবং নবম লিওর দূতরা ১০৫৪ খৃষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলে গেলেও প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্পর্ক কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত অত্যন্ত ক্ষীণ ও কদাচিৎ ছিলো। ১০৯৬ খৃষ্টাব্দের পর কমনেনি[১] পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সঙ্গে অব্যাহত সম্পর্ক বজায় রাখে। ১২০৪ খৃষ্টাব্দের পর ল্যাটিনরা প্রাচ্য সাম্রাজ্যে বসবাস শুরু করে। ত্রয়োদশ শতকে করিন্থের ফ্লেমিশ আর্কবিশপ উইলিয়াম অব মোয়েরবেক এবং তার সহচর হেনরি অব ব্র্যাবান্ট সেন্ট টমাসের সহযোগিতায় এরিস্টটলের *এথিক্স* ও *পলিটিক্স* অনুবাদ করেন এবং স্পেন ছাড়াও পাশ্চাত্যের জন্য গ্রীক দর্শনের আরেকটি দ্বার উন্মুক্ত করেন। চতুর্দশ শতকের সমাপ্তিতে এবং পঞ্চদশ শতকে বাইযেন্টাইন পণ্ডিতরা গ্রীক উত্তরাধিকারিত্বের পুরো সম্পদ ইটালীতে নিয়ে আসেন; এবং ইটালীয় রেনেসাঁর প্রয়োজনীয় উপাদানের যোগান দেন। কনস্টান্টিনোপল ক্রুসেডের প্রধান প্রবাহ পথে অবস্থিত ছিলো না, তবুও ক্রুসেড কনস্টান্টিনোপল থেকেই সম্পদশালী বৃহৎ বাণিজ্যপোত পাশ্চাত্যে নিয়ে আসে।

এতদসত্ত্বেও এমন কতগুলি পন্থা ছিলো যার মাধ্যমে ক্রুসেড সিরিয়ার মধ্য দিয়ে, এবং এর দ্বারা সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত ল্যাটিন রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে পশ্চিম ইউরোপের বিকাশকে প্রভাবিত করে। প্রথমে ভাষার প্রমাণের কথা ধরা যাক—যে সব পাশ্চাত্য শব্দ আরবীতে এবং যেসব আরবী শব্দ পাশ্চাত্য ভাষাসমূহে প্রবেশ করেছে সেই প্রসঙ্গে আরবীতে পাশ্চাত্য শব্দের সংখ্যা খুব বেশি নয়। প্রুট্স দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন, *ইনবিরুর* (ইম্পারেটর), *কাস্তাল*, (ক্যাস্টেলাম), *বুর্জ* (বুর্জুস) এবং *গির্শ্* (গ্রসাস)। এর তুলনায় পাশ্চাত্য ভাষাগুলিতে আরবী শব্দের সংখ্যা অনেক বেশি। কেবল মাত্র আমাদের নিজস্ব ভাষাতেই *ক্যারাভান, ড্রাগোমান, জার, সিরাপ* শব্দগুলির কথা সহজে উল্লেখ করা যায়। ইউরোপের অন্যত্র রোমান্স ভাষার দিকে লক্ষ্য করলে—যেখানে আরবী শব্দগুলি সরাসরি প্রবেশ করেছে, আর আমাদের ভাষায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐসব ভাষার মাধ্যমে এসেছে—আমরা দেখতে পাবো যে, আরবী থেকে ধার করা পাশ্চাত্য শব্দগুলির তালিকা অতি সহজেই বৃদ্ধি করা যায় (*ডাউয়েন, গ্যাবেল্লি, ফেলুক্কা, চেবেক* প্রভৃতি)। কিন্তু এসব ধার করার তাৎপর্য নিরূপণে স্পষ্টত ভাষাতাত্ত্বিক অসুবিধা রয়েছে। ফিলিস্তিনই একমাত্র স্থান নয়, কিংবা ক্রুসেডই একমাত্র যুগ নয় যার মধ্য দিয়ে এগুলির উদ্ভব হয়েছে। ধার করার অন্যান্য সম্ভাব্য স্থান স্পেন ও সিসিলি এবং পাশ্চাত্য ও আরবী ভাষাভাষী বিশ্বের সঙ্গে বহু শতাব্দীব্যাপী যে যোগাযোগ ছিলো—সুয়েজের পূর্বে ও পশ্চিমে উভয়দিকে এবং ব্যবসা–

১. কমনেনাস শব্দের বহুবচন; বাইযেন্টাইন সাম্রাজ্যের একটি ক্ষমতাসীন রাজ পরিবারের (১০৫৭–৫৯, ১০৮১–৮৫) সদস্যরা এই নামে পরিচিত ছিল।–অনুবাদক

www.waytojannah.com

বাণিজ্য ও জলদস্যুতা উভয় পন্থায়—সেটিই ছিলো অনন্য সময় ও পন্থা। এ কথা সত্য যে, পাশ্চাত্য এখনো ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে *বাজার*[১] *ডিনার, ট্যারিফ* এবং *যেচিন*, সমুদ্র বিহারের ক্ষেত্রে *অ্যাডমিরাল* ও *আর্সেন্যাল* ও গার্হস্থ্য জীবনের ক্ষেত্রে *আলকোভ, কারেফ, ম্যাটরেস* ও *সোফা কিংবা অ্যামিউলেট, এলিক্সির, জুলেপ* ও *ট্যালিসম্যান* এবং সঙ্গীতের ক্ষেত্রে *লিউট* ও *ন্যাকার* প্রভৃতি আরবী শব্দ ব্যবহার করে। কিন্তু এসব শব্দ প্রচলনের দায়িত্ব ক্রুসেডের উপর আরোপ করার আগে আমাদের আরবী ও রোমান্স ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করতে হবে এবং এগুলি প্রচলনের মূল স্থান ও সঠিক সময় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

ক্রুসেড ছিলো কতগুলি ধারাবাহিক যুদ্ধ, যেসব যুদ্ধ নতুন শত্রুর বিরুদ্ধে, নতুন অস্ত্রের সাহায্যে এবং কোন কোন দিক দিয়ে নতুন কলাকৌশল অনুসরণ করে সংঘটিত হয়। কাজেই আমরা স্বাভাবিকভাবেই আশা করতে পারি যে, এসব যুদ্ধ পাশ্চাত্যে যুদ্ধকৌশল বিকাশে কিছুটা প্রভাব সৃষ্টি করেছে। কোন কোন লেখকের মতে প্রথম এডওয়ার্ডের রাজত্বকালে ইংল্যাণ্ডে যে কনসেন্‌ট্রিক' (সাধারণ কেন্দ্র সমন্বিত) রীতির দুর্গ সাধারণ হয়ে পড়ে, তা জেরুজালেমের ল্যাটিন সাম্রাজ্যের সামরিক স্থাপত্যের ছাঁচে নির্মিত আবার ল্যাটিন সাম্রাজ্যের রীতিও আরবরা সিরিয়ায় প্রাপ্ত বাইযেন্টাইন দুর্গগুলির যে সংস্কার সাধন করে সেই সংস্কৃত ছাঁচে নির্মিত। এ ধরনের যুক্তি অনুসরণ করেই প্রুটস অভিমত প্রকাশ করেন যে, ফিলিস্তিনে সামরিক প্রতিরক্ষার সাধারণ পরিকল্পনায় নর্ম্যান ক্যাস্টেলেশন (ছোট ছোট গম্বুজ ও ফোকরওয়ালা প্রাচীর বিশিষ্ট) পদ্ধতি অনুসৃত হলেও (দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমনটি আমরা ওয়েলস্ সীমান্তে এবং সাউথ ওয়েলসে দেখতে পাই) বৃহত্তর সুরক্ষিত এলাকার বিভিন্ন অংশের বিন্যাসে, পাশ্চাত্যের প্রাচীনতর সামরিক স্থাপত্যে অপরিজ্ঞাত অতিরিক্ত অংশসমূহ সংযোজনে এবং প্রাচ্যে উদ্ভাবিত অবরোধ কৌশলের প্রয়োজনে কতিপয় নতুন প্রতিরক্ষা পদ্ধতিতে আরব প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়।'[২] তাই তিনি দুই সারি প্রাচীর ব্যবহার ('কনসেনট্রিক' দুর্গের জন্য যা অপরিহার্য) এবং দুই সারির মধ্যস্থলে একটি অতিরিক্ত টাওয়ার নির্মাণকে আরব্য প্রভাব হিসাবে উল্লেখ করেন।[৩] তিনি আরো অভিমত প্রকাশ করেন যে, প্রথম রিচার্ড কর্তৃক ভেক্সিনে নির্মিত বিখ্যাত শাটো গেইনার্ড দুর্গে সুস্পষ্টভাবে প্রাচ্যের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। অপরপক্ষে এরূপ যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, 'কনসেনট্রিক' দুর্গ পাশ্চাত্যে উদ্ভাবিত হয়েছে এবং সেখান থেকে ক্রুসেডারগণ তা প্রাচ্যে নিয়ে গেছেন। এবং যে কোনভাবেই হোক একথা নিশ্চিত যে, দুঃসাহসিক

১. মূল আরবী নয়, ফার্সী।

২. কুলটুরগেসচিচটে পৃ. ১৯৪।

৩. এ ধরনের একটি প্রাথমিক টাওয়ার বিশেষ করে সেটি যখন দ্বারদেশে কিংবা প্রবেশ পথে নির্মিত হয় তখন তা বারবিকান নামে পরিচিত, এবং বলা হয়ে থাকে যে এই শব্দটি আরবী (বা ফার্সী) শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ 'প্রাচীরের উপর ঘর' কিংবা 'তোরণ-গৃহ'। (দ্রষ্টব্য এন,ই,ডি সাবভোস)

www.waytojannah.com

Contents

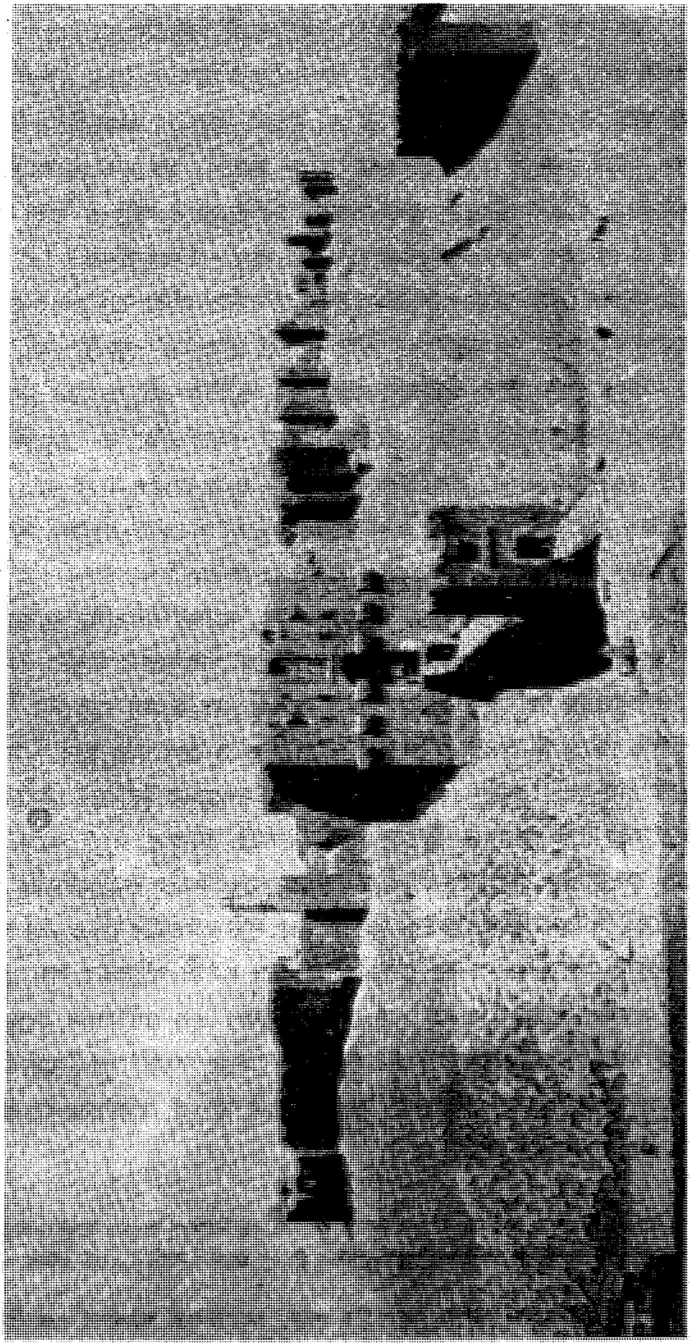

চিত্র-৯. ইসলামিক সামরিক স্থাপত্য শিল্প
সালাহ্উদ্দীনের সময়ে তৈরি বিশাল তোরণ এবং প্রবেশ পুল সম্বলিত আলেপ্পোর শহর রক্ষা দুর্গ

www.waytojannah.com

Contents

অভিযানকারী নর্ম্যানদের প্রকৌশলগত দক্ষতা, যা তারা ফিলিস্তিনের আগে পশ্চিম ইউরোপে প্রদর্শন করে, তা নিজেদের স্বাধীন সম্পদ থেকে বিকাশে তারা সম্পূর্ণ সক্ষম ছিলো। আমরা আরো আস্থার সঙ্গে বলতে পারি যে, ক্রুসেড অবরোধ কলাকৌশল উন্নয়নে সহায়তা করে--সুড়ঙ্গ খনন ও মাইন স্থাপনের কৌশল প্রয়োগ, মেঙ্গনেল[১] ও ক্যাটারিং-র‍্যামের[২] গোলন্দাজ বাহিনী নিয়োগ এবং সম্ভবত বিভিন্নভাবে অগ্নি ও দাহ্য পদার্থ প্রয়োগ। যদিও এ ক্ষেত্রেও সম্ভবত আরবরা বরং নয় বরং বাইযেন্টাইনরাই ছিলো মূল প্রেরণা। ১১৫৯ খৃষ্টাব্দে ক্রেমা অধিকারের সময় প্রথম ফ্রেডারিক পবিত্র ভূমি থেকে যে দক্ষ প্রকৌশলী নিয়োগ করেন তিনিও আরবদের শিষ্য না হয়ে গ্রীকদের শিষ্য ছিলেন। ক্রস-ধনুক বা আড়-ধনুক প্রাচ্য থেকে আমদানি করা হয়। নাইটও তার ঘোড়ার জন্য বর্ম ব্যবহার ক্রুসেডের প্রভাব থেকে আসে। বর্মের ভেতরে তুলার কাঁথা বা কোমল গদি ব্যবহারও একই সূত্র থেকে আসে। আর ফিলিস্তিনে যুদ্ধের সময় ফ্রাঙ্কিশ নাইট প্রাচ্য সূর্যের তাপ থেকে নিজের মাথা ও ঘাড় রক্ষার জন্য আরব *কুফিয়া* ব্যবহার শেখেন। সাময়িক সংবাদ প্রেরণের জন্য সংবাদ বহনকারী কবুতর নিয়োগের কৌশলটি আরবদের কাছ থেকে নেওয়া। যদিও এ প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নর্ম্যান সিসিলির রেকর্ডপত্রে সাধারণভাবে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। বলা হয়েছে যে, আলোকসজ্জার মাধ্যমে দেয়ালে ও জানালায় রংবেরংয়ের জিনিস এবং গালিচা ঝুলিয়ে বিজয় উৎসব পালনের রীতিও মানুষের আবেগের ক্ষেত্রে যা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও স্বদেশজাত বলে মনে হবে--সম্ভবত একই সূত্র থেকে ধার করা। *জারিদ*-এর মহড়ার সঙ্গে সাদৃশ্যমূলক টুর্নামেন্ট (কৃত্রিম যুদ্ধ মহড়া) অনুষ্ঠানের রীতি সম্ভবত ক্রুসেডের মাধ্যমেই বিকাশ লাভ করে এবং ক্রমবর্ধমানভাবে কুলজীচিহ্ন ব্যবহারও সিরিয়ার সারাসেনদের[৩] সঙ্গে যোগাযোগের ফল। তারা নিশ্চিতভাবেই দ্বিমস্তক ঈগল, ফ্লিউর-ডি-লি এবং দুটি তালাচাবি (চিত্র ১০) প্রভৃতি কুলজী চিহ্ন ব্যবহার করতেন এবং বহু কুলজী চিহ্ন এবং কুলজী পরিচায়ক শব্দ (যেমন অ্যাযিউর এবং সম্ভবত গিউলস) একই সূত্র থেকে উদ্ভূত। এও প্রতীয়মাণ হচ্ছে যে, ক্রুসেডের ফলেই সমগ্র ইউরোপে কুলজীচিহ্নের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়ম-বিধির উদ্ভব হয়েছে এবং 'সবগুলি ইউরোপীয় দেশে কুলজীচিহ্নের সম্পর্ক, পরিচয়জ্ঞাপক শব্দ ও নিয়মের ক্ষেত্রে একটি সামঞ্জস্য রয়েছে।'

---

১. একটি অপ্রচলিত সামরিক সরঞ্জাম, যা ভারী পাথর ও অন্যান্য নিক্ষিপ্ত বস্তু নিক্ষেপে ব্যবহৃত হতো।-অনুবাদক

২. তোরণ ও প্রাচীরে আঘাত হানার জন্য ভারী কাষ্ঠদণ্ড ও লোহার ছুঁচালো অগ্রভাগ সমন্বিত একটি প্রাচীন সামরিক যন্ত্র।-অনুবাদক,

৩. মূলত সিরিয়া ও তার আশেপাশের ভবঘুরে উপজাতীয় লোক, পরবর্তীকালে আরবদের এবং বিশেষত ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী যে কোন মুসলমানকে এই নামে অভিহিত করা হতো।-অনুবাদক

www.waytojannah.com

Contents

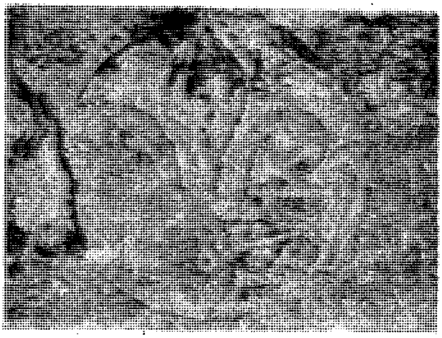

চিত্র-১০. ১০ (ক) ফ্লু ডে-লি,

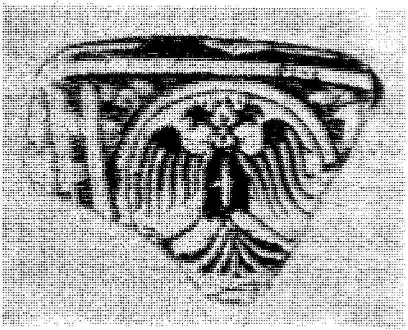

১০ (খ) দুই মাথাবিশিষ্ট ঈগল,

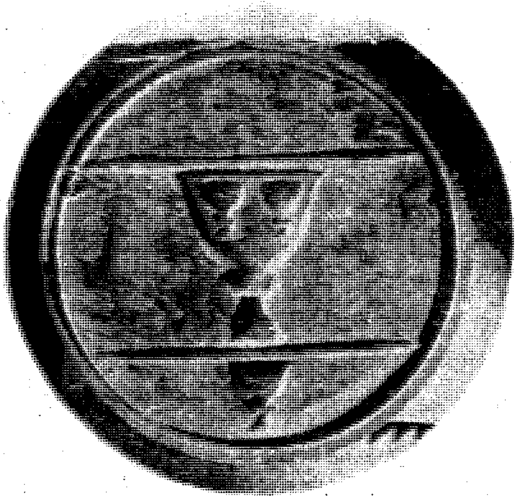

১০ (গ) পেয়ালা,

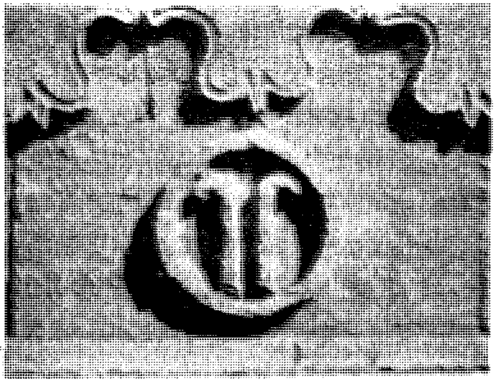

১০ (ঘ) পোলো স্টিক

প্রাচীন আরব মুসলিমগণের দৌত্যের উদাহরণ

www.waytojannah.com

Contents

ক্রুসেডের সময় ব্যবসা–বাণিজ্য যুদ্ধের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং ইটালীয় বণিকরা ফ্রাঙ্কিস নাইটদের পিছনে পিছনে দ্রুত ধাবিত হয়। কেবলমাত্র সিরিয়ার পণ্যই এর উদ্দেশ্য ছিলো না, ভারত, চীন এবং মসল্লা দ্বীপপুঞ্জের পণ্যও এর লক্ষ্য ছিলো। একথা সত্য এবং আমরা ইতিপূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, ক্রুসেড না হলেও এরূপ প্রাচ্য বাণিজ্যের উদ্ভব হতো এবং তা সফলতা লাভ করতো। একথাও ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে, ভেনিস প্রথম ক্রুসেড শুরু হওয়ার বহু বছর আগে বাইযেন্টিয়ামের মধ্যদিয়ে প্রাচ্যের বাজারে প্রবেশ করে। তাই মধ্যযুগে প্রাচ্যের যেসব পণ্য পশ্চিম ইউরোপে আসে তার সবগুলি ক্রুসেডের দরুন—অন্তত এককভাবে ক্রুসেডের দরুন আসেনি, কিংবা এসব পণ্য আমদানিকে কেন্দ্র করে যেসব প্রাচীন বাণিজ্যপথ ও বাজারের উদ্ভব হয়েছে তাও এককভাবে ক্রুসেডের অবদান নয়। অবশ্য একইভাবে আমরা সিরিয়ার ল্যাটিন বসতি থেকে যে বিরাট বাণিজ্যিক প্রেরণার সৃষ্টি হয় এবং সেখানে স্থানীয়ভাবে যেসব পণ্য উৎপাদিত হয় তা অস্বীকার করতে পারি না। এই বসতি একদিকে দামেস্কের বাজারসমূহে এবং অন্যদিকে রাক্কা ও ইউফ্রেটিসের পথে বাগদাদের বাজারগুলিতে যাতায়াতের যে নতুন সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে তাও আমরা অস্বীকার করতে পারি না। একইভাবে আমরা বলতে পারি যে, নতুন নতুন গাছপালা, লতাগুল্ম ও ফসল লেভ্যান্ট থেকে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এসেছে ––তিল ও ক্যারব, ভুট্টা ও ধান, লেবু ও তরমুজ এবং খোবানী ও পেঁয়াজ–রসুন, এমনিভাবে পাশ্চাত্যে বহু নতুন নতুন ব্যবহার্য ও ফ্যাশনদ্রব্য ছড়িয়ে পড়ে—সুতীবস্ত্র; মসুলের মসলিন[১] ; বাগদাদের ব্যালডাচিন, দামেস্কের বুটিদার রেশমীবস্ত্র ও ড্যামাস্সিন, 'সারসেনেট' বা স্যারাসেন পোশাক; বাইযেন্টিয়ামের রেশমী বস্ত্র, দো–সুতী কাপড় ও বুটিদার লিনেন কাপড়; প্রাচ্যে তৈরি এক ধরনের রেশমী–সাটিন' 'অ্যাটলাস' (আরবী *আতলাসা*); দূরপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার কম্বল, গালিচা ও দেওয়াল–পর্দা (ট্যাপিস্ট্রি) বার্নিশ; নতুন নতুন রং যেমন ক্যার্মাইন (উজ্জ্বল লাল রং) ও লাইল্যাক (উভয় শব্দই আরবী); রং, ওষুধ, মসল্লা ও সুগন্ধিদ্রব্য যেমন ফিটকিরি, ঘৃতকুমারী, লবঙ্গ, ধুপ, নীল ও চন্দনকাঠ; পোশাক ও ফ্যাশনের জিনিস, যেমন ক্যামলেট (রেশম ও পশম মিশ্রিত কাপড়) জুপ (আরবী *জুব্বাহ* থেকে) কিংবা পাউডার ও কাচের আয়না; মৃৎপাত্র, কাচ, স্বর্ণ, রৌপ্য ও কলাই মিনার উপর শিল্পকর্ম। এমনকি তসবিহও (জপমালা) প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে আসে। এটি ভারতের বৌদ্ধদের কাছ থেকে সিরিয়া হয়ে পশ্চিম ইউরোপে আসে।

প্রাচ্য বাণিজ্যে ক্রুসেডের অবদান সরাসরি না হলেও ক্রুসেড–এর পিছনে প্রেরণা সৃষ্টি করে। দ্বাদশ শতকে এই বাণিজ্য প্রধানত সিরিয়ায় কেন্দ্রীভূত ছিলো। বাণিজ্যপথ উন্নয়নে এবং ক্রেডিট ও ফাইন্যান্সের নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবনে এর অবদান ছিলো অসামান্য।

---

১. মসলিনের সঙ্গে মসলিন তৈরি কেন্দ্র ঢাকা ইতিহাস প্রসিদ্ধ ; এক্ষেত্রে ঢাকাই মসলিন সম্ভবত মসুল হয়ে পাশ্চাত্যে যেতো, এবং লেখক হয়তো তাই বলতে চেয়েছেন। –অনুবাদক।

www.waytojannah.com

মধ্যযুগীয় ইউরোপে যে বিশাল বাণিজ্যপথ ভেনিস থেকে ব্রেনার গিরিপথ হয়ে কলোন এবং সেখান থেকে দুভাগ হয়ে একদিকে বাল্টিক সাগরের তীরে লুবেকে এবং অন্যদিকে উত্তর সাগরের তীরে ব্রুযে গিয়ে পৌঁছে তা এই প্রাচ্য বাণিজ্যেরই পণ্য–সামগ্রী বহন করে। এই পথেই লম্বার্ডিতে, রাইন নদীর তীরে, ফ্লাণ্ডার্সে এবং উত্তর ফ্রান্সে মধ্যযুগীয় শহর ও বাণিজ্য সংঘসমূহ ব্যাপকভাবে গড়ে ওঠে, একই সময় ভূমধ্য সাগরে একটি নিয়মিত জাহাজ চলাচল ব্যবস্থা গড়ে ওঠে যাতে পণ্য ও তীর্থযাত্রী উভয়ই বহন করা হতো। ভেনিস ও মার্সেলজ–এর সদর দফতর হয়ে উঠে এবং এই জাহাজ চলাচলে বেসামরিক জাহাজ মালিক ও জাহাজ কোম্পানীগুলির সঙ্গে সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলি যোগদান করে। সুদূর প্রাচ্য বাণিজ্যের জন্য এবং তীর্থযাত্রী ও নাইটদের বিদেশ ভ্রমণের জন্য যে আর্থিক প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তার ফলে এক ধরনের ক্রেডিট–নোট পদ্ধতির উদ্ভব হয়। এর ফলে লেভ্যান্টে শাখা ও ব্যবসা কেন্দ্র সমন্বিত ব্যাঙ্কার্স প্রতিষ্ঠানের (জেনোয়ী, পিসান বা সিয়েনী) সৃষ্টি হয়। সামরিক প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে টেম্পলাররা ডিপোজিট ও লেণ্ডিংয়ের ব্যাঙ্কের ভূমিকা গ্রহণ করে। ক্রুসেড ও ক্রুসেডের প্রেরণায় উদ্ভূত প্রাচ্য বাণিজ্যের মুদ্রা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি অদ্ভুত দিক হচ্ছে ভেনেসীয়গণ কর্তৃক পবিত্র ভূমিতে *বাইযেন্টিনি স্যারাসেনাটি* মুদ্রা তৈরি। মুসলিম *হিন্টারল্যাণ্ডের* (বাণিজ্যের পশ্চাদভূমি) সঙ্গে ব্যবসা–বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এটি ছিলো একটি স্বর্ণমুদ্রা (সম্ভবত ল্যাটিনদের দ্বারা ছাপ মেরে তৈরি প্রাচীনতম স্বর্ণমুদ্রা)। ১২৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত (যখন ৪র্থ ইনোসেন্ট প্রতিবাদ জানায়) এসব স্বর্ণ মুদ্রায় আরবী উৎকীর্ণলিপি ছিলো, যাতে কুরআন শরীফের একটি সংক্ষিপ্ত উক্তি, মহানবীর উল্লেখ এবং হিজরী সাল অনুযায়ী তারিখ ছিলো। দক্ষিণ ফ্রান্সে ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগেও এধরনের মুদ্রার সন্ধান পাওয়া যায়।

ক্রুসেডের সময়কার দুই শতকে পাশ্চাত্যের উপর প্রাচ্যের প্রভাবের কতিপয় নিদর্শন আমরা বিভিন্ন ধরনের অট্টালিকা নির্মাণে, শিল্প ও কারুশিল্পে এবং দৈনন্দিন ও গার্হস্থ্য জীবনের সাধারণ পরিসরে দেখতে পাই। এরূপ মনে করার কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না যে, ক্রুসেড পাশ্চাত্যের সাধারণ স্থাপত্য বিকাশে প্রভাব সৃষ্টি করেছে। কনসেন্ট্রিক দুর্গের বিশেষ উন্নয়নের ক্ষেত্রেই এর প্রভাব দেখা যায়। স্যারাসেনিক স্থাপত্যের কোন সাধারণ রীতি পরিদৃষ্ট হয় না। বিজয়ী আরবরা যে ধরনের দেশীয় ভবন নির্মাণ করেছেন তদনুযায়ী বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন স্থাপত্য রীতি দেখা যায়। একমাত্র সামঞ্জস্য দেখা যায় সাজসজ্জা ও অলংকরণে। আরবরা এক ধরনের ছুঁচালো খিলান ব্যবহার করেন, কিন্তু এটি এ জাতীয় গথিক স্থাপত্য থেকে পৃথক ধরনের ছিলো। তারা জ্যামিতিক ডিজাইন ব্যবহার করতেন, কারণ জীবজন্তুর ছবি ব্যবহার তাদের ধর্মে নিষিদ্ধ, কিন্তু এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, তাদের ডিজাইন জ্যামিতিক পর্যায়ে পাশ্চাত্য গথিক ডিজাইনের

ট্রীফয়ল (ত্রিপত্র আকৃতির নক্শা) বা সিঙ্ক ফয়ল্‌কে (পঞ্জা আকৃতির নক্শা) প্রভাবিত করেছে।[১] পবিত্র ভূমির গির্জা–স্থাপত্যের স্মৃতিসৌধগুলি প্রায় সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য রীতিতে এবং পাশ্চাত্য ভবন তৈরির নিয়ম–বিধি ও পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত। আমরা বড়জোর একথা বলতে পারি যে, স্থানীয় সমস্যা কিছু কিছু স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ফিলিস্তিনে কাঠ পাওয়া যায়নি বলে গির্জার ছাদ সমতল করে তৈরি করতে হয়, কিংবা স্থানীয় রাজমিস্ত্রী এবং স্টোন–কাটাররা স্বাভাবিকভাবে পাশ্চাত্য পন্থায় অভ্যস্ত বলে সাধারণভাবে পাশ্চাত্য রীতিতে তৈরি ভবনেও কিছু কিছু পাশ্চাত্য রীতির বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে।[২] প্রাচীর চিত্রের এরাবেস্ক[৩] রীতি প্রাচ্য থেকে উদ্ভূত নয়, বরং মূরীয় এবং ক্রুসেড যদি পাশ্চাত্যের ভাস্কর্যে কোন নতুন উপাদান দিয়ে থাকে তাহলে সেগুলি আরব্য নয়, বাইযেন্টাইন। চিত্রাঙ্কন কোন আরব্য শিল্প নয়, এবং পবিত্র ভূমির গির্জাগুলির মোজাইক বাইযেন্টাইন সূত্র থেকে উদ্ভূত। গার্হস্থ্য শিল্প ও কারুকার্যের সঙ্কীর্ণতর গণ্ডীর মধ্যেই আমরা আরব্য প্রভাব সম্ভবত সবচাইতে বেশি পরিমাণে দেখতে পাই। স্বয়ং জেরুজালেম রাজ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভবনগুলির অঙ্গন, মার্বেল, ফোয়ারা এবং প্রস্রবনের কলকল ধ্বনি সম্ভবত আরব্য রীতি অনুসরণ করে। আভ্যন্তরীণ কারুকার্য এবং আসবাবপত্রের ক্ষেত্রেও একই আদর্শের নকল করা হয়। প্রাচ্যের স্বর্ণের কারুকার্য ও অলংকার সম্ভবত ইটালীতে এবং বিশেষভাবে ভেনিসে কারুশিল্পকে প্রভাবিত করেছে। প্রাচ্যের আইভরি, এনামেল, কার্পেট, ট্যাপেস্ট্রি একইভাবে ব্যাপক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যে প্রভাব সৃষ্টি করেছে। অষ্টাদশ শতকের *চিনয়সেরিকে* (ওয়াল–পেপার বার্নিশ, বার্নিশ ও ফার্নিচারে) আমরা যে দৃষ্টিতে দেখি মধ্যযুগের 'রেবেস্ক' বা অ্যারাবেস্ক ফ্যাশনকে আমরা সে দৃষ্টিতে দেখতে পারি। তীর্থযাত্রীরা হয়তো খৃস্টান পবিত্র জিনিস সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আরবদের পবিত্র বস্তু সংরক্ষণের পাত্র (রেলি কোয়ারি) কিনে নিয়ে আসেন। তারা হয় তো প্যারিসে অনুকরণ করার জন্যে প্রাচ্যের 'গার্ডল–পার্স' (কটিদেশ বেষ্টনী থলে) পরে দেশে নিয়ে আসেন। কিংবা যেসব সিঙ্গায় এক সময় সিরীয়দের কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হতো সেগুলি তারা পাশ্চাত্যে বয়ে আনেন।

বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের ক্ষেত্রে প্রাচ্যের আরবরা নয়, বরং স্পেনের আরবরাই ল্যাটিন পাশ্চাত্যে উপহারের সওগাত বয়ে নিয়ে আসে। অবশ্য কতিপয় গাণিতিক জ্ঞান প্রাচ্য

---

১. ক্রুট্‌স অপ সিট, পৃ ৪১৯, ধারণা করেন যে, (কিন্তু তিনি স্বীকার করেন যে, এটি ধারণা) আরব্য প্রভাবের ফলেই পাশ্চাত্যে বহু ছোট ছোট খিলানের সমবায়ে গঠিত অশ্ব–নাল খিলান ও অর্ধ–বৃত্তাকার খিলান প্রবর্তিত হয়েছে এবং এটি সিঙ্কফয়ল্ ও পাথরের উপর বিভিন্ন ধরনের কারুকার্য সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে।

২. গোলাকার 'টেম্পল' গির্জাগুলি (যার মধ্যে চারটি ইংল্যাণ্ডে এবং যার সন্ধান ফ্রান্স, স্পেন এবং জার্মানীতেও পাওয়া যেতে পারে।) সেপালচার গির্জা এবং জেরুজালেমের 'টেম্পলের' একটি ইচ্ছাকৃত অনুকরণ–এগুলি কোন কোন পাশ্চাত্য গির্জার ল্যাবিরিন্থস' বা 'চেমিনস ডি জেরুজালেম'–এর কিংবা প্রুশিয়ার টিউটনিক অর্ডারের কোন কোন শহরের 'জেরুসালেমস'–এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

৩. রিলিফে খোদাই করা কিংবা আঁকা ফুল, পত্রগুচ্ছ, জ্যামিতিক চিত্র প্রভৃতির একত্র সন্নিবেশিত একটি জটিল ও সূক্ষ্ম ডিজাইন, যা বিশেষভাবে মূরীয় স্থাপত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। –অনুবাদক।

www.waytojannah.com

চিত্র-১১. নর্দাম্পটনের রাউন্ড টেম্পল গির্জা

www.waytojannah.com

থেকে আমদানি করা হয়। বাথ–এর অ্যাডেলার্ড আরবদের জ্যোতিঃশাস্ত্র ও জ্যামিতি অধ্যয়ন করেন। তিনি দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধে মিসর, এশিয়া মাইনর এবং স্পেন সফর করেন। প্রথম খৃস্টান বীজগাণিতিক লিওনার্ডো ফিবনাক্কিও মিসর এবং সিরিয়া ভ্রমণ করেন। তিনি দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের সমসাময়িক ছিলেন এবং তার বর্গসংখ্যা সংক্রান্ত পুস্তিকা ফ্রেডারিকের নামে উৎসর্গ করেন। আরবী সংখ্যা–চিহ্ন ও পাটীগণিতের প্রসারণ ইটালীয় বন্দরগুলির সঙ্গে সিরিয়ার বাণিজ্য প্রাণবন্ত করে তোলে। অংক শাস্ত্রের ন্যায় ভেষজশাস্ত্রও আরব্য বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান উপাদান ছিলো, কিন্তু এই উপাদানের মূল কেন্দ্র ও প্রসারণের উৎস ছিলো সিরিয়া নয়, স্পেন। সিরীয় প্রভাব সম্পর্কে যে বিষয়ে সবচাইতে বেশি ধারণা করা হয় তা হচ্ছে মোন্টপেলিয়ারে একটি মেডিক্যাল স্কুলের উদ্ভব। দক্ষিণ ফ্রান্স ও লেভ্যান্টের মধ্যে যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় এটি তারই ফল। আমরা ত্রয়োদশ শতকে যে জ্ঞানদীপ্ত দর্শনের সাক্ষাত পাই তা প্রাচ্যের আরব দার্শনিকদের প্রত্যক্ষ অবদান নয়। খৃস্টান ঐতিহ্য ও ফাদারদের শিক্ষা ছাড়াও স্পেনের আরবদের এরিস্টটল চর্চা থেকে কিংবা এরিস্টটলের যে জ্ঞান সরাসরি বাইযেন্টিয়াম থেকে পাওয়া যায় সেখান থেকে এর উপাদান সংগ্রহ করা হয়।[১]

শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ক্রুসেডের প্রভাব সম্ভবত সবচাইতে গভীর ও ব্যাপ্তিশীল ছিলো। এর অন্যতম প্রত্যক্ষ ফল ছিলো প্রাচ্য ভাষাগুলির চর্চা। কিন্তু এক্ষেত্রে ক্রুসেডের চাইতেও যে এসিয়াটিক মিশন ক্রুসেডের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং মঙ্গোলদের ধর্মান্তরিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করে তারই অবদান বেশি। ক্যাটালোনিয়ার অধিবাসী জনৈক রেমণ্ডাস লালাস সর্বপ্রথম প্রাচ্যচর্চার উন্নয়ন সাধনে সচেষ্ট হন। তিনি এটিকে এমন একটি শান্তিবাদী ক্রুসেডের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চান সেখানে সামগ্রিকভাবে আধ্যাত্মিকতাই হবে অস্ত্র। আরবী ভাষা চর্চার জন্য তিনি ১২৭৬ খৃস্টাব্দে মিরামারে ফ্রাইয়ারদের একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩১১ খৃস্টাব্দে সম্ভবত তাঁরই উদ্যোগে প্যারিস, লুভেইন ও স্যালামা হরফে প্রাচ্য ভাষার (আরবী ও তাতার ভাষার) কতিপয় অধ্যাপকের পদ সৃষ্টির জন্য কাউন্সিল অব ভিয়েন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু এই অস্থির ও নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি ১৩১৪ খৃস্টাব্দে তিউনিসে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে তার সাধনা প্রায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু যে প্রাচ্য মিশনের জন্য তিনি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন তা অব্যাহত থাকে। কিন্তু আমরা দেখতে পাবো যে, এর পরিণতি প্রাচ্য চর্চা বিকাশে পর্যবসিত না হয়ে ভৌগোলিক জ্ঞান বিকাশে পর্যবসিত হয়।[২]

---

১. পশ্চিম ইউরোপে আরব বিজ্ঞান সম্পর্কিত এক নিবন্ধ (আইসিসে মুদ্রিত, ৭ম খণ্ড, পৃ.৩) প্রফেসর সি এস হাস্‌কিন্স মন্তব্য করেন, খৃস্টান ইউরোপে আরব বিজ্ঞান প্রচারে ক্রুসেড বিস্ময়করভাবে অত্যন্ত নগণ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

২. প্রফেসর হাসকিন্স (অপ. সিট) জে কে রাইটের জিওগ্রাফিক্যাল লোর অব দি টাইম অব দি ক্রুসেড্‌স্ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, 'ক্রুসেড যদি খৃস্টান ইউরোপের ভৌগোলিক জ্ঞানের দিগন্তকে প্রসারিত করে থাকে তবে তা আরব ভূগোলবিদদের রচনার সংস্পর্শের চাইতে প্রকৃত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই করেছে,' যে অভিজ্ঞতা মধ্যযুগে পাশ্চাত্যের কাছে অপরিজ্ঞাত ছিলো।

www.waytojannah.com

সাহিত্যের ক্ষেত্রে ক্রুসেড অনেকখানি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে এবং এগুলি বহু পাশ্চাত্য কবির কাব্যের বিষয়বস্তু ছিলো। ক্রুসেডের পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদদের মধ্যে রয়েছেন *গেস্টাফ্র্যাঙ্কোরাম*-এর অজ্ঞাতপরিচয় নর্ম্যান লেখক, যিনি প্রথম ক্রুসেডের বিবরণ প্রদান করেন; ফালচার অব চার্টরেস যার *হিস্টোরিয়া হিরোসেলিমিটানা* গ্রন্থে কেবল প্রথম ক্রুসেডেরই বর্ণনা দেওয়া হয়নি, ১১২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্যের ইতিহাসও দেওয়া হয়েছে, এবং সর্বোপরি টায়ারের আর্কবিশপ উইলিয়াম, যার তেইশ খণ্ডে রচিত *হিস্টরি অব থিংস ডান ইন দি পার্টস ওভারাসীজ* ১১৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই গ্রন্থটির একটি ফরাসী অনুবাদ বর্তমানে মধ্যযুগের প্রধান উপাদান এবং ক্রুসেড কাহিনীর প্রধান ভিত্তি। টায়ারের উইলিয়াম কেবল ল্যাটিনদের কার্যকলাপের বিবরণই দেননি, তিনি *এ হিস্টরি অব দি মুহাম্মাডান প্রিন্সেস ফ্রম দি এপিয়ারেন্স অব দি প্রফেট*- ও [হযরত মুহম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের পরবর্তী মুসলিম সুলতানগণের ইতিহাস] সংকলিত করেন। শেষোক্ত রচনাটি বর্তমানে পাওয়া না গেলেও ত্রিপোলির উইলিয়ামের *ট্র্যাক্টেটাস ডি স্ট্যাটু স্যারাসেনোরাম* (১২৭৩) গ্রন্থে এর যেটুকু সন্ধান পাওয়া যায় তাতে আরব বিশ্ব সম্পর্কে গ্রন্থকারের জ্ঞানের বিস্তৃতি এবং ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভা সম্পর্কে তার গভীর দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। মূল প্রাচ্য সূত্রের মধ্যে রয়েছে দ্বাদশ শতকের বিবরণী সম্বলিত উত্তর সিরিয়ার জনৈক শেখ, উসামা ইবনে মুনকিজের আত্মজীবনী; ইবনে আল-আসিরের আতাবেগের ইতিহাস; এবং বাহাউদ্দীন রচিত সালাহ্উদ্দীনের জীবনী। কিন্তু পাশ্চাত্যে যেকোনভাবেই হোক ক্রুসেডের কাহিনী দ্রুত রূপকথায় রূপান্তরিত হয়। *সং অব রোল্যাণ্ড*-এর পথপ্রদর্শন করে। এটি উত্তর স্পেনে খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত সীমান্ত যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে কবি-কল্পনার ফসল। ক্রুসেড যুদ্ধের প্রথম দিকে সম্ভবত প্রথম ক্রুসেডের সময় একই কল্পনার ক্রিয়া থেকে একটি রূপকথা সৃষ্টির সূচনা হয়, এবং ইতিহাস থেকে অনেক দূরে সরে গেলেও এটি ইতিহাসের পাশাপাশি অব্যাহত থাকে।[১] *চ্যান্সন ডেস চেটিফস* (১১৩০) এবং *চ্যান্সন ডি. এন্টিয়ক* (১১৮০)-এ ইতিমধ্যেই রূপকথার আবির্ভাব ঘটে। সং অব রোল্যাণ্ডে যেমন রোল্যান্ড ও অলিভারকে গৌরবমণ্ডিত করা হয়, তেমনি এখানেও পিটার দি হার্মিট বা গডফ্রে অব বুইলনকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এগুলিতে ক্রুসেডকে যদৃচ্ছক্রমে কখনো এখানে এবং কখনো ওখানে বড়ো করে প্রদর্শন করে এমন এক বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী তৈরি করা হয় যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাস্তবতার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছে। টাসো এই কাহিনীই গ্রহণ করেন এবং তাঁর মহাকাব্য *জেরুজালেমে লিবারেটায়* ষোড়শ শতকের রীতিগত মহাকাব্যীয় পরিচ্ছদে বিন্যাস করে। ইউরোপের হৃদয় থেকে ক্রুসেড কত দূর গিয়েছে এর চাইতে ভাল করে আর কোথাও তা প্রদর্শিত হয়নি। ডি স্যান্টিক্স বলেন, টাসো এমন একটি কাব্য রচনা করতে চেয়েছিলেন যা ধর্মীয় প্রেরণায়

১. ভন সাইবেলের গেস্চিচ্টে সে আর্সটেন ক্রুয়েয্যুগস দ্রষ্টব্য।

www.waytojannah.com

Contents

উজ্জীবিত হয়ে সত্যিকারভাবে বীরত্বব্যঞ্জক হবে, *পসিবিলমেন্টে স্টোরিকো ই প্রসিমো আল ভেরো ও ভেরিসিমিলি*। তিনি কতটা সফলতা অর্জন করেছেন? *আনমণ্ডো কেভালেরেস্কো, ফ্যান্টাস্টিকো, রোমান্যেস্কো ই ভল্যুটুওসো, চে সেন্টে লা মেসা ই সি ফা লা ক্রোসে*।[১]

ক্রুসেড বাস্তবে শার্লেমনের 'বিষয়' বা বৃটেন এণ্ড দি রাউণ্ড টেবলের 'বিষয়ের' ন্যায় মধ্যযুগীয় কাব্যের অন্যতম বড়ো 'বিষয়' কখনো হয়নি।[২] বস্তুত ক্রুসেড এই দুটি বিরাট বিষয়কে প্রভাবিত করেছে। শার্লেমনকে একজন ক্রুসেডার হিসাবে তৈরি করে কনস্টান্টিনোপলে, এবং এমনকি জেরুজালেমে পাঠানো হয়। আর্থারীয় কবিগণ তাদের কাহিনীতে ক্রুসেডের ন্যায় একটি রূপ আরোপ করেন। মধ্যযুগে ক্রুসেড না হলে *মর্টে ডি' আর্থার* বাস্তবে যা ছিলো তা হতো না। কিন্তু এ ধরনের প্রভাবের ক্ষেত্রে ইসলাম থেকে কোনো কিছু আহরণ করা হয়নি। এটি সর্বশ্রেষ্ঠ যুদ্ধ হিসাবে অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিশ্বাসের যুদ্ধের ধারণামাত্র এবং এই ধারণা ইরান ও তুরানের মধ্যে যুদ্ধের ন্যায়ই প্রাচীন। অবিশ্বাসের রূপায়ণ ছাড়া মধ্যযুগের কাব্য ভাণ্ডারে ইসলাম নিজেও অতি সামান্যই যুক্ত করেছে। *অকাসিন এণ্ড নিকলেট*-এর *ক্যান্টিফ্যাবল*-এর লেখক হয়তো আরবী সূত্র থেকে কোন কিছু ধার করেছেন। কিন্তু ধার করে থাকলেও ক্রুসেডের আওতার বাইরেই তিনি তা করেছেন।[৩] যে 'স্যারাসেনিক' মতবাদে কেবল সনেট নয়, মিলযুক্ত গীতিকাব্যের আকারও প্রাচ্য থেকে উদ্ভূত বলে ধারণা করা হয়, তার মধ্যে যদি কোন সত্যতা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রেও তা ক্রুসেডের আওতার বাইরেই হয়েছে এবং তা সিসিলীয় ইতিহাসের একটি ব্যাপার। এটি এমনি মনে হবে, যেন ট্রয়ের কাহিনী এবং আলেকজাণ্ডারের দুঃসাহসিক অভিযান মধ্যযুগীয় কবিদের কাছে ক্রুসেডের চাইতেও বেশি পরিমাণে প্রাচ্যের দৃশ্য তুলে ধরেছে। কেউ কেউ হয়তো এমন কথা বলতেও দ্বিধা করবেন না যে, কাউন্ট রবার্ট অব প্যারিস এবং দি ট্যালিসমান-এর সময়ের আগে পর্যন্ত ক্রুসেড পাশ্চাত্যের দুঃসাহসিক কাহিনীর সত্যিকার উপাদান হয়নি, কিন্তু ক্রুসেড স্বয়ং না হলেও ক্রুসেড থেকে যেসব প্রসঙ্গ ও উদ্দেশ্য পাওয়া যায়, তা মধ্যযুগের রোমান্টিক ঐতিহ্যের অর্ন্তভুক্ত হয়। যেমন জনৈক নাইট সম্পর্কে এরূপ প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয় যে, তাঁকে স্যারাসেন-দেশে বন্দী করা হয় এবং যে স্যারাসেন রাজকুমারী তাঁকে ভালোবাসতেন তিনি তাঁকে উদ্ধার করেন। যেমন কোন এক স্ত্রীর এরূপ *মটিফ* (উদ্দেশ্য) দেখানো হয় যে, তিনি দীর্ঘকাল বিরহ যন্ত্রণা

---

১. ডি স্যাঙ্কটিস, স্টোরিয়া চেল্লা লিটারেচুরা ইটালিয়ামা ২য়, ১৬১, ১৬৮।

২. প্রুট্স মন্তব্য করেন (অপ সিট. পৃ ৪৯৪) যে, প্রাথমিক ক্রুসেডারদের যে গোষ্ঠী একসময় অতৃপ্ত আগ্রহের সৃষ্টি করে ক্রুসেডের শেষের দিকে তাতে ভাটা পড়ে। একটি এক্সজামপ্লা বা উপদেশমূলক গল্প সংকলনের রচয়িতা জেমস্ অব ভিটি (১২৪০) লক্ষ্য করেছেন যে, লেখকদের কাছে ক্রুসেডের বিষয় ছাড়া অন্য যেকোন বিষয় অধিকতর আকর্ষণীয় ছিলো।

৩. প্রুট্স মনে করেন (পৃ ৪৫০) যে, একটি ভারতীয় ধারাবাহিক গল্প (কালিলা এণ্ড ডিমনা সম্ভবত ক্রুসেডের মাধ্যমে পশ্চিম ইউরোপে আসে। তিনি আরো বলেন যে, টভেয়ারগণ তাদের গাথা কাব্য প্রাচ্যের উপাদান সংযোজিত করেন এবং প্রাচ্যের গল্প-কাহিনী ও উপকথা বোক্কাক্কিও এবং ইটালীয় ঔপন্যাসিকগণ তাদের মাধ্যমেই লাভ করেন।

www.waytojannah.com

ভোগ করার পর তার ক্রুসেডার স্বামীকে ফিরে পাবার আশা ত্যাগ করে যখন আবার বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন তখন স্বামীর পুনরাবির্ভাব ঘটে—একা অথবা জনৈক স্যারাসিন মহিলাসহ, কিন্তু এসব হচ্ছে কল্পনার জালবোনা—এগুলির সঙ্গে ক্রুসেডের সত্যিকার বিষয় ও উপাদানের সম্পর্ক নেই।[১]

৩

ক্রুসেডের মাধ্যমে কিংবা জেরুজালেম রাজ্যের নলের মধ্য দিয়ে মুসলিম প্রাচ্য পশ্চিম ইউরোপের উপর যে প্রভাব সৃষ্টি করেছে সে প্রশ্ন ছাড়াও, পশ্চিম ইউরোপের একটি আন্দোলন হিসাবে নিজস্ব মূলভূমিতে ক্রুসেডের সামগ্রিক সাধারণ প্রভাবের অতিরিক্ত ও বৃহত্তর প্রশ্নটিও বিবেচনা করা যেতে পারে। এই অতিরিক্ত ও বৃহত্তর প্রশ্নটি আমাদের প্রসঙ্গের বাইরে অবস্থিত, তাই একটি পরিশিষ্ট ও একটি উপসংহার হিসাবে আরো কিছুটা মতামত, বিশেষত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্রুসেডের সাধারণ প্রতিক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।

ক্রুসেড চারদিক দিয়ে পশ্চিম ইউরোপের খৃস্টান জগতে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। প্রথমত যাজক সম্প্রদায় এবং বিশেষ করে পোপতন্ত্রে এর প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, এটি কতিপয় রাষ্ট্রের প্রত্যেকটির আভ্যন্তরীণ জীবন ও অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছে। আমরা আংশিকভাবে সরকারী (মূল 'স্টেট') কর্মপন্থায় এবং আংশিকভাবে দুটি ধর্ম বহির্ভূত এস্টেটের অবস্থায় এই প্রভাব দেখতে পাই–এস্টেট দুটি হচ্ছে অভিজাত শ্রেণী ও সাধারণ শ্রেণী, বিশেষ করে শহরবাসী সাধারণ শ্রেণী। তৃতীয়, এটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের বাহ্যিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে। এসব রাষ্ট্রের আপেক্ষিক মর্যাদা ও গুরুত্ব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এবং একটি ইউরোপীয় ব্যবস্থার সাধারণ বিকাশের ক্ষেত্রে এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শেষত, এটি এশিয়া মহাদেশের সঙ্গে ইউরোপের সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে। এবং ত্রয়োদশ শতক থেকে শুরু করে পঞ্চদশ শতকের সমাপ্তি পর্যন্ত অনুসন্ধানের যে সম্প্রসারমান আলোড়নের সৃষ্টি হয়, তার মধ্যে আমরা এমন একটি আন্দোলনের ধারাবাহিক পর্যায় দেখতে পাই যা ক্রুসেডই প্রথম সূচনা করে।

যাজক সম্প্রদায় ও পোপতন্ত্র

যাজক মণ্ডলী ছিলো একটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং যাজক মণ্ডলীর নেতা পোপ ছিলেন এক বিরাট ইউরোপীয় ব্যক্তিত্ব। তাই ক্রুসেডের ন্যায় একটি আন্তর্জাতিক ও

১. সম্ভবত আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পাশ্চাত্যের সঙ্গীত ক্রুসেডের যুগে কিছু পরিমাণে প্রাচ্যের সঙ্গীতের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

www.waytojannah.com

Contents

ইউরোপীয় উদ্যোগে স্বাভাবিকভাবেই যাজক মণ্ডলী ও পোপের নিয়ন্ত্রণ পূর্বেই নির্দিষ্ট হয়েছিলো বলে প্রতিভাত হয় এবং তার ফলে পৌরহিত্যবাদের প্রবণতা প্রাধান্য পেতে দেখা যায়। গ্রেগরিয়ান আন্দোলনে ইতিপূর্বেই এই প্রবণতা সঞ্চারিত হয়। দ্বিতীয় আরবানের ধারণা অনুযায়ী পোপকে পবিত্র যুদ্ধের জেনারেমিসিমো হতে হবে। ক্রুসেড হবে পোপতন্ত্রের পররাষ্ট্রনীতি, যা পরিচালিত হবে তারই ইঙ্গিতে। পোপের জনৈক প্রতিনিধি আল্লাহ্র বাহিনীর সঙ্গে থাকবে এবং সে বাহিনীর শাসনও তার হাতে থাকবে। কার্যক্ষেত্রে এ উচ্চাকাঙ্ক্ষা কখনো প্রতিফলিত হয়নি। যাজকীয় আওতা বহির্ভূত রাজাদের বৈষয়িক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ইতিমধ্যেই প্রাধান্য লাভ করে, এবং বস্তুত প্রথম ক্রুসেডে তাই ছিলো প্রধান। কিছু কিছু লোক যে যাজকীয় ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন তার স্থলে ১১০০ খৃষ্টাব্দে একটি পার্থিব জেরুজালেম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যে সব সম্রাট ও রাজা প্রথম ক্রুসেডে অনুপস্থিত ছিলেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্রুসেডে তারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন, আমরা মাঝে মাঝে লক্ষ্য করব যে, কিভাবে একটি বৈষয়িক রাষ্ট্র জেরুজালেমের আর্থিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য নিজস্ব কর ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। এতদসত্ত্বেও এবং পার্থিব নীতি এবং ব্যবস্থা সত্ত্বেও (যা চতুর্থ ক্রুসেডের সময় যতোটা সুস্পষ্ট ছিলো অন্য কোথাও ততটা ছিলো না) ক্রুসেড মূলত পোপতন্ত্রের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিলো। পোপরাই এসব ক্রুসেডে উদ্বুদ্ধ করতেন এবং এগুলিকে সংগঠিত করতেন। পোপরাই তাদের নির্দেশ দিতেন, এবং এই নির্দেশ কেবল প্রাচ্যের মুসলমানদের বিরুদ্ধেই নয়, পাশ্চাত্যের ধর্মদ্রোহী *আলবিজেনসিয়েনের*[১] বিরুদ্ধেও প্রদত্ত হয়। এবং দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের রাজত্বকালে এমন এক সময়ও আসে যখন জনৈক পোপ একজন পাপী সম্রাটের বিরুদ্ধে ক্রুসেড পরিচালিত করতে পারতেন। ক্রুসেড কেবল পোপতন্ত্রের নীতির একটি হাতিয়ারই ছিলো না, পোপের অর্থ বিভাগেরও একটি অংশ ছিলো। বৈষয়িক রাষ্ট্র যদি সালাহ্উদ্দীন *'টাইদ'* (উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশ কর, উশর) আরোপ করতো, পোপও তার নিজস্ব টাইদ অরোপ করতে পারতেন। ত্রয়োদশ শতকের সূচনার পর যাজকদের পক্ষ থেকে ক্রুসেডের অজুহাতে নিয়মিতভাবে এক দশমাংশ যাজকীয় রাজস্ব ধার্য করা হয়। এই রাজত্ব প্রথমে কাউন্সিলের ফরমান বলে এবং পরে পোপের কর্তৃত্বে ধার্য করা হয় এবং ইংল্যাণ্ডে রিফরমেশন (পোপ বিরোধী ধর্ম বিপ্লব) পর্যন্ত বলবৎ ছিলো। ক্রুসেড যেমন যাজক শ্রেণীর জন্য নতুন রাজস্বের সূত্রপাত করে, তেমনি তারা নতুন সম্প্রদায়েরও সৃষ্টি করে। টেম্পলারস নামক সংঘ ও হসপিটালারস্ নামক সংঘ নিয়মিত যাজক বিধির উপর ভিত্তি করে ইউরোপে যোদ্ধা–যাজকের এক নতুন শ্রেণী হিসাবে আবির্ভূত হয়। পেশাদার সৈনিক জীবনের সঙ্গে সন্ন্যাস জীবনের বিধি সংযুক্ত হয়।

---

১. আলবিজেনসীয় নামে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোক ; আনু. ১০২০–১২৫০ খৃষ্টাব্দে তারা ফ্রান্সের দক্ষিণে বসবাস করতো এবং ধর্মদ্রোহিতার জন্য শেষ পর্যন্ত তাদের নির্মূল করা হয়। –অনুবাদক।

www.waytojannah.com

সামরিক শৃংখলার মিশ্রিত বৈশিষ্ট্য ক্রুসেডের মিশ্রিত বৈশিষ্ট্যকে চমৎকারভাবে তুলে ধরে। এর ফলে ক্রুসেড একই সময়ে পোপপন্থী ও পোপবিরোধী, যাজকীয় ও যাজক-বিরোধী এবং যাজকতন্ত্রের সমর্থনপুষ্ট ও যাজকতন্ত্রের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে ওঠে। ক্রুসেড পবিত্র ও অপবিত্র, বৈষয়কি ও যাজকীয় এবং পার্থিব ও আধ্যাত্মিক ধারণার মধ্যে যে প্রাচীন সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিলো তা দূর না করলেও দুর্বল করে। ক্রুসেড ছিলো যুদ্ধরত সাধারণ মানুষের উৎসর্গ এবং এটি নিজস্ব পন্থায় সাধারণ মানুষকে পাপস্খালনের পথে পরিচালিত করতো। ক্রুসেডকে কেন্দ্র করে সাধারণ লোক এক ধরনের ধর্ম যাজক হতে পারতো এবং এর সঙ্গে সহযোগিতা করে সাধারণ রাষ্ট্র কিছু পরিমাণে পবিত্রতা অর্জন করতে পারতো। এক পারলৌকিক মনোভাব থেকে একটি আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। এমন এক যুগে এই আন্দোলনের জন্ম হয় যে যুগটি দৃশ্যত ধর্মতন্ত্রের দিকে যাচ্ছিল। তাই সাধারণ প্রেরণা ও সাধারণ শক্তি বিকাশে এই আন্দোলনের অবদানমূলক ক্ষমতা কোন অংশে কম ছিলো না। প্রাচ্যে ইসলামের সঙ্গে দৈনন্দিন যোগাযোগ—যে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতা, এবং সেসঙ্গে ঘনিষ্ঠতালব্ধ সহনশীলতা সৃষ্টি করে—বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের প্রাচীন বিরোধিতাকে দুর্বল করে, ঠিক যেমনিভাবে ক্রুসেড বিশ্বাসের আওতায় পার্থিব ও যাজকীয় পার্থক্যকে দুর্বল করেছিলো। ত্রয়োদশ শতকের সব লোকই দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের মনোভাবসম্পন্ন ছিলো না। তিনি পোপের বিরুদ্ধে একটি স্যারাসেন বাহিনী ব্যবহার করেন। আরব পণ্ডিতদের সঙ্গে পত্র বিনিময় করেন এবং যে সময় জেরুজালেমের অস্তিত্বের প্রশ্ন দেখা দেয় তখনো মুসলিম শাসকদের সঙ্গে আপোস আলোচনা করেন। যাই হোক পণ্ডিত ব্যক্তিরা আরব দার্শনিকদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণে আগ্রহ প্রদর্শন করেন, কেউ কেউ আরবী ভাষা শিখতে শুরু করেন এবং জ্ঞানার্জনের একটি নতুন প্রেরণার সৃষ্টি হয়। যে সেন্ট লুই বক্ষস্থলে তলোয়ার প্রবেশ করিয়ে অবিশ্বাসীর সঙ্গে কথা বলতেন তার মনোভাবের সঙ্গে, যে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় এরিস্টটলের *ফিজিকা এট মেটাফিজিকার* জন্য আরব স্পেনেও যেতে রাজি ছিলো তার মনোভাবের পার্থক্য ছিলো। ক্রুসেড থেকে আলাদাভাবে জ্ঞান চর্চার উদ্ভব ও বিকাশ সাধিত হয়। কিন্তু যে নতুন সমঝোতার যুগ সৃষ্টিতে ক্রুসেডও কিছুটা অবদান রাখে, কেবলমাত্র সে যুগেই জ্ঞানচর্চা এরিস্টটলের ধর্ম নিরপেক্ষ জ্ঞানের সঙ্গে বাইবেল ও গির্জার ঐতিহ্যের সমন্বয় সাধনের মহান দায়িত্ব সম্পাদনে সচেষ্ট হতে পারে।

রাষ্ট্র ও যাজকীয় আওতা বহির্ভূত এস্টেট

পাশ্চাত্যের আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় জীবনে ক্রুসেডের সবচাইতে সহজ ও সুস্পষ্ট ফলাফল হচ্ছে একটি নতুন ধরনের কর ব্যবস্থার বিকাশ। এতোদিন ভূমির উপর কর ধার্য করা হতো। ক্রুসেডের আবির্ভাবের পরেই আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর করের সূচনা দেখতে

www.waytojannah.com

পাই। সপ্তম লুই ১১৪৬ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম *প্রপটার সাসটেনটেশনেম টেরেই হিরোসলি মিটানেই* নামে একটি কর ধার্য করেন, এবং ১১৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এর পুনরাবৃত্তি করেন। ১১৬৬ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় হেন্‌রি তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। তিনি ঐ বছর প্রতি পাউণ্ডে দুই পেন্স হারে এবং এর পরবর্তী চার বছর প্রতি পাউণ্ডে এক পেনি হারে কর ধার্য করেন। তিনি সকল শ্রেণীর কাছ থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং আয়ের *(ক্যাটাল্লা এট রেডিটাস)* ভিত্তিতে এই কর আদায় করেন। ১১৮৪ খৃষ্টাব্দে ফিলিফ অগাস্টাস ও দ্বিতীয় হেনরি তাদের নিজ নিজ রাজ্যে পরবর্তী তিন বছরের জন্য এ ধরনের একটি কর আরোপে একমত হন। কিন্তু এই চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি। জেরুজালেমের পতনের পর ১১৮৮ খৃষ্টাব্দে উভয় রাজা সালাহউদ্দীন 'টাইদ' ধার্য করেন। অন্তত ইংল্যাণ্ডে এই দৃষ্টান্ত বিস্মৃত হয়নি, এবং ত্রয়োদশ শতকে *ক্যাটাল্লা এট রেডিটাস*–এর উপর কর জাতীয় অর্থ ব্যবস্থার একটি প্রচলিত বৈশিষ্ট্যে পরিণত করা হয়।[১]

পাশ্চাত্য রাজ্যগুলির যাজকীয় আওতা বহির্ভূত এস্টেটগুলির উপর ক্রুসেডের প্রতিক্রিয়া অনেক অনিশ্চিত ও অস্পষ্ট। এরূপ বলা হয় যে, ক্রুসেড সামান্ততন্ত্র অবসানে ও ব্যারানিয়াল এস্টেটের অবনতিতে অবদান সৃষ্টি করে। ক্রুসেড অশান্ত আবেগকে অবশ্যই প্রাচ্যের দিকে সিরিয়ায় নতুন জায়গীর (ফীফ্) অনুসন্ধানের জন্য কিংবা সামরিক সম্প্রদায়ের সদস্য হওয়ার জন্য আকৃষ্ট করে। এর ফলে সম্ভবত কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পত্তি বিক্রয় করা হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মালিকানা বৈধতায় গোলযোগ দেখা দেয়। কিন্তু পঞ্চদশ শতকের সমাপ্তি পর্যন্ত সামন্ততান্ত্রিক ব্যরনব্যবস্থা প্রাণবন্ত শক্তি হিসাবে অব্যাহত থাকে। ক্রুসের নতুন পদ্ধতির যুদ্ধ–বিগ্রহ এবং আমাদের ইতিপূর্বে উল্লিখিত টুর্নামেন্ট ও কুলজীচিহ্ন ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের সংশ্লিষ্ট করার ক্ষেত্রে যতটা অবদান সৃষ্টি করেছেন। তাদের মর্যাদা ব্যাহত করার ক্ষেত্রে ততটা অবদান সৃষ্টি করতে পারেনি। একইভাবে পৌর স্বাধীনতার উদ্ভব ক্রুসেডের অবদান বলে প্রায়ই উল্লেখ করা হয়। বলা হয় যে, ক্রুসেডে অংশগ্রহণকারী নেতাদের নগদ অর্থের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় পৌরসনদ প্রদান করা হয়। এখানেও আবার অনুমান প্রমাণকে ছাড়িয়ে গেছে। আমরা নির্বিবাদে একথা বলতে পারি যে, যেহেতু ক্রুসেডে ব্যবসা–বাণিজ্যের বিকাশ সাধন করেছে, সে জন্য ক্রুসেড আবশ্যিকভাবে বিভিন্ন শহর গড়ে ওঠাকেও উৎসাহিত করেছে। বড় বড় ইটালীয় বন্দরগুলি তাদের প্রাথমিক সমৃদ্ধির জন্য অবশ্যি ক্রুসেডের কাছে ঋণী। এবং যে স্থলবাণিজ্য পথে ভেনেসীয় পণ্য রাইন নদীর ওপারে বাল্টিক ও উত্তর সাগরে বহন করা হয়, আমরা দেখেছি যে, সেই বাণিজ্য পথও স্বাধীন শহর ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার জন্য দায়ী।

---

১. কার্টেল্লিয়েরি, ফিলিপ দি সেকেন্ড অগাস্ট, ২য় খণ্ড, পৃ ৮৫। পৃ. ৫ থেকে পরের দিকে এ বিষয়ের একটি পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

www.waytojannah.com

রাষ্ট্রসমূহ ও ইউরোপীয় ব্যবস্থার বাহ্যিক সম্পর্ক

কেবলমাত্র ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টির মাধ্যমে নয়, ইউরোপীয় ঐক্যের নতুন বন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমেও ক্রুসেড ইউরোপীয় ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধন করে। আমরা বলতে পারি যে, ১০৯৬ খৃষ্টাব্দের পর সংযুক্ত পশ্চিম ইউরোপের ধারণা কেবলমাত্র একটি হোলি রোমান এম্পায়ারের আনুষ্ঠানিক পরিকল্পনার মধ্যেই নয়, একটি সাধারণ ক্রুসেডের বাস্তব অবস্থার মধ্যেও প্রতিভাত হয় ।একথা সত্য যে, ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির শাসকরা যখন কোন ক্রুসেডে মিলিত হতেন তখন পারস্পরিকভাবে একমত না হওয়ার জন্যেই মিলিত হতেন। জাতীয় মতভেদ জাতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বারা জোরদার হতো, যা তৃতীয় ক্রুসেডে বিশেষভাবে দেখা যায়। এতদসত্ত্বেও পারস্পরিক স্বার্থের একটি ঐক্য ও একটি সাধারণ উদ্দেশ্যের মনোভাব কখনো সামগ্রিকভাবে তিরোহিত হয়নি। প্রাচ্যের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য বাগদাদ থেকে কোন নির্দেশ ছিলো না এবং খলীফারও কোন আহবান ছিলো না। বড় জোর মসুলে একটি বাস্তব ক্ষমতা ছিলো এবং একজন নূরুদ্দীনের একনিষ্ঠ বিশ্বাস ছিলো কিংবা একজন সালাহ্উদ্দীনের উৎসাহ–উদ্দীপনা ছিলো। পাশ্চাত্য খৃষ্টান শক্তির জন্য ছিলো এর পোপ এবং ক্রুসেড যুদ্ধের জন্য পোপের নির্দেশ। শত্রুর বিরুদ্ধে একটি সাধারণ আক্রমণ ব্যবস্থায় এটিকে আন্তর্জাতিকীকরণ করা হয়। একটি ইউরোপীয় কমনওয়েলথের ধারণা—একটি *রেসপাবলিকা ক্রিশ্চিয়ানা*, যা তুর্কীদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষায় বা আক্রমণে *রেস ক্রিশ্চিয়ানায়* ব্যাপৃত হয়—কয়েক শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। ওলন্দাজ পণ্ডিত টের মিউলেন তাঁর *ডেরগেডাঙ্কে ডের ইন্টারনেশনালেন অর্গানাইজেশন* নামক গ্রন্থে ডুবয়সের সময় (১৩০০) থেকে আব্বে ডি সেন্ট–পিয়ের ও কান্টের সময় (১৮০০) পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের যেসব পরিকল্পনা ইউরোপীয় ঐক্য বা রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রণীত হয় সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রামাণ্য হিসাবে উদ্ধৃত প্রায় সবগুলি পরিকল্পনায়ই তুর্কীদের বিরুদ্ধে সাধারণ কর্মপন্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। আমরা যা কিছু রেকর্ডপত্র পাই তার প্রায় সবগুলিতেই ক্রুসেডের অব্যাহত ধারণা নিহিত রয়েছে।

ইত্যবসরে ক্রুসেডের সময় এবং ক্রুসেডের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির ভারসাম্য পরিবর্তিত হয়। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যর তুলনায় ভারসাম্যের ক্ষেত্রে বাইযেন্টাইন সাম্রাজ্যের ওজন বিলীন হয়। ১২০৪ খৃষ্টাব্দে এর পতন হয় এবং ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে কনস্টান্টিনোপল ও টেবিজণ্ডে পুনরায় গ্রীক সাম্রাজ্যগুলির আবির্ভাব হলেও তারা একটি বিরাট নামের ছায়ামাত্র ছিলো। ইউরোপের ভারসাম্য পাশ্চাত্যে এসেই বজায় থাকে। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ফ্রান্স সর্বাধিক প্রাধান্য লাভ করে এবং এর সাফল্যে ক্রুসেড তার ভূমিকা পালন করে। ফরাসী ভূমিতেই ক্রুসেডের প্রচার করা হয় এবং ফরাসী নাইটরাই ক্রুসেড যুদ্ধ করে। সেন্টলুইর মাধ্যমে ফ্রান্সই পূর্ণাঙ্গ আদর্শ ক্রুসেডার তৈরি করে। ফরাসী ঔপনিবেশিকরা জেরুজালেম রাজ্যে বসতি স্থাপন করে, এবং যখন এর পতন হয় তখন

www.waytojannah.com

তারা সাইপ্রাস রাজ্যে বসবাস করে। তারা মোরিয়া এবং ডিউক শাসিত এথেন্সে বসতি স্থাপন করে। চতুর্দশ শতকের জনৈক ফরাসী লেখক বলেন, 'মোরিয়ার শিভ্যলরি পৃথিবীর সবচাইতে উন্নত শিভ্যলরি। সেখানে প্যারিসের মতই উত্তম ফরাসী ভাষা প্রচলিত।' লেভ্যান্টের মিশ্র সাধারণ ভাষা 'উত্তম ফরাসী ভাষা' নয়। এর একটি ল্যাটিন ভিত্তি রয়েছে যা ভেনেসীয় ও জেনোয়ী ব্যবসায়ীদের ইটালিয়ান ভাষা থেকে উদ্ভূত। কিন্তু পূর্ব ভূমধ্যসাগরে ফরাসী ভাষা টিকে না থাকলেও ফরাসী ঐতিহ্য কখনো তিরোহিত হবে না। পবিত্র স্থানসমূহের যে আশ্রিত রাজ্য শার্লেমন শাসন করতেন তার দায়িত্ব ষোড়শ শতকে প্রথম ফ্রান্সিস গ্রহণ করেন। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ল্যাটিনরা জেরুজালেমের ন্যাটিভিটি গুহাগৃহ (গ্রটো) এবং হোলি সেপালচারের অধিকার লাভ করেন। এ সব শর্ত উনবিংশ শতকেও কার্যকর রয়েছে এবং এগুলি ক্রিমিয়া যুদ্ধের অন্যতম কারণ ছিলো। এমন কি সেদিন পর্যন্তও ক্রুসেডের অন্যতম উত্তরাধিকার সিরিয়া ফরাসী অছি শাসনের অধীনে ছিলো।

ইউরোপ ও এশিয়ার সম্পর্ক

উপসংহারে ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের নতুন সম্পর্কের ব্যবস্থার কথা বলতে হয়। যার সূচনা হয়েছিল ক্রুসেডের মাধ্যমে। ক্রুসেডের মাধ্যমে ইউরোপ কেবল আভ্যন্তরীণ ঐক্যের একটি নতুন রূপ এবং নিজস্ব আভ্যন্তরীণ জীবনের উপর একটি নতুন প্রভাবই লাভ করেনি, বিশ্ব সম্পর্কে একটি নতুন ও ব্যাপকভাবে প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গিও লাভ করেছে। দৃষ্টির এই প্রশস্ততা এবং সেসঙ্গে আবিষ্কার ও ভৌগোলিক জ্ঞানের বিকাশই হচ্ছে ক্রুসেডের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। দ্বাদশ শতকে তীর্থযাত্রীদের পথ প্রদর্শকদের জন্য ভূগোল ছিলো একটি বহুমূল্য সম্পদ।[১] এতে বিভিন্ন পথ ও পবিত্র স্থানের যেসব গুরুত্বপূর্ণ এলাকা (বিশেষ করে ফিলিস্তিন ও মিসরের মধ্যবর্তী এলাকা) সামরিক অনুসন্ধান কার্য পরিচালনার পর অধিকার করা হয় সেগুলির বিবরণ থাকতো। এগুলি কেবলমাত্র 'নিকটবর্তী এশিয়ার' উপকূলীয় প্রান্তকেই স্পর্শ করে। কিন্তু আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে, ত্রয়োদশ শতকে আবিষ্কার ও বর্ণনা সমগ্র 'দূরবর্তী এশিয়ায়' প্রসারিত হয়। এশিয়া আবিষ্কারের মহান যুগ ষোড়শ শতকে আমেরিকা আবিষ্কারের যুগের সমান না হলেও সমতুল্য। প্রায় ১২৪০ খৃষ্টাব্দের দিকে এই আবিষ্কার শুরু হয় এবং এক শতাব্দী পরে শেষ হয়।[২] ঐ শতকে এশিয়া একটি মঙ্গোল সাম্রাজ্যের অধীনে অসংলগ্নভাবে একত্রিত ছিলো। এর বিস্তৃতি ছিলো ক্রিমিয়া ও তাব্রিজ থেকে শুরু করে বোখারা ও সমরকন্দ হয়ে ক্যাম্বালুক

১. পেরেগ্রিনেটর্স সম্পর্কে প্রুট্স্ (অপ সিট পৃ. ৪৭০) এবং ইটিনেরা হিরোসলিমিটানা যেমন কর্প, স্ক্রিপ্ট, একল ল্যাটিন)–এর সংস্করণসমূহ এবং প্যালেস্টাইন পিলগ্রিম্স টেক্সট সোসাইটির প্রকাশনাসমূহ দ্রষ্টব্য।

২. প্রফেসর এ পি নিউটন কর্তৃক সম্পাদিত ট্রাভ্ল এন্ড ট্রাভ্লার্স অব দি মিডল এজেস মিস ইলিন পাওয়ারের 'ক্যাথে পর্যন্ত স্থল পথ উন্মুক্তকরণ সংক্রান্ত অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

www.waytojannah.com

(পিকিং) ও কিন্‌সাই (হ্যাংচৌ) পর্যন্ত। মঙ্গোলরা তাদের প্রাচীন শামান ধর্মের[১] অনুসারী ছিলো এবং অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি সহনশীল ছিলো। নিজেরা খৃস্টান না হলেও তারা তাদের সাম্রাজ্যে খৃস্টানদের আশ্রয় প্রদান করে। খৃস্টান প্রেরণা তাদের ধর্মান্তরিত করার আশা পোষণ করে এবং খৃস্টান বাণিজ্যিক উদ্দীপনা তাদের সাম্রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রাচ্য বাণিজ্যের উৎসস্থল পর্যন্ত বাণিজ্য পথ সৃষ্টি করতে চায়। মঙ্গোলদের নিকট অংশত এরূপ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে মিশন পেরিত হয় যে, তারা ধর্মান্তরিত হলে শেষ পর্যন্ত ক্রুসেডের উদ্দেশ্য সফল হবে এবং পবিত্র ভূমি স্থায়িভাবে পুনরুদ্ধার করা যাবে। কিন্তু এটি ক্রুসেডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলেও এতে ক্রুসেডের আওতা অতিক্রম করা হয়। রেমাণ্ডাস লালাসের মতো অনেকেই মনে করতেন যে, এই মিশন ক্রুসেডের স্থলাভিষিক্ত হওয়া এবং সামরিক অভিযানের স্থলে শান্তিপূর্ণ ধর্ম প্রচার প্রবর্তিত হওয়া উচিত। তারা এও চাইতেন যে, এশিয়ার এসব ধর্মান্তরই এর একান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত, যাতে করে পানি যেভাবে সমুদ্রকে আবৃত করে তেমনিভাবে পৃথিবী আল্লাহ্‌র জ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়। মঙ্গোলদের সহনশীলতা এবং এশিয়ায় নেস্টোরিয়ান খৃস্টানদের অবস্থানের সুযোগে এসব খৃস্টান মিশনারী বহুদূর পর্যন্ত ভ্রমণ করে। চতুর্দশ শতকের শুরুতে চীনে ল্যাটিন চার্চের প্রতিষ্ঠাতা জন অব মন্টিকর্ভিনো ক্যাম্বালুকের আর্কবিশপ হন। তিনজন ফ্রান্সিসকান তার অধীনে বিশপ ছিলেন। ইটালীয় বন্দরসমূহের নাবিকরা যেভাবে প্রথম ক্রুসেডের সহগামী হয়েছিলো তেমনিভাবে এই মিশনের সঙ্গে ইটালীয় বণিকরা সহগামী হয়। এর অনুসরণে কেবল পোলোরাই (মার্কোপোলো প্রমুখ) তাদের বিরাট ভ্রমণে বের হননি। (আরো সুস্পষ্ট পদক্ষেপ হিসাবে) একটি জেনোয়ী কোম্পানী কাস্পিয়ান সাগরে নৌ–বাণিজ্য অভিযান পরিচালনা করে এবং জনৈক ভেনেসীয় কনসাল তাব্রিজে বসতি স্থাপন করেন। এ ব্যাপারে সবগুলি বড় বড় আশা ব্যর্থ হয়। একটি খৃস্টান এশিয়াকে একটি খৃস্টান ইউরোপের সঙ্গে সংযুক্ত করার এবং ইসলামকে স্পেনের একটি অংশে ও লেভ্যান্টের এক কোণে একটি ক্ষুদ্র শক্তিতে সীমাবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্যে মঙ্গোলদের ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত করার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। পারস্যের খান শাসিত সাম্রাজ্য ১৩১৬ খৃস্টাব্দে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি মধ্য এশিয়াও একই পথ অনুসরণ করে। ১৩৬৮–৭০ খৃস্টাব্দে চীনের ক্ষমতাসীন স্থানীয় রাজ বংশ মিংরা বিদেশীদের চীনে প্রবেশ বন্ধ করে দেয়। শেষ পর্যন্ত পরিণাম ফল দাঁড়ায় খৃস্ট ধর্মের অবনতিতে এবং ইসলাম ধর্মের বিস্তৃতিতে। ওসমানী তুর্কীদের ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে ইসলাম আরো বিস্তৃত পরিসরে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু অপরাজিত পাশ্চাত্যের জন্য একটি নতুন আশার আলো উদ্ভাসিত হয় এবং এই নতুন আশারই ফলশ্রুতি ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লব। স্থলপথ যদি রুদ্ধই হলো, তাহলে খৃস্টানরা

---

১. এককালে উত্তর–পূর্ব এশিয়ায় প্রচলিত একটি ধর্ম, যা এই মতবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে যে, কেবলমাত্র শামানদের (তান্ত্রিক পুরোহিত) দ্বারাই ভালো ও মন্দের ক্রিয়া প্রভাবিত করা যায়। –অনুবাদক।

www.waytojannah.com

কেন সমুদ্র পথে এগিয়ে যাবে না? কেন তারা নৌপথে প্রাচ্যে গিয়ে পেছন থেকে মুসলমানদের ধরবে না এবং জেরুজালেমকে *এ টের্গো* হিসাবে জয় করবে না? বড় বড় নাবিকদের মনোভাব তাই ছিলো। তারা তাদের বক্ষদেশে ক্রুশ পরিধান করে সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে বিশ্বাস করতেন যে, তারা পবিত্র ভূমি উদ্ধারের জন্যই সাধনা করছেন। কলোম্বাস ক্যাথের পরিবর্তে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ পেলেও আমরা অন্তত একথা বলতে পরি যে, তার সঙ্গী স্পেনীয়রা খৃষ্ট ধর্মের জন্য একটি মহাদেশ পেয়েছে এবং পাশ্চাত্য যা স্বপ্নেও ভাবেনি এমন এক পন্থায় অবশেষে ভারসাম্যকে তার অনুকূলে পেয়েছে।

আমরা যদি বৃহত্তর পরিসরের কথা এবং মূল প্রেরণার পর সুদীর্ঘ তৎপরতার কথা বিবেচনা করি তাহলে আমরা মনে করবো না যে, ক্রুসেড ব্যর্থ হয়েছে। এমন কি পূর্ব ভূমধ্যসাগরে ইসলামের হুমকির বিরুদ্ধে একটি সাধারণ খৃষ্টান শক্তিকে রক্ষা করার ব্যাপারে মূল উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রেও ক্রুসেড ব্যর্থ হয়নি। আমরা বলতে পারি যে, ক্রুসেড সেলজুক তুর্কীদের এশীয় সীমানায় নাইসিয়ায় সীমাবদ্ধ রেখে তার অভিযান শুরু করে এবং ওসমানীয় তুর্কীদের খোদ ইউরোপে দানিউবের তীরে সীমাবদ্ধ রেখে তার অভিযান সমাপ্ত করে। আমরা আবার অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে পারি যে, প্রায় পাঁচ শ বছর পর মুসলিম শাসিত এলাকায় পবিত্র স্থানসমূহের একটি ফ্রাঙ্কিশ অশ্রিত রাজ্যসহ সবকিছু যেখান থেকে শুরু হয়েছিলো সেখানেই শেষ হয়েছে। কিন্তু এলাকাই সবকিছু নয়। মানচিত্রের মানদণ্ডে ক্রুসেড যদি কোন কিছু লাভ করে না থাকে, অথবা রক্ষা করতেও না পেরে থাকে তবুও ক্রুসেড অন্য এমন কিছু লাভ করেছে বা রক্ষা করেছে যা অধিকতর সূক্ষ্ম হলেও কোন অংশে কম বাস্তব নয়। ক্রুসেড মধ্যযুগে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকাশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে পাশ্চাত্য খৃষ্টান শক্তিকে রক্ষা করেছে। তাকে আত্মকেন্দ্রিক স্থানীয়তাবাদের কবল থেকে মুক্ত করেছে; তাকে প্রসারতা ও একটি গভীর দৃষ্টি প্রদান করেছে। যে জাতির কোন গভীর দৃষ্টি নাই তা ধ্বংস হয়'; এবং মধ্যযুগের জাতিসমূহের জন্য ক্রুসেডের গভীর দৃষ্টি যা কদাচিত দৃঢ়ভাবে দেখা যায়, এবং সম্ভবত কখনো সামগ্রিকভাবে দেখা যায় না—একটি মুক্তির আদর্শ হিসাবে কোন অংশে কম নয়।

আর্নেস্ট বার্কার

www.waytojannah.com

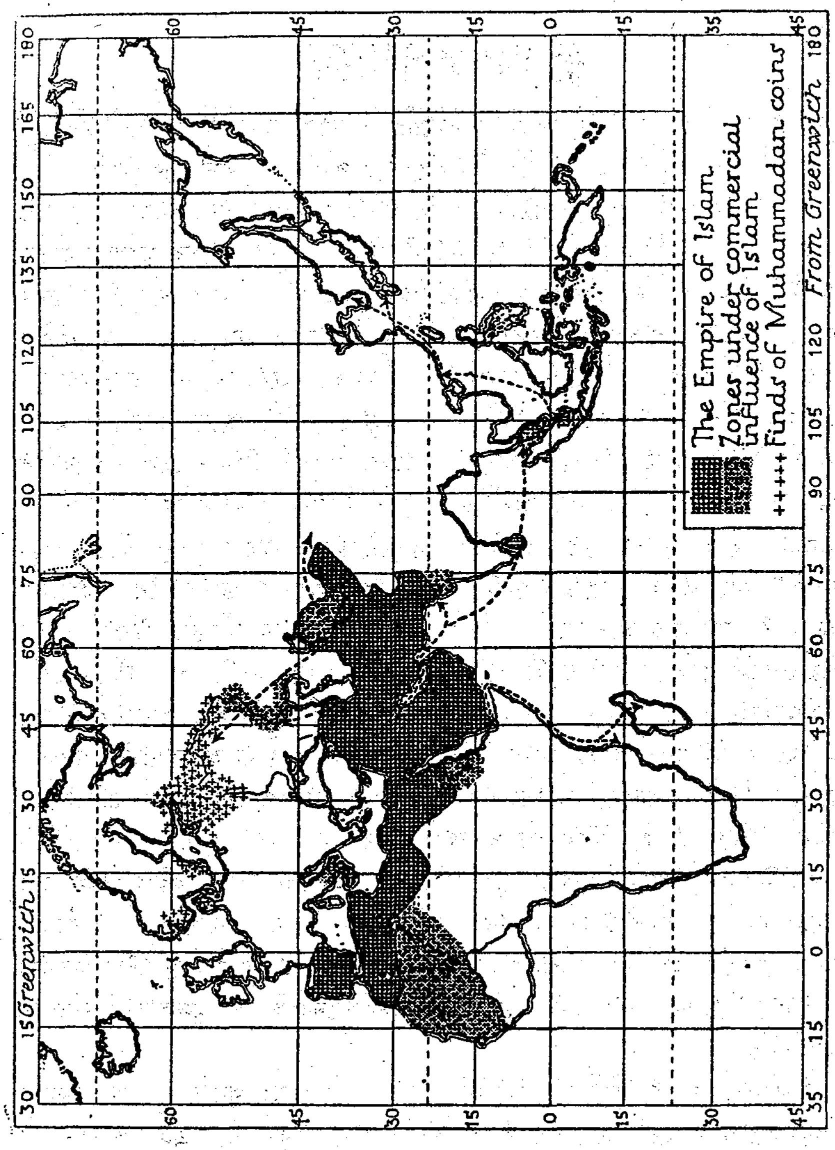

চিত্র-১২. দশম শতাব্দীতে ইসলামী শাসনের ভৌগোলিক বিস্তার এবং বাণিজ্যিক প্রভাব মানচিত্রে দেখানো হয়েছে

www.waytojannah.com

ভূগোল ও বাণিজ্য

আমরা যদি দশম শতকের মাঝামাঝি সময়ের ইউরোপ, আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ার একটি রাজনৈতিক মানচিত্র অংকন করি তাহলে দেখতে পাবো যে, 'বসতিপূর্ণ বিশ্বের' অতি বৃহত্তর যে অংশটিকে গ্রীকরা 'ওইকাউমেন' বলে অভিহিত করতো তা ইসলামী সরকার ও ইসলামী সভ্যতার অধিকারী দেশগুলির দখলে ছিলো। এসব দেশের মধ্যে মজবুত রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে না উঠলেও সাধারণভাবে এমন একটি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বন্ধন ছিলো যাতে তাদের অধিবাসীরা এবং মুসলমান অধিবাসীরাই নয়, বরং সকল শ্রেণীর নাগরিকই নিজেদের এক বিশাল সাম্রাজ্যের নাগরিক বলে মনে করতো। এ সাম্রাজ্যের ধর্মীয় কেন্দ্র ছিলো মক্কা এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিলো বাগদাদ। মূলত মদীনা থেকে পর্যায়ক্রমিক বিজয় অভিযানের মাধ্যমে পূর্ববর্তী তিন শতকে এই বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। পশ্চিম দিকে মিসর এবং সুদূর অ্যান্টি-এ্যাটলাস পর্যন্ত আটলান্টিক উপকূলসহ আফ্রিকার সমগ্র উত্তর উপকূল এর অন্তর্ভুক্ত ছিলো। আরো দূরে অ্যাস্টিরিয়া ছাড়া মসগ্র স্পেন এবং সিসিলি ও ক্রিট দ্বীপগুলি এর অন্তর্ভুক্ত ছিলো। সার্ডিনিয়া এবং সাইপ্রাসও মুসলমানদের অব্যাহত অভিযানের আওতায় ছিলো। তেমনি অবস্থায় ছিলো দক্ষিণ ইটালীয় উপকূল, যেখানে বারি প্রভৃতি কতিপয় শহর প্রকৃতপক্ষে মুসলিম শাসনাধীনে ছিলো এবং আমাল্‌ফি ইত্যাদি কতিপয় শহর তাদের প্রভাবাধীনে ছিলো। আরবের উত্তরে আর্মোনিয়া ও দক্ষিণপূর্ব ককেসাসসহ সিরিয়া মুসলমানদের স্থায়ী অধিকারভুক্ত ছিলো। আরো পূর্বে ইরাকসহ মেসোপটেমিয়া এবং তারপর আধুনিক পারস্য ও আফগানিস্তানের সামগ্রিক অঞ্চল তারা অধিকারভুক্ত করে। আবার এসব দেশের উত্তরদিকে ট্রান্সোক্সানিয়াও ইসলামের কর্তৃত্বাধীনে আসে। পশ্চিমে খাওয়ারিজম্‌ বদ্বীপ অঞ্চল এবং পূর্বে ফারগনার পার্বত্য ও উপত্যকা অঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত ছিলো। ইতিমধ্যে অষ্টম শতকে সিন্ধু নদ অতিক্রম করা হয়। সিন্ধুদেশসহ এর ভাটি অঞ্চল ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আফ্রিকার দক্ষিণ দিকে কেবলমাত্র মিসরে আসওয়ানের অক্ষাংশ মুসলমানরা কদাচিৎ অতিক্রম করে।

'আমাদের যুগে ইসলামী সাম্রাজ্য ফারগানার সীমা থেকে খুরাসান, আল-জিবান (মেডিয়া) ইরাক ও আরব হয়ে ইয়ামনের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই পথ প্রায় চার মাসের সফর ছিলো। এর প্রস্থ ছিলো রুম দেশ (বাইযেন্টাইন সাম্রাজ্য) থেকে সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, ইরাক, ফারস্‌ এবং কিরমান হয়ে ফার্‌স্‌ সাগরের (ভারত মহাসাগর) উপকূলবর্তী আল-মনসূরা অঞ্চল পর্যন্ত। এইপথ ভ্রমণ করতে প্রায় চারমাস অতিবাহিত

www.waytojannah.com

হতো। ইসলামী রাজত্বের দৈর্ঘ বর্ণনা করতে গিয়ে ইতিপূর্বে আমি মাগরিব (উত্তর আফ্রিকা) ও আন্দালুসের (স্পেন) কথা উল্লেখ করিনি, কারণ এটি জামার আস্তিনের মতো। মাগরিবের পূর্বে ও পশ্চিমে কোন ইসলামী রাজ্য নেই। অবশ্য কেউ যদি মিসরের পরে মাগরিবের দেশে যায় তাহলে সুদানের (কৃষ্ণকায়) দেশ মাগরিবের দক্ষিণে অবস্থিত এবং এর উত্তরে রুম সাগর (ভূমধ্য সাগর) এবং তারপর রুম অঞ্চল অবস্থিত।'

ভূগোলবিদ ইবন হাউকালের অনুমানিক ৯৭৫ খৃস্টাব্দের লেখা থেকে উপরিউক্ত উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

উপরে বর্ণিত অঞ্চলগুলির সাথে বর্তমানে মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলির আদৌ কোন মিল না থাকলেও এবং তা বর্তমানের তুলনায় অনেক ছোট হলেও একথা সত্য যে, এই অঞ্চলগুলি ধর্মীয় দিক ছাড়া রাজনৈতিক দিক দিয়েও একটি শক্তিশালী ব্লক ছিলো। অস্ত্রের শক্তিতে এগুলি একতাবদ্ধ হয় এবং তৎকালে জ্ঞাত বিশ্বে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শক্তিতে পরিণত হয়।

অপর দিকে আমরা যদি ঐ সময়কার খৃস্টান ইউরোপীয় বিশ্বের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করি তাহলে এই বিশ্ব বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের উপর কতখানি নির্ভরশীল ছিলো তা সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারবো। ঐ সময় ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণে মুসলিম উপকূলসমূহের শাসকদের অধীনে একটি অপ্রতিরোধ্য প্রতিবন্ধকতা গড়ে ওঠে। উত্তর ককেসাস ও পূর্ব ইউরোপে যেসব অর্ধ সভ্য জাতি বাস করতো তারা যতটা খৃস্টান প্রভাবাধীন ছিলো, অন্তত ততোটা মুসলিম প্রভাবাধীনেও ছিলো। কেবলমাত্র ইউরোপের উত্তরে পৌত্তলিক নর্ম্যানরা (উত্তর ইউরোপের অধিবাসী) এ সময় তাদের শক্তি সম্প্রসারণের সূচনা করে, যা দ্বাদশ শতকে ইসলামের একচ্ছত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নেতৃত্বের অবসানে বিরাট অবদান সৃষ্টি করে।

দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মের তীর্থস্থানগুলির তুলনামূলক ভৌগোলিক অবস্থান সম্পূর্ণ পৃথক। খৃস্টান ইউরোপের আদর্শ ধর্মীয় কেন্দ্র জেরুজালেম ৬৩৮ খৃস্টাব্দ থেকে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিলো। কিন্তু মুসলিম বিজয়ের ফলে হোলি সেপালচারে ইউরোপীয় খৃস্টানদের তীর্থযাত্রা বন্ধ হয়নি। আমরা যে সব প্রথম তীর্থযাত্রীর ভ্রমণ কাহিনী পাই তারা হচ্ছেন ফ্রাঙ্ক আরকাল্‌ফ (আনু. ৬৮০), স্যাক্সন উইলিবাল্ড (আনু. ৭২৫) এবং জনৈক বার্নার্ড, যিনি আনু. ৮৭০ খৃস্টাব্দে রোম থেকে তীর্থযাত্রা করেন। নিঃসন্দেহে আমরা কেবল এদের কাছ থেকেই মুসলমানদের দ্বারা বিজিত দেশসমূহের তথ্য পাইনি। এক্ষেত্রে বাইযেন্টাইন সাম্রাজ্যের খৃস্টানদের সঙ্গে মিসর, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়ায় বসবাসকারী তাদের স্বধর্মীদের সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলো।

মুসলিম বিশ্বের ব্যাপারসমূহ ছিলো সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। তীর্থযাত্রার কেন্দ্রস্থল মক্কা স্বয়ং মুসলমানদের কাছে একটি কেন্দ্রীয় ভৌগোলিক মর্যাদা লাভ করে। আল্লাহ্‌র ঘরে

www.waytojannah.com

তীর্থযাত্রা বা হজ্জ ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম। ইসলামী সাম্রাজ্যের সকল এলাকা থেকে মুসলমানরা এখানে মিলিত হতেন। কাজেই হজ্জ কেবল ধর্মীয় ঐক্যসাধনের একটি শক্তিশালী নিয়ামক ছিলো না, মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নয়নে এবং বিশ্বের সকল অংশ সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণে হজ্জ বৈষয়িকভাবেও সাহায্য করে। হজ্জকে কেন্দ্র করে কতিপয় ভ্রমণ নির্দেশক পুস্তিকা সংকলিত হয়। এগুলিতে বিভিন্ন দেশ থেকে মক্কাগমনের পথসমূহের বিভিন্ন কেন্দ্র ও পর্যায় উল্লিখিত হয়। অবশ্য এগুলিতে তৎকালীন জ্ঞাত বিশ্বের অমুসলিম এলাকাগুলি সম্পর্কে জ্ঞানের ও আগ্রহের অভাব ছিলো।

ইসলাম প্রায় সকল দিক দিয়ে খৃস্টান ইউরোপের সাংস্কৃতিক দিগন্তকে সীমাবদ্ধ করার পর প্রায় এক সহস্র বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ইত্যবসরে ইউরোপ নৌপ্রদক্ষিণ করেছে এবং যেসব বাধা তাকে অজ্ঞাত বিশ্বের কথা বাদ দিলেও জ্ঞাত বিশ্বের দক্ষিণ ও পূর্ব অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সেগুলিকে অতিক্রম করেছে। ইউরোপ এর অনেকখানি নিজস্ব শক্তি ও উদ্যোগেই করেছে। কিন্তু যারা এক সময় বিশ্বের হর্তাকর্তা ছিলেন তাদের দ্বারাও ইউরোপ অনেকখানি উপকৃত হয়েছে। তাই ভৌগোলিক জ্ঞান আবিষ্কার ও বিশ্ববাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদেরকে তার সাংস্কৃতিক পূর্ব পুরুষ হিসাবে দেখা ইউরোপের উচিত ছিলো। এসব কর্মক্ষেত্রে আমাদের আধুনিক সভ্যতায় ইসলাম যে অবদান রেখেছে তা আমাদের ব্যবসায়–বাণিজ্য ও নৌচলাচলের শব্দভাণ্ডারে বহু মূল আরবী শব্দ থেকে বোঝা যায়। আমাদের প্রকৃত ভৌগোলিক জ্ঞান যে এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত কেবলমাত্র তার ঐতিহাসিক বিকাশ পর্যালোচনার মাধ্যমেই এই প্রভাবের গভীরতা প্রমাণ করা যায়। কারণ আধুনিক ভূগোল এমন একটি প্রত্যক্ষ ও ঐতিহ্য বর্জিত বিজ্ঞান যেখানে পূর্ববর্তী যুগসমূহের অল্প বিস্তর নির্ভুল প্রায় সব মতামতই বিবেচনার বহির্ভূত রাখে। আমি 'প্রায়' শব্দটি কেন ব্যবহার করেছি তার দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করতে চাই যে, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জউবার্ট যখন তার ইদ্রিসীর ফরাসী অনুবাদের সম্পাদনা করেন তখন এই সংস্করণের দ্বারা বিশ্বের ভৌগোলিক জ্ঞান এবং বিশেষ করে আফ্রিকার জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে পারে এমন কথা চিন্তা করা হয়নি।

আমাদের বিশ্ব–জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের ইসলামী সংস্কৃতির পূর্বপুরুষদের ঐতিহাসিক প্রভাব পর্যালোচনা কিছুটা দুঃসাধ্য। কারণ, মুসলমানদের ভৌগোলিক জ্ঞান কতোটা ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল ছিলো, তারা ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে কতদূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন এবং তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্কের বিস্তার কতটা ছিলো, এগুলি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সবসময় সহজ নয়। নবম শতক থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত এক উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক রচনা আরবীতে প্রকাশিত হয়। তাই উপরোক্ত বক্তব্য বিস্ময়কর মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের কাছে এই রচনার প্রধান অংশ জ্ঞানী ও

www.waytojannah.com

সাহিত্যিকদের সরকারী বিজ্ঞান মাত্র। এসব লেখক যেসব অঞ্চলে ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভ্রমণ করেছেন, সেগুলি সম্পর্কে যতবেশি পর্যবেক্ষণশীল হোন না কেন, এবং যেসব পর্যটক ও নাবিকের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাদের কথা যত মনোযোগ সহকারেই শ্রবণ করুন না কেন, তারা তখনো কমবেশি আদর্শগত ধর্মীয় ও ঐতিহ্যগত মতামতের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন। এই অবস্থায় 'অন্ধকার যুগের' খৃস্টান পণ্ডিতদের চাইতে তাদের মতামত অনেক বেশি সংস্কারমুক্ত থাকলেও কতিপয় বাস্তবকে তারা সত্যিকার আলোকে দেখতে পাননি। এই সরকারী ও সাহিত্যমূলক বিজ্ঞান ছাড়াও এসময় সমুদ্র ভ্রমণকারী ও বণিকদের বিরাট নৌ ও ভৌগোলিক অভিজ্ঞতা ছিলো। সাহিত্যিকরা অবশ্যই এদের জ্ঞানের দ্বারা লাভবান হন। কিন্তু কোন কোন সময় তাদের নিজস্ব লেখা থেকে দেখা যায় যে, যেসব ব্যবসায়ী ও নাবিক ততোটা দাম্ভিকতার আশ্রয় গ্রহণ করেননি তারা লেখকদের চাইতেও বেশি সংস্কারমুক্ত ছিলেন। বর্তমানে আমরা এই অপেক্ষাকৃত বিনয়ী লোকদেরই ইসলাম ও মধ্যযুগীয় ইউরোপের সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রধান আপোসকারী ও শিক্ষক হিসাবে বিবেচনা করবো। বড় বড় আরবী ভৌগোলিক রচনা জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত ভৌগোলিক ক্ষেত্র ছাড়া মধ্যযুগীয় ভৌগোলিক মতামতের ক্ষেত্রে কার্যত তাৎক্ষণিক কোন প্রভাব সৃষ্টি করেছে বলে মনে হয় না।

আমরা অবশ্য আরবী সাহিত্যে মুসলমানদের বিরাট ভৌগোলিক জ্ঞান কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার পর্যালোচনা পরিহার করবো না। ইসলামের প্রথম ১৫০ বছরে বিজ্ঞান হিসাবে ভূগোল, আমরা খৃস্টান জগতে যা লক্ষ্য করেছি তার চাইতে নিশ্চয়ই উন্নত ছিলো না। মহানবীর সমসাময়িক লেখকদের উক্তিতে বিশ্বের দৈর্ঘ, অংশসমূহ নীলনদের উৎস এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে অদ্ভুত মতামত পাওয়া যায়। এসব মতামতের মধ্যে একটিতে পৃথিবীকে একটি পাখির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে যার মাথা হচ্ছে চীন এবং লেজ হচ্ছে আফ্রিকা। কুরআনে দুবার ভৌগোলিক ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ একটি অনতিক্রম্য বাধার সাহায্যে দুটি সমুদ্রকে পৃথক করেছেন (২৫.৫৫ ; পাতা ১৯,২০)। পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই উক্তিকে ভূমধ্যসাগর এবং লোহিত সাগরসহ ভারত মহাসাগরের প্রতি ইঙ্গিত বলে অভিমত প্রদান করেছেন এবং তাদের এই বিশ্লেষণ সম্ভবত সত্য। দুই সমুদ্রের এই মতবাদ যে মূলত পারসিক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কুরআনে উল্লিখিত হওয়ায় এই মতবাদটি ধর্মীয় বিশ্বাসে উন্নীত হয়েছে এবং মুসলমানদের সর্বপ্রকার ভৌগোলিক রচনায় ও মানচিত্র অঙ্কন বিদ্যায় এটি বহুল পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করেছে।

গ্রীকদের প্রভাবেই ইসলামে ভূগোলের বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা শুরু হয়। নবম শতকের শুরুতে বিশেষ করে খলীফা আল মামুনের রাজত্বকালে (৮১৩—৩৩) গ্রীক রচনাবলীর যে ব্যাপক অনুবাদকার্য শুরু হয় তাতে মুসলমানরা গ্রীক সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী হয়ে পড়েন। এর একটি ফলশ্রুতি হচ্ছে টলেমীর ভৌগোলিক রচনার সঙ্গে

www.waytojannah.com

তাদের পরিচিতি। টলেমীর আফ্রিকার পূর্ব উপকূলকে প্রাচ্যের দিকে সম্প্রসারিত করার মতবাদ দুই সমুদ্রের মতবাদের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। টলেমীর রচনার প্রাথমিক আরবী অনুবাদ আমরা পাই নি, কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানী আল খারেজমী ৮৩০ খৃষ্টাব্দের দিকে এর যে পরিবর্তিত সংকলন প্রণয়ন করেন তা পাওয়া যায়। কিন্তু এর সঙ্গে আবশ্যিকভাবে যে মানচিত্র ছিলো তা নেই। আল খারেজমীর অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাগুলি অনেকাংশেই টলেমীর অনুরূপ, কিন্তু তাঁর গ্রন্থে মুসলিম বিজয়ের পর যেসব স্থানের সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলির ভৌগোলিক অবস্থানও দেয়া হয়েছে। এই শেষোক্ত তথ্যগুলো জোতির্বিজ্ঞানের নতুন পর্যবেক্ষণের ফল কিনা তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। আমরা শুধু এটুকু জানতে পারি যে, খলীফা আল মামুন সিরীয় মরুভূমিতে একটি ভৌগোলিক ডিগ্রী পরিমাপ করার নির্দেশ দেন এবং একই খলীফার নির্দেশে আল–খারেজমীসহ সত্তরজন পণ্ডিত ব্যক্তি 'পৃথিবীর একটি প্রতিমূর্তি' তৈরি করেন, যার বর্ণনা পরবর্তীকালের একটি রচনায় এখনো পাওয়া যায়। কাজেই আমরা ধরে নিতে পারি যে, আল–খারেজমীর গ্রন্থে ইতিমধ্যে মুসলিম পণ্ডিতদের গবেষণার ফল অন্তর্ভুক্ত হয়। তদুপরি এতে অন্যান্য প্রভাবেরও প্রমাণ পাওয়া যায়, যেমন বসতিপূর্ণ বিশ্বকে সাতটি অঞ্চলে বা আবহাওয়ায় বিভক্তিকরণ, যা টলেমীর লেখায় দেখা যায় না। সাতটি আবহাওয়ার মতবাদের প্রমাণ নিঃসন্দেহে গ্রীক পণ্ডিতদের মধ্যেও, সম্ভবত সুপ্রাচীন ইরাটস্থেনিসের আমলে পাওয়া যায়। অবশ্য এটিও সম্ভব যে, বসতিপূর্ণ বিশ্বের বিভাগ সম্পর্কিত এই মতবাদ মূলত পারসিক–ব্যবিলনীয়, এবং হয়ত একারণেই মুসলমানদের ভৌগোলিক রচনায় এদের স্থান প্রাধান্য লাভ করেছে। মুসলমানরা গ্রীকের চাইতে প্রাচ্য ঐতিহ্যকেই বেশি গুরুত্ব প্রদান করে।

কিন্তু মুসলিম বিশ্বে টলেমীর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের যে ধারণাও প্রবেশ করেছিলো তার সঙ্গে নতুন ইসলামী রাজত্বের নাগরিকরা বিশ্ব সম্পর্কে যে ধারণা লাভ করে তার তেমন কোন সামঞ্জস্য ছিলো না। পৃথিবীর গোলাকৃতিতে তাদের কোন অপত্তি ছিলো না— যা ঐ সময় বহু খৃষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদ স্বীকার করতেন না–কিংবা এই মতবাদকে সমর্থন করার প্রয়োজনীয়তাও তারা বোধ করেননি। এতদ্বারা এ সত্যই প্রকাশ পাচ্ছে যে, ইসলামী ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞান অচিরেই নিজস্ব পথ অনুসরণ করে। জ্যোতির্বিজ্ঞানী আল–ফারগানী (আনু. ৮৬০), আল বাত্তানী (আনু. ৯০০), ইবনে ইউনুস (আনু. ১০০০) ও মহান আল বিরুনী (আনু ১০৩০) সাতটি আবহাওয়া বিভাগের নীতি অনুসরণ করে দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশের ভৌগোলিক তালিকা দিতে থাকেন। কিন্তু তারা বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে খুব সামান্য তথ্যই দিতে পেরেছেন, কিংবা আদৌ কোন তথ্যই দিতে পারেন নি। এ ধরনের তথ্য বিভিন্ন দেশের একটি বর্ণনা ও ভ্রমণবৃত্তান্তসমূহ থেকে পাওয়া যায়, যা সাম্রাজ্যের প্রশাসনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিলো। এগুলির মধ্যে মক্কা ভ্রমণের বৃত্তান্তের কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাই নবম শতকের মধ্যেই 'দেশ সম্পর্কে বই' কিংবা

www.waytojannah.com

'রাস্তা ও রাজ্য সম্পর্কে বই' প্রভৃতি শিরোনামে বিভিন্ন দেশের কতিপয় বর্ণনা পাওয়া যায়। ঐ যুগের প্রধান প্রধান লেখক হচ্ছেন ইবনে খুররাদাজবেহ (আনু. ৮৭০), আল ইয়াকুবী (আনু. ৮৯০), ইবনুল ফকিহ (আনু. ৯০৩) এবং ইবনে রুস্তা (আনু. ৯১০)। তারা কমবেশি সুবিন্যস্তভাবে ইসলামের আওতাভুক্ত বিভিন্ন দেশের একটি প্রশাসনিক ও স্থানের বৃত্তান্তমূলক বিবরণ প্রদান করেন। এতে ভ্রমণ পথ সংক্রান্ত বিবরণ বিশেষ প্রাধান্য পায়। এসব রচনায় দূরপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ ও দ্বীপপুঞ্জ এবং বাইযেন্টাইন সাম্রাজ্যের ন্যায় অমুসলিম দেশগুলির প্রতি এখনো বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা হয়। অপরদিকে এগুলিতে সর্বপ্রকার রূপকথার কাহিনীও বিরাটভাবে স্থান পায়। সমুদ্র–কাপ্তান সিরাফের সুলাইমানের ভারতে ও চীনে সমুদ্র ভ্রমণের বিবরণীও এই যুগের অন্তর্ভুক্ত।

দশম শতকে আমরা ভৌগোলিক রচনা বিকাশের একটি পর্যায় দেখতে পাই, যা মুসলমানদের ভৌগোলিক মতামতের উপর একটি স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করে। এসব গ্রন্থের বক্তব্য অনেকখানি পূর্ববর্তী রচনাসমূহের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এগুলি ইতিমধ্যে মুসলিম দেশগুলি থেকে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তার দ্বারা সমৃদ্ধ। এযুগের অধিকাংশ গ্রন্থকার স্বয়ং ভ্রমণকারী ছিলেন। এই নতুন ভূগোলচর্চা পূর্ববর্তী যুগের ভূগোল চর্চা থেকে পৃথক ধরনের ছিলো ; কারণ এতে যেসব দেশ ইসলামের আওতায় ছিলো না সেগুলি সম্পর্কে খুব সামান্যই উল্লেখ করা হয় এবং ভৌগোলিক বিষয়ের ধারাবাহিক আলোচনার সঙ্গে কতিপয় মানচিত্রও দেওয়া হয়। বক্তব্য বিষয় মানচিত্রেরই বর্ণনামূলক। এসব মানচিত্রের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে বিশ্বের একটি মানচিত্র। এর আকার গোল এবং কেন্দ্রস্থল মক্কা। পৃথিবী 'বেষ্টনকারী মহাসমুদ্র' দ্বারা বেষ্টিত, যেখান থেকে দুটি উপসাগর এমনভাবে মহাদেশে প্রবেশ করেছে যাতে এক জায়গায় অর্থাৎ সুয়েজ যোজকে তারা পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি পৌঁছেছে। কুরআনের ইঙ্গিত অনুযায়ী এই দুটি উপসাগর হচ্ছে ভূমধ্যসাগর ও ভারত মহাসাগর (রুম সাগর ও ফারস সাগর)। বিশ্ব মানচিত্রের পর আরব দেশকে বিশ্বের কেন্দ্র হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর উত্তর আফ্রিকা, মুসলিম স্পেন, মিসর ও সিরিয়ার বর্ণনা রয়েছে। এই অংশ রুম সাগরের বর্ণনার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত করা হয়েছে। ভৌগোলিক বর্ণনার দ্বিতীয় অংশে মুসলিম প্রাচ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এবং তা মেসোপটেমিয়া থেকে শুরু করে ট্র্যান্সঅক্সানিয়ায় শেষ করা হয়েছে।

যে প্রথম গ্রন্থকার এ ধরনের একটি ভৌগোলিক পুস্তিকা প্রণয়ন করেছেন বলে উল্লেখ করা হয় তিনি হচ্ছেন আবু যায়েদ আল–বল্খী (মৃ. ৯৩৪)। তিনি খুরাসান ও ট্র্যান্সঅক্সানিয়ায় ক্ষমতাসীন সাসানীয় রাজবংশের (৮২২–৯৯৯) দরবারে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। আল–বলখী উজীর আল–জায়হানির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন, যিনি নিজেও একইভাবে একটি বিরাট ভূগোল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এর বিষয়বস্তু ইউরোপের কাছে অপরিজ্ঞাত। বল্খীর গ্রন্থটিও সংরক্ষিত হয়নি, কিন্তু কয়েকটি প্রধান ভৌগোলিক গ্রন্থ তার

www.waytojannah.com

Contents

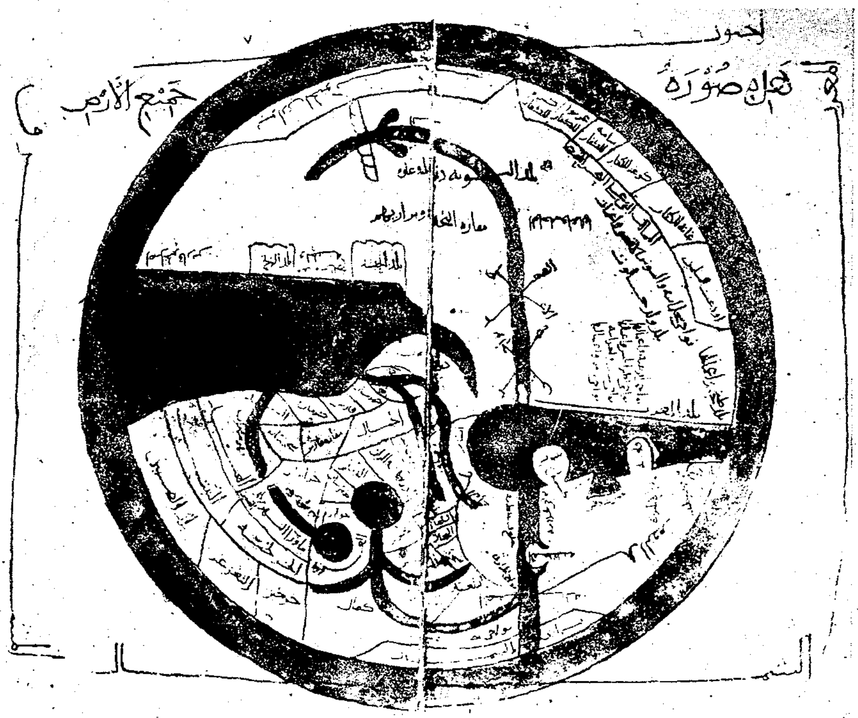

চিত্র-১৩. বিশ্ব মানচিত্র (১০৮৭ খৃস্টাব্দে নকলকৃত ইবনে হাওকাল-এর পাণ্ডুলিপি থেকে গৃহীত)
উপরের দিকে দক্ষিণ: বাম দিকে বিশাল সমুদ্র হচ্ছে ভারত মহাসাগর যাতে সিন্ধু, টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস নদী গিয়ে মিলিত হয়েছে; ডান দিকে অপেক্ষাকৃত ছোট সমুদ্র ভূমধ্যসাগর এবং তার উত্তর তীরে পেলোপনেসাস এবং ক্যালিব্রিয়া উপদ্বীপ। দক্ষিণদিক থেকে এসেছে নীল নদ এবং উত্তর দিক থেকে এসেছে কাল সাগর যা চতুর্বেষ্টিত সাগরের সাথে সংযুক্ত বলে ধারণা করা হতো

www.waytojannah.com

দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থারই বিশ্লেষণ। এগুলি হচ্ছে আল ইস্তাখ্রী (আনু. ৯৫০) ও ইবনে হাউকালের (আনু. ৯৭৫) গ্রন্থ, এবং কিছুটা অধিকতর স্বাধীনভাবে রচিত আল-মাক্দিসীর (আনু. ৯৮৫) রচনা। খুব সম্ভব এই ভৌগোলিক চর্চা আংশিকভাবে সাসানীয় আমল থেকে প্রচলিত প্রাচীনতর পারস্য ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ভারত মহাসাগরকে 'ফার্স সাগর' নামকরণ তারই ইঙ্গিত বহন করে। মানচিত্রগুলি (চিত্র ১৩) অবশ্যই স্পেনীয় মঙ্ক বীটাস (আনু. ৭৩০-৯৮)-এর বিশ্ব মানচিত্রের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত যে সব মানচিত্র ঐ সময় ইউরোপে প্রচারিত হয় সেগুলির তুলনায় ভৌগোলিক বাস্তবতার অধিকতর সঠিক ধারণা প্রদান করে। জীবন্ত জিনিসের ছবি আঁকা নিষিদ্ধ হওয়ায় আমরা এসব মানচিত্রে কখনো মানুষ ও জীব-জন্তুর ছবি দেখতে পাই না। ছবি যুক্ত হওয়ায় হারফোর্ডের বিখ্যাত মানচিত্রসহ অধিকাংশ ইউরোপীয় মানচিত্র আরো অধিক অদ্ভুত দেখায়। কিন্তু অপর দিকে দশম শতকের ইসলামী মানচিত্রগুলোতে আমরা ইতিমধ্যেই গতানুগতিকভাবে উপকূল রেখা ও নদ-নদী প্রদর্শনের একটি প্রবণতা দেখতে পাই। তাই ইসতাখ্রীর বহু মানচিত্রে বৃত্তাকারে কিংবা উপবৃত্তাকারে ভূমধ্যসাগরকে দেখানো হয়েছে।

এ সময়কার ভৌগোলিক ধরনের অন্যান্য রচনায় কেবলমাত্র বিশেষ অঞ্চলের বিষয় আলোচিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে সবচাইতে বিখ্যাত হচ্ছে আল-হামদানির আরব উপদ্বীপের বর্ণনা এবং আল-বিরুনীর ভারত সংক্রান্ত বিখ্যাত বর্ণনা। এজাতীয় কিছু কিছু রচনা আমরা অবিকলভাবে পাইনি; কিন্তু পরবর্তী সঙ্কলনগুলি থেকে তা জানা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভল্গা বুলগেরিয়ানদের দরবারে ৯২১ খৃস্টাব্দে খলীফা আল-মুক্তাদির কর্তৃক প্রেরিত দূত ইবনে ফাদ্লান কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্ট উল্লেখযোগ্য। আল-মাসূদীর রচনা এক্ষেত্রে বিশেষ স্থান দখল করেছে। তিনি মুসলিম বিশ্বের একজন বিশ্ব পর্যটক ছিলেন। এসব সফরে তিনি বহু ভৌগোলিক ও জাতিতত্ত্বমূলক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাঁর বহু রচনার মধ্যে দুটি ৯৫৬ খৃস্টাব্দে সমাপ্ত হয়, এবং সংরক্ষিত আছে। ভৌগোলিক বিষয়গুলিতে পদ্ধতির অভাব সুস্পষ্ট হলেও এগুলি এ কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, এগুলিতে 'রাজকীয়' ইসলামী ভূগোল ও ভ্রমণকারী ও নাবিকদের স্বাধীন ভৌগোলিক ধারণার বিরাট পার্থক্য চোখে পড়ে। যেমন এক জায়গায় ভারত মহাসাগরের বিস্তৃতি সম্পর্কে মুসলিম পণ্ডিতদের প্রচলিত মতামতের বিবরণ দেওয়ার পর লেখক এরূপ মন্তব্য না করে পারেন নি যে, পারস্য উপসাগরের বন্দরসমূহের যেসব নাবিক এসব সমুদ্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ, তারা পণ্ডিতদের পরিমাপ সম্পর্কে আদৌ একমত হননি। এমনকি তাঁরা এরূপ দাবি করেন যে, কোন দিকে এসব সমুদ্রের আদৌ কোন সীমা নেই। এই অভিমত প্রচলিত বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত, সেখানে বলা হয় যে, ফারস্ সাগর 'পরিবেষ্টনকারী মহাসাগরের' একটি উপসাগর এবং ভূমধ্যসাগরের ন্যায় এর একটি সঙ্কীর্ণ প্রবেশ পথ রয়েছে। উপরোক্ত গ্রন্থকার আল-

www.waytojannah.com

মাকদিসী ভারত মহাসাগরের আকারের বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে একইভাবে বলেন যে, কোন কোন লোক এটিকে একটি 'তৈলাসানের' (এক ধরনের অর্ধবৃত্তাকার পারস্য কোট) সঙ্গে তুলনা করেছেন, এবং কেউ কেউ পাখির সঙ্গে তুলনা করেছেন, কিন্তু দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর এসম্পর্কে অভিজ্ঞ জনৈক শেখ তার জন্য বালির উপর এই সমুদ্রের একটি আকার অঙ্কন করেন। 'তৈলাসান' বা পাখি কারো সঙ্গেই এর মিল ছিল না, বরং উপসাগর বা উপদ্বীপের দরুন এটি বিশৃংখলপূর্ণ আকারে পরিপূর্ণ ছিলো। মনে হয় আল–মাসুদী চীন সফর করেছেন এবং আফ্রিকার পূর্ব উপকূল সম্পর্কে অনেক কিছু জানতেন। অপর পক্ষে জ্যোতির্বিজ্ঞানমূলক ভূগোল সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুব কম ছিলো বলে মনে হয়, কারণ তার অন্যতম গ্রন্থে আমরা এরূপ অদ্ভুত অভিমত দেখতে পাই যে, *একটি* আবহাওয়ায় সবগুলি গুরুত্বপূর্ণ শহর আকস্মিকভাবে একই অক্ষাংশে অবস্থিত থাকবে।

একাদশ শতকের পূর্ববর্তী শতকের ধারায় অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বলতা নিয়ে অব্যাহত থাকে। এযুগের সর্বাধিক পরিচিত গ্রন্থকার হচ্ছেন, স্পেনীয় মুসলমান আল–বাক্‌রী (রচনাকাল আনু. ১০৬৭)। তাঁর বিরাটাকার রচনার মধ্যে কেবল মাত্র আফ্রিকা সংক্রান্ত অংশটিই সম্পাদিত হয়েছে। এখানে আমরা আরো বিশদভাবে ভ্রমণপথ নির্দেশক তথ্য, এবং বিশেষভাবে অসংখ্য বন্দর ও উপসাগর সমন্বিত উপকূল রেখার তথ্যাবলী পাই। প্রায় একই সময়ে আমরা পারস্যবাসী নাসির–ই খস্‌রুর একটি ভ্রমণকাহিনী পাই। তিনি খোরাসানের অধিবাসী ছিলেন এবং মিসর ও মক্কা সফর করেন। এই ব্যক্তি নিজেকে গভীর পর্যবেক্ষণশীল হিসাবে প্রদর্শন করলেও সাধারণভাবে বিশ্বের গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে অত্যন্ত ভুল ধারণা পোষণ করতেন।

একাদশ শতকে এমন কতিপয় ঘটনা ঘটে যা মুসলিম বিশ্বের আদর্শ ঐক্যে গভীর আঘাত হানে। ১০৫০ খৃষ্টাব্দের দিকে সেলজুক তুর্কীরা প্রাচ্য অংশ আক্রমণ করে। পশ্চিমে সিসিলি দ্বীপ, স্পেনের এক বিরাট এলাকা, এমন কি আফ্রিকা উপকূলের কোন কোন স্থান খৃষ্টান শাসকরা জয় করেন। একই সময়ে ইউরোপ ক্রুসেডের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলো। এই সময়েই খৃষ্টানবিশ্ব থেকে ইসলামীবিশ্বের সংরক্ষিত বিশেষ সত্তা ক্ষুণ্ন হতে শুরু করে। ইসলামী বিশ্ব বিচ্ছিন্নতার মধ্যে তার রাজনৈতিক শক্তি হারায়। অবশ্য একই সেলজুক তুর্কীদের নেতৃত্বে এবং ক্রুসেডের বিরুদ্ধে আইয়ুবীদের তীব্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মাত্র স্বল্পকালের জন্য এই শক্তি ফিরে আসে। এসব ঘটনা মুসলিম লেখকদের রচনায় প্রচলিত ভৌগোলিক মতামতের ক্ষেত্রে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। কেবলমাত্র জ্যোতির্বিজ্ঞানমূলক ভূগোলে সামান্য কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমরা ইবনে হাউকালের প্রায় ১১৬৪ খৃষ্টাব্দে একটি ভূগোল গ্রন্থের একটি পরবর্তী উদ্ধৃতাংশে দেখতে পাই যে, বিশ্বের মানচিত্র আর গোলাকার নয়। বরং বসতিপূর্ণ বিশ্বের জ্যোতির্বিজ্ঞান ভিত্তিক ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পরিবৃত্তাকার (ডিম্বাকৃতি)।

www.waytojannah.com

Contents

এসময়কার সবচাইতে দীপ্তিমান লেখক হচ্ছেন ইতিপূর্বে এড্রিসী নামে অভিহিত আল–ইদ্রিসী। অন্য যে কোন মুসলিম ভূগোলবিদের চাইতে আল–ইদ্রিসীর প্রতি আমাদের দৃষ্টি বেশি আকৃষ্ট হয়েছে। এর প্রথম কারণ হচ্ছে, তিনি দুটি বৃহৎ সাংস্কৃতিক মিলনকেন্দ্র সিসিলির খৃষ্টান শাসক নর্ম্যান রাজা দ্বিতীয় রজারের (১১০১–৫৪) দরবারে কাজ করতেন এবং দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, তিনি সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত মুসলিম ভৌগোলিক জ্ঞানের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন। পূর্ববর্তী আরবী ভূগোল গ্রন্থসমূহ পর্যালোচনা করে আমরা জানতে পারি যে, আল ইদ্রিসী তাঁর পূর্ববর্তী লেখকদের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল ছিলেন। কিন্তু রাজা রজার জ্ঞাত বিশ্বের বর্ণনামূলক একটি গ্রন্থ রচনার দায়িত্ব একজন মুসলমান জ্ঞানীর উপর ন্যস্ত করেছেন, এই বাস্তব সত্য থেকে মুসলিম জ্ঞান–বিজ্ঞান ঐ সময় যে কতটা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে তাঁর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

এটা সর্বজন বিদিত যে, সিসিলির নর্ম্যান রাজ দরবার অর্ধেক পরিমান প্রাচ্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিলো। রজার তাঁর জন্য একটি ভূগোল তৈরির যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তাও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে প্রাচ্য। প্রাচীনকাল থেকে মহামতি আলেকজাণ্ডার ও কোন কোন পারস্য রাজার ন্যায় বড় বড় রাজার এরূপ বিশেষ অভিলাষ ছিলো যে,বিশ্ব তাদের পদানত তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাদের জন্য তৈরি করে দেওয়া হোক। ভূগোলের প্রতি খলীফা আল–মামুনের আগ্রহের পিছনেও এই অভিলাষ সক্রিয় ছিলো, এমন কি দশম শতকে সামানীয় রাজদরবারে যে ভূগোল চর্চার সূত্রপাত হয় তার পিছনেও এই একই কারণ ছিলো। আল–ইদ্রিসী তাঁর ভূমিকায় বলেছেন যে, এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করার উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহের জন্য রাজা রজার সকল দিকে লোক পাঠান। ঠিক আল–মামুনের ন্যায় তিনিও একটি বিরাট বিশ্ব মানচিত্র তৈরি করার নির্দেশ দেন। আল–ইদ্রিসীর রচনায়ও বহু মানচিত্র রয়েছে, এবং এই মানচিত্রগুলি একদিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বক্তব্য বিষয় মানচিত্রগুলিরই ভাষ্য। সবচাইতে পরিচিত এর দুটি সংস্করণে সত্তরটি মানচিত্র রয়েছে। (প্রকৃত পক্ষে সবগুলি পাণ্ডুলিপিতে একটি মানচিত্র পাওয়া যায় না)। তিনি মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অনুকরণে বিশ্বকে যে সাতটি আবহাওয়া অঞ্চলে ভাগ করেন তার প্রত্যেকটি ভাগের এক–দশমাংশের জন্য একটি করে মানচিত্র দেওয়া হয়। সবগুলি মানচিত্র একত্রে সন্নিবেশিত করা হলে এই সত্তরটি মানচিত্র টলেমীয় নমুনায় একটি আয়তাকার চতুর্ভুজের সৃষ্টি করে। কিন্তু এতে দুটি বৃহৎ সাগরের সুনির্দিষ্ট ইসলামী ধারণা সংরক্ষণ করা হয়, যদিও বিস্তারিত বর্ণনায় বিশেষ করে ভূমধ্য সাগরের উপকূল রেখার বর্ণনার পূর্ববর্তী যে কোন ইসলামী মানচিত্রের চাইতে অনেক সুন্দরভাবে বাস্তব অবস্থাকে তুলে ধরা হয়েছে। আল–ইদ্রিসীর লেখা থেকে পূববর্তী ভূগোলবিদের কাছে তিনি কতটা ঋণী তা বোঝা যায়, এবং রচনাটি সামগ্রিকভাবে বর্ণনামূলক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানমূলক ভূগোলের একটি সমন্বয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু আল বিরুনীর ন্যায়

www.waytojannah.com

Contents

বড় বড় জ্যোতির্বিজ্ঞানীর পরিমাপের ফলাফল ব্যবহার করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। কারণ তথাকথিত 'ক্ষুদে ইদ্রিসী' নামে পরিচিত আল–ইদ্রিসীর দ্বিতীয় ও সংক্ষিপ্ত সংস্করণে আমরা বিষুব রেখার দক্ষিণে সাতটি আবহাওয়ার অতিরিক্ত একটি অষ্টম আবহাওয়া অঞ্চল দেখতে পাই। তাছাড়া 'বড় ইদ্রিসীতে' অন্যান্য মানচিত্রের আগে যে বিশ্ব মানচিত্র দেখা যায় তা গতানুগতিকভাবে গোলাকার।

এ কথা বিশ্বাস করা কষ্টকর যে, যুগ ও ভৌগোলিক বিকাশের দিক দিয়ে ইসলামী ও খৃষ্টান সভ্যতার সম্মিলন স্থলে রচিত আল–ইদ্রিসীর গ্রন্থ সিসিলি, ইটালী বা অন্যান্য খৃষ্টান দেশের খৃষ্টান পণ্ডিতদের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলো। অবশ্য বর্তমানে এর প্রভাবের কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। আল–ইদ্রিসীর বলে পরিচিত গ্রন্থের প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে রোমে। অসমাপ্তভাবে সংক্ষিপ্ত করার পর এটি অনূদিত হয়, এমনকি অনুবাদক লেখকের নামও জানতেন না।

পর্যটকদের বর্ণনামূলক কাহিনী ছাড়া আল–ইদ্রিসীর পরবর্তী ভৌগোলিক রচনা তেমন বড় রকমের মৌলিকত্ব দাবি করতে পারে না। এই সময় বর্ণনামূলক কাহিনীই অধিকতর ব্যাপকতা লাভ করে। এসব পর্যটকের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত হচ্ছেন স্পেনীয় ইবনে যুবায়র। তিনি ১১৯২ খৃষ্টাব্দে মক্কা ও মেসোপটেমিয়া ভ্রমণ করেন। এক শতাব্দীরও পরে মরক্কোর ইবনে বতুতা মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র সফর করেন। তিনি আরো পূর্ব দিকে শ্রীলংকা ও মালদ্বীপে যান এবং কনস্টান্টিনোপলও সফর করেন। সর্বশেষ সফরে ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি আফ্রিকার গভীর অভ্যন্তরে যান। অপর একজন ভ্রমণকারী যিনি ১২৫০ খৃষ্টাব্দের দিকে বিশ্বের এই অংশের অত্যন্ত মূল্যবান বিবরণী রেখে যান, তিনি হচ্ছেন ইবনে ফাতিমা। তাঁর গ্রন্থ আমরা পাইনি, কিন্তু গ্রন্থকার ইবনে সাঈদ ১২৭৪ খৃষ্টাব্দের দিকে এটিকে ব্যবহার করেন। এই সর্বশেষ লেখকের রচনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এতে বিষয়বস্তু আল–ইদ্রিসীর ন্যায় একইভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তার বর্ণনা অতোটা বিস্তারিত না হলেও এতে মুসলমানদের আফ্রিকা সংক্রান্ত জ্ঞান কত গভীর ছিলো তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তা ছাড়া এটি জ্যোতির্বিজ্ঞানমূলক ভূগোলের এতোটা কাছাকাছি পৌঁছে যে, এতে প্রধান প্রধান শহর ও স্থানগুলির অত্যন্ত সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান দেওয়া হয়েছে। ইবনে সাঈদ সিরিয়ার হামার যুবরাজ আবুল ফিদা সম্পর্কেও অন্যতম প্রধান বিবরণ দাতা। আবুল ফিদার 'দেশসমূহের তালিকা' (১৩২৭) প্রায় ১০০ বছর আগে আল–ইদ্রিসীর পরেই আরবীতে সর্বাধিক পরিচিত ভৌগোলিক রচনা ছিলো। তবে এটি পূর্ববর্তী সূত্রগুলির তুলনায় কিছুটা দুর্বল সংকলন।

আমাদের কাছে অনেক বেশি মূল্যবান সঙ্কলন হচ্ছে ইয়াকুতের বিরাটাকারের ভৌগোলিক অভিধান (১২২৮)। এতে সর্ব প্রকার ভৌগোলিক নাম বর্ণানুক্রমে দেওয়া হয়েছে। ভৌগোলিক দিকের ন্যায় জীবন চরিতের দিক দিয়েও রচনাটি মূল্যবান।

www.waytojannah.com

গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিলো বিখ্যাত ব্যক্তিদের জন্মস্থান বা বাসস্থানের নাম দেওয়ার পর বংশ পরিচয় ও বর্ণনামূলক অতিরিক্ত নাম প্রদান। আর এক ধরনের রচনা হচ্ছে, আল কাযউইনীর (আনুঃ ১২৭৫) রচনা। তাঁকে আরবী সাহিত্যের প্লিনি বলা হতো। তিনি একটি ভূ–বিবরণ (বিশ্বতত্ত্ব) ও একটি ভূগোল রচনা করেন। শেষোক্ত গ্রন্থে তিনি তার উল্লেখিত স্থানসমূহের বহু অদ্ভুত অতিরঞ্জিত বিবরণ প্রদান করেন। তিনি জার্মান দেশগুলি সম্পর্কেও কিছু কিছু তথ্য প্রদান করেন। অধিকতর উন্নত ও মৌলিক ভূগোলবিদ ছিলেন আল–দিমাশ্‌কী (আনু. ১৩২৫), যদিও তাঁর সাধারণ প্রবণতা আল–কাযউইনীর মতোই ছিলো।

আল–ইদ্রিসীর পরে বহু ইসলামী ভূগোলবিদের আবির্ভাব একথাই স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ঐ যুগেও ভূগোল সংক্রান্ত জ্ঞান অত্যন্ত ব্যাপক ছিলো। কিন্তু আমরা আর কোন ভূগোল চর্চা কেন্দ্রের সন্ধান পাই না। মঙ্গোল আক্রমণের পর চিরদিনের জন্য মুসলিম বিশ্বের সুসম্পূর্ণ ও সাংস্কৃতিক ঐক্য বিনষ্ট হয়। এ কথা সত্য যে, ইতিমধ্যে ইসলামী বিশ্বাস নতুন ধরনের অগ্রগতি লাভ করে এশিয়া মাইনর ও মধ্য এশিয়ায় তুর্কী অভিযান এবং আফ্রিকার অভ্যন্তর ভাগে অধিকতর শান্তিপূর্ণ পন্থায় ব্যবসা–বাণিজ্য ও ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে। আরবী ও পারস্য সাহিত্য ঐ সব দেশ সম্পর্কে আমাদের অনেক তথ্য জ্ঞাপন অব্যাহত রাখে। কিন্তু স্বয়ং খৃষ্টানরা, এবং প্রথমত ইটালিয়ানরা ইতিমধ্যে ভ্রমণকার্যে ও আবিষ্কারে তৎপর হয়ে ওঠে। চতুর্দশ শতকের জনৈক মিসরীয় লেখক আল উমারী এশিয়া মাইনরের বর্ণনা দিতে গিয়ে তার বক্তব্যের সমর্থনে জনৈক জেনোয়া বাসীর উদ্ধৃতি দেন। এ সময় আমরা কোন একটি দেশ ও তার প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকতর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভৌগোলিক বর্ণনা পাই। কয়েকজন গ্রন্থকার ধারাবাহিকভাবে প্রাথমিক মামলুক যুগের মিসরের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রদান করেন। এগুলির মধ্যে আল–মাকরিযী প্রণীত মিসরের বর্ণনামূলক একটি বিরাটাকার গ্রন্থ (আনু. ১৪২০) সব চাইতে বিখ্যাত।

ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামী ভূগোল সাহিত্য মধ্যযুগে ইউরোপীয় চিন্তাধারায় *সরাসরি* তেমন গভীর কোন প্রভাব সৃষ্টি করেছে বলে মনে হয় না। খৃষ্টান লেখকগণ কর্তৃক মুসলিম ভৌগোলিক মতামত গ্রহণের দু–একটি প্রমাণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে *অপাস টেরাই স্যাঙ্কটাই*–তে দ্রষ্টব্য বিশ্ব মানচিত্র। ১৩২১ খৃষ্টাব্দে ম্যারিনো স্যানুটো এটি প্রণয়ন ও পোপের নামে উৎসর্গ করেন। এই মানচিত্রটি গোলাকার, এর কেন্দ্রস্থল জেরুজালেম এবং এতে সুস্পষ্টভাবে মহাসাগর থেকে দুটি বড় সমুদ্রের উদ্ভব ও পূর্বদিকে আফ্রিকান উপকূলের বিস্তৃতি দেখানো হয়েছে। তাই ক্রুসেডী প্রেরণা পুনরুজ্জীবনে আপোসহীন এই ব্যক্তি যাদের তিনি ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন তাদেরই জ্ঞান–বিজ্ঞানের অন্যতম অনুসারী হন।

মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ভৌগোলিক রচনা সম্পর্কে ইতিমধ্যেই আমরা কিছুটা আলোকপাত করেছি। ভূগোলের চাইতে ইউরোপের মধ্যযুগীয় বিজ্ঞানে এর প্রত্যক্ষ প্রভাব

www.waytojannah.com

অনেক বেশি গভীর ছিলো। এদের কোন কোন রচনা প্রাথমিক দিকেই অনূদিত হয়। এক্ষেত্রে প্লাটো অব টিভলী (আনু. ১১৫০) কর্তৃক অনূদিত আল–বাত্তানীর যিজ (রচনাকাল আনু. ৯০০) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সপ্তম আলফন্সো কর্তৃক বিজিত হওয়ার পর টলোডা ছিলো খৃস্টান জ্ঞানী–বিজ্ঞানীদের প্রধান কেন্দ্র, যেখানে তারা আরবী বিজ্ঞান সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য সকল দেশ থেকে এসে সমবেত হতেন। ভূগোলের ক্ষেত্রে এসব অনুসন্ধানমূলক পর্যালোচনা প্রথমত পৃথিবীর গোলাকৃতির মতবাদকে সজীব রাখার ক্ষেত্রে অবদান সৃষ্টি করে। খৃস্টান জগতের অন্ধকার যুগে এই মতবাদ প্রায় বিস্মৃতির অতলে চলে যায়, এবং এই ধারণা পুনরুজ্জীবিত না হলে আমেরিকা আবিষ্কার অসম্ভব হতো। মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সকলেই মানচিত্র অঙ্কনের আদৌ কোন চেষ্টা না করে কতিপয় নির্দিষ্ট সংখ্যক স্থানের ভৌগোলিক দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশ নিরূপণের উদ্দেশ্যেই ভূগোল চর্চা করতেন। সাতটি আবহাওয়া অনুসরণেই তাদের দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশের তালিকা তৈরি করা হতো। এই বিজ্ঞানের অধিকতর সাধারণ বৈশিষ্ট্যের দরুন খৃস্টান বিজ্ঞানীরা নিছক ভৌগোলিক রচনার চাইতে এদিকটির প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়। ফলে দ্বাদশ শতকে ল্যাটিন ভাষায় জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত তালিকা তৈরি শুরু হয় এবং এতে কোন কোন সময় ভৌগোলিক তালিকাও থাকতো। কোন কোন খৃস্টান বিজ্ঞানী সাতটি আবহাওয়ার বিভাগকেও মেনে নেন। বিশ্বের জ্ঞাত গোলার্ধের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে সমান দূরত্বে অবস্থিত একটি কেন্দ্র বা 'বিশ্বচূড়া' রয়েছে, এই ধারণা ইসলামের আরো গুরুত্বপূর্ণ উত্তরাধিকার। আল–বাত্তানী 'পৃথিবীর এই গম্বুজকে' একটি দ্বীপ হিসাবে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু অপর একজন গ্রন্থকার (ইবনে রুস্তা) ইতিপূর্বেই এটিকে 'আরিনের গম্বুজ' হিসাবে জানতেন। *আরিন* শব্দটি ভারতীয় শহর উজ্জয়িনীর (টলেমীর ভূগোলে ওযিনি) আরবী অনুবাদের একটি ভুল পাঠ। এখানে জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি মানমন্দির ছিলো এবং এই শহরেরই মধ্যরেখার উপর মূলত একটি ভারতীয় ধারণা 'বিশ্বচূড়া' অবস্থিত ছিল বলে মনে করা হতো। মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ন্যায় তাদের খৃস্টান শিষ্যরাও এই মতবাদকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। শেষোক্তদের মধ্যে একজন ছিলেন বাথ–এর অ্যাডেলার্ড, যিনি ১১২৬ খৃস্টাব্দে আল খারেযমীর ত্রিকোণমিতিক তালিকাসমূহ অনুবাদ করেন। আরো ছিলেন জেরার্ড অব ক্রিমোনা এবং ত্রয়োদশ শতকে রজার বেকন ও আল বার্টাস ম্যাগনাস। ১৪১০ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত আইলীর কার্ডিন্যাল পিটারের *ইম্যাগো মুণ্ডি* গ্রন্থে পরবর্তীকালেও আরিন (বা আরিম) মতবাদের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ থেকেই ক্রিস্টোফার কলম্বাস এই মতবাদ সম্পর্কে অবহিত হন। ইত্যবসরে এই মতবাদের এতোটা বিকাশ হয় যে, তার ভিত্তিতে কলম্বাস বিশ্বাস করেন যে, পৃথিবী একটি নাশপাতির ন্যায় গোলাকার এবং আরিনের চূড়ার বিপরীত দিকে পশ্চিম গোলার্ধেও পূর্বদিকের চূড়ার চাইতে অনেক বেশি উন্নত আরেকটি কেন্দ্র রয়েছে। যাকে ভিত্তি করে নাশপাতির নিচের

www.waytojannah.com

Contents

দিক তৈরি হয়েছে। তাই মুসলিম ভৌগোলিক মতবাদ নতুন বিশ্ব আবিষ্কারে একটি হিস্‌সা দাবি করতে পারে। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের আর একটি ক্ষেত্রেও আমরা একই মতবাদের প্রভাব দেখতে পাই। দান্তে মুসলিম ঐতিহ্যের কাছে ঋণী এ কথা বহু দিক দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে। তাই এটা খুবই সম্ভব যে, দান্তে এই মতবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে তার *পারগেটোরিও* পশ্চিম গোলার্ধের পাহাড়ের মত একটি স্থানে কল্পনা করেছেন এবং এই সঙ্গে অত্যন্ত নিপুণভাবে খৃষ্টানদের এরূপ প্রাচীন বিশ্বাসকে যুক্ত করেছেন যে, পার্থিব স্বর্গ বিশ্বের পূর্বতম প্রান্তে সমুদ্রের পিছনে (বিটাসের বিভিন্ন বিশ্ব মানচিত্রে যেমনটি দেখানো হয়েছে) অবস্থিত।

মুসলিম নৌচলাচল বিজ্ঞান নবম শতকে চূড়ান্ত বিকাশলাভ করে। কিন্তু এই নৌচলাচল ভারত মহাসাগরে এশিয়া ও আফ্রিকার অমুসলিম অধ্যুষিত উপকূলসমূহের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক থেকে প্রধানত গুরুত্ব লাভ করলেও ভূমধ্যসাগরে তা মুসলিম শাসনাধীন এলাকাসমূহেই সীমাবদ্ধ থাকে। কারণ খৃষ্টান বন্দরগুলির সঙ্গে তখন সম্পর্ক ছিল সামরিক ও আক্রমণাত্মক।

তাই শেষ পর্যন্ত ভারত মহাসাগরই বড় বড় বাণিজ্যিক তৎপরতার ক্ষেত্র হয়ে পড়ে। এর মূল কেন্দ্র ছিল পারস্য উপসাগর। এখানে আল উবুল্লা উপকণ্ঠসহ সিরাক ও বসরার ন্যায় বন্দর এবং ওমান উপকূলের অন্যান্য বন্দর ইসলামের আবির্ভাবের আগে থেকেই বাণিজ্য ও নৌচলাচলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। অবশ্য ইসলামের আবির্ভাব, বিশেষ করে ইরাকে এর রাজনৈতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এই ব্যবসায়ী উদ্যোগকে আরো উৎসাহিত করে। দশম শতকের মাঝামাঝি সময়ে মুসলমানদের জাহাজ চীনের খানফু শহরে পৌঁছে, খানফুর বর্তমান ক্যান্টনে ফৌঁছে। ঐ সময় শহরটি একটি উল্লেখযোগ্য মুসলিম উপনিবেশ হিসাবে চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে পড়ে। এখান থেকে কিছু সংখ্যক মুসলিম ব্যবসায়ী ও নাবিক আরো দক্ষিণে অগ্রসর হন। সম্ভবত তাঁরা কোরিয়া ও জাপানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কতিপয় গোলযোগের ফলে এই প্রাথমিক বাণিজ্যিক তৎপরতা ৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বন্ধ হয়ে যায় এবং এতে খানফু বন্দর ধ্বংস হয়। ঐ সময়ের পর থেকে আরবী লেখকদের কাছে কালা নামে পরিচিত এক শহরের পরে নিয়মিত নৌচলাচল সম্প্রসারিত হয়নি। এটি বিশেষভাবে টিন খনির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এর অবস্থান অবশ্যই মালাক্কার পশ্চিম উপকূলে ছিল। কালা রাজনৈতিকভাবে যাবাজের শাসকের অধীনে ছিল। প্রাথমিক আরবীতে জাবা থেকে এই নামটির উদ্ভব হয়। কিন্তু ঐ সময় যাবাজ বলতে প্রথমে সুমাত্রাকে এবং বিশেষভাবে ঐ সময়কার সমৃদ্ধ শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের কেন্দ্রকে বোঝাতো। এসব অঞ্চলের সঙ্গেই বাণিজ্যিক যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। ইবনে রুস্তা (আনু. ৯০০) সুলায়মান (আনু. ৮৫০) এবং তার অনুসারী আবু যায়েদের (আনু. ৯৫০) বিবরণী থেকে মনে হয় যে, মুসলিম নাবিকগণ এসব সমুদ্রে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতেন। কিন্তু তারা কোন্

www.waytojannah.com

Contents

কোন্ সমুদ্রপথ অনুসরণ করতেন বিবরণীতে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। মুসলমানদের জাহাজ একইভাবে শ্রীলঙ্কার (সারানদিব) বন্দরসমূহ এবং ভারতের পশ্চিম উপকূলেও চলাচল করতো। বোম্বের কাছাকাছি সাইমূর শহরে একটি সমৃদ্ধ আরব উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। সিন্ধুর মুসলিম অধিকৃত এলাকার দাইবুল (দেবল) এসব অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে বাণিজ্যিক তৎপরতা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এখানে তাঁরা দশম শতকের সূচনায় সোনার জন্য বিখ্যাত সুফলা দেশে পৌঁছেন। আফ্রিকান উপকূলের এই অঞ্চলটি মাদাগাস্কারের বিপরীত দিকে অবস্থিত ছিল। মাদাগাস্কার দ্বীপটি মুসলমানদের কাছে ওয়াক্ ওয়াক্ দ্বীপ নামে পরিচিত ছিল। লেখকরা আরো একটি ওয়াক্ ওয়াক্–এর কথাও উল্লেখ করেছেন যা চীনের বিপরীত দিকে অবস্থিত ছিল এবং বর্ণনা থেকে মনে হয় যে, এটিই ছিল জাপান। এতে ভৌগোলিক লেখার বিবরণীতে গুরুতর বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। নিঃসন্দেহে এই বিভ্রান্তির কারণ হচ্ছে, এরূপ ভৌগোলিক বিশ্বাস যে, আফ্রিকার পূর্ব উপকূল পূর্ব দিকে চীনের কাছাকাছি কোন এক জায়গায় 'ফারস সাগরের' মুখ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। দেখা যাচ্ছে যে, এই চিরাচরিত মতবাদের দ্বারা সামুদ্রিক কাপ্তানদের জ্ঞান বাধা প্রাপ্ত হয়নি। তাদের সমুদ্র বিহারের কাহিনী আরবী সাহিত্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। কল্পনার মাধুরী মিশিয়ে আরব্য রজনীর সিন্দাবাদ নাবিকের বিখ্যাত কাহিনীগুলিতে তা এখনো টিকে আছে।

পারস্য উপসাগরকে কেন্দ্র করে সুদীর্ঘকালব্যাপী নৌচলাচলের যে ধারা গড়ে ওঠে তা পরবর্তীকালে পর্তুগীজ, তুর্কী, বৃটিশ. ওলন্দাজ প্রভৃতি যে সব শক্তি এসব এলাকায় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে তাদের পথ সুগম করে। ১৪৯৮ খৃস্টাব্দে আফ্রিকা প্রদক্ষিণের পর ভাস্কো ডা গামা আফ্রিকার পূর্ব উপকূল মালিন্ডি পৌঁছলে জনৈক আরব নাবিকই (Pilot) তাকে ভারত গমনের পথপ্রদর্শন করেন। পর্তুগীজ সূত্রে জানা যায় যে, এ নাবিকের কাছে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট সামুদ্রিক মানচিত্র ও অন্যান্য নৌচলাচল সরঞ্জাম ছিল। ঐ সময়কার আরব মহলেরও এই কাহিনী জানা ছিল। তাদের মতে আহমদ ইবনে মজিদ নামে পরিচিত এই নাবিককে নেশাগ্রস্ত করার পরই তাকে দিয়ে পর্তুগীজরা পথ বাতলিয়ে নেয়। সম্ভবত কাল্পনিক এই বিবরণ দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, মুসলমানরা পর্তুগীজদের আগমনের সুদূর প্রসারী পরিণতি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এই আহমদ ইবনে মজিদ ভারত মহাসাগর, লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর, দক্ষিণ চীন সমুদ্র এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপাঞ্চলের নৌচলাচল ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন বলেও জানা যায়। স্যার আর এফ বার্টনের একটি বিবরণ অনুযায়ী এও দেখা যায় যে, ইবনে মজিদকে এর পূর্ববর্তী শতকে আফ্রিকান উপকূলে কম্পাসের আবিষ্কারক হিসাবে শ্রদ্ধা জানানো হতো।

প্রথম দিকের আব্বাসীয় খলীফাগণ সুয়েজ যোজক ভেদ করার কথা চিন্তা করেন। কিন্তু ক্রুসেডের পর থেকে যেভাবে চিন্তা করা হয়েছিল তেমনিভাবে কখনো চিন্তা করা হয়নি যে,

www.waytojannah.com

এ ধরনের উদ্যোগ ইসলামের জন্য এক বিরাট বিপদ হয়ে দেখা দেবে। তাই ভূমধ্যসাগরে মুসলিম নৌচলাচল প্রাচ্য সমুদ্রের নৌচলাচল থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্য মুসলিম বন্দরগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

খলীফা হযরত উমর (রা)–এর আমল থেকেই খৃস্টান দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক মুসলমান ও খৃস্টান উভয় পক্ষ থেকেই তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। এর ফলে আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর এবং অন্যান্য বহু প্রাচীন সামুদ্রিক বন্দর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তিউনিস উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনীয় বন্দরগুলির মধ্যে নৌচলাচলের নতুন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে।খৃস্টানদের কাছে মুসলিম নাবিকরা প্রায়ই জলদস্যু ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এবং এ কথা খৃস্টান নাবিকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল।

ক্রুসেডের শুরু থেকে ভূমধ্যসাগরে মুসলমানদের নৌচলাচলের প্রায় একক প্রধান্যের অবসান ঘটে। স্পেনের একটি বিরাট অংশ, সিসিলি দ্বীপ এবং ইটালীয় উপকূলের অধিকৃত এলাকা মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়। একই সময়ে ইটালীয় সমুদ্র বন্ধর জেনোয়া ও পিসার বিকাশ শুরু হয়। ১১৯২ খৃস্টাব্দে পর্যটক ইবনে জুবায়র একটি খৃস্টান জাহাজযোগে সিউটা থেকে আলেকজান্দ্রিয়া গমন করে। নৌচলাচলে একক প্রাধান্যের এই পরিবর্তন বাস্তবে অপেক্ষাকৃত কম হিংসাত্মক ছিল। অবস্থা কেবল এটুকুই দাঁড়ায় যে, যে খৃস্টানরা এর আগে মুসলিম নিয়ন্ত্রণাধীনে নিছক নাবিক বা ক্রীতদাস হিসাবে নৌচলাচলে সংশ্লিষ্ট ছিল তারা এখন পুরোপুরি স্বাধীনতা লাভ করে এবং নিজস্ব কর্তৃত্বেই নৌচলাচল ও বাণিজ্য করে। আধুনিক আন্তর্জাতিক নৌচলাচলের শব্দকোষে এডমিরাল, ক্যাব্‌ল, অ্যাভারেজ, শ্যালপ (স্লুপ), বার্ক এবং ভারত মহাসাগরের নৌচলাচলের বিশেষ ভাষা মনসুন[১] প্রভৃতি বহু শব্দ এককালে সমুদ্রে মুসলমানদের একক প্রাধান্যের ইঙ্গিত বহন করে।

নাবিক ইবনে মজিদের প্রসঙ্গে কম্পাসের কথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। এই ব্যক্তি তাঁর রচনায় নিজেই অনুমান করেন যে, কম্পাসের আবিষ্কারক ছিলেন কিং ডেভিড (হযরত দাউদ আ) কিন্তু এটি কিছুতেই প্রমাণ করা যায় না যে, মুসলমানরা খৃস্টানদেরও আগে এই যন্ত্রটির সঙ্গে পরিচিত ছিল। এ কথা সত্য হতে পারে যে, চীনারা দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই যন্ত্র ও এর ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তাদের কাছ থেকেই পাশ্চাত্য এটি লাভ করে। কিন্তু মুসলমান সমুদ্র–কাপ্তানরা কম্পাসের ব্যবহার জানতেন এর প্রথম নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যায় ১২৮২ খৃস্টাব্দের জনৈক লেখকের রচনায়। প্রায় একই সময়ে ফ্রান্স

---

১. 'মূল আরবী মাওসিম, একটি বিশেষ সময়, একটি ঋতু ; বাং মওসুম। ভারত মহাসাগরে ও দক্ষিণ এশিয়ায় এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত দক্ষিণ–পশ্চিম থেকে এবং বছরের অবশিষ্ট সময়ে উত্তর–পূর্ব থেকে প্রবাহিত মওসুমী বায়ু। প্রবল বৃষ্টিপাত সমন্বিত দক্ষিণ–পশ্চিমের বায়ু প্রবাহের কালকে মনসুন বা মওসুমী ঋতু বলা হয়।–অনুবাদক।

www.waytojannah.com

এবং ইটালীতেও এর ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। কম্পাস সম্পর্কে এমন কয়েকটি পরিভাষা রয়েছে যা মূলত প্রাচ্য ভাষা হলেও আরবী নয়। তাতে মনে হয় যে, চুম্বকের কাঁটার গুণাগুণ সম্পর্কিত জ্ঞান ইউরোপ প্রাচ্য থেকে লাভ করে, কিন্তু এতে এ কথা মনে হয় না যে, মুসলমানরা এ ক্ষেত্রে খৃস্টানদের অগ্রগামী। বহু ক্ষেত্রে তাদের এলোমেলো মানচিত্র অঙ্কন বিজ্ঞান বরং এরূপ ধারণার সৃষ্টি করে যে, তাদের জাহাজগুলি কেবল উপকূলের দৃষ্টিপথেই চলাচল করতে পারতো। কাজেই নির্বিবাদে এরূপ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, মুসলমানরা ইউরোপীয় খৃস্টানদের আগেই কম্পাসের ব্যবহার জানলেও তাদের এই জ্ঞান ১২০০ খৃস্টাব্দের আগের নয়, এবং তারা বিষয়টি জানার অব্যবহিত পরেই খৃস্টান নাবিকরাও তা লাভ করে।

ত্রয়োদশ শতকের শেষ দিকে ভূমধ্যসাগরের প্রথম সামুদ্রিক চার্টের আবির্ভাবের ক্ষেত্রে অদ্ভুত সমস্যার ও কম্পাসের সমস্যার সঙ্গে মিল রয়েছে। সব চাইতে প্রাচীনজ্ঞাত চার্ট সম্ভবত জেনোয়াবাসীরা তৈরি করে। এসব চার্ট পূর্ববর্তী সর্বপ্রকার মানচিত্রের চাইতে অনেক বেশি সঠিকভাবে একই সময়ে উপকূল ও দ্বীপাঞ্চলের অবস্থান নির্দেশ করে কেবল কম্পাসের সাহায্যেই এগুলি তৈরি সম্ভব হয়। এসব চার্টে উপকূল রেখার বিস্তারিত নকশাও দেওয়া হয় এবং এসব বিশদ বিবরণ কিছুতেই এক যুগের অবদান হতে পারে না। এবারে আমরা আল-ইদ্রিসী এবং তাঁর পূর্ববর্তী ইবনে হাউকাল ও আল-বাক্‌রীর রচনায় আফ্রিকান উপকূলের সঠিক বর্ণনার কথা স্মরণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে, উপরোক্ত ভৌগোলিক গ্রন্থগুলিতে প্রতিফলিত মুসলিম নাবিকদের অভিজ্ঞতা আধুনিক মানচিত্র বিজ্ঞানের আদর্শ প্রাচীনতম চার্টগুলি তৈরিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

মেসোপটেমিয়ার বিরাট সমুদ্র পথের মাধ্যমে পারস্য উপসাগর মুসলিম সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল বাগদাদের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এর মাধ্যমে ভারত মহাসাগরের নৌচলাচল বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের সহায়ক হয়। এই পথেই বাগদাদের বড় বড় বণিকরা চীনের রেশম, ভারতের মসল্লা ও সুগন্ধি দ্রব্য এবং কালার বিভিন্ন ধরনের কাঠ, নারিকেল ও টিন আমদানি করতেন। এসব পণ্য মুসলিম দেশগুলি থেকে ইউরোপে যেত। কারণ ঐ সব দেশের সঙ্গে ইউরোপের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। এই সামুদ্রিক বাণিজ্যের একটি অংশ পারস্য উপসাগরে প্রবেশ না করে পণ্যসামগ্রী এডেন এবং লোহিত সাগরের বন্দর জেদ্দা ও আল-কুলযুমে (সুয়েজের নিকট প্রাচীন ক্লিস্‌মা) পৌঁছিয়ে দিতো। ক্রুসেডের সময় জেদ্দার প্রায় বিপরীত দিকে তীর্থযাত্রীদের গমনাগমনের একটি প্রাচীন বন্দর 'আইজাবে পৌঁছিয়ে দিতো। এখান থেকেই মুসলিম বিশ্বের পশ্চিম অংশে সরবরাহ যেতো। আবার একই পথে আফ্রিকার আইভরি প্রভৃতি পণ্যসামগ্রীর আমদানি হতো। এগুলি এডেনের বিপরীত দিকে ইথিওপীয় সামুদ্রিক বন্দর যাইলা থেকে পাঠানো হতো।

www.waytojannah.com

মুসলমানদের নৌবাণিজ্যের চাইতে 'মরুভূমির জাহাজের' মাধ্যমে স্থল-বাণিজ্য আরো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের অনেক আগেই স্থল-বাণিজ্য বহর এশিয়া ও আফ্রিকার তৃণভূমি অঞ্চল অতিক্রম করলেও আমরা এই বাণিজ্যে মুসলমানদের অবদানের কথাই বিশেষভাবে জানি। এমন কি কিছুকাল আগেও মরুভূমিতে গমনাগমনের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সভ্যতা মুসলমানদের পিছনে পড়েছিল। সাম্প্রতিককালে সিরীয় মরুভূমি, আরব উপদ্বীপ, পারস্য ও সাহারায় যে মোটর যানবাহন চালু হয়েছে, মধ্য এশিয়ায় যে সব রেলপথ নির্মিত হয়েছে এবং যে কয়েকটি বিমান সার্ভিস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এগুলি সবই স্মরণাতীত কাল থেকে অব্যাহত উটের পথই অনুসরণ করছে। মুসলিম সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির যুগে ভ্রমণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মুসলিম দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে তীর্থযাত্রীদের মক্কা গমনাগমনের ক্ষেত্রে এই দলবদ্ধ চলাচল সবচাইতে সাধারণ মাধ্যম ছিল। একই সময়ে সাম্রাজ্য থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থলপথ প্রথমত ভারত ও চীনের, দ্বিতীয়ত দক্ষিণ ও মধ্য রাশিয়ার এবং তৃতীয়ত আফ্রিকার স্থলপথের সঙ্গে যুক্ত হয়। সমুদ্র পথেও ভারত এবং চীনে যাওয়া যেতো; তাই অন্যান্য দিকের তুলনায় এদিকে স্থলপথে দলবদ্ধ বাণিজ্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তাছাড়া ভারতের সঙ্গে স্থলপথ আফগানিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলের দুর্গম পথের দরুন ব্যাহত হয়। চীনের সঙ্গে বাণিজ্যে তুর্কী অধিকৃত অঞ্চলসমূহের মধ্য দিয়ে যেতে হতো। তদুপরি চীনের প্রধান উৎপাদিত পণ্য রেশম আগে পারস্যেও উৎপাতিক হতো। একাদশ শতকে সামানীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর চীনের সঙ্গে স্থলপথ বাণিজ্য আরো প্রতিকূল হয়ে পড়ে। ত্রয়োদশ শতকে এশীয় বাণিজ্য পথের বিরাট প্রসার মঙ্গোলদেরই অবদান ছিল।

উত্তর দিকে মুসলমানদের বাণিজ্যিক প্রভাব প্রসারের তথ্য লাভের জন্য আমরা কেবল লিখিত সূত্রের উপর নির্ভর না করে রাশিয়া, ফিনল্যাণ্ড, সুইডেন ও নরওয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে বিপুল সংখ্যায় যে সব মুসলিম মুদ্রা পাওয়া যায় তাও বিবেচনা করতে পারি। এসব মুদ্রা বিচ্ছিন্ন ভাবে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ এবং আইসল্যাণ্ডেও পাওয়া যায়। কাযান প্রদেশে ভলগা নদীর মাঝামাঝি অঞ্চলে এ ধরনের বিপুল সংখ্যক মুদ্রা পাওয়া যায়। কিন্তু বাল্টিক প্রদেশগুলিতে প্রাপ্ত মুদ্রা সংখ্যার দিক দিয়ে এগুলিকে অনেক বেশি পরিমাণে ছাড়িয়ে যায়। স্কাণ্ডিনেভিয়ার যে সব এলাকায় এসব মুদ্রা প্রধানত পাওয়া যায় সেগুলি হচ্ছে সুইডেনের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল এবং নরওয়ের দক্ষিণ এলাকা। মুদ্রাগুলির সময়কাল হচ্ছে সপ্তম শতকের সমাপ্তি থেকে একাদশ শতকের সূচনা। এরূপ সম্ভাবনা খুব কম যে, মুসলিম বণিকগণ উত্তর দিকে এসব স্থান পর্যন্ত গিয়েছিলেন; কারণ লিখিত আরবী সূত্র থেকে দেখা যায় যে, ভলগা নদীর মাঝামাঝি অঞ্চলে ভল্গা বুলগারদের দেশই ছিলো তাদের বাণিজ্যিক অভিযান ও দূতাবাসের চূড়ান্ত লক্ষ্য। ইসলাম ধর্মও প্রাথমিক দিকে ঐসব অঞ্চল পর্যন্তই প্রসারিত হয়। তাদের বাণিজ্য সাধারণত যে পথে অগ্রসর হয় তা ট্রান্সঅক্সানিয়া থেকে

www.waytojannah.com

Contents

ওকসাস নদীর মোহনায় অবস্থিত খারিযমের (খিবা) বদ্বীপ অঞ্চল পর্যন্ত ছিল। ভল্গার মোহনা থেকে উজান দিকের পথ ততোটা স্বাভাবিক ছিল না। অবশ্য এতোটা বিস্তৃত এলাকায় মুদ্রা পাওয়ার কারণ হচ্ছে সাংস্কৃতিক প্রভাবের একটি লক্ষণ, এবং এতদ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, মুসলমানরা বুলগেরীয় বাজারগুলিতে যেসব লোক উত্তর-পশ্চিমে বসবাস করতো তাদের কাছ থেকে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করতো। এদের মধ্যে স্কান্ডিনেভীয় রাশিয়ানরা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে মুসলমান বণিকরা কি ধরনের পণ্যসামগ্রী ক্রয় করতেন তা আমরা বিভিন্ন ভৌগোলিক রচনা বিশেষ করে আল-মাকদিসীর রচনা থেকে জানতে পারি। পণ্যগুলি হচ্ছে নকুলের পশম, শুভ্র পশম, আরমিনের লোম, খেকশিয়াল, বিবর, ফুটফুটে খরগোস ও ছাগলের পশম, মোম, তীর-ধনুক, বার্চগাছের বাকল, খাড়া পশমের টুপী, মাছের সিরিশ, মাছের দাঁত, বিবরের নির্যাস, অম্বর, ঘোড়ার পাকা চামড়া, মধু, হেজেল নাট, বাজ পাখি, তলোয়ার, বর্ম, ম্যাপল কাঠ, ক্রীতদাস এবং ছোট বড় গবাদি পশু। অধিকাংশ ক্রীতদাসই ছিল স্লাভজাতীয়। তাদের নাম এখনো সভ্য জগতে, বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলিতে তাদের ভূমিকার ইঙ্গিত বহন করে। ক্রীতদাস আমদানির আর একটি সূত্র ছিল স্পেন। এখান থেকে মাগরেব ও মিসরে ক্রীতদাস আমদানি করা হতো। এই শেষোক্ত শ্রেণীর ক্রীতদাসরা প্রধানত খোজা ছিল এবং তাদেরকে মুসলিম হেরেমে নিয়োগ করা হতো। এটা সর্বজন বিদিত যে, বিভিন্ন জাতি থেকে এভাবে আমদানিকৃত ক্রীতদাসদের ইউরোপে মুসলিম সংস্কৃতি প্রসারে কোন অংশে কম অবদান ছিল না। এই সুদূর প্রসারী মুসলিম-বুলগেরীয় বাণিজ্য ছাড়াও যার প্রমাণ জার্মানীতেও পাওয়া যায়--কাস্পিয়ান সাগরের তীরে ভল্গা নদীর মোহনায় খাযার সাম্রাজ্যের সঙ্গেও তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। খাযারদের রাজধানী ইটিল বা আটিল এখানেই অবস্থিত ছিল। পণ্য বিনিময়ের দিক দিয়ে এই বাণিজ্য অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু খাযার সাম্রাজ্য মুসলিম ও বাইযেন্টাইন সাম্রাজ্যের মধ্যে এক ধরনের নিরপেক্ষ এলাকার সৃষ্টি করে। ফলে এর মধ্য দিয়ে বহু মুসলিম ও প্রাচ্য পণ্য খৃস্টান দেশগুলোতে যাওয়ার পথ সুগম হয়।

আফ্রিকার স্থল-বাণিজ্য একটি প্রাচ্য ও একটি পাশ্চাত্য এলাকায় বিভক্ত ছিল। উভয় দিকেই প্রধান আমদানি পণ্য ছিল স্বর্ণ। মুসলিম অঞ্চলের পরে আসোয়ানের পূর্ব দিকে বুজা দেশে স্বর্ণখনি এলাকার বিরাট বাণিজ্য কেন্দ্র আল-'আল্লাকী প্রাচীন মিসরীয় আমল থেকেই বিখ্যাত ছিল। পশ্চিম আফ্রিকায় স্বর্ণের দেশ ঘানার সঙ্গে সক্রিয় বাণিজ্য অব্যাহত ছিল। এর রাজধানী অবশ্যই নাইজার নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। মরক্কো, আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়ার মুসলিম বণিকরা দক্ষিণ দিকে কয়েক মাস পর্যন্ত ভ্রমণ করতেন। তারা সাধারণত আউদাগোশত নামে একটি মরূদ্যান পার হতেন। এটির অবস্থান ছিল ঘানার উত্তরে চৌদ্দ দিনের পথ। এসব এলাকায় বাণিজ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে ভৌগোলিক ইবনে হাউকাল (আনুমানিক ৯৭৫) বলেন যে, তিনি আউদাগোশত ৪২০০০ দিনারের একটি আই

www.waytojannah.com

ও ইউ[১] দেখেছেন যা দক্ষিণ মরক্কোর সিজিলমাসা শহরের জনৈক বণিকের নামে লেখা হয়। এমনও বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী শতকে এই বাণিজ্যের পরিমাণ আরো বেশি ছিল। কারণ তখন পশ্চিমের অঞ্চলগুলি ও মিসরের মধ্যে একটি সরাসরি রাস্তা ছিল। কিন্তু নিরাপত্তা না থাকায় এই রাস্তাটি পরিত্যক্ত হয়।

পরবর্তী শতকগুলিতেও আফ্রিকা এমন একটি এলাকা ছিল যেখানে কোন প্রতিযোগিতা ছাড়াই মুসলমানরা ব্যবসা–বাণিজ্য ও ধর্ম প্রচারের প্রেরণা অব্যাহত রাখতে পারে। ত্রয়োদশ শতকে লেখক ইবনে সাঈদ ইব্‌নে ফাতিমার ভ্রমণ কাহিনীর মাধ্যমে সুদূর সেনেগাল পর্যন্ত আটলান্টিক উপকূলের সঙ্গে সম্যকভাবে অবহিত হন। এই এলাকাটি নাইজারের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং নীল নদের ন্যায় একই নদী ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে মনে করা হতো। তিনি চাদ হ্রদের আশেপাশে বসবাসকারী নিগ্রোদের সম্পর্কেও অবহিত হন। অপরদিকে মুসলমানরা কখনো নীলনদের উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, কারণ এ ব্যাপারে তারা কেবল টলেমীর প্রচলিত ধারণারই পুনরাবৃত্তি করেন। এতদসত্ত্বেও রেনেসাঁ যুগের ইউরোপ মুসলমানদের সূত্র ছাড়া অন্ধকার মহাদেশের অভ্যন্তর ভাগ সম্পর্কে কিছুই জানতো না। কারণ ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে খৃষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত মুসলমান লিও আফ্রিকানুস আফ্রিকা সম্পর্কে যে বিবরণী প্রদান করেন তা তখনকার জন্য এবং পরবর্তীকালে আরো দীর্ঘকালের জন্য তাদের একমাত্র তথ্যসূত্র ছিল। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ইদ্রিসীর বিবরণের যে মূল্যায়ন করা হয় তা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ইতিপূর্বে বর্ণিত ব্যাপক ব্যবসা–বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্ব ও খৃষ্টান ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্য প্রথমে তীব্র বিপরীতধর্মী ছিল। তাদের মধ্যে সরাসরি কোন বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল না বললেই চলে, যেটুকু ছিল তা ইহুদী বণিকদের হাতে ছিল। ঐ সময় ইহুদীরা একান্তভাবে একটি বাণিজ্যিক জাতি ছিল। সভ্যতার দুটি এলাকায় কেবল তারাই অবাধে বাণিজ্য করতে পারতো। ইবনে খুর্‌রাদাজবেহ্‌র বর্ণনায় দেখা যায় যে, ইহুদী বণিকরা ফ্রান্সের দক্ষিণ থেকে সমুদ্র পার হয়ে মিসর আগমন করতো, সেখান থেকে পায়ে হেঁটে সুয়েজ যোজক অতিক্রম করতো এবং সেখান থেকে জাহাজযোগে ভারতে যেতো। অন্যরা স্থলপথে সিউটা থেকে মিসর যেতো এবং সিরিয়া থেকে সিন্ধুনদ এলাকায় গমন করতো। তারা প্রায়ই কনস্টান্টিনোপলেও যেতো। এমনিভাবে মুসলিম দেশগুলি ইউরোপ থেকে ইতিপূর্বে বর্ণিত ক্রীতদাস, বাইযেন্টাইন সাম্রাজ্যের রেশম, পশম এবং অস্ত্রশস্ত্র লাভ করতো। এসব পণ্য রাশিয়া হয়েও তাদের কাছে যেতো। একই ব্যবসায়ীরা ইউরোপের জন্য নিয়ে আসতো মৃগনাভি, ঘৃতকুমারী,কর্পুর, দারুচিনি এবং এ জাতীয় অন্যান্য পণ্য। এসব নামের সঙ্গে তাদের মূল প্রাচ্য নামের মিল নেই। অন্যান্য যে সব পথে প্রাচ্যের

---

১. আই ও ইউ আমি তোমার কাছে ধারি। আরবী শব্দ বাক এবং এর থেকেই আধুনিক 'চেক' শব্দের উদ্ভব হয়েছে। –অনুবাদক

www.waytojannah.com

পণ্যসামগ্রী ইউরোপে প্রবেশ করতো সেগুলি হচ্ছে কাস্পিয়ান অঞ্চল ও বাইযেন্টিয়ামের মধ্যবর্তী খাযার সাম্রাজ্য এবং মধ্য ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনকারী রাশিয়ার অর্ধ–বর্বর জাতি অধ্যুষিত এলাকা। দশম শতকে বাইযেন্টাইন সীমান্তবর্তী ট্রেবিযণ্ড শহর মুসলিম গ্রীক বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। সেখানে কিছু সংখ্যক মুসলিম ব্যবসায়ী বসবাস করতো। বাইযেন্টাইন সরকার শুল্ক আরোপ করে প্রচুর লাভবান হতো। স্পেন সীমান্তেও কিছুটা সরাসরি বাণিজ্য অব্যাহত ছিল।

অতএব, আমরা একদিক দিয়ে বলতে পারি যে, খৃষ্টান ও মুসলিম বিশ্বের মধ্যে পারস্পরিকভাবে এক ধরনের বাণিজ্যিক বিচ্ছিন্নতা বিরাজ করছিল। এ কথা সত্য যে, অষ্টম শতক থেকেই মুসলমান ভ্রমণকারী ও বণিকদের ইটালীয় শহরগুলিতে এবং কনস্টান্টিনোপলে দেখা যায়, কিন্তু এসব সম্পর্ক একাদশ শতকে যে প্রাণবন্ত বাণিজ্যিক লেনদেন শুরু হয় এবং যা ক্রুসেডের প্রথম যুগে স্বল্পকালের জন্য ব্যাহত হয় তারই সূচনা করে। বিগত যুগগুলির বাধা দূর হওয়ার পর যে বাণিজ্যিব সম্পর্ক গড়ে ওঠে তা ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ প্রচারে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে। এসব জাতি তাদের শাসকদের (যেমন সিসিলির রজার) সহায়তায় এই মূল্যবোধের দ্বারা লাভবান হতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

যৌথ অংশিদারিত্ব, বাণিজ্যিক চুক্তি যে সব বহুমুখী পন্থায় বাণিজ্যিক সম্পর্ক মুসলমান ও খৃষ্টানদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সৃষ্টি করে তা এখানে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা যায় না। মুসলিম বিশ্ব প্রায় পাঁচ শতাব্দী ধরে বৈষয়িক সংস্কৃতির যে সব সম্পদ আহরণ করে তা ইউরোপকে ঢেলে দেওয়া হয়। এ সব সম্পদ কেবল মুসলমানদের দুঃসাহসিক উদ্যমের মাধ্যমে দূরবর্তী দেশগুলি থেকে সংগৃহীত চীনা, ভারতীয় ও আফ্রিকান উৎপাদিত পণ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এগুলির মধ্যে প্রথমত মুসলিম দেশগুলিতে স্বাভাবিকভাবে ও শিল্প উৎপাদনের মাধ্যমে যেসব সম্পদ পাওয়া যেতো, তাও ছিল। মুসলিম দেশগুলিতে একটি বিশেষ পন্থায় শিল্প উৎপাদনের বিকাশ হয়। মূলধন না থাকায়, এবং শ্রমশিল্পীরা বিভিন্ন সংস্থায় সংগঠিত হওয়ায় এটি প্রধানত শাসকদের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। মুসলমানরা পরবর্তীকালে যখন ইউরোপীয় শিল্পের সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়, তখন শিল্পোন্নয়নের এই অদ্ভুত ব্যবস্থা তাদের জন্য বিরাট অসুবিধাজনক বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু ইসলামী সমৃদ্ধির যুগে এই ব্যবস্থা শিল্প দক্ষতার এমন এক বিকাশ ঘটায় যাতে উৎপাদিত জিনিসের শৈল্পিক মূল্য অপ্রতিদ্বন্দ্বিতার চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছে। প্রথমে বস্ত্র শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যের কথা উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে সাধারণভাবে প্রচলিত কতগুলি নাম থেকে কোন্ কোন্ বস্ত্র ইসলামী দেশগুলি থেকে আমদানি করা হতো তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় ঃ মসলিন (মসুল থেকে), ড্যামাস্ক (দামেস্ক থেকে), বালডাচিন (মূলত বাগদাদে উৎপাদিত হতো) এবং গজ, কটন, সার্টিন প্রভৃতি যে সব বোনা বস্ত্রে আরবী বা

www.waytojannah.com

পারসিক নাম রয়েছে। একইভাবে প্রাচ্যের কম্বল আমদানিও মধ্যযুগের ন্যায় প্রাচীন। এখানে একটি অদ্ভুত বিষয়ও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মধ্যযুগীয় জার্মান সম্রাটদের রাজকীয় পোশাকে আরবী উৎকীর্ণ লিপি ছিল। এগুলি সম্ভবত সিসিলি থেকে অর্ডার দিয়ে তৈরি করা হতো যেখানে খৃষ্টান পুনর্বিজয়ের পরও দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইসলামী শিল্পকলা ও শিল্প অব্যাহত থাকে। যে সব স্বাভাবিক উৎপাদিত দ্রব্য মূলত মুসলিম দেশসমূহ থেকে আমদানি করা হয়েছে এ কথা তাদের নাম থেকে বোঝা যায় না, সেগুলি হচ্ছে কমলা, লেবু, খোবানি প্রভৃতি ফল, স্পিনিজ, আর্টিকোক প্রভৃতি শাক–সব্জি, স্যফরণ বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অ্যানিলাইন। একইভাবে মূল্যবান পাথর (ল্যাপিস–ল্যাজিউলাই) এবং বাদ্যযন্ত্রেরও (বীণা, গিটার ইত্যাদি) নাম করা যেতে পারে, যদিও এগুলি সরাসরি বাণিজ্যিক লেনদেনের ফল কিনা তা প্রমাণ করা যায় না। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যেতে পারে, যার তৈরি কৌশল ইউরোপ দ্বাদশ শতকে মুসলমানদের কাছ থেকে আয়ত্ত করে।

সর্বশেষে আমাদের বাণিজ্যিক শব্দ সম্ভারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে এক সময় মুসলিম বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক রীতিনীতি কিভাবে খৃষ্টান দেশগুলির বাণিজ্য বিকাশে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ সংরক্ষিত রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'স্টার্লিং' শব্দটির মধ্যে প্রাচীন গ্রীক শব্দ 'স্ট্যাটার' অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, কিন্তু এই শব্দটি আরবীর মাধ্যমেই ইংরেজি ভাষায় প্রবেশ করেছে। 'ট্রাফিক' শব্দটি সম্ভবত আরবী *তাফরিক* থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ বন্টন। তেমনি সর্বজন পরিচিত 'ট্যারিফ' শব্দটি বেশ সুন্দর আরবী শব্দ *তা'রিফ* থেকে এসেছে, যার অর্থ বৈশিষ্ট্য ঘোষণা। একই সূত্র থেকে এসেছে 'রিস্ক' 'টেয়ার' 'ক্যালিবার' এবং প্রাত্যহিক ব্যবহৃত 'ম্যাগাযিন' শব্দ। ম্যাগাযিনের মূল আরবী *'মাখাযিন'*, যার অর্থ ভাণ্ডার বা দোকান (ফারসী 'ম্যাগাসিন' শব্দ এখনো সাধারণভাবে দোকান অর্থে ব্যবহৃত হয়)। 'চেক' শব্দের কথা আফ্রিকান বাণিজ্য প্রসঙ্গে ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর জার্মান এবং ওলন্দাজ প্রতিশব্দও *(ওয়েচসেল, উইসেল)* একইভাবে আরবী। 'অ্যাভাল' শব্দটির ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। এরপর বিল অব এক্সচেঞ্জ (মূল্যপত্র) প্রসঙ্গে বলা যায় যে, মুসলমান ও ইটালিয়ান খৃষ্টানদের পার্টনারশীপ (অংশীদারিত্ব) থেকেই জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর ধারণার উদ্ভব হয়। মুসলমানদের বাণিজ্যিক আইন কুরআন ও হাদীস থেকে উদ্ভূত শরিয়তী বিধানের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে একটি উন্নত বাণিজ্য রীতি ব্যবস্থার দ্বারা এটি পরিলক্ষিত হয়। উপরের দৃষ্টান্ত তারই প্রমাণ। এসব বাণিজ্য পদ্ধতির একটি হচ্ছে 'মোহাট্রা' নামে অভিহিত কাল্পনিক দরাদরি। এই শব্দটিও আরবী থেকে বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষাভুক্ত হয়।

'ডাউয়েন' (dauane)-এর ন্যায় প্রকটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত শব্দ ঐ সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যখন ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন বন্দরে নিয়মিত বাণিজ্যিক লেনদেনের উদ্ভব

www.waytojannah.com

হয়। এ কথা সর্বজন বিদিত যে, এই লেনদেন পাশ্চাত্য দেশগুলির বাণিজ্যিক সংগঠনেও বিরাট অবদান সৃষ্টি করে। মুসলিম শাসকদের সঙ্গে তারা যেসব চুক্তি সম্পাদন করে এবং পাশ্চাত্যের বন্দরগুলিতে যেসব বাণিজ্য প্রতিনিধি নিয়োগ করে তা বর্তমানে যে সব বিধি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করছে তার বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় ছিল।

পূর্ববর্তী পর্যালোচনা থেকে দেখা যাবে যে, ভূগোল ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইউরোপ মুসলিম বিশ্ব থেকে যে সাংস্কৃতিক সুফল লাভ করেছে তা কেবল এক মুহূর্তের ব্যাপার ছিলো না বরং একাদশ শতকের শুরু থেকে যে পারস্পরিক সম্পর্ক অব্যাহত থাকে এবং ত্রয়োদশ শতকের মঙ্গোল আমলে যা বিশেষভাবে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে তাই ছিল এর ভিত্তিভূমি। এ কথাও সত্য যে, তুরস্ক ও পারস্যের ন্যায় দেশগুলিতে এবং ভারত ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মুসলিম অধিবাসীদের মধ্যে পরিবৃদ্ধি সহকারে যে ইসলামী সভ্যতা বিরাজমান ছিল তার মাধ্যমেও বহু মুসলিম মতামত ও রীতিনীতি ইউরোপীয় দেশগুলি অবহিত হয় এবং সেগুলি অনুসরণও করে। কিন্তু খৃস্টান জগতের উপর মুসলমানদের এককালের বিপুল প্রাধান্য দশম শতকের ন্যায় এতো সুস্পষ্টভাবে আর কোন যুগে দেখা যায়নি। এ সময় ইসলাম সমৃদ্ধির স্বর্ণশিখরে ছিল এবং খৃস্টান ইউরোপে নেমে আসে নৈরাশ্যজনক স্থবিরতা।

জে এইচ ক্রেমার্স

চিত্র-১৪. মার্সিয়ার (৭৫৭-৯৬) রাজা 'ওফা' কর্তৃক আরব দিনারের নিবিড় অনুকরণে তৈরি একটি স্বর্ণ মুদ্রা। আরবী হরফে উপর থেকে নিচে 'ওফা রেক্স' শব্দগুলো লেখা হয়েছে। এই মুদ্রাটি মুসলিম মুদ্রা ব্যবস্থার সুবিশাল প্রভাব এবং বিস্তার এর পরিচায়ক

গ্রন্থপঞ্জি

এ রিনাউড, *ইনট্রোডাকশন জেনারেলি এ লা জিওগ্রাফি ডেস ওরিয়েন্টক্স, জিওগ্রাফি ডি আবুল ফিদা*, প্যারিস, ১৮৪৮–এর ১ নং টোম। সি শয়, *দি জিওগ্রাফি অব দি মুসলিমস অব দি মিডল এজেস, দি জিওগ্রাফিক্যাল রিভিউ* গ্রন্থে (নিউইয়র্কের আমেরিকান জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত), ১৯২৪, পৃ. ২৫৭–৬৯।

কে মিলার, ম্যাপেই অ্যারাবিকেই ১ম–৪র্থ খণ্ড, স্টাটগার্ট ১৯২৬–৯।

মনুমেন্টা জিওগ্রাফিকা আফ্রিকেই এট ইজিপ্টি, পার ইউসুফ কামাল, ৩য় টোম (ইপোক অ্যারাবে), ফ্যাসক্ ১, ১৯৩০। (এই প্রকাশনায় সর্বপ্রথম বিস্তারিত বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা দেওয়া হয়েছে এবং

www.waytojannah.com

মানচিত্রগুলিকে সময়ানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। এতে ঐ সময়কার ইউরোপীয় ও মুসলিম সাধারণ ভৌগোলিক জ্ঞানের একটি তুলনাও তুলে ধরা হয়েছে।)

জে লিলিওয়েল, *জিওগ্রাফি ডু ময়েন এজ, অ্যাডেক কার্টেস*। ২ খণ্ড। ব্রুক্সেলিস, ১৮৫২। *অ্যাটলাস*, ব্রুক্সেলিস ১৮৫০।

সি আর ব্রিযলি, দি ডন অব মডার্ন জিওগ্রাফি, ১-১১ খণ্ড। লণ্ডন ১৮৯৭-১৯০১ ; ৩য় খণ্ড। অক্সফোর্ড, ১৯০৬।

জি জ্যাকব, *স্টুডিয়েন ইন অ্যারাবিশেন জিওগ্রাফেন*, ১ম-৪র্থ খণ্ড। বার্লিন, ১৮৯১-২।

সি ডি লা রন্‌কিয়ার, *লা ডিকোভার টি ডি এল আফ্রিক আউ ময়েন এজ*, ৩য় খণ্ড। কায়রো, ১৯২৫-৭।

স্যার আর্নল্ড টি উইলসন, *দি পার্সিয়ান গাল্‌ফ*। অক্সফোর্ড, ১৯২৮।

জি ফের্‌রাণ্ড, *রিলেশন্স ডি ভয়েজেস এট্ টেক্সটেস জিওগ্রাফিক্‌স্ অ্যারাবেস*, পারসেন্‌স্ এট টার্কস রিলেটিফ্‌স্, এ এল এক্সট্রিম-ওরিয়েন্ট ডেস এইট্‌থ্ আউ এইটিন্থ সিকল্‌স, ২ খণ্ড। প্যারিস। ১৯১৩-১৪।

এ হাইড, *হিস্টয়ের ডু কমার্স ডু লেভ্যান্ট আউ ময়েন এজ*, ৩ খণ্ড। লিপযিগ, ১৮৮৫-৬।

ডব্লু এ বিওয়েস, *দি রোমান্স অব দি ল মার্চেন্ট*, লণ্ডন, ১৯২৩। এল ডি ম্যাস ল্যাট্রী, *ট্রেইটেস ডি পেইক্স এট ডি কমার্স এট ডকুমেন্টস ডাইভার্স কনসার্ন্যাস্ট লেস রিলেশন্স ডেস চ্রেটিয়েন্স আবেক লেস অ্যারাবেস ডি লা আফ্রিক সেপটেনট্রিওনেল আউ ময়েন এজ*-এর ঐতিহাসিক পরিচিতি। প্যারিস ১৮৬৬।

আল-মুকাদ্দাসী, *ট্রান্সলেটেড ফ্রম দি অ্যারাবিক এণ্ড এডিটেড বাই জি এস. এ র‍্যাংকিং এণ্ড আর এফ আযু*, প্রথম সংখ্যা ১-৪ (অসমাপ্ত)। কলকাতা ১৮৯৭-১৯১০ (বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা)।

ইদ্রিসী, *জিওগ্রাফি ট্রে ডুইটে ডি লা অ্যারাব এন ফ্রাঙ্কায়েস ডি আপরেস ডিউক্স মাস ডি লা বিবলিওথেক ডু রয় এট আকম্পেগনী ডি নোটস পার অ্যামেদী জউবার্ট*। প্যারিস, ১৮৩৬-৪০, ২ খণ্ড।

সি বার্বিয়ার ডি মিনার্ড, *ডিকশনায়ের জিওগ্রাফিক, হিস্টরিক এট লিটারেইরি ডি লা পার্সে এট ডেস কার্টিস অ্যাডজাসেন্টিস, এক্সট্রেইট ডু মটজেম আল-বউলদান ডি ইয়াকুবী এট কমপ্লিট এ লা' আইডি ডি ডক্যুমেন্টস অ্যারাবেস এট পার্সান্স*, প্যারিস, ১৮৬১।

ইবনে বতুতা *ট্রাভেল্‌স ইন এশিয়া এণ্ড আফ্রিকা, ১৩২৫-৫৪ ; ট্রান্সলেটেড এণ্ড সিলেক্টেড বাই এইচ এ আর গিব* (ব্রডওয়ে ট্রাভেলার্স, সম্পাদনা স্যার ই ডেনিসন রস ও ইলিন পাওয়ার), লণ্ডন, ১৯২৯।

পিয়েরফ্ ডি আইলি, *ইমাগো মুণ্ডি*, এডপার এডমণ্ড বার্ন টোম ১, প্যারিস ১৯৩০।

www.waytojannah.com

ইসলামী লঘু শিল্পকলা এবং ইউরোপীয় শিল্পকর্মে এর প্রভাব

ইসলামের সেই চমকপ্রদ যুগের সূচনায় ইসলামী সভ্যতা পশ্চিমে আটলান্টিকের তীরবর্তী শহরগুলিতে নতুন ধরনের শিল্পের অবদান সৃষ্টি করার জন্য যেসব অঞ্চল থেকে শুরু করে সে সব অঞ্চলে শিল্পকলার অবস্থা ছিল সেকেলে ও অনুন্নত। ঐ সময় আরবের শিল্পকলায় ছিল হয় দূর অতীতের একটি নির্জীব অভিব্যক্তি কিংবা বিচ্ছিন্নভাবে বাইরের প্রভাবমূলক একটি অনুকরণ। যে সব স্থায়ী বসতিপূর্ণ উর্বর অঞ্চল মরুভূমির বিচ্ছিন্ন ভবঘুরে বেদুইনদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক পরিবেশে সমৃদ্ধি লাভ করে, সেখানেও স্থানীয়ভাবে শিল্পকলার তেমন বিকাশ ঘটেনি। ইসলামী শিল্পকলার আত্মিকরূপ আরব থেকে উদ্ভূত হলেও এর বাহ্যিকরূপ বাইরের যে সব দেশে শিল্পকলা একটি বলিষ্ঠ শক্তি ছিল তার আঙ্গিকেই গড়ে উঠেছে।

খৃস্টানরা সিরিয়া ও মিসরের পৌত্তলিক আমলের শিল্পকলায় গভীর পরিবর্তন সাধন করে। এ সব দেশের নিজস্ব যে সব বৈশিষ্ট্য ছিলো কিংবা বাইরের প্রভাবাধীনে যে সব বৈশিষ্ট্যের আমদানি ও বিকাশ ঘটে, সেগুলিকে নতুন এক প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত করা হয় এবং উভয়ের সংমিশ্রণে একটি সুসংবদ্ধ ও অপরূপ শিল্পকলার উদ্ভব হয়। ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রীসের অপর পারে আর এক ধরনের শিল্পকলা গড়ে ওঠে। পারস্যবাসী তাদের পার্থীয় অধিস্বামীদের বিতাড়িত করে নিজস্ব সাসানীয় রাজবংশ প্রতিষ্ঠার কয়েক শতকের মধ্যেই এক অপূর্ব জাতীয় পুনর্জাগরণের যুগে প্রবেশ করে। ইরানীয় শিল্প–প্রতিভা তাদের প্রাচীন শিল্প–সম্পদের সঙ্গে আলেকজান্ডারের অভিযানের সময় থেকে প্রচলিত গ্রীক বৈশিষ্ট্য এবং পরবর্তীকালে আভ্যন্তরীণ এশিয়া থেকে আমদানিকৃত বৈশিষ্ট্য সমূহের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে অত্যন্ত বলিষ্ঠ এক অপরূপ শিল্প সৌকর্য গড়ে তোলে। উপরোক্ত দুটি সংস্কৃতি ছিল পরস্পর বিরোধী। অপর দিকে মুসলমানদের কাছে উভয়টিই ছিল অপ্রীতিকর। ইসলামী শিল্পকলা এই পরিস্থিতিতেই ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে।

মধ্যযুগে শিল্পকলা ছিল প্রথমত ও প্রধানত একটি ধর্মীয় অভিব্যক্তি। আমরা মধ্যযুগীয় শিল্পকর্মের ধারায়, যে ধর্ম বিশ্বাসের প্রেরণায় সেগুলি গড়ে ওঠে তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করি। এগুলির গঠন রীতিতে কোন কোন বৈশিষ্ট্য যত সুস্পষ্টই হোক না কেন এবং কোন বিশেষ পদ্ধতি তাদের মূল পরিচয় যতই তুলে ধরুক না কেন, তারা সুস্পষ্টভাবে ধর্মীয় প্রভাবের ছাঁচেই গড়ে ওঠে। খৃস্টান শিল্পকলা মূলত ধর্মীয় উপদেশের একটি বাহন। এর

www.waytojannah.com

উদ্দেশ্য সব সময় সর্বপ্রকার সূক্ষ্ম ছবি ও প্রতীকের মাধ্যমে এত সরল–সহজভাবে প্রতিফলিত যে, শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সবাই তা উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু এর সুন্দর পট–শিল্প আরবদের কাছে ছিল নিছক মূর্তিপূজা। কোন শৈল্পিক ঐতিহ্য না থাকায় তারা শিল্পকে সন্দেহের চোখে দেখে এবং আদিম যুগের লোকদের ন্যায় এর সঙ্গে জাদুর যোগাযোগ রয়েছে বলে মনে করে। তার উপর ধর্মীয় নিষ্ঠার প্রথম দৃষ্টিতে বিলাসিতা তাদের কাছে বিশেষভাবে নিন্দনীয় ছিল। তারা মনে করেন যে, এটি নাস্তিকতা থেকে উদ্ভূত একটি শয়তানের ফাঁদ, যার সঙ্গে সত্যিকারের বিশ্বাসীর কোন সংশ্রব থাকতে পারে না। পারস্য শিল্পের যে শিল্পসৌকর্য পারস্যের কারুশিল্পীরা বর্তমানে ইসলামী শিল্পকলায় গভীরভাবে প্রতিফলিত করেছে তাও প্রথমে পৌত্তলিকতার নিন্দনীয় বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা হতো।

ইসলামী শিল্পের সূচনা মসজিদে। এখানে প্রকাশ্য দিবালোকে এর উদ্ভব হয় এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এটি লালিত পালিত হয়। প্রথম দিকের মসজিদগুলি কোন প্রকার স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যবিহীন সাদাসিধা কাঠামো ছিল। কেবল নামায আদায় এবং ধর্মীয় উপদেশ প্রচারের জন্যই সেগুলি ব্যবহৃত হতো। প্রথমে কোন প্রকার গৃহসজ্জা ছিল না। যখন এর প্রবর্তন হয়, তখনো সেগুলি ছিল যতোটা সম্ভব অতি সাধারণ। যে কোন অভিনবত্বের কঠোর সমালোচনা করা হতো। কথিত আছে যে, মিসরে যখন প্রথম *মিম্বার* তৈরি করা হয়, তখন এই অপকর্মের সংবাদ খলীফার কর্ণগোচর হলে তার নির্দেশে সেটি ভেঙে ফেলা হয়; কারণ এতে ইমামের মর্যাদা তার অন্যান্য মুসলমান ভাইয়ের চাইতে অবাঞ্ছিতভাবে বৃদ্ধি পায়। তেমনি মক্কার দিকনির্দেশের জন্য প্রথম যে *মিহ্‌রাব* তৈরি করা হয় তারও তীব্র সমালোচনা হয় ; কারণ এটি বিশেষভাবে খৃস্টান গির্জার *আপস*–এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বস্তুত সেখান থেকেই *মিহ্‌রাবের* উদ্ভব হয়। কিন্তু শীঘ্রই এমন এক যুগের আবির্ভাব হয়, যে যুগের লোকদের রুচিশীল দৃষ্টিতে গির্জার উন্নত অবস্থার তুলনায় মসজিদের দৈন্য বিশেষভাবে ধরা পড়ে। ফলে যথাসময়ে *মিম্বার* ও *মিহ্‌রাব* মসজিদের প্রধান আলংকারিক সৌন্দর্যে পরিণত হয়। সূক্ষ্ম ডিজাইন ও অলংকরণের বৈচিত্রে এগুলি স্থাপত্য শিল্পে এক অপরূপ সাফল্য সূচিত করে।

ইসলাম যখন আরো প্রসারিত হতে থাকে, তখন বাইরের জাতিগুলির সংস্পর্শে তার শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গিও প্রসারিত হয়। ইসলামী ধর্মীয় বিধানে যেসব স্থায়ী বিধি–নিষেধ রয়েছে তার সীমার মধ্যে একটি শৈল্পিক আদর্শের নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হয়। তার উপর প্রাসাদিত দৃষ্টিভঙ্গি লাভের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক প্রাধান্যের স্থলে সম্পূর্ণরূপে লৌকিক একটি সাংস্কৃতিক প্রবণতার উদ্ভব হয়।

যে সব শাসক ধর্মীয় বিশ্বাসের ধারক হিসাবে খ্যাতিমান ছিলেন না তাদের মধ্যে যখন বিদেশী রীতিনীতি সংক্রমিত হতে শুরু করে তখন রাজপ্রাসাদের পবিত্রতার সুনামও

www.waytojannah.com

ক্ষীণ হতে থাকে। সংস্কৃতিমনা শাসকগণ মহানবীর উত্তরাধিকারী হিসাবে নয়, বরং রাজা হিসাবে যখন সুন্দর সুন্দর বই; সুদৃশ্য ছবিওয়ালা পোশাক ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট হন তখনই বিধিনিষেধ বহির্ভূত শিল্পকর্মের আবির্ভাব শুরু হয়। শাসকের দেখাদেখি অভিজাত শ্রেণী এবং অন্ধ অনুসারীরাও এ ধরনের শিল্পের সমঝদার হয়ে ওঠেন এবং এর ফলে এমন এক 'দরবারী শিল্পের' উদ্ভব হয় যাতে কারুশিল্পীরা লাভবান হলেও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন।

প্রাথমিক খলীফাদের আমলে আভিজাত্য চর্চা অসম্ভব ছিল। তারা অলংঘনীয় মূলনীতি হিসাবে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের মতবাদ ছিল যে, প্রত্যেকে তার অভাব–অভিযোগে শাসকের প্রত্যক্ষ সহায়তা পাবে যার জীবন যাপন প্রণালী, বাসস্থান এবং বাসস্থানের আসবাবপত্র সমালোচনার উর্ধে থাকবে। কিন্তু একটি আয়েশী জীবনের শাসক শ্রেণী যখন নিজেদের জনগণের সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে শুরু করে তখনই রাজপ্রাসাদও একটি বিচ্ছিন্ন মর্যাদা লাভ করে এবং সেখানে একটি নতুন ধরনের রীতিনীতি প্রচলিত হয়। কতিপয় উল্লেখযোগ্য প্রাচীর চিত্র থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, উমাইয়া খলীফাদের আমলেই একটি লৌকিক দরবারী শিল্পের উদ্ভব হয়। এসব প্রাচীর চিত্রে গ্রীক ও প্রাচ্য ধারার সংমিশ্রণে অত্যন্ত সুন্দরভাবে অঙ্কিত চিত্র সম্বলিত বিষয়বস্তু রয়েছে। মরু সাগরের পূর্বে মরুভূমি অঞ্চলের একটি পরিত্যক্ত শিকার–ভবনে এখনো দেখা যায়।[১] ভবনটি খলীফা প্রথম ওয়ালিদ কর্তৃক ৭১২ থেকে ৭১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়। আব্বাসীয় খলীফাগণ কর্তৃক দামেস্ক থেকে নতুন নগরী বাগদাদে রাজধানী স্থানান্তরের পর দরবারী শিল্প একটি প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যে পরিণত হয়। এই রাজধানী স্থানান্তর প্রকৃতপক্ষে ৭৬৬ খৃষ্টাব্দে সম্পন্ন হয়। এই রাজধানী স্থানান্তর মুসলিম শিল্পকলার ইতিহাসে একটি বিশেষ যুগের সূচনা করে, কারণ এ সময় থেকে এর বিকাশে পারস্য প্রভাব প্রাধান্য বিস্তার করে।

মুসলিম শিল্পকলার উদ্ভব ধাপে ধাপে বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; বরং এই শিল্পকলা কিভাবে খৃষ্টান ইউরোপের সমসাময়িক ও পরবর্তী অগ্রগতিকে প্রভাবিত করেছে তা অনুসন্ধানের জন্য এর কতিপয় পরিণত বিকাশের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরাই আমাদের উদ্দেশ্য। তাছাড়া আমরা একান্তভাবে ছোটখাটো শিল্পকলার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছি। এগুলি ছিল কারুশিল্পীদের কাজ। যখন কোন ভবন নির্মিত হতো তখন এর উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয়তা ও সুযোগ সুবিধা বিধানের জন্য খুঁটিনাটি সব কিছু সজ্জিত করার উদ্দেশ্যে এদের ডাক পড়তো।

---

১. এ সব নকশার রঙীন চিত্র এলয়স্ মুসিলের *কুশেজ্জর আমরায়* পুনর্মুদ্রিত করা হয়েছে।

www.waytojannah.com

শীঘ্রই মুসলমানরা বিরাট নির্মাণশিল্পী হয়ে ওঠে। তাদের শিল্প প্রতিভা গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে স্থাপত্যের সুনির্দিষ্ট ধ্যান-ধারণা লাভ করে। মানুষের ছবি আঁকার ব্যাপারে ধর্মীয় বিধিনিষেধ থাকায় মূর্তি শিল্পের বিকাশ না ঘটলেও পাথর, কাঠ ও অন্যান্য জিনিসের খোদাই কার্যে তারা অত্যন্ত দক্ষতা অর্জন করে। প্রাচীর চিত্র দূর অতীত থেকে অব্যাহত থাকলেও বর্তমানে যে চিত্রকলা আমাদের কাছে পরিচিত তা তথাকথিত 'মিনিয়্যাচার' শিল্পে সীমাবদ্ধ। ছোট ছোট চিত্র, পাণ্ডুলিপির ছবি প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলিতে কারিগরি সৌকর্যের দক্ষতা এবং রং সম্পর্কে গভীর বিচক্ষণতা প্রকাশ পেলেও মধ্যযুগীয় ইউরোপে একই অবস্থায় যেসব উৎকৃষ্টতম শিল্পকর্মের সৃষ্টি হয়েছে তার কতিপয় বৈশিষ্ট্য এগুলিতে দেখা যায় না। সুদক্ষ নির্মাণ শিল্পীর সংখ্যা বহু হলেও ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে তাদের সমকক্ষ কাউকে দেখা যায় না।

অবশ্য মুসলমানরা যদিও স্থাপত্য ছাড়া চারুকলার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সাফল্যের সমকক্ষ হতে পারেনি, তথাপি যে সব শিল্পে তারা অবাধে তাদের প্রতিভার প্রতিফলন ঘটায়, সেখানে তারা মধ্যযুগে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। ইসলাম পাশ্চাত্যের নিকট অপরিজ্ঞাত বহু প্রাচীন কারুশিল্প ধারার প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী ছিল। মুসলিম জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা যেভাবে ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরাট সম্পদ বিতরণ করে গেছেন, তেমনি মুসলিম কারুশিল্পীরাও প্রাচ্যে প্রচলিত শিল্পকলার 'কর্মকেন্দ্র ভিত্তিক চর্চার' ঐতিহ্য সংরক্ষণ, বিকাশ ও প্রসার করে গেছেন। এই ঐতিহ্য হয় ইউরোপে কখনো প্রবেশ করেনি, কিংবা অতীতে ইউরোপ এ সম্পর্কে অবহিত হলেও মধ্যযুগের ঝড়ঝঞ্ঝায় সেখানে তার বিলুপ্তি ঘটে।

নতুন করে অতীতের এই নিপুণতার বিকাশ ঘটাতে গিয়ে ইসলামী শিল্পকলা এমন এক সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য লাভ করে যে, এটিকে অতি সহজেই একটি স্বাভাবিক ব্যাপার মনে করা হয় এবং তাই গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সাধারণের জন্য হোক কিংবা উৎসব অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য হোক প্রতিটি জিনিসকে অত্যন্ত প্রাণবন্তভাবে অলংকৃত করা হতো। তার পরিকল্পনা ও প্রকাশ এতো সুষ্ঠু ছিল যেন সেটি কোন কৃত্রিম সৌন্দর্য নয় বরং প্রকৃতির স্বাভাবিক রূপের অভিব্যক্তি। এই অঙ্কন শিল্পের রীতি সুনির্দিষ্টভাবে বিদেশাগত হলেও ইউরোপীয় ঐতিহ্য থেকে সামঞ্জস্যহীন হিসাবে এখনো তা পরিত্যক্ত হয়নি। এর অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আকর্ষণীয় ও রোমান্টিক। এর অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলি এতো সুনিপুণভাবে উদ্‌ঘাটিত হয় যাতে আমাদের মনে এরূপ বিশ্বাস জন্মে যে, এর বাহ্যিক অবয়বের বাইরে কোন অবোধ্য প্রাণশক্তি রয়েছে। এ ধরনের শিল্পসৌকর্য নগ্ন জিনিস রূপায়ণের নিছক কৌশল মাত্র নয়, বরং সূক্ষ্ম কারুকার্যের এমন একটি অপরিহার্য দিক যা ছাড়া কোন শিল্পকর্ম অসম্পূর্ণ থাকে। পাশ্চাত্যের শ্রবণে সুরমাধুর্য যেমন আনন্দের শিহরণ জাগায়, তেমনি কোন একটি কারুশিল্পের নৃত্যছন্দ প্রাচ্যের কাল্পনিক দৃষ্টিকে বিমোহিত করে। প্রাচ্যের কারুশিল্পীদের কাছে কারুশিল্পের চর্চা এতোটা মোহনীয় ছিল যে, এর বিভিন্ন

www.waytojannah.com

সমস্যা পর্যালোচনায় এবং যে ধারা এখনো আধুনিক শিল্পীরা অনুসরণ করছে সেই ধারার সুষ্ঠুতা বিধানে তারা অবিরাম ও অক্লান্ত সাধনা করে যান। ইসলামী শিল্পকলার সামান্যতম পর্যালোচনা থেকে একথা প্রতীয়মান হবে যে, মুসলিম শিল্প প্রতিভা কারুশিল্পের ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছে তা ছোটোখোটো শিল্প হিসাবে অসাধারণ মর্যাদার অধিকারী।

ধর্মীয় বিধি-নিষেধে মানুষের কিংবা কোন জীব-জন্তুর ছবি আঁকা মুসলমানদের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হলেও মুসলিম অলংকরণে অত্যন্ত সাধারণভাবে এগুলির প্রতিফলন দেখা যায়। কিন্তু সময় সময় এরূপ বলা হয় যে, কোন বিশেষ সম্প্রদায় এগুলি সমর্থন করে না, কিংবা এগুলি কোন অবস্থায়ই মসজিদে করতে দেওয়া হয় না। এ ধরনের ছবি থাকলে সংশ্লিষ্ট জিনিসগুলি লৌকিক ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছে বলে সঙ্গে সঙ্গে ধরে নেওয়া হয়। কোন বিশেষ শৃংখলা ভঙ্গকারী অন্যায় কার্যে সার্বজনীন মৌনসম্মতিও সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। উদারমনা লোকেরা তা মেনে নিলেও কঠোর মনোভাবসম্পন্ন লোকের কাছে তা সবসময় বিরক্তিকর এবং তারা যে কোন মুহূর্তে এর বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করতে পারে। আমাদের যাদুকর এবং শিল্প সংগ্রহে এমন বহু জিনিস রয়েছে যেগুলি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে সুস্পষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতির স্বাক্ষর বহন করে। এতে নিশ্চিতভাবে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, এসব ক্ষেত্রে কোন না কোন সময়ে ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিরস্কারের হাত সক্রিয় ছিল।

মুসলিম অলংকরণ শিল্পে আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আরবী উৎকীর্ণ লিপির ব্যবহার। পবিত্র কুরআনের একটি উদ্ধৃতি, কোন কবির একটি উৎকৃষ্ট চরণ কিংবা অভিনন্দন বা আশীর্বাদমূলক কোন উক্তি প্রান্তভাগের বা ফ্রিযের চারদিকে লেখা হয়, অথবা গোল করে পাকানো কাগজের আকারে (কার্টুশ) লিপিবদ্ধ করা হয়। অভিজাত মালিকের নাম ও জাঁকজমকপূর্ণ উপাধি মাঝে মাঝে কোন মূল্যবান জিনিসের সৌকর্য বিধান করে। এতে তারিখ এবং ব্যুৎপত্তিও দেওয়া হয়। কোন কোন ওস্তাদ কারিগর সময় সময় তার শিল্পকর্মের উপর নিজের নাম, যে শহরে তৈরি করা হয়েছে তার নাম এবং যে বছর কাজ শেষ হয়েছে সে বছরের নামও প্রদান করেন।

ইসলামী শিল্পে আরবদের একক অবদান আরবী হস্তলিপি, ইসলাম যেখানেই প্রসার লাভ করেছে সেখানে মুসলিম প্রভাবের সার্বজনীন স্বাক্ষর রেখেছে। পবিত্র কুরআন এই বর্ণমালায় লিখিত। মুসলিম জগতের সর্বত্র এটি অত্যন্ত পবিত্র। এর লিপিকাররা এর লেখনরীতির সৌকর্য সাধনে পরস্পর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। অভিজ্ঞ লিপিকাররা পুরুষানুক্রমে এই হস্তলিপি চর্চা করে এতোটা সাফল্য ও স্বীকৃতি লাভ করেছে যে, একটি সুন্দর গ্রন্থ কেবল অমূল্য সম্পদই নয়, একজন ওস্তাদ হস্তলিপিবিদের লেখার একটি টুকরাও সংগ্রাহকের কাছে মহামূল্যবান।

www.waytojannah.com

পড়তে না পারলেও ইউরোপীয় কারুশিল্পীরা আরবী হস্তলিপির বাইরের সাদৃশ্যের সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিচিত হন। এই পরিচয় ও অজ্ঞতার প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া যায় মার্সিয়ার রাজা ওফ্ফার (৭৫৭–৯৬) তৈরি একটি স্বর্ণ মুদ্রায়, যা বর্তমানে বৃটিশ মিউজিয়ামে রয়েছে (চিত্র ১৪)। একটি মুসলিম দিনারের সঙ্গে এর গভীর মিল রয়েছে, কিন্তু 'ওফ্ফা রেক্স' কথাটি একটি আরবী রূপকথার মধ্যে উল্টোভাবে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। রূপকথাটি এতোটা নির্ভুলভাবে অনুকরণ করা হয়েছে যে, এতে মূল মুদ্রার তারিখ (৭৭৪) এবং মুসলিম ধর্মীয় বক্তব্যের বর্ণনাও কপিতে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। এই মুদ্রার অনুরূপ পরবর্তী কোন মুদ্রা পাওয়া যায় না, কিন্তু এতদ্বারা মুসলিম টাকশাল থেকে নিখুঁত মুদ্রার প্রচলন কতো ব্যাপক ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। একই মিউজিয়ামে আনুমানিক নবম শতকের ব্রঞ্জের গিল্টি করা ক্রসের উপর মুসলিম শিল্পকর্মের সঙ্গে পাশ্চাত্যের যোগাযোগের আর একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। এর কেন্দ্রস্থলে একটি কাচের মধ্যে কুফী অক্ষরে আরবীতে *বিসমিল্লাহ* কথাটি উৎকীর্ণ রয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই শিল্পীরা যে অপরিচিত লেখা নকল করেছেন তার অর্থ বুঝতে পারেননি, কারণ যে উৎকীর্ণলিপি এতোটা মুসলিম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তা কিছুতেই একজন খৃষ্টান রাজার মুদ্রার উপর কিংবা খৃষ্টানদের একটি পবিত্র নিদর্শনের উপর জেনেশুনে দেওয়ার কথা নয়।

এ সময়ের পর থেকে মুসলিম সূত্র হতে প্রায়ই হিজিবিজিভাবে নকল করা আরবী হস্তলিপির টুকরো টুকরো অংশ এবং অন্যান্য কারুকার্য খৃষ্টান ইউরোপের কারুশিল্পে ক্রমবর্ধমানভাবে ব্যাপকতা লাভ করে। পবিত্র স্থানসমূহের প্রতি শ্রদ্ধামূলক আকর্ষণ, মুসলমানরা এককভাবে যে জ্ঞান–বিজ্ঞানের অধিকারী ছিল তা অর্জন করার আগ্রহ, বাণিজ্যিক উদ্যম এবং এ ধরনের অন্যান্য স্বার্থ–সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হয়ে বহু পর্যটক মুসলিম দেশগুলি ভ্রমণ করেন। তারা আরবদের জাঁকজমকের যেসব কাহিনী বর্ণনা করেন তার সমর্থনে মুসলিম দক্ষতার বিভিন্ন প্রামাণ্য জিনিসও নিয়ে আসেন।

নিজেদের দেশে অজ্ঞাত জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য পণ্ডিত ব্যক্তিরা মুসলমানদের জ্ঞানচা কেন্দ্র সফরের পর যেসব জিনিস নিয়ে আসেন তার মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ছি অ্যাস্ট্রলেব (নক্ষত্র নির্ণায়ক যন্ত্র)। প্রাচীন গ্রীকদের আবিষ্কৃত জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই যন্ত্রটি উন্নয়ন সাধন করেন আলেকজান্দ্রিয়ার ভূগোলবিদ টলেমী। মুসলমানরা এর পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রদান করেন। অ্যাস্ট্রলেব দশম শতকে ইউরোপে আসেন। নামাযের সময় নির্ধারণ এবং মক্কার দিক নির্ণয়ের জন্য প্রাচ্যে এটি প্রধানত ব্যবহৃত হতো। অন্যান্য কাজেও এটি ব্যবহৃত হতো, যেমন আমরা *দর্জি কর্তৃক কথিত কাহিনীতে* দেখতে পাই যে, বাকচতুর নরসুন্দর অ্যাস্ট্রলেব দেখে ক্ষৌরকার্যের শুভ মুহূর্ত নির্ণয় না করা পর্যন্ত তার উত্ত্যক্ত মক্কেলকে দীর্ঘসময় অপেক্ষায় রাখেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ায় সমগ্র মধ্যযুগে অ্যাস্ট্রলেব ও এর ব্যবহারকারীরা বহু দুর্নাম কুড়ায়। তখন সাধারণভাবে বিশ্বাস

www.waytojannah.com

Contents

করা হতো যে, জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সমার্থক। দশম শতকের মহান পণ্ডিত গারবার্ট অব গুভার্ন, যিনি ৯৯৯ খৃস্টাব্দে দ্বিতীয় সিলভেস্টার নামে পোপ নিযুক্ত হন, তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা করায় বলা হয় যে, কর্ডোভা সফরের সময় তাঁর সঙ্গে শয়তানের মোলাকাত হয়। 'গারবার্ট অ্যাস্টলেবের ব্যবহারের ক্ষেত্রে টলেমীকেও ছাড়িয়ে যান, এবং গলে যে গণিত বিজ্ঞানের চর্চা দীর্ঘকাল বন্ধ ছিল তিনি তা পুনরুজ্জীবিত করেন। এই গারবার্টের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে মালমেসবারীর উইলিয়াম জাদু বিদ্যায় তার নিপুণতা ছিল বলে কুৎসিৎ উক্তি করেন। ফ্লোরেন্সে দশম শতকের শেষার্ধের বিজ্ঞানের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে একটি অ্যাস্টলেব সংরক্ষিত আছে। রোমের অক্ষাংশ পরিমাপের জন্য এটি নির্মিত হয়। কোন কোন মহলের মতে পোপ সিলভেস্টার এটি ব্যবহার করতেন।[১]

প্রাচীনতম তারিখের অ্যাস্টলেব অক্সফোর্ডে রয়েছে। ৯৮৪ খৃস্টাব্দে নির্মিত এই অ্যাস্টলেবটি ইস্পাহানের অ্যাস্টলেব বিশেষজ্ঞ ইব্রাহিমের দুই পুত্র আহমদ ও মাহমুদ নির্মাণ করেন। বৃটিশ মিউজিয়ামের অ্যাস্টলেবগুলির মধ্যে ১২৬০ খৃস্টাব্দে ইংরেজদের নির্মিত একটি অ্যাস্টলেবও রয়েছে। মার্টন কলেজ লাইব্রেরী ঐতিহ্যগতভাবে এটির অধিকারী। এর সঙ্গে সসারের নামও জড়িত রয়েছে। তিনি তার ছোট ছেলের জন্য অ্যাস্টলেব সম্পর্কে একটি পুস্তিকা লেখেন।

নাবিকদের জন্য অ্যাস্টলেব ছিল অমূল্য জিনিস। সপ্তদশ শতকে নতুন যন্ত্র আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত পাশ্চাত্যে সামুদ্রিক পর্যবেক্ষণের জন্য এর ব্যবহার অব্যাহত থাকে। অ্যাস্টলেবের সৌন্দর্য তার শিল্প-সৌকর্যের মধ্যে নিহিত। কোন প্রকার অবয়ব পরিবর্তন ছাড়া শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিস্ময়কর যত্ন ও নিপুণতা সহকারে একই আকারে এটি নির্মিত ও খোদাই করা হয়। ১০৬৬-৭ খৃস্টাব্দে টলেডোতে ইব্রাহিম ইবনে সাঈদের তত্ত্বাবধানে নির্মিত একটি অ্যাস্টলেব ১৫ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। এর সঙ্গে অপর একটির (চিত্র ১৬) তুলনা করা যেতে পারে যা আকারে একই রকমের হলেও কারুকার্যের দিক দিয়ে অধিকতর সূক্ষ্ম। পারস্যের বিখ্যাত ওস্তাদ শিল্পী আবদুল হামিদ ১৭১৫ খৃস্টাব্দে এটি তৈরি করেন।

আমরা মুসলমানদের প্রাথমিক ধাতবশিল্পে সৌকর্যের যে অসংখ্য নমুনা পেয়েছি তার মধ্যে একটি হচ্ছে জেরোনা ক্যাথিড্রালে রক্ষিত একটি কাস্কেট (চিত্র ১৭)। এটি কাঠের উপর পিটিয়ে পাতলা করা রৌপ্যমণ্ডিত পাতে গুটানো আকারে *রেপুজে*[২] কারুকার্য খচিত। কাস্কেটের উৎকর্ণ লিপিতে বলা হয়েছে যে, বদ্‌র ও তা'রিফ নামক দুজন কারুশিল্পী দ্বিতীয়

১. এডুয়ার্ডো সাভেড্রা দ্রষ্টব্য, 'নোট সার আন অ্যাস্টলেব অ্যারাবে' অ্যাক্টিডেলিভ কংগেস্নে ইন্টারনেশিওনেল ডেগলি ওরিয়েন্টালিষ্ট, ১৮৭৮। ফিরেনয ১৮৮০।

২. মূল ফরাসী শব্দ যার অর্থ 'পেছনে ঠেলা' ভেতর থেকে পিটিয়ে পাতলা ধাতব জিনিসের উপর রিলিফ আকারে (স্ফীত) কারুকার্য। -অনুবাদক।

www.waytojannah.com

চিত্র-১৫. ১০৬৬-৬৭ খৃঃ মাদ্রিদের টলেডো স্থাপত্য শিল্প জাদুঘরে রক্ষিত অ্যাস্ট্রলেব (জ্যোতির্বিজ্ঞান ঘড়ি)

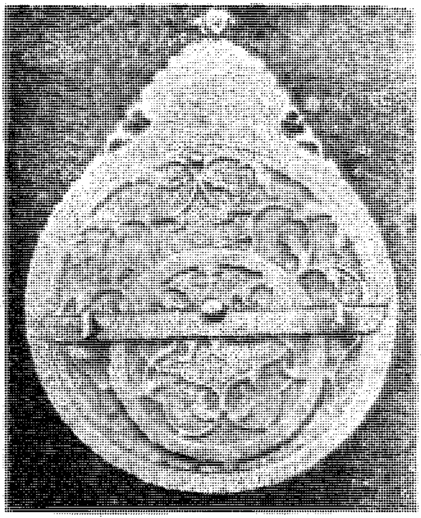

চিত্র-১৬. ভিক্টোরিয়া এবং এলবার্ট জাদুঘরে রক্ষিত ১৭১৫ খৃস্টাব্দের পারস্য অ্যাস্ট্রলেব

চিত্র-১৭. রৌপ্য নির্মিত জুয়েলারী বাক্স (দশম শতাব্দীতে কর্ডোভার জেরোনা প্রধান গির্জায় রক্ষিত)

www.waytojannah.com

Contents

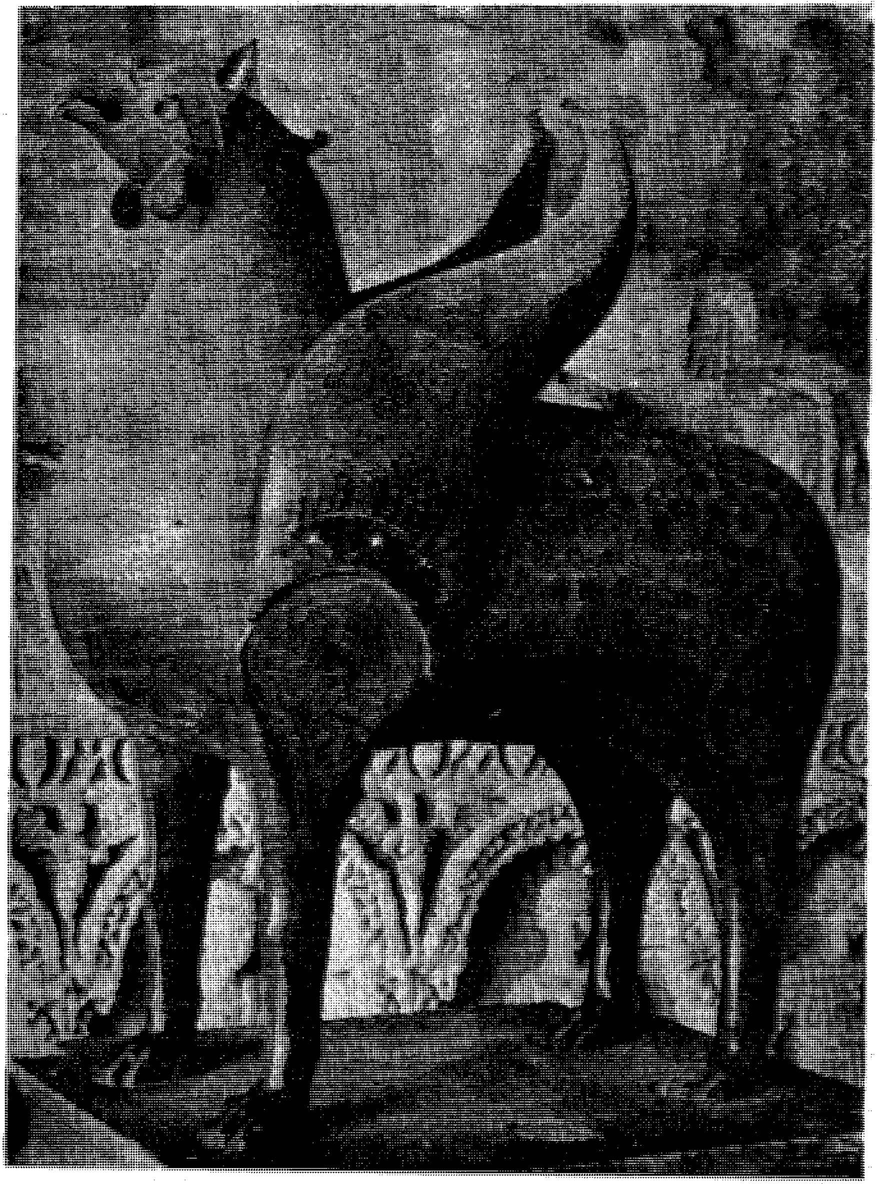

চিত্র-১৮. ক্যাম্পো সান্টোতে রক্ষিত একাদশ শতাব্দীর ফাতিমীয় ব্রঞ্জ গ্রিফিন (কল্পিত জন্তু)

www.waytojannah.com

আল–হাকামের (৯৬১–৭৬) জনৈক ওমরাহ্‌র জন্য এটি তৈরি করেছেন। ওমরাহ এটি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিশামকে উপহার হিসাবে প্রদান করবেন। হিশাম কর্ডোভায় তার পিতার উত্তরাধিকারী হিসাবে খলীফা হন। রৌপ্যের উপর কারুকার্যমণ্ডিত যে সামান্য কয়টি শিল্পকর্ম আমাদের যুগ পর্যন্ত টিকে আছে এটি তার অন্যতম। ইহকালে মূল্যবান ধাতব জিনিস ব্যবহারে ধর্মীয় আপত্তি থাকা সত্ত্বেও এটি স্বর্গের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। খলীফাদের প্রাসাদের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের ব্যবহার কোন অবস্থাতেই নিষিদ্ধ ছিল না।

কায়রোতে ফাতিমীয় খলীফাগণ স্বর্ণ ও রৌপ্যের যেসব সম্পদ সঞ্চয় করেন মিসরীয় রেকর্ডপত্রে তার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে কিন্তু ১০৬৭ খৃস্টাব্দের বিদ্রোহের সময় তুর্কী ভাড়াটিয়া বাহিনী সেগুলি তছনছ করে। এই বংশের শুরু থেকে রাজপ্রাসাদসমূহে যেসব বংশগত সম্পদ সঞ্চিত হয় তার একটি তালিকা ঐতিহাসিক আল–মাকরিযী প্রথম দিকের আর্কাইভজ থেকে নকল করেন। এই আর্কাইভজ তার আমলেও যথাযথ ছিল। এই তালিকা থেকে ঐ সময়কার দরবারের মনিকারগণ যেসব অদ্ভুত বিলাসদ্রব্য উদ্ভাবন করেন তার কিছু কিছু ছবি তুলে ধরা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। এটি এক সুদীর্ঘ দলিল যাতে ব্যবসায়ীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিটি জিনিসের নিখুঁত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এসব জিনিসের মধ্যে রয়েছে সোনা ও রূপার দোয়াতদানি, দাবার ঘুঁটি, ছাতার (প্যারাসল) বাট, বিভিন্ন ফুলদানি, সোনার পাখি, মূল্যবান পাথর খচিত গাছ, প্রভৃতি। উৎসাহী পর্যবেক্ষকরা হাজারো রকমের জিনিস গণনা করলেও আমরা যদি তার থেকে কয়েকশ বাদও দেই, তাতেই যে কেউ বিস্ময় বোধ করবেন। তাছাড়া সমসাময়িক পারস্য পর্যটক নাসির–ই–খসরুর বর্ণনা থেকে ফাতিমীয় খলীফাদের বিখ্যাত সম্পদের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি ১০৪৭ খৃস্টাব্দে জনৈক ওমরাহর সৌজন্যে রাজকীয় প্রাসাদের প্রকোষ্ঠগুলি পরিভ্রমণ করেন। তিনি পরপর এগারটি প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করেন যার প্রত্যেকটি পূর্ববর্তীটি থেকে সুন্দর ছিল। দ্বাদশ প্রকোষ্ঠে ছিল সিংহাসন। স্বর্ণের তৈরি সিংহাসনটি শিল্পসৌকর্যে ছিল বিস্ময়কর। এতে সুদর্শন উৎকীর্ণলিপি সমন্বিত বিভিন্ন মৃগয়ার দৃশ্য অংকিত ছিল। তিনটি রৌপ্য নির্মিত সোপানের উপর স্থাপিত সিংহাসনের সম্মুখভাগে উন্মুক্ত কারুকার্য মণ্ডিত একটি বিস্ময়কর সোনালি জাফরি স্থাপন করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত এর সৌন্দর্য এতো অপূর্ব ছিল যে, 'এটি বর্ণনাকে হার মানায়'।[১]

প্রথমদিকের মুসলিম স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্পকর্ম কার্যত বিলুপ্ত হয়েছে। বর্তমানে যেসব মুসলিম ধাতব শিল্প পর্যালোচনা করা যায় সেগুলি হচ্ছে ধনী ও অভিজাত মুসলমানগণ কর্তৃক ব্যবহৃত প্রধানত ব্রঞ্জ, পিতল ও তামার আসবাব ও তৈজসপত্রের মধ্যে যেগুলি

১. দ্রষ্টব্য ঃ সফর নামাহ ঃ রিলেশন ডু ভয়েজ ডি নাসিরি––খসু, ফরাসী ভাষায় অনুবাদ ও সম্পাদনা, চার্লস শেফার। প্যারিস, ১৮৮১।

www.waytojannah.com

টিকে আছে সেগুলি। পিসার ক্যাম্পোসান্টোতে অবস্থিত ব্রঞ্জের বিশাল গ্রিফিন (চিত্র ১৮) এমন এক ধরনের শিল্পকর্মের দৃষ্টান্ত যে রীতি সাধারণত ছোট ছোট পাখি ও জীবজন্তু, ফোয়ারার বিভিন্ন অংশ কিংবা বহনযোগ্য জলপাত্রে দেখা যায়। এগুলি থেকেই পরবর্তীকালের তথাকথিত ইউরোপীয় *একোয়ামানিলেস* তাদের অদ্ভুত আকার লাভ করে। অতি আদরের জীবের আত্মতুষ্টির প্রতিমূর্তি বিস্ময়কর দানব গ্রিফিনের দেহ সম্পূর্ণরূপে খোদাই করা নকশায় আবৃত। ঘাড় ও পাখা দুটির উপর পাল্লার ন্যায় পালক অংকিত করা হয়েছে। পিছনের দিক দেখলে মনে হয় গোল ডোরাওয়ালা কাপড় সেঁটে দেয়া হয়েছে। তার প্রান্তভাগে কুফী হস্তলিপি উৎকীর্ণ করা হয়েছে এবং তা বক্ষের চারদিকে বৃত্তাকারে অব্যাহত রয়েছে। কটিদেশে তীক্ষ্ণ খোব সৃষ্টি করা হয়েছে এবং শঙিখল প্রান্তভাগের অভ্যন্তরে এসব খোবে সিংহ ও বাজপাখি খোদাই করা হয়েছে। উৎকীর্ণলিপিতে কবিতায় মালিকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে। কিন্তু এই অপূর্ব ব্রঞ্জ মূর্তিটি তৈরীর তারিখ বা মূল পরিচয়ের কোন সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে এটি সম্ভবত একাদশ শতকের কোন ফাতেমীয় রাজপ্রাসাদ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে।

রিলিফে উত্তোলিত নকশা বা খোদাইকরা নকশা ছাড়া ধাতব কারুকার্যের অন্যান্য রীতিও মুসলিম কারুশিল্পীরা চর্চা করেন। তারা ব্রঞ্জ বা তামার উপর স্বর্ণ ও রৌপ্য খচিত কারুকার্যে অত্যন্ত নিপুণতা অর্জন করেন। বিভিন্ন পন্থায় অনুসৃত এই পদ্ধতি সাধারণত *ডামাস্কেনিং* নামে পরিচিত। ইউরোপীয়দের এই শিল্প চর্চার সঙ্গে দামেস্কের সম্পর্ক থেকেই এই নামের উদ্ভব হয়। সেখানে এটির উদ্ভব না হলেও এর চর্চা অবশ্যই হতো। এই জাতীয় সবচাইতে সূক্ষ্ম ও প্রাচীনতম শিল্পকর্মে ধাতব পদার্থের উপর নকশাগুলি খোদাই করা হতো এবং তারপর শূন্যস্থানগুলি স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা ভরাট করে দেওয়া হতো। এক ধরনের কালো আঠালো পদার্থ দিয়ে অন্যান্য কর্তিত অংশ ভরাট করে প্রায়ই এই নকশার সৌকর্য সাধন করা হতো। কোন কোন ক্ষেত্রে এটিই ছিল এই কারুকার্যকে সমৃদ্ধ করার একমাত্র পন্থা।

মুসলিম খোদাই করা ধাতব শিল্পকর্ম দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পূর্ণতা লাভ করে এবং দুইশত বছর পর্যন্ত এর অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব অব্যাহত থাকে। এর সর্বাধিক সুন্দর এবং আদর্শ নমুনা হচ্ছে বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত একটি পিতলের সোরাহী (চিত্র ১৯), যার পুরোটাই রৌপ্য খচিত কারুকার্যমণ্ডিত। দশটি পৃষ্ঠদেশ সমন্বিত অবয়ব ও গণ্ডদেশ আড়াআড়িভাবে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত এবং সেগুলি বিভিন্ন আকারের খোবে বৈচিত্রময়। বহির্ভাগের প্রতিটি অংশ বিভিন্ন ধরনের ছবি, জ্যামিতিক বা পত্রপুষ্পের নকশা এবং উৎকীর্ণলিপির কারুকার্যে গভীরভাবে সুশোভিত। পাদদেশে গ্রন্থীযুক্ত কারুকার্যের একটি ঝালর থোবার ন্যায় ঝুলন্ত রয়েছে এবং এর মধ্যদিয়েই নকশার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। খচিত ছোট ছোট রূপার পাতে যেসব ছবি তৈরি করা হয়েছে সেগুলির আকার অপূর্ব এবং

www.waytojannah.com

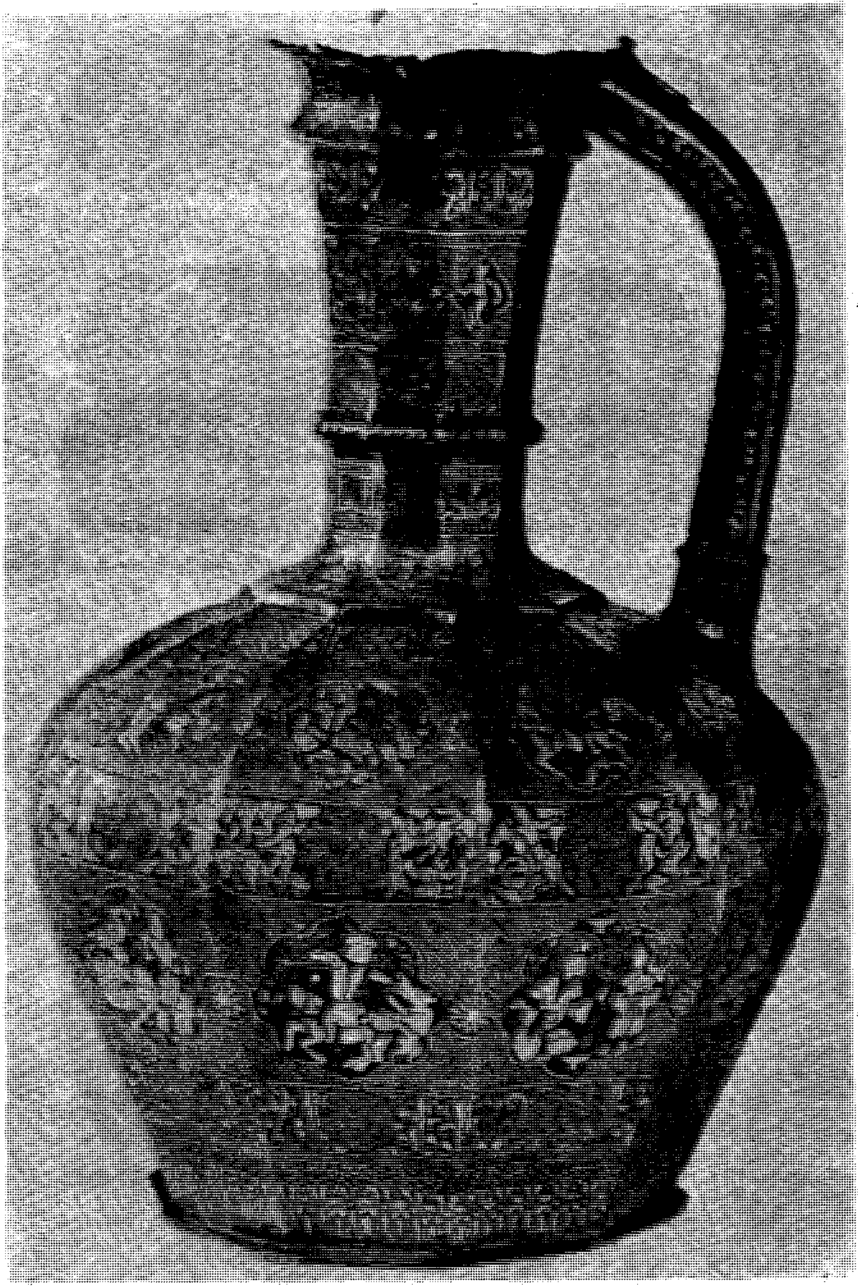

চিত্র-১৯. ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত ১২৩২ খৃস্টাব্দে মসুল-এর রৌপ্য খচিত পিতলের কলসি

www.waytojannah.com

Contents

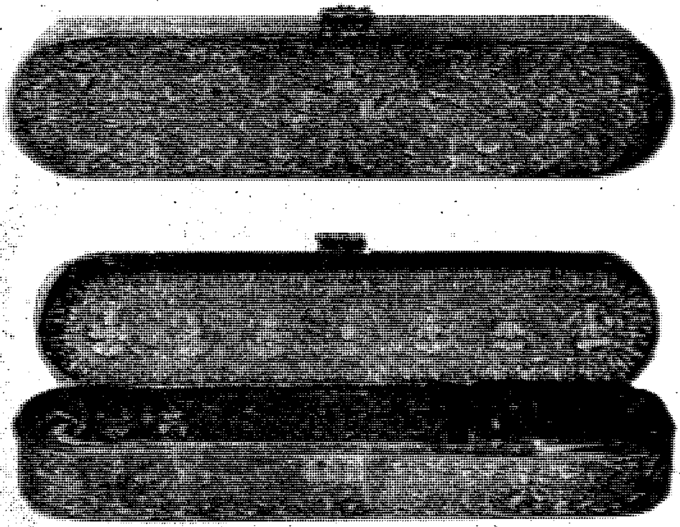

চিত্র-২০. বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত ১২৮১ খৃষ্টাব্দে মসুল স্কুলের স্বর্ণ ও রৌপ্য খচিত পিতলের কলমদানী

চিত্র-২১. ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত পঞ্চদশ শতাব্দীর ভেনিসীয় রৌপ্যখচিত পিতলের রেকাব

www.waytojannah.com

সেগুলিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে মুখমণ্ডল, হাত, গুটানো কাপড় প্রভৃতি বিশদভাবে খোদিত হয়েছে। গণ্ডদেশের চারদিকে একটি উৎকীর্ণ লিপিতে বলা হয়েছে যে, সোরাহীটি মসুলে ১২৩২ খৃষ্টাব্দে শুজা ইবনে হানফার[১] কর্তৃক নির্মিত হয়েছে।

সোরাহীটি মসুলভিত্তিক একটি শিল্পচর্চা কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্বশীল। প্রাচীন ও সমৃদ্ধ তাম্র খনির সঙ্গে এই নগরীর গভীর যোগাযোগ ছিল। এখানে বিভিন্ন ধরনের কারুশিল্পের জন্য বিখ্যাত শিল্পীদের সমাবেশ ঘটে। এম রিনাউদ কর্তৃক উদ্ধৃত ত্রয়োদশ শতকের জনৈক লেখকের ঘোষণা অনুযায়ী এখানে বিশেষ করে রান্নাবান্না ও খাবারের কাজে ব্যবহৃত তামার পাত্র তৈরির জন্য এসব কারুশিল্পী সমবেত হয়। কিন্তু এরও আগে মসুলের উত্তর ও পূর্বদিকের বিভিন্ন অঞ্চলে একই রীতি ও কারুকার্যের শিল্পকর্ম দেখা যায়। এতে এই শিল্পচর্চার সঙ্গে আরমেনীয় ও পারস্য সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয়। অবশ্য এখন পর্যন্ত তার পক্ষে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায়নি। পরবর্তী কালের শিল্পকর্মে কারুকার্যের রীতি ও কোন কোন বৈশিষ্ট্যে দ্বিতীয় শতকের গ্রীক ঐতিহ্যের (Hellenis Tie trade time) সম্পর্ক থাকায় এইরূপ সম্ভাবনা বাতিল করা যায় না যে, দূর অতীত থেকে এসব অঞ্চলে গড়ে ওঠা স্থানীয় শিল্প রীতিকে ভিত্তি করে হয়তো বা মুসলমানরা এই শিল্পের বিকাশ সাধন করে।

এই শিল্পচর্চার প্রভাব সিরিয়ার মধ্য দিয়ে মিসরে দ্রুত প্রসারিত হয়। মঙ্গোল আক্রমণের ফলে মেসোপটেমিয়ার নগরগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ায় এবং কারুশিল্পীরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ায় এই স্থানান্তর দ্রুত সম্পাদিত হয়। চেঙ্গিস খানের পৌত্র হালাগু কর্তৃক বাগদাদ অধিকার এবং খলীফা মুসতাসিমের মৃত্যু ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে আব্বাসীয় খেলাফতের অবসান ঘটায়।

বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত রৌপ্য ও স্বর্ণ খচিত একটি পিতলের রাইটিং কেস–এ (চিত্র ২০) এর শিল্পী বাগদাদের অধিবাসী মাহমুদ ইবনে সানকার–এর নাম রয়েছে। কিন্তু এটি তার পিতৃপুরুষদের নগরীতে (চিত্র ২২) তৈরি হতে পারে না। কারণ এর তারিখ দেওয়া হয়েছে ১২৮১ খৃষ্টাব্দে, যখন এর অধিবাসীরা ছিল নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বসতি স্থাপনকারী গ্রামের লোক। এই সুদর্শন রাইটিং কেসটি; কারুকার্য ও শিল্পসৌকর্যে সোরাহীটি থেকে কোন অংশে নিম্নমানের নয়। তিনটি বড় বড় পদকে চারগ্রুপে অংকিত দ্বাদশ রাশিচক্র এর ঢাকনির প্রধান অলংকার। ঢাকনির ভেতরের দিকে একসারি বৃত্তের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন

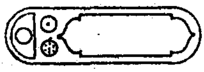

চিত্র-২২. কলমদানীর অভ্যন্তরীণ ফিটিংসমূহের স্থাপত্য পরিকল্পনা

১. ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণলিপিটি প্রথম পাঠ করে এম রিনাউদ উপরোক্ত নামটি দিয়েছেন। কিন্তু এম ম্যাক্সভ্যান বার্চেম এটি সংশোধন করে ('নোটস ডি 'আর্কিওলজি অ্যারাবে' জার্নাল এসিয়াটিক, ১১শ সিরি, প্যারিস, ১৯০৪) পৈতৃক হানফার–এর স্থলে মানআহ্ নাম দিয়েছেন।

www.waytojannah.com

Contents

নক্‌শা দেওয়া হয়েছে। মধ্যবর্তী বৃত্তের মধ্যে একটি মনুষ্য মুখাকৃতির আলোক রিকিরণকারী সূর্য রয়েছে এবং এর উভয় পার্শ্বের বৃত্তগুলিতে উপবিষ্ট অবস্থায় রয়েছে চন্দ্র, কলম ও কাগজ হাতে বুধ, বীণা হাতে শুক্র, তলোয়ার ও কর্তিত মস্তক হাতে মঙ্গল, বিচারকের আসনে বৃহস্পতি এবং যষ্ঠি ও থলে হাতে শনি গ্রহ।

সুন্দর সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত ভিত্তিভূমির উপর এসব নকশা অংকন করা হয়েছে এবং চারদিকের প্রান্তভাগেও রয়েছে জটিল নকশা। এই কেসটি এ ধরনের বহু কেসের মধ্যে একটি অপরূপ দৃষ্টান্ত। মূল অবস্থায় ২২ নং চিত্রের ন্যায় এর মধ্যে ছিল কালি রাখার কোটর, বালি ও আঠা রাখার কোটর এবং খাগের কলম রাখার জন্য আয়তাকার খোব।

খোদাই করে খচিত করার এই শিল্প দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর কারুকার্যও পরিবর্তিত হয় এবং তা চতুর্দশ শতকে কায়রোভিত্তিক দ্বিতীয় শিল্পধারার বৈশিষ্ট্য নিয়ে নতুনভাবে বিকশিত হয়। কারুকার্যপূর্ণ পৃষ্ঠদেশে মাঝে মাঝে যেসব পদক স্থাপন করা হয় সেগুলির চারদিকে পত্র–পুষ্প শোভিত সূক্ষ্ম প্রান্তভাগের উদ্ভব হয়। উৎকীর্ণলিপি আনুষঙ্গিক না হয়ে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। ২৩ নং চিত্রটি প্রান্তভাগ সমন্বিত একটি আদর্শ পদক। ১২৯৩ থেকে ১৩৪১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মিসরের সুলতান আল–নাসির মোহাম্মদ ইবনে কালাউনের জন্য নির্মিত একটি বৃহৎ থালা থেকে এই বিশদ নকশাটি তুলে ধরা হয়েছে।

আমাদের কাছে প্রায়ই অত্যন্ত সুন্দরভাবে রক্ষিত যে অসংখ্য শিল্প নিদর্শন রয়েছে এ দুটি দৃষ্টান্ত থেকে সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে। এগুলির মধ্যে রয়েছে সোরাহী, থালা এবং অন্যান্য সুদর্শন গঠনের পাত্র, যেগুলির নাম–পরিচয় তাদের কারুকার্যে নিহিত এবং যেগুলি সুলতান ও বড় বড় অভিজাত ব্যক্তিদের উৎসব অনুষ্ঠানের শোভাবর্ধন করতো। জুয়েল কেস, রাইটিং বক্স, মোমবাতিদানি, ধুপদানি, ফুলদানি এবং অনুরূপ অন্যান্য যে সব জিনিস গার্হস্থ্য জীবনে আড়ম্বরপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হতো সেগুলি বৈচিত্র ও সংখ্যার দিক দিয়ে এতো বেশি যে তা বিশেষ বিশেষভাবে বর্ণনা করা যায় না। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে এই শিল্প–কর্মের অত্যন্ত কদর ছিল। সম্পদশালী অভিজাত ব্যক্তিরা বিখ্যাত শিল্পীদের শিল্প কর্মের জন্য অধীর আগ্রহ প্রকাশ করতেন। এবং প্রায়ই নিজেদের জন্য এসব জিনিস বিশেষভাবে তৈরি করিয়ে নিতেন। বৃটিশ ও ভিক্টোরিয়া এণ্ড আলবার্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত বহু শিল্প নিদর্শনের সঙ্গে চমকপ্রদ ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে এবং এর কোন কোনটি শিল্প সৌকর্যের দিক দিয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

চিত্র-২৩. ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত চতুর্দশ শতাব্দীর মিসরীয় রৌপ্যখচিত পিতলের খোলা পানির পাত্রের পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ

www.waytojannah.com

চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে এই শিল্পের অবক্ষয় শুরু হয়। সিরিয়ায় মঙ্গোলদের হস্তক্ষেপ এবং ১৪০১ খৃষ্টাব্দে তৈমুর কর্তৃক দামেস্কের ধ্বংস সাধন বড় বড় শিল্প কেন্দ্রগুলিকে বিপর্যস্ত করে। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে উসমানীয়দের মিসর বিজয় কায়রোর অবশিষ্ট শিল্পীদেরও বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কিন্তু এটি নিজস্ব কেন্দ্রগুলিতে বিলুপ্ত হতে থাকলেও ইউরোপে এর আকর্ষণ ক্রমবর্ধমানভাবে বৃদ্ধি পায়। এখানেই তার গৌরবদীপ্ত পুনর্জন্ম ঘটে। ক্রুসেডের আমলে ইটালীয় শহরগুলিতে যে প্রাচ্য বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, পঞ্চদশ শতকে তা বিপুল সমৃদ্ধি লাভ করে। ছোট ছোট ইটালীয় রাজণ্যবর্গের আড়ম্বরপূর্ণ জীবনে প্রাচ্যের জিনিস জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাদের কারুশিল্পীরা আদর্শ হিসাবে এসব শিল্পকর্ম প্রবর্তন করে এবং এগুলির সৌকর্য সাধনে অনুকরণমূলক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। ভেনিসে মুসলিম ধাতব শিল্প স্থানীয় কারুশিল্পীদের এতটা অনুপ্রাণিত করে যে, সেখানে সুস্পষ্টভাবে একটি ভেনেসীয় প্রাচ্য শিল্পচর্চা কেন্দ্র গড়ে ওঠে এবং ইটালীয় রেনেসাঁর রুচির সঙ্গে মুসলিম শিল্পরীতি ও কারুকার্যের সংমিশ্রণ সাধিত হয়। ২১ নং চিত্রটি এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এটি পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত একটি পিতলের থালা। এটি মুসলমানদের পারস্পরিক বুনটের গ্রন্থী নকশায় রৌপ্যখচিত একটি শিল্পকর্ম, যা প্রথমদিকের বলিষ্ঠ কায়রো কারুকার্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এর কেন্দ্রস্থলে ভেরোনার একটি অভিজাত পরিবার ওচ্‌চি ডি কেন–এর স্মারক হিসাবে মিনাকরা একটি রূপার শিল্ড রয়েছে। অন্যান্য শিল্পকর্ম সমসাময়িক পারস্য শিল্পকর্মের আদর্শে তৈরি। এগুলি প্রকৃতপক্ষে ভেনিসেই উক্ত নগরীতে বসবাসকারী পারস্যের কারুশিল্পীরা তৈরি করতেন।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে ধাতব শিল্পকর্ম পারস্যে মসুলের শিল্পচর্চা কেন্দ্রের ন্যায় একই পন্থা অনুসরণ করে। কিন্তু এখানে কারুকার্যমণ্ডিত পাত্রগুলির গাঠনিক সৌকর্য বিধানের এবং অলংকরণের কতিপয় সংশোধনীর মাধ্যমে এর অগ্রগতি সূচিত হয়। ষোড়শ শতকের প্রাথমিক বছরগুলিতে সাফাভী বংশের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে পারস্য শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনের সূচনায় একটি নতুন রীতিতে এসব পরিবর্তনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়। এই রীতিতে সাধারণত খোদাইকরণ রৈখিক নকশায় বা উৎকীর্ণ লিপিতে রূপান্তরিত হয় এবং তা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে অনুসৃত পাকানো নকশার ভিত্তিভূমিতে করা হয়। ২৪ নং চিত্রে এই রীতির একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। একটি বাটির ঢাকনির উপর এই নকশাটিতে বিখ্যাত পারস্য কারুশিল্পী মাহমুদ আল–কুর্দীর স্বাক্ষর রয়েছে। ষোড়শ শতকের প্রাথমিক বছরগুলিতে তিনি ভেনিসে শিল্প চর্চা করেন।

মধ্যযুগীয় মুসলিম কারুশিল্পীদের স্বর্ণ ও রৌপ্য খচিত শিল্পকর্ম কোন কোন দিক দিয়ে সমসাময়িক ইউরোপীয় কারুশিল্পীদের তৈরি মিনাকরা ধাতব শিল্পের একটি প্রাচ্য প্রতিরূপ।

www.waytojannah.com

ইউরোপীয়দের *চ্যাম্পলিভ* পদ্ধতিতে বহু জিনিসের ওপর আঠালো রঙিন কাচে নকশা করা হয়। এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের রীতি ছিল অনুরূপ একটি পদ্ধতিতে মূল্যবান ধাতব পদার্থের সাহায্যে নকশা করা। ধাতব পদার্থের উপর মিনা করা অবশ্যই একটি প্রাচ্য রীতি, কিন্তু এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে ইসলামী দৃষ্টান্ত কদাচিৎ দেখা যায়। আল–মাকরিযীর ফাতিমীয় সম্পদের তালিকায় রঙের সাহায্যে মিনাকরা সোনালি ফলকের উল্লেখ রয়েছে। ফুসতাতের আবর্জনার স্তূপ থেকে পত্রালংকার এবং *ক্লয়যেনে* রীতিতে মিনাকরা উৎকীর্ণ লিপি সমন্বিত একটি ধাতব থালা উদ্ধার করা হয়। এটি বর্তমানে কায়রোর আরব আর্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। স্পষ্টত এটিও ফাতিমীয় যুগের। কিন্তু মুসলিম মিনাকরা ধাতব শিল্পের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ নমুনা হচ্ছে ইন্‌সব্রুকের মিউজিয়াম কার্ডিনেণ্ডামে রক্ষিত একটি তামার বাটি। *চ্যাম্পলিভ* রীতিতে সুশোভিত নকশার মধ্যস্থলে একটি বিরাট পদকে 'অ্যাসেন্ট অব আলেকজাণ্ডার' (আলেকজাণ্ডারের উত্থান) প্রতিফলিত করা হয়েছে। চারদিকে পৌরাণিক জীবজন্তুসহ অন্যরা রয়েছে এবং পটভূমিতে রয়েছে তাল জাতীয় গাছ ও নানা প্রকার দণ্ডায়মান ছবি। রীতির দিক দিয়ে বাইজেন্টাইন হওয়া সত্ত্বেও এই বাটির উৎকীর্ণ লিপিতে বলা হয়েছে যে, এটি মেসোপটেমিয়ার জনৈক অর্টুকী রাজার জন্য তৈরি করা হয়, যিনি দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে রাজত্ব করেন।

আমরা যে কয়টি নমুনা পেয়েছি তাতে মনে হয় যে, মিনার কাজ মুসলিম ধাতবশিল্পীদের প্রিয় ছিল না। পঞ্চদশ শতকের দিকে মুসলমানদের মধ্যে পুনরায় মিনাশিল্পের চর্চা দেখা যায়। এসময় স্পেনে অত্যন্ত সুন্দরভাবে মিনাকরা তলোয়ারের আসবাবপত্র তৈরি হয়। এসব দৃষ্টান্ত ও পরবর্তীকালে ভারতে মুঘল সম্রাটদের জন্য তৈরি করা মিনাশিল্প ঐতিহ্যগত না হয়ে সম্ভবত বিদেশী রীতির প্রতিফলন।

মৃৎপাত্রের উপর রঙিন উজ্জ্বলতা (গ্লেজ) প্রয়োগের মাধ্যমে আর এক ধরনের মিনার কাজে মুসলমানরা অনেক পূর্ব থেকেই অত্যন্ত সুদক্ষ শিল্পী ছিলেন। মুসলিম শাসনাধীনে মিসর ও নিকট–প্রাচ্যের স্থানীয় মৃৎশিল্পীরা তাদের এলাকায় প্রাচীনকাল থেকে কমবেশি ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় যে মৃৎশিল্প ছিল তা পুনরুজ্জীবিত করেন এবং তার প্রয়োগ পদ্ধতি ও কারুকার্যের কৌশলের উন্নতি সাধন করেন। মিসরে বহু যুগ আগে থেকেই উপরিভাগে সুন্দর সবুজ–নীল উজ্জ্বলতাসম্পন্ন প্রাচীর টালি প্রচলিত ছিল। আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৫০০ খৃষ্টাব্দে সুসায় দারিয়ুসের প্রাসাদে বিভিন্ন বর্ণের অনুরূপ শিল্প–সৌকর্যের প্রচলন ছিল। আরব অভিযানের পূর্ব–পর্যন্ত এসব অঞ্চলে সবার অজ্ঞাতে উপরোক্ত শিল্প চর্চা অব্যাহত ছিল। মুসলিম প্রভাবে মৃৎশিল্পীরা নতুন রীতি ও নকশা কৌশলের মাধ্যমে পুনরায় এর পরীক্ষা–নিরীক্ষা শুরু করেন।

www.waytojannah.com

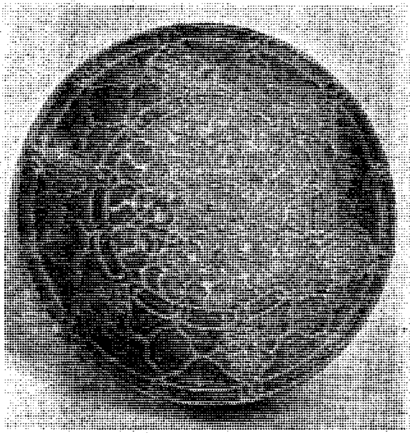

চিত্র-২৪. ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত ষোড়শ শতাব্দীতে একজন পারস্য শিল্পী কর্তৃক ভেনিসে নির্মিত রৌপ্যখচিত পিতলের বাটির ঢাকনা

চিত্র-২৫. লুভার মিউজিয়ামে রক্ষিত ত্রয়োদশ শতাব্দীর স্বর্ণ এবং রং দ্বারা চিত্রিত মাটির পেয়ালা

চিত্র-২৬. লুভার মিউজিয়ামে রক্ষিত ফাতেমীয় একাদশ শতাব্দীর উজ্জ্বল রঙে চিত্রিত মাটির তৈরি ফুলদানী

www.waytojannah.com

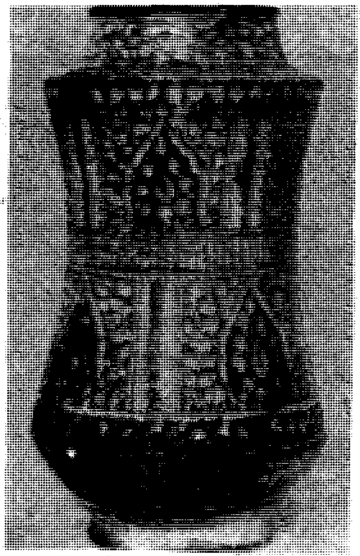

চিত্র-২৭. ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতাব্দীর সুলতানাবাদ-এর বিভিন্ন রঙে চিত্রিত মাটির তৈরি ঔষধ পাত্র

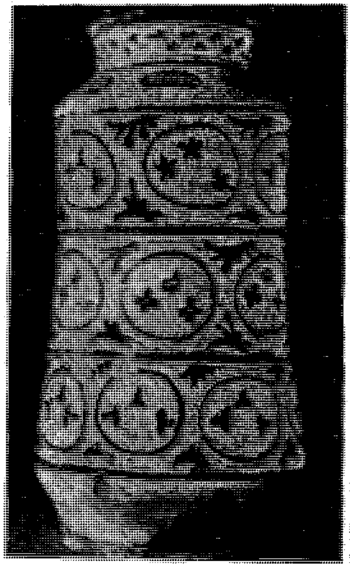

চিত্র-২৮. গাঢ় নীল রঙে চিত্রিত মাটির তৈরি ঔষধ পাত্র

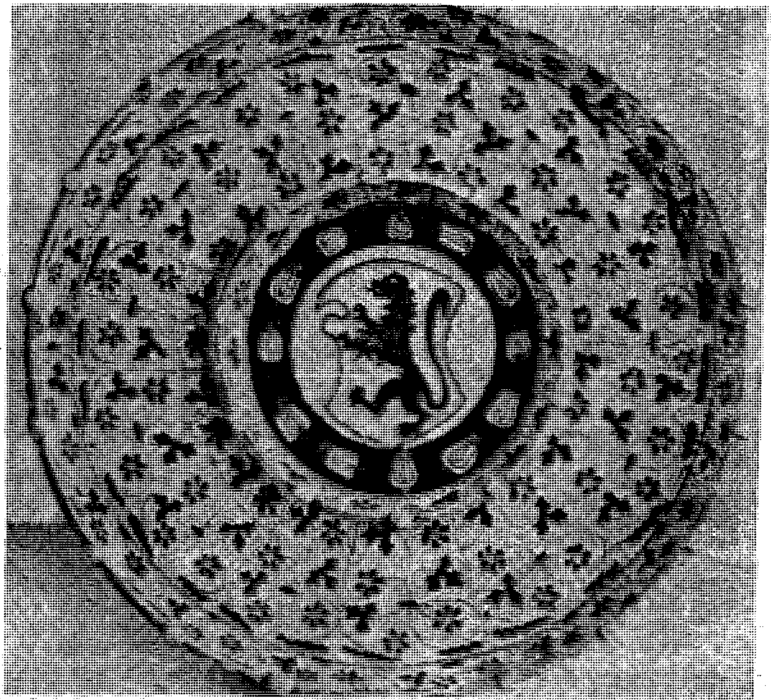

চিত্র-২৯. ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভ্যালেনসিয়ায় নীল এবং হলুদ আভায় চিত্রিত মাটির তৈরি থালা

www.waytojannah.com

মুসলিম মৃৎশিল্পের প্রাথমিক ইতিহাস এখনো অলিখিত রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বহু চমকপ্রদ নিদর্শন আবিষ্কৃত হলেও এগুলির ব্যুৎপত্তি এবং সময়-তারিখ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুমানের বিষয়। এ কথা পরিষ্কার যে, পারস্য, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া ও মিসরে অবস্থিত কেন্দ্রগুলি থেকে বিভিন্ন ধরনের মৃৎশিল্প মুসলিম বিশ্বে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ মৃৎপাত্রের উদ্ভব মূলত কোথায় হয়েছিল তা সঠিকভাবে নির্ধারণ অসম্ভব। জনপ্রিয় শ্রেণীর মৃৎপাত্রগুলি বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে ছিল এবং একই ধরনের ও নকশার মৃৎপাত্র বিভিন্ন প্রাচীন এলাকায় পাওয়া যায়, যেসব এলাকা পরস্পর থেকে বহু দূরে বিচ্ছিন্ন। প্রাথমিক মুসলিম মৃৎশিল্প কি ধরনের ছিল দু-একটি নমুনা থেকে তা বোঝা যায়।

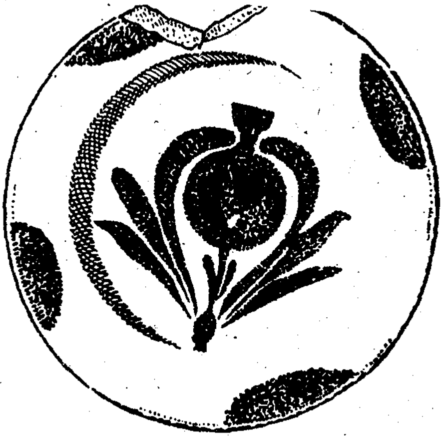

চিত্র-৩০. লুভার মিউজিয়ামে রক্ষিত নবম শতাব্দীতে সুসার মাটির তৈরি চিত্রিত থালা

সুসায় একটি গ্লেজ করা মাটির থালা পাওয়া গেছে (চিত্র ৩০)। এতে সাদা ভিত্তিভূমির উপর উজ্জ্বল নিকেল ব্লু রঙে পপিবৃক্ষের একটি মাথা অংকিত করা হয়েছে। এর তৈরিকাল নবম শতক বলে ধরা হয়, কারণ সামাররার রাজপ্রাসাদ এলাকায় খননকার্যের পর অনুরূপ মৃৎপাত্র পাওয়া যায়। খলীফা হারুনুর রশীদের জনৈক পুত্র ৮৩৬ খৃষ্টাব্দে এই প্রাসাদটি নির্মাণ করেন এবং পঞ্চাশ বছর পর তা পরিত্যক্ত হয়। এই থালাটি বর্তমানে পাশ্চাত্য মৃৎশিল্পে অত্যন্ত জনপ্রিয় নীল ও সাদা কারুকার্যের একটি প্রাথমিক দৃষ্টান্ত। এই ফ্যাশনটি আধুনিক ইউরোপে পরবর্তীকালে চীন থেকে আসে। আব্বাসীয় শাসকগণ নবম শতকেই চীনা মৃৎশিল্প আমদানি করেন। সামাররায় তা রাজবংশের আমলে নির্মিত মৃৎশিল্প ও চীনামাটির পাত্র আবিষ্কৃত হয়। সে সঙ্গে ঐসব পাত্রের স্থানীয়ভাবে অনুকরণ করা মৃৎপাত্রও পাওয়া যায়। উপরোক্ত থালাটির বাস্তবতাপূর্ণ ডিজাইন এই বিদেশী ঐতিহ্যের অনুসারী। কিন্তু যে অপরূপ নীল বর্ণে নকশাটি প্রতিফলিত করা হয়েছে তা দেশীয়ভাবে উৎপাদিত। এই রংটি পরবর্তীকালে চীনে রফতানি করা হয় এবং এটি সেখানে 'মুসলিম ব্লু' নামে পরিচিত হয়। নীল ও সাদা পাত্র তৈরিতে এই রঙটি চীনাদের কাছে এতো অপরিহার্য ছিল যে, কোন অজ্ঞাত কারণে এর সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় এ ধরনের মৃৎপাত্র উৎপাদনও সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। তাই পাশ্চাত্যবাসী অভ্যাসবশত 'ব্লু এণ্ড হোয়াইট চায়না' দূরপ্রাচ্যের বলে মনে করলেও বিশেষ ধরনের ব্লু মুসলমানদেরই অবদান। পঞ্চদশ ও

www.waytojannah.com

ষোড়শ শতকে এশিয়া মাইনরের কুতাহিয়ায় মুসলিম মৃৎশিল্পীরা এই রঙ কতিপয় মৃৎপাত্রে অপরূপভাবে ব্যবহার করেন।

প্রগতিশীল ধ্যান–ধারণা প্রতিফলিত করতে গিয়ে মুসলিম মৃৎশিল্পীরা বিদেশলব্ধ অভিজ্ঞতাকে নিজস্ব ঐতিহ্যের মধ্যে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সংযোজিত করে নিজেদের মহান মৌলিকত্ব অক্ষুণ্ন রাখেন। কিভাবে এই মৌলিকত্ব বজায় রাখেন তা বহু চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। ৩১ নং চিত্র তথাকথিত *গাব্‌রি* মৃন্ময় পাত্রের একটি ঢাকনি। এ ধরনের মৃন্ময়পাত্র অগ্নিপূজকরা তৈরি করতেন বলে ধারণা করা হয়। আরব বিজয়ের অনেক পরেও এরা পারস্যের কোন কোন অঞ্চলে তাদের প্রাচীন ধর্ম আঁকড়ে থাকে। এই কারুকার্য ইটের ন্যায় লাল দেহাবয়বের উপর সাদা কাদামাটির যে পাতলা আবরণ থাকে তা কেটে অংকন করা হয়। তারপর সমস্ত অবয়বটি ঈষৎ হলদে, সবুজ, বেগুনী বা বাদামী রঙের স্বচ্ছ উজ্জ্বলতায় আবৃত করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রঙ এমন এলোমেলোভাবে দেওয়া হয় যা সমসাময়িক একটি চীনা রীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অশ্বারোহী শিকারী, পৌরাণিক দানব এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পত্রালংকার প্রভৃতি সাসানীয় উপাদানের সাধারণ প্রচলন থেকে ইতিপূর্বে মনে করা হতো যে, *গাবরি* মুসলিম যুগের সূচনা থেকে প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু একাদশ বা দ্বাদশ শতকের রীতির কুফী বর্ণমালার উৎকীর্ণলিপির দৃষ্টান্ত থেকে এর অধিকাংশ শিল্পকর্ম এযুগ থেকে শুরু হয়েছে বলে ধরা হয়। *গ্রাফিটো* নামে পরিচিত খোদাই করা নকশারীতি চীনে সাধারণভাবে প্রচলিত থাকলেও সেখানেই এর উদ্ভব হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায় না। ইসলামের পূর্ববর্তী মিসরেও এর প্রচলন ছিল। পঞ্চদশ শতকে ইটালীয় মৃৎশিল্পীরা অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে এই রীতি অনুসরণ করেন। তারা সম্ভবত মুসলিম সূত্র থেকে এটি লাভ করেন। সেখান থেকেই অনেকখানি পরিণত কারিগরি জ্ঞান লাভ করার ফলে ইটালীয় রেনেসাঁর যুগে মৃৎশিল্প পুনরুজ্জীবনে এটি তাদের বিশেষ সহায়ক হয়।

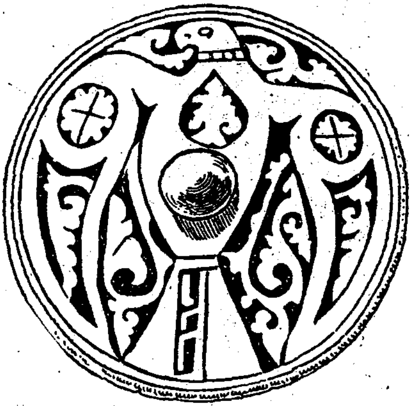

চিত্র-৩১. নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামে রক্ষিত একাদশ শতাব্দীর পারস্যের খোদাই এবং চিত্রিত কারুকাজ সম্বলিত মাটির তৈরি কলসির ঢাকনা

যাকে দীপ্তিমান মৃৎশিল্প (লাস্টার্ড পটারি) বলা হয়। সেখানে মুসলমানরা সীমাহীন সাফল্য অর্জন করে। এতে একটি রঞ্জিত ভিত্তিভূমিতে ধাতব লবণের সাহায্যে নকশাটি অংকন করা হয় এবং সেখানে এমনভাবে ধূম্র প্রয়োগ করা হয় যাতে একটি ধাতব

www.waytojannah.com

www.waytojannah.com

উজ্জ্বলতার সৃষ্টি হয়। এই উজ্জ্বলতা উজ্জ্বল তাম্র–লাল থেকে শুরু করে সবুজ–হলদে আভাযুক্ত বিভিন্ন নমুনার হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে এতে রংধনুর মতো সমুজ্জ্বল আলো ঝলোমলো রংয়ের প্রতিফলন ঘটে। নিকট–প্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে দশম শতকের শিল্পকর্ম আবিষ্কৃত হয়েছে। এত দ্বারা ইসলামী বিশ্বের সর্বত্র এই শিল্পের অত্যন্ত কদর প্রমাণিত হলেও এর উদ্ভব কোথা থেকে তা সন্দেহাবৃত। এটি প্রথমে মিসরে না পারস্যে তৈরি হয়েছে সে সম্পর্কে এখনো বিতর্ক চলছে এবং এ সম্পর্কে তীব্র মতপার্থক্য রয়েছে। ২৬ নং চিত্রের বিরাট পাত্রটি ফুসতাতের ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং এটি একাদশ শতকের ফাতেমীয় শিল্পকর্ম বলে অনুমান করা হয়। ৩২ নং চিত্রটি একটি থালা। নিষ্প্রভ দীপ্তির মধ্যে একটি উজ্জ্বল গ্রিফিন, পত্রালংকার এবং বিশেষ ধরনের কুফী হস্তলিপি রয়েছে। ১২২০ খৃষ্টাব্দে মঙ্গোলদের দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত একটি প্রাচীন পারস্য নগরী রাই বা রাজিসের ধ্বংসাবশেষ থেকে এটি আবিষ্কৃত হয়।

চিত্র-৩২. লুভার মিউজিয়ামে রক্ষিত দশম শতাব্দীতে পারস্যের ঔজ্জ্বল্য চিত্রিত মাটির তৈরি থালা।

রাই মৃৎশিল্পের একটি বিরাট কেন্দ্র ছিল। এখান থেকে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রীতির উদ্ভব হয়। এর ধ্বংসাবশেষ বিভিন্ন সুদর্শন শিল্পকর্মের একটি খনি। সুনির্দিষ্টভাবে এই নগরীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতিপয় পাত্র ও থালা রয়েছে যা অস্বচ্ছ (ওপেক) বর্ণে রঞ্জিত। বর্ণগুলি হচ্ছে নীল, সবুজ, লাল–বাদামী ও বেগুনী। মাঝে মাঝে সাদা বা রঙের আভাযুক্ত পাদভূমিতে সোনালি পত্রের স্পর্শ। বিষয়বস্তুতে রয়েছে সূক্ষ্ম কারুকার্যের জন্য বিখ্যাত বিভিন্ন ছবি ও আনুষ্ঠানিক অলংকার। সমসাময়িক পাণ্ডুলিপিগুলির চিত্রসমূহের সঙ্গে এগুলির এতটা মিল রয়েছে যে, যেন শিল্পীরা পাণ্ডুলিপির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই এগুলি অংকন করেছেন। ২৫ নং চিত্রের পেয়ালাটিতে পরস্পর বিরোধী 'এস' আকৃতির বক্ররেখা দ্বারা গঠিত খোবের মধ্যে স্পিংস সঙ্গীত শিল্পীদের ছবি অংকন করা হয়েছে। এটি প্রায়ই 'মিনিয়েচার' পাত্র হিসাবে অভিহিত এ ধরনের শিল্পের একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত। রাই নগরী যখন মঙ্গোলদের দ্বারা ধ্বংস হয় তখন এই শিল্প উৎকর্ষের চরম সীমায় পৌঁছে।

২৭ নং চিত্রের পাত্রটি গাঢ়নীল ও কালোবর্ণের নীলকান্তমণির রঙে রঞ্জিত। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে পারস্যের সুলতানাবাদে তৈরি এক ধরনের মৃৎশিল্পের রীতিতে এটি তৈরি করা হয়েছে। এই আকৃতির পাত্র ইটালীয়দের কাছে *আলবারেল্লো* নামে পরিচিত ছিল। নামটি সম্ভবত আরবী *আল–বারনিয়া* থেকে নেওয়া হয়েছে, যার অর্থ একটি ওষুধের

Contents

পাত্র। এ ধরনের পাত্র প্রাচ্যে কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো উপরোক্ত নাম থেকে তা বোঝা যায় এবং ইটালীতেও একই উদ্দেশ্যে এগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে। পঞ্চদশ শতকের ইটালীয় ওষুধের দোকানে এ ধরনের পাত্র প্রাচ্য থেকে আমদানিকৃত ওষুধ ভর্তি করে সাজিয়ে রাখা হতো। আমাদের দেশে এখনো যেভাবে চীনা জিঞ্জার-জার (আদ্রক ভর্তিপাত্র) আমদানি করা হয়, ঠিক তেমনিভাবে ইটালীয় ওষুধের পাত্রও ওষুধ ব্যবসায়ের মাধ্যমে পশ্চিমদিকে প্রবর্তিত হয়। ২৮ নং চিত্রে প্রাচ্যের অনুকরণে একটি ইটালীয় পাত্র দেখা যায়। এটি ঈষৎ পীতবর্ণের পোড়ামাটির পাত্রে গাঢ়নীল রঙে রঞ্জিত একটি আলবারেল্লো। পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ফায়েনযায় এটি তৈরি করা হয়।

ইটালীয়রা দীপ্তবর্ণে রঞ্জিত ওষুধের পাত্র, প্রাচ্যে এধরনের পাত্রের মুসলিম কেন্দ্র ভ্যালেনসিয়া থেকে পেয়েছে। এ জাতীয় যেসব উৎকৃষ্টতম নিদর্শন রয়েছে সেগুলিও এখানে তৈরি করা হয়। কোন কোন সময়ে বিদেশী ক্রেতাদের অর্ডার অনুযায়ী এগুলি তৈরি করা হতো, যাতে তাদের কুলচিহ্ন অংকিত করা হতো। ২৯ নং চিত্রের থালাটি হলদে দীপ্তি ও নীল বর্ণে রঞ্জিত করা হয়েছে। এটি পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে ফ্লোরেন্সের ডেগলি আগ্‌লি পরিবারের জনৈক সদস্যের জন্য ভ্যালেন্সিয়ায় তৈরি করা হয়। উক্ত পরিবারের গৌরব প্রতীকও এটিতে অংকিত রয়েছে। স্পেনীয় দীপ্তিমান মৃৎশিল্প ইটালীয় অনুকরণমূলক প্রতিযোগিতাকে এতোটা অনুপ্রাণিত করে যে, তার ফলেই ষোড়শ শতকে স্থানীয় মৃৎশিল্পীরা কিভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রেনেসাঁর নকশা দীপ্তিমান করতে হবে তা আয়ত্ত করে। তারা এমন সব পন্থায় অম্লান দীপ্তি আরোপ করেন যা ঐতিহ্যের ধারা পাল্টিয়ে দেয়। বিখ্যাত শিল্পকেন্দ্র গুব্বিওতে মহান শিল্পী জিওরজিও আঁদ্রিওলির সোনালি ও চুনীবর্ণের দীপ্তি ইটালী কিংবা প্রাচ্য সর্বত্রই অপ্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছে।

ষোড়শ শতকের সূচনায় মৃৎশিল্পের প্রাচীন ধারা সর্বত্রই পরিবর্তিত হতে থাকে। নতুন রূপায়ণের ক্ষেত্রে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতাসম্পন্ন দুটি রূপ এশিয়া-মাইনর ও সিরিয়ায় ধীরে ধীরে আবির্ভূত হয় এবং এক অপরূপ সমৃদ্ধি লাভ করে। সাদা পল্লবের আবরণযুক্ত পোড়ামাটির পাত্রে স্বচ্ছ উজ্জ্বলতা দ্বারা সেগুলি রঞ্জিত করা হয় এবং নকশাগুলি কালো পটভূমিতে সবুজ, নীল ও নিষ্প্রভ বাদামী রঙে অংকিত হয়। এশিয়া-মাইনরের কেন্দ্রগুলিতে প্রায়ই এগুলিতে টমাটোর ন্যায় উজ্জ্বল লালবর্ণও আরোপ করা হয়। এসব মৃৎশিল্পের চমকপ্রদ দিক হচ্ছে যে, বর্গাকৃতি প্রদানের মাধ্যমে এগুলি প্রাচীরের টালি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সে ক্ষেত্রে প্রতিটি ইউনিটে পুনরাবৃত্তিমূলক আনুষ্ঠানিক নকশা অংকন করা হতো অথবা স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নকশা সম্বলিত বড় বড় অংশ পৃথকভাবে তৈরি করা হতো। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের কনস্টান্টিনোপল, ব্রুসা ও অন্যান্য বড় নগরীতেও বহু ভবনে এ ধরনের নকশাসম্বলিত প্রাচীর রয়েছে।

www.waytojannah.com

Contents

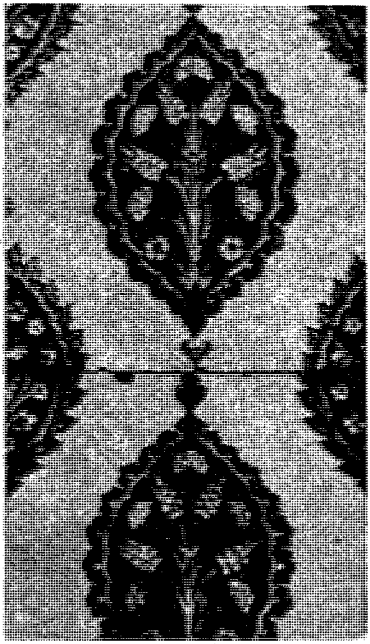

চিত্র-৩৩, ৩৪ ও ৩৫. ষোড়শ শতাব্দীতে এশিয়া মাইনরে বিভিন্ন রঙে চিত্রিত মাটির তৈরি টালি (প্যারিসের শিল্প ও কারুকাজ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত)

www.waytojannah.com

চিত্র-৩৬. ষোড়শ শতাব্দীতে দামেস্কের চিত্রিত মাটির তৈরি টালির প্যানেল (প্যারিসের শিল্প ও কারুকাজ মিউজিয়ামে রক্ষিত)

www.waytojannah.com

পরবর্তী তিনটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে পুনরাবৃত্তিমূলক নকশা অংকিত টালির নমুনা। প্রথমটিতে (চিত্র ৩৩) কারুশিল্পী প্রতিটি টালির মধ্যস্থলে দুই দিক সরু ডিম্বাকৃতির একটি নকশা অংকন এবং প্রত্যেক কোনে একই নকশার এক–চতুর্থাংশের পুনরাবৃত্তি করেন। এতে অনেক টালি একত্র করার পর উপর থেকে নিচের দিকে আঁকাবাঁকাভাবে পরস্পর বিরোধী সাদা সাদা ডোরা সৃষ্টি হয়। এই ডিজাইনের বিপরীত দ্বিতীয়টি (চিত্র ৩৪) হচ্ছে সম্পূর্ণ নৈসর্গিক। এতে সমান্তরালভাবে ঢেউ খেলানো লতায় পর্যায়ক্রমিকভাবে দ্রাক্ষাপত্র ও আঙ্গুর এবং বাদাম–কুঁড়ি অংকিত করা হয়। তৃতীয় নকশাটি (চিত্র ৩৫) উপরোক্ত আনুষ্ঠানিক ও নৈসর্গিক উভয় উপাদানের সংমিশ্রণে অংকিত হয়েছে এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মাঝে মাঝে গোলাপাকৃতির পুষ্পশোভিত ক্ষীণ একান্‌থাসের পত্ররাজি। সহজ–সরল বিষয়গুলিকে জটিলতাপূর্ণ নকশায় রূপান্তরিত করতে গিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অসঙ্গতির মধ্যেও সঙ্গতির সৃষ্টি করা হয়েছে। এটি এই রীতির বৈশিষ্ট্য। মুসলিম কারুশিল্পীরা কিভাবে কারুশিল্পের বিভিন্ন ধারণার সুষ্ঠু পরীক্ষা–নিরীক্ষা করেছেন এখানে ঘটনাক্রমে তা লক্ষণীয়। ৩৬ নং চিত্রে প্রদর্শিত সুন্দর প্যানেলটিতে টালি–নকশার দ্বিতীয় প্রকার, অর্থাৎ একটি বড় আকারের মধ্যে সামগ্রিক নকশা দেখানো হয়েছে। এটি হালকা নীল, সবুজ ও বাদামী রঙে রঞ্জিত দামেস্ক শিল্পকর্মের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যা তুর্কী মৃন্ময় পাত্রের সঙ্গে সিরীয় মৃন্ময় পাত্রের পার্থক্য সৃষ্টি করেছে।

চিত্র-৩৭. ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত ষোড়শ শতাব্দীতে এশিয়া মাইনরে চিত্রিত মাটির তৈরি বোতল

তুর্কী ও সিরীয় মৃৎশিল্পীরা তাদের টালিতে একটি রীতি প্রয়োগ করেছেন এবং থালা, বাটি, ফুলদানি ও অন্যান্য বিচিত্র ধরনের পাত্রে একই ধরনের নকশা ব্যবহার করেছেন। ৩৭ নং চিত্রের বোতলটিতে স্ফিঙ্কস্, পাখি ও জীব–জন্তুর এক অদ্ভুত সংমিশ্রণের নকশা অংকন করা হয়েছে। আপেল–গ্রীন পাদভূমিতে ছবিগুলি সাদা রাখা হয়েছে। এগুলি কিছুটা সেকেলে উপাদান সমন্বিত একটি বিশেষ শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। লালবর্ণের যে পরশ রঙের পরিকল্পনাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে তা মূলত তুর্কী। এশিয়া–মাইনরের শিল্পকর্মে সবসময় লাল রঙ দেখা যায় না, আর সিরীয় শিল্পকর্মে তা আদৌ নেই।

www.waytojannah.com

এ ধরনের মৃৎশিল্পে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য যে সব আলঙ্কারিক উপাদান ব্যবহৃত হয় সেগুলি নিঃসন্দেহে পত্র–পুষ্প অলংকার। দামেস্ক প্যানেলে (চিত্র ৩৬) তা ব্যাপকভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। অপরূপ নকশা সমন্বিত এ ধরনের দুটি সুদর্শন পাত্রে টিউলিপ, গোলাপ, কচুরিপানা, আইরিশ ও বাদাম–কুঁড়ির অপূর্ব সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। ফুলগুলি সবসময় এতোটা পরিপূর্ণ নিপুণতা ও যথাযথ সৌকর্যবোধের মাধ্যমে অংকন করা হয় যে, ছবির মধ্যেও তাদের স্বাভাবিকতা কখনো ক্ষুণ্ন হয় না। কারুশিল্পীরা পারস্য থেকেই তাদের পুষ্পালংকারের উপাদান সংগ্রহ করেন এবং এত অপরূপভাবে সেগুলি অংকনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ৩৮ নং চিত্রে আমরা পারস্য রীতির দ্বারা প্রভাবিত দামেস্ক শিল্পকর্মের একটি অপরূপ জগ দেখতে পাই। এতে নীল খোলসসম্পন্ন পাদভূমিতে টিউলিপ ও গোলাপ ফুল অংকন করা হয়েছে। সূক্ষ্ম কারুকার্য ও উজ্জ্বল বর্ণের এটি এ জাতীয় একটি অপূর্ব সৃষ্টি।

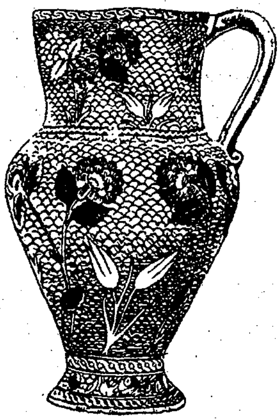

চিত্র-৩৮. অক্সফোর্ডের অ্যাশমেনিয়ান মিউজিয়ামে রক্ষিত ষোড়শ শতাব্দীতে দামেস্কের চিত্রিত মাটির তৈরি জগ

পাশ্চাত্য শিল্পে কতিপয় ফুলের প্রবর্তন হয় প্রধানত তুরস্ক ও সিরিয়ার মাধ্যমে পারস্য থেকে। এসব ফুল বর্তমানে আমাদের উদ্যানসমূহে উৎপাদিত হচ্ছে। কিন্তু এক সময় মুসলিম প্রাচ্য থেকে আমদানিকৃত মৃন্ময়পাত্র এবং চীনামাটির বাসন–কোসনের নকশা থেকেই ইউরোপ এগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কনস্টান্টিনোপলে নিযুক্ত রাজকীয় দূত বাসবেকের মাধ্যমেই টিউলিপ সর্ব প্রথম পাশ্চাত্যে আসে।

সিরিয়ায় প্রাচীনকাল থেকেই কাচ উৎপাদনের অত্যন্ত সুন্দর স্থানীয় উপাদান ব্যবহার করা হতো। মুসলমানরা এখানে কাচের উপর কারুকার্যের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রীতি উদ্ভাবন করেন। বিভিন্ন রকমের বোতল, পানপাত্র, সজ্জিত পাত্র এবং রঙিন মিনাকরা এবং প্রায়ই সোনালি পরশ দেওয়া চিত্র ও কারুকার্য সমন্বিত পাত্রে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন কোন পাত্র এমন পন্থায় কারু–সমৃদ্ধ করা হয়েছে যা পারস্য ও মেসোপটেমিয়ার কয়েকটি মৃন্ময় পাত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ফলে বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এগুলি প্রাচীনতম বলে ধরে নেওয়া হয়। প্রথম মঙ্গোল অভিযানের সময় মেসোপটেমিয়ার যেসব কারুশিল্পী সিরিয়ায় হিজরত করেন এগুলি সম্ভবত তাদেরই অবদান। এসব কারুশিল্পী সিরিয়ায় নিজেদের উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন যা চতুর্দশ শতকে ব্যাপক সমৃদ্ধি লাভ করে। কিন্তু ১৪০১ খৃষ্টাব্দে তৈমুর সিরিয়ার ধ্বংস সাধন করলে এরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

www.waytojannah.com

৩৯ নং চিত্রের পানপাত্রটিতে আড়াআড়িভাবে দুটি উৎকীর্ণ নকশা বন্ধনীর ন্যায় চিত্রিত করা হয়েছে। বন্ধনীর মাঝখানে দুদিকে দণ্ডায়মান দুজন পরিচারক পরিবৃত্ত হয়ে একজন রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট। লাল ও সাদা বর্ণে মিনাকরা এবং সমুজ্জ্বল এই চিত্রটি ত্রয়োদশ শতকের রীতির একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত। পানপাত্রটিকে যেভাবে ফ্রান্সের চতুর্দশ শতকের *রেপোসে* শিল্প রীতিতে ব্যাপক কারুকার্যময় একটি প্রশস্ত পাদানি ও রূপার গিল্টি করা দণ্ডের উপর অত্যন্ত মূল্যবান বস্তুর ন্যায় চ্যালিস (পবিত্র পানপাত্র) হিসাবে স্থাপন করা হয়েছে, তাতে মনে হয় নির্মিত হওয়ার অব্যবহিত পরই এটি ইউরোপে আসে। সমসাময়িক রেকর্ডপত্রে দেখা যায়, খৃস্টান ইউরোপে এ সময় সিরীয় কাচের পাত্রের অত্যন্ত কদর ছিল। ১৩৯৭ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সের পঞ্চম চার্লসের সম্পদের যে তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে তার দুটিতে এ জাতীয় কাচের পাত্রের সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে, যেমন ঃ 'ট্রফ্স পয ডি ভয়ের ঔভার পার ডেহর্স এ ইমেজেস এ লা ফ্যাকন ডি ডামাস' ; এবং আং বেসিন প্ল্যাট ডি ভয়ের পেইন্ট এ লা ফ্যাকন ডি ডামাস'। বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আরেকটি সিরীয় কাচের পাত্রও বিশেষ করে কোন খৃস্টান মালিকের জন্য তৈরি করা হয়েছিল, কারণ এতে ভার্জিন ও চাইল্ড, সেন্ট পিটার ও সেন্টপলের ছবি এবং একটি ল্যাটিন উৎকীর্ণলিপি রয়েছে। ত্রয়োদশ শতক থেকে সমগ্র ইউরোপে কাচের কারুকার্যের জন্য বিখ্যাত ভেনেসীয় কারুশিল্পীরা পঞ্চদশ শতকে প্রাচ্য রীতির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং মিনার কাজে এতোটা দক্ষতা অর্জন করেন যে, শীঘ্রই এতে মুসলমানদের একচেটিয়া প্রাধান্যের অবসান ঘটে। এটি ভেনিস থেকে ইউরোপের অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রে প্রসার লাভ করে এবং সেখানে নতুন নতুন রীতির উদ্ভব হয়। যেসব সুশোভিত মিনাকরা স্পিরিটের বোতল সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে অত্যন্ত সাধারণ হয়ে পড়ে সেগুলি মধ্যযুগীয় মুসলিম নিপুণতার নিকৃষ্ট উত্তরাধিকারী।

অনুকরণ যতই চমকপ্রদ হোক না কেন-আকারের সৌন্দর্যের দিক দিয়ে কিংবা অলংকরণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যক্ষতার দিক দিয়ে এগুলি কখনো তাদের প্রাচ্যের আদর্শের সমকক্ষ হতে পারেনি। ৪১ নং চিত্রের লম্বা গলাওয়ালা বোতল এবং ৪২ নং চিত্রের সুক্ষ্ম কারুকার্যময় বাটি ও ঢাকনি মুসলমানদের খাবার টেবিলের আদর্শ কাচের পাত্র। বোতলটিতে আড়াআড়ি বন্ধনীর মধ্যে পদক, উৎকীর্ণলিপি ও পত্রালংকার মিনাকরা হয়েছে এবং এতে ১৩৪৫ খৃস্টাব্দে মিসরের মামলুক সুলতান আলকামিল সাইফুদ্দিন শা'ব্যানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনৈক আমীরের নাম খোদাই করা হয়েছে। বাটিতেও একই ধরনের নকশা রয়েছে এবং সেগুলি সবুজ, নীল, লাল ও সাদা বর্ণে মিনাকরা হয়েছে এবং কোথাও গিল্টি করা হয়েছে। এই অপরূপ আকৃতির সুদর্শন পাত্রটিতে কোন নাম নেই, কিন্তু নিম্নোক্ত কথাটি উৎকীর্ণ করা হয়েছে ঃ

'আমাদের প্রভু সুলতানের উপর গৌরব বর্ষিত হোক!'

www.waytojannah.com

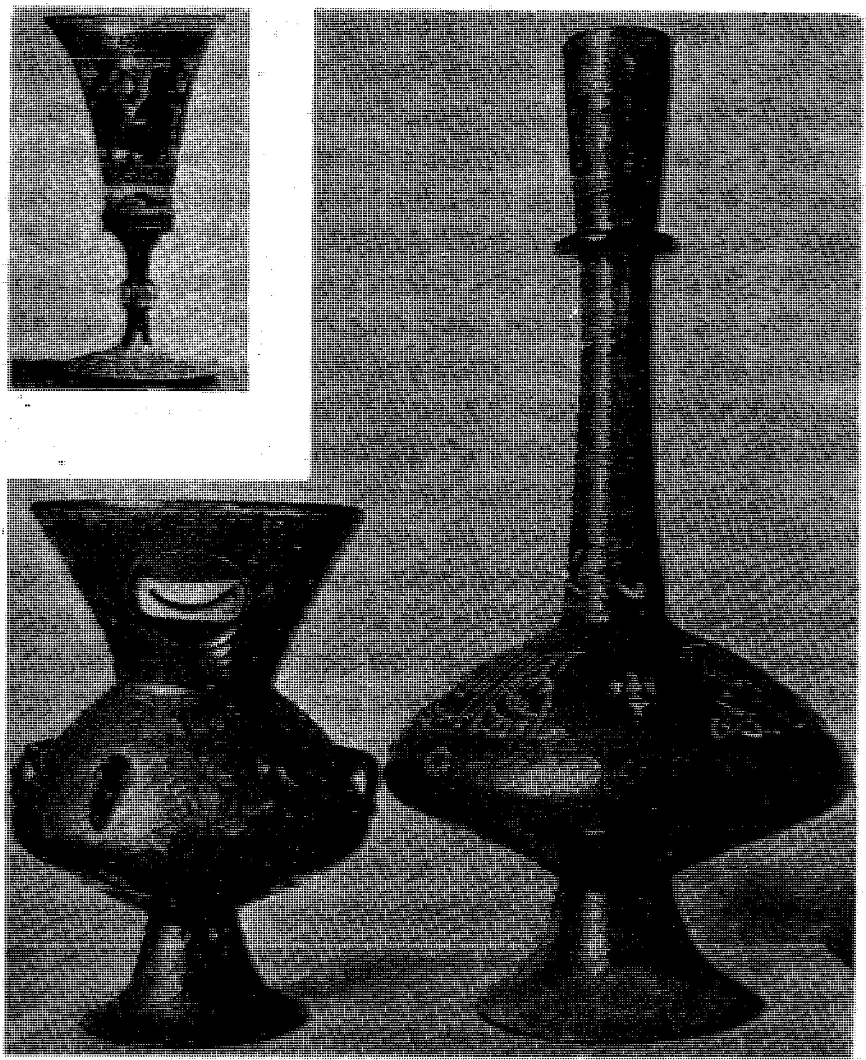

চিত্র-৩৯. ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত একাদশ শতাব্দীতে সিরিয়ার কলাই করা কাচের বড় পানপাত্র

চিত্র-৪০. লুভার মিউজিয়ামে রক্ষিত ষোড়শ শতাব্দীতে সিরিয়ার কলাই করা কাচের ল্যাম্প

চিত্র-৪১. লুভার মিউজিয়ামে রক্ষিত ষোড়শ শতাব্দীতে সিরিয়ার কলাই করা কাচের বোতল

www.waytojannah.com

Contents

চিত্র-৪২. ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত চতুর্দশ শতাব্দীতে সিরিয়ায় তৈরি ঢাকনাসহ কলাই করা কাচের পাত্র

চিত্র-৪৩. মিলানের স্যান ইসিডরো কলেজে রক্ষিত দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে একাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাগদাদের সিল্কের তৈরি বস্ত্র

www.waytojannah.com

সিরীয় কাচশিল্পীদের সবচাইতে সুন্দর শিল্পকর্ম হচ্ছে প্রদীপ কিংবা দ্বীপাধার। দ্বীপাধারগুলির সঙ্গে ভেতরের দিকে ছোট ছোট তৈলপাত্র প্রান্তভাগের তার দ্বারা যুক্ত করা হয়। প্রদীপগুলিকে তাদের গায়ের ভাঁজের সঙ্গে রূপা বা পিতলের শিকল দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এসব প্রদীপ বহু বড় বড় মসজিদকে রত্নের ন্যায় আলোকশিখায় উদ্ভাসিত করে। এগুলি সাধারণত পদক ও উৎকীর্ণ নকশার ডোরা কেটে অলংকৃত করা হয়। প্রচলিত পল্লবগুচ্ছের নকশা তাদের প্রাণবন্ত করে তোলে। কিন্তু ৪৪ নং চিত্রের ন্যায় কোন কোনটির সমগ্র উপরিভাগ বুটিদার রেশমী বস্ত্রের মতো পুষ্পের নকশায় আবৃত করা হয়। আরেকটির (চিত্র ৪০) অলংকরণও একইভাবে করা হয়েছে। সেটিতে যে দাতা প্রদীপটি কোন অজ্ঞাত মসজিদকে দান করেছেন তার বর্মের গৌরবচিহ্ন অংকিত করা হয়েছে।

চিত্র-৪৪. কায়রোর আরব চিত্রকলা জাদুঘরে রক্ষিত চতুর্দশ শতাব্দীতে সিরিয়ার কলাই করা কাচের ল্যাম্প

মুসলিম অভিজাত শ্রেণী প্রাচ্যের একটি প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসরণ করে তাদের নিজস্ব জিনিসের উপর প্রায়ই কুলজীচিহ্ন অংকন করেন। তাদের এই রীতি পাশ্চাত্যকেও কুলজীচিহ্ন ব্যবহারে প্রভাবিত করে। এর ফলে ক্রুসেডের সময় নিজস্ব একটি অদ্ভুত পরিভাষাসহ ধারাবাহিক বিজ্ঞান হিসাবে কুলজীচিহ্ন রীতি প্রবর্তিত হয়। এতে পারস্য শব্দ থেকে নীলবর্ণের পরিভাষা *আযূউর*[১] গ্রহণ করা হয়, যার অর্থ 'ল্যাপিস ল্যাজিউলাই' নামে অভিহিত মূল্যবান নীল পাথর। ইউরোপীয় ও প্রাচ্য কুলজীচিহ্ন ব্যবস্থায় আরো কয়েকটি চমৎকার সম্পর্কও রয়েছে। এর মধ্যে সেই অদ্ভুত দ্বিমস্তক ঈগলের ছবির কথা উল্লেখ করা যায়। এই ছবিটি দূর অতীতের হিট্টাইট স্মৃতিসৌধে প্রথম দেখা যায়। দ্বাদশ শতকের প্রথম দিকে এটি সেলজুক সুলতানদের প্রতীকচিহ্নে পরিণত হয়। চতুর্দশ শতকে এটি হোলি রোমান সম্রাটদের বর্মে গৌরবচিহ্ন হিসাবে প্রবর্তিত হয়।

মুসলমানদের কুলজীচিহ্ন হয় ৪০ নং চিত্রের প্রদীপের ন্যায় গোল আকারে বর্মের উপর স্থাপন করা হতো অথবা ৪১ নং চিত্রে বোতলে যেভাবে মিনা করা হয়েছে সেভাবে

১. মূল পারস্য শব্দের অপভ্রংশ হিসাবে শব্দটির শুরুতে 'এল' বর্ণটিও বাদ পড়েছে। আরবী *লাবাওয়ার্দ*, পারস্য লাযূহওয়ার্দ আকাশী নীলবর্ণের মূল্যবান পাথর।-অনুবাদক

www.waytojannah.com

পাদদেশে ছুঁচালো করে লাগানো হতো। ঈগলের ন্যায় বিভিন্ন ধরনের পাখি এবং মামলুক সুলতান বাইবার্স কর্তৃক ব্যবহৃত সিংহের ন্যায় বিভিন্ন পশুর প্রতীক চিহ্ন ছাড়াও রাজদরবারের কোন কোন কর্মচারী তাদের মর্যাদাসূচক সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করতেন। এসব কর্মচারী ছিলেন সাকী, পোলো–মাষ্টার, বিভিন্ন সমরসচিব প্রভৃতি। চ্যালিসের ন্যায় পেয়ালা এবং পোলো–স্টিকের তাৎপর্য বোঝা যায়, কিন্তু ৪৫ নং চিত্রে প্রদর্শিত সর্বশেষ ছবিটির অর্থ দীর্ঘকাল পর্যন্ত দুর্বোধ্য ছিল। একসময় মনে করা হতো যে, এর মাধ্যমে মুসলিম শিল্পকর্মে প্রাচীন মিসরীয় চিত্রাক্ষরের একমাত্র নমুনা ধরে রাখা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এটিকে ২২ নং চিত্রে একটি রাইটিং কেসের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার যে নকশা দেওয়া হয়েছে, তেমনি একটি নকশা বলে ধরা হয়।

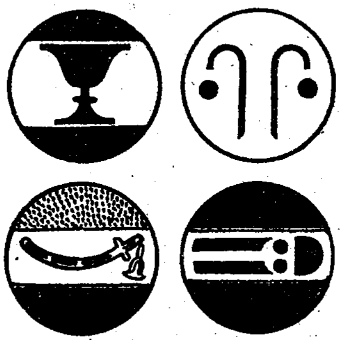

চিত্র-৪৫. বর্মের ওপর মুসলিম গৌরবের নিদর্শনসূচক নকশা

কোন কোন সময়ে সরকারী ব্যাজে কিভাবে একটি ব্যক্তিগত প্রতীক চিহ্ন ব্যবহৃত হতো লম্বা বোতলের উপর ছুঁচালো শিল্ডটি (একটি ঈগলের) তার দৃষ্টান্ত। সম্ভবপর ক্ষেত্রে মুসলমানদের গৌরব প্রতীকগুলি সবসময় উজ্জ্বল বর্ণের হতো, কারণ কোন অভিজাত ব্যক্তির ব্যবহৃত রং তার অস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল।

এবারে বস্ত্রের শিল্পকর্মের কথা আলোচনা করা যাক। আরবরা যখন পারস্য, সিরিয়া ও মিসর জয় করেন তখনই সেসব দেশ বস্ত্রের সুদর্শন কারুকার্যে বেশ উন্নতি সাধন করে। আশেপাশের বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ বয়নকেন্দ্রসমূহে অত্যন্ত উন্নতমানের রেশমী বস্ত্র উৎপাদিত হতো। তারা নিজেদের নকশায় বহু সাসানীয় উপাদান গ্রহণ করেন। মহানবী কর্তৃক রেশমী কাপড়ের ব্যবহার বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানরা কেবল চালু রেশম কারখানাগুলিকে উৎসাহিতই করেননি; তারা যেখানে গেছেন সেখানেই নতুন নতুন রেশম কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছেন। নিষিদ্ধ বিলাসিতায় তাদের আগ্রহ এতটা নিঃসংকোচ ও অবাধ ছিল যে, শীঘ্রই তারা মধ্যযুগীয় বিশ্বে রেশমী বস্ত্র ব্যবসায়ী হিসাবে প্রাধান্য লাভ করে। মধ্যযুগে বহু রেশমী বস্ত্র যে সব নামে পরিচিত হয়, এবং ব্যবসায়ের যেসব পরিভাষা আমাদের যুগ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে তার মধ্য দিয়ে এর পরিচয় পাওয়া যায়। নাম ও পরিভাষায় কোন কোন জিনিস যেখানে উৎপাদিত হতো কিংবা যেসব কেন্দ্র থেকে পাওয়া যেতো সেসব স্থানের পরিচয় রয়েছে। তাই মিসরের প্রথম মুসলিম রাজধানী ফুসতাত থেকে সসারের সময় প্রচলিত বস্ত্র 'ফুসচেন'–এর উদ্ভব

www.waytojannah.com

Contents

হয়েছে। যেসব কাপড়কে এখনো আমরা 'ডামাস্কাস্' বলি তার নাম দামেস্ক থেকে এসেছে। এই বিরাট বাণিজ্য কেন্দ্রের বহু জিনিস যা একান্তভাবে সেখানে উৎপাদিত হতো না সেগুলিকেও পাশ্চাত্যবাসী দামেস্কের জিনিস বলে মনে করতো। ইটালীয় বণিকগণ মসুল থেকে যে *মুসোলিনা* আমদানি করতো সেগুলিই আমাদের 'মসলিন'। বাগদাদকে ইটালিয়ানরা 'বালডাক্কো' বলতেন, এবং সেখান থেকে যেসব উৎকৃষ্ট রেশমী বস্ত্র আমদানি করা হতো সেগুলি এই নামে অভিহিত হয়। বহু গির্জায় বেদীর উপর যে রেশমী চাঁদোয়া টাঙানো হয় সেটিকেও 'বালডাচ্চিনো' বলা হয়। পরবর্তীকালে ইউরোপীয় দোকানসমূহে গ্রানাডা থেকে আমদানিকৃত পোশাকের কাপড় 'গ্রেনাডাইন্স্' নামে পরিচিত হয়। সেখানে পারস্য থেকে আমদানিকৃত '*তাফতাহ্*' 'টাফেটা' নামে পরিচিত হয়।

বাগদাদের 'আততাবীয়াহ্' এলাকায় মহানবী (সা)-এর সাহাবী 'আত্তাব (রা)'-এর প্রপৌত্রগণ বসবাস করতেন। দ্বাদশ শতকে এই এলাকাটি একটি বিশেষ ধরনের বস্ত্র উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং তা সেখানে *আত্তাবী* রেশমী বস্ত্র হিসাবে পরিচিত হয়। স্পেনীয়রা এটির অনুকরণ করতেন। ফ্রান্স ও ইটালী এটিকে '*ট্যাবিস*' নামে গ্রহণ করে এবং এই ব্যবসায়িক নামটিই ইউরোপের সর্বত্র জনপ্রিয় হয়। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর (লর্ডস্ ডে) মিঃ পেপিস বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত থেকেই তাঁর 'সোনালি লেস যুক্ত ভুয়া ট্যাবি ওয়েস্টকোট' পরিধান করেন। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে মিস বার্নি 'লাইল্যাক ট্যাবির' একটি গাউন পরে উইণ্ডসর প্রাসাদে একটি রাজকীয় জন্মোৎসবে যোগদান করেন। লাইল্যাক পারস্যে এই নামে পরিচিত একটি রং। একই নামে পাশ্চাত্যে আমদানিকরা একটি ফুলের গাছ আছে। উপরোক্ত সুদর্শন ঝলসানো রেশমী কাপড় বর্তমানে অপ্রচলিত। কিন্তু আমাদের অতি পরিচিত বন্ধু ট্যাবি বিড়াল এখনো বাদামী ও হলদে রঙের একটি '*আত্তাবী*' নকশা ধারণ করে।[১]

বার্লিনে আব্বাসীয় খলীফা হারুনুর রশীদের জাদুকরী নামযুক্ত টুক্রো কাপড় পাওয়া গেলেও বাগদাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত রেশমী কাপড় বর্তমানে কদাচিৎ দেখা যায়। লিওনের কলেজিয়াটা ডি সান ইসিডরোতে রক্ষিত একখণ্ড রেশমী বস্ত্রের (চিত্র ৪৩) উৎকীর্ণলিপিতে বলা হয়েছে যে, সম্ভবত আবূ নাসের নামে জনৈক শিল্পী এটি বাগদাদে তৈরি করেন, যেখানে শিল্পীর স্বাক্ষর থাকার কথা সেখানে নামের অক্ষরগুলো কিছুটা বিকৃত প্রতীয়মান হয়। লাল, হলুদ, কালো ও সাদাবর্ণে বোনা কাপড়টিতে নকশা দশম শতকের শেষভাগের প্রাথমিক মুসলিম শিল্প-রীতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। একটি প্রাচীনতর ঐতিহ্য অনুসরণে এর পাখি, পশু ও ফুলের নকশা বিরাট বৃত্তাকার প্যানেলের ভেতরে ও বাইরে অংকিত করা হয়েছে। একটি বিশেষ উপাদান হাতীর নকশা সম্ভবত ভারত থেকে এসেছে। কয়েক বছর আগে ক্যালের নিকটবর্তী একটি গ্রাম্য গির্জায় আবিষ্কৃত কিছুটা প্রাচীনতর একটি পারস্য রেশমী

১. দ্রষ্টব্য : সিলি স্ট্রেঞ্জ, বাগদাদ আণ্ডার দি আব্বাসিও ক্যালিফেট।অক্সফোর্ড ১৯০০।

www.waytojannah.com

বস্ত্রেও এই জন্তুটির ছবি দেখা যায়। বস্ত্রখণ্ডটি বর্তমানে লুভারের অন্যতম সম্পদ। পারস্য বস্ত্রের কোন কোন বাইজেন্টাইন অনুকরণে, বিশেষ করে আচেনে শার্লেমানের সমাধিতে রক্ষিত সুদর্শন বস্ত্রখণ্ডেও এই ছবি দেখা যায়।

ইউরোপে প্রাচ্য বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উৎকৃষ্টমানের রেশমী বস্ত্রের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। মুসলিম দেশগুলি থেকে সূক্ষ্ম কারুকার্যসম্পন্ন বস্ত্র এতো অধিক পরিমাণে আসতে থাকে যে, পাশ্চাত্যের শিল্প উদ্যোক্তারা এই লাভজনক শিল্পে বিপুল অর্থাগমের সম্ভাবনা দেখতে পায়। তারা বিভিন্ন কেন্দ্রে তাঁত প্রতিষ্ঠা করে প্রাচ্য ও স্পেনীয় কারখানাগুলির সঙ্গে জোরেশোরে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। প্রধানত সিসিলি থেকেই পাওয়া ইটালীয় শিল্পীরা তাদের কারিগরিজ্ঞান এবং নকশার নমুনা লাভ করেন। এখানে পালেরমোর রাজকীয় প্রাসাদে মুসলিম অভিযানকারীরা একটি বিখ্যাত তাঁত কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বীপটি নর্ম্যানদের অধীনে পুনরায় খৃষ্টান অধিকারে যাওয়ার পর এই কারখানা আরো সমৃদ্ধি লাভ করে। নর্ম্যান শাসনামলে সিসিলির শিল্পকেন্দ্রটি বাইজেন্টাইন ঐতিহ্যের সংস্পর্শে আরো বিকাশ লাভ করে। ১১৪৭ খৃষ্টাব্দে ঈজিয়ান সাগরে হামলা চালিয়ে কতিপয় গ্রীক তাঁতীকে গ্রেফতার করার পর রাজপ্রাসাদের কারখানায় নিযুক্ত করা হয় এবং এরই মাধ্যমে গ্রীক ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ ঘটে। ত্রয়োদশ শতকের শুরুতেই কতিপয় সমৃদ্ধ ইটালিয়ান নগরীতে রেশমীবস্ত্র বয়ন প্রধান শিল্প উদ্যোগে পরিণত হয়। এখানকার উৎপাদিত বস্ত্রের সঙ্গে তারা যেসব সিসিলীয় বস্ত্রের অনুকরণ করেন সেগুলির পার্থক্য করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। ফলে তারা ব্যাপকহারে বস্ত্র উৎপাদন করে বিদেশে রপ্তানি করতো।

চতুর্দশ শতকে ইটালীয় রেশমী বস্ত্রে মুসলিম বস্ত্র শিল্পের ন্যায় নতুন প্রভাব প্রতিফলিত হয়। ৪৬ নং চিত্রের ন্যায় সোনালি বুটিদার নীল ও সাদা রেশমী কাপড়ে কেবল সিংহ, তালজাতীয় ক্ষুদে গাছ, ফুলের নকশা, আরবী উৎকীর্ণলিপি এবং ইটালীয় শিল্পকর্মে ইতিমধ্যে প্রবর্তিত অন্যান্য প্রাচ্য উপাদান ছাড়াও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চীনা পাখিও দেখা যায়। কতিপয় ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে দূরপ্রাচ্যে যে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয় প্রধানত সেকারণেই ইউরোপে এগুলির আবির্ভাব ঘটে। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে যে হালাগু খান আব্বাসীয়দের উচ্ছেদ সাধন করে তার ভ্রাতা কুবলাই খানের নেতৃত্বে যাযাবর মঙ্গোলরা ১২৮০ খৃষ্টাব্দে চীন আক্রমণ করে এবং সেখানে ইউয়ান রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে। এই রাজবংশ ১৩৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এসব বিজয়ের ফলে পারস্য থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত এশিয়ার এক বিস্তীর্ণ এলাকা প্রায় এক শতাব্দিকাল একই মঙ্গোল রাজবংশ শাসন করেন। এতে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যার ফলে পূর্ব পশ্চিম এশিয়ার শিল্প ঐতিহ্যের উল্লেখযোগ্য বিনিময় ঘটে। চীনে তাং রাজ বংশের আমলে প্রতিষ্ঠিত উপনিবেশগুলি থেকে একটি মুসলিম জনবসতি গড়ে ওঠে এবং অন্য যেসব এলাকায় ইসলাম প্রসারিত হয়েছে সেসব এলাকার

www.waytojannah.com

ন্যায় আরবীভাষা প্রচলিত হয়। মুসলিম জনবসতিতে বহু কারুশিল্পীও ছিলেন। এদের মধ্যে যারা রেশম তাঁতী ছিলেন তারা তাদের প্রাচীন আবাসভূমির রেশম শিল্পের ঐতিহ্যগত দক্ষতা নিয়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে এমনসব রেশমীবস্ত্র উৎপাদন করেন যা মুসলিম বিশ্বে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। তাদের সুদর্শন রেশমীবস্ত্র তাদের পাশ্চাত্যের ভাইদের এতোটা প্রভাবিত করে যে, এর ফলে মুসলিম বস্ত্র উৎপাদনে নতুন নতুন ডিজাইনের উদ্ভব হয় এবং তার মাধ্যমে পশ্চিম ইউরোপের বস্ত্রের ডিজাইনেও তা প্রতিফলিত হয়। মধ্যযুগীয় চীনা শিল্পসৌকর্যের কতিপয় অপরূপ নমুনা এখনো সংরক্ষিত আছে। এর মধ্যে সম্ভবত সবচাইতে উল্লেখযোগ্য নমুনাটি ড্যানসিগে (পোল্যাণ্ডের একটি বন্দর) রক্ষিত আছে। এটি মামলুক সুলতান আন্‌নাসির মোহাম্মদ ইবনে কালাউনের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত হয়। ডিজাইনের মধ্যে তার নামটি বোনা হয়েছে। ৪৭ নং চিত্রে রেশমী ও সোনালি বুটিদার একটি চীনাবস্ত্র দেখানো হয়েছে। নকশাটিতে রয়েছে ফিনিক্স পাখি ও আরবীতে উৎকীর্ণ পামেটিস। এগুলিকে আনুষ্ঠানিক কারুজার্যমণ্ডিত দুটি রেখার মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। নকশাটি উল্লেখিত পাখিসমন্বিত রীতির একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

কেবল মধ্যযুগে নয়, তার পরবর্তীকালেও প্রাচ্যের রেশমী কাপড় দিয়ে প্রায়ই গির্জার পোশাক তৈরি করা হতো। ৪৮ নং চিত্রের ফতুয়া জাতীয় পোশাকটি (চেচিউবল) ষোড়শ শতকের শেষভাগে কিংবা সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগে তৈরি পারস্যের একটি রেশমী কাপড় থেকে কেটে তৈরি করা হয়েছে। এর নকশাটি যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে কোন অবস্থাতেই তার উপযোগী নয়, বিশেষ করে কোন মসজিদে এটিকে কখনো সহ্য করা হবে না। এর প্রধান উপাদান হচ্ছে হাতে পেয়ালা ও মদের বোতল নিয়ে দরবারী পোশাক পরিহিত দণ্ডায়মান তরুণদের সারি। পত্র–পুষ্প শোভিত সরু লতার ফাঁকে ফাঁকে এসব ছবি তুলে ধরা হয়েছে। এগুলির সঙ্গে তুর্কী মৃৎশিল্পীদের কারুকার্যের মিল রয়েছে। ভেতরের শূন্যস্থানগুলিতে এমন ধরনের সুদর্শন পাখির ছবি দেওয়া হয়েছে যা চীনাপাখির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ডিজাইনটি সাফাভী আমলের শৌখীন বুটিদার রেশমী পোশাকের উজ্জ্বল নকশার একই শ্রণীভুক্ত। এই শ্রেণীর বিস্তারিত বৈশিষ্ট্যগতভাবে আরো বেশি ছবির সমাবেশ দেখা যায়। এর মধ্যে খসরু ও শিরিনের মিলনাত্মক রোমান্টিক কাহিনী কিংবা লাইলী ও মজনুর বিয়োগাত্মক কাহিনীর সচিত্র বর্ণনা উল্লেখযোগ্য। কোন কোন সময় পুষ্পশোভিত বৃক্ষ ও গুল্মরাজির মধ্যে নিরীহ বা হিংস্র প্রাণীর বিচরণের দৃশ্যও দেখা যায়। অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বলভাবে এগুলি অংকিত ও রঞ্জিত হয়।

ধর্মীয় পোশাক (ওরফ্রি) হিসাবে ব্যবহৃত লম্বা রেশমী ফালিটির উপর যে নকশা অংকিত হয়েছে তা তুর্কী ও ইটালীয় তাঁতিদের একটি বিশেষ শ্রেণীর ডিজাইন প্রতিফলিত করেছে। এ জাতীয় নকশা যখন প্রবর্তিত হয় তখন উভয় এলাকার শিল্পীরা এতোটা সক্রিয়ভাবে ও সফলতার সঙ্গে পরস্পরকে অনুকরণ করে, যাতে কোন্ কাপড়টি ইউরোপীয় বা প্রাচ্য তা

www.waytojannah.com

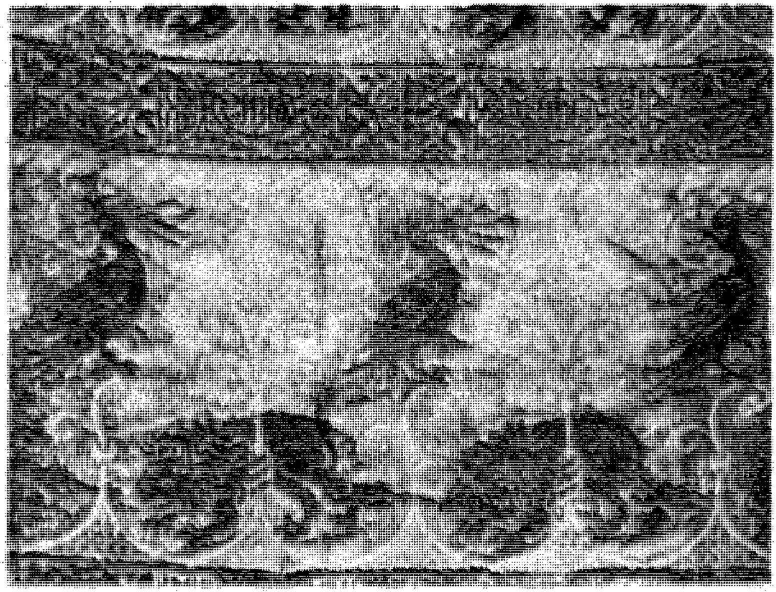

চিত্র-৪৬. ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত চতুর্দশ শতাব্দীতে ইটালীয় সিল্কের তৈরি বস্ত্র

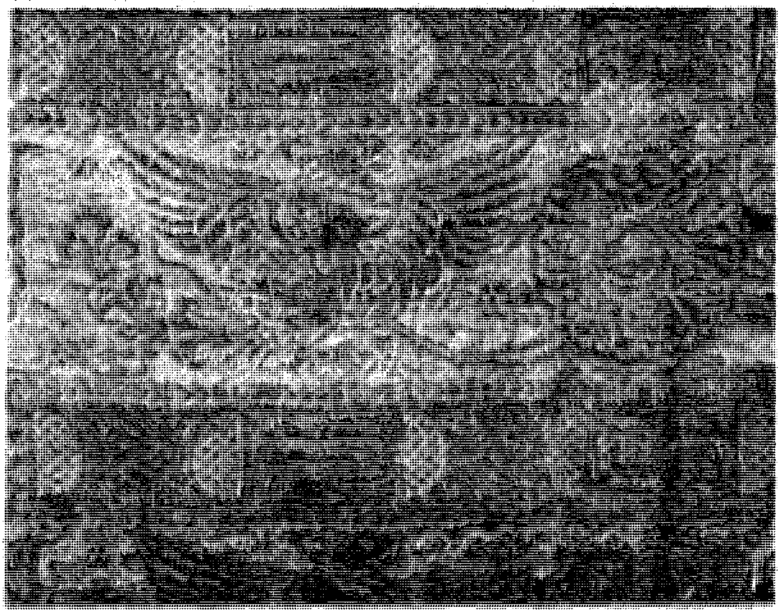

চিত্র-৪৭. ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতাব্দীতে চীনা সিল্কের তৈরি বস্ত্র

www.waytojannah.com

চিত্র-৪৮. প্যারিসের চিত্রকলা মিউজিয়ামে রক্ষিত ষোড়শ শতাব্দীতে পারস্যের বুটিদার সিল্কের তৈরি ক্যাজুবল

www.waytojannah.com

নির্ণয় করা বিশেষজ্ঞদের পক্ষে অনেক সময় দুষ্কর হয়ে পড়ে। তারিখের দিক দিয়ে পরবর্তী এবং দেখতে ইউরোপীয় মনে হলেও এই বস্ত্রখণ্ডে এমন এক ধরনের একটি তুর্কী নকশা রয়েছে যার উদ্ভব হয় পঞ্চদশ শতকের কোন এক সময়ে এশিয়া মাইনরে। অত্যন্ত সাদাসিধে আকারের এই নকশাগুলি উপরে নিচে আঁকাবাঁকাভাবে অংকিত সাধারণ বা কারুকার্যমণ্ডিত রেখার দ্বারা গঠিত। রেখাগুলি মাঝে মাঝে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় এবং জমিনটি জালের ন্যায় কারুকার্যে ভরে দেওয়া হয়। কোন কোন নকশায় ওরফ্রির নকশাটির ন্যায় জালের ফাঁকগুলির মধ্যে কমবেশি আনুষ্ঠানিক কারুকার্য করা হয়। অন্যগুলিতে রেখাগুলির সংযোগ স্থল থেকে অনুরূপ উপাদানের উদ্ভব হয়। শেষোক্ত পরিকল্পনাটি ৫০ নং চিত্রের অত্যন্ত সুন্দর বুটিদার বস্ত্রের অনুসরণ করা হয়েছে। গাঢ় লাল বর্ণের পাদভূমি ও নিকেল নীলের পটভূমিতে নকশাটি সোনালি বর্ণে বোনা হয়েছে। প্রধান ব্যবস্থার ফলে ভেতরে ভেতরে যেসব স্থান শূন্য ছিল সেখানে একটি দ্বিতীয় নকশাজাল সৃষ্টি করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে গোলাপ, টিউলিপ কুঁড়ি, পিঙ্ক ও নার্গিস ফুল।

এই ডিজাইনের প্রধান উপাদান পুষ্পগুচ্ছ থেকে ইটালীয়রা ৪৯ নং চিত্রের পুষ্প-নকশাটি উদ্ভাবন করেছে। পঞ্চদশ শতকের শেষভাগের মখমলে প্রায় একই ধরনের একটি নকশা ৫১ নং চিত্রে দেখা যায়। ষোড়শ শতকে ইউরোপীয় ও তুর্কী তাঁতশিল্পীরা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পালাক্রমে একে অপরকে হার মানায় এবং এর মাধ্যমে জাল ও গুচ্ছ রীতির বহু জটিলতাপূর্ণ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। তারা এই সময়ে সুদর্শন মখমলকে বিশেষ বিশেষ ধরনের নকশায় এমন অপরূপ করে তোলেন যে, এগুলি ঐতিহ্যগতভাবে তাদের অবদান হয়ে পড়ে। এসব মূল্যবান রেশমী বস্ত্র পুনরুজ্জীবিত করার একক প্রচেষ্টায় উইলিয়াম মরিস নীল, কমলা, সাদা ও সোনালি রঙে বোনা বুটিদার মখমলের উপর এই জাতীয় একটি নকশা (চিত্র ৫২) অংকন করেন।

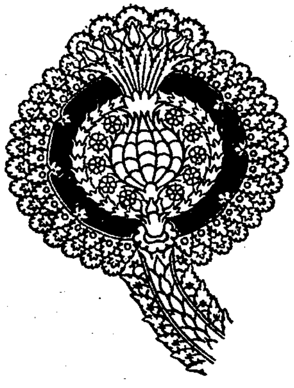

চিত্র-৪৯. ষোড়শ শতাব্দীতে ইটালীয় সিল্কের তৈরি বোনা বস্ত্রের পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ (ফ্লোরেন্স জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত)

বর্তমানকালে সার্বজনীনভাবে প্রয়োজনীয় কার্পেট প্রাচ্য থেকে ইউরোপে এমন একটি বিলাসদ্রব্য হিসাবে আসে যাকে ধনাঢ্য শিল্প রসিকগণ প্রথমে ব্যবহারের জিনিসের চাইতে সংরক্ষণযোগ্য সম্পদ হিসাবে মনে করতেন। ট্যাপিস্ট্রির ন্যায় মসৃণ এবং অসংলগ্ন সুতার গ্রন্থি সৃষ্টির মাধ্যমে মখমলের ন্যায় জড়ো করা, এই উভয় প্রকারের কার্পেটই প্রাচ্যের অতি

www.waytojannah.com

প্রাচীন সম্পদ। এগুলিকে ঘুমানোর জন্য মাদুর, দেওয়ালের পর্দা এবং মেঝের আবরণ হিসাবে ব্যবহার করা হতো। ইটালীয় ছবিতে প্রাচ্যের কম্বলের অনুকরণ থেকে জানা যায় যে, ইউরোপে চতুর্দশ শতকে এগুলির আবির্ভাব ঘটে। ষোড়শ শতকে এগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়মিত পণ্যে পরিণত হয়। প্রমাণ রয়েছে যে, কার্ডিন্যাল উলসী ১৫২১ খৃষ্টাব্দে ভেনেসীয় রাষ্ট্রদূতের সৌজন্যে তাঁর হ্যাম্পটন কোর্টের প্রাসাদের জন্য প্রাচ্যের ষাটটি কম্বল সংগ্রহ করেন। চিত্রকর হলবিনের ছবিতে সম্ভবত এগুলির প্রতিফলন দেখা যায়। ঐ সময় এশিয়া-মাইনরে যেসব কার্পেট তৈরি হতো সেগুলির সঙ্গেও এর সাদৃশ্য দেখা যায়। নর্দাম্পটনশায়ারের বাউটন হাউসে স্যার এডওয়ার্ড মন্টেগুর জন্য বিশেষভাবে নির্মিত তিনটি জড়োকার তৈরি কার্পেট সংরক্ষিত আছে। এগুলিতে প্রান্তভাগে বোনা তাঁর প্রতীক চিহ্ন ও ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দের তারিখ দেওয়া রয়েছে। বর্তমানের ন্যায় তখনো এগুলি 'তুর্কী' গালিচা হিসাবে পরিচিত ছিল। এগুলি বিভিন্ন আকৃতিমূলক কারুকার্যে মণ্ডিত ছিল এবং লাল জমিনের উপর নীল ও হলুদ বর্ণে রঞ্জিত ছিল।

ষোড়শ শতকে পারস্যের কারুশিল্পীগণ কার্পেট বোনাকে সৌকর্যের এমন এক শিখরে নিয়ে যান যেখানে তার পূর্বে কিংবা তারপর থেকে এ পর্যন্ত কেউ পৌঁছাতে পারেনি। তাদের অলৌকিক দক্ষতাপূর্ণ ডিজাইন সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে অতুলনীয়। এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান আর্দাবিল থেকে নিয়ে আসা হয়েছে এবং বর্তমানে ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। আর্দাবিলে এটি সাফাভী শাহদের শ্রদ্ধেয় পূর্ব পুরুষ শেখ শাফীর মসজিদে কয়েক শতক পর্যন্ত ছিলো। ৫৩ নং চিত্রে এই বিশাল কার্পেটের একটি অংশ দেখানো হয়েছে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত এই গালিচাটিতে তিন কোটিরও বেশি অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থী রয়েছে। প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে গ্রন্থীর সংখ্যা ৩৮০। মধ্যভাগে কাটাকাটা প্রান্তভাগ সমন্বিত একটি বিরাট পদক রয়েছে। এর চারদিকে রয়েছে ডিম্বাকৃতির ছুঁচালো খোব, সেগুলি উজ্জ্বল বর্ণে পত্র-পুষ্পের অপরূপ কারুকার্যে সুশোভিত। আয়তাকার ক্ষেত্রটির প্রত্যেক কোণে কেন্দ্রীয় উপাদানের এক-চতুর্থাংশের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। গাঢ় নীল বর্ণের জমিনে আঁকাবাঁকা লতায় উজ্জ্বল ফুলের সমাহার এবং তারি মধ্যে দুটি প্রদীপ দ্বিতীয় পর্যায়ের কেন্দ্রগুলি থেকে যেনো শূন্যে ঝুলে আছে।দৃঢ়বদ্ধ প্রান্তভাগ কর্ণলতিকার ন্যায় বৃত্ত ও সম্প্রসারমান খোবে সুশোভিত ও কারুকার্যমণ্ডিত। এক প্রান্তের একটি কার্টুশে (পাকানো কাগজ) কবি হাফিজের একটি কবিতা উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং তার নিচে রয়েছে ঃ 'দ্বার দেশের বান্দা কাশানের মকসূদের শিল্পকর্ম, ৯৪৬ খৃষ্টাব্দে' (১৫৪০ খৃ.)। বহু প্রাচীনতর কার্পেট সংরক্ষিত থাকলেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই কার্পেটটিকেই সবচাইতে প্রাচীনতম বলে মনে করা হতো। এই প্রসঙ্গে মিলানের মিউজিও পল্‌ডিপেয্‌যোলিতে রক্ষিত অপর একটি অপরূপ পারস্য গালিচার কথা উল্লেখযোগ্য। এটি ১৫২১ খৃষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দীন জামী কর্তৃক বোনা হয়েছিলো।

www.waytojannah.com

Contents

চিত্র-৫০. প্যারিসে রক্ষিত ষোড়শ শতাব্দীতে এশিয়া মাইনরের সিল্কের তৈরি বস্ত্র

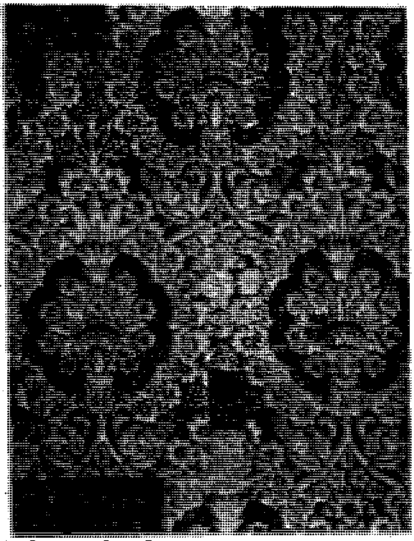

চিত্র-৫১. ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট [illegible] রক্ষিত ষোড়শ শতাব্দীতে ইটালীয় সিল্কের তৈরি মখমল

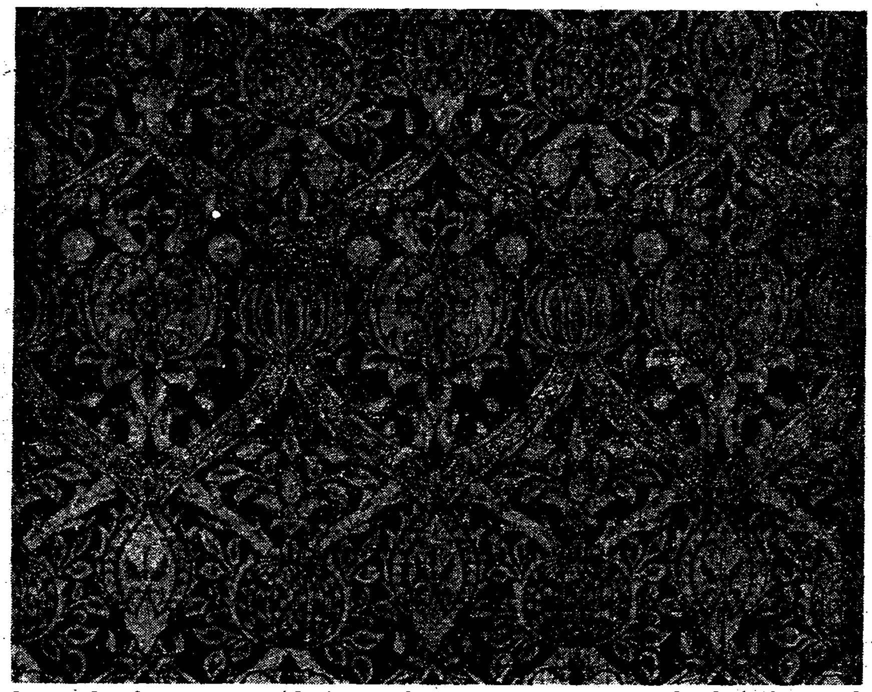

চিত্র-৫২. ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম মরিস নির্মিত সিল্কের তৈরি মখমল

www.waytojannah.com

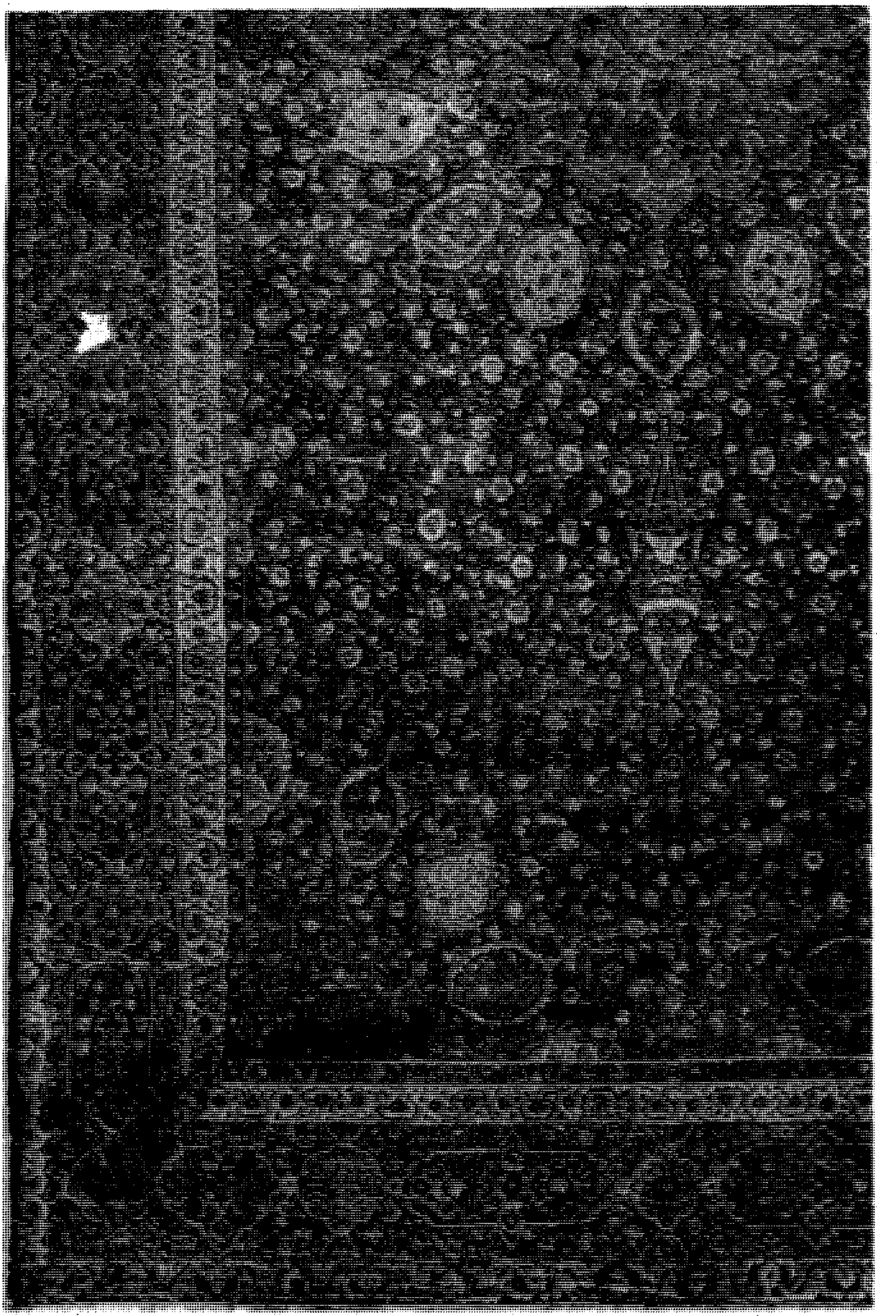

চিত্র-৫৩. ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত ১৫৪০ খৃস্টাব্দে পারস্যের আরদাবিলের একটি মসজিদে নরম ফেসো কার্পেট

www.waytojannah.com

Contents

ইউরোপীয় কারুশিল্পীরা মুসলমানদের কাছ থেকে জড়ানো কার্পেট বোনার কাজ শিখেন। প্রথমে তারা প্রাচ্যের ঐতিহ্যগত হাতের কৌশল প্রয়োগ করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে যান্ত্রিক পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করেন। যান্ত্রিক পন্থায় তৈরি গালিচা ও কম্বল বর্তমানে প্রায় সার্বজনীনভাবে ব্যবহৃত হয়। মুসলমানদের কাছ থেকে নেওয়া নকশা সাধারণ হলেও, সেগুলি ঐতিহ্যগত না হয়ে কিছুটা খেয়ালী ধরনের। নকশার মধ্যে নয়, বরং মখমলের ন্যায় বুনটের মধ্যেই আধুনিক গালিচার প্রাচীন ঐতিহ্য অব্যাহত রয়েছে।

আমরা সমতলের নকশা থেকে রিলিফের (সমতলের উঁচুতে) নকশাতে গেলে দেখতে পাবো যে, মুসলিম খোদাই-শিল্পীরা এখানেও তাদের অন্যান্য নকশা অংকন রীতি অনেকখানি একইভাবে অনুসরণ করেছে। ইউরোপীয় রিলিফের নকশা অংকনে আমরা যে রীতি বৈচিত্র্য দেখতে পাই, যেখানে মুসলিম দেশগুলিতে অপরিজ্ঞাত ভাস্কর্য ও ছবি অংকনের প্রভাব ঐতিহ্যগত হয়ে পড়েছে, মুসলিম খোদাই শিল্প ও মডেলিংয়ে তা অনুপস্থিত। সেখানে সাধারণত বয়নকার্যে, খচিত করণে কিংবা রংয়ের কারুকার্যে ব্যবহৃত নকশাগুলিরই পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। ইউরোপীয়দের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত পন্থায় এ ধরনের নকশাগুলি কারুকার্যের উপযোগী করে নেওয়া হয়, যে নকশা উজ্জ্বল বর্ণের একটি পাণ্ডুলিপির শিরোনামের পৃষ্ঠা কিংবা একটি রেশমী বস্ত্র অলংকরণে ব্যবহৃত হয়েছে, সেই একই নকশা কোন গম্বুজের বহির্ভাগে কিংবা মসজিদের প্রাচীরে পাথর খোদাইতেও সমভাবে উপযোগী বলে মনে করা হয়। ৫৫ নং চিত্রে সাদা মার্বেলের তৈরি ফাউন্টেন-বেসিনটির নির্মাণকাল ১২৭৭-৭৮ এবং তাতে ঐতিহাসিক আবুল ফিদার পিতৃব্য হামার সুলতান দ্বিতীয় মোহাম্মদের নাম অংকিত রয়েছে। এতে খোদাইশিল্পী তার বিশেষ প্রয়োজনে কিভাবে বিভিন্ন কারুশিল্পের একটি সাধারণ ডিজাইনকে কাজে লাগিয়েছেন তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পরিকল্পনাটি মূলত একটি পুনরাবৃত্তিমূলক নকশা যার উপাদানগুলি একপাশে অনির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত প্রান্তভাগ হিসাবে প্রসারিত করা যায় কিংবা একপাশে ও উপরে নিচে 'সার্বিক' নকশা হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ১২১৬ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণকারী জনৈক শেখের সমাধি থেকে সংগৃহীত ৫৬ নং চিত্রের কাঠের আবরণটিতে নিচের দিকের কারুকার্যমণ্ডিত লম্বা অংশে (ফ্রিয্) এবং পৃথক পৃথক খোবগুলিতে একই পুনরাবৃত্তিমূলক নকশা খোদাই করা হয়েছে। এই অপরূপ শিল্প কর্মটির একটি দিক সাউথ কেংসিংটনে এবং অবশিষ্ট অংশ কায়রোতে

চিত্র-৫৪. কায়রোর আরব চিত্রকলা। জাদুঘরে রক্ষিত দশম/একাদশ শতাব্দীর মিসরীয় খোদাই করা কাঠের প্যানেল

www.waytojannah.com

চিত্র-৫৫. ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত ১২৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে সিরিয়ায় মার্বেল পাথরের তৈরি ফোয়ারা পাত্র

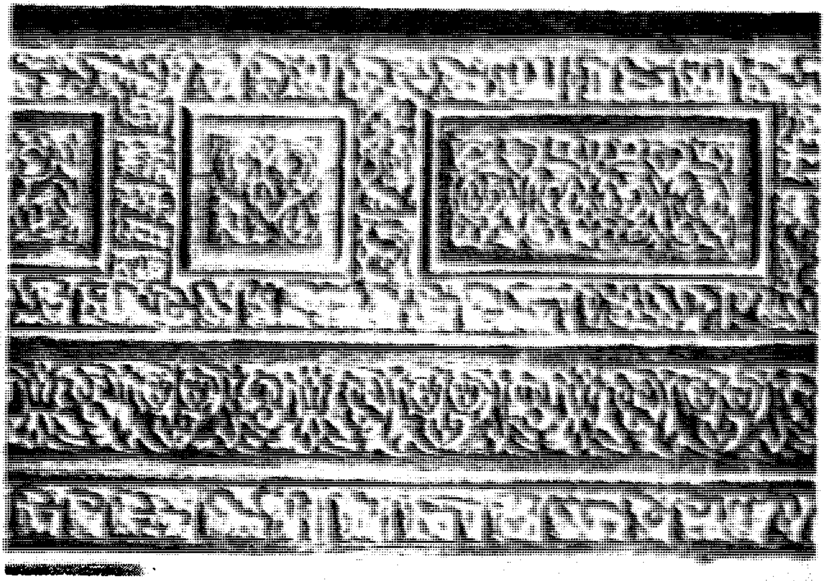

চিত্র-৫৬. ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত ১২১৬ খৃষ্টাব্দে কায়রোর একটি সমাধিতে খোদাই করা কাঠের প্যানেল-এর কাজ

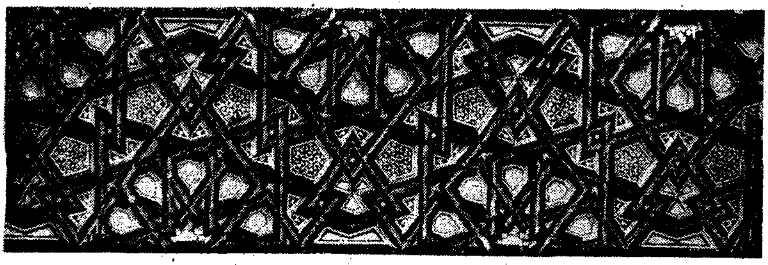

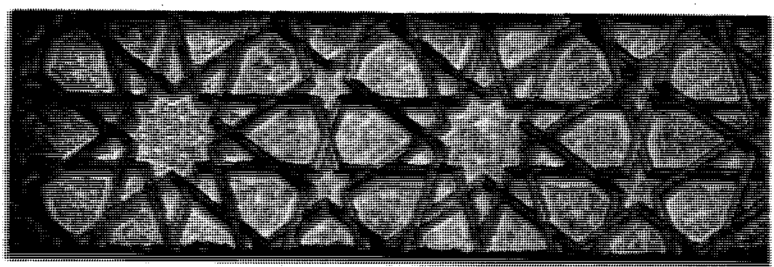

চিত্র-৫৮ এবং ৫৯. ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত পঞ্চদশ শতাব্দীতে কায়রোর খোদাই করা অভ্র খচিত দরজার পাল্লা

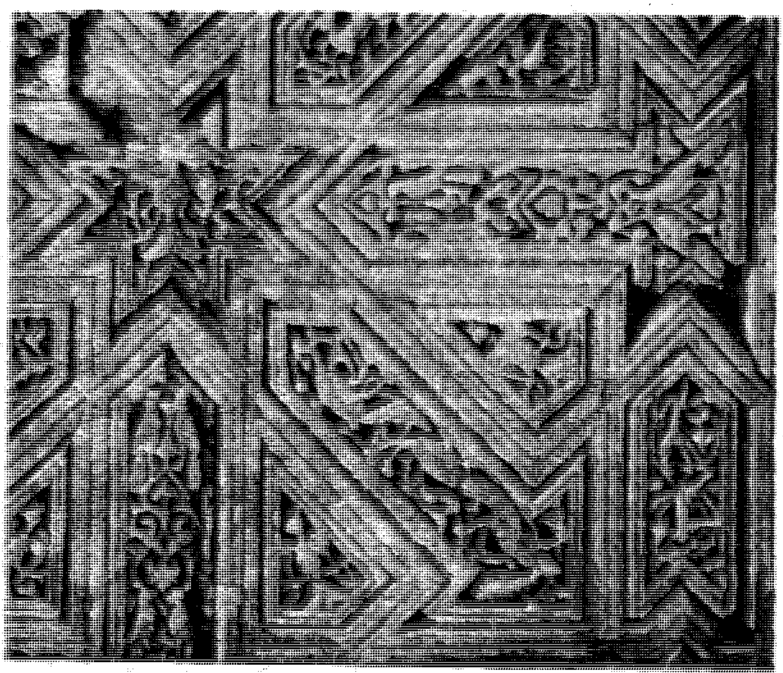

চিত্র-৫৭. পালের্মো ন্যাশনাল মিউজিয়ামে রক্ষিত একাদশ শতাব্দীর খোদাই করা কাঠের সিলিং

www.waytojannah.com

রক্ষিত আছে। ফাতিমীয় আমলের খোদাই শিল্পে ৫৪ নং চিত্রের ন্যায় সমতলভাগকে প্রায়ই এতোটা গভীর করে খোদাই করা হয় যে, এতে ছিদ্র করণের একটি ধারণার সৃষ্টি হয়। এই খোবটি কায়রোর আরব আর্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। সিসিলিতে নির্মিত হলেও ৫৭ নং চিত্রের খোদাই করা কাঠের সিলিংটির (ভেতরের দিকের ছাদ) শিল্পকর্ম রীতির দিক দিয়ে ফাতিমীয়। গভীরভাবে খোদাই করা খোবের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন ছাড়াও এই পত্রালংকারে বহু রকমের পশু–পাখির ছবিও রয়েছে। রাজ–দরবার কিংবা লৌকিক ব্যবহারের জন্য নির্মিত ফাতিমীয় শিল্পকর্মে এ ধরনের বৈশিষ্ট্য প্রায়ই দেখা যায়। এগুলিতে মানুষের ছবিও অবাধে ব্যবহৃত হতো।

মুসলিম ছুঁতাররা যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নির্মাণ পদ্ধতি প্রবর্তন করেন উপরোক্ত সিলিংয়ে তাই অনুসরণ করা হয়েছে। ব্যবহারিক এবং আলংকারিক প্রয়োজনীয়তা থেকে এই রীতির উদ্ভব হয়েছে। আবহাওয়াগত কারণে কাঠ সংকুচিত হয়ে যেতে পারে কিংবা দুমড়ে যেতে পারে। অনেক সময় যথোপযুক্ত কাঠের অভাবও ছিল। তাই খোবগুলি আয়তনে যতটা সম্ভব ছোট করা হতো এবং তার রক্ষণকারী ফ্রেমগুলি অপেক্ষাকৃত বড় করা হতো। নকশার স্থায়িত্ব ও বিভিন্ন রকমের উদ্দেশ্য সংরক্ষণের জন্য ধীরে ধীরে অদ্ভুত ও বিচিত্র রকমের ছোট ছোট খোবের উদ্ভব হয়। এই পরিকল্পনাটি প্রকৃতপক্ষে কাঠামোগত পন্থায় প্রকাশ পেতো এবং মুসলিম ছুঁতার শিল্পীরা এ ধরনের ডিজাইন অংকনে বিশেষ আনন্দ পেতো। দীপ্তিমান তারকার ন্যায় বিচিত্র আকারের বহু-ভুজ সম্বলিত এই নকশা এমন এক ধরনের কারুকার্য সৃষ্টি করে যা অলংকার শিল্পে মুসলমানদের সম্ভবত সবচাইতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান। এই রীতি রূপায়ণে কাঠের যে কারুকার্য বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে সেখানে এর সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গরূপ প্রকাশিত হয়। কিন্তু বহু কারুশিল্পী বিভিন্ন শিল্প মাধ্যমেও এসব নকশা ব্যবহার করেছেন। মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র এসব নকশা অংকনে অত্যন্ত উদ্ভাবনমূলক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তীকালে এগুলি বিরক্তিকর জটিলতা এবং অতি–সচেতন জ্যামিতিক রূপ লাভ করলেও এর সহজ আকারগুলি সবসময় মুসলিম প্রতিভার অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য রঙের অপরূপ পরিকল্পনা রূপায়ণে এককভাবে কার্যকর বাহন ছিল।

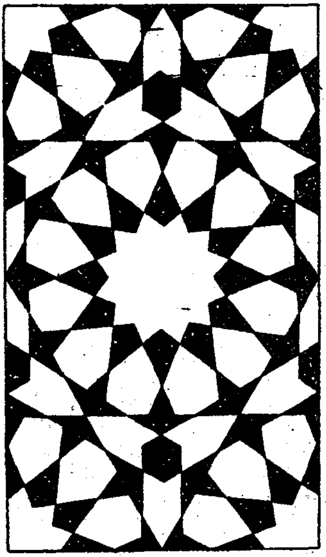

চিত্র-৬০. ইসলামী জ্যামিতিক নকশা

৬০ নং চিত্রে এ ধরনের একটি নকশায় ষড়ভুজের মধ্যে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে বারোটি ছুঁচালো

www.waytojannah.com

তারকা স্থাপন করা হয়েছে। এই নকশাটি ৬১ নং চিত্রের খসড়া কাঠামোর উপর ভিত্তি করে অংকন করা হয়েছে। খসড়া কাঠামোটি উনবিংশ শতকের সূচনায় পারস্যের শাহর স্থপতি মির্যা আকবরের একটি নোট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাঁর এ ধরনের বহু নকশা ভিক্টোরিয়া এণ্ড আলবার্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। সূক্ষ্ম রেখা দ্বারা গঠিত মূল জ্যামিতিক চিত্রটি একটি ছুঁচালো জিনিস দিয়ে কাগজের উপর অংকন করা হয়েছে এবং তারই ভিত্তিতে কালি দিয়ে নকশাটি অংকন করা হয়েছে। পদ্ধতিটি উপদেশমূলক এবং সম্ভবত একটি প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা বহন করছে। এতে প্রাচ্যের অংকন শিল্পীরা কিভাবে পরিকল্পনা তৈরি করে তার ভিত্তিতে বহু রকমের নকশা অংকন করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এসব নকশা সম্বলিত পুস্তিকা থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[১]

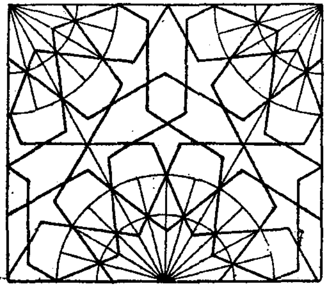

চিত্র-৬১. ৬০ নম্বর চিত্রের নকশার গাঠনিক ভিত্তি (উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পারস্যের মির্জা আকবর-এর আঁকা)

৫৮ ও ৫৯ নং চিত্রে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকের দরজার দুটি পাল্লায় মিসরীয় শিল্পকর্মের নিদর্শন দেখানো হয়েছে। খোবগুলি এতো ছোট যে সেখানে কাঠের পরিবর্তে আইভরি ব্যবহার করে এক বিস্ময়কর শিল্প–সৌকর্য প্রদর্শন সম্ভব হয়েছে। একটি পাল্লায় খোবগুলিতে তীক্ষ্ণ রীলিফে পুষ্পালংকার খোদাই করা হয়েছে এবং অন্যটিতে জ্যামিতিক নকশায় সেগুলিকে খচিত করা হয়েছে। উভয়টিই সম্ভবত একই ডিজাইনের মিম্বরের ধ্বংসাবশেষ। অনুরূপ ডিজাইনের একটি নমুনা ভিক্টোরিয়া এণ্ড আলবার্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। এটি কায়রোর একটি মসজিদে মামলুক সুলতান কায়েত বে (১৪৬৮–৯৫ খৃ.) নির্মাণ করেন। উনবিংশ শতকে একটি নতুন রাস্তা নির্মাণের জন্য এটি ধ্বংস করা হয়।

আংশিকভাবে বা সামগ্রিকভাবে আইভরি দিয়ে মুসলমানরা বহু সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরি করেন। তারা খোদাই করে, খচিত করে কিংবা রঞ্জিত করে এটিকে অলংকৃত করতেন। দশম শতকে কর্ডোভায় আইভরি খোদাই শিল্পীদের একটি কেন্দ্র ছিল। তারা এমন এক রীতি অনুসরণ করতেন যাতে তখনি একটি পরিণত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে। তাদের শিল্প–সৌকর্যের বহুবিধ দৃষ্টান্তের মধ্যে ৬২ নং চিত্রের নলাকার কৌটাটি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। এটি যামোরার গির্জা থেকে আহরিত হয়েছে এবং বর্তমানে মাদ্রিদের

১. এম জে বোরগয়েন লি টেইট ডেস এনটিল্যাকস (প্যারিস, ১৮৭৯) গ্রন্থে এ ধরনের প্রায় দুইশত অদ্ভুত ডিজাইন বিশ্লেষণ করেছেন। ডঃ ইএইচ হ্যান্‌কিন (দি ড্রইং অব জিওমেট্রিক প্যাটার্নস্ ইন স্যারাসেনিক আর্ট, কলকাতা, ১৯২৫) কতিপয় উল্লেখযোগ্য জটিল নমুনা অস্বাভাবিক দক্ষতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন।

www.waytojannah.com

চিত্র-৬২. মাদ্রিদের প্রত্নতত্ত্ব জাদুঘরে সংরক্ষিত ৯৬৪ খৃষ্টাব্দে কর্ডোভার খোদাই করা অভ্র নির্মিত জুয়েলারী বাক্স

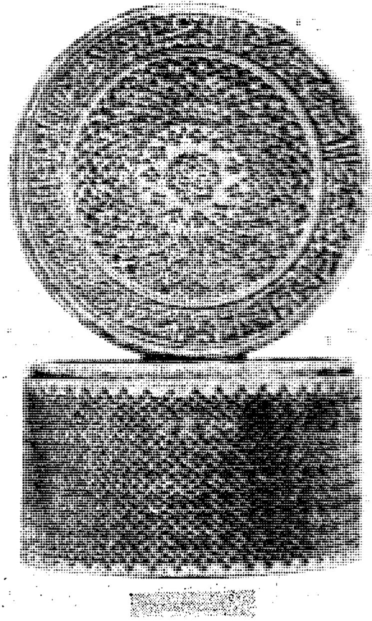

চিত্র-৬৪. ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত চতুর্দশ খৃষ্টাব্দে কায়রোর সচ্ছিদ্র অভ্র নির্মিত বাক্স।

চিত্র-৬৩. প্যামপ্লোনা প্রধান গির্জায় রক্ষিত ১০০৫ খৃষ্টাব্দে কর্ডোভার খোদাই করা অভ্র নির্মিত জুয়েলারী বাক্স

www.waytojannah.com

Contents

চিত্র-৬৫. ভেনিসের সেন্ট মার্কের রাজকোষে রক্ষিত দশম শতাব্দীতে ফাতেমীয় খোদাই করা রক ক্রিস্টালের কলসি

www.waytojannah.com

Contents

মিউজিও আর্কিলজিকোতে রক্ষিত আছে। গম্বুজ আকৃতির ঢাকনির চারপাশে এক উৎকীর্ণলিপিতে বলা হয়েছে যে, এটি ৯৬৪ খৃস্টাব্দে খলীফা দ্বিতীয় আল হাকামের জন্যে তার পত্নী যুবরাজ আবদুর রহমানের মাতাকে উপহার হিসাবে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে। প্রায় একই সময়ে কর্ডোভায় তৈরি অনুরূপ কতিপয় জিনিসের এই সুন্দরতম নিদর্শনটি সম্পূর্ণরূপে পত্রালংকার, ময়ূর ও অন্যান্য পশু–পাখির চিত্রে আবৃত। অন্যান্য নিদর্শন বর্তমানে লণ্ডন, প্যারিস ও অন্যত্র দেখা যায়। গঠনে এবং শিল্প–সৌকর্যে একই রকম হলেও এগুলির কারুকার্য বিভিন্ন রকমের। ৬৩ নং চিত্রে আয়তাকার কৌটার ন্যায় কোন কোনটিতে ছবিওয়ালা বিষয়বস্তুকে বেষ্টন করে পারস্পরিক বোনা ঝুলন্ত বৃত্ত খোদাই করা হয়েছে।

কয়েকজন কারুশিল্পী একযোগে এটি তৈরি করেছেন, যাদের মধ্যে খায়ের ও উবায়দা নাম দুটি পড়া যায়। নাম দুটি তাদের খোদাই করা খোবে অংকিত রয়েছে। রাজদরবারের জনৈক ওমরাহ্‌র জন্য ১০০৫ খৃস্টাব্দে এটি নির্মিত হয়। ঢাকনির মধ্যে তার নাম ও উপাধি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে উৎকীর্ণ করা হয়েছে।

৬৪ নং চিত্রে আর এক ধরনের আইভরি শিল্পকর্ম দ্রষ্টব্য। একটি বৃত্তাকার বাক্সের গায়ে ও সমতল ঢাকনিতে ছিদ্র করে জ্যামিতিক নকশা অংকন করা হয়েছে। এটি চতুর্দশ শতকে কায়রোতে নির্মিত এই শ্রেণীর শিল্পকর্মের প্রতিনিধি স্থানীয়। ত্রয়োদশ শতক থেকে প্রবর্তিত এবং কিছুটা অস্পষ্টভাবে 'সিকুলো–অ্যারাবিক' হিসাবে বর্ণিত কতিপয় নলাকার ও আয়তাকার আইভরি বাক্সের কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এগুলি সোনালি ও অন্যান্য বর্ণে রঞ্জিত এবং বৃত্তের মধ্যে গ্রন্থি নকশা কিংবা পশু, পাখি, ফুল ও গাছের ছবি অংকিত এমন একটি রীতি যা উজ্জ্বল বর্ণের পাণ্ডুলিপির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ৬৬ নং চিত্রে এর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যেখানে পিছনে উপবিষ্ট একটি চিতাসহ জনৈক অশ্বারূঢ় শিকারীর ছবি অংকিত করা হয়েছে।

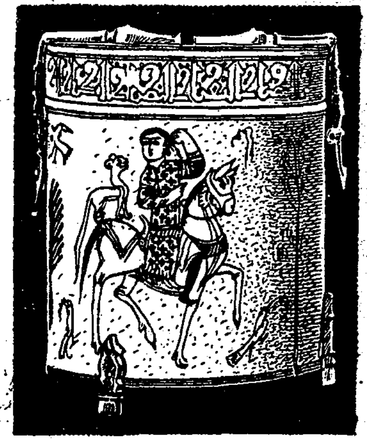

চিত্র-৬৬. প্যারিসে ব্যক্তিগত সংগ্রহে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সাইকিউলো আরবীয় চিত্রিত অভ্র নির্মিত বাক্স

রঞ্জিত, খোদাই করা কিংবা ছিদ্র করা আইভরি কৌটা মণিমুক্তা, অলংকার, সুগন্ধি, মিষ্টি এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিস রাখার জন্যে ব্যবহার করা হতো। উৎকীর্ণলিপিতে দেখা যায় যে, এগুলি প্রায়ই উপহার হিসাবে বিশেষভাবে তৈরি করা হতো। প্রাচীনতম

www.waytojannah.com

কৌটাগুলি সূচনায় ইসলামী শিল্পকর্মের অত্যন্ত মূল্যবান নিদর্শন। এর অনেকগুলি আমরা বিস্ময়করভাবে সুসম্পন্ন আকারে পেয়েছি। এগুলির কোন কোনটিতে এখনো রঙের যে সৌন্দর্য দেখা যায় তা বিবেচনা করলে মনে হয় যে, খোদাই করা কৌটাগুলি মূল অবস্থায় রং ও স্বর্ণের আমেজে সমুজ্জ্বল ছিল। কোন কোনটিতে এখনো তাদের ধাতব হুক ও কব্জা দেখা যায়। এগুলি একটি বিশেষ ধরনের ধাতব শিল্পের চমৎকার দৃষ্টান্ত।

খোদাই শিল্পে নিপুণতার একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে, ৬৫ নং চিত্রে প্রদর্শিত স্বচ্ছ পাথরের একটি অপরূপ জলপাত্র। এটি ভেনিসের সেন্ট মার্কস–এর ট্রেজারীতে রক্ষিত আছে। শিল্পকর্মটি ঐতিহাসিকভাবেও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে মিসরের দ্বিতীয় ফাতেমীয় খলীফা আল–আজিজের নাম অংকিত রয়েছে। আল–মাকরিযী ১০৬৭ খৃষ্টাব্দে বিলুপ্ত যেসব সম্পদের তালিকা তৈরি করেছেন এটি তার অন্যতম স্বচ্ছ পাথরের জলপাত্রও হতে পারে, কারণ সেগুলিতে এই খলীফার নামও খোদাই করা হয়েছে। শিল্পসৌকর্য ও অলংকরণের দিক দিয়ে এটি ইসলামী শিল্পকলার এক গৌরবোজ্জ্বল যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

যেসব প্রাত্যহিত ব্যবহার্য জিনিসে মৌল–উপাদান, কলাকৌশল বা ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমরা কোন না কোনভাবে ইসলামের কাছে ঋণী তার মধ্যে আমাদের মুদ্রিত বই–পুস্তক সবচাইতে ব্যাপক। প্রথম দৃষ্টিতে প্রাচ্যের সঙ্গে এগুলির সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ মনে হলেও বই উৎপাদনের আধুনিক পদ্ধতি মধ্যযুগীয় মুসলিম উদ্যোগ ও নৈপুণ্য থেকে অনেক কিছু লাভ করেছে। কেবলমাত্র সাম্প্রতিককালেই ইসলামী সাহিত্য টাইপের মাধ্যমে বা লিথগ্রাফি পদ্ধতিতে পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে। শেষোক্ত পদ্ধতিটি বিশেষভাবে জনপ্রিয়, কারণ এতে লিপিকরের প্রকৃত সৌকর্য–দক্ষতা বিশ্বস্ততার সঙ্গে রক্ষিত হয়। লিপিকরের এই সৌকর্য–দক্ষতা সর্বপ্রকার কারুশিল্পীর কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার জিনিস। মুদ্রণশিল্প মুসলিম দেশগুলিতে সম্প্রসারিত হওয়ার বহু আগে ইউরোপে পূর্ণতা লাভ করলেও এর বিকাশের একটি বড় রকমের উপাদানের জন্য আমরা প্রাচ্যের কাছে ঋণী। মুসলমানরা যখন ৭০৪ খৃষ্টাব্দে সমরকন্দ জয় করেন তখনই চীনের একটি প্রাচীন আবিষ্কার কাগজের সঙ্গে পরিচিত হন এবং চীনা শিল্পীদের কাছ থেকে কাগজ তৈরির কৌশল আয়ত্ত করেন। ইসলামী বিশ্বের মধ্যদিয়ে এটি পাশ্চাত্যে আসে। কাগজে লেখা বহু সংখ্যক আরবী পাণ্ডুলিপির তারিখ নবম শতক, কিন্তু দ্বাদশ শতকের আগে খৃষ্টান ইউরোপে এর আমদানি হয়নি এবং ত্রয়োদশ শতকে এটি সাধারণভাবে প্রচলিত হয়নি। প্রথম ইউরোপীয় কাগজ কল প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলমানদের দ্বারা স্পেন ও সিসিলিতে এবং এখান থেকেই কাগজ প্রেরিত হয় ইটালীতে।

যান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে পঞ্চদশ শতকে যখন ব্যবসায় ভিত্তিতে বই উৎপাদন শুরু হয় তখনই কাগজ এর একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদানে পরিণত হয়। কাগজ ছাড়া মুদ্রণ শিল্পের এতোটা অগ্রগতি আদৌ হতো না। কিন্তু আধুনিক প্রকাশকরা একমাত্র

www.waytojannah.com

কাগজের জন্যই মুসলমানদের কাছে ঋণী নয়। পঞ্চদশ শতকে ভেনিস যখন অতোটা সক্রিয়ভাবে মুসলিম শিল্পরীতি আয়ত্ত ও প্রচার করছিল তখন ইটালীতে বাঁধাই করা বই–পুস্তক বিশেষভাবে প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্য লাভ করে। এসময় কিছু কিছু বই এমন একটি বৈশিষ্ট্য লাভ করে যা মুসলিম বই বাঁধাইর ক্ষেত্রে সাধারণ এবং এটি হচ্ছে সামনের প্রান্ত ভাগগুলি সুরক্ষিত করার জন্যে মোড়কের ন্যায় মলাট (ফ্ল্যাপ)। এই বৈশিষ্ট্য আমাদের ব্যাঙ্কারদের 'পাস–বুকের' ন্যায় হিসাব রক্ষণের জন্য তৈরি কতিপয় বাঁধাইর ক্ষেত্রে এখনো অব্যাহত রয়েছে। এটি এখনো প্রাচ্য ঐতিহ্যের একটি স্মারক।

মুসলমানদের দ্বারা অনুপ্রাণিত আর একটি অভিনব দিক হচ্ছে, চামড়ার মলাটে কারুকার্য করার একটি নতুন পদ্ধতি। মধ্যযুগে ইউরোপীয় বাইণ্ডাররা প্রায়ই ধাতব ছাঁচ দ্বারা ছাপ মেরে নকশা সৃষ্টির মাধ্যমে চামড়ার মলাটের সৌকর্য সাধন করতেন। এসব সীলমোহর নতুন নতুন ও বিস্তারিত নকশা খোদাইর মাধ্যমে বৃহত্তর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত পদ্ধতির বিকাশলাভ ঘটে। কিন্তু 'কানা হাতিয়ার' নামে পরিচিত এই সীলমোহরের নকশা কেবলমাত্র রিলিফেই প্রতিফলিত করা যেতো। অবশেষে প্রাচ্য শিল্পীদের সীলমোহরের খোদাই করা স্থানসমূহে সোনার রং ভরাট করে ছাপ মারা উন্নত নকশার সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়। ভেনিসে বসবাসকারী মুসলিম বাইণ্ডাররা ইউরোপে এই রীতি প্রবর্তন করেন। পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে একটি নতুন রীতিতে এই পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করা হয়। এতে উত্তপ্ত হাতিয়ারটিকে বারবার সোনার পাতে চাপ দিয়ে ছাপ মেরে স্থায়িভাবে সোনার রং যুক্ত করা হয়। সম্ভবত কর্ডোভায় এই নতুন রীতিটির উদ্ভব হয়। ষোড়শ শতকে খৃস্টান ও মুসলমান উভয় বাইণ্ডাররাই সার্বজনীনভাবে এই রীতি অনুসরণ করেন। অবশ্য সোনা ব্যবহারের প্রাচীনতর প্রাচ্যরীতি কখনো সামগ্রিকভাবে পরিত্যক্ত হয়নি।

৬৭ নং চিত্রে চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে কিংবা পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগের একই বাঁধাইর ভেতরের দিকে অপরূপ কারুকার্য প্রাচ্যের সোনা ব্যবহারের একটি দৃষ্টান্ত। পরিষ্কার ও সূক্ষ্ম একটি অলৌকিক নকশা। কয়েকটি সাধারণ হাতিয়ারের সাহায্যে অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে অসংখ্য ছাপ মেরে এটি অংকিত করা হয়েছে। ৬৮ নং চিত্রে প্রাচ্যের বাইণ্ডারগণ কর্তৃক অনুসৃত অন্যান্য অলংকরণ রীতি প্রদর্শিত হয়েছে। এসব রীতি সপ্তদশ শতকের অনেক আগে প্রবর্তিত হয়। গাঢ় লাল বর্ণের চামড়ার মলাটে একটি কেন্দ্রীয় নকশা ছাপ মেরে সোনা দিয়ে সুশোভিত করা হয়েছে। এর উপরে ও নিচে এবং প্রত্যেক কোণে সমতল থেকে নিচু করা বিভিন্ন আকারের খোব রয়েছে। সাদা পাতলা চামড়া কেটে কালো পাদভূমির উপর আঠা দিয়ে জড়িয়ে সেগুলির মধ্যে ফিতার ন্যায় কারুকার্য মণ্ডিত নকশা অংকন করা হয়েছে। সমতল ক্ষেত্রে গাছপালা এবং দূরপ্রাচ্যের একটি ড্রাগনসহ বিভিন্ন রকমের পশুপাখি সমন্বিত একটি আনুষ্ঠানিক প্রাকৃতিক দৃশ্য স্বর্ণ দিয়ে রঞ্জিত করা হয়েছে।

www.waytojannah.com

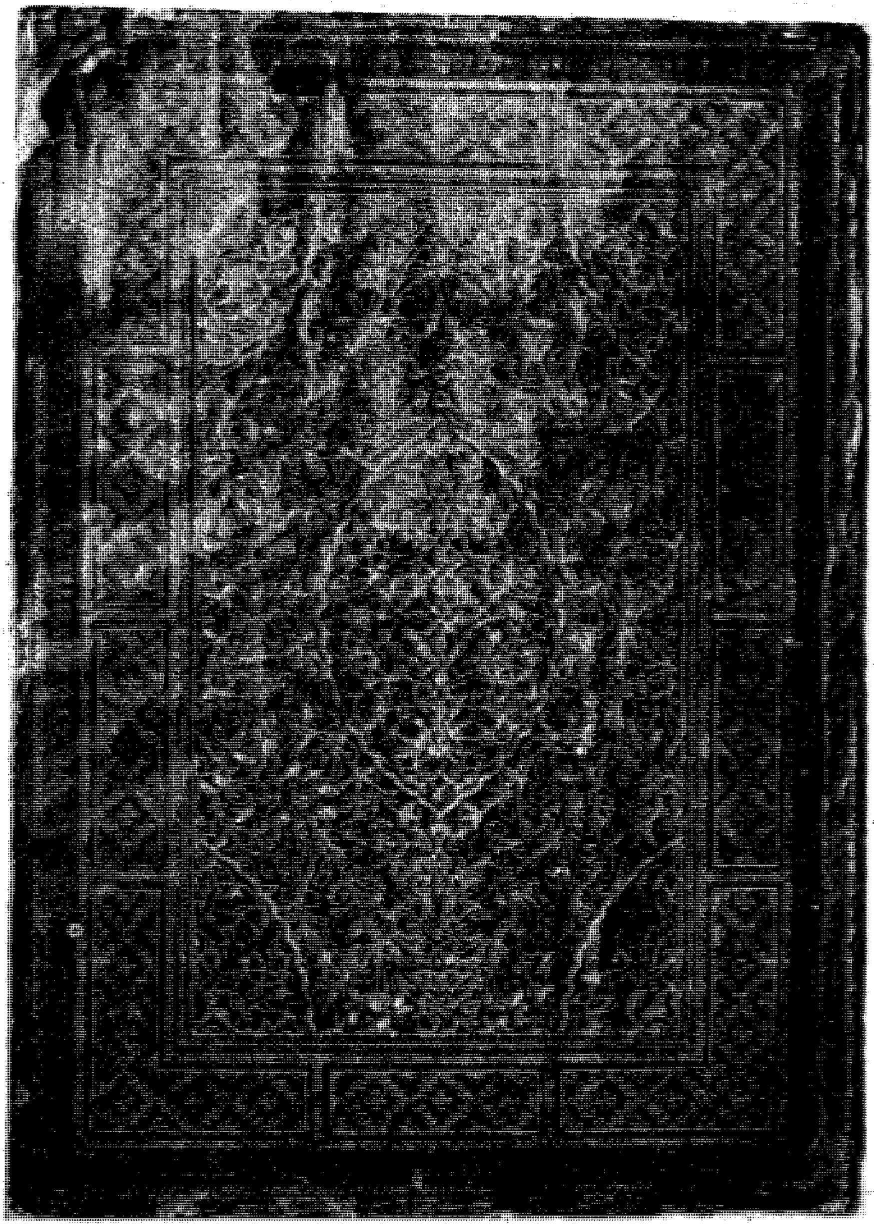

চিত্র-৬৭. ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে বা পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কায়রোর চামড়ার তৈরি পুস্তকের মলাটের ভিতরের অংশ

www.waytojannah.com

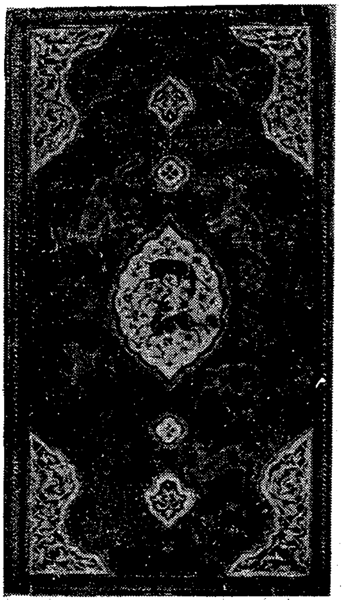

৬৮

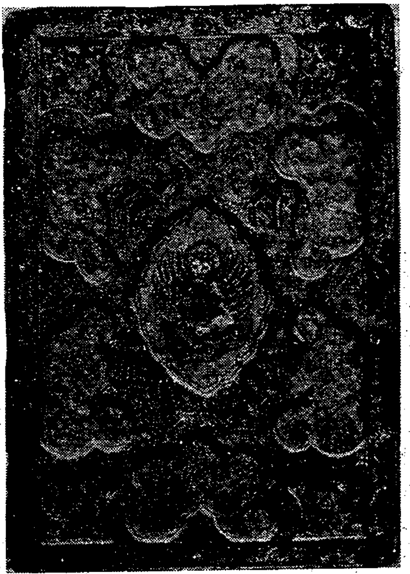

৬৯

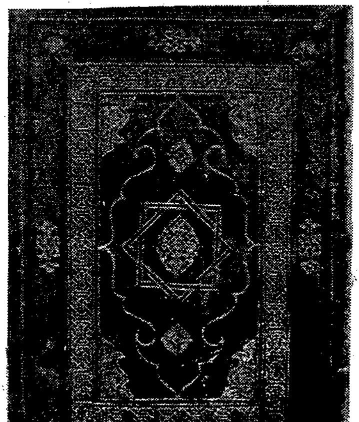

৭০

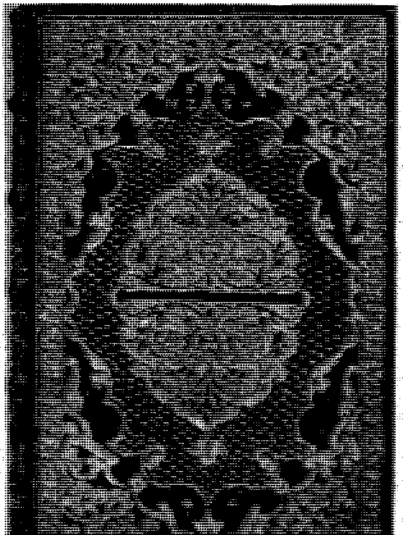

৭১

ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত চামড়ার তৈরি পুস্তকের মলাট

চিত্র-৬৮.পারস্যে সপ্তদশ শতাব্দীতে, চিত্র-৬৯. ভেনিসে ষোড়শ খৃস্টাব্দে, চিত্র-৭০. ভেনিসে ১৫৪৬ খৃস্টাব্দে চিত্র-৭১. জার্মানে ১৫৮৩ খৃস্টাব্দে

www.waytojannah.com

৬৯ নং চিত্রে ষোড়শ শতকের ভেনিসীয় মলাটে একই ধরনের নিচু করা খোব ও রঞ্জিত কারুকার্য রয়েছে। এটি স্পষ্টত একটি পারস্য মডেলের অনুকরণ।

মিসরীয় বাঁধাইয়ে (চিত্র ৬৭) কেন্দ্রস্থলে একটি ছুঁচালো ডিম্বাকৃতির খোব থেকে এবং প্রত্যেক কোণে এর এক–চতুর্থাংশের পুনরাবৃত্তি করা হয়। পারস্য মলাটে একই পরিকল্পনার কিছুটা পরিবর্তন সাধন করে কারুকার্য করা হয় যা আমরা ইতিমধ্যেই বহু কারুশিল্পে লক্ষ্য করেছি। ৭০ নং চিত্রে প্রদর্শিত ১৫৪৬ খৃস্টাব্দের একটি ভেনিসীয় মলাটে মূলত মুসলমানদের কেন্দ্রীয় ও কৌণিক কৌশল এবং প্রাচ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত রৈখিক কারুকার্য সমন্বিত অনুরূপ একটি নকশা সোনালি দীপ্তিতে রঞ্জিত করা হয়েছে। ৭১ নং চিত্রে পরবর্তীকালের একটি জার্মান নকশায় একই ব্যবস্থা দেখা যায়, যদিও সমসাময়িক ইউরোপীয় রীতিতে বিস্তারিত কারুকার্য কিছুটা সংশোধন করা হয়েছে।

এই চারটি বাঁধাই শিল্পে মোটামুটিভাবে এমন কয়েকটি শৈল্পিক পদ্ধতির বিকাশকে অনুসরণ করা হয়েছে যার উদ্ভব মূলত মুসলিম দেশগুলিতে। এসব দেশের নকশা পরিকল্পনা ও কারুকার্যের উপাদান নিয়ে এগুলি ইউরোপীয় শিল্পকেন্দ্রে আবির্ভূত হয় এবং কিছুটা রদবদলসহ দৃঢ়ভাবে আধুনিক চর্চার অন্তর্ভুক্ত হয়। যেসব পন্থায় সূক্ষ্ম চামড়ার বাঁধাইয়ে বর্তমানে সার্বজনীনভাবে হাতিয়ারের সাহায্যে সোনালি লেখা অংকিত করা হয় মুসলিম শিল্পীরাই তার পূর্ণতা সাধন করেন। প্রাচীন হাতের তৈরি বইয়ের মলাটের সঙ্গে যখন উনবিংশ শতকের যান্ত্রিকভাবে উৎপাদিত বইর মলাট যুক্ত হয় তখনো যান্ত্রিকভাবে বাঁধাইকরা বইগুলি মূল মুসলিম রীতিরই অনুসরণ করে।

প্রান্তভাগের মলাটে (এন্ডপেপার), কাগজের মলাটে এবং অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় কারখানায় বইর প্রান্তভাগ বাঁধাইতে 'মার্বেল রঙের' যেসব উজ্জ্বল নকশা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে সেগুলিও সরাসরি প্রাচ্য সূত্র থেকে নেওয়া হয়েছে। ষোড়শ শতকে মুসলমানদের অংকিত চিত্রের ও সুদর্শন হস্তলিপির প্রান্তভাগের চারদিকে আটকানো কাগজের টুকরার উপর এসব সূক্ষ্ম নকশার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। শিল্পরসিকদের বিশেষ রুচিসম্মত সম্পদ সুশোভিত করার প্রয়োজনেই এর উদ্ভব হয়। ইংল্যাণ্ডে বেকনের সময় মার্বেল পেপারের কথা জানা ছিল। এ সম্পর্কে তার উক্তি হচ্ছে, তুর্কীদের কাগজকে চ্যামলেটিং (মার্বেল রং) করার একটি সুন্দর শিল্প রয়েছে, যা আমাদের এখানে প্রচলিত নেই। তারা ডুবুরিদের তৈল রং বিভিন্নভাবে পানির সঙ্গে মিশায়, সেটাকে হালকাভাবে ঝাঁকিয়ে নেয় এবং তার দ্বারা তাদের কাগজ ভিজিয়ে নেয়। ফলে কাগজ চ্যামলেট বা মার্বেলের ন্যায় রেখায়িত হয়ে ওঠে।

ষোড়শ শতকের শেষদিকে পাশ্চাত্যে যেসব বই বাঁধাই হতো সেগুলিতে প্রাচ্য ে কে আমদানি করা মার্বেল পেপার দেখা যায়। কিন্তু এরও প্রায় একশ বছর পরে ইউরো ীয় বাইণ্ডাররা এই কাগজ উৎপাদন শুরু করেন। হাতের তৈরি মার্বেল কাগজ বর্তম নে

www.waytojannah.com

Contents

কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। অনুকরণমূলকভাবে উৎপাদিত কাগজই বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

ইউরোপ এক হাজার বছরেরও বেশি কাল পর্যন্ত মুসলিম শিল্পকর্মকে একটি বিস্ময়ের বস্তু হিসাবে দেখে। প্রথমে এ কারণে তারা বিস্মিত হয় যে, এটি এমন সব দেশের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল যেগুলিকে উত্তরাধিকার সূত্রে খৃষ্টান বলে মনে করা হতো। পরবর্তীকালে এর নিজস্ব সৌন্দর্যের জন্যই তারা বিস্ময় বোধ করে। মধ্যযুগীয় ভক্তি–শ্রদ্ধার কারণেই বহু সুন্দর সুন্দর শিল্পকর্ম সংরক্ষিত হয়। কারণ যেসব শিল্প নিদর্শন যুগের পর যুগ ধরে গির্জাগুলিতে সুরক্ষিত থাকে তাদের সংখ্যা কম নয়। এখানে খলীফার জুয়েল–কেস হিসাবে ব্যবহৃত কৌটা পবিত্র স্মৃতিচিহ্নের ভাণ্ডারে পরিণত হয়। এর মধ্যে পবিত্র ভূমি থেকে হয়ত মুসলমানদের কোন রাজকীয় পোশাক থেকে কেটে নেওয়া এক টুকরো অপরূপ রেশমী বস্ত্র ছিল। এসব জিনিসের প্রতি অতিরিক্ত ভক্তি–শ্রদ্ধার যথেষ্ট কারণও ছিল। এগুলির উপর যেসব অদ্ভুত ছবি ও রহস্যজনক লেখা থাকতো সেগুলিকে কোন কোন সময় ট্যালিসম্যান (জাদুকরি কবচ) এবং হযরত সোলায়মানের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জিনিস মনে করা হতো। মধ্যযুগে স্থাপত্য আর কিছু না হোক রোমান্টিক ছিল। শার্লেমনকে প্রদত্ত হারুনুর রশীদের উপহার কিংবা সেন্টলুই কর্তৃক প্রাচ্য থেকে সংগৃহীত শিল্প নিদর্শনের ন্যায় যেসব উল্লেখযোগ্য শিল্প সম্পদকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত পবিত্র মনে করা হতো, গবেষণার মাধ্যমে কেবলমাত্র বিগত শতকেই এই শ্রদ্ধামূলক মনোভাবে সন্দেহ আরোপ করা হয়। কিন্তু এই সন্দেহ সত্য হোক কিংবা মিথ্যা হোক এগুলির অপরূপ সৌন্দর্য নিঃসন্দেহে বাস্তব। যেসব শ্রেষ্ঠ অবদানকে প্রত্যেক কারুশিল্পী শ্রদ্ধা করে সেগুলি সবসময় উপেক্ষিত পাশ্চাত্যে শিল্পচর্চায় নিষ্ঠাবান শিল্পকর্মীদের জন্য একটি প্রেরণা ছিল।

খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ভাব বিনিময় ক্রুসেডের বহু পূর্ব থেকেই শুরু হয়। স্পেনে পশ্চিম ইউরোপের একেবারে দ্বারপ্রান্তে ইসলাম দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রথম থেকেই খৃষ্টান সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে। সিসিলিতে দুটি ধর্ম সাধারণ ভূমিতে অবস্থান করে। উত্তর আফ্রিকা সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয় এবং এখান থেকে মুসলিম জাহাজগুলি ভূমধ্যসাগরের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বিচরণ করে।

ক্রুসেডের সঙ্গে একটি নতুন যুগের সূচনা হয়। বিস্মিত খৃষ্টান জগতের কাছে স্যারাসেন নামে পরিচিত অর্ধ–রূপকথার শিল্পসৌকর্য বাস্তবতা লাভ করে। ইউরোপের প্রত্যেকটি অঞ্চল থেকে আকস্মিকভাবে দলে দলে লোক এমন এক সামাজিক ব্যবস্থার গভীর সংস্পর্শে আসে যা প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের সংকীর্ণ অভিজ্ঞতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। বিদেশী প্রগতির সংস্পর্শে শীঘ্রই তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া সূচিত হয়। শিল্পক্ষেত্রে এই প্রভাব কোন অংশে কম সুদূর প্রসারী ছিল না। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে

www.waytojannah.com

সঙ্গে ইটালীয় বণিকরা সিরীয় বন্দরগুলির সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করে, প্রাচ্য বাণিজ্য নিয়মিতভাবে সংগঠিত করা হয় এবং মুসলিম শিল্প কেন্দ্রগুলি থেকে সর্বপ্রকার দুষ্প্রাপ্য জিনিস ইউরোপীয় বাজারসমূহে গিয়ে পৌঁছে। এসব আমদানি নতুন নতুন প্রয়োজন মেটায়। এগুলি যেখানে যায় সেখানেই প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে এবং সঙ্গে সঙ্গে কিংবা অদূর ভবিষ্যতের জন্য সূক্ষ্ম পন্থায় উন্নতির নতুন নতুন দিক উন্মোচিত করে।

যে গুরুত্বপূর্ণ যুগসন্ধিক্ষণে পাশ্চাত্য মধ্যযুগীয় অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসছিল তখন কতগুলি শক্তির উদ্ভব হয় এবং তা ধর্মীয় প্রেরণার দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। এসব শক্তি সামগ্রিকভাবে বাণিজ্যিক তৎপরতার মধ্যে গড়েওঠা অপর একটি ক্ষমতার পর্যায়ে প্রবেশ করে। পঞ্চদশ শতকে ইউরোপীয় কারুশিল্পীগণ রেনেসাঁর জন্য অপরিহার্য আড়ম্বরপূর্ণ ও লাভজনক শিল্পচর্চায় মুসলমানদের সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন উদ্যমে প্রাচ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মুসলিম পদ্ধতিগুলি গভীরতরভাবে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করে তারা তাদের নিজস্ব পদ্ধতিগুলির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করেন। এমনিভাবে তারা যেসব অলংকারমূলক অবদান লাভ করেন সেগুলি কেবল আয়ত্ত করেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তারা মুসলিম নকশার রীতিনীতিগুলি গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে শুরু করেন এবং সেগুলিকে এমন এক নতুন শিল্প সাধনার প্রেরণায় অঙ্গীভূত করেন যা ধারণার দিক দিয়ে পুরোপুরি ইউরোপীয়। কেবল ছোটখাট কারুশিল্পীরাই নন, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির ন্যায় অসাধারণ ব্যক্তিরাও প্রাচ্যের অলংকার শিল্প নিয়ে পরীক্ষা–নীরিক্ষা করেছেন। তিনি ৭২ নং চিত্রের নকশাটি তার একটি নোট বুকের খসড়া রেখাচিত্র থেকে রূপায়িত করেন। এত দ্বারা এ ধরনের পর্যালোচনায় তাঁর আগ্রহ সূচিত হয়েছে।

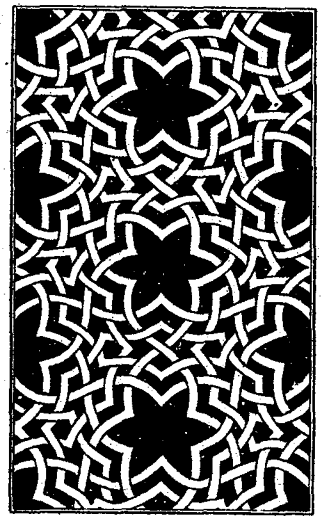

চিত্র-৭২. লিওনার্দো দ্য ভিন্সির আঁকা থেকে তৈরি ইসলামী নকশা

সব সময় প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ থেকে এসব অভিনবত্বের সূচনা হয়নি। ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে এ ধরনের প্রেরণা সৃষ্টিকারী একটি নতুন পদ্ধতির উদ্ভব হয়, এবং তা হচ্ছে 'নকশার বই'। এটি মুদ্রণযন্ত্রের একটি সমৃদ্ধ অবদান। মূল সূত্রসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা যাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না তারা এ ধরনের সংগ্রহের মাধ্যমে নতুন রীতিতে প্রখ্যাত শিল্পীদের গবেষণামূলক কাজের সঙ্গে পরিচিত হন। ফ্রান্সিস্কো ডি

www.waytojannah.com

পেলেগরিনোর[১] একটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ নকশার বইগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার দৃষ্টান্তগুলি সামগ্রিকভাবে মুসলিম নমুনা থেকে নেওয়া হয়েছে। এটি এবং পিটার ফ্লন্টার, ভার্জিল সলিস ও মার্টিনাস পেট্রাস প্রমুখের সমসাময়িক নকশার বই থেকে হোলবিন কর্তৃক অংকিত নকশাগুলির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে। রৌপ্যকার ও অন্যান্য কারুশিল্পীর জন্য তিনি যেসব নকশা অংকন করেছেন সেগুলিতে মুসলিম শিল্প প্রেরণাকে অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে একটি মৌল রীতিতে রূপায়িত করা হয়েছে।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ওলন্দাজ ও ইংরেজ প্রতিষ্ঠানগুলি ভাস্কোদাগামার ভারত অভিযানের সুফল ভোগ করতে থাকে। প্রাচ্য থেকে সরাসরি একটি নতুন বাণিজ্যের ধারা ক্রমবর্ধমানভাবে অব্যাহত থাকে এবং তা প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হস্তশিল্প দ্রব্যকে প্রভাবিত করে। এসব দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় তা মিটানোর জন্য এমনসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় যা আধুনিক শিল্পোন্নয়নকেও ম্লান করে দেয়। মুসলিম এশিয়া থেকে বাহ্যত তুচ্ছ বহু জিনিস আসতে থাকে যা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে এবং তা কেবল ইউরোপেই নয়, সমগ্র সভ্য জগতে ছড়িয়ে পড়ে। জাহাজ ভর্তি তুলা ও উজ্জ্বল বর্ণের নকশা সম্বলিত 'চিন্টজ' (সুতি কাপড়) বস্ত্রের ক্ষেত্রে নতুন প্রচলনের সূচনা করে। এর ফলে প্যারিসের উপকণ্ঠে বস্ত্রশিল্পের বিকাশ হয়, রানী অ্যানের আমলে মহিলারা সুদর্শন পোশাক লাভ করেন এবং পরবর্তীকালে ম্যানচেস্টার সম্পদশালী হয়ে ওঠে। পারস্য থেকে নতুন 'শাল' আসতে থাকে। প্রাচুর্যের অধিকারী 'নবাবরা' ভারত থেকে সম্ভবত মোগলদের জলপাত্রের অনুকরণে নির্মিত বিভিন্ন ধরনের চা ও কফির পাত্র নিয়ে আসেন। এগুলি ভিক্টোরিয়া যুগের ব্রেকফাস্টের টেবিলে সাধারণ ব্যবহার্য জিনিসে পরিণত হয় এবং কিছুটা সংশোধিত আকারে বর্তমান যুগেও অব্যাহত রয়েছে।

পাশ্চাত্যের শ্রদ্ধাভক্তি, শিক্ষা গ্রহণ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৌতূহল ইসলামের সূচনা থেকে মুসলিম নিপুণতার স্বাক্ষর বহনকারী জিনিসসমূহে প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের রুচির খোরাক লাভ করেছে। কিন্তু তাদের কারিগরি দক্ষতা ও সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিল্পীরা এমন একটি তহবিল থেকে পাশ্চাত্যের শিল্পকে ক্রমাগত উজ্জীবিত করে আসছে যা আমাদের কাছে কেবল একটি উত্তরাধিকারই নয়, বরং আমাদের পোষণকারী একটি বার্ষিক বৃত্তিও বটে। ১২৮৬ খৃস্টাব্দে ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবের প্রেসবিটারির মার্বেল পাথরের মেঝেতে খচিত করে ইসলামী নকশা অংকনকারী রোমের ওডারিকাস এবং ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে নিজস্ব মখমলের উপর অপর একটি নকশা অংকনকারী উইলিয়াম মরিসের ন্যায় প্রখ্যাত কারুশিল্পী এবং তাদের পূর্ববর্তী, মধ্যবর্তী ও পরবর্তীকালের অসংখ্য শিল্পীর কারুকার্য এই সত্যটিই প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এ. এইচ. ক্রিস্টি

১. ফ্লোরেন্সের জৈনিক চিত্রকর ও ভাস্কর। তিনি ফন্টেন ব্লুতে প্রথম ফ্রান্সিসের দরবারে শিল্পচর্চা করতেন এবং ফ্রান্সে ফ্রান্সিস্কো ডি পেলেগ্ রিন নামে পরিচিত ছিলেন। লা ফ্লিউর ডি লা সায়েন্স ডি পোর্ট্রেকচার : প্যাটন্স ই ব্রডারি, ফ্যাকন অ্যারাবিক এট ইটালিক শিরোনামে ১৫৩০ খৃস্টাব্দে তার গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্যাস্টন মিজিওমের পরিচিতিসহ এর একটি প্রতিরূপ সংস্করণ প্যারিস থেকে ১৯০৮ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

www.waytojannah.com

ইসলামী শিল্পকলা এবং ইউরোপের চিত্রকলার ওপর এর প্রভাব

সপ্তদশ শতকের আগে মুসলিম চিত্রশিল্প ইউরোপে আনা হয়েছিল কিনা তার কোন প্রমাণ নেই। রেমব্রান্টকেই প্রাচ্যের শিল্পকলার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহশীল পাশ্চাত্যের প্রথম চিত্রকর মনে করা হতো। দূরপ্রাচ্য থেকে কতিপয় চিত্র হল্যাণ্ডে পৌঁছার পর তিনি সেগুলি নকল করেন। এগুলি ছিল দিল্লীর রাজকীয় পরিবারের সদস্যদের ছবি।[১]

অতএব, ইউরোপে ব্যক্তিগতভাবে কোন শিল্পীর উপর মুসলিম বিশ্বের চিত্র শিল্পের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল না। তেমনি মুসলিম প্রাচ্যের প্রভাব কোন বড় রকমের চিত্রকলার আন্দোলনকে অনুপ্রাণিতও করেনি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ক্ল্যাসিক্যাল শিল্পের প্রতি নতুন আবেগের ফলে ইটালীয় চিত্রকলায় যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয় সেরূপ শিল্প চর্চায় মুসলমানদের কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। খুঁজে পাওয়া গেলেও তা বাহ্যিক। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে আরব প্রাধান্যের প্রাথমিক যুগেই এগুলি দেখা যায়। প্রাচ্যের নকশীবস্ত্র থেকে কিছু কিছু জীবজন্তুর ছবি নকল করা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একাদশ শতকে বিবলিওথেক ন্যাশনেলে (জাতীয় গ্রন্থাগার) বীটাসের অ্যাপক্যালিপসের টীকার পাণ্ডুলিপিতে এবং মধ্যযুগের প্রথম দিকের অন্যান্য কতিপয় পাণ্ডুলিপিতে এসব চিত্র দেখা যায়। কিন্তু মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গে খৃস্টান বিশ্বের সরাসরি যোগাযোগ এবং প্রাচ্যের শিল্প সৌকর্যমূলক জিনিস আমদানির ফলে ভাস্কর্য, স্থাপত্য কিংবা ধাতব শিল্পকর্মে যতটা অবদান সৃষ্টি হয়েছে চিত্রকলার ক্ষেত্রে তা আদৌ হয়নি। প্রাচ্যের উপাদানসমূহের কারুকার্যমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রেই প্রধানত এর ভূমিকা দেখা যায় এবং সেখানেও ছোটখাট ব্যাপারেই তা সীমাবদ্ধ থাকে। এসব কারুকার্যমূলক উপাদান মুসলমানদের উৎপাদিত রেশমী বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্প উপকরণ আমদানির মাধ্যমে পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এলেও এগুলি একান্তভাবে মুসলমানদের উদ্ভাবিত বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। মুসলমানরা তাদের পূর্বসূরিদের কাছ থেকে যেসব জিনিস লাভ করেছে সেগুলিও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতীতের এ ধরনের শৈল্পিক সম্পদের মধ্যে কালডিয়ার পবিত্র বৃক্ষের ন্যায় অত্যন্ত প্রাচীন কতিপয় প্রচলিত নকশাও রয়েছে। এই নকশাটি সাসানীয় শিল্পকলার মধ্য দিয়ে মুসলিম যুগে এসেছে। আদিম রীতি অনুসারে এই জীবন বৃক্ষটির দুপাশে দুটি জন্তু পরস্পরের মুখোমুখি থাকে। কিন্তু খৃস্টান

১. ল্যাট্‌ (জে এবারসোল্ট, *ওরিয়েন্ট এট্‌ অকসিডেন্ট* পৃ. ৯৯, প্যারিস, ১৯২৮)।

www.waytojannah.com

Contents

শিল্পীরা প্রায়ই পবিত্র বৃক্ষের কেন্দ্রীয় উপাদানটি পরিহার করেছে। মুসলিম পূর্ববর্তী আদিম যুগের অন্যান্য চিত্রের মধ্যে একটি অপরটির শিকার দুটি জন্তু এবং একই দেহ ও দুই মস্তক বিশিষ্ট জন্তুর ছবি উল্লেখযোগ্য। এগুলি চিত্রকলার চাইতে ভাস্কর্যের মধ্যেই বেশি দেখা যায় এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে প্রায়ই অনুরূপ খোদাই শিল্প থেকে নকল করে গির্জার ক্যাপিটাল (স্তম্ভের শীর্ষদেশ) ও বাস-রিলিফে (পটভূমি থেকে উঁচু) খোদাই করা হয়।[১] দ্বিতীয় রজারের (১১০১-৫৪খৃ.) পালেরমোর প্যালেটাইন চ্যাপেলের নকশাশিল্পীদের ন্যায় যেসব মুসলিম শিল্পী মধ্যযুগের প্রথম দিকে খৃস্টান পৃষ্ঠপোষকদের জন্য কাজ করেন তাদের শিল্পকর্মে এধরনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।[২]

ক্রুসেডের আমলে মুসলিম প্রাচ্যের সঙ্গে অধিক পরিমাণ যোগাযোগের ফলে মুসলমানদের আলংকারিক উপাদান সম্বলিত জিনিসপত্রের বিশেষভাবে আমদানি ঘটে। এ সময় জেনোয়া, পিসা ও ভেনিসের ন্যায় বাণিজ্যিক যোগাযোগ কেন্দ্রের দেশগুলিতে চিত্রশিল্পে এসব উপাদান প্রচলিত হয়। এর ফলে প্রধানত অপরিচিত জিনিসের প্রতি কৌতূহল ও আকর্ষণ থেকে প্রাচ্য বিশ্বের প্রতি একটি আগ্রহের সৃষ্টি হয়। এর প্রতিফলন ঘটে সিয়েনীয় চিত্রকলার প্রাথমিক দ্রব্যগুলিতে এবং তা আরো প্রাধান্য পায় টুসকান শিল্পে। চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই এসব ইটালীয় চিত্রে পাগড়িওয়ালা ছবি ও প্রাচ্যের মুখাবয়ব পরিদৃষ্ট হয়। কোন পবিত্র দৃশ্যে এসব বিদেশী ছবি সাধারণত প্রাধান্য পায় না। কেবলমাত্র আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রেই প্রাচ্যের প্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। যেমন, পারস্য ও অন্যান্য কার্পেটের প্রতিলিপিতে, অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রাচ্যের পোশাকে এবং চিতা বাঘ, বানর ও তোতা পাখির ন্যায় ভিনদেশী জীবজন্তুর প্রচলনে। বিস্তারিত প্রাকৃতিক দৃশ্যেও প্রাচ্যের নকশার ইচ্ছাকৃত অনুকরণমূলক গাছপালা ও পত্রপুষ্প দেখা যায়।

কারুকার্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রায়ই আরবী হস্তলিপি ব্যবহারের মধ্যে একটি বিশেষ প্রাচ্য বৈশিষ্ট্য ধার করার প্রমাণ পাওয়া যায়। এটি খৃস্টান শিল্পীদের উপর মুসলিম শিল্পের সরাসরি প্রভাবের অন্যতম প্রধান দৃষ্টান্ত যা ইউরোপীয় পণ্ডিত ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে আড্রিয়েন ডি লং পারিয়ার কর্তৃক *রিভিউ আর্কিওলজিক*-এ তাঁর নিবন্ধ 'ডি এল এমপ্লয় ডেস কারেক্টার্স অ্যারাবেস ড্যান্স এল অর্নামেন্টেশন, চেযলেস পিউপল্স ক্রেটিয়েন্স ডি এল অকসিডেন্ট' প্রকাশিত হওয়ার পর ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় এর দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হয়। *বার্লিংটন ম্যাগাযিন*-এ মিঃ এইচ ক্রিস্টির অত্যন্ত সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলিতে (১১শ ও ১২শ

---

১. এগুলির একটি দীর্ঘ তালিকা সংকলিত হয়েছে, দ্রষ্টব্য-আঁদ্রে মাইকেল, *হিস্টরি ডি লার্ট টি.* আই ২ মি পার্টি, পৃ. ৮৮৩ এস কিউ কিউ (প্যারিস, ১৯০৫), এ ম্যারিগনান, আন হিস্টারিয়েন ডি লার্ট ফ্ল্যাঙ্কয়েস লুই কোরাজড (৪র্থ অধ্যায়, এল' ইনফ্লুয়েন্স ওরিয়েন্টেল সুর লেস প্রভিন্সেস ডু নর্ড এট্ ডু মিডি ডি এল ইটালী) (প্যারিস, ১৮৯৯)।

২. এ প্যাভলভস্কী 'ডেকোরেশন্স ডেস প্ল্যাফন্ডস ডি লা চ্যাপেল প্যালাটাইন' (বাইযেন্টিনিস্চ্ যিটসচারিফ্ট, ২য়, ১৮৯৩)।

www.waytojannah.com

Contents

সংখ্যা 'দি ডেভেলপমেন্ট অব অর্নামেন্ট ফ্রম অ্যারাবিক স্ক্রিপ্টস্)। ইটালীয় চিত্রকলায় চিত্রকর জটোর আমলেই এ ধরনের আরবী বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কারুকার্যের ব্যবহার দেখা যায় (যেমন পাডুয়ার অ্যারেনা চ্যাপেলে রিসারেকশন অব ল্যাযারাসে যিশুখৃস্টের ছবির ডান কাঁধের উপর)। এ ধরনের কারুকার্যের জন্য ফ্রা অ্যাঞ্জেলিকো এবং ফ্রালিপ্পো লিপপি (চিত্র ৭৩) বিশেষভাবে জনপ্রিয়। এখানে স্পষ্টত এ ধরনের নকশার মূল পরিচয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা থেকে ভার্জিনের আস্তিন এবং তাঁর পোশাকের প্রান্তভাগেও এই নকশা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাচ্য থেকে আমদানিকৃত বহু ধরনের রেশমী ও সুতিবস্ত্র কিংবা প্রদীপ ও অন্যান্য পিতলের পাত্রই তাদের এ ধরনের নকশা জ্ঞানের সূত্র।

টমাস আর্নল্ড

গ্রন্থপঞ্জি

স্যার টমাস ডব্লু আর্নল্ড, *পেইন্টিং ইন ইসলাম, এ স্টাডি অব দি প্লেস অব পিক্টোরিয়াল আর্ট ইন মুসলিম কালচার*, অক্সফোর্ড ১৯২৮।

www.waytojannah.com

Contents

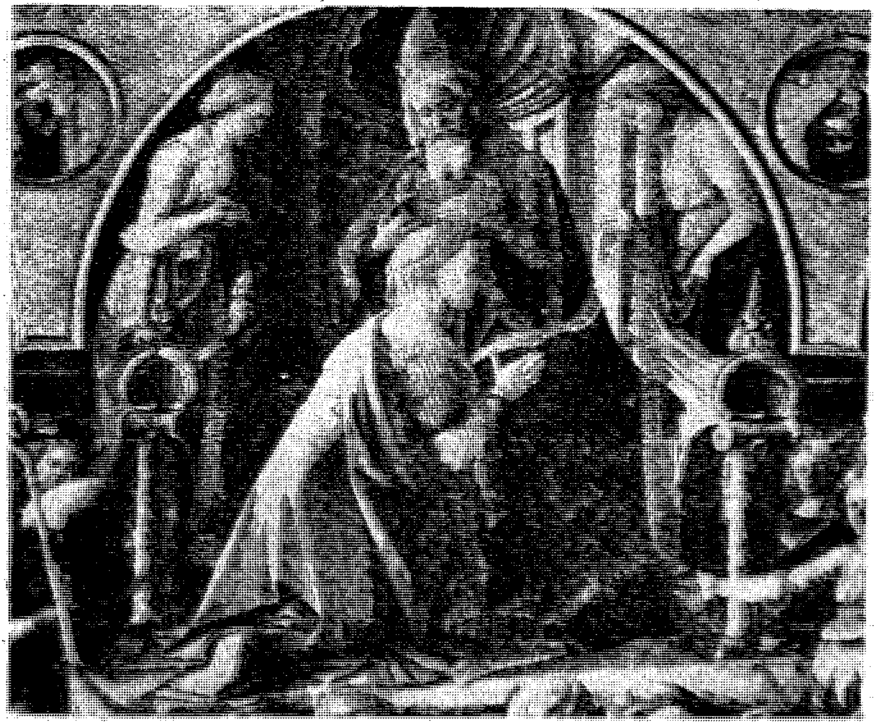

চিত্র-৭৩. অলংকরণ ও সাজসজ্জার ক্ষেত্রে আরবী হরফের ব্যবহার ঃ মাঝখানের দৃশ্যটি উফিজি ফ্লোরেন্স-এ ফ্রা লিপ্পো-লিপ্পির 'কুমারীর রাজ্যাভিষেক' থেকে নেওয়া উপরে দৃশ্যের একটি অংশের বর্ধিত রূপ যেখানে স্বর্গীয় দূতগণের ধরে রাখা ওড়নায় আরবী হরফ দেখা যাচ্ছে

www.waytojannah.com

স্থাপত্য শিল্প

এখন থেকে একযুগ পরে হয়তো কিছুটা আস্থার সঙ্গে স্থাপত্য শিল্পে মুসলিম বিশ্বের অবদান নিরূপণ করা সম্ভব হবে। অনুসন্ধানমূলক জ্ঞানচর্চার বর্তমান অবস্থায় মুসলিম স্থাপত্যের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে এতটা সন্দেহ বিরাজ করছে যে, কেবলমাত্র ঘোরতর পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তিই তার যুক্তি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পারে। এটি দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার যে, অতি সাম্প্রতিক গবেষণা যেখানে অনিশ্চিত বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করার কথা, সেখানে তা আমাদের কাছে বিতর্কমূলক যুক্তি হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এসব ব্যাপার পরিণত যুগে মুসলিম স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কিংবা পাশ্চাত্য বিশ্বে স্থাপত্যের বিবর্তনে এর প্রভাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। এগুলি বরং এর উদ্ভব এবং প্রাথমিক ভবনগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাপার। এতদসত্ত্বেও মানবজাতির জন্য এর অবদানের ক্ষেত্রে এগুলির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে, কারণ এগুলি মূলত ইসলামী এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া না গেলে আমরা তাকে অবাধে ইসলামের অবদান হিসাবে মেনে নিতে পারি না। অপর কথায়, কারো কারো মতে মুসলিম স্থাপত্যে এমন বহু জিনিস রয়েছে যা অমুসলিম জাতিসমূহ থেকে ধার করা। কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি এমনও মনে করেন যে, মুসলমানরা শুধুমাত্র স্থাপত্য রীতি ধার করেছেন এবং তাদের কোন উল্লেখযোগ্য নিজস্ব স্থাপত্য শিল্প নেই। এই মৌল প্রশ্নে উপসংহারে পৌঁছতে হলে সাধারণভাবে মুসলিম স্থাপত্যের উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রথমে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আবশ্যক।

আরবরা অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যেই হেজাজ থেকে পশ্চিমে হারকিউলেসের পিলার পর্যন্ত[১] এবং পূর্বে ভারতের সীমানা পর্যন্ত মরুভূমির ঘূর্ণিঝড়ের ন্যায় অগ্রসর হয়। যেসব দেশ ইতিপূর্বে সভ্যতা লাভ করে সেগুলি জয় করে। রোমান সাম্রাজ্যে সর্বাধিক উন্নতির যুগে যতোটা প্রসার লাভ করেছিল তারা তার চাইতে বিস্তৃততর এলাকায় নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে এবং এমন বহু জাতি তাদের কর্তৃত্বাধীনে আসে যাদের স্থাপত্য রোম থেকে পৃথক ধরনের ছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের সভ্যতা রোম থেকে প্রাচীনও ছিল।

যারা আমাদের মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্য স্থাপত্যের প্রধানত রোমান সূত্রে বিশ্বাস করেন এবং যারা এর প্রত্যেকটি ব্যাপারে ইরান বা আরমেনিয়ার সূত্র আরোপ করেন তাদের তীব্র

---

১. জিব্রাল্টার প্রণালীর দুই দিকে সমুদ্র তীরবর্তী দুটি পার্বত্য ভূখণ্ড--একটি স্পেনের জিব্রাল্টারে এবং অপরটি উত্তর মরক্কোর জেবেল মুসায় অবস্থিত।-অনুবাদক।

www.waytojannah.com

Contents

বিতর্কের প্রেক্ষিতে প্রকৃত অবস্থা যাই হোকনা কেন, একটি বিষয় ক্রমেই পরিষ্কার হচ্ছে যে, শেষোক্ত বিষয়টির প্রতি আমাদের আরো গভীর মনোযোগ দেওয়া উচিত। আরমেনিয়া, মেসোপটেমিয়া ও তুর্কীস্তানে কতিপয় উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার কিছুটা বাদ–বিসম্বাদের সৃষ্টি করলেও তা আমাদের অতি–রোমান মনোভাবকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। এমনো হতে পারে আমাদের 'রোমানেস্ক' ও গথিক ভবনগুলি রাজকীয় রোমের ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে রাজকীয় কর্তৃপক্ষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে বিশ্বাস পোষণ করতেন কিংবা রেনেঁসার পাণ্ডিত্যাভিমানী মানবতাবাদীরাও যা বিশ্বাস করতেন তা ভুল ধারণা প্রসূত। কারণ যাই হোক, একথা সুস্পষ্ট যে, বর্তমানে একটি নিরপেক্ষ মন নিয়ে আমাদের প্রাচ্যের দিকে তাকাতে হবে এবং প্রথমেই 'প্রাচ্যকে' একটি একক সত্তা হিসাবে মনে করার অভ্যাস পরিহার করতে হবে। আমরা রোমের কাছে ঋণী এই সত্যের প্রতি কেউ কদাচিৎ সন্দেহ পোষণ করে, কিন্তু আমাদের এই বাধ্যবাধকতার সীমা পুনর্বিবেচনার সময় এসেছে।

আরব বিজয়ীরা যেসব অঞ্চল অধিকার করে তার মধ্যে সিরিয়া, আরমেনিয়ার অংশবিশেষ এবং মিসরসহ উত্তর আফ্রিকার বসবাস উপযোগী অঞ্চলগুলি পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য থেকে অধিকৃত হয়। স্পেন ভিসিগথদের কাছ থেকে অধিকৃত হলেও ইতিপূর্বে এটি একটি রোমান প্রদেশ ছিল। মেসোপটেমিয়া থেকে তুর্কিস্তান পর্যন্ত ভূখণ্ড এবং আফগানিস্তান দ্বিতীয় খসরুর সাবেক সাসানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খৃষ্ট ধর্ম আর্মেনিয়ার পূর্ব সীমান্ত ও সিরিয়া পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রবেশ করে। সুদূর দক্ষিণে ইয়েমেনের সানায় (দক্ষিণ আরব) ষষ্ঠ শতকের একটি গির্জা ছিল।[১] অতএব, বিজয়ীরা তাদের প্রত্যেকটি প্রদেশের প্রজাদের মধ্যে দক্ষ স্থপতিদের তৈরি অবস্থায় পায়। তাছাড়া তারা এমন বহু সংখ্যক ভবনও পায় যেগুলিকে তারা তাদের পূর্ববর্তী কপটিক (প্রাচীন মিসরীয়) ও ভিসিগথিক খৃস্টানদের ন্যায় পাথরের খনি হিসাবে ব্যবহার করে। এই অনস্বীকার্য বাস্তব অবস্থা থেকে অনেক কিছুর উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, আরবরা তাদের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলিতে এমনসব স্থানীয় নির্মাণ শিল্পীর সাক্ষাত পান যাদের নির্মাণ রীতি রোমানদের রীতির চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল এবং কোন কোন বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হলে তারা বাইযেন্টাইন স্থপতিদের এমনসব ব্যাপারে শিক্ষাদান করেছেন যার ফলে বাইযেন্টাইন স্থাপত্য রোমান স্থাপত্য থেকে আলাদা রূপ লাভ করে।

প্রাথমিককালের আরব বিজয়ীদের কোন স্থাপত্য দক্ষতা বা রুচি ছিল না বলে যে সাধারণ ও যুক্তিযুক্ত অভিমত দেওয়া হয় সে সম্পর্কে কোন বিতর্কে যাবো না। কারণ

১. বি এবং ই এম হুইসাও, অ্যারাবিক স্পেন (লণ্ডন, ১৯১২), পৃ ১২২।

www.waytojannah.com

আপাত দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে তেমনটিই মনে হতে পারে। তারা যে বীজয় গৌরবে দীপ্ত তা কেবল ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ একটি সৈনিক জাতির পক্ষেই সম্ভব, যাদের সময় প্রধানত সংগ্রাম ও ইবাদতেই অতিবাহিত হয়। তাছাড়া তারা শহরে বসবাসকারী ছিলেন না, তারা ছিলেন নিয়ত মুসাফির। তারা যখন যুদ্ধবিগ্রহ ছেড়ে শাসনকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখনো নির্মাণ শিল্পের কারিগরি দক্ষতার জন্য স্থানীয় শিল্পীদের ওপর কিংবা (এবং এই ব্যাপারটি গরুত্বপূর্ণ) একটি বিজিত এলাকা থেকে অপর এলাকায় নিয়ে আসা শিল্পীদের ওপর নির্ভর করেন। তাই জানা যায় যে, আরমেনীয় রাজমিস্ত্রীদের কেবল মিসরে নয়, স্পেনেও নিয়োজিত করা হয়। সম্ভবত ফ্রান্সের নবম শতকের জারমিখ্নি-ডেস-প্রেস গির্জার নির্মাণ কাজেও তাদের নিয়োগ করা হয়, কারণ তার মধ্যে কতিপয় মুসলিম বৈশিষ্ট্য রয়েছে।[১] কিন্তু বিজয়ের প্রাথমিক বছরগুলিতে স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে আরবদের সম্ভাব্য অজ্ঞতা সত্ত্বেও মুসলিম স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য ও নিঃসন্দেহ দিক হচ্ছে, মৌলিকভাবে বিচিত্র হয়েও এটি সকল দেশে ও সকল যুগে নির্ভুলভাবে একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখে। এর এমন একটি দিক রয়েছে, যা এটিকে সর্বপ্রকার স্থানীয় শিল্পকর্ম থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্য দান করেছে এবং এটিই কারিগরি ক্ষেত্রে তার নিজস্ব রূপের নিয়ামক।

যে কারণটি বহু বিচিত্র নির্মাণ আদর্শকে একক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একটি রীতিতে রূপান্তরিত ও রূপায়িত করেছে তা হচ্ছে সম্ভবত ইসলামের বিশ্বাস। কারণ প্রথমদিকের আরবদের নির্মিত ভবনগুলি ছিল প্রধানত মসজিদ ও প্রাসাদ এবং পরবর্তী শতকগুলিতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য শিল্প-সমৃদ্ধ ভবন নির্মিত হয় সেগুলিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছিল মসজিদ কিংবা অন্যান্য ধর্মীয় ভবন, যথা মাদ্রাসা ও মসজিদ সংলগ্ন ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র। মসজিদই ছিল আরবদের আদর্শমূলক ও প্রধান ভবন। বিভিন্ন এলাকায় আকারের দিক দিয়ে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও এগুলির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন থাকতো। মুসলিম বিশ্বের সকল এলাকা থেকে বার্ষিক হজ্জে গমন নিঃসন্দেহে একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মসজিদ সৃষ্টিতে অবদান রাখে, কারণ সুদীর্ঘ হজ্জযাত্রায় হাজীরা পথিমধ্যে স্থানীয় যে মসজিদটিতে নামায পড়তে যেতেন, সেখানে সংশ্লিষ্ট হাজী নির্মাণ শিল্পী বা স্থপতি হলে তিনি এর নকশাগুলি পর্যবেক্ষণ করতেন।

৬২২ খৃস্টাব্দে মহানবী কর্তৃক নির্মিত মদীনার আদি মসজিদটি অন্যসব মসজিদের আদর্শ ছিল। এটি ছিল চারদিকে ইট ও পাথরের প্রাচীর সমন্বিত একটি বর্গাকার বেষ্টনী। এর একটি অংশে ছাদ ছিল এবং সেটি সম্ভবত উত্তরাংশ, যেখানে মহানবী নামায পড়াতেন। এই ছাদ সম্ভবত খেজুর গাছের গুড়ির উপর খেজুর পাতাকে কাদায় আবৃত

১. জে স্ট্রৈযিগোভস্কী, অরিজিন অব ক্রিশ্চিয়ান চার্চ আর্ট (অক্সফোর্ড, ১৯২৩), পৃ ৬৪।

www.waytojannah.com

করে নির্মিত হয়। মুসল্লিরা উত্তরে পবিত্র জেরুজালেম শহরের দিকে মুখ করে সিজদা দিতেন। এবং এই দিক *(কিবলাহ্)* কোন একটি পন্থায় চিহ্নিত করা হয়। ৬২৪ খৃষ্টাব্দে জেরুজালেম থেকে মক্কার দিকে *কিব্লাহ* পরিবর্তন করা হয়, অর্থাৎ (মদীনার ক্ষেত্রে) তা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে পরিবর্তিত হয়। এরূপ একটি সাদাসিধে গৃহে কোন এলাকা থেকে স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ধার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি; কারণ স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজনও ছিল না।

পরবর্তী মসজিদটি নির্মিত হয় ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে মেসোপটেমিয়ার কুফা নগরে। মার্বেল স্তম্ভের উপরে এর ছাদ নির্মিত হয়। স্তম্ভগুলি হিরায় পারস্য রাজাদের একটি পরিত্যক্ত প্রাসাদ থেকে সংগ্রহ করা হয়। এই মসজিদটিও ছিল বর্গাকৃতির, কিন্তু এর চারদিকে প্রাচীরের পরিবর্তে পরিখা ছিল। ৬৪২ খৃষ্টাব্দে আমর কর্তৃক ফুসতাতে (কায়রো) একটি ছোট মসজিদ নির্মিত হয়। এটিও বর্গাকৃতির ছিল, কিন্তু কথিত আছে যে, এতে কোন উন্মুক্ত চত্বর *(সাহন)* ছিল না। এর মধ্যে নতুন বৈশিষ্ট্য ছিল একটি উঁচু মঞ্চ *(মিম্বর)*। কয়েক বছর পরে *ইমামকে* জনতা থেকে আলাদা রাখার জন্য এতে একটি *মাক্সুরাহর* (পর্দা বা কাঠের জাফরী) প্রবর্তন করা হয়। বলা হয়, এই শতকের সমাপ্তিতে গম্বুজের আবির্ভাব ঘটে এবং তার সামান্য কিছু দিন পরে *কিবলাহ্* নির্দেশক *মিহরাবের* প্রবর্তন হয়, (চিত্র ৭৪)। এমনিভাবে মদীনায় প্রথম মসজিদ নির্মিত হওয়ার আশি থেকে নব্বই বছরের মধ্যেই *জামি* মসজিদের সর্বপ্রকার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হয়। অন্য যেসব ছোটখাট বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হয় সেগুলি হচ্ছে *লাইওয়ানাত* (*আল–আইওয়ান*–এর অপভ্রংশ *লাইওয়ান*–এর বহুবচন) নামে পরিচিত *সাহন*–এর চারদিকের খিলান শ্রেণী এবং ওযু করার ব্যবস্থা। এই ছোট তালিকায় সকল যুগের মসজিদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার প্রধান প্রধান বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উপরোল্লিখিত মসজিদগুলির কোনটিতেই তাদের মূল কাঠামো রক্ষিত হয়নি। এমনকি পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে তাদের মূল পরিকল্পনাও হারিয়ে গেছে। কিন্তু পরিকল্পনাই হচ্ছে আসল ব্যাপার। কারণ আদি মসজিদটি কেবল একটি গৃহ ছিল এবং স্থাপত্য বলতে আমরা যা বুঝি তার কোন নিদ্দর্শন নিশ্চয়ই তাতে ছিল না। এতদসত্ত্বেও এম ভন বার্চেম[১] এই প্রাথমিক মসজিদ পরিকল্পনার মূল ধারণার সঙ্গে খৃষ্টান প্রাথমিক গির্জার তুলনা করেছেন ঃ *সাহন* আর্টিয়াম (প্রধান কক্ষ) থেকে, প্রধান *লাইওয়ান* মূল গির্জা থেকে, *মাক্সূরাহ চান্সেল*–স্ক্রিন (যাজকের জন্য সংরক্ষিত স্থান) থেকে, গম্বুজ গির্জার টাওয়ার[২] থেকে এবং *মিহরাব* অ্যাপ্স (ছাদযুক্ত অর্ধ–বৃত্তাকার স্থান) থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কিন্তু এ

১. এনসাইক্লোপেডিয়া অব্ ইসলাম ঃ প্রবন্ধ 'আর্কিটেক্চার'।

২. বর্তমানে এই মতবাদ অগ্রাহ্য করা হয়।

www.waytojannah.com

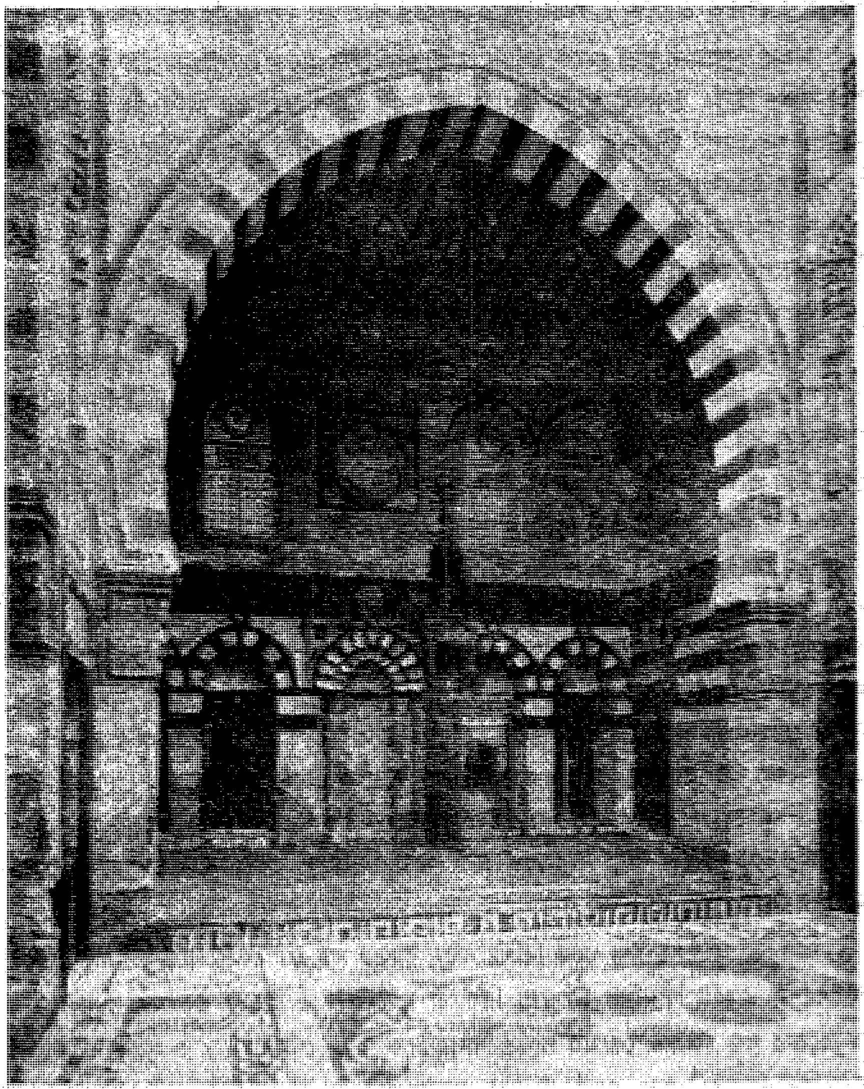

চিত্র-৭৪. কায়রোতে একটা মিউরোর কাইত বায় মসজিদের অভ্যন্তরের দৃশ্য। মসজিদের মাঝখানে সুউচ্চ মিম্বার উঠে এসছে এবং তার ডানে (ছবিতে বামে) মেহরাব দেখা যাচ্ছে

www.waytojannah.com

ধরনের অনুমানের আদৌ প্রয়োজন ছিল না কিংবা তা যথাযথও নয়।আরবরা এই ধর্মীয় বেষ্টনী ও রক্ষিত স্থানকে স্থাপত্যশিল্পে রূপান্তরের পূর্বে এর মূল সূত্রের প্রশ্ন দেখা দেয়নি।

নিছক প্রয়োজনীয়তা থেকে মর্যাদা ও জাঁকজমকের অবস্থায় পৌঁছার চেষ্টা অত্যন্ত দ্রুত গতিসম্পন্ন ছিল। ইসলামী ধর্মীয় বিধানে অনাড়ম্বর জীবন এবং বহু নিষ্ঠাবান মুসলমানের কঠোর শৃংখলাপূর্ণ জীবন যাপনের কথা বিবেচনা করলে এই প্রচেষ্টা বিস্ময়কর বৈ কি ! মহানবীর ইন্তিকালের বিশ বছরের মধ্যেই মদীনায় তার নিজস্ব মসজিদটিকে প্রাচীর ও সজ্জিত পাথরের পৈঠা দিয়ে পুনর্নির্মাণ করা হয়। ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে আরবদের জেরুজালেম বিজয়ের পর খলীফা ওমর সেখানে যে একটি স্থূল মসজিদ নির্মাণ করেন তার পাশে সপ্তম শতকের শেষের বছরগুলিতে সাধারণত 'ডোম অব দিরক' কুব্বাতুস সাখ্‌রা নামে পরিচিত একটি সুরম্য প্রাসাদ নির্মিত হয়। মাশহাদ বা স্মৃতিসৌধের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বিশালকায় এই প্রাসাদটিতে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে কারুকার্য করা হয়েছে (চিত্র ৭৫)। এখান থেকেই মুসলমানদের স্থাপত্যশিল্প সম্পর্কে এখনো যে বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে আমরা তার কেন্দ্রস্থলে প্রবেশ করছি। ডোম অব দি রক (আরবী *কুব্বাতুস সাখ্‌রাহ্‌*) একটি শ্রমসাধ্য ও সুসম্পন্ন ভবন। এটি এমন একটি *মাশহাদ* (স্মৃতিসৌধ) যেখানে তীর্থযাত্রীরা পাথরটির চারদিক প্রদক্ষিণ করে। মহানবী (সা) এখান থেকেই উর্ধ্বাকাশে আরোহণ করেছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়। তাছাড়া এটি এখনো অনুপম এবং অতন্ত চারশ' বছর পর্যন্ত উন্মুক্ত চত্বরসহ বর্গাকৃতির স্বাভাবিক জামে মসজিদটির পরিবর্তন সাধনের কোন গুরুত্বপূর্ণ চেষ্টা করা হয়নি। তাই অত্যন্ত হঠকারিতার সঙ্গে অনুমান করা হয় যে, 'ডোম অব দি রক' একটি রোমান বা বাইযেন্টাইন রীতির ভবন, এটিকে সরাসরি পৌত্তলিক বা খৃষ্টান আদর্শ থেকে নকল করা হয়েছে, এটি সম্পূর্ণভাবে খৃষ্টান শ্রমশিল্পীরা তৈরি করেছে। সুতরাং এটি আরব শিল্পকর্মের প্রধান ধারার বাইরে একটি আলাদা স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। এই অভিমতে কিছুটা সত্য থাকলেও এবং আপাত দৃষ্টিতে যথার্থ মনে হলেও তা কোন অবস্থায় জোর দিয়ে বলা যায় না।

পার্শ্ববর্তী অংশসহ উচ্চ গম্বুজ বিশিষ্ট নতুন রীতির এই ইমারতটি গড়ে তোলার পিছনে আরবদের একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল।ঐ মুসলমান ও ইহুদী উভয়ের কাছে পরম অনুরক্তের বস্তু জেরুজালেমের পবিত্র পাথরটিকে তারা গৌরবান্বিত ও সুরক্ষিত করতে চেয়েছিল। তারা এমন একটি ইমারত গড়তে চায় যা নিকটবর্তী হোলি স্পোলচারের বিখ্যাত খৃষ্টান গির্জাকে হার মানায়। নতুন *মাশ্‌হাদ* বিশাল সমতল ভূমির উপর 'হারাম শরীফ' বা পবিত্র স্থান নামে পরিচিত একটি প্রশস্ত পাথরের মালভূমির মধ্যস্থলে স্থাপন করা হয়। (একই সারিতে পরিকল্পনার কেন্দ্রস্থলের উপর ইতিপূর্বেই আল-আক্‌সা নামে একটি মসজিদ ছিল। এই আদি ভবনটির ইতিহাস এতই অস্পষ্ট ও জটিলতাপূর্ণ যে, এখানে তার

www.waytojannah.com

Contents

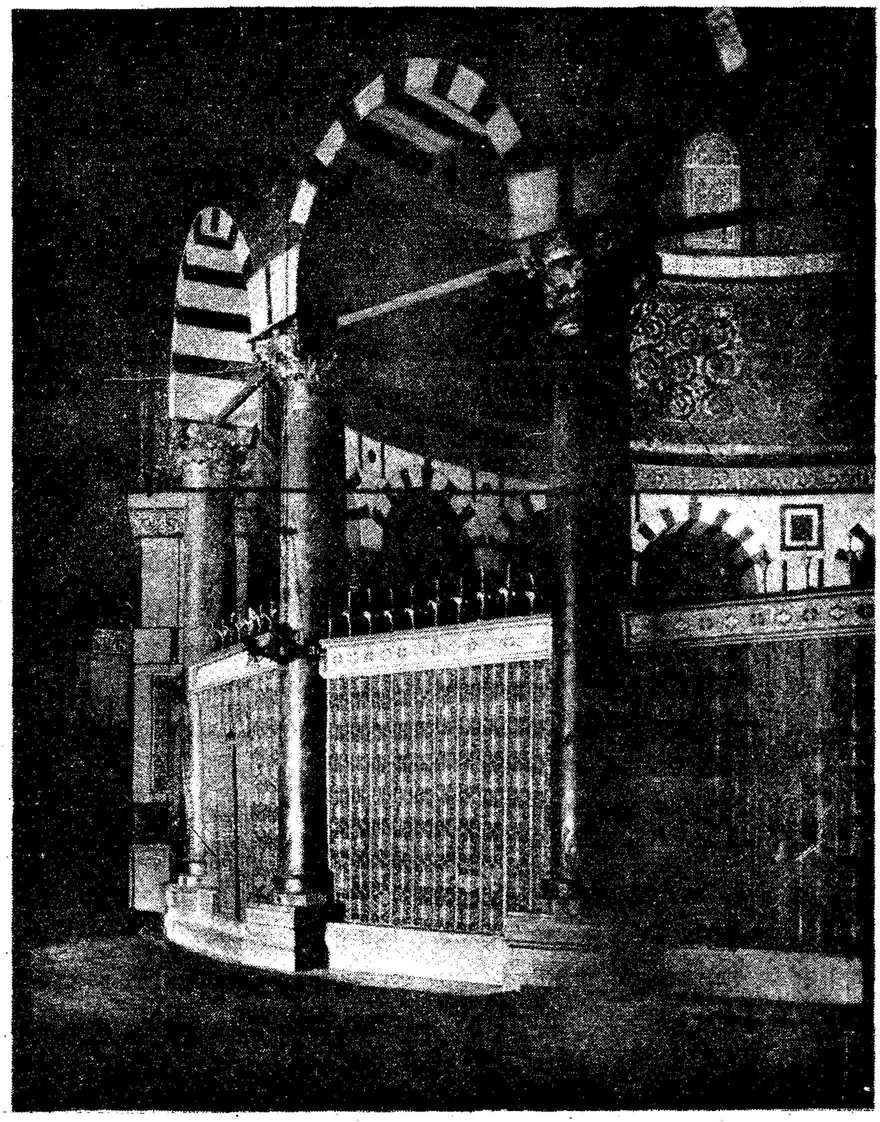

চিত্র-৭৫. জেরুজালেমে বিশালাকৃতি গম্বুজের অভ্যন্তরের দৃশ্য

www.waytojannah.com

আলোচনা নিষ্ফল।) তাদের পবিত্র স্থানের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য হিসাবে অঙ্গুরির ন্যায় গোলাকার উচ্চ গম্বুজ বিশিষ্ট ইমারতটি তৈরি করতে আরবরা অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়।একথা সত্য যে, তাদের পূর্ববর্তী রোমান বা বাইযেন্টাইনরা কোন সমাধি স্তম্ভ বা অন্যান্য পবিত্র স্থান সুরক্ষিত করার জন্য যেভাবে চূড়ান্ত ও নিয়ন্ত্রণকারী ভবন তৈরি করে এই গোলাকার গম্বুজ বিশিষ্ট ইমারতটি তৈরিতেও সেই পন্থা অনুসরণ করা হয়। কিন্তু এগুলিই বিশ্বে একমাত্র 'ডোম' (গোলাকার গম্বুজের ইমারত) ছিল না। ইরানীয় প্রেরণার প্রধান প্রবক্তা স্ট্রেযিগোভস্কীর মতে প্রাচ্যের গোলাকার গম্বুজের ইমারতের উদ্ভব এশিয়া মাইনরে কিংবা তারো পূর্বদিকে, সেখান থেকে আরমেনিয়া হয়ে বাইযেন্টিয়ামে এবং বাইযেন্টিয়াম থেকে গ্রীক যাজকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বলকান দেশসমূহে ও রাশিয়ায় এই রীতির প্রচলন হয়।[১] তাই আরবরা এখানে সর্বপ্রথম একটি গোলাকার গম্বুজের ইমারত তৈরি করলেও সেটিকে এমন এক বৈশিষ্ট্য প্রদান করেন যা একান্তভাবে খৃষ্টানও ছিল না কিংবা রোমানও ছিল না। তারা সম্ভবত পার্শ্ববর্তী বিখ্যাত *'আনাসটাসিস'* ডোমের নকল করেন। আকারের দিক দিয়ে এটি প্রায় একই রকমের। সপ্তম শতক শেষ হওয়ার বহু আগে সিরিয়া ও আর্মেনিয়ায় অবশ্যই গোলাকার গম্বুজ বিশিষ্ট গির্জা ছিল। ইতিপূর্বে ফিলিস্তিনেও 'ডোম অব দি রক' তথা একটি অষ্টভুজের অভ্যন্তরে উচ্চ গম্বুজ বিশিষ্ট গোল ইমারতের ন্যায় কয়েকটি গির্জা ছিল। অন্যান্য দিকে প্রাচীরগুলি হচ্ছে নিরেট পাথরের, আভ্যন্তরীণ খিলান পথের এবং জানালা পথের খিলানগুলি অর্ধ বৃত্তাকার এবং দুই সারিতে ব্যবহৃত স্তম্ভশ্রেণীর সবগুলি স্তম্ভ প্রাচীন। এসব স্তম্ভ পৌত্তলিক বা খৃষ্টানদের প্রাচীনতর ভবনগুলি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।তাই স্টাইলের দিক দিয়ে স্তম্ভগুলির নিচের দিকে কিংবা উপরিভাগে কোন সামঞ্জস্য নেই। খিলান শ্রেণীর নিচের দিকে বিশাল কাঠের বন্ধনী রয়েছে। এই এলাকায় যে ভূমিকম্প হতো সম্ভবত তা প্রতিরোধের জন্য কিংবা নির্মাণ শিল্পীরা শুধুমাত্র খিলানের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারেনি বলেই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। বাইযেন্টাইন ভবনগুলিতেও একই রকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা দেখা যায়। 'ডোমটিও' স্বয়ং দ্বিগুণ। পুরোটা কাঠের তৈরি বাইরের দিক সীসায় এবং ভেতরের দিক নকশা করা প্লাস্টারে মোড়ানো। কিন্তু এটি মূল কাঠামো নয়। অনেকখানি মোজাইকের কাজ মূল অবস্থায় রয়েছে। অবশিষ্ট অধিকাংশ স্থানে পরবর্তীকালে কারুকার্য করা হয়েছে। অতএব আমরা দেখতে পাই যে, 'ডোম অব দি রক'–এ যা কিছু নতুনত্ব তা হচ্ছে গোলাকৃতির পরিকল্পনা, অর্ধবৃত্তাকার খিলান, কাঠের বন্ধনী এবং সম্ভবত মোজাইক। অর্ধ–বৃত্তাকার খিলান নিঃসন্দেহে আরবদের আবিষ্কার নয়, কাঠের বন্ধনীর উদ্ভব সন্দেহজনক এবং মোজাইকের প্রাচীনতম ব্যবহার প্রাক ইসলামী যুগের।

১.'জে স্ট্রেজিগোভস্কী, ওপি, সি আইটি, পৃ. ২৭।

www.waytojannah.com

ডোম অব দি রক–এর পরে সময়ানুক্রমিকভাবে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম ভবন হচ্ছে অষ্টম শতকের সূচনায় নির্মিত দমেস্কের বিশাল জামে মসজিদ (চিত্র ৭৬)। এর প্রধান লাইওয়ান বা সংরক্ষিত এলাকা হচ্ছে একটি সুউচ্চ কক্ষ। যে খিলানপথ এটিকে *সাহন* থেকে পৃথক করেছে, সেখানে বিভিন্ন দরজা বা পর্দা রয়েছে। *সাহন*–এর অপর তিনদিক খিলান দেওয়া বারান্দায় ঘেরা। এই মসজিদের নতুন বৈশিষ্ট্যগুলি নানা রকমের।প্রধান *লাইওয়ানের* তিনটি গলিপথ একটি আড়াআড়ি পার্শ্বদেশে নিয়ে শেষ হয়েছে। পার্শ্বদেশের মাঝামাঝি উপরে একটি অর্ধবৃত্তাকার ছাদ রয়েছে। পার্শ্বদেশের প্রান্তভাগে অর্থাৎ প্রধান *লাইওয়ানের* দক্ষিণ দিকের প্রাচীরের মধ্যস্থলে *কিবলাহ* নির্দেশিত একটি *মিহরাব* রয়েছে। কেন্দ্রীয় চত্বরের চারপাশের খিলান শ্রেণী কিছু অংশ পিলপার ওপরে এবং কিছু অংশ থামের ওপরে অবস্থিত। খিলানগুলি 'অশ্বনাল' আকৃতির। কোন সুস্পষ্ট কারণ না থাকলেও এগুলি পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য মুসলিম স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য লাভ করে। অশ্বনাল গোলাকারও হতে পারে, কিংবা উপরিভাগ ছুঁচালোও হতে পারে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে এর বক্রতা নিচের দিকে থামের উপরিভাগ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। দামেস্কে গোলাকার অশ্বনাল খিলান ব্যবহৃত হয়। *সাহন*–এর চতুর্দিকে প্রধান খিলান শ্রেণীর ওপরে অর্ধবৃত্তের ন্যায় উপরিভাগ সমন্বিত সারিবদ্ধ জালানা রয়েছে। প্রতিটি খিলানের ওপর দুটি করে জানালা। যে *টেমেনস্*–এর অভ্যন্তরে মসজিদটি নির্মিত হয় তার চারকোণে এক সময় যে চারটি রোমান টাওয়ার ছিল, এবং যেগুলিকে আরবরা মিনার হিসাবে ব্যবহার করতেন তার মধ্যে বর্তমানে কেবল একটি (দক্ষিণ পশ্চিম কোণে) অবশিষ্ট আছে। বর্তমানের অপর তিনটি পরবর্তীকালে তৈরি করা হয়েছে। ভবনটির অভ্যন্তর ভাগ মার্বেল, মোজাইক এবং রঙীন কাচের জানালার সাহায্যে অপরূপভাবে সুসজ্জিত করা হয়েছে। যেসব সিরীয় গির্জাকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছে সম্ভবত সেগুলির নির্মাণ প্রণালীতে প্রভাবিত হয়েই এই মসজিদটির অস্বাভাবিক পরিকল্পনা করা হয়েছে। *কিবলাহ্র* গুরুত্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই সম্ভবত অভ্যন্তরভাগে একটি পার্শ্বদেশ এবং সংরক্ষিত এলাকার মধ্যস্থলে একটি অর্ধগোলাকার ছাদের প্রবর্তন করা হয়েছে। বর্তমানে তৃতীয়বারের[১] মত একটি *মিহরাব*–এর মাধ্যমে এই *কিবলাহ* নির্দেশিত হয়েছে। *মিহরাব* সম্ভবত একটি মৌল ধারণা। বিশ্বের যে অংশে চক্ষু রোগ অত্যন্ত সাধারণ, সেখানে এ ধরনের ব্যবস্থা স্বাভাবিক। এক সময় জনৈক বৃদ্ধ *শেখ* আমার কাছে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। *মিহরাবটি* দেওয়ালে ফাঁক সৃষ্টি করে কুলঙ্গী আকারে এ জন্য তৈরি করা হয়েছে যাতে দেওয়াল হাতড়িয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় অন্ধ লোকও তা চিনতে পারে। অথবা খৃস্টানদের 'অ্যাপ্‌স্' থেকেও ধারণাটি নেওয়া হতে পারে। প্রাক ইসলামিক যুগে পাথরে খোদাই করা অশ্বনাল খিলান দেখা যায়। কিন্তু দামেস্কের অশ্বনাল

---

১. প্রথম কুলঙ্গী–*মিহরাব* মদীনায় এবং দ্বিতীয়টি ফুসতাতে (কায়রো) ছিল।

www.waytojannah.com

Contents

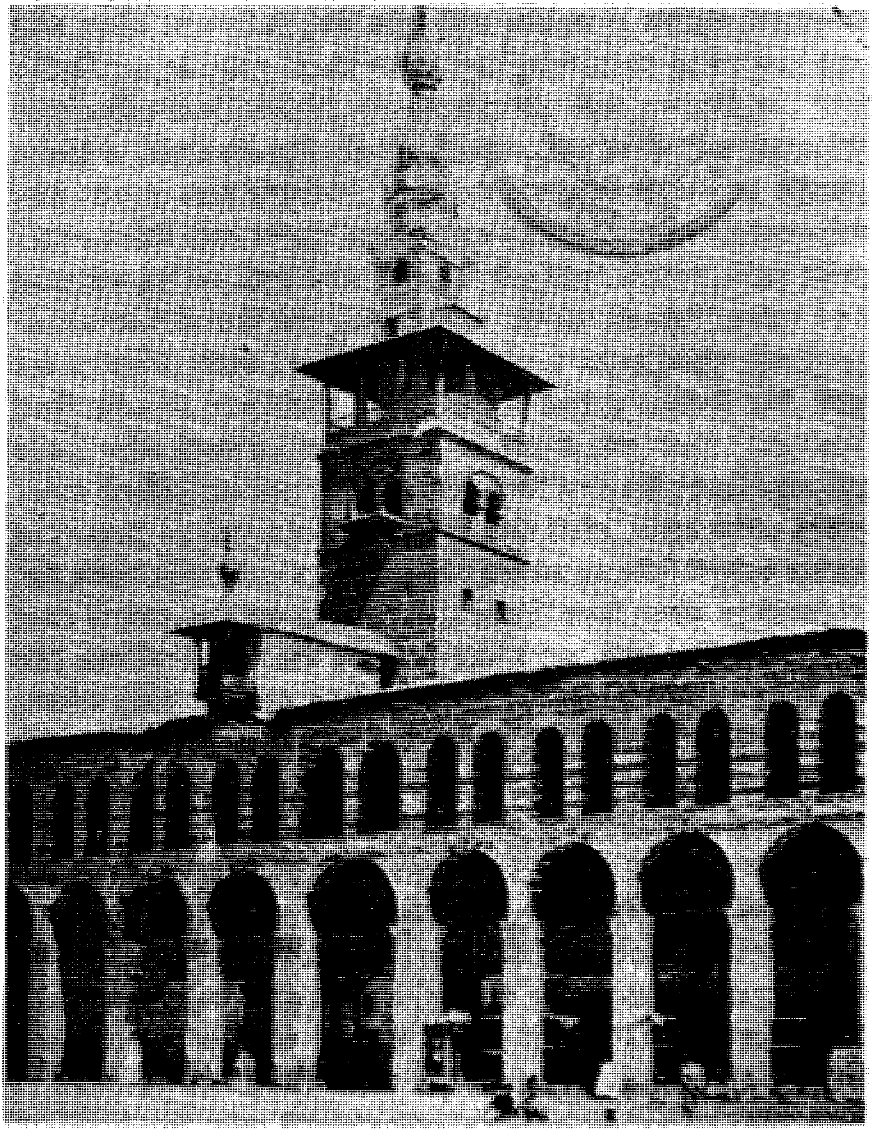

চিত্র ৭৬. দামেস্কের বড় মসজিদ

www.waytojannah.com

খিলানই প্রাচীনতম নিদর্শন, যেখানে এটিকে সত্যিকারের কাঠামোগত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। মিনারের উদ্দেশ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ঃ *মুয়াজ্জিন* কর্তৃক *আযান* দেওয়ার সুবিধার্থেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।[১] খৃষ্টান ও ইহুদীরা যেভাবে উপাসনাকারীদের আহবান জানায়, তার বিকল্প হিসাবে সম্ভবত ইচ্ছা করেই এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। খৃষ্টানরা ঘন্টাধ্বনি করে ও ইহুদীরা সিঙ্গাধ্বনি করে উপাসনাকারীদের আহবান জানায়। *আযান* দেওয়ার জন্য মিনার ব্যবহারের দৃষ্টান্ত মনে হয় দামেস্কেই প্রথম দেখা যায়।

যে প্রাচীনতম মিনারটি এখনো টিকে আছে, সেটি তিউনিসের নিকটে কায়রওয়ানের বিশালকায় জামে মসজিদে অবস্থিত। খলীফা হিশামের রাজত্বকালে (৭২৪–৪৩) এটি নির্মিত হয়। বিরাট বিশাল এই মিনারটি ক্রম সরু হয়ে উপরের দিকে উঠেছে, এর পার্শ্বদেশে ফোকর রয়েছে এবং উপরের দিকে দুটি পর্যায় রয়েছে। একটি পর্যায় পরবর্তীকালে নির্মিত হয়। এ কথা যদি সত্য হয় যে, দামেস্কের চারটি মিনারই এ ধরনের প্রথম দৃষ্টান্ত তাহলেও এরূপ ধরে নেওয়া যায় না যে, কায়রওয়ানের মিনারের ন্যায় এমন সাদাসিধা কাঠামো সিরিয়া বা অন্য কোন বিশেষ স্থানের অবদান, এটি অত্যন্ত সহজ সরল পন্থায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা মিটানোর একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। অন্যদিকে কায়রওয়ানের জামে মসজিদটির বিভিন্ন সময়ে সংস্কার সাধন করা হলেও নবম শতকের শেষভাগে যে আকারে এটি পুনর্নির্মিত হয় সেই আকারটি প্রধানত অক্ষুণ্ন থাকে। ৭৩২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত তিউনিসের যয়তুনাহ মসজিদটি জামে মসজিদের আর একটি প্রাচীন ও চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত। এর খিলান পথ প্রাচীন থামের উপর অপ্রীতিকরভাবে তৈরি কৃত্রিম খিলানের সাহায্যে নির্মাণ করা হয়েছে। থামের উপরিভাগে আড়াআড়ি কাঠের সঙ্গে যুক্ত করে কাঠের পৈঠা বা আবাসী স্থাপন করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা বহু প্রাচীন মুসলিম ভবনের সৌন্দর্য ক্ষুণ্ন করে।

স্পেনের কর্ডোভার বিরাট মসজিদটির নির্মাণ কাজ ৭৮৬ খৃষ্টাব্দে শুরু হয় এবং ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত থাকে (চিত্র ৭৭)। দশম শতকে এর এলাকা দ্বিগুণেরও বেশি সম্প্রসারিত করা হলেও বর্তমান কাঠামো গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে এখনো এর মূল আকার সম্পর্কে ধারণা করা যায়। এই জামে মসজিদটির অত্যন্ত গভীর একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। এতে খিলান শ্রেণী দ্বারা বিচ্ছিন্ন এগারটি মধ্যবর্তী পথ রয়েছে এবং প্রত্যেক খিলান শ্রেণীতে বিশটি স্তম্ভ রয়েছে। ইতিপূর্বে উল্লিখিত অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এসব স্তম্ভও প্রাচীনতর রোমান ভবন থেকে সংগৃহীত হয়েছে। সংরক্ষিত এলাকার আকার বিশাল হওয়ায় সে অনুপাতে অনেক উঁচু ছাদ দিতে হয়েছে। বস্তুত উপরিভাগে সাধারণ

১. মি রের আরবী শব্দ মা'জানা এরূপ একটি স্থানের ইঙ্গিত দেয় যেখান থেকে নামাযের *আযান* দেওয়া হয়, আ যিনি *আযান* দেন তিনিই হচ্ছেন মুয়াজ্জিন।

www.waytojannah.com

অশ্বনাল খিলানসহ প্রাপ্ত থামগুলির তুলনায় ছাদটি অনেক বেশি উঁচু হয়। ফলে আরো উপরের পর্যায়ে দ্বিতীয় খিলান শ্রেণী তৈরি করতে হয়। এতে এমন একটি জটিল ও অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয় যা মোটেই প্রীতিকর নয়। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তৈরিভাবে প্রাপ্ত প্রাচীন স্তম্ভগুলি কায়রওয়ান ও কর্ডোভা উভয় ক্ষেত্রেই খিলান শ্রেণীর সামগ্রিক নকশাকে প্রভাবিত করেছে। অথচ ইট বা পাথরের পিল্‌স প্রবর্তন করা হলে কিংবা বিশেষভাবে তৈরি লম্বা থাম ব্যবহার করা হলে এরূপ অপ্রীতিকর স্থাপত্য কৌশল পরিহার করা যেতো। কর্ডোভার সমগ্র মসজিদটি ঠেস দেওয়া উঁচু দেওয়ালে পরিবেষ্টিত এবং এর *সাহন*–এর চারদিকে খিলান শ্রেণী রয়েছে।

এবারে মেসোপটেমিয়ায় ফিরে আসা যাক। এখানকার বিভিন্ন মসজিদ এদেশের ঐতিহ্যগত ইটের রীতিতে নির্মিত হয়েছে, এবং মদীনার মসজিদের আদর্শের সঙ্গে কায়রোর বিখ্যাত ইবনে তুলুন মসজিদের সংযোগ স্থাপন করেছে। এই মধ্যবর্তী দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে উখাইদির, রাক্কাহ্‌, আবু দুলাফ ও সামাররার মসজিদ। প্রথম দুটি মসজিদ অষ্টম শতকের শেষভাগে এবং অপর দুটি নবম শতকের মধ্যভাগে নির্মিত হয়েছে বলে বর্তমানে ধারণা করা হয়। সবগুলিতেই সাসানীয় স্থাপত্যের ঐতিহ্য রক্ষা করা হয়েছে এবং সবগুলিতেই জামে মসজিদের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পরলোকগত গার্টরুড বেল–এর বিষয়ভিত্তিক বিবরণ গ্রন্থে[১] উখাইদিরে অবস্থিত মসজিদটির এমন অপরূপ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গরুত্বপূর্ণ। যে সূক্ষ্মাগ্র খিলান পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য গথিক[২] স্থাপত্যে সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয় উপরোক্ত গ্রন্থে তার মৌল রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাসানীয় খিলান অর্ধ–বৃত্তাকার হলেও মাঝেমধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে ছুঁচালো খিলানের প্রাচীন দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। সম্ভবত এর আগে মেসোপটেমিয়ায় অশ্বনাল খিলান ব্যবহৃত হতো। সিরীয় গির্জাগুলিতে ঐ ধরনের কয়েকটি খিলান দেখা যায় (যেমন, আনু ঃ ৫৬৪ খৃস্টাব্দে নির্মিত কাস্‌র ইবনে ওয়ার্দান গির্জায়), এবং প্রকৃত পক্ষে ইটালির চিউসিতে একটি গ্রীক দৃষ্টান্তও রয়েছে। মাসহাত্তার ন্যায় উখাইদিরের খিলানগুলি ছুঁচালো ডিম্বাকৃতির এবং কিছুটা উত্তোলিত। কিন্তু রাক্কাহতে অবস্থিত বাগদাদ ফটকে এবং সামাররার নিকটে আবু দুলাফের খিলান পরবর্তী মুসলিম স্থাপত্য রীতি অনুযায়ী বক্রাকার। অষ্টম শতকের শেষের দিকে মেসোপটেমিয়ার অন্যান্য সর্বপ্রকার খিলান–আকারের স্থলে এই রীতিটি প্রবর্তিত হয়। এর অনেক আগে ভারতে মাঝে মাঝে যেসবা ছুঁচালো খিলান দেখা যায়, সেগুলি নিরেট পাথর কেটে তৈরি করা হয় এবং সেদিক দিয়ে বিবেচনা করা হলে এগুলি আদৌ খিলান নয়।

---

১. জি এল বেল, প্যালেস এন্ড মস্ক এট উখাইদির (অক্সফোর্ড, ১৯১৪)

২. পশ্চিম ইউরোপে দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতকে বিকশিত বিশেষ স্থাপত্য রীতি, যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সূক্ষ্মাগ্র খিলান, খিলান দেওয়া ঠেস, পাঁজরার ন্যায় খিলান করা ছাদ, খাড়া ছাদ প্রভৃতি।–অনুবাদক

www.waytojannah.com

Contents

চিত্র-৭৭. কর্ডোভার বড় মসজিদের অভ্যন্তরের দৃশ্য

www.waytojannah.com

Contents

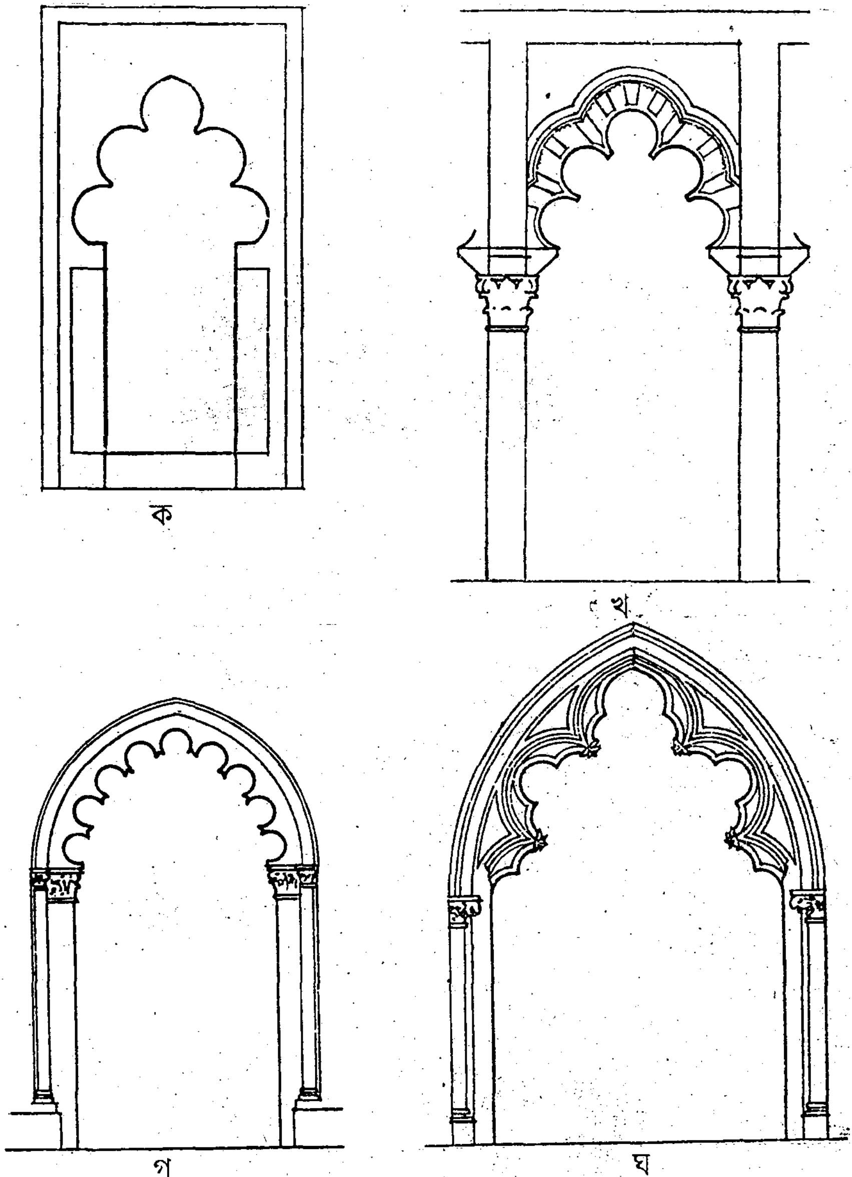

চিত্র-৭৮. সূক্ষ্মাগ্র খিলানসমূহের সম্পূর্ণ সদৃশ চিত্র

(ক) সামারা বড় মসজিদ (৮৪৬-৫২) (ওয়েলস এবং সলসবারীর প্রধান গির্জায় খিলান দ্বারা ঢাকা প্রবেশ দ্বারের সাথে নিবিড়ভাবে এর সাদৃশ্য রয়েছে)

(খ) কর্ডোভার বড় মসজিদের পবিত্র স্থান (৯৬১-৭৬)

(গ) ফ্রান্সের লা সুতেরা গির্জা (১২০০)

(ঘ) নরফকের ক্রো গির্জা (চতুর্দশ শতাব্দী)

www.waytojannah.com

Contents

সামাররার মসজিদটি বিশাল আকারের। এর যথেষ্ট ঐতিহাসিক গুরুত্বও রয়েছে। মক্কার দিকে গভীর সংরক্ষিত এলাকাসহ এর একটি *সাহন* রয়েছে। *সাহন*–এর অপর দিকগুলিতে রয়েছে বেশ গভীর দরদালান। ইটের তৈরি বিশাল বেষ্টনী প্রাচীরের প্রত্যেক কোণে গোলাকার টাওয়ার এবং মধ্যবর্তী অর্ধবৃত্তাকার টাওয়ার রয়েছে। সংরক্ষিত এলাকার দক্ষিণ দিকের প্রাচীরে সূক্ষ্মাগ্র বা কারুকার্য মণ্ডিত উপরিভাগ সমন্বিত ছোট ছোট গবাক্ষের সারি রয়েছে। এই উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কর্ডোভাতে দেখা যায় এবং হ্যাভেলের[১] মতে এগুলি হয়ত বৌদ্ধ ভারতের অবদান। অন্যথায় পাশ্চাত্যের শিল্পকর্মে বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিকারী এই অবদান একান্তভাবে মুসলমানদের (চিত্র ৭৮)। আরো গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে– –খিলান শ্রেণী ধরে রাখার জন্যে কর্ডোভা ও অন্যান্য স্থানের ন্যায় প্রাচীন স্তম্ভের স্থলে ইটের পিলপা ব্যবহার। এ সব পিলপা একটি বর্গাকৃতির ভিত্তির উপরে অষ্টভুজ আকারের। প্রত্যেক পিলপার সঙ্গে গোলাকার অথবা অষ্টভুজ আকারের চারটি করে মার্বেলের দণ্ডভাগ রয়েছে। দণ্ডভাগগুলি ধাতব কব্জা দ্বারা সংযুক্ত এবং এগুলির উপরিভাগ ঘন্টাকৃতির। এখানেও আমরা আর একটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই যা পাশ্চাত্য স্থাপত্যের অঙ্গীভূত হয়েছে। সামাররায় ও পরবর্তীকালে ইবনে তুলুনে ব্যবহৃত অদ্ভুত ধরনের পেঁচালো মিনারের দৃষ্টান্ত পরবর্তীকালে কোথাও দেখা যায় না।

কায়রোর ইবনে তুলুন মসজিদটির নির্মাণ কাজ ৮৭৬ খৃষ্টাব্দে শুরু হয়। বহু লেখক[২] এর বিস্তারিত বর্ণনা দিলেও আমরা যখন উপলব্ধি করি যে, এর উল্লেখযোগ্য কতগুলি বৈশিষ্ট্য মেসোপটেমিয়ার প্রাচীনতর ভবনগুলিতে পূর্ব থেকেই বিরাজমান ছিল, তখন মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে এর গুরুত্ব কিছুটা হ্রাস পায়। এটি প্রায় বর্গাকৃতির একটি বিরাট জামে মসজিদ। *সাহন*–এর চারদিকে খিলান দেওয়া দরদালান রয়েছে (চিত্র ৭৯) এবং সংরক্ষিত *লাইওয়ান* অন্যান্য কিছুর চাইতে অনেক গভীর। প্রধান প্রাচীরগুলির বাইরে একটি উন্মুক্ত বেষ্টনী চত্বর (*যিয়াদা*) রয়েছে। এ ধরনের বৈশিষ্ট্য ইতিপূর্বে কোথাও দেখা যায়নি। বাইরের প্রাচীরগুলি অত্যন্ত বিরাট ও পুরু এবং সেগুলিতে কারুকার্য করা যেসব ফোকর রয়েছে তা ছিদ্র ও ঝুঁটিওয়ালা গথিক দুর্গ প্রাচীরের আদর্শে নির্মিত বলে ধরা যায়। (আসিরিয়ার খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে এবং মিসরে তারও পূর্বে বিভিন্ন ধরনের ফোকর ব্যবহৃত হতো।) ফোকরের নিচে একটি ছুঁচালো গবাক্ষ সারি ছিদ্রযুক্ত প্লাস্টারের পর্দায় আবৃত। প্রতিটি গবাক্ষের পর পর একটি করে ছুঁচালো কুলঙ্গী রয়েছে যেগুলির উপরিভাগ সূক্ষ্মাগ্র। ইটের তৈরি বড় বড় পিলপার সাহায্যে খিলান শ্রেণী তৈরি করা হয়েছে। এর বিভিন্ন কোণে রয়েছে ইটের স্তম্ভ দণ্ড। সব কিছুর উপরে রয়েছে ছুঁচালো

১. ইবি হ্যাভেল, *ইণ্ডিয়ান আর্কিটেকচার* (২য় সংস্করণ, লণ্ডন, ১৯২৭), পৃষ্ঠা ৮৫–৬।

২. আমার লেখা মোহামেডান আর্কিটেকচার এটসেটরা–এর তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য (অক্সফোর্ড, ১৯২৪)।

www.waytojannah.com

Contents

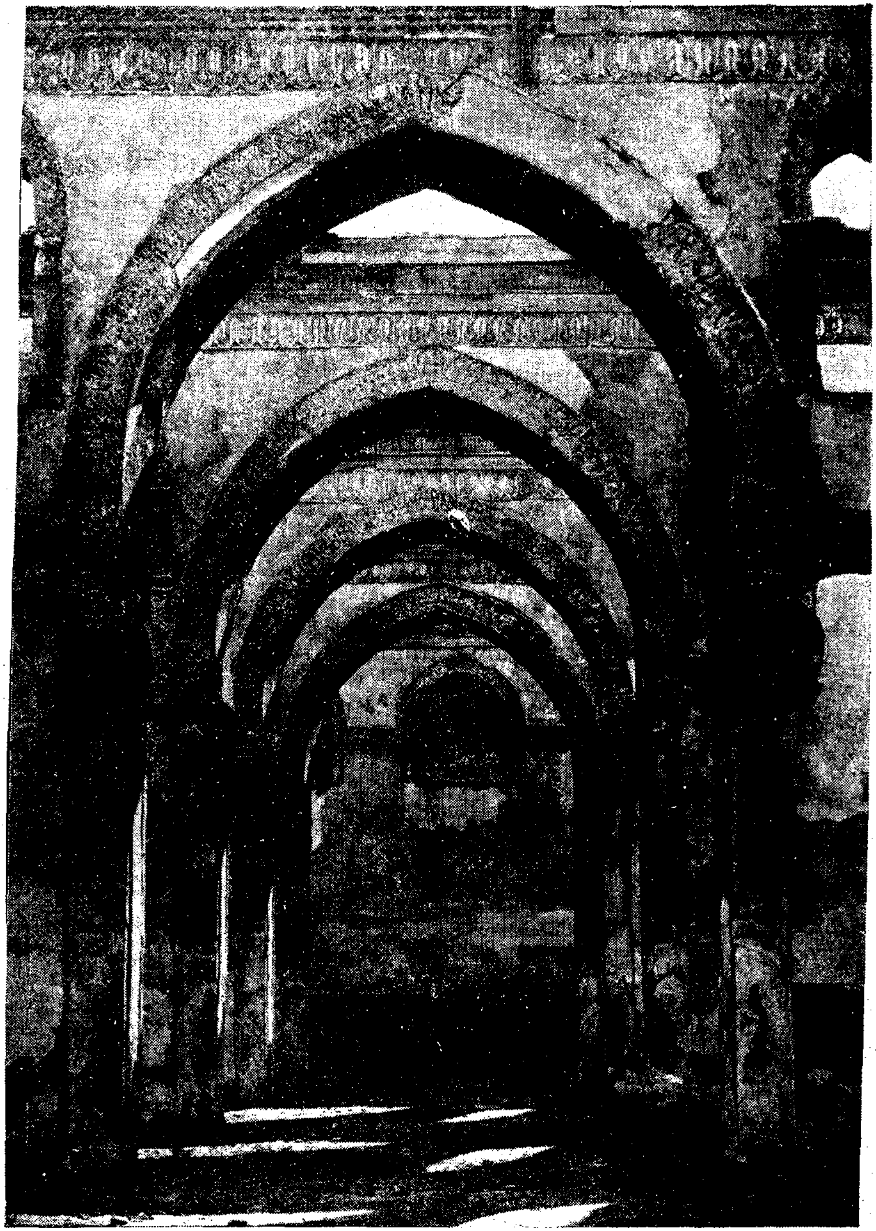

চিত্র-৭৯. কায়রোর ইবনে তুলুন মসজিদ (খিলান শ্রেণী একটি)

www.waytojannah.com

খিলান শ্রেণী যেগুলির নিচের দিক অনেকটা 'অশ্বনালের' ন্যায় বাঁকা। এমনিভাবে কাঠের ছাদ পর্যন্ত সমস্ত কাঠামোটি ইটের তৈরি এবং পরিষ্কার বা কারুকার্য করা চুনাবালিতে আবৃত। অতিশয়োক্তি না করে একথা বলা যেতে পারে যে, এই মসজিদটি সবদিক দিয়ে মেসোপটেমীয় রীতিতে তৈরি এবং এর প্রতিষ্ঠাতা যৌবনে সামাররা ও বাগদাদের মসজিদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় তার কিছু কিছু দৃষ্টান্তও এখানে সংযোজিত হয়েছে। ইতিমধ্যে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও এতে অন্য যেসব অভিনবত্ব রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কাঠের ওপর কুফী উৎকীর্ণলিপি (নকশার কাজে অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে হস্তলিপি ব্যবহার) এবং কার্যত সকল দৃশ্যমান উপরিভাগের ওপর রঙের কারুকার্য। সাদা চুনাবালির ওপর ছাড়াও সিলিংয়ের কাঠের ওপর রঙের কারুকার্য করা হয়েছে। স্পষ্ট নকশার একটি *মিহরাব* কুলঙ্গী রয়েছে ; *সাহন*-এর কেন্দ্রস্থলে একটি ফোয়ারা রয়েছে (মূলত এখানে কাঠের অর্ধ বৃত্তাকার একটি ছাদ ছিল) ; এবং ছাদ থেকে ঝুলন্ত আড়ম্বরপূর্ণ বাতির ঝাড় রয়েছে।

নবম শতকের সমাপ্তি থেকে দ্বাদশ শতকের সমাপ্তি পর্যন্ত যে সব মসজিদ টিকে আছে সেগুলির সংখ্যা বেশি নয়। এসময় বহু সামরিক স্থাপত্যের সৃষ্টি হয়েছে। একথা স্বীকার করা হয় যে, এ ব্যাপারে ক্রুসেডাররা সিরিয়া ও মিসর থেকে বহু ধারণা সংগ্রহ করে, কারণ এর কয়েক শতক আগে সিরিয়া ও আর্মেনিয়ায় দুর্গ নির্মাণ কৌশল উচ্চতর পর্যায়ে বিকশিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইউরোপীয়রা এই সূত্র থেকেই 'ম্যাচিকলেশন'[১]-এর ব্যবহার শেখে।

কায়রোর দুর্গ[২] সম্পর্কিত নিজস্ব রচনার পরিশিষ্ট মিঃ কে এ সি ক্রেসওয়েল ম্যাচিকলেশনের উদ্ভব পর্যালোচনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, সিরিয়ায় যে দশটি তথাকথিত দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে তার মধ্যে ছয়-সাতটি এমন এক ধরনের পায়খানা (ল্যাট্রিন) যা সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। বস্তুত জার্সীর গোরিতে অবলম্বন মঞ্চের (পীয়ার) উপর এ ধরনের একটি পায়খানা এখনো ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট যে তিনটি সম্ভবত উপর থেকে কোন কিছু নিক্ষেপের জন্য ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে প্রাচীনতমটির তারিখ হচ্ছে ৬ষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ের। ইসলাম তখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মিঃ ক্রেসওয়েলের এসব দৃষ্টান্ত দেওয়ার পর সিরিয়ার রুসাফার নিকটে কাস্‌র্‌ আল-হেয়ার-এ একটি মুসলিম দৃষ্টান্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। এটির তারিখ ৭২৯ খৃষ্টাব্দ। আর্মেনীয়

১. ম্যাচিকলেশন ঃ ঘন ঘন সন্নিবেশিত দেওয়াল সংলগ্ন ব্র্যাকেট ব্যবস্থা যা একটি উদগত নিচু পাঁচিলের সৃষ্টি করে। প্রতি জোড়া ব্রাকেটের মধ্যস্থলে একটি ফাঁকে (ফরাসী মাচিকুলিস) বদ্ধ অবস্থায় একটি ঠেলা দরজা থাকে। অবরোধকারীরা দেওয়ালের নিচে বিস্ফোরক দ্রব্য স্থাপনের চেষ্টা করলে এসব ফাঁক পথে তাদের মাথার উপর তীর, গরম তেল বা পানি এবং অন্যান্য জিনিস নিক্ষেপ করা যেতে পারে। ম্যাচিকলেশনের স্থলে *হোর্ডেস* (হোর্ডিং) বা ব্রিটিশ নামে পরিচিত কাঠের গ্যালারি প্রবর্তিত হয়েছে এবং এগুলি একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

২. বুলেটিন ডি এল ইনস্টিটিউট ফ্রান্সয়েস ডি আর্কিওলজি ওরিয়েন্টেল, ২৩শ খণ্ড (কায়রো, ১৯২৪)।

www.waytojannah.com

রাজমিস্ত্রীদের দ্বারা তৈরি কায়রোর একটি ফটক বাব আন্–নাস্র–এর (১০৮৭) উপরে দুটি রয়েছে। এগুলি স্পষ্টত প্রবেশপথ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিষ্ঠিত *ম্যাচিকোলিস* (চিত্র ৮০)। এর এক শতক পরে ইউরোপে সর্বপ্রথম এসব দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যেমন শাটো গাইলার্ড (১১৮৪), শাটিলন (১১৮৬), নরউইচ (১১৮৭) এবং উইনচেষ্টার (১১৯৩)। অতএব এটা স্পষ্ট যে, এই ধারণাটি ক্রুসেডারগণ স্যারাসেনদের কাছ থেকে ধার করেছেন। কিন্তু স্যারাসেনরা ক্রুসেডারদের কাছ থেকে নয়। কালক্রমে চতুর্দশ শতকের ফরাসী ও ইংরেজ দুর্গসমূহে সারিবদ্ধ করবেলের (দেওয়াল থেকে উদ্গত অবলম্বন) উপর ম্যাচিকলেশন অত্যন্ত ব্যাপক হয়ে পড়ে (চিত্র ৮১)।

মিসর ও সিরিয়া থেকে ধারকরা সামরিক স্থাপত্যের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোন দুর্গের 'সমকোণী' বা 'বক্র' প্রবেশ পথ। দেওয়ালের ফটকের মধ্যে এমনভাবে এই প্রবেশপথ তৈরি করা হয় যাতে শত্রুপক্ষ প্রবেশপথে পৌঁছার পর এর মধ্যদিয়ে ভেতরের চত্বরে কোন কিছু দেখতে বা নিক্ষেপ করতে না পারে। রোমান বা বাইযেন্টাইন সমর বিজ্ঞানে এ ধরনের প্রবেশ পথের জ্ঞান ছিল বলে প্রতীয়মান হয় না। যেখানে পর্যায়ক্রমিক প্রতিরক্ষা ফটকগুলি একই সরল পথে *প্রপুগ্‌নাকুলাম* নামে পরিচিত এলাকার পর পর স্থাপিত হতো। যত দূর জানা যায় এসব বাঁকা প্রবেশপথ সর্বপ্রথম বাগদাদের 'গোলাকার নগরীতে' ব্যবহৃত হয় (অষ্টম শতক)। পুনরায় কায়রোতে সালাহউদ্দীনের দুর্গে এগুলি দেখা যায় (শুরু ১১৭৬)। চূড়ান্ত পর্যায়ে আলেপ্পোর দুর্গে এর অপরূপ দৃষ্টান্ত পরিদৃষ্ট হয়। বুমারিসে একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত থাকলেও ইংল্যাণ্ডে এগুলি কদাচিৎ দেখা যায়। ফ্রান্সে এগুলি অধিকতর জনপ্রিয় ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ কারকাসোনের কথা উল্লেখযোগ্য। এই দুটি দেশে অধিকতর সুরক্ষিত দুর্গে অসমান্তরাল প্রবেশপথ প্রাধান্য লাভ করে, যেমনটি পিয়েরেফান্ডস্ ও কনওয়েতে দেখা যায়।

ত্রয়োদশ শতকের সূচনায় পুরাতন দিল্লীতে নির্মাণকার্য শুরু হওয়ার আগে ভারতে গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম ইমারত ছিল না। এশীয় তুরস্কেও তেমন কিছু ছিল না। কেনিয়ায় সেলজুক ইমারতগুলি পুরাতন দিল্লীর ন্যায় একই সময়ে শুরু হয়। স্পেন ও উত্তর আফ্রিকায় সামরিক স্থাপত্য ছাড়া প্রধান ধ্বংসাবশেষগুলি হচ্ছে কর্ডোভার মসজিদের পরবর্তী স্থাপত্যকর্ম এবং সেভিল (জিরাল্ডা টাওয়ার, ১১৭২–৯৫) ও রাবাতের অপরূপ মিনার। কর্ডোভা মসজিদের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ কাজ দশম শতকের শেষার্ধে সম্পন্ন হয়। সেভিল ও রাবাতের মিনারগুলি সূক্ষ্মাগ্র খিলান শ্রেণী দ্বারা সুসজ্জিত, যা পাথরের উপর কারুকার্যের পরবর্তী গথিক স্থাপত্যে দেখা যায় (চিত্র ৮২)। এই শিল্পকর্ম বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে অত্যন্ত চমকপ্রদ। এর মধ্যে গম্বুজ নির্মাণের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিকও রয়েছে। কিন্তু এটি স্থাপত্যের বিকাশে স্পেনের বাইরে কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। সিসিলিতে কাপ্পেলা প্যালাটিনা ১১৩২ খৃষ্টাব্দে, মার্টোরানা গির্জা ১১৩৬ খৃষ্টাব্দে, লা যিযা ১১৫৪

www.waytojannah.com

Contents

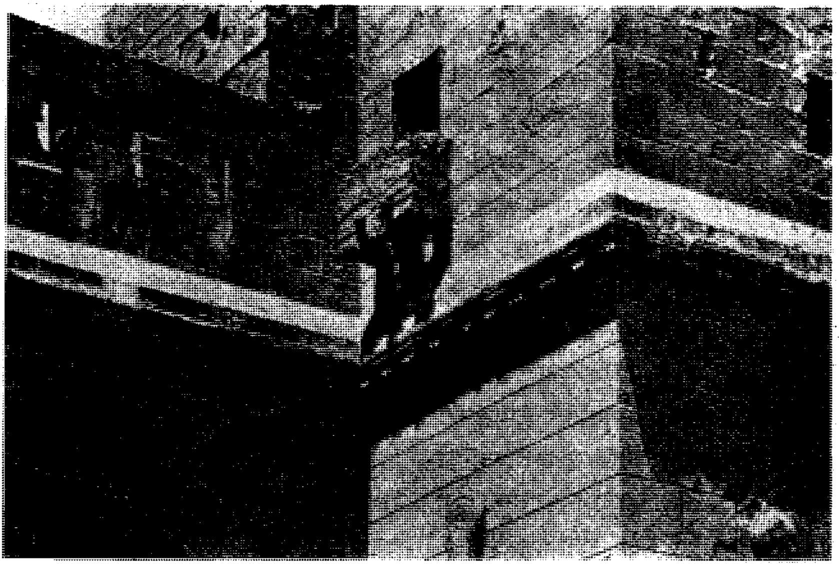

চিত্র-৮০. কায়রোর বাব আল-নাস্‌র (১০৮৭)

চিত্র-৮১. জতুর্দশ শতাব্দীতে ভিলেনেভ লা-এভিংগন দুর্গের প্রবেশদ্বার

www.waytojannah.com

খৃষ্টাব্দে এবং লা কিউবা ১১৮০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। এগুলিই স্বীকৃত তারিখ এবং তা এই দ্বীপে মুসলিম শাসনের আওতার বাইরে। কারণ পালের্মোতে ১০৬০ খৃষ্টাব্দে এবং সামগ্রিকভাবে সিসিলিতে ১০৯০ খৃষ্টাব্দে মুসলিম শাসনের অবসান হয়। কিন্তু নর্ম্যানদের দ্বারা নির্মিত হলেও এগুলিতে অবিমিশ্র স্যারাসেনিক বৈশিষ্ট্যসমূহ পুরোপুরি বর্তমান। এসব বৈশিষ্ট্য ইটালীর মূল ভূখণ্ডে আমাল্‌ফি এবং সালের্নোতেও দেখা যায়। পারস্যে এ সময়কার প্রধান ভবনগুলি হচ্ছে ইস্পাহানের জুমা মসজিদ এবং মসুলের বিশাল মসজিদ (আনুঃ ১১৪৫–৯১)। উভয়টিই বিরাট জামে মসজিদ। কিন্তু প্রথমোক্তটির অনেক পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। পারস্যের মসজিদগুলি ইটের তৈরি হওয়ায় চুনাবালির রিলিফ এবং মিনা করা টালির সাহায্যে সেগুলিকে অলংকৃত করা হয়েছে। শেষোক্ত ফ্যাশানটি পরবর্তীকালে সিরিয়া ও মিসরের ন্যায় যেসব দেশে পাথর ব্যবহার করা হতো সেসব দেশেও প্রবর্তিত হয়। মিনারগুলি সাধারণত জোড়ায় জোড়ায় স্থাপন করা হতো। আকারে নলের মতো, উপরের দিকে ক্রমশ কিছুটা সরু এবং উজ্জ্বল বর্ণের টালি দ্বারা আবৃত। এম সালাদিন সেগুলিকে কিছুটা নির্দয়ভাবে কারখানার চিমনির সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু সেগুলি অবশ্যি তা নয়। পারস্যও আগ্রহের সঙ্গে এই অদ্ভুত 'স্ট্যালাকটাইট' (লম্বমান কোণাকৃতির) নকশা অভিনন্দিত করেছে। পরবর্তী অনুচ্ছেদে তা আলোচনা করা হয়েছে।

'সিরীয়–মিসরীয়' রীতির প্রধান দৃষ্টান্তগুলি সবই কায়রোতে দেখা যায় এবং সেগুলি হচ্ছে, বিরাটাকার জামে মসজিদ আল–আযহার (৯৭০) ও আল–হাকিম (৯৯০–১০১২), ছোট জামে মসজিদ আল–আকমার (১১২৫) এবং ছোট অথচ গুরুত্বপূর্ণ সমাধি–মসজিদ আল যুয়ুশী (১০৮৫)। আল–আযহার ও আল আকমারে খিলান শ্রেণী প্রাচীন স্তম্ভের উপর স্থাপিত এবং আল–হাকিমে সেগুলি ইটের উত্তরণ মঞ্চের (পীয়ার) ওপর প্রতিষ্ঠিত। নিকটবর্তী মুকাত্তাম পাহাড়ে উৎকৃষ্ট চুনা পাথর থাকা সত্ত্বেও আল–হাকিমে সেরাসেনিক কায়রোতে সর্বপ্রথম পাথর ব্যবহৃত হয়। স্পষ্টত কায়রো এতদিন পর্যন্ত মেসোপটেমীয় ঐতিহ্যের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট ছিল। আল যুয়ুশী মসজিদটি সমাধি–মসজিদের প্রথম দৃষ্টান্ত। পরবর্তীকালে এই রীতির ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। এই মসজিদটিতে প্রতিষ্ঠাতার সমাধির ওপর একটি গম্বুজ রয়েছে এবং দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে রয়েছে *মিহরাব*। *সাহনটি* ছোট এবং *সাহন* ও গম্বুজের মধ্যস্থলে একটি খিলান দেওয়া আভ্যন্তরীণ পার্শ্বদেশ রয়েছে। এতে বর্গাকৃতির তিন পর্যায়ের একটি মিনার রয়েছে এবং অতি উঁচুতে ছোট একটি গম্বুজ রয়েছে। এ ধরনের গম্বুজ সিসিলীয় গির্জাগুলিতে দেখা যায়। মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে গম্বুজের বিবর্তন সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যেহেতু পাশ্চাত্য স্থাপত্যে ইসলামের অবদানের ক্ষেত্রে এর কোন সুস্পষ্ট সম্পর্ক নেই, সেহেতু বর্তমান সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনায় তা পরিহার করা যেতে পারে। একই কারণে 'স্ট্যালাক্‌টাইটের' (লম্বমান

www.waytojannah.com

কোণা কৃতির নকশা) যে অপরূপ বৈশিষ্ট্য মুসলমানরা সর্বত্র অনুসরণ করেছেন এবং যা ভারত থেকে স্পেন পর্যন্ত তাদের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হিসাবে চিহ্নিত, তার উদ্ভব নিয়ে আলোচনা করাও কোন মানে হয় না। সম্ভবত মেসোপটেমীয় সূত্র থেকে উদ্ভুত এই বৈশিষ্ট্য আল–য়ুয়ুশী মসজিদের মিনারে নির্ভরযোগ্যভাবে প্রথম দেখা যায়। এরপর আল–আকমার মসজিদের সম্মুখ ভাগে এটি পরিদৃষ্ট হয়। এখানে এটিকে আলঙ্কারিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে শম্বুক সদৃশ অনেকগুলি কুলঙ্গিও খোদাই করা হয়েছে। এগুলি অতি পরিচিত রেনেসাঁর ঝিনুক কুলঙ্গির আদর্শ নয় কি ? এই যুগের কায়রো মসজিদগুলিতে অপর একটি বিস্তারিত দিক হচ্ছে 'করাত কাঁটার' ন্যায় ফোকর (চিত্র ৮২) এবং এটিও সম্ভবত মেসোপটেমিয়া থেকে উদ্ভুত। ভেনিসের ডিউক প্রাসাদ ও অন্যান্য প্রসাদের স্থাপত্যে এই উপাদানটি সম্ভবত প্রেরণা সৃষ্টি করেছে।

ত্রয়োদশ শতক থেকে পরবর্তীকালে আমরা এর সবগুলি এলাকায় মুসলিম স্থাপত্যের অনেক ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাই। এ সময় সিসিলিকে বাদ দিয়ে ভারত ও তুরস্ককে তালিকাভুক্ত করতে হয়। স্পেনে আল হামরা ও আল কাযার নামে পরিচিত গুরুত্বপূর্ণ প্রাসাদ রয়েছে। এগুলি তাদের ব্যাপক ও অপরূপ কারুকার্যের জন্য বিখ্যাত। অন্যদিকে এখানকার পরবর্তীকালের মুরীয় ভবনগুলি প্রথম শ্রেণীর পর্যায়ে পড়ে না। কায়রো ১৫১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মসজিদ ও সমাধির অতুলনীয় পর্যায়ক্রমিক নিদর্শন সৃষ্টি করেছে। অতঃপর শহরটি তুর্কীদের অধিকারে যায় এবং তখন থেকে যে অল্প কয়টি মসজিদ নির্মিত হয়েছে সেগুলি ওসমানীয় রীতি অনুসরণ করে। আনাতোলিয়া ১২০০ থেকে ১৪৫৩ খৃ. পর্যন্ত কোনিয়া ও ব্রুসায় পর্যায়ক্রমিকভাবে অত্যন্ত চমকপ্রদ কয়েকটি নিদর্শন তুলে ধরে। এরপর কনস্টানটিনোপল তুরস্কের রাজধানীতে পরিণত হয়। এ সময় থেকে ওসমানীয় স্থাপত্য বাইযেন্টিয়াম স্মৃতিসৌধগুলির অবাধ অনুকরণ শুরু করে। এমনকি সুদূর কায়রো বা দামেস্কের নির্মাণকার্যেও তা অনুসরণ করা হয়। পরবর্তীকালে পারস্য, তুর্কীস্তান ও ভারতে মুসলিম স্থাপত্যের এক অপরিমিত সম্পদ গড়ে ওঠে। ভারতে এই স্থাপত্য ঐতিহ্য আধুনিককাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত স্থানীয় বৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালে স্যারাসেনিক স্থাপত্যকে পাঁচটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করে ঃ সিরীয়–মিসরীয়, হিস্পানো–মোরেস্ক, পারস্য, ওসমানীয় ও ভারতীয়। এসব পার্থক্য আংশিকভাবে স্থানীয় উপাদানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠলেও স্থানীয় নির্মাণ ঐতিহ্যই তার মূল ভিত্তি।

'মধ্যযুগে' মসজিদ পরিকল্পনায় ব্যাপক বৈচিত্র্য ও বিকাশ ঘটে। জামে মসজিদের নির্মাণকাজ কোন কোন দেশে অব্যাহত থাকে। গম্বুজওয়ালা সমাধি মসজিদ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। দ্বাদশ শতকে প্রবর্তিত *মাদ্রাসাহ্* (মসজিদ সংলগ্ন বিদ্যালয়) এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। গম্বুজ মুসলিম স্থাপত্যের একটি জনপ্রিয় বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। কায়রোতে এর আকার ছিল সাধারণত সুদৃঢ়। পারস্য ও তুর্কীস্তানে বাল্‌ব বা

www.waytojannah.com

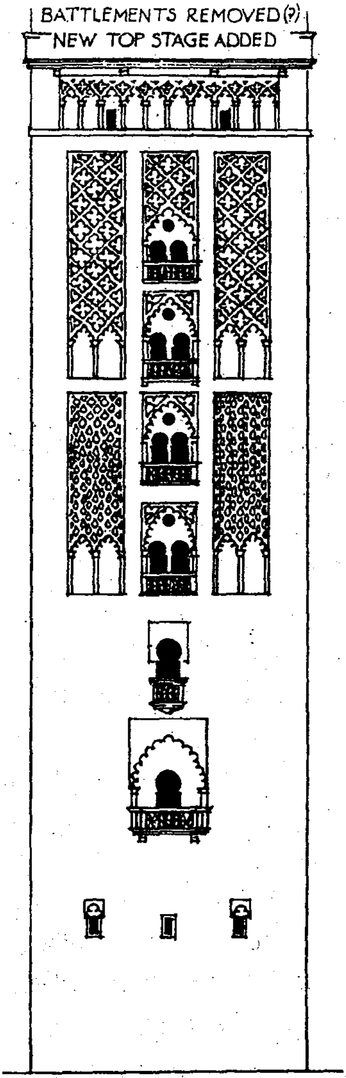

ক

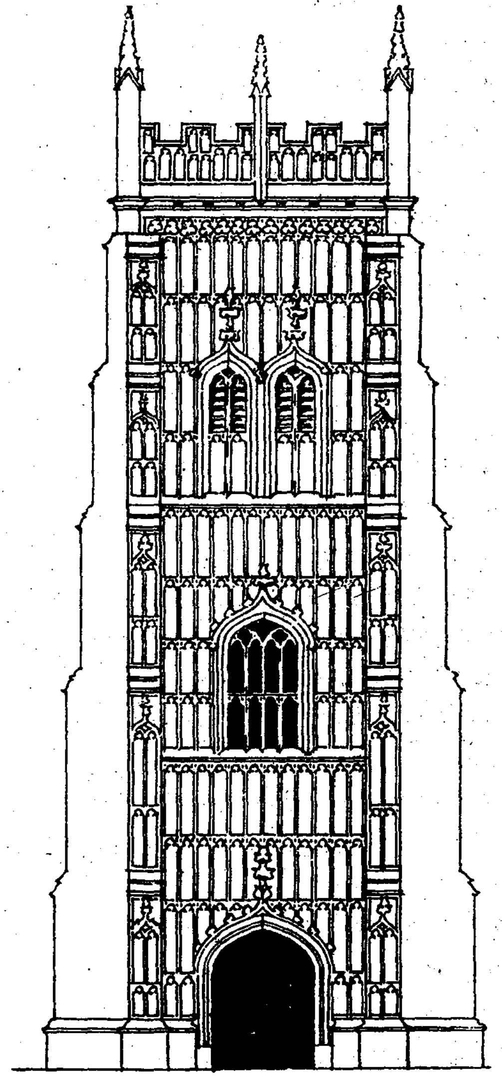

খ

চিত্র-৮২. পাথরের ওপর কারুকার্য সম্বলিত বুরুজের সম্পূর্ণ সদৃশ চিত্র
(ক) সেভিলের জিরাল্ড মিনার (১১৭২-৯৫)
(খ) ইভেশামের বেল টাওয়ার (১৫৩৩)

www.waytojannah.com

ডিম্বাকার প্রাধান্য লাভ করে। অপরদিকে কনস্টান্টিনোপলে মসজিদগুলিতে নিচু বাইযেন্টাইন গম্বুজ প্রবর্তন করা হয়। (চিত্র ৮৩) বাহ্যিক দিক দিয়ে পঞ্চদশ শতকে মিসরের পাথরের গম্বুজগুলিতে জরির ন্যায় নকশা অংকন করা হয়। পারস্যে সেগুলি উজ্জ্বল ঝলসানো টালি দ্বারা আবৃত করা হয়। লম্বমান (স্ট্যালাকটাইট) খিলানের উপর সেগুলি স্থাপন করা হয়। বস্তুত এই স্ট্যালাকটাইট সর্বত্র ব্যবহার করা হতো এবং প্রায়ই অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহার করা হতো। এগুলি কোন কোন সময় সীলিং থেকে আমাদের বৈদ্যুতিক পাখার উপরিভাগের ন্যায় ঝুলন্ত থাকে। স্যারাসেন গম্বুজ পাশ্চাত্যের রেনেসাঁ গম্বুজকে প্রভাবিত না করলেও এটা সম্ভব বলে মনে হয় যে, অত্যন্ত সুদর্শন মুসলিম মিনার বিশেষ করে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকের কায়রোর মিনারগুলি ইটালীর পরবর্তীকালের রেনেসাঁ *ক্যাম্পনিলিকে*[১] প্রভাবিত করেছে এবং সেখান থেকেই রেন–এর কতিপয় সুদর্শন সিটি স্টাপল[২]–এর উদ্ভব হয়েছে। ইতিমধ্যে মুসলিম স্থপতিরা গম্বুজ ও মিনারকে পার্থক্যমূলক–ভাবে ব্যবহারের সম্ভাবনা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে শুরু করেন, যেমনটি রেন পরবর্তীকালে সেন্টপল গির্জায় অত্যন্ত সার্থকভাবে গম্বুজ ও টাওয়ারের পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। পারস্যের কিছুটা বিদঘুঁটে ধরনের নলাকার মিনার এবং ওসমানীয় তুর্কীদের পেনসিল আকারের মিনার তাদের নিজস্ব দেশের বাইরে কখনো প্রসার লাভ করেনি।

স্যারাসেনিক স্থাপত্যের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে গোলাকার অশ্বনাল ও সূক্ষ্মাগ্র অশ্বনাল খিলানের জনপ্রিয়তাও অব্যাহত থাকে। অর্ধ–বৃত্তাকার এবং সাধারণ সূক্ষ্মাগ্র বা দুই কেন্দ্রবিশিষ্ট খিলান প্রায়ই ব্যবহৃত হতো। এবং তথাকথিত 'পারস্য' খিলান—যেখানে বাঁকা অংশ সরল রেখায় পরিণত হয়—মূল দেশে এবং অন্যান্য স্থানে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি কিছুটা আমাদের 'টিউডর' খিলানের ন্যায় (চিত্র ৮৩)। বিচিত্র নকশা সম্বলিত বা সূক্ষ্মাগ্র খিলান সাধারণ ব্যাপার হয়ে পড়ে। সাধারণ খিলানের উপরিভাগে নানা রকম কারুকার্য করা হয়। ফোকরগুলিকে পত্রালঙ্কারে কিংবা করাতকাঁটা কেটে শোভিত করা হয়। গবাক্ষ পথ ছিদ্র করা পাথরের কারুকার্য কিংবা পাথর বা চুনাবালির জাফরিতে ভরে দেওয়া হতো। রংকরা কাচের সাহায্যে সেগুলিকে ঔজ্জ্বল্য প্রদান করা হতো। সম্ভবত পাশ্চাত্য দেশগুলিতে তখনো রঞ্জিত কাচের ব্যবহার প্রবর্তিত হয়নি। চুনাবালির ওপর অঙ্কিত করে অথবা কাঠ বা পাথরের ওপর খোদাই করে অলংকারমূলক হস্তলিপি ব্যবহার করা হতো এবং পালাক্রমে জ্যামিতিক নকশা অঙ্কন করা হতো, কারণ স্বাভাবিক চিত্র ব্যবহার ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ ছিল। মিসরের ভবনগুলিকে উঁচু রিলিফে সুস্পষ্ট খোদাই কদাচিৎ দেখা যায়, (চিত্র ৮৪) যদিও ভারতে হয়ত এ ধরনের দৃষ্টান্ত রয়েছে। খোদাই

১. বেল টাওয়ার, সাধারণত গির্জার কাছাকাছি নির্মিত হয়।–অনুবাদক।

২. কোন ভবনের বিশেষত গির্জার প্রধান অংশ থেকে উঁচু টাওয়ার, যার চূড়া সাধারণত সরু হয়। –অনুবাদক।

www.waytojannah.com

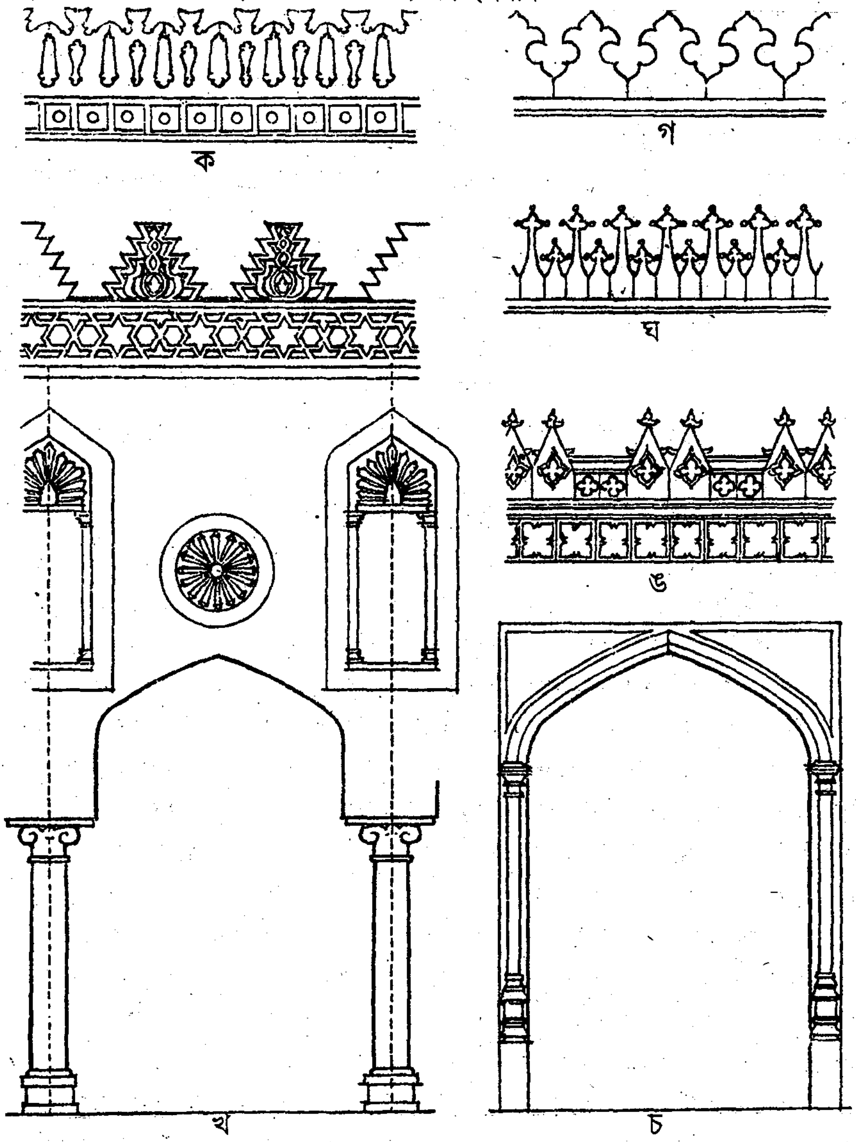

চিত্র-৮৩. যুদ্ধের সময় গুলি চালানোর জন্য অট্টালিকার ওপর নির্মিত ফোকর বিশিষ্ট প্রাচীর এবং খিলানের সম্পূর্ণ সদৃশ চিত্র

(ক) কায়রোর ইবনে তুলুন মসজিদ (৮৬৮)

(খ) কায়রোর আল আজহার মসজিদে পারস্য খিলান (৯৭০)

(গ) কায়রোর জায়ন আল দীন ইউসুফ মসজিদ (১২৯৮)

(ঘ) ভেনিসের ক্য দ্য ওরা প্লাজা (১৪৩১)

(ঙ) নরফকের ক্রোমার গির্জা (পঞ্চদশ শতাব্দী)

(চ) ষোড়শ শতাব্দীতে অক্সফোর্ডের খৃষ্টীয় গির্জা ভবনে টিউডর খিলান

www.waytojannah.com

করা না হলেও অত্যন্ত সূক্ষ্ম জ্যামিতিক নকশার অবাধ ব্যবহারের মাধ্যমে ঐ ধরনের একটা রূপ ফুটিয়ে তোলা হতো এবং পাথর বা চুনাবালির উপর খোদাইয়ের পরিবর্তে ছেদন করে তা করা হতো। আরো পূর্বদিকে পারস্যে এবং বিশেষভাবে তুর্কীস্তানে, যেখানে ইটই হচ্ছে নির্মাণ কাজের স্বাভাবিক উপাদান, সেখানে প্রচুর পরিমাণে উজ্জ্বলতাপূর্ণ টালি ব্যবহৃত হয়। দীর্ঘকাল পর্যন্ত নকশার কাজে জ্যামিতিক বা বিমূর্ত আকারই জনপ্রিয় ছিল। এরপর পত্রপুষ্প নকশা প্রবর্তনের মাধ্যমে অধিকতর স্বাভাবিক কারুকার্যের আবির্ভাব ঘটে। ইংল্যান্ডে এলিজাবেথীয় যুগ থেকে নীচু রিলিফে অঙ্কিত যে সব প্রচলিত নকশাকে 'অ্যারাবেস্ক' নামে অভিহিত করা হয় তার দ্বারা এই ইঙ্গিতই পাওয়া যায় যে, এ ক্ষেত্রে আমরা মধ্যযুগের আরবদের কাছে কিছুটা ঋণী।[১] অন্যত্র তেমনভাবে ব্যবহৃত না হলেও কায়রোতে অত্যন্ত সাধারণ অপর একটি নকশারীতি হচ্ছে আড়াআড়িভাবে পালাক্রমে অনুজ্জ্বল ও উজ্জ্বল পাথর ব্যবহার। এর সূত্র হয়তো রোম বা বাইযেন্টিয়ামে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কারণ সেখানে পাথরের দেওয়ালে প্রায়ই ইটের 'জরির রেখা' প্রবর্তিত হতো। কিন্তু এতে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। তাই পিসা, জেনোয়া, সিয়েথা, ফ্লোরেন্স ও অন্যান্য ইটালীয় নগরীতে মার্বেল ভবনগুলির ডোরাকাটা সম্মুখভাগের নকশা কায়রোরই অবদান। কারণ এই নগরীর সঙ্গে মধ্য যুগে তাদের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ওভার্নি–এর (ফ্রান্স) লি পাইতে একই ধরনের বিচিত্রবর্ণ সৌকর্য পরিদৃষ্ট হয় এবং নর্দাম্পটনের সেন্ট পিটার গির্জায় তার কাছাকাছি জিনিস দেখা যায়।

বর্তমান পর্যালোচনায় উল্লেখিত বহু বিষয় সম্পর্কে এক কথায় বলতে গেলে একথা সুস্পষ্ট যে, সার্বিকভাবে স্থাপত্যের ক্ষেত্রে ইসলামের কাছে পাশ্চাত্য বিশ্বের ঋণ প্রচুর। কেবলমাত্র সামরিক স্থাপত্যের ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি যে, যে ক্রুসেডাররা পবিত্র ভূমিতে বহু সুন্দর সুন্দর গির্জা ও দুর্গ রেখে গেছেন তারা নিজেরাই স্যারাসেন শত্রুদের কাছ থেকে দুর্গ নির্মাণের কৌশল আয়ত্ত করেছেন।অপরদিকে স্যারাসেনরা তাদের ক্ষেত্রে আর্মেনীয় রাজমিস্ত্রীদের নৈপুণ্যের দ্বারা লাভবান হয়েছেন।

প্রাক ইসলামী যুগের আর্মেনিয়া ও সিরিয়ার প্রস্তর নির্মিত ভবন এবং ইরানের ইট নির্মিত ভবনের (আমাদের মধ্যযুগীয় খিলান করা ছাদের উৎস সম্পর্কে পণ্ডিত ব্যক্তিরা ক্রমবর্ধমানভাবে শেষোক্তটিকেই সূত্র হিসাবে মনে করেন) কাছে আমাদের সর্বপ্রকার ঋণের কথা বাদ দিলেও আমরা সিরিয়া ও অন্যান্য স্থানের মুসলিম ভবনগুলিকে সূক্ষ্মাগ্র খিলানের প্রবর্তক বলে যুক্তিযুক্তভাবে ধরে নিতে পারি। প্রায় সুনিশ্চিতভাবে ওজী খিলান[২] এবং সম্ভবত 'টিউডর' খিলানও একই সূত্র থেকে উদ্ভব হয়েছে। সূক্ষ্মাগ্র বা বিচিত্র নকশা

১. সংশ্লিষ্ট সবগুলি প্রশ্নে আমার *মোহামেডান আর্কিটেকচার,* এটসেটরা (অক্সফোর্ড, ১৯২৪) গ্রন্থের 'নেচার অব স্যারাসেনিক অর্ণামেন্ট' শীর্ষক ১০ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২. দুপাশে ইংরেজী 'এস' আকৃতির বক্র রেখা সমন্বিত সূক্ষ্মাগ্র খিলান।–অনুবাদক।

www.waytojannah.com

Contents

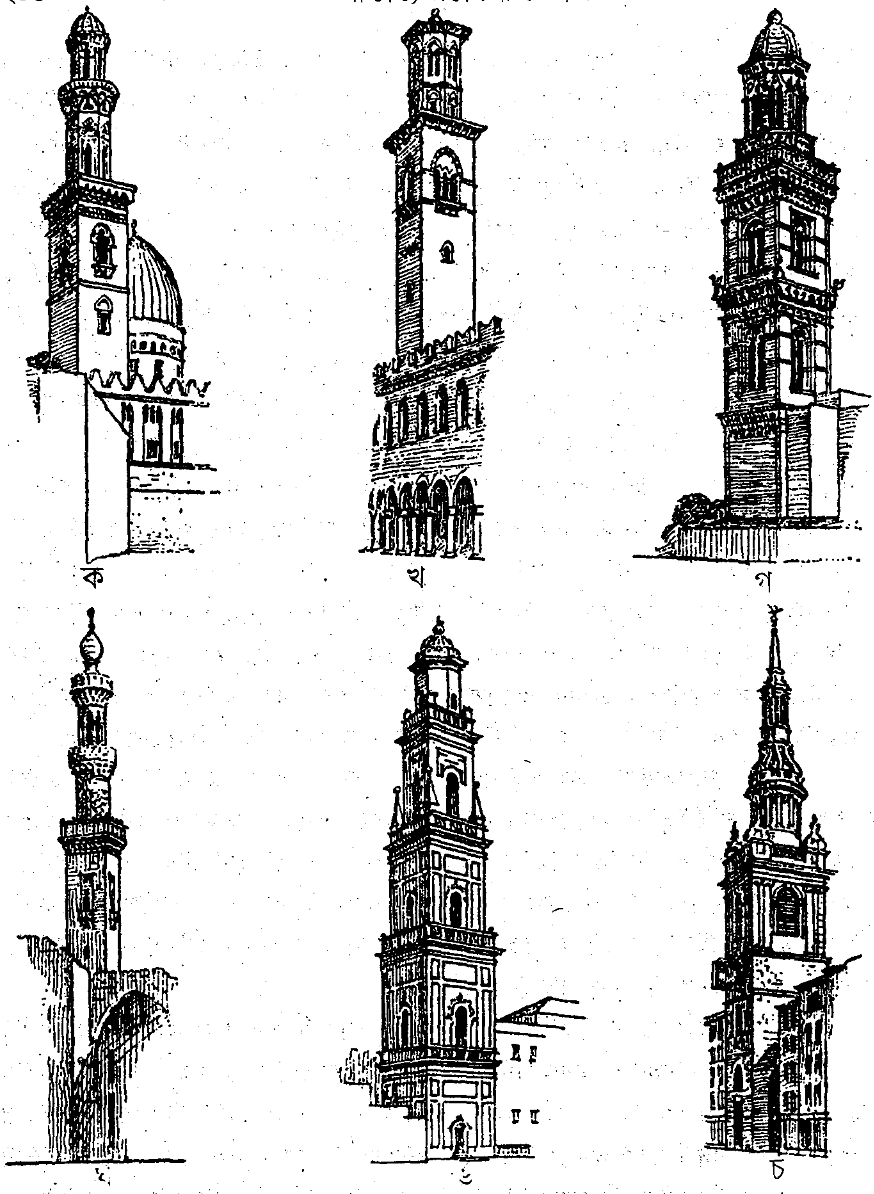

চিত্র-৮৪. মিনার এবং ঘন্টা ঘরের সম্পূর্ণ সদৃশ চিত্র

(ক) কায়রোর সানজাল আল জাওলি মদ্রাসা (১৩০৩-৪)

(খ) ভেরোনার ডেল কমিউন বুরুজ (১১৭২)

(গ) দক্ষিণ ইটালীর সালেটো গম্বুজ (১৩৯৭)

(ঘ) কায়রোর নিকটে বারকুকের স্মৃতিসৌধ (১৪০০-১০)

(ঙ) দক্ষিণ ইটালীর লিকসী গম্বুজ (১৬৬১-৮২)

(চ) লণ্ডনের সেন্ট মেরিলি বাউ (১৬৭১-৮৩)

www.waytojannah.com

সম্বলিত খিলানও এই সূত্র থেকে এসেছে। তেমনি বিভিন্ন পর্যায়ে পাথরের উপর সূক্ষ্ম কারুকার্যের প্রচলন এখান থেকেই হয়। প্রাথমিক মসজিদগুলির পাথরে এবং চুনবালিতে ছেদন করে যেসব জ্যামিতিক জাফরি তৈরি করা হয়েছে সম্ভবত সেখান থেকেই থালার উপর সূক্ষ্ম কারুকার্যের প্রচলন হয়েছে। কিংবা এগুলি আরো অতীতের প্রাক ইসলামী সিরীয় বা মেসোপটেমীয় ভবনগুলিরও অবদান হতে পারে। কখনো কখনো বলা হয় যে, রঙীন কাচ (স্টেইণ্ড গ্লাস) প্রাচ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু এটি প্রমাণিত হয়নি। গথিক খিলানকরা ছাদের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উত্তরণ মঞ্চের (পীয়ার) চারকোণে স্তম্ভদণ্ড ব্যবহার অষ্টম বা নবম শতকের একটি স্যারাসেনিক অবদান। কারুকার্যমণ্ডিত ও ছিদ্রকরা ফোকর মেসোপটেমিয়া থেকে কায়রোতে এসেছে এবং এখান থেকে ইটালীতে প্রচলিত হয়েছে। পরবর্তীকালে এটি গথিক স্থাপত্যের একটি বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের গথিক শিল্পকর্মে খোদাই করা যে সব উৎকীর্ণলিপি নকশা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা নবম শতকের কায়রোর ইবনে তুলুন মসজিদ থেকে অনুকৃত। কিন্তু সুদূর ফ্রান্সে কুফীরীতির উৎকীর্ণলিপি তার দক্ষিণাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে মুসলিম অধিকারের সময় প্রবর্তিত হয়েছে।[১] এমনকি ইংল্যাণ্ডে কচিৎ–কদাচিত এ জাতীয় যে দু–একটি নিদর্শন দেখা যায় তাও আরব প্রভাব বলে মনে করা হয়। (চিত্র ৮৫) ডোরাকাটা সম্মুখভাগ এবং এমনকি রেনেসাঁ যুগের *ক্যামপানিলি* ও শম্বুক–কুলঙ্গির নকশাও সম্ভবত কায়রোর অবদান। কোন ভবনের মহিলাদের কক্ষগুলিকে গোপন রাখার জন্য কিংবা মসজিদের পর্দা হিসাবে ব্যবহৃত আরব *মাশরাবিইয়াহ* বা কাষ্ঠনির্মিত জাফরি ইংরেজদের ধাতব গ্রিলে নকল করা হয়েছে। 'অ্যারাবেস্ক' বা বুটিদার কাপড়ের নকশার মাধ্যমে উপরিভাগে নিচু রিলিফের কারুকার্য এবং কারুকার্যে জ্যামিতিক নকশার ব্যবহার অবশ্যই মুসলমানদের কাছে আমাদের ঋণের একটি দিক। তারা আমাদের অনেকখানি জ্যামিতিক জ্ঞানের সূত্রও বটে।

উপরে সুনির্দিষ্ট দিকগুলিই আলোচনা করা হলো। কিন্তু ক্রুসেডের সময় এবং (আরো আপোসে) মধ্যযুগের শেষভাগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে তাতে স্থাপত্যের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে অন্যান্য যেসব প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে তা এই দ্রুত ও ভাসাভাসা আলোচনায় দৃষ্টির বাইরে থেকে যায়। স্পেনে নকশার ক্ষেত্রে মূরীয় ঐতিহ্য রেনেসাঁ যুগের শেষভাগ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এবং স্পেনীয় গথিক স্থাপত্যের বহু জটিলতা

---

১. যেমন লি পাই ক্যাথিড্রালের আণ্ডার পোর্চের একটি চ্যাপেলে প্রখ্যাত খৃষ্টান খোদাই শিল্পী গওফ্রিডাস কর্তৃক উৎকীর্ণ কাঠের দরজা। লা ভাউট চিলহাকের গির্জায়ও অনুরূপ আরেকটি দরজা রয়েছে। ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবির বেদির উপর উত্তোলিত তাকে (রিটেব্‌ল্‌) এবং প্রাথমিক যুগের কতিপয় রঙীন কাচের জানালায় যেসব ডোরাকাটা নকশা অঙ্কন করা হয়েছে প্রফেসর লিথ্যাবির মতে সেগুলিও একই সূত্র থেকে এসেছে। *বার্লিংটন ম্যাগাযিন*–এ (৯ম–১২শ খণ্ড, ১৯২২) এ এইচ ক্রিস্টির 'দি ডেভেলপমেন্ট অব অর্নামেন্ট ফ্রম অ্যারাবিক স্ক্রিপ্ট' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

www.waytojannah.com

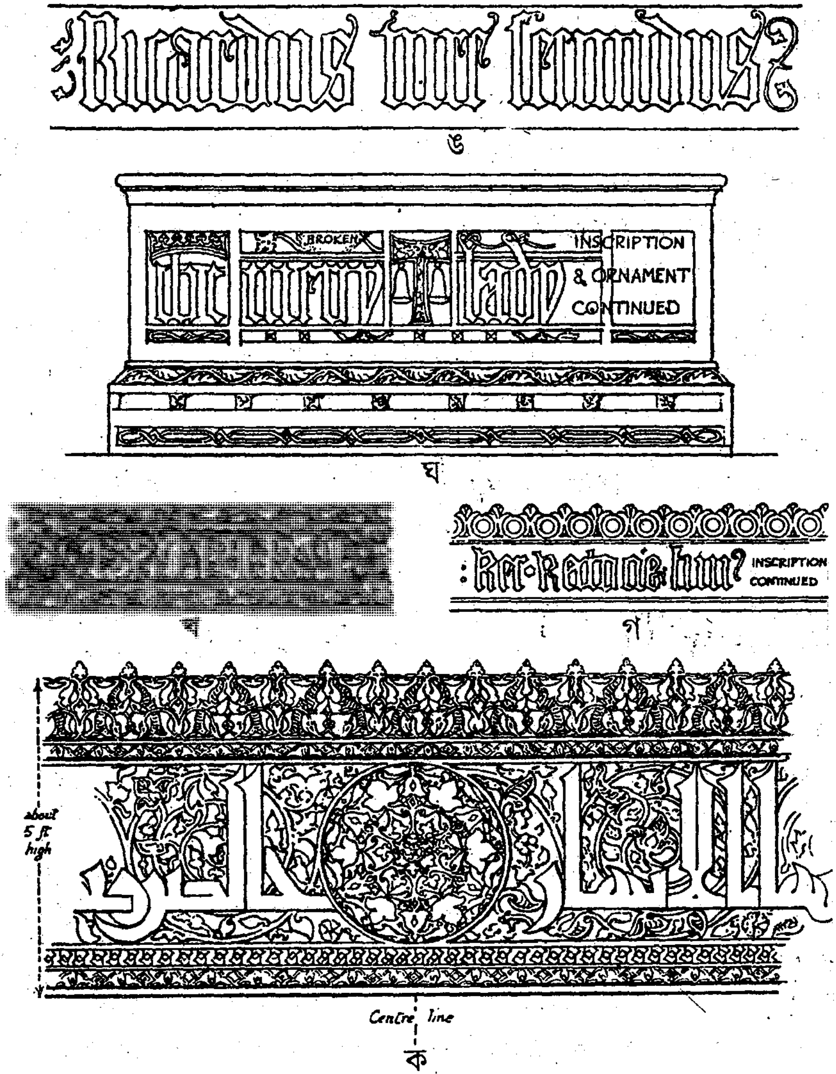

চিত্র-৮৫. কুফীয় এবং গোথীয় খোদাই করা নকশার সম্পূর্ণ সদৃশ প্রতিকৃতি
(ক) কায়রোর সুলতান হাসান মসজিদ (১৬৫৬-৬৩)
(খ) কায়রোর আরব জাদুঘর (একাদশ শতাব্দী)
(গ) নরফকের দক্ষিণে একর গির্জা (১৫৫০)
(ঘ) ইয়র্ক শায়ারের ফিসলেক সমাধি (১৫০৫)
(ঙ) ওয়েস্ট মিনিস্টারের দ্বিতীয় রিচার্ড-এর সমাধি (১৩৯৯)

www.waytojannah.com

Contents

ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির পিছনে অবদান রাখে। সর্বশেষে একথা বলা যায় যে, কোন কোন দূরতর দেশে মুসলিম নির্মাণ শিল্পের বিকাশ এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং এর পরিধি এক হাজার বছরেরও বেশি।

মার্টিন এস ব্রিগ্‌স

গ্রন্থপঞ্জি

এম এস ব্রিগ্‌স্, *মোহামেডান আর্কিটেকচার ইন ইজিপ্ট এণ্ড প্যালেস্টাইন*, (অক্সফোর্ড, ১৯২৪)।

ই ডিয়েয, *ডাই কান্‌স্‌ট্‌ ডের ইসলামিচেন ভোলকার*। (বার্লিন, ১৯১৫)।

জে ফ্রান্‌য্‌, ডাই বাউকুন্‌স্ট ডেস ইসলাম। (ডার্মস্টাট, ১৮৮৭)

এ গায়েট, *এল 'আর্ট অ্যারাবে* (প্যারিস ১৮৯৩)

রিচমণ্ড, ই টি, *মোসলেম আর্কিটেকচার*, ৬২৩–১৫১৬ ঃ *সাম কজেস এণ্ড কনসিকোয়েন্সেস*, রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটি। (লণ্ডন, ১৯২৬)।

জি টি রিভয়রা, *মোসলেম আর্কিটেকচার ঃ ইটস ওরিজিন এণ্ড ডেভেলপমেন্ট* (অক্সফোর্ড, ১৯১৮)।

এইচ স্যালাডিন, ম্যানুয়েল ডি' আর্ট মুসুলমান ঃ টোম ১, আর্কিটেকচার। (প্যারিস ১৯০৭)।

www.waytojannah.com

সাহিত্য

মুসলিম প্রাচ্যের সাহিত্য দৃশ্যত আমাদের পাশ্চাত্যের কাছ থেকে এত দূরে যে, সম্ভবত প্রতি হাজারে একজন পাঠকও আমাদের নিজস্ব সাহিত্যের সঙ্গে কখনো এটিকে হৃদয় দিয়ে মিলিয়ে দেখেনি। অপরদিকে বিভিন্ন সময়ে ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রাচ্যের অবদান কত বেশি ছিল বলে দাবি করা হলেও তা কত কম প্রমাণিত হয়েছে এ সম্পর্কে সাহিত্যের ইতিহাসের যেসব ছাত্র অবহিত রয়েছেন, তারা হয়ত সমগ্র বিষয়টিকে সহনশীল সন্দেহাত্মক মনোভাব নিয়ে বিবেচনা করবেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে এমন কতকগুলি দিক রয়েছে যাতে দ্বিমতের অবকাশ নেই। প্রাচ্যের নীতিমূলক রূপক গল্প এবং এ জাতীয় অন্যান্য রচনা মধ্যযুগে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইংল্যাণ্ডে এ ধরনের প্রথম গ্রন্থ হচ্ছে *'দি ডিকটেস এণ্ড সেয়িংস অব দি ফিলোসফার্স'*। এটি মূল আরবী রচনা থেকে ল্যাটিনে, সেখান থেকে ফরাসীতে এবং সর্বশেষে ইংরেজীতে অনূদিত হয়। অষ্টাদশ শতকে পুনরায় *অ্যারাবিয়ান নাইটস* (আরব্য রজনী)–এর অন্তত ত্রিশটি ইংরেজী ও ফরাসী সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এবং তারপর থেকে পশ্চিম ইউরোপের সবগুলি ভাষায় এর তিনশ গুণেরও বেশি সংস্করণ বেরিয়েছে। ওমর খৈয়াম এমন একটি নাম যা পারস্য থেকে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় বেশি পরিচিত। কিন্তু এগুলি কি প্রাচ্য থেকে বিচ্ছিন্ন অনাহূত প্রবেশ, না একটি সাধারণ প্রবণতার প্রতিফলন আর তাই যদি হয় তাহলে কিভাবে এই প্রবণতার উদ্ভব হয়েছে এবং সাহিত্যের সাধারণ ধারায় তা কি প্রভাব সৃষ্টি করেছে ? দুর্ভাগ্যবশত এসব প্রশ্নের কোন চূড়ান্ত জবাব নেই এবং প্রাপ্ত তথ্য–প্রমাণের ভিত্তিতে জবাব খুঁজে নেওয়ার একটি পন্থা নির্দেশ ছাড়া কোন জবাব দেওয়ার চেষ্টাও বৃথা।

এক সাহিত্য অপর সাহিত্যের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করে তার প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণের কারণগুলি খুঁজে বের করার মতো জটিল সমস্যা আর কিছু হতে পারে না। দুটি দেশের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ও গভীর ঐতিহাসিক সম্পর্ক একটির বা উভয়টির সাহিত্যের অবদান সৃষ্টি করলেও এ ধরনের যোগাযোগ থাকতেই হবে এমন নয়। কিংবা এদের ঐতিহাসিক সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হোক বা শত্রুতামূলক হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। ইউরোপের সবগুলি সাহিত্যের ইতিহাস এ কথা প্রমাণ করে যে, সাহিত্যের আদর্শ ও আন্দোলন সামরিক সীমান্তে বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। ঐতিহাসিক সম্পর্কের চাইতেই বেশি অত্যাবশ্যক জিনিসটি হচ্ছে আন্তঃযোগাযোগ এবং এটিও আবার সাধারণ ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করা অধিকতর দুঃসাধ্য। এই যোগাযোগ ব্যক্তিগত হোক আর দ্বিপক্ষীয়

www.waytojannah.com

Contents

হোক কিংবা প্রায়সিক ব্যাপারের ন্যায় জ্ঞানচর্চামূলক ও একতরফাই হোক, কেবল সাহিত্যিক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই তার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়।

সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারই সবচাইতে দুর্বোধ্য। কোন প্রকার স্থানান্তর সম্ভব হওয়ার আগে পারস্পরিকভাবে একটির বা উভয়টির গ্রহণ করার অবস্থাও থাকতে হবে। একটি যা দিতে পারে অপরটির তা গ্রহণ করার ইচ্ছা থাকতে হবে এবং যে কোন ক্ষেত্রে তার প্রাধান্যর স্বীকৃতি থাকতে হবে। কোন গভীর পর্যালোচনা ছাড়াই একথা বলা যেতে পারে যে, আরবী বা পারস্য সাহিত্যের ধরনসমূহের ইউরোপীয় গ্রহণ ক্ষমতা সময় ও সুযোগের দিক দিয়ে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্যে ধীরে ধীরে ল্যাটিন রেনেসাঁর যুগ থেকে গ্রীক প্রভাবের সূক্ষ্ম মিশ্রণ এবং প্রাচ্য সাহিত্যের উপাদানগুলির অনিয়মিত ও অর্ধ–মিশ্রিত অভিযোজনের কোন তুলনা হতে পারে না। ইউরোপীয় সাহিত্যে কোন প্রাচ্য সাহিত্য কলাকে সামগ্রিকভাবে স্থানান্তরের মতো কোন ব্যাপার ঘটেনি। কিন্তু এককভাবে কলাকৌশলগত উপাদান এবং সময় সময় সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত উদ্দেশ্যগুলি সাফল্যজনকভাবে স্থানান্তরিত হয়। অন্যান্য বিষয় বাদ দিয়ে কেবল এসব দিক কেন নির্বাচিত হয়েছে তা প্রধানত একটি জাতীয় ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। অবশ্য এরূপ মন্তব্য করা যেতে পারে যে, প্রাচ্য সাহিত্য ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে তার পার্থক্যের চাইতে সামঞ্জস্যের মাধ্যমেই প্রভাব সৃষ্টি করেছে। ইউরোপের সাহিত্য রুচি প্রাচ্য সাহিত্যের অত্যন্ত অপরিচিত উপাদানগুলিকে আগাগোড়া প্রত্যাখ্যান করে। অপর দিকে ইউরোপীয় চিন্তাধারা ও জ্ঞান–বিজ্ঞানে প্রাচ্য সাহিত্যের যেসব উপাদানের বীজ নিহিত ছিল কিংবা প্রবিষ্ট হচ্ছিল পাশ্চাত্য সাহিত্য সেগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়। এসব ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য যে দ্বারদেশে করাঘাত করছিল প্রাচ্যের সাদৃশ্যগুলি তা উন্মুক্ত করে দেয়, কিংবা তাদের সাহিত্য কৌশলের রূপ ও সৌন্দর্য এতটা জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, সেগুলি ইউরোপীয় অগ্রগমনের পথকে আলোকিত করে। এতদ্বারা একথা বোঝায় না যে, তারা ক্রীতদাসের ন্যায় অনুকরণের জন্য কোন মান বা আদর্শ স্থাপন করেছে। বরং তাদের প্রেরণাকে পরবর্তীকালে সাহিত্যের যে সব শাখায় প্রয়োগ করা হয়েছে তা প্রাচ্যের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখে এবং প্রায় ক্ষেত্রে এর প্রাচ্যের পথপ্রদর্শকদের সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে নিজস্ব বিশেষ ধারায় বিকাশ ও প্রসার ঘটায়।

প্রাচ্য ও ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের যে প্রভাব সৃষ্টি করে তার মধ্যে একটি সাদৃশ্য খুঁজতে গিয়ে এ দুটির মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা উপেক্ষা করা হয়। কেবল পরিমাণের ক্ষেত্রে নয়, প্রকারের মধ্যেও এই পার্থক্য বিরাজমান। আরব ও পারস্যের সাহিত্য মূলত 'রোমান্টিক'। যে ছাত্র সাহিত্য ক্ষেত্রে অত্যন্ত উন্নত মানের গ্রীক আদর্শের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত তিনি গ্রীক সাহিত্যের চিরন্তন আকর্ষণের বৈশিষ্ট্যগুলির কদাচিৎ সন্ধান পান। আকারের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ দক্ষতা থাকলেও গ্রীক সাহিত্য যেখানে বৈচিত্র্যময়, সেখানে সুদৃঢ় এবং যেখানে

www.waytojannah.com

Contents

কঠোর সেখানে অমিতব্যয়ী। ক্লাসিক সাহিত্য সংযম ও সরলতার মাধ্যমে মহত্ত্ব অর্জন করে, আর প্রাচ্য সাহিত্য মূল্যবান ও অস্পষ্ট ভাষার এমন সূক্ষ্ম বুননীর সৃষ্টি করে যা প্রায়ই অস্বাভাবিক ও উদ্ভট উপমায় সমৃদ্ধ। গ্রীক সাহিত্য সৌন্দর্যের মাধ্যমে বুদ্ধির জগতে আবেদন সৃষ্টি করে এবং আরবী ও পারস্য সাহিত্য রূপ মাধুর্যের মধ্য দিয়ে অনুভূতি ও কল্পনাকে নাড়া দেয়। গ্রীক সাহিত্য সৃষ্টিধর্মী এবং প্রাচ্য সাহিত্য মূলত অনুকরণমূলক ও বুদ্ধিদীপ্তিতে দুর্বল। এরূপ মন্তব্যে সত্যের কিছু উপাদান থাকলেও সামগ্রিকভাবে এটি ঠিক নয় বরং এরূপ মন্তব্য বাড়িয়ে বলার এবং নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতা প্রকট। রোমান্সের ভাষায় চিন্তার মৌল বাস্তবতাকে সুশোভিত করার ক্ষেত্রে মুসলিম লেখকরা অন্যদের ছাড়িয়ে গেছে কিন্তু এর থেকে এরূপ সিদ্ধান্তে আশা ভুল হবে যে, প্রাচ্যচেতনা ও ইউরোপীয় চেতনার মধ্যে বৈষম্য রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বৈষম্য রয়েছে প্রাচ্যচেতনা ও ক্লাসিক্যাল চেতনার মধ্যে। ইউরোপীয় সাহিত্যে ক্লাসিকতা সব সময় উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাচ্য সাহিত্যের চেতনার সঙ্গে জনগণের বিশেষত উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে জনগণের সাহিত্যের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়। পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা ও অজ্ঞতা থেকেই তাদের পারস্পরিক অনুভূতির মধ্যে দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে। যখনি উভয়ের মধ্যে একটি যোগাযোগের সূত্র উন্মুক্ত হয়েছে, তখনি ইউরোপীয় সাহিত্যের জনপ্রিয় ধারার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য প্রাচ্য প্রভাবের ধারা সাধারণত এতটা বেগবান হয়ে ওঠে যে, তা ক্লাসিক্যাল প্রাধান্যের বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।

এই জনপ্রিয় আবেদন এবং মধ্যযুগে প্রাচ্য উপাদানের আমদানি পদ্ধতিটিকে আরো অস্পষ্ট করে তুলেছে এবং বিষয়টি আরো জটিল হয়ে ওঠে। এতে ঐতিহাসিক সমালোচনার সাধারণ পদ্ধতিতে তা প্রমাণ করা প্রায়ই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। উভয় দিকের অধিকাংশ গণসাহিত্য ধ্বংস হওয়ার ফলেও এই জটিলতা বৃদ্ধি পায়। এতদসত্ত্বেও আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসগুলিতে আরবী লেখক এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতরা সাধারণত লোকসংগীত ও লোক–কাহিনীর প্রতি যে অবজ্ঞাসূচক দূরত্ব বজায় রাখেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এরূপ বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে, আধুনিক লোক–সাহিত্য পর্যালোচনা সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে প্রাচ্য থেকে আহরিত উপাদান ও কৌশল কতটা পরিব্যাপ্ত হয়েছে সে সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে আলোকপাত করবে। সম্ভবত এই প্রভাব অষ্টম শতকেও কার্যকর ছিল।[১] তবে প্রধানত দেশীয় ভাষার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচ্য যোগাযোগের প্রশ্নের উদ্ভব হয়।

একেবারে প্রথম প্রশ্নটিই সম্ভবত সবচাইতে দুরূহ সমস্যা এবং সবচাইতে বিতর্কমূলকও বটে। একাদশ শতকের সমাপ্তিতে দক্ষিণ ফ্রান্সে নতুন বিষয়বস্তু সমন্বিত

---

১. আরবীর প্রভাবের ক্ষেত্রে গথিক মধ্যস্থতার পক্ষে প্রফেসর লিও ওয়াইনারের উদ্ভাবনমূলক যুক্তিসমূহ (কেনট্রিবিউশন টুয়ার্ডস এ হিষ্টোরী অব অ্যারাবিকো গথিক কালচার, ১ম খণ্ড, নিউইয়র্ক, ১৯১৭), বিশেষ করে ব্যাকরণবিদ ভার্জিলিয়াস মারো সম্পর্কিত অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

www.waytojannah.com

Contents

একটি নতুন ধরনের কাব্য, একটি নতুন ধরনের সামাজিক মনস্তত্ত্ব এবং নতুন ধরনের কাব্যরীতি আকস্মিকভাবে দেখা দেয়। পূর্ববর্তী ফরাসী সাহিত্যে এমন কিছু ছিল না যেখান থেকে এই নতুন জিনিসের আভাস পাওয়া যেতে পারে। অপর দিকে এই নতুন কাব্যে আরব স্পেনের সমসাময়িক কাব্যের একটি বিশেষ রীতির সুস্পষ্ট সামঞ্জস্য দেখা যায়। কাজেই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই মনে করা যেতে পারে যে, প্রথম 'প্রভেন্সাল'[১] কবিরা আরবী আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হন। এই অভিমত কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় নিঃসন্দেহে স্বীকৃত হয়। এই অভিমত ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনের প্রবল বেগের মধ্যে গিয়ামোরিয়া বারবিরির ন্যায় এতোটা দৃঢ়তার সঙ্গে কখনো আর কেউ সমর্থন করেনি।[২] অষ্টাদশ শতকের সমাপ্তিতে মধ্যযুগীয় সাহিত্য পর্যালোচনা যখন পুনরুজ্জীবিত হয় তখনো জনসাধারণের কল্পনা প্রাচ্যের রোমান্সে আবিষ্ট ছিল। এসময়রেওসিস্মণ্ডী ও ফরিয়েলের নেতৃত্বে সাধারণভাবে মনে করা হতো যে, আরবী কাব্যের সঙ্গে প্রভেন্সালের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কেবল উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়েই প্রাচ্য ভাষাবিদ ও রোমান্স ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে আকস্মিকভাবে এই মতের পরিবর্তন দেখা দেয়। সমালোচকরা 'প্রভেন্স' ও আন্দালুসিয়ার মধ্যে যোগাযোগের প্রামাণ্য রেকর্ডপত্র দাবি করেন। এধরনের প্রমাণ না পাওয়ায় তাঁরা চরম বিপরীত মতের অনুসারী হন। যে অতি উত্তপ্ত জাতীয়তাবাদ পাশ্চাত্য জাতিগুলিকে উত্তেজিত করে তোলে তার প্রতিক্রিয়ায় কেউ নিরাসক্ত মনে কিছুটা সমর্থন জানালেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বিখ্যাত প্রাচ্য ভাষাবিদ ডোফির নিম্নোক্ত নিন্দাসূচক অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে কোন আত্মমর্যাদা সচেতন রোমান্স পণ্ডিতই আরবীর প্রভাবের মতবাদ সমর্থন করতে পারেন না ঃ 'নাউস কনসিডারনস্ সেট্রে কোয়েশচন কম টাউট এ ফেইট ওয়সিউস, নাউস ভাউড্রিয়ন্স নেপ্লাস লা ভয়ের ডিভ্যাটু, কুইক নাউস সিয়ন্স কনভেইনকু কোয়েলে লি সেবা পেডান্ট লংটেম্পস এন্কোর। এ চাসুন সন চিভাল ডি ব্যাটেইলি?[৩] মনে হয় এই যুক্তির উপর ভিত্তি করেই প্রচলিত মতামত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এ ব্যাপারে মঁসিয়ে অ্যাংলেডের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ঃ 'আইনসি ফন্ড এট ফর মে, লেস ট্রুবাডুরস্ ওন্ট টাউট ক্রী।'

কিন্তু পক্ষে বিপক্ষে উভয় প্রকারের মতামতের সঙ্গে প্রদত্ত আশ্বাস সত্ত্বেও উভয়টিই বাস্তবের চাইতে অনুমানের উপরই প্রতিষ্ঠিত। প্রাচ্য ভাষাবিদদের পক্ষ থেকে সমস্যাটি সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে যে সব গবেষণা করা হয়েছে তাতে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত কোন

১. ভূমধ্যসাগরের তীরে দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রান্সের একটি সাবেক প্রদেশের অধিবাসী, ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদি। কতিপয় আঞ্চলিক ভাষার সমন্বয়ে গঠিত এখানকার সুস্পষ্ট রোমান্স ভাষা ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ভাষা ছিল। এই ভাষায় ট্রুবাডুর নামে পরিচিত গীতি কবিরা সাড়া জাগানো কাব্য রচনা করেন।—অনুবাদক

২. ডেল অরিজিন ডেল্লা পোয়েসিয়া রিমাটা (টিরাবস্চি কর্তৃক প্রকাশিত মডেনা, ১৭৯০)।

৩. রিসার্চেস সুর এল হিস্টোরী.....ডি এল, এসপাঁনে ৩য় সং (১৮৮১) ২য় খণ্ড, পরিশিষ্ট ৬৪, নোট ২।

www.waytojannah.com

বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু বর্তমানে এমন কিছু নতুন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যাতে এ ব্যাপারে সর্বপ্রকার সন্দেহের অবসান ঘটেছে যে, দক্ষিণাঞ্চলের[১] কাব্যচর্চা অন্তত কিছু পরিমাণে হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে প্রাচীনতম প্রভেন্সাল কবিদের প্রভাবিত করেছে।[২]

প্রভেন্সাল কাব্যের অভিনবত্ব রচনার মূল বিষয়ে নয়, এর প্রচলিত প্রকাশ ভঙ্গিতে নিহিত। এই স্পন্দিত প্রেম এক অদ্ভুত কল্পিত চিত্র ও সাহিত্য সৌন্দর্যের ঐশ্বর্যে গরীয়ান হয়ে উঠেছে। এর সঙ্গে সাধারণ মানুষের সহজ সরল ও আবেগপূর্ণ সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশিত প্রেমের তুলনা করা যায় না। একটি ভাবাবেগপূর্ণ মতবাদ, রোমান্টিক শ্রদ্ধা-ভক্তি এবং নিরূপণমূলক অবস্থাই কাল্পনিক উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারে। এতেই কুমারী নারী নয়, বরং স্ত্রীর মধ্যে আদর্শ মানসী খুঁজে পাওয়া যায়। এই মানসীর প্রতি ভক্তি এবং সেবা থেকে এমন এক নৈতিক শক্তির উদ্ভব হয় যা কবির জীবনকে সমৃদ্ধ ও মহত করে তোলে। এই প্রেমচাতুর্য, এই গৃহলক্ষ্মী ভজন কোত্থেকে এসেছে? সময়ের আচরণে টিউটনিক বা রোমান্স যে কোন গণসাহিত্যে এদের যেভাবে প্রতিফলিত করা হয়েছে সেখান থেকে তা আসতে পারে না। ব্রুনেটিয়ার লিখেছেন, "মধ্যযুগের বুর্জোয়া জীবনে মেয়েরা এতটাই নিচের দিকে মাথা নত করেছে যতটা অন্য কোন যুগে পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে আইনের বলে কিংবা নিষ্ঠুরতায়ও তারা করেনি।" শিভলরির যেসব নতুন আদর্শ অভিজাত শ্রেণীকে অনুপ্রাণিত করতে শুরু করে তার মধ্যেও কোনভাবে এটি নিহিত ছিল না। যোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে এই কৃত্রিম ভাবাবেগের কোন মিল নেই। নারীর প্রতি নতুন শ্রদ্ধা-ভক্তির আদর্শ গির্জার সতীত্বের আদর্শের সরাসরি পরিপন্থী ছিল। পেশাদার কবি ও তার কাব্যচর্চায় পৃষ্ঠপোষক মহিলার স্বাভাবিক সম্পর্ক থেকে যদি এর উদ্ভব হতো তাহলে এর সুর আরো বিনয়নম্র হতো। স্বর্ণ যুগের কিংবা রৌপ্য যুগের হোক, গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যে এমন কিছু ছিল না যা এর মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে পারে। এতদসত্ত্বেও এটি স্পষ্টত একটি প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য ঐতিহ্যের ওপর নির্ভর করে এবং অন্তত সেই সাহিত্য ঐতিহ্যের সম্ভাব্য সূত্র হিসাবে আমরা স্পেনের আরবী কাব্যের দিকে তাকাতে পারি।[৩]

একাদশ শতকের মধ্যে আরবী কাব্যের বিকাশ ও উন্নয়নের একটি সুদীর্ঘ প্রেক্ষিত গড়ে ওঠে। কিন্তু যতো পিছনেই যাওয়া যাক না কেন প্রেমই ছিল সব সময় এর অন্যতম প্রধান উৎস। বিশুদ্ধ ভাষা, বিস্তারিত উপমা, জটিল ছন্দ ও নিখুঁত মিলের (পাশ্চাত্য ভাষাগুলির মধ্যে আরবীই সর্বপ্রথম কাব্যের একটি মৌল উপাদান হিসাবে পূর্ণাঙ্গ মিলের

১. মুসলিম স্পেন; তথা আন্দালুসিয়া।-অনুবাদক

২. বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এর পর ল্যাটিন, সেলটিক প্রভৃতি সূত্রের প্রভাবকে অস্বীকার করার কিংবা কিছু পরিমাণে দেশীয় অবদানকে বাতিল করার কোন মনোভাব দেখা যায় নি।

৩. এ বিষয়ের আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : কে বুরদাচ্, উবার ডেন আর্সপ্রাং ডেন মিটেনালটার লিচেন মিনেসাংস, এস বি প্রিউস। অ্যাকাড, উইস, ১৯১৮।

www.waytojannah.com

ওপর গুরুত্ব আরোপ করে) মাধ্যমে সৃষ্ট চিরাচরিত চিত্রকল্পে সমৃদ্ধ মরুভূমির প্রাচীন কাব্য সুষমার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি গীতি কবিতার প্রারম্ভে প্রিয়তমার বিচ্ছেদ ব্যথা তুলে ধরা হতো। পরিত্যক্ত তাঁবু এলাকায় ফিরে আসার পর তার স্মৃতি উদ্বেলিত হয়ে উঠতো। শহরাঞ্চলে হিযরতের পর এসব কাব্যে প্রেমের উদ্দেশ্য আরো বলিষ্ঠ হয়ে দেখা দেয়। মরুভূমির সহজ–সরল সুখানুভূতির স্থলে একটি সূক্ষ্ম নতুন অনুভূতির প্রতিফলন ঘটে। উপাখ্যানমূলক গীতিকাব্যের স্থলে ছোট ছোট গীতি কবিতার উদ্ভব হয়। এসব কবিতায় কবি তার নিজস্ব সত্তা ও আবেগ তুলে ধরেন। গীতিধর্মী কবিতা নিজস্ব পন্থায়, স্টাইলে ও চিরন্তন রীতিতে পরিণত হওয়ার আগে আরবী কাব্য কয়েক দশক পর্যন্ত অবাধ, হাস্য–উচ্ছল ও জীবনধর্মী নতুন প্রাণে উজ্জীবিত হয়। অপর দিকে দরবারী কবিদের মধ্যে এটি ভাবাবেগপূর্ণ গীতিরস ও অতি সূক্ষ্ম রূপলাবণ্য লাভ করে। সেখানে প্রকৃত আবেগের উত্তাপের স্থলে সাহিত্যিক নিপুণতার সঙ্গে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সঙ্গীতের সংমিশ্রণ ঘটে। জনসাধারণের মধ্যে এটি এক নতুন কলায় রূপায়িত হয়– যে উন্মত্ত প্রেমিকের জীবন এক দুর্লভ ও আদর্শ মানসীর প্রতি নিষ্কাম প্রেমে উৎসর্গীকৃত তার রোমান্সে পরিণত হয়। আধ্যাত্মিকতাবাদীদের মধ্যে একটি উন্নত ও আধ্যাত্মিক প্রেমের এসব চিত্রকল্পে নিহিত আদর্শবাদের উপাদানগুলিকে মাশুকের প্রতি আত্মার অবিরাম ভক্তির রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আরব ও পারস্যের মরমী কাব্যে পার্থিব প্রেমের বলিষ্ঠ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্রকল্প প্রাধান্য লাভ করে। এসব গীতি কবিতা ছিল শব্দাড়ম্বরে ও আনন্দের রেশে উচ্ছল। কোন কোন আরব কবি আরবদের চিরাচরিত অদ্ভুত পন্থায় তা প্রকাশ করেন। অন্যদের হাতে তা দার্শনিক ধ্যান–ধারণায় অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুরুচিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। পারস্য কবিদের হাতে নতুন মাধুর্য ও সরলতার আমেজ লাভ করে। পারস্যের চিন্তাধারা থেকে স্বাভাবিকভাবে উৎসারিত উন্নত চিত্রকল্পে সুষমামণ্ডিত হয়। ইউরোপীয় সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রেমমূলক গীতিকাব্যের প্রতিটি রূপই নিজস্ব ভূমিকা গ্রহণ করে।

এই নতুন গীতিকাব্যের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, নিষ্কাম প্রেমের একটি সুনির্দিষ্ট সাহিত্য পরিকল্পনার উদ্ভব। এর সঙ্গে আরবের সুস্পষ্ট অবদান প্রেমের সামাজিক ও নৈতিক মতবাদের সংমিশ্রণ ঘটে। অষ্টম শতকের শেষ ভাগেই বাগদাদের দরবারে কোন কোন কবি তাদের কবি প্রতিভাকে একান্তভাবে এই প্রেমমূলক কাব্যসাধনায় নিয়োজিত করেন। একশত বছরেরও কম সময়ের মধ্যে জনৈক কিশোর এই পরিকল্পনাটিকে একটি একক আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে সুসংবদ্ধ করেন। তিনি ইসলামের একটি সাধক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার পুত্র ও উত্তরাধিকারী ইবনে দাউদ। *'বুক অব ভেনাস'* গ্রন্থে তিনি প্রেমের সবগুলি দিক, এর স্বভাব, বিধি, প্রকাশভঙ্গি এবং প্রতিক্রিয়া কবিতার মাধ্যমে সুবিন্যস্ত, শ্রেণীবদ্ধ ও বিশ্লেষণ করেন। এই কাজে তিনি মহানবীর নিম্নোক্ত উক্তির আদর্শে

www.waytojannah.com

অনুপ্রাণিত হন ঃ 'যিনি প্রেম করেন এবং প্রেমকে গোপন রাখেন, পবিত্র থাকেন এবং ইনতিকাল করেন, তিনি একজন শহীদ।'

মুসলিম বিশ্বে সাংস্কৃতিক ঐক্য স্পেনেও এসব কাব্যিক শিল্পচর্চা সুনিশ্চিত করে। কিন্তু এখানে জনসংখ্যার স্পেনীয় ও আরব উপাদানের সংমিশ্রণে এবং উত্তরাঞ্চলের খৃষ্টান শক্তির সঙ্গে ক্রমাগত সংগ্রামের উদ্দীপনায় এগুলি স্বতন্ত্র ধারায় আরো বিকশিত হয়। আরবী সাহিত্যের অন্য কোন যুগে সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কবিতার প্রেরণা, হৃদয়-মনে সৌন্দর্যের প্রতিফলন এবং এসব প্রতিফলনকে আবেগপূর্ণ অপরূপ ভাষায় সুষমামণ্ডিত করার ক্ষমতা এতো বেশি প্রসার লাভ করেনি। এ ক্ষেত্রে জানা-অজানা অসংখ্য কবির মধ্যে ডোযী[১] কর্তৃক উদ্ধৃত সা'দ ইবনে জুদাইর গীতিকাব্য দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। এখানেও নিষ্কাম প্রেমের আদর্শ সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করে। ইবনে হাযম্-এর নাম ইসলামে ধর্মনিষ্ঠতা ও তীব্র বাদানুবাদের জন্য অত্যন্ত বিখ্যাত। পাশ্চাত্যে তিনি তুলনামূলক ধর্ম বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে শ্রদ্ধেয়। এই ব্যক্তিও প্রেম সম্পর্কে তার স্বরচিত কবিতায় এমন একটি গ্রন্থ রচনা করেন যা সম্ভবত *'বুক অব ভেনাস'কেও* ছাড়িয়ে গেছে।[২] তিনি নিষ্কাম প্রেমের মতবাদকে এমন একটি পন্থা হিসাবে গ্রহণ করেন যার মাধ্যমে একটি মহান অস্তিত্বের বিচ্ছিন্ন অংশগুলি পার্থিব সংযোগ লাভ করে। এই পবিত্রতম ভাব-প্রবণতার চেতনায় প্রেমের এমন এক বিশ্লেষণ সাধিত হয় যা বহু দিক দিয়ে পরবর্তী শতকে ট্রুবাডুরদের (প্রভেন্সের গীতি কবি) মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু ট্রুবাডুররা তার গৌরবোজ্জ্বল উচ্চতায় পৌঁছতে কদাচিৎ সক্ষম হয়।

স্পেনীয় আরবী কাব্যের এতোখানি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া সত্ত্বেও যে কাব্য আমাদের যুগ পর্যন্ত এসেছে তার অধিকাংশই দরবারী কবিদের সতর্কতার সঙ্গে সুমার্জিত রচনা। তাদের কাব্যচর্চার আভিজাত্য যুবরাজ ও মন্ত্রীদের আভিজাত্যের সঙ্গে তুলনীয়। বস্তুত তারা নিজেরাও যুবরাজ ও মন্ত্রী ছিলেন। স্পেনীয় আরবী সংস্কৃতির এই দরবারী সুষমায় ধীরে ধীরে একটি নতুন কাব্যিক কৌশল গড়ে ওঠে। সমপরিমাণ দৈর্ঘ ও যতি চিহ্ন সম্বলিত ব্যাঙ্গাত্মক ও একক ছন্দের ছোট ছোট কবিতার পাশাপাশি আন্দালুসীয় প্রেমাত্মক গীতি-কবিতায় নতুন স্তবক রীতির প্রাধান্য দেখা দেয়। এসব স্তবকে অন্তর্মিল ও সূক্ষ্ম ছান্দিক কৌশল অনুসৃত হয়। এসব ছন্দ এখনো স্বরভিত্তিক হলেও তা যেনো ট্রুবাডুর কাব্যের পথে এক পা এগিয়ে যায়। সেটিও ছিল মূলত প্রেমাত্মক কাব্য এবং অমাত্য ও দরবারী কবিদের অবদান। তারাও একইভাবে প্রচলিত কৃত্রিম রীতি ও জটিল স্তবক

---

১. হিস্টোরি ডেস মুসুলমানস ডি এল, এস পাগনে, ২য় ২২৭ এফ এফ (জি স্টোক্সের ইংরেজী অনুবাদ, স্প্যানিশ ইসলাম, পৃষ্ঠা ৩৩২-৫।)

২. ইবনে হাযম্ (মৃ. ১০৬৪) তাওক আল-হামামা (লি কোলিয়ার ডি লা কলোম্বে), পরিচিতিসহ সম্পাদনা, পেটফ, লিডেন, ১৯১৪।

www.waytojannah.com

Contents

অনুসরণ করতেন। একটি অসুবিধাই থেকে যায়। প্রাথমিক ট্রুবাডুরগণ কেউই আরবী জানতেন না। তাহলে আন্দালুসিয়া থেকে প্রভেন্সে এই কাব্যরীতি আমদানির মধ্যবর্তী ব্যক্তিরা কারা ছিলেন?

ডোযীর আমল থেকে সেতুর নিচ দিয়ে বহু পানি গড়ালেও একথা অকপটে স্বীকার করতে হবে যে, এ সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান এখনো দেওয়া যায় না। বর্তমানে সর্বপ্রকার প্রশ্নের উর্ধে[১] এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, আন্দালুসিয়ার 'মূররা' বিপুল পরিমাণে কেবল রক্ত সম্পর্কের দিক দিয়েই স্পেনীয় ছিলেন না, বরং উচ্চতম পর্যায় থেকে নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত তারা সবাই পরিচিত ও অভ্যাসগতভাবে রোমান্স ভাষা বুঝতে ও বলতে পারতেন। এসব স্পেনীয় মুসলমান আরবী সংস্কৃতিকে আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে সেই সংস্কৃতিতে অবদানও রাখতেন এবং এদের সহযোগিতায় স্পেনীয় আরব সংস্কৃতি এর বহু সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। আন্দালুসিয়ার খৃস্টানরা অর্ধ–আরব হয়ে পড়েন (তাদের *মোযারেব* নামেই এই ইঙ্গিত পাওয়া যায়) এবং প্রায়ই আরবী সাহিত্যে দক্ষতা অর্জন করেন। অন্যদিকে তারা ইসলামী সংস্কৃতির বহু বীজ উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ছড়িয়ে দেন।

এই ধরনের আন্তঃক্রিয়া পদ্ধতি আন্দালুসীয় ও অনেকখানি স্পেনীয় কাব্যে মৌলভাবে সক্রিয় ছিল। *স্ট্রৌফিক*[২] ছন্দ বিকাশে স্পেনীয় প্রতিভা বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে, কিন্তু অপরদিকে *স্ট্রৌফির* আকার আরবী আকার ও ছন্দ বিধির প্রভাব এই রচনা কৌশলকে যেভাবে মার্জিত করে *(মুয়াশশাহ্)* তা জনপ্রিয় দ্বিভাষিক গাথায় (যাজাল) প্রতিফলিত হয়েছে এবং সেখান থেকেই এটি নিখুঁত রোমান্স কাব্যে প্রবর্তিত হয়েছে। *যাজালের* সঙ্গে জনপ্রিয় *ভিলানসিসোর* যে মিল রয়েছে সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই এবং এরূপ মনে করারও কোন কারণ নেই যে, *রোমানসোরোতে* আরবী উপাদান যতো কম বলেই প্রমাণিত হোক না কেন তাতে এ ধরণের আন্তঃক্রিয়া কেবল রচনাকৌশলে কিংবা এক ধরনের কাব্যে সীমাবদ্ধ ছিল *'ক্রনিকা জেনারেল'*–এ আরবী ও স্পেনীয় ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা স্পেনীয় গদ্য সাহিত্য একটি সাদৃশ্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে।[৩]

অতএব, আমদানির মাধ্যম ছিল জনপ্রিয় *'যাজাল'* এবং রোমান্স ভাষায় এর সমপর্যায়ভুক্ত *'ভিলানসিসো'*। সৌভাগ্যবশত এই জনপ্রিয় সাহিত্যের একটি মূল্যবান অংশ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। এটি দ্বাদশ শতকের প্রথম দিকে আন্দালুসীয় কবি ইবনে কুয্মান কর্তৃক অশিষ্ট মিশ্রিত উপভাষায় রচিত প্রায় ১৫০টি ছোট ছোট কবিতার

---

১. ডন জুলিয়ান রিবেরা ডিসারটেনিয়াস ওয়াই ওপাসকুলস (মাদ্রিদ, ১৯২৮), ১ম, ১২–৩৫, ১০৯–১২।

২. স্ট্রৌফি শব্দের বিশেষণ ঃ প্রাচীন গ্রীক থিয়েটারে সমবেত সঙ্গীতের গায়কদল মঞ্চের ডান দিক থেকে বাম দিকে গমনের সময় যেভাবে সুরের পরিবর্তন ঘটাতেন গীতি কবিতার তেমনি পরিবর্তনমূলক স্তবক।–অনুবাদক

৩. দ্রষ্টব্য ফিস্‌মাউরিস কেলি, *এ নিউ হিস্টোরী অব স্প্যানিশ লিটারেচার*, ১৯২৬, পৃ ২৪; আর মেনেণ্ডেয পিডাল, এল রোমান্সেরো পৃঃ ৫৮।

www.waytojannah.com

একটি সংগ্রহ। তিনি প্রাথমিক ট্রুবাডুর কবিদের সমসাময়িক হলেও তার নিজস্ব স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আন্দালুসিয়ার একটি প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য অনুসরণ করছিলেন। তার কবিতার রচনাকৌশল–এর সমাপ্তি ও মিলের ক্ষেত্রে আরবী কিন্তু ছান্দিক বিপ্লব ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। ছন্দ তখন অক্ষরভিত্তিক না হয়ে স্বরভিত্তিক। তার অধিকাংশ কবিতাই (রিবেরার বর্ণনা অনুযায়ী) রাস্তায় চারণ কবিদের অভিনয়ের উদ্দেশ্যে রচিত নাটকীয় কাহিনী। তাই সেখানে স্তবকগুলি সমবেত কণ্ঠে গান গাওয়ার উপযোগী করে অত্যন্ত নিপুণভাবে রচিত হয়েছে। এসব স্তবকের সঙ্গে প্রথম 'প্রভেন্সাল' কবিদের ছন্দ ব্যবস্থা তুলনা করা হলে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য দেখা যায়। উইলিয়াম অব পয়টিয়ার্সের কবিতাগুলি এমন ছন্দে রচিত যার সঙ্গে মাঝে মাঝে ইবনে কুয্মানের ছন্দের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে কিছুটা ব্যতিক্রম হলেও তা মূলত সমবেত সঙ্গীতের জন্য উদ্ভাবিত শোকগাথার একটি পরিকল্পনা সংযোজনের ফল। তাছাড়া 'প্রভেন্সাল কবিদের' স্বেচ্ছাচারিতা ও খামখেয়াল থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তারা এমন সব ছন্দ ব্যবহার করছিলেন যার কোন প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য কিংবা অস্তিত্বের যুক্তি ছিল না। অথচ আন্দালুসিয়ার সমবেত সঙ্গীতমূলক কবিতা তার সাঙ্গিতিক ও ছান্দিক প্রয়োজনীয়তা এতটা যথাযোগ্যভাবে অক্ষুণ্ণ রাখে যে, বিজ্ঞ আলফন্সো ও পরবর্তী স্পেনীয় কবিদের কবিতায় 'প্রভেন্সাল' কাব্যে এখনো এর প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।[১]

এখনো একটি চূড়ান্ত বক্তব্য দেওয়ার অবকাশ রয়েছে। ইবনে কুযমানের কবিতায় কোনক্রমেই আন্দালুসিয়ার দরবারী কাব্যের উদ্বেলিত আবেগ কিংবা জনপ্রিয় গাথার নিষ্কলুষ রোমান্স প্রতিফলিত হয় না। উইলিয়াম অব পয়টিয়ার্সের কোন কোন কবিতা একই নৈতিকতার সংকীর্ণ ধারা থেকে খুব দূরে না গেলেও এই আন্দালুসীয় জনপ্রিয় কাব্যের সুর ও 'প্রভেন্সাল' দরবারী কাব্যের প্রচলিত আদর্শবাদের মধ্যে বিরাট বৈসাদৃশ্য রয়েছে কিন্তু ইবনে কুযমান স্পেনীয় আরব সমাজের এক বিস্ময়কর অধপতনের চিত্র প্রতিফলিত করেন। বিখ্যাত কাব্যসমূহের জনপ্রিয় সংস্করণগুলি সম্পর্কে আরব লেখকদের প্রাসঙ্গিক মন্তব্যসমূহ বিবেচনা করলে এরূপ সম্ভাবনা খুব প্রবল যে, অন্যান্য জনপ্রিয় কাব্যে (বিশেষত একাদশ শতকে আন্দালুসিয়ার সংস্কৃতি যখন উন্নতির চরম শিখরে তখন) দরবারী কাব্যের আদর্শসমূহ অধিকতর বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে।

সাক্ষ্য–প্রমাণের এই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, আন্দালুসিয়ার দরবারী কাব্য ও 'প্রভেন্সের' কাব্যের মধ্যে একই সময়ে সংঘটিত এসব ঘটনা প্রবাহের আলোকে আমদানির মতবাদ সরাসরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এখনো এমন বহু বিষয়

১ রিবেরা, অপ সিট, ১ম, ৩৫–৯২।

www.waytojannah.com

রয়েছে যা সুস্পষ্ট হওয়া দরকার। এছাড়া অন্যান্য প্রশ্নও রয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ[১] আন্দালুসীয় ও প্রভেন্সাল' কাব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সঙ্গীত এ সমস্যার উপর অনেকখানি আলোকপাত করতে পারে। আমরা প্রফেসর ম্যাকাইলের সঙ্গে পুরোপুরি একমত হতে না পারলেও আরবী কাব্য ইউরোপে নতুন কাব্য ধারা উদ্ভবে কিছু পরিমাণে অবদান রেখেছে, এই দাবি আপাতত যুক্তিযুক্ত বলে মেনে নিতে পারি। প্রফেসর ম্যাকাইলের বক্তব্য হচ্ছে ঃ 'ইউরোপ জুদিয়ার[২] কাছে যেমন তার ধর্মের জন্য ঋণী তেমনি অ্যারাবিয়া (আরব) কাছে তার রোমান্সের জন্য ঋণী।'[৩]

দ্বিতীয় যে এলাকা থেকে ইউরোপে আরবীর প্রভাব প্রসারিত হয় তা ছিল সিসিলির নর্ম্যান রাজ্য। এখানে বিশেষভাবে সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক এসব ঐতিহ্য অব্যাহত রাখেন। এ সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, নর্ম্যান রাজাদের দরবারে আরবী কাব্যের চর্চা হতো। ফ্রেডারিকের আমলেই সিসিলীয় ধারার উদ্ভব হয়। ক্যাস্টিলের বিজ্ঞ আল ফন্সোর দরবারের ন্যায় ফ্রেডারিকের দরবারেও আরবী গ্রন্থের অনুবাদ, মুসলিম দর্শন চর্চা এবং প্রভেন্সাল ও স্থানীয় ট্রুবাডুরদের কাব্য সাধনা সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু শুনলেও আরবী কবি বা কাব্য সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট উল্লেখ নেই। অপর দিকে একথা নিশ্চিত যে, ফ্রেডারিকের দরবারে স্যারাসেন নর্তকী ও গায়িকা ছিল। মধ্যযুগীয় সিসিলির সাবধানী ইতিহাসবিদ একথা স্বীকার করেন যে, আমরা সিরিলীয়–আরবী জনপ্রিয় কাব্য সম্পর্কে অধিকতর অবহিত হলেও আমরা এর সঙ্গে সিসিলির পূর্ববর্তী ইটালীয় কাব্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও আবিষ্কার করি। তিনি অধিক অগ্রসর না হয়ে কেবল এটুকুই দাবি করেন যে, আরবী কবিদের দৃষ্টান্ত এবং তারা মুসলিম শাসকদের কাছ থেকে যে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন তার দরুনই অশিষ্ট ভাষায় কাব্য চর্চা হয়।[৪] তবুও একথা সত্য যে,

---

১. দ্রষ্টব্য ঃ রিবেরা, হিস্টোরিয়া ডিলা মিউজিকা অ্যারাবে মিডিয়েভ্যাল, ১৯২৭ এবং এইচ জি ফার্মার হিস্টোরিক্যাল ফ্যাক্টর ফর দি অ্যারাবিয়ান মিউজিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স, ১৯৩০। পাদটীকা আকারে একথাও বলা যেতে পারে যে, এই দৃষ্টিকোণ থেকে রোমান্স কাব্যের পরিভাষা পুনরায় পর্যালোচনা করা দরকার। ফাউরিয়েল (৩য় ৩২৬) গালাউবিয়ার মূল আরবী শব্দ তুলে ধরেছেন। সিংগার সেনহাল মিডন্স ও গোয়ার্ডাডোর (আরবী বাকীব) শব্দগুলির কথা উল্লেখ করেছেন। এফ ডব্ল্যু হ্যাসলাক এরূপ ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, স্ট্যান্যা যায়ৃত–এর ('গৃহ', আরবীতে কবিতার একটি চরণ হিসাবে ব্যবহৃত) অনুকরণ বা অনুসরণ। টেনসিও কাজে ও নামে আরবী তানাযু–এর অনুরূপ রিবেরা (ডিজাটেসিওন্স্ ইত্যাদি, ২য়, ১৩৩–৪৯)কতগুলি শব্দের আরব–পারস্য ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর মতে টেবার শব্দটি তারাব থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ সঙ্গীত, গান। কিন্তু টেবার টৌভার–এর সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, আরবী ওয়াজাদা (আবিষ্কার) শব্দের দ্বারা প্রেম বা দুঃখের বেদনাবোধও বোঝায়।

২. এক সময় রোমান শাসনের অধীনে দক্ষিণ ফেলিস্তিনের একটি অংশ।–অনুবাদক

৩. লেকচার্স অন পোয়েট্রি (১৯১১), পৃঃ ৯৭ ; সি. এফ পৃঃ ১২৫ ; 'আরব সিরীয় একই জাতি সত্তার কাছে (কারণ ফিলিস্তিনও সেই একই জাতি ও অঞ্চলের একটি অংশ) আমরা প্রধানত সেসব উপাদানের জন্য ঋণী যা মধ্যযুগকে আধ্যাত্মিক ও চিন্তাশক্তির দিক দিয়ে রোম শাসিত বিশ্ব থেকে আলাদা করেছে।

৪. এম আমারী, স্টোরিয়া ডাই মুসুলমানি ডি সিসিলিয়া, ১৮৬৮–৭২, ৩য় ৭৩৮, ৮৮৯। আরো দ্রষ্টব্য জি সিসারিও, লি অরিজিনি ডেল্লা পোয়েসিয়া *লিরিকা ই লা* ' পোয়েসিয়া সিসিলিয়ানা সট্টো গ্লি সোয়েভি ১৯২৪, পৃঃ ১০১, ১০৭।

www.waytojannah.com

জাকোপোন ডি টোডির স্তোত্র, কার্ণিভ্যাল সঙ্গীত এবং *'ব্যাল্লাটায়'* প্রতিফলিত প্রাথমিক জনপ্রিয় ইটালীয় কাব্যের ছন্দ এবং আন্দালুসিয়ার জনপ্রিয় কাব্যের ছন্দ একই ধরনের।[১] এমনকি আরবদের বিরুদ্ধে পিট্রার্কের (ইটালীয় কবি) প্রচণ্ড জাতীয়তাবাদী বিক্ষোভ[২] অন্তত একথা প্রমাণ করে যে, তার আমলেও ইটালীতে অধিকতর জনপ্রিয় আরবী কাব্য প্রচলিত ছিল। কথ্য ল্যাটিন ভাষা হতে উদ্ভুত বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার (Romance) লোকদের কাব্য প্রতিভাস্ফুরণে আরবী কাব্যের স্থান যাই হোক না কেন, আরবী গদ্য সাহিত্যের কাছে মধ্যযুগীয় ইউরোপের ঋণ সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

আরবী দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা প্রচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরবী সাহিত্যের অন্যান্য দিক সম্পর্কেও আগ্রহের সৃষ্টি হয়। নীতিমূলক গল্প, উপকথা, কাহিনী ইত্যাদি সমবায়ে যে বিরাট আরবী সুকুমার সাহিত্য গড়ে ওঠে তা বিশেষ আবেদনের সৃষ্টি করে। অবশ্য মৌখিকভাবে এর আগেই আরবী ও অন্যান্য প্রাচ্য গল্প–কাহিনীর উপাদানগুলি বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ত্রয়োদশ শতকে *'ফ্যাবলিয়ো'* (ছন্দোময় ছোট গল্প), *কোন্‌ট্‌* (দুঃসাহসিকতামূলক কাল্পনিক গল্প), *ইগজেম্পেল* (আদর্শমূলক গল্প) প্রভৃতি আকারের যেসব কাহিনী ইউরোপে জনপ্রিয়তা লাভ করে, অতি সম্প্রতি এগুলির প্রাচ্য মূলসূত্র আবিষ্কৃত ও স্বীকৃত হয়েছে। এগুলির সঙ্গে নিঃসন্দেহে প্রাচ্য ও ভারতীয় কাহিনীর সাদৃশ্য রয়েছে। প্রফেসর বেডিয়ারের ব্যাপক গবেষণা এই অভিমতের সমর্থনে উত্থাপিত যুক্তিগুলিকে বর্তমানে অনেকটা দুর্বল করলেও[৩] এখনো এমন বহু জনপ্রিয় সাহিত্য রয়েছে যেগুলিতে অন্ততপক্ষে প্রাচ্য গল্পগুলির কাহিনী গ্রহণ করা হয়েছে। আরবী রোমান্টিক গল্প এবং 'আইসোল্ডে ব্লাঞ্জমেইন' জার্মান *রোলাণ্ডসলিড* ও অন্যান্য উত্তরাঞ্চলীয় কাহিনীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি 'গ্রেইল–সাগর' অন্যতম সংস্করণের রচয়িতা তার সূত্র হিসাবে একটি আরবী গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। সুদর্শন *'আউকাসিন এট নিকলেট'*–এর সঙ্গে সম্পর্ক থাকার দরুন প্রাচীন ফরাসী কাহিনী *ফ্লয়ের এট্‌ ব্লাঞ্চেফলিউর* রচনায় যে আরবী প্রেরণা প্রদর্শিত হয়েছে তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নায়কের আরবী নাম (আল কাসিম) এবং কাহিনীর বিন্যাসে অন্যান্য বিষয় থেকে নিঃসন্দেহে এর স্পেনীয়–আরবী সূত্র প্রমাণিত হয়।[৪] ফরাসী ভ্রাম্যমাণ চারণ কবিরা ইউরোপীয় সাহিত্যে

---

১. দ্রষ্টব্য ঃ জে এম মিল্লাস, ইনফ্লুয়েন্সিয়া ডি লা পোয়েসিয়া পপুলার হিসপানো–মুসুলমানা এন লা পোয়েসিয়া ইটালিয়ানা, রিভিজিটা ডি আর্চিভস ইত্যাদি, ১৯২০, ১৯২১। আরো উল্লেখযোগ্য যে, সান জার্মানোর সিসিলিয়ান রিচার্ড তার গ্রন্থে সন্নিবেশিত কাব্য ও কবিতাংশে আরবী ঐতিহাসিক রচনার বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরেছেন।

২. এসিস্ট সেন। ১২শ। ২।

৩. জে বেডিয়ার, লেস ফ্যাবলিয়া, ৫ম সং; ১৯২৫।

৪. এ গুলির জন্য সাধারণভাবে দ্রষ্টব্য ঃ এস সিংগার, 'অ্যারাবিস্‌চ আন্ডইউরোপাইসচ পোয়েসি ইমমিটেলালটার' আবহ, প্রিউস, আকাড, উইসেন চাফটেন, ১৯১৮ এবং *যেড ফার ডিউট, ফিলোলজি*, ৩য় (১৯২৭), ৭৭–৯২ এবং আউকাসিন–এর জন্য এফ ডব্লু বুরডিলনের সংস্করণ (ম্যাঞ্চেস্টার ১৯১৯) ১৪শ–১৫শ দ্রষ্টব্য।

www.waytojannah.com

অপরূপ যে *চান্টে–ফ্যাব্‌ল্* গেয়ে বা আবৃত্তি করে সবার মনোরঞ্জন করতেন তাও জনপ্রিয় আরবী রোমান্সের একটি পরিচিত রূপের অনুকরণ।

আরবী ভ্রমণ সাহিত্য এবং ভূ–বিবরণও পাশ্চাত্য সাহিত্যে তাদের স্বাক্ষর রাখে। যে সময় ইউরোপের জন্য ভ্রমণ বলতে প্রধানত পবিত্র ভূমিতে তীর্থযাত্রা বোঝাতো তখন এটিই আশা করা যায়। প্রায় অপরিহার্যভাবে ধরে নেওয়া যায় যে, রূপকথার ন্যায় বিস্ময়কর উপাদানগুলি মৌখিক প্রচারের মাধ্যমে দূরতম এলাকায়ও ছড়িয়ে পড়ে। অন্যান্যের মধ্যে এগুলি মার্কো পোলো এবং 'স্যার জন ম্যাণ্ডেভিলের কাহিনীকেও অলংকৃত করে। কিন্তু এগুলির ব্যাপ্তি পাশ্চাত্যের ল্যাটিন দেশগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এগুলি সুদূর আঁয়ারল্যাণ্ড এবং স্কাণ্ডিনেভিয়ায়ও প্রবেশ করে এবং এখানে সম্ভবত কাস্পিয়ান–বাল্টিক বাণিজ্য পথে প্রচারিত হয়। *লিজেন্ড অব সেন্ট ব্রেণ্ডান*–এর ন্যায় সন্ন্যাসীদের কাহিনীতে এগুলির পুনরাবির্ভাব ঘটে। বণিক ও ভ্রাম্যমাণ চারণ কবিরা এগুলিকে সিরিয়ার ক্রুসেডের রাজ্যগুলি থেকে লেভ্যান্টের বন্দরগুলিতে নিয়ে আসে। বোক্কাক্কিও খুব সম্ভব মৌখিক সূত্র থেকেই তার *ডিকামারেন*–এর প্রাচ্য কাহিনীগুলি সংগ্রহ করেন। সসারের *স্কুইয়ারেস টেল* 'আরব্য রজনীরই' একটি কাহিনী। এই কাহিনীটি সম্ভবত ইটালীয় বণিকগণ কৃষ্ণসাগর এলাকা থেকে ইউরোপে নিয়ে আসেন। কারণ দৃশ্যটি ভল্গাতীরে মঙ্গোল খানদের দরবার থেকে তুলে ধরা হয়েছে, তাতারীর দেশে সারেতে।

আরবী কাহিনীসমূহের মৌখিক প্রচারের সঙ্গে চতুর্দশ শতকে নতুন পাঠক শ্রেণীর চিত্তবিনোদনের জন্য আরবী গল্প সংগ্রহগুলি থেকে বহু অনুবাদ যুক্ত হয়। মধ্যযুগীয় জনপ্রিয় কাহিনী থেকে এসব প্রাচ্য কাহিনী অধিক প্রাধান্য লাভ করে। বৈচিত্র্য ও মার্জিত সাহিত্য রসই এর একমাত্র কারণ ছিল না। এসব গল্পে যে উন্নততর কল্পনাশক্তি ও নৈতিক শিক্ষা প্রতিফলিত হয় তাই ছিল প্রধান কারণ। এখানে সাহিত্য প্রাধান্য ও সাহিত্য পদ্ধতির ক্ষেত্রে খৃস্টান ও মুসলিম মধ্যপ্রাচ্য একটি সাধারণ ভিত্তি ভূমিতে মিলিত হয়। জনসাধারণ গল্প বলতেন, কারণ তারা গল্প পছন্দ করতেন। সাধারণভাবে তাদের গল্পগুলিতে কোন নৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু এই গল্প একটি সাহিত্যকলা হিসাবে নৈতিক কাঠামো লাভ করে। লেখকের সাধারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকার পরিচালনার কৌশল, উত্তম জীবন যাপনের কর্তব্য কিংবা সদগুণাবলীর পেশা তুলে ধরা। এসব রচনার মধ্যে আরবী রচনার সংখ্যা বিপুল। এগুলি প্রাচীন ভারতীয় উপকথা থেকে, প্রাচ্যের অন্যান্য গল্পভাণ্ডার থেকে (তার মধ্যে নিঃসন্দেহে অনেকখানি গ্রীক সূত্র থেকে) এবং প্রাচ্য ইতিহাসের ঐতিহাসিক ও রূপকথার কাহিনীসমূহ থেকে সংগৃহীত। অবশ্য এগুলির কোন সাহিত্যিক ভিত্তির ধারণা ছিল না। মুসলমানদের বা খৃস্টানদের মধ্যে কোন লেখক কিংবা পাঠক এগুলির উপাদানের মৌলিকত্ব কিংবা মনস্তাত্ত্বিক আবিষ্কারের ক্ষমতার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি। নৈতিকতাবাদীর কলাকৌশল (আপাতত তার সাহিত্য স্টাইলের

www.waytojannah.com

Contents

কথা বাদ দিলেও) পরিচিত উপাদানকে নতুন প্রেক্ষাপটে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তার নির্বাচন ও সমন্বয় ক্ষমতার মধ্যে নিহিত। এমনিভাবে নীতিমূলক আরবী গল্পগুলি মধ্যযুগীয় ও পরবর্তী ইউরোপীয় সাহিত্যে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে, এক দেশ থেকে আরেক দেশে প্রসারিত হয় এবং বহু সমসাময়িক মৌলিক রচনাকে অনুপ্রাণিত করে এবং তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

প্রধানত ইহুদীদের দ্বারা আরবী থেকে অনূদিত এ ধরনের বহু রচনার মধ্যে তিনটিকে অবশিষ্টগুলির আদর্শ হিসাবে নির্বাচিত করা যায়। আরবী *বুক অব সিন্দবাদ* ('দি সেলর শব্দ বাদে) একটি মূল সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। মূল গ্রন্থটির ন্যায় এটিও বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে না। এই আরবী গ্রন্থটি মধ্যযুগীয় বিভিন্ন সংস্করণের সূত্র ছিল। এগুলির মধ্যে একটি সিরীয় সংস্করণ হচ্ছে *'সিন্দবান'* এটি থেকে মধ্যযুগীয় গ্রীক *'সিন্টি পাস'* একটি হিব্রু সংস্করণ *(সিণ্ডাবার)* এবং কতিপয় পারস্য সংস্করণের উদ্ভব হয়। কিছু কিছু আরবী ও তুর্কী ভাষায় পুনরনূদিত হয়। এগুলিই অষ্টাদশ শতকে ইউরোপ পৌঁছে। সম্ভবত হিব্রু *সিণ্ডাবারই* ছিল ত্রয়োদশ শতকের স্পেনীয় *লিব্রো ডি লস এঙ্গানস* এবং চতুর্দশ শতকে ল্যাটিন *হিস্টোরিয়া সেপ্টেম স্যাপিয়েন্টিয়াম*–এর সূত্র। শেষোক্তটি থেকেই কাব্যে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ভব হয়, যার অন্যতম হচ্ছে ইংরেজী *'সেভেন সেজেস অব রোম'*।

দ্বিতীয় গ্রন্থটি ছিল প্রাচীন দার্শনিকদের উক্তি সম্বলিত একটি সংগ্রহ গ্রন্থ। একাদশ শতকে জনৈক মুবাশ্‌শির ইবনে ফাতিক কর্তৃক মিসরে এটি সঙ্কলিত হয়। এটি স্পেনীয় ভাষায় *বোকাডোস ডি ওরো* শিরোনামে অনূদিত হয়। পাশ্চাত্যের অন্যান্য সংস্করণ একটি ল্যাটিন অনুবাদের *(লিবার ফিলোসফোরাম মরালিয়াম)* উপর ভিত্তি করে রচিত। এর থেকেই *গিলম ডিটিগ্‌ননভিল তার লেস ডিট্‌য মোরাডেস ফিলোসফেস* রচনা করেন এবং এরই ইংরেজী অনুবাদ হচ্ছে আর্ল রিভার্সের *দি ডিকটেস এণ্ড সেয়িংস অব দি ফিলোসফার্স*। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এটি ক্যাক্সটন কর্তৃক মুদ্রিত প্রথম ইংরেজী গ্রন্থ।

স্পেনীয় সাহিত্যে, বিশেষত প্রাথমিক যুগে এসব গ্রন্থ ও অনুরূপ অন্যান্য রচনার প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এগুলি থেকেই ইনফ্যান্টে (যুবরাজ) ডন জন ম্যানুয়েল (যিনি নিজে আরবী ভাষা জানতেন) *এল কণ্ডে লু ক্যানোর* রচনার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। এমন কি সর্বপ্রকার আরবী রচনায় যেভাবে গৌরচন্দ্রিকা দেওয়া হয় তার গ্রন্থেও তেমনিভাবে গৌরচন্দ্রিকার অবতারণা করা হয়েছে।[১] বস্তুত স্পেনে এরূপ প্রাথমিক গদ্য রচনা খুবই কম, যেগুলি আরবী থেকে অনূদিত উপাদান গ্রহণ করেনি। অথচ প্রায়ই এরূপ মন্তব্য করা হয়েছে যে, স্পেন থেকে সরাসরি আরবী সাহিত্যের ঐতিহ্য অন্যত্র প্রচারিত হয়নি।

১. অবশ্য ডন জন সরাসরি আরবী সূত্র থেকে নিয়েছেন, এ কথা প্রমাণ করা যায় না (জি মলডেন হাওয়ার, ডাই লিজেণ্ডে ভন ব্যরলাম আণ্ড জোসাপৃট, ১৯২৯, ৯০–৪)।

www.waytojannah.com

Contents

মধ্যযুগীয় ইউরোপ অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও ইটালী এবং দক্ষিণ ফ্রান্সের ওপর নির্ভরশীল ছিল। স্পেনীয় সাহিত্যে আরবীর যেসব প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে সে ধরনের প্রভাব বহুকাল পরে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে প্রবেশ করে।

তৃতীয় এবং অধিকতর বিখ্যাত রচনাটির ক্ষেত্রেও স্পেন তুলনামূলকভাবে একই অবস্থায় বিচ্ছিন্ন থাকে। এই রচনাটিতেও মূলত প্রাণী বিষয়ক সংস্কৃত উপকথা ছিল। অষ্টম শতকে '*কালিলা এণ্ড দিমনাহ*' শিরোনামে এটি আরবীতে অনূদিত হয়। কিন্তু আলফন্সোর জন্য এটি স্পেনীয় ভাষায় অনূদিত হয় (১২৫২–৮৪)। কিন্তু অবশিষ্ট একটি ল্যাটিন অনুবাদ থেকেই এটি অবগত হয়। কাপুয়ার জন নামে পরিচিত জনৈক ধর্মান্তরিত ইহুদী একই শতকে '*ডাইরেক্টারিয়াম হিউম্যানে ভিটে*' শিরোনামে এই অনুবাদকার্য সম্পন্ন করেন। *গেস্টা রোমানোরাম*–এর ন্যায় অন্যান্য ল্যাটিন রচনা এই সংস্করণটি অবলম্বনেই লিখিত হয়। ১৫৫২ খৃস্টাব্দে ডোনি কর্তৃক এটি সর্বপ্রথম দেশীয় ভাষায় অনূদিত হয়। এই প্রাচ্য কাহিনীর পরবর্তী কালের ভাগ্যে দেখা যায় যে, ক্লাসিক্যাল পুনরুজ্জীবনের প্রবলতম বন্যার সময়ও প্রাচ্য সাহিত্যের আকর্ষণী–শক্তি অব্যাহত ছিল। টমাস নর্থ–এর *মর‍্যাল ফিলোসফি অব ডোনি* (১৫৭০) বহু ইংরেজী সংস্করণের মধ্যে একটি। *নভেল্লির* (ক্ষুদে উপন্যাস) লেখকরা, এমনকি নাট্যকাররাও (ম্যাসিঙ্গারের *দি গার্ডিয়ান*–এর তৃতীয় অঙ্ক দ্রষ্টব্য) ল্যাটিন এবং দেশীয় সংস্করণগুলির ব্যবহার অব্যাহত রাখেন। এর পরবর্তী পুনরুজ্জীবন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই পর্যায়ে *দি লাইটস অব ক্যানোপাস* নামে পরিচিত পারস্য সংস্করণ থেকে *ফ্যাবলস অব পিল্‌পে* হিসাবে এটি ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয় (১৬৪৪)। পারস্য সাহিত্যের সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের এটিই প্রথম সরাসরি যোগাযোগ এবং লা ফন্টেনের অন্যতম সূত্র।

আরবী সুকুমার সাহিত্যের আরেকটি শাখাও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে অবদান রেখেছে। এটি ছিল সর্ব প্রকার আরবী রচনার সবচাইতে বিশ্লেষণমূলক *মাকামাত*। যদিও প্রচলিত সাহিত্য রীতি অনুসারে মিলযুক্ত গদ্যে *মাকামাত* রচনা করতে হতো এবং সর্ব প্রকার ভাষাতাত্ত্বিক কৌতূহল সৃষ্টির মাধ্যমে এটিকে সুশোভিত করা হতো, তবুও এসব রচনার কাহিনীর পরিকল্পনা ছিল অত্যন্ত সহজ। এতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন কতিপয় কাহিনী থাকে। এর নায়ক সব সময় একজন অশ্বারোহী সাহসী সৈনিক, ভবঘুরে, জীবিকা অর্জনের জন্য বহু রকমের ছলছাতুরি অবলম্বন করে। অপর দিকে এই নায়ক অত্যন্ত সুমার্জিত সাহিত্য রসের অধিকারী এবং এর সাহায্যে উচ্চতম নৈতিকতাপূর্ণ আবেগ প্রকাশ করে। এই পরিকল্পনার সঙ্গে স্পেনীয় 'পিকারেস্ক'[১] উপন্যাসের কতিপয় সাদৃশ্য রয়েছে। এ সঙ্গে আরো বলা যায় যে, স্পেনীয় ইহুদীরা কেউ কেউ '*মাকামাত*'–এর অনুকরণ করেছেন। '*এল ক্যাভেলেরো*

১. পিকারো শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ দুঃসাহসী দুষ্ট প্রকৃতির লোক, চোর, জলদস্যু ইত্যাদি। পিকারেস্ক এক ধরনের উপন্যাস যার নায়কের চরিত্র পিকারো–এর অনুরূপ। মূলত স্পেনে এ ধরনের উপন্যাসের উদ্ভব হয়। এর পিছনে মাকামাত–এর প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়।–অনুবাদক

www.waytojannah.com

সিফার–এ প্রাচ্যের অন্যান্য সাদৃশ্য ছাড়াও প্রথম স্পেনীয় *পিকারো* (নায়ক) 'রিবাল্ডোর' অন্তত একটি দুঃসাহসিক অভিযানের বর্ণনা রয়েছে। এই কাহিনীতে আরবী গ্রন্থের *জুহায়র* চরিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাচ্যের ধারা অক্ষুণ্ন রয়েছে।[১] *মাকামাত* –এর কাহিনীগুলির সঙ্গে সম্ভবত প্রাথমিক ইটালীয় বাস্তবধর্মী বা 'পিকারেস্ক' ধরনের কাহিনীগুলিরও সাদৃশ্য রয়েছে কিন্তু সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে এখনো কোন অনুসন্ধান করা হয়নি।

মধ্যযুগীয় ইউরোপে আরবী সাহিত্যের মৌল চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ বাস্তবে সাধারণ বুদ্ধিভিত্তিক আন্দোলনের একটি দিক গড়ে তোলে। অন্ধকার যুগের সংকীর্ণ যাজকীয় ব্যবস্থায় ল্যাটিন সভ্যতা সব কিছুকে ছাড়িয়ে যায়। মানুষ এতোদিন যেসব জিনিসকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে এসেছে সেগুলি সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। তারা যে ল্যাটিন সাহিত্যের অধিকারী ছিল তার সংকীর্ণতা, দারিদ্র ও মৌলিকত্বের অভাবের দরুন কৌতূহল মিটাতে না পেরে নিজেদের আকাঙক্ষা পূরণের জন্য অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাতে বাধ্য হয়। তারা কিছুটা আক্রোশ থাকলেও এতদিন পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের সামরিক প্রাধান্য স্বীকার করে নেয়। বর্তমানে তারা লজ্জার সঙ্গে উপলব্ধি করে যে, জ্ঞান–বিজ্ঞানের দিক দিয়েও মুসলিম বিশ্ব উন্নত। যে আরবী বিজ্ঞানের জোয়ারে তাদের এই দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে তার বাহন ছিল বিপুল পরিমাণ গদ্য সাহিত্য। এই সাহিত্য ইউরোপের সকল উদীয়মান সাহিত্যে কম–বেশি গভীরভাবে প্রবেশ করে এবং জ্ঞান–বিজ্ঞানে রেনেসাঁর পথ উন্মুক্ত করে। কিন্তু মধ্যযুগীয় সাহিত্যে ইসলামের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল কাব্যে ও গদ্যে ইসলামী সংস্কৃতি ও ধ্যান–ধারণার প্রভাব। এই প্রভাব আরবী সূত্র থেকে বস্তুগত উপাদান ধার না করেও হতে পারে। কড়াকড়িভাবে বলতে গেলে বিষয়টি বর্তমান অধ্যায়ের আওতাবহির্ভূত হলেও সাম্প্রতিক গবেষকদের বারংবার প্রদত্ত কতিপয় অভিমত এখানে উল্লেখ না করে পারা যায় না। তাদের অভিমত অনুযায়ী মুসলিম বিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্ব এবং মহানবীর *মিরাজের* কাহিনীর (এর কোন কোনটির সূত্র প্রাচীনতর পারস্য রূপকথাও হতে পারে) উপাদানগুলি '*ডিভাইনা কমেডিয়ায়*' প্রবেশ করেছে। এসব উপাদান সরাসরিও আসতে পারে। কিংবা *লিজেণ্ড অব টুণ্ডাল* ও *সেন্ট প্যাটিক্স পারগেটরি*–এর ন্যায় পূর্ববর্তী পাশ্চাত্য রূপকথার মাধ্যমেও গৃহীত হতে পারে। কারণ আরবী দার্শনিক ধ্যান–ধারণা ও মুসলিম অধ্যাত্মবাদের কাল্পনিক চিত্র ও আদি রস সুনিশ্চিতভাবে কেবল দান্তের রচনাতেই নয়, *ডলসে স্টিল নুওভো*–এর অন্যান্য কবির ধ্যান–ধারণায়ও প্রতিফলিত হয়েছে।[২] দান্তের সময় যেরূপ আগ্রহের সঙ্গে ইটালীতে আরবীয় চর্চা হতো তাতে এই অভিমতের ভিত্তি কিছুতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অবশ্য বিস্তারিত পর্যায়ে কোন কোন ক্ষেত্রে ছাড়া এটি

---

১. রিভিউ হিস্পানিক, ১০ম, (১৯০৯), ৯১। এইচ জে , দি ট্রুবাডুর্স (১৯১২), ১০৬।
২. এই সর্বশেষ প্রশ্নে দ্রষ্টব্য : এইচ জে চেটর, দি ট্রুবাডুর্স (১৯১২), ১০৬।

www.waytojannah.com

প্রমাণিত হয়েছে বলে এখনো ধরে নেওয়া যায় না। কিন্তু দান্তে যেভাবে কেবল খৃষ্টান ঐতিহ্য ও ক্লাসিক্যাল অধ্যাত্মবাদই নয় ইসলামের অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যগুলিকেও তার প্রতিভার যাদু স্পর্শে একীভূত করেছেন। তা যদি তুলে ধরা যেতো তাহলে এই চিন্তাধারা আরো আকর্ষণীয় হতো।

মধ্যযুগের প্রসঙ্গ সমাপ্ত করার আগে কিছু সময়ের জন্য স্পেনের প্রসঙ্গে ফিরে যেতে হয় এবং সেখানে ইতিপূর্বে আলোচিত আরেকটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে হয়। বিষয়টি হচ্ছে খৃষ্টানদের দ্বারা বৃহত্তর অংশটি পুনর্বিজয়ের পর আন্দালুসিয়ায় আরবদের অলিখিত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অব্যাহত প্রভাব। গোঁড়ামিপূর্ণ যুক্তির ভিত্তিতে বিচার্য না হলেও এই প্রভাব স্পেনীয় সাহিত্যে এবং তার মাধ্যমে ইউরোপীয় সাহিত্যে কোন অংশে কম লক্ষণীয় নয়। এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না যে, দক্ষিণাঞ্চলের সাহিত্যে যে উত্তাপ ও আলোড়নমূলক উন্নততর কল্পনার স্বাক্ষর বিরাজমান তা প্রথম কয়েক শতকে আন্দালুসিয়ার আরব সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং আন্দালুসীয়দের উপর উক্ত সংস্কৃতি যে ছাপ রেখে গেছে তারই ফলশ্রুতি। অবশ্য একথাও সত্য যে, সেভিল বিজয় থেকে গ্রানাডার পতন পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে আন্দালুসীয়রা ভাষা, ঐতিহ্য ও সাহিত্য রীতির ক্ষেত্রে তাদের 'ক্যাস্টিলের' সহ-ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে একই ধারার অনুসারী ছিলেন। কিন্তু মূরীয় ক্ষমতা দুর্বল ও বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরূপতার প্রধান কারণও দূরীভূত হয়। মূর ও খৃষ্টানদের মধ্যে পারস্পরিক মৈত্রী সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে সাহিত্যিক অনুভূতিরও আকস্মিক এবং আমূল পরিবর্তন ঘটে। অধিকতর উত্তাপহীন ও কঠোর ক্যাস্টিলীয়দের মধ্যে আন্দালুসীয়রা যেন এমন এক জিনিসের অভাব বোধ করে যা তখনো তাদের হৃদয় তন্ত্রীতে অনুরণিত হচ্ছিলো। তাই সেটিকে ফিরে পাওয়ার জন্য তারা মূরীয় অতীতের প্রতি ফিরে তাকায়। যে সুমার্জিত সাহিত্য রস *আমাডিস ডি গাউলা* গ্রন্থটিকে অন্যান্য উপন্যাস থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্য দান করেছে তার মধ্যেই আন্দালুসীয় চেতনার প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। 'মরিস্কো' উপন্যাসে এর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং *হিস্টোরিয়া ডেল অ্যাবেনসারেজ* (১৫৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে) ও এর পরবর্তী গ্রন্থ *জিনেস পেরেয ডি হিটার গুয়েরাস সিভিলেস*-এ তার চূড়ান্ত বিকাশ দেখা যায়। এসব উপন্যাস আংশিকভাবে মূল আরবী উপাদানের উপর ভিত্তি করে রচিত কিনা তা এখানে বিবেচ্য বিষয় নয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, এগুলি মূরীয় ও স্পেনীয় সংস্কৃতির এমন এক সংমিশ্রণ ঘটায় যা আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের ইতিহাসের মোড় পরিবর্তন করে। এটিই ছিল আধুনিক উপন্যাসের জন্মলগ্ন। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে যে *ডন কুইক্সট প্রেসকটের* ভাষায়, সম্পূর্ণরূপে আন্দালুসীয় দীপ্তিতে উজ্জ্বল তার রচয়িতা সারভেন্টিযও আন্দালুসীয় সংস্কৃতির কাছে ঋণী (আরব ইতিহাসবিজ্ঞানী সিড হামেট বেনেন জেলির মাধ্যমে না হলেও)। স্পেনীয় সাহিত্যের অন্যান্য দিকপালের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

www.waytojannah.com

* * * *

রেনেসাঁ প্রাচ্যকে পটভূমিতে নির্বাসিত করে একটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং প্রাচ্য প্রভাবের জোয়ার রুদ্ধ করে। কিন্তু ক্লাসিক্যাল ব্যবস্থা স্থায়ী হতে পারেনি। ইউরোপের যে রোমান্টিক চেতনা ব্রেটনের উপন্যাসে টিউটনিক লোক–গাথায় এবং ইংরেজি নাটকে প্রকাশ লাভ করে তা আড়ষ্ট ও অবদমিত হয়। মুক্তি পাওয়ার জন্য একটি নির্গমন পথ খুঁজতে থাকে। প্যাস্টোরাল রোমান্স, বীরত্বব্যঞ্জক উপন্যাস 'পিকারেস্ক' প্রভৃতি সর্বপ্রকার সৃষ্টি একের পর এক ব্যর্থ হতে থাকে। পেরো একটি শক্তিশালী সূত্র অনুসরণ করে। কিন্তু তখনো লোককাহিনী আক্রমণের প্রচণ্ডতা সহ্য করার মত দৃঢ়তা লাভ করেনি। এরপর ১৭০৪ খৃস্টাব্দে গ্যালাণ্ডের *অ্যারাবিয়ান নাইটস*–এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে জানা যায় যে, এই অনুবাদ একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। দীর্ঘকাল ধরে যে শৈল্পিক আদর্শ ধীরে ধীরে রূপায়িত হয় এটি ছিল তার চূড়ান্ত মুহূর্ত। 'মরিস্কো' রোমান্স, প্রাচ্যে ভ্রমণ ও উপনিবেশ স্থাপন; ট্যাভার্নিয়ার, শারডেন, বার্ণিয়ার প্রমুখের ভারতীয় ও পারস্য জীবনের বর্ণনা, এবং যেসব প্রাচ্য দূতাবাস বিভিন্ন সময়ে তাদের সুষমায় প্যারিসকে উজ্জ্বলতা দান করে তাদের দ্বারা সৃষ্ট স্থানীয় বর্ণচ্ছটার মায়া এই আদর্শকে পরিপুষ্ট করে তোলে।[১] নিঃসন্দেহে এসব ছিল বাহ্যিক; কিন্তু এই দীর্ঘ সময় ধরে প্রাচ্যের সেই আকর্ষণীয় বর্ণ, প্রেমরস ও রহস্যভরা রোমান্টিক কল্পচিত্র গড়ে ওঠে যা আমাদের এ যুগের রচনাকেও নাড়া দেয়। নির্ভেজাল প্রাচ্য বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন *অ্যারাবিয়ান নাইটস* সঙ্গে সঙ্গে এবং সামগ্রিকভাবে সাফল্য লাভ করে। পাঠক সাধারণের কল্পনায় বিস্ফোরণ ঘটে। পাঠকদের এই পছন্দের সুযোগ গ্রহণের জন্য প্রকাশকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। *অ্যারাবিয়ান নাইটস*–এর অনুসরণে প্রকাশিত হয় *পার্সিয়ান টেলস* (সহস্র ও এক দিবস)। *'টার্কিশ টেলস'* হিসাবে পুরোন *বুক অব সিন্দবাদ*–এর পুনরাবির্ভাব হয়। খাঁটি উপাদানের অভাব দেখা দিলে পরিশ্রমী লেখকগণ তা পূরণ করার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠেন। নিউলেট এক যুগ পর্যন্ত মানুষের মনের ক্ষুধা নিবারণের জন্য কৃত্রিম অনুবাদের পন্থা অবলম্বন করেন এবং মন্টেসকিউ তার *লেটার্স পার্সেন্স*–এ নতুন ধরনের সামাজিক সমালোচনা সৃষ্টি করেন।

ইংল্যাণ্ডেও এই উন্মত্ততা কোন অংশে কম ছিল না। *অ্যারাবিয়ান নাইটস, পার্সিয়ান টেল্‌স* এবং *টার্কিশ টেলস*, প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনূদিত হয় এবং এগুলির সংস্করণের পর সংস্করণ প্রকাশিত হতে থাকে। একটি পারস্য কাহিনীকে কিভাবে 'হাফ–এ–ক্রাউন' মূল্যে দ্রুত প্রচার করা যায় বহু অনুকরণকারী গিউলেটর দৃষ্টান্ত থেকে তা আয়ত্ত

---

১. পিয়ের মার্টিনো ঃ *এল ওরিয়েন্ট ড্যান্‌স্ লা লিটারেচার ফ্রাঙ্কয়েস আউ ১৬শ এট আউ ১৮শ সিকল*, ১৯০৬, আরো দ্রষ্টব্য এম পি কোন্যান্ট, *দি ওরিয়েন্টাল টেল ইন ইংল্যাণ্ড*, নিউইয়র্ক, ১৯০৮, এবং মরিস্কোরোমান্সের জন্য দ্রষ্টব্য এম এ চ্যাপলিন, *লে রোমান মৌরেস্ক এন ফ্রান্স*, ১৯৮।

www.waytojannah.com

করেন। অষ্টাদশ শতকের 'প্রাচ্য' সাহিত্যে যা প্রতিফলিত হয় তা এক অদ্ভুত প্রাচ্য ছিল। এই প্রাচ্যকে ঐ সময়কার রোমান্টিক কল্পনা নিজস্ব ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী নতুন রূপে চিত্রিত করে। খলীফা, কাজি ও জিনের পোশাকে এতে অদ্ভুত সব ছবি স্থান পায়। এতো বড়ো বিকৃতি স্থায়ী হতে পারেনি। হ্যামিলটন, পোপ ও গোল্ডস্মিথের কশাঘাতে কৃত্রিম প্রাচ্য রোমান্স দমে যায়, যদিও ইতিমধ্যেই তা সাহিত্যে তার স্বাক্ষর রাখে। এতে ইংল্যাণ্ডে ওল্ড টেস্টামেন্টের অনুরূপ ছন্দে *দি ভিসন অব মিরযা* (যে স্ফুলিঙ্গ রবার্ট বার্ণসের কল্পনাকে প্রথম আলোকিত করে) এবং *র‍্যাসেলাস*-এর সৃষ্টি হয়। ফ্রান্সে এক অদ্ভুত ঘটনা পরম্পরায় নীতিমূলক গল্পের সত্যিকারের প্রাচ্য রীতিতে ফিরে গিয়ে এটি ভল্টেয়ার ও অন্যান্য সংস্কারকদের রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যঙ্গ রচনার পটভূমি দান করে। ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড উভয় দেশেই এটি বেকফোর্ডের ব্যাথেক-এর ন্যায় একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের জন্ম দেয়। এই বইটি প্রাচ্যের বিষয়বস্তু ও চিত্রকল্পের সঙ্গে 'গথিক রোমান্সের' সংমিশ্রণ ঘটিয়ে পরবর্তী অর্ধ শতকের অধিকাংশ কল্পনামূলক রচনাকে পূর্বসূরি হিসাবে প্রভাবিত করে। অবশ্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে জনসাধারণের রুচিকে রোমান্টিক আন্দোলন নামে পরিচিত নন—ক্লাসিক্যাল ও মধ্যযুগীয় পর্যায়ে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে এর পরোক্ষ প্রভাব ও প্রবণতা সৃষ্টি।

কিন্তু *অ্যারাবিয়ান নাইটসের* সাফল্য বিশ্লেষণ করার জন্য আরো কিছু বলা দরকার। পাঠক শ্রেণী বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং অধিকতর জনপ্রিয় সাহিত্যের চাহিদা থাকায় ফরাসী ও ইংরেজি সাহিত্যে যে সংকটের সৃষ্টি হয় সম্ভবত তার মধ্যেই এর কারণ নিহিত। ক্লাসিকবাদ অন্তত ইংল্যাণ্ডে কখনো সত্যিকারভাবে জনপ্রিয় ছিল না। সপ্তদশ শতকের ভারিক্কি ও মন্থরগতি উপন্যাসগুলি জনসাধারণ তেমন পছন্দ করত না। এটি ছিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ, যেখানে ডেফো, স্টীল ও এডিসনের ন্যায় লেখকগণ একটি নতুন স্টাইল সৃষ্টির প্রয়াস পান। *অ্যারাবিয়ান নাইট্‌স* মূলত জনগণের উপযোগী একটি সাহিত্যকর্ম। এতে সাহিত্য শিল্পের সবগুলি সূক্ষ্ম উপাদান না থাকলেও একটি উপাদান সবচাইতে বেশি পরিমাণে বর্তমান এবং তা হচ্ছে দুঃসাহসিক অভিযানের প্রাণশক্তি। এটি জনপ্রিয় সাহিত্যের জন্য অপরিহার্য হলেও লেখক-সাহিত্যিকরা এতো দিন পর্যন্ত তা উপেক্ষা করেন। এরূপ বলা অতিশয়োক্তি হবে না যে, জনপ্রিয় লেখকরা যে সূত্রের সন্ধান করছিলেন এটি তা উন্মুক্ত করে। বস্তুত *অ্যারাবিয়ান নাইটস* না হলে কোন *রবিন্সন ক্রুসো*[১] এমনকি সম্ভবত *গালিভার্স ট্রাভেলও* হতো না।

১. ইবনে তুফায়লের দার্শনিক রোমান্স *'হাই ইবনে ইয়াক যান'*-এ কখনো কখনো *রবিন্সন ক্রুসো*-এর মূল সূত্র অনুসন্ধান করা হয়। পোকক্ *ফিলোসফাস অটোডিডাকটাস* শিরোনামে ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে ল্যাটিন ভাষায় এটি অনুবাদ করেন এবং ওক্‌লি ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে তা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এ আর প্যাস্টর বর্তমানে এ ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। তার রচনা *দি আইডিয়া অব রবিন্সন ক্রুসো* (১ম খণ্ড, ওয়াটফোর্ড, ১৯৩০) দ্রষ্টব্য।

www.waytojannah.com

অষ্টাদশ শতকে প্রাচ্য কাহিনীর প্রচলন কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং এগুলি কতোটা প্রভাব বিস্তার করেছিল, এই বিষয়গুলি আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসবিদগণ উপেক্ষা করেন। ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে সরাসরি অনুকরণের মাধ্যমে সৃষ্ট দুর্বল সাহিত্যে নিঃসন্দেহে এর বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে। এই বাস্তব অবস্থার আলোকেই ব্রুনেটিয়ার তাঁর সমালোচনায় বলেছেন যে, মুসলিম প্রাচ্যের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে কেবল আমাদের সাহিত্যের এমন একটি শাখা সমৃদ্ধ হয়েছে যা জাতীয় লজ্জা হিসাবে চিহ্নিত। এই শতকের মানসিকতায় প্রাচ্য কাহিনী যে গভীর ছাপ রেখেছে সে সম্পর্কে অন্যান্য অভিমতও রয়েছে। ১৭৭০ খৃস্টাব্দে তাঁর *হিস্টরী অব ইংলিশ পোয়েট্রি* লিখতে গিয়ে ওয়ার্টনের কাছে এটি স্বয়ংসিদ্ধ বলে প্রতীয়মান হয় যে, মধ্যযুগের রোমান্টিক আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে একটি আরব অবদান ছিল। ওয়ার্টনের অভিমত অতিরঞ্জিত হলেও এর অস্তিত্ব এবং স্বীকৃতি তার যুগ যে সব ধ্যানধারণায় অনুপ্রাণিত হয় তার উপর আলোকপাত করে। সাউদে তাঁর *থালাবা* ও *দি কার্স অব কেহামা* নামক বর্ণনামূলক কাব্যের জন্য যেসব বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন তার মধ্যেও একই তন্ময়তা পরিদৃষ্ট হয়। আধুনিক সমালোচকদের কাছে এগুলি 'বিচ্ছিন্ন ও জনমত বর্জিত ধারণা' বলে মনে হলেও বিংশ শতকের নারী–পুরুষের কাছে 'আলী বাবা' ও 'আলাদিন' যতটা বিচ্ছিন্ন ও জনমত বর্জিত ছিল তাদের যুগে তাদের কাছে *'মগরেবী দি ম্যাজিসিয়ান'* ও অন্যান্য অদ্ভুত কল্পনামূলক প্রাচ্য কাহিনী তার চাইতে বেশি বিচ্ছিন্ন ও জনমত বর্জিত ছিল না; কারণ এসব কাহিনী একইভাবে সে যুগের লোকদেরও উজ্জীবিত করে।

সব কিছুর ঊর্ধ্বে *অ্যারাবিয়ান নাইটস* টিকে আছে। এগুলিতে এমন একটি উপাদান রয়েছে যা কল্পনা জগতকে নাড়া দিতে কখনো ব্যর্থ হয় না। যে উপাদান তার অনুকরণকারীদের জন্য সৌভাগ্যের দ্বার উন্মোচিত করে তা কেবল বর্ণাঢ্যতা এবং কল্পনা জগতই নয়। এসব কাহিনীর যাদুকরী ও রহস্যময় দিক বাস্তবতার দৃঢ় ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। চরিত্রগুলি নির্দিষ্ট মানের এবং অবিকশিত হলেও তাদের দুঃসাহসিক অভিযানগুলি ছিল সত্যিকারের শিহরণমূলক দুঃসাহসিক অভিযান, যা নাটকীয় আবেগ নিয়ে বর্ণিত হয়। এই অদ্ভুত ও কল্পনা জগতের মধ্যে নিহিত রয়েছে নৈতিকতার একটি প্রাণকেন্দ্র। এটি না থাকলে এগুলি ইউরোপের হৃদয়ের এতো গভীরে প্রবেশ করতে পারতো না কিংবা দুই শতাব্দীকাল পর্যন্ত শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলের হৃদয় জয় করতে পারতো না। সত্যিকারের প্রাচ্য অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং এর প্রভাব আরো বলিষ্ঠ হয়। এতদিন পর্যন্ত যেসব বিদঘুঁটে পরিস্থিতি এটিকে আচ্ছন্ন করে রাখে সেখান থেকে তা মুক্ত হয়।

একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, ইউরোপ তখনো প্রাচ্যের সত্যিকারের সাহিত্য ও চিন্তাধারা সম্পর্কে গভীরভাবে অজ্ঞ ছিল। উইলিয়াম জোন্স 'ভাষাবিদ হিসাবে নয়, রুচিবান হিসাবে এবং বিশ্লেষক হিসাবে নয়, কবি হিসাবে' যখন ১৭৭৪ খৃস্টাব্দে তার

www.waytojannah.com

Contents

ল্যাটিন *কমেন্টারীজ অন এশিয়াটিক পোয়েটি* প্রকাশ করেন তখন একটি নতুন পৃষ্ঠা উন্মোচিত হয়। পশ্চিম ইউরোপের সংস্কৃতিমনা ও ক্লাসিক্যাল ধারায় শিক্ষিত লোকেরা সর্বপ্রথম মুক্ত মনে আরবী ও পারস্য কাব্য উপলব্ধি ও উপভোগ করতে সক্ষম হন। কিন্তু ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের সাহিত্য ঐতিহ্যের ভারে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত থাকায় নতুন জার্মান আন্দোলন এসব সম্ভাবনাকে কাজে লাগায়। এগুলি ছিল অবাধ মাধ্যম। জনসাধারণের রুচির সেবক নয়, স্রষ্টা। তাছাড়া পারস্য কাব্য ইতিমধ্যেই জার্মান সাহিত্যে তার স্বাক্ষর রাখে। এক শতাব্দীরও আগে পর্যটক ও পণ্ডিত ওলিয়ারিয়াস শেখ সাদীর *গুলিস্তাঁ* ও বুস্তাঁ-এর যে অনুবাদ করেন তা ঐ সময়কার জার্মান সাহিত্যকে সজীবতা ও প্রাণশক্তি দান করে[১] এবং গ্রিমেলসওসেনের *জোসেফ* কাহিনীর *ইউসুফ এণ্ড যুলেখা* গল্পে পারস্য সাহিত্যের একটি অব্যাহত প্রভাব দৃষ্ট হয়। অপর দিকে লেসিং তার উপদেশাত্মক রচনায় একটি প্রাচ্য প্রেক্ষিত প্রদানে ভল্টেয়ারকে অনুসরণ করেন। ওয়েহলেন শ্লেগ্যারের *আলী অ্যাণ্ড গালহিন্দী*-এর ন্যায় রোমানটিক শ্রেণীর গ্রন্থগুলি আদর্শগতভাবে অষ্টাদশ শতকের অদ্ভুত কল্পনাপ্রবণ রচনা। তার পরবর্তী নাটক *অ্যালাড্ডিনে* (১৮০৮) *অ্যারাবিয়ান নাইটস,* পরী, বামণ ও ভারতীয় নীতিমূলক গল্পের সংমিশ্রণ থাকলেও প্রাচ্যকে সম্যকভাবে উপলব্ধির সেই আভাস পাওয়া যায় যা ঐ সব জিনিসকে ধীরে ধীরে বিদূরিত করে।

সত্যিকারের এই উপলব্ধির জন্য জার্মানী কবি-জ্ঞানীদের একটি উল্লেখযোগ্য শ্রেণীর কাছে ঋণী ছিল। উইলিয়াম জোন্স যে কাজ শুরু করেন তারা তা অব্যাহত রাখেন। হার্ডারের প্রভাবে জার্মান রোমান্টিক আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনার আবেগপূর্ণ প্রেরণা প্রাচ্য সাহিত্য এবং চিন্তাধারাতেও সম্প্রসারিত হয়। প্রথম যুগে শ্লেগেল ও হ্যামার এবং দ্বিতীয় যুগে রাকার্ট পাশ্চাত্যের কবি ও লেখকদের কাছে নতুন ও প্রায় সন্দেহাতীত ধনভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত করেন। এমনিভাবে ভারতীয়, পারস্য, আরব প্রভৃতি প্রাচ্য সাহিত্য উনবিংশ শতকের জার্মান সাহিত্যে এতো অধিক পরিমাণে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় যা মধ্যযুগীয় স্পেনীয় সাহিত্যের পর ইউরোপে অতুলনীয়। পাশ্চাত্যের 'গুলিস্তানে' প্রথম এবং সুন্দরতম ফুল ছিল গথের *ওয়েস্টসলিচ ডিভান*। তার উত্তরাধিকারীরা আরো অগ্রসর হন। তারা তাদের পাশ্চাত্য আদর্শগুলি নিজেদের জন্য পড়েন ও অনুবাদ করেন। রাকার্টের ন্যায় তারা পারস্যের ধ্যান-ধারণা ও চিত্রকলা পুনঃ প্রকাশ এবং অনুকরণ করেন, আর তা না করলেও প্লাটেনের ন্যায় পারস্যের ছন্দরীতি পুরোপুরি অনুসরণ করেন। অপর দিকে গথে প্রাচ্যের কাব্যে সকলের আগে ঐ যুগের নিষ্ঠুর বাস্তবতা থেকে কল্পনার জগতে মুক্তির আস্বাদন গ্রহণের একটি পন্থা খুঁজে পান। নিছক অনুকরণ তাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি; তিনি বরং পারস্য কাব্যের *শিল্পসৌকর্য* ও ধ্যান-ধারণাকে সেগুলির সঙ্গে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ ইউরোপীয় ঐতিহ্যের মধ্যযুগীয় ও 'রোমান্টিক' উপাদানসমূহের সঙ্গে জোয়ালবদ্ধ করে তার নিজস্ব চিন্তাধারা প্রকাশের জন্য একটি নতুন ভাষাগত বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি

---

১. *অ্যালগেমাইন ডিউশ বায়োগ্রাফী,* খণ্ড ২৪, পৃ. ২৭৫। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে ওলিয়ারিয়াসের মৃত্যু হয়।

www.waytojannah.com

করেন। একই সময়ে তিনি এমন এক বিশ্বজনীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, যেটিকে জার্মান সাহিত্যে প্রতিফলিত করাই ছিল তার লক্ষ্য।[১]

কিছুকালের জন্য পারস্য ও ভারতীয় রীতি অব্যাহত থাকে। এমনকি নিজস্ব ব্যঙ্গ রচনায় ব্যবহার না করলেও হাইনে তার গীতিকাব্য থেকে সামগ্রিকভাবে প্রাচ্যের নিদর্শন পরিহার করতে পারেন নি। কিন্তু এটি ব্যর্থ হয়, কারণ এটি ব্যর্থ হতে বাধ্য। এটি ছিল চারা গাছের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত উষ্ণ গৃহের (হটহাউস) উদ্ভিদ, তাই সংস্কার না করে ইউরোপীয় ভূমিতে তা পরিবর্ধন করা যায় না। এরূপ অভিমতের মধ্যে যথেষ্ট সত্য রয়েছে যে, কবির মধ্যে প্রাচ্যের চিন্তাধারা যত বেশি অনুপ্রবিষ্ট হয় তার রচনা সাহিত্য হিসাবে ততো কম সার্থকতা লাভ করে। গথের প্রতিভা সহজাতভাবে হাফিযের সর্বপ্রকার উপাদান বর্জন করে। কারণ সেগুলিকে তিনি স্বাভাবিক মনে করেননি। তবুও তার রচনাবলীর মধ্যে উৎকৃষ্টতমগুলির পরেই *ডিভান*-এর স্থান। জাল রচনা *লাইডার ডেস মিরযা শফ্ফী*-এর মাধ্যমে কেবলমাত্র বোডেনস্টেডট জনসাধারণের কল্পনায় আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। কিন্তু জার্মান রোমান্টিক আন্দোলনের প্রাচ্য কাব্যকে সাহিত্য হিসাবে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া না গেলেও, কিংবা এটি আধুনিক ইউরোপীয় কাব্যের সঙ্গে প্রাচ্য কাব্যের সংমিশ্রণ ঘটাতে না পারলেও পুনঃ প্রকাশ ও অনুবাদের মাধ্যমে এটি শেষ পর্যন্ত ইউরোপের সাহিত্য ধারায় মূল্যবান অবদান রাখে এবং এমন এক দ্বার উন্মুক্ত করে যা কখনো বন্ধ হয়নি।

জার্মান সাহিত্যে প্রাচ্য প্রবাহের আংশিক প্রবেশ আরো বিস্তৃততর ক্ষেত্রে একটি প্রাচ্যমুখী আন্দোলনের আশা জোরালো করতে পারতো এবং এই আশা কার্যত আরো জোরালো হয়।[২] কিন্তু উনবিংশ শতকে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স এই আশা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। ভালোর জন্যই হোক আর মন্দের জন্যই হোক পাশ্চাত্যের মন প্রাচ্য থেকে আকস্মিকভাবে আগের যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক দূরে সরে যায়। নিজস্ব নতুন দর্শন, নতুন রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা, নতুন আবিষ্কার ও বিপুল শিল্পোন্নয়নের উন্মাদনায় প্রাচ্যের দিকে মনোযোগ দেওয়ার কোন মনোভাব ছিল না। প্রাচ্যের চিন্তাধারা ধৈর্যের সঙ্গে উপলব্ধি করার অবকাশও আদৌ ছিল না। জাতীয়তাবাদের চাকার নিচে গথের একটি *ওয়েলটলিটারেচার*-এর আদর্শ বিচূর্ণ হয়। এমনকি জার্মানীতেই তা ধ্বংস হয়। এতদসত্ত্বেও উনবিংশ শতকের এবং আমাদের সময়কার সাহিত্যে প্রাচ্য, বিশেষ করে মুসলিম প্রাচ্য যে স্থান দখল করে আছে তা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। এটা আপাত বিরোধী সত্য বলে মনে হয় যে, যে যুগে আগের যে কোন সময়ের তুলনায় প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সঙ্গে

---

১. জার্মান রোমান্টিক আন্দোলনে প্রাচ্য উপাদান সম্পর্কে দ্রষ্টব্য ঃ এ জে এফ রেমী, কলাম্বিয়া ইউনিভারসিটি জার্মানিক স্টাডিজ, ১ম খণ্ড, সংখ্যা ৪ (নিউইয়র্ক, ১৯০১)।

২. তুলনীয় ঃ ব্রুনেটিয়ার কর্তৃক উদ্ধৃত শপেন হাওয়ারের অংশবিশেষ (এটুডেস, ৮ম, ২১১) ঃ লি নাইন্টিন সিক্ল নে ডিভেইট গুয়ের ময়নুস আন জ্ঞওর আ লা কনাইস্যান্স ডু ভিউক্স মণ্ডে ওরিয়েন্টাল কুইলি সিক্সটিন সিক্ল আ লা ডিকোভার্টে ওউ আ লা রিভিলেশন ডি এল, এন্টিকুইট গ্রোকো-রোমেইন।

www.waytojannah.com

অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং পাশ্চাত্যের জনগণের কল্পনায় প্রাচ্যের আকর্ষণ ক্ষমতা সব চাইতে বেশি প্রবল, সে সময় প্রাচ্য সাহিত্যের দাবি সামগ্রিকভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের রোমান্টিক আন্দোলন এবং হার্ডারের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য রয়েছে তার মধ্যে অন্তত আংশিকভাবে হলেও এর বিশ্লেষণ অনুসন্ধান করতে হবে।

ফ্রান্সের রোমান্টিক আন্দোলন জার্মানীর তুলনায় কম উৎসাহমূলক ও জ্ঞানচর্চার সঙ্গে কম সংশ্লিষ্ট ছিল। সেখানে এতে গথে ও শিলারের চাইতে বায়রন ও স্কটের প্রভাব ছিল বেশি। তাই সেখানে নতুন প্রাচ্যবাদের স্বাক্ষর কদাচিৎ দেখা যায়। রাজনৈতিক তন্ময়তা এবং যে বৈশিষ্ট্যের জন্য ফরাসী সাহিত্যের প্রাদেশিকতার অপবাদ রয়েছে তার দরুন ফরাসী লেখকগণ নিজেদের দেশের কাছাকাছি জিনিসের মধ্যেই তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ রাখেন। একথা সত্য নয় যে, প্রাচ্যকে উপেক্ষা করা হয়। রবং *ভিক্টর হিউগো* তার *লেস ওরিয়েন্টাল*–এর ভূমিকায় লিখেছেন, 'সমগ্র বিশ্ব গ্রীক ভাষাবিদ ছিল, এখন তা প্রাচ্যবিদ।' তিনি প্রাচ্য বিশ্বের প্রতি গভীর কাব্যিক সহানুভূতি প্রকাশ করেন। 'তিনি যেন দূর থেকে এর মধ্যে একটি সমৃদ্ধ কাব্যকলার ঔজ্জ্বল্য দেখতে পান। এটি একটি ঝর্ণা যেখানে তৃষ্ণা নিবারণের ইচ্ছা তিনি দীর্ঘকাল যাবত পোষণ করেন। বস্তুত সেখানে সব কিছুই বিশাল, সমৃদ্ধ এবং উৎপাদনশীল। কাব্যের সে আর এক মহা সমুদ্র।' কিন্তু এই ঘোষণা সত্ত্বেও তার কবিতায় কোন উল্লেখযোগ্য প্রাচ্য অবদান খুঁজে বের করা দুষ্কর। যে সব পারস্য কবি গথে ও জার্মানদের উপর তাদের জাদুকরী প্রভাব সৃষ্টি করেছেন তাদের প্রভাব তাঁর মধ্যে অবশ্যই নেই। বরং আরব কবিদের প্রতিই তাঁর সহানুভূতি ছিল। আরব থেকে পারস্য একটি প্রচণ্ড পরিবর্তন; এটি যেন একটি পুরুষ জাতির পর একটি নারী জাতির কাছে আগমন...... পরাধীন জাতির কাব্য সৃষ্টি। পারস্যবাসী হচ্ছে এশিয়ার ইটালীবাসী। তার কাছে প্রাচ্য, *লেস ওরিয়েন্টেলস*–এর *যিম–যিযিমির* প্রাচ্য, তখনো অষ্টাদশ শতকের ঐতিহ্য অনুযায়ী মূলত একটি উজ্জ্বল ও দুর্বিনীত প্রাচ্য ছিল। এই প্রাচ্য গোটিয়ের ফর্চুনিয়ো চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। কিংবা কবি ও পণ্ডিতদের কল্পনা ও স্বর মাধুর্যের আবাস না হয়ে এটি বায়রনের একটি সুশোভিত প্রাচ্য। ডেলাক্রওয়া আলজিরীয় বিষয়বস্তুকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন তেমনিভাবে তিনি এটিকে তার উজ্জ্বল বর্ণের শৈল্পিক রূপ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করেছেন। ফ্রান্সের প্রায় সব রোমান্টিক লেখকের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। জেরার্ড ডি নার্ভাল ও জ্যেষ্ঠ গোটিয়ের ন্যায় কেউ কেউ অনেকটা জার্মান সাহিত্য চর্চার প্রভাবে প্রাচ্যের প্রতি সত্যিকারের সংশ্লিষ্টতা অনুভব করেন। কিন্তু তাদের প্রাচ্যবাদ প্রায়ই ধার করা। ব্রুনেটিয়ারের ভাষায় প্রাচ্যের জিনিস পরিচিত হতে গিয়েও 'আভ্যন্তরীণ' হয়নি।

উনবিংশ শতকে ইংরেজি সাহিত্য মূলত ফ্রান্সের ন্যায় একই পর্যায়ে ছিল। নতুন প্রাচ্যবাদ আশা অনুযায়ী অধিকতর স্বাক্ষর রাখলেও প্রাচ্য আলঙ্কারিক পটভূমি সৃষ্টির বাইরে

www.waytojannah.com

তেমন কোন অবদান রাখেনি। এই পটভূমি 'স্থানীয় রঙের' ওপর রোমান্টিকতার আমেজে সমৃদ্ধ হয় এবং তা স্কট ও জার্মান আন্দোলনের অবদান। এই অপর প্রাচ্যকে বায়রনই জনপ্রিয় করেন এবং এর ক্লাসিক দৃষ্টান্ত হচ্ছে মূর-এর *লাল্লা রুখ। অ্যারাবিয়ান নাইটস* কাঠামো গল্পের কয়েকটি উপাদানে সীমাবদ্ধ হয় এবং জোন্স, ডি হার্বিলট ও প্রাচ্যবিদদের রচনার ওপর ভিত্তি করে কাব্য-কাহিনীগুলি রচিত হয়। প্রাচ্যের ভাবধারা ও চিত্রকল্পে নিজস্ব কল্পনাকে ভরে তোলার জন্য মূর দুই বছর পর্যন্ত নিভৃতে অবস্থান করেন। কিন্তু এর ফলে নিজস্ব তৃপ্তি লাভ করলেও[১] তার কাব্য কেবল স্কটের রচনাভঙ্গিকে তার বাসভূমি থেকে ভারতে বয়ে নিয়ে যায়। অন্যদের ব্যাপারে বলতে গেলে বড় বড় কবিদের ক্ষেত্রে প্রাচ্যবাদের স্থান অতি সামান্য। *সোহরাব এণ্ড রুস্তাম ফেরিস্টাইস ফ্যান্সীজ* প্রভৃতি গ্রন্থে নাম ছাড়া প্রাচ্যের নিদর্শন নেই বললেই চলে। গদ্য সাহিত্যে *শাগপাট* আরব আদর্শের ওপর এককভাবে স্বকীয়তা বজায় রেখেছে।

অতএব এই আপাতবিরোধী সত্যের সমাধান হচ্ছে যে, যেখানে মুসলিম প্রাচ্য সংশ্লিষ্ট সেখানে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের কবি-সাহিত্যিকগণ পর্দার অন্তরালে যে বাস্তবতা তাদের প্রেরণা যোগাতো সেখান থেকে তাদের নিজস্ব কল্পনার রোমান্টিক দৃশ্যের তন্ময়তায় অন্যমনস্ক হতেন। প্রাচ্যকে নিছক রঙের পরিকল্পনা হিসাবে ব্যবহার করা হতো। মানব জাতির আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারিত্বে এর অবদানের যে দাবি করা হয় তা অধৈর্যের সঙ্গে একদিকে সরিয়ে দেওয়া হতো। বহুকাল আগে স্যার উইলিয়াম জোন্স মন্তব্য করেন যে, এশিয়ার জনগণ ও প্রাকৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে গভীরতাপূর্ণ জ্ঞান না থাকলে এশীয় কাব্যের সমঝদার হওয়া সম্ভব নয়। যতদিন পর্যন্ত এই অপরিহার্য জ্ঞান গুটিকয়েক পণ্ডিত ব্যক্তি ও সিভিল সার্ভেন্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন পর্যন্ত ইউরোপের ওপর প্রাচ্য সাহিত্য ও চিন্তাধারার কোন উৎপাদনশীল প্রভাব সৃষ্টির প্রশ্নই ওঠেনি। যারা প্রাচ্যকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করে এবং যারা গোবিনিউ ও মোরিয়ারের ন্যায় কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক সহানুভূতি নিয়ে এর চিত্র অঙ্কন করে তারা নিঃসন্দেহে প্রাচ্য সাহিত্য ও প্রাচ্য জীবনের কাছে কিছুটা ঋণী। কিন্তু এই ঋণ পরিমাপ করা দুঃসাধ্য।

তবুও উনবিংশ শতকেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মৌল সম্পর্কের স্বাক্ষর বহন করে। একজন ইংরেজ যেভাবে *ভ্যাথেক*-এ প্রাচ্য ও গথিক কাহিনীর সংমিশ্রণ সৃষ্টি করেন, ঠিক তেমনিভাবে বর্তমান কালেও আরেকজন ইংরেজ পাশ্চাত্য কাব্যের অন্তস্থলে জনৈক প্রাচ্য কবির প্রবেশ ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। ফিৎজিরাল্ডের *ওমর খাইয়াম* একই সময়ে সত্যিকারের পারসিক এবং সত্যিকারের ইংরেজি। এটি অনুবাদ নয়, পুনঃসৃষ্টি। বিখ্যাত

---

১. আমি নিজে কখনো প্রাচ্যে না গেলেও যারা সেখানে গিয়েছেন তাদের প্রত্যেকেই ঘোষণা করেন যে, 'লাল্লা রুখ'-এ আমি যেভাবে প্রাচ্যকে, এর জনসাধারণকে এবং এর জীবনকে প্রতিফলিত করেছি তার চাইতে অধিকতর পূর্ণাঙ্গ আর কিছু হতে পারে না।

www.waytojannah.com

চতুষ্পদী শ্লোকগুলিতে প্রকাশিত কবি-মানস অত্যন্ত বীরত্বব্যঞ্জক বা উচ্চমার্গের না হলেও এতে ঐ যুগের সঠিক সুর ধরে রাখা হয়েছে এবং আটশত বছর আগে ইস্পাহানের সভ্য সমাজের সুমার্জিত ভোগ সুখবাদকে যেভাবে প্রতিধ্বনিত করা হয় ঠিক তেমনিভাবে এটিও প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

ইউরোপীয় সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি ফিরালে প্রথমে মনে হয় যে, মুসলিম প্রাচ্যের সাহিত্যের প্রভাব একটি সঙ্কীর্ণ ও অনুৎপাদনশীল ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। কিন্তু যখন এটি উপলব্ধি করা যায় যে, প্রাচ্য সেখানকার চেতনায় খামির ন্যায় কাজ করেছে, তখনি এর অনেক বিস্তৃততর গুরুত্ব বোঝা যায়। আমাদের অভিমত নির্ভুল হলে তিনটি পৃথক পৃথক যুগে এটি পাশ্চাত্য সাহিত্যে ফলশ্রুতি সৃষ্টি করেছে। এসব ফলশ্রুতি একই ধরনের হলেও পরিমাণের দিক দিয়ে এক নয়। প্রত্যেক বারেই এর কাজ ছিল একটি সঙ্কীর্ণ ও নির্যাতিত অবস্থা থেকে কল্পনার মুক্তি সাধন, গতানুগতিকতার প্রাচীরে প্রথম ভাঙন সৃষ্টি। এতোদিন পর্যন্ত যে সৃজনশীল প্রেরণা সুপ্ত বা প্রাণহীন ছিল এবং যা প্রাচ্য সাহিত্য পাশ্চাত্যকে ঋণ হিসাবে দিয়েছে, সেই প্রেরণা উদ্দীপ্ত করার ক্ষমতা এর ছিল। আন্দোলন একবার শুরু হলে নিজস্ব আভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে তা প্রাণবেগ লাভ করে। যে সব প্রাচ্য উপাদান আয়ত্ত করা হয় সেগুলি স্থানীয় উপাদানের সঙ্গে এমনভাবে সংমিশ্রিত হয় যে, চূড়ান্ত পর্যায় সেগুলিকে প্রায়ই চেনা যায় না। প্রাচ্য যেখানে ইউরোপীয় সাহিত্যের জন্য আদর্শসমূহ সরবরাহ করেছে সেখানে সে নিম্ন পর্যায়ের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মধ্যযুগে ইসলামী সভ্যতা ও খৃষ্টান জগতের মধ্যে যখন জ্ঞানচর্চার পদ্ধতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় তখন শেষোক্তদের অনুকরণই বেশি ফলপ্রসূ হয়। রেনেসাঁর পর এটি বড়জোর নির্দোষ কৌতূহলের সৃষ্টি করে। একই কারণে প্রাচ্য সাহিত্যের সঙ্গে মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার যোগাযোগের ফল পরবর্তীকালের যোগাযোগের ফলের চাইতে অনেক বেশি ব্যাপক।

এই তিনটি আকস্মিক যোগাযোগের মুহূর্তগুলি অনুসরণ করে জার্মান রোমান্টিক লেখকরা পুনরায় প্রাচ্যের দিকে দৃষ্টি ফেরায় এবং প্রাচ্য কাব্যের সত্যিকার লব্ধ সম্পদকে ইউরোপীয় কাব্যে প্রবেশ করাণোর একটি পন্থা উন্মুক্ত করার জন্য সচেতনভাবে লক্ষ্য স্থির করে। নতুন ক্ষমতা ও প্রাধান্যবোধ নিয়ে উনবিংশ শতক তাদের এই লক্ষ্যের সামনে চূড়ান্তভাবে সমাজে দ্বার উন্মুক্ত করে। অপর দিকে বর্তমানে একটি পরিবর্তনের লক্ষণও দেখা যায়। প্রাচ্য সাহিত্য তার জন্যই আবার পঠিত হচ্ছে এবং প্রাচ্য সম্পর্কে একটি নতুন উপলব্ধি দানা বেঁধে উঠেছে। এই জ্ঞান প্রসারিত হওয়ার জন্য মানব জীবনে তার যথাযথ স্থান পুনরুদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য সাহিত্য আর একবার তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে পারে, এবং যে সঙ্কীর্ণ ও নির্যাতনমূলক ধ্যান-ধারণা সাহিত্য, চিন্তাধারা ও ইতিহাসের সর্বপ্রকার উলেখযোগ্য জিনিসকে ভূ-মণ্ডলে আমাদের নিজস্ব ক্ষুদ্র অংশে সীমাবদ্ধ করে রাখবে—সেখান থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাদের সাহায্য করতে পারে।

এইচ এ আর গিব

www.waytojannah.com

আধ্যাত্মিকতা

বেশি দিন আগের কথা নয়। আমি মিস আণ্ডারহিলের *মিস্টিসিজম* বইটির প্রথম দিকের কয়েকটি পৃষ্ঠা উল্টিয়ে যাচ্ছিলাম। দুটি উদ্ধৃতির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। একটি মধ্য যুগীয় জনৈক জার্মান অতীন্দ্রিয়বাদীর এবং অপরটি জনৈক ইংরেজ লেখকের যার মৃত্যু সংবাদ মাত্র কয়েকদিন আগে প্রচারিত হয়। আমি অত্যন্ত বিস্মিত হই, কারণ দুটি উদ্ধৃতির সঙ্গেই মুসলিম অধ্যাত্মবাদীদের অবিকল সাদৃশ্যের কথা আমার মনে পড়ে। 'একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোন জীব সমষ্টি এই শব্দটি বলতে পারে না, কারণ এতে সেই জীবকে নিজেকে *অ-সমষ্টি* বলে সাক্ষ্য দিতে হয়'—একহার্টের এই বিখ্যাত উক্তিটি আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সাড়ে তিনশ বছর আগে বাগদাদে মরমী অদ্বিতীয়ত্বের (তওহীদ) সংজ্ঞা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আবূ নাসর আস-সাররাজ লিখেছেন, "আল্লাহ ছাড়া আর কেউ 'আমি' বলতে পারে না, কারণ প্রকৃত সত্তা (অস্তিত্ব) একমাত্র আল্লাহতেই নিহিত।" "এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধি একক বলে মনে হয়, যেখানে সব বোধশক্তি একই বোধশক্তিতে একাকার"-এডওয়ার্ড কার্পেন্টারের এই উক্তিটি আমাকে মিসরীয় কবি ও সূফী ইবনুল ফরীদের (আনু. ১২৩৫ খৃ.) *তা'ইয়া* শীর্ষক কবিতার কতিপয় স্তবক (৫৮০-এর পরবর্তী) অনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করে। সেখানে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনাকে এমন একটি অভিজ্ঞতা হিসাবে বর্ণনা করেন যেখানে সর্বপ্রকার বোধশক্তি একাকার এবং যুগপৎভাবে সক্রিয় হয় ঃ

> আমার চোখ যখন কথা বলে তখন আমার রসনা অপলক দৃষ্টিতে থাকে তাকিয়ে ; আমার কান যখন সরব তখন হাত তা শোনে;
>
> আর আমার কান যখন দৃশ্যমান সব কিছু দেখার জন্য হয় চোখ, তখন আমার চোখ গান শোনার জন্য হয় কান।

এটি এমন একটি 'ঘটনাচক্র' স্পষ্টত যার প্রমাণমূলক মূল্য রয়েছে। আধ্যাত্মিক মনস্তত্ত্ব ও অনুধ্যানের সমস্যাবলীর ব্যাপারে পাশ্চাত্য এখনো ইসলামের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে। মধ্যযুগে মুসলিম দর্শন ও বিজ্ঞান যখন তাদের স্পেনীয় কেন্দ্র থেকে খৃষ্টান ইউরোপে আলো বিকিরণ করে তখন পাশ্চাত্য এসব বিষয়ে প্রকৃত পক্ষে কি পরিমাণে শিক্ষা লাভ করে তা এখনো আমাদের বিস্তারিতভাবে অনুসন্ধান করতে হবে। কিন্তু এই পরিমাণ নিশ্চয়ই যথেষ্ট ছিল। এই সূত্র থেকে যদি টমাস অ্যাকিনাস, একহার্ট ও দান্তের ন্যায় ব্যক্তিদের মধ্যে কোন প্রভাব সৃষ্টি না হয়ে থাকে তাহলে তা বাস্তবিকই

www.waytojannah.com

অদ্ভুত ব্যাপার হবে। কারণ আধ্যাত্মিকতার সাধারণ ক্ষেত্রেই মধ্যযুগীয় খৃষ্ট ধর্ম ও ইসলাম অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সংস্পর্শে আসে। আমরা দেখতে পাবো যে, ইতিহাসে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত। ঐ যুগের রোমান ক্যাথলিক ও মুসলিম অধ্যাত্মবাদীদের ধ্যান-ধারণা ও রীতি-পদ্ধতিতে একই ও অনুরূপ আধ্যাত্মিক প্রতিভার ছাপ কেন দেখা যায়, এটি তা বিশ্লেষণ করে। কিন্তু ক্যাথলিক সম্প্রদায় তাদের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রাখলেও ত্রয়োদশ শতকের পরে ইসলাম-এর প্রধান ধারা এমন একটি নতুন ধর্মীয় দর্শনের পথে প্রবাহিত হয় যাতে নিষ্ঠাবান মুসলমানদের দৃষ্টিতে, ধর্ম ছাড়া আর সব কিছুই আছে।

আমরা যখন মেসোপটেমিয়ায় সূফী নামের সঙ্গে পরিচিত হই তখন হিজরীর দ্বিতীয় শতক (৭১৯-৮১৬ খৃ.) সমাপ্ত প্রায়। মুসলিম অধ্যাত্মবাদীরা অচিরেই সাধারণভাবে এই নামে পরিচিত হন। সূফী শব্দটি *সাওফ* থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ পশমের বর্ণহীন মোটা পোশাক। খৃস্টান তাপসরা এই পোশাক পরতেন এবং তা একই পন্থা নির্দেশ করে। এর উৎস সম্পর্কিত জটিল প্রশ্নগুলি এখানে আলোচনা করার অবকাশ নেই, কিন্তু এ সম্পর্কে আমার কাছে যা মনে হয় তা আমি তুলে ধরতে চাই। প্রথমেই আমাদের এই অভিমত মেনে নিতে হবে যে, সূফীবাদ তথা তাসাওউফ মূলত ইসলামী। সূফীরা মহানবী (সা)-এর কাছ থেকে তাদের মতবাদ লাভ করেছেন বলে যে দাবি করেন তা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা যায়। তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমরা সম্ভবত যে একমাত্র খাঁটি লিখিত তথ্য পাই তা হচ্ছে পবিত্র কুরআন।[১] এখানে রিয়াযত ও মা'রিফতের ঐ সব উপাদানের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। অবশ্য সূফীয়ায়েকেরাম প্রথমোক্ত উপাদানগুলির উপর তার চাইতেও বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং অধিকতর গভীর ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণভাবে এগুলির তাৎপর্য তুলে ধরেন। কিন্তু এর দ্বারা এই অভিমত প্রমাণিত হয় না যে, সূফীবাদের সঙ্গে *কুরআনের* কোন সম্পর্ক নেই। মুসলমানরা সব সময় তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থকে শ্রদ্ধা করে, শৈশব থেকে কণ্ঠস্থ করে এবং মানুষের সকল জ্ঞানের উৎস হিসাবে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পর্যালোচনা করে। তাই সূফীদের উপরিউক্ত ধারণা তাদের কাছে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইলমে শরীফ ও ইলমে মা'রিফাত-এর পৃথক কোন নির্দিষ্ট প্রণালী রেখে না গেলেও পবিত্র *কুরআনে* উভয়টিরই উপাদান রয়েছে। মুসলিম ফুকাহা ও উলামায়েকেরাম বৈষয়িক জগতের অতীত শ্রেষ্ঠত্বকে তাদের বিশ্বাসের অঙ্গীভূত করেছেন। অপর দিকে সূফীগণ প্রিয় নবী করীম (সা)-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এই শ্রেষ্ঠত্বকে সর্বব্যাপী অস্তিত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। এ বিষয়টি *কুরআনে* কম প্রাধান্য পেলেও তারা স্বাভাবিকভাবে এর ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। 'আল্লাহ্ আসমানসমূহ ও পৃথিবীর নূর (আলো)' (২৪ : ৩৫), 'তিনি আউয়াল ও আখির এবং জাহির ও বাতিন (৫৭ : ৩), তিনি ছাড়া আর কোন

---

১. বক্তব্যটি একান্তভাবে লেখকের। বস্তুত মহানবী (সা)-এর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে পবিত্র হাদীস-এ যেসব বিস্তারিত তথ্য রয়েছে তাও প্রামাণ্য-অনুবাদক।

www.waytojannah.com

Contents

ইলাহ নেই; তার সত্তা ছাড়া সব কিছুই ধ্বংসশীল' (২৮ ঃ ৮৮); 'আমি আমার রূহ্ তার (মানুষের) মধ্যে সঞ্চারিত করেছি' (১৫ ঃ ২৯); আমিই মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার নফ্স তাকে কি কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি, কারণ আমি তার গ্রীবার ধমনীর চাইতেও নিকটতর' (৫০ ঃ ১৬), 'যেদিকেই তুমি মুখ ফিরাও না কেন সেদিকেই আল্লাহর দিক, (২ ঃ ১১৫), যাকে আল্লাহ জ্যোতি দেন না তার আদৌ কোন জ্যোতি নেই' (২৪ ঃ ৪০), মারিফতের বীজ নিশ্চয়ই এগুলির মধ্যে নিহিত। প্রাথমিক সূফীদের জন্য কুরআন কেবল আল্লাহর কালামই নয়; এটি তার নৈকট্য লাভের মৌলিক উপায়। ঐকান্তিকভাবে ইবাদতের মাধ্যমে এবং সামগ্রিকভাবে উদ্ধৃত অংশগুলিও বিশেষভাবে 'রাত্রিকালীন সফর এবং উর্ধারোহণ *(মিরাজ)* সম্পর্কিত মুজিযা সম্বলিত আয়াতে করিমাসমূহের (১৭ ঃ ১; ৫৩ ঃ ১–১৮) সম্পর্কে গভীর মুরাকাবা–মুশাহিদার মাধ্যমে তারা মহানবী (সা)–এর রূহানী অভিজ্ঞতা পুনরুৎপাদনে কঠোর সাধনা করেন।

এখন সময় ও স্থানের অবস্থা বিবেচনা করা যাক। যে রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলে দামেস্ক থেকে বাগদাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় তাতে ইসলাম সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রাচীনতর সভ্যতার চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসে এবং একই সময়ে উভয়ের মধ্যে সংঘাতেরও সৃষ্টি হয়। এসব চিন্তাধারা শেষ পর্যন্ত বিলীন হলেও ইতিহাসে দেখা যায় যে, এ ধরনের মুকাবিলায় পুরোপুরি বিজয় কদাচিৎ সাধিত হয়। যেসব এলাকায় দীর্ঘকাল যাবত প্রাচীন গ্রীক জ্ঞান–বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিরাজমান ছিল আমরা সেখানকার একটি সুদূর প্রসারী আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করছি। এখানে একদিকে মুসলমান এবং অন্যদিকে খৃস্টান *ম্যানেকিয়েন*[১] ও *যোরোয়াষ্টিয়ানদের*[২] মধ্যে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে দৈনন্দিন বিতর্ক অনুষ্ঠিত হতো। যেসব বিজিত জাতি সদ্য ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন এবং নিজেদের প্রয়োজনের সঙ্গে নতুন ধর্মকে খাপ খাইয়ে নিতে চান তারা যেসব মতবাদ ও রীতিকে গুরুত্ব দিতেন সেগুলিতে মহানবী (সা)–এর অনুমোদন রয়েছে বলে দাবি করতেন। সূফীদের *কুরআনের* গূঢ় অনুসারী মনে করা যুক্তিযুক্ত। তবে কোন কোন সূফী সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ দেখে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তা *কুরআন* অনুশীলনের নিখুঁত ফল নয়। ১০০০ খৃস্টাব্দের পর প্রাচীন গ্রীক দর্শন আত্মভূত ও সংমিশ্রণ করতে শুরু করে এবং এ পর্যন্ত যেসব প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে এই ইঙ্গিতই পাওয়া যায় যে, এর মূল উদ্ভব ও প্রাথমিক

---

১. *ম্যানেকী* ধর্মমতের অনুসারী। মেনিয নামে পরিচিত পারস্যের জনৈক ধর্মপ্রচারক ও তার অনুসারীরা ৩য় থেকে ৭ম শতক পর্যন্ত এই ধর্মমত প্রচার করেন। ভালো ও মন্দের দুটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ধর্মীয় দর্শনে যোরোয়াস্টিয়ান নোমিক, খৃস্টান ও পৌত্তলিক উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটে। –অনুবাদক।

২. জরথুস্ত্র (খৃ পূ ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতক) প্রচারিত ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী প্রাচীন পারস্য ধর্ম। যেন্দআবেস্তা নামক ধর্ম গ্রন্থে এর যেসব মূলনীতি উল্লেখিত রয়েছে তদনুযায়ী এর অনুসারীরা এক ধরনের পরকালে এবং সর্বব্যাপী ভালো শক্তি (ওরমাযদ) ও মন্দ শক্তির (আহরিমান) মধ্যকার অব্যাহত দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত ভাল শক্তির বিজয়ে বিশ্বাস করেন। –অনুবাদক।

www.waytojannah.com

বিকাশ খৃষ্টান সন্ন্যাসবাদ ও গ্রীক আতীন্দ্রিয়বাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়। আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে, মহানবী (সা)-এর কাছে পরিচিত *রাহিব* (খৃষ্টান সন্ন্যাসী) তার অনুসারীরা যে জীবন যাপন করেন তার অন্যতম আদর্শ হিসাবে কাজ করে। তাঁর বিখ্যাত উক্তি হিসাবে পরিচিত *'লা রাহবানিয়াতা ফিল ইসলাম'*, ইসলামে সন্ন্যাস জীবনের স্থান নেই, বস্তুত খৃষ্টান আদর্শের বিরুদ্ধে পরবর্তীকালের একটি প্রতিবাদ এবং এটি উক্ত আদর্শের প্রভাবের একটি প্রমাণ।[১] মহানবী (সা) *কুরআনে* উল্লিখিত চিরকৌমার্যসহ *রাহবানিয়ার* নিন্দা করেছেন বলে সাধারণত মনে করা হয়, কিন্তু সূরা ৫৭ ঃ ২৭-এর যে ভাষ্য হিজরী তৃতীয় শতকের সমাপ্তি পর্যন্ত অব্যাহত ছিল তদনুযায়ী তিনি আল্লাহর নির্দেশিত একটি পন্থা হিসাবে এর প্রশংসা করেন ঃ যারা এটিকে নীতিভ্রষ্ট করেছেন তাদেরই কেবল নিন্দা করেছেন।[২] লেখকের এই অভিমত বিভ্রান্তিমূলক। কারণ ইসলাম কখনই বৈরাগ্যবাদ বা সন্ন্যাসবাদ *(রাহবানিয়াত)* সমর্থন করেনি। ইলমে তাসাওউফে যুহদের যে কথা আছে তা রাহ্বানিয়্যতের সংগে সম্পৃক্ত নয়। তবে কিছু বাতিল দল দেখা যায় যাদের সাথে তাসাওউফের মৌল পার্থক্য রয়েছে। সে সব দলকে পথভ্রষ্ট রূপে তরীকতের ইমামগণ চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য লেখকগণ এমন কি কোন কোন সত্য মিথ্যাকে তথা হক ও বাতিলকে এক সংগে হাজির করতে গিয়ে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন-অনুবাদক

তাকওয়া, রোযা, আত্মসংযম, ইবাদতে একাগ্রতা, যিকর ফিকর ও রিয়াযত সে কালেই মুসলমানদের ইলমে বাতিনের জন্য জোরদার প্রতিষ্ঠান ছিল, যেহেতু আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তাই জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কিংবা জান্নাত লাভের আশায় তাঁর ইবাদত করার অর্থ তাঁর (আল্লাহ্র) সঙ্গে 'উপাস্যকে' সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ আশা বা ভীতি নামক অন্য বিষয়কে সংশ্লিষ্ট করা, তাই কঠোর সংযমী সূফী একমাত্র তাঁর (আল্লাহ্র) উপরই নির্ভর করতে (তাওয়াক্কুল) উদ্বুদ্ধ হন এবং তার ইবাদত করেন। শুধুমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য তাঁরই নিকট নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেন। এখানেই শেষ নয়। প্রকৃত সূফী মনে করেন যাবতীয় শির্ক বর্জনের মাধ্যমেই আল্লাহ্র কুরবত ও রিযামন্দী হাসিল হয়। ইলমে মারিফাতের ভাষায় ঃ প্রেমের মাধ্যমেই আল্লাহ্র সাথে মিলন। এই চিন্তাধারাই ইলমে তাসাউফ বিকশিত করেছে। মহিলা সাধক রাবেয়া বসরীর (ওফাত ৮০১ খৃ.) মধ্যে এর প্রথম সূচনা দেখা যায়। কথিত আছে যে, তিনি একজন ক্রীতদাসী ছিলেন এবং তার কোন জন্ম পরিচয় ছিল না। তার দ্বারা রচিত হোক বা নাই হোক নিম্নোক্ত চরণগুলিতে মাশুকের (প্রেমাস্পদ) পরমানন্দজনক ধ্যানের মধ্য দিয়ে অধ্যাত্মবাদীদের লক্ষ্য প্রতিফলিত হয়েছে ঃ

---

১. এই উক্তিটি একান্তভাবে লেখকের।- অনুবাদক।
২. এই অভিমতও একান্তভাবে লেখকের।- অনুবাদক।

www.waytojannah.com

Contents

আমি তোমাকে দুভাবে ভালবাসি ঃ স্বার্থপর ভাবে,
এবং তারপর, শুধু তোমারই জন্য যথাযোগ্যভাবে।
প্রতিটি চিন্তায় তোমার চিন্তা ছাড়া
স্বার্থপরতার লেশমাত্র নেই আমার প্রেমে।
আমার গভীর প্রেমার্ত দৃষ্টির সামনে তুমি যখন
অবগুণ্ঠন তোলো তখন তা পবিত্রতম প্রেম।
এতে হোক ওতে হোক প্রশংসা আমার নয়;
আমি মনে করি, উভয় ক্ষেত্রে প্রশংসা তোমারই।

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক মিলনের মতবাদ *কুরআনে* অনেক গভীরতাপূর্ণ। মহানবী (সা)-এর হাদীসে কুদসীতে তা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, "আমার বান্দা নফল ইবাদত দ্বারা আমার কাছাকাছি আসে, এবং আমি তাকে ভালবাসি। এবং আমি যখন তাকে ভালবাসি তখন আমি তার শ্রবণশক্তি, যাতে সে আমার দ্বারা শুনতে পায়, এবং দৃষ্টি, যাতে সে দেখতে পায়; এবং কণ্ঠ, যাতে সে কথা বলতে পারে; এবং তার হাত, যাতে সে গ্রহণ করতে পারে।" আল্লাহ্‌র নামের অবিরত পুনরাবৃত্তির (যিকর) মাধ্যমে আপনা থেকে উৎপন্ন একাগ্রতার প্রগাঢ় প্রচেষ্টা থেকে শুরু করে সূফীরা এমন একটি মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি তথা মুরাকাবা-মুশাহাদার উদ্ভাবন করেছেন যা আত্মাকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান (মারিফাত) লাভে অনুপ্রাণিত বা উদ্বুদ্ধ করে। এই অবস্থাকেই বলা হয় আল্লাহর সঙ্গে একাত্ম হওয়ার বৈশিষ্ট্য (ফানাফিল্লাহ্) সমূহের জ্ঞান যা ঐসব সূফীর বিশেষত্ব যারা নিজেদের কলবে নূর অবলোকন করে। মুসলমানদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম এই আভ্যন্তরীণ জীবনের একটি পরীক্ষামূলক বিশ্লেষণ দান করেছেন তিনি হচ্ছেন বসরার হারিস আল মুহাসিবি (ওফাত ৮৫৭)। *রি'আয়া লি-হুকুক আল্লাহ্* বা 'ধর্মীয় কর্তব্য পালনের পদ্ধতি' শিরোনামে লিখিত এই গ্রন্থটির একটি অপরূপ পাণ্ডুলিপি এখনো অক্সফোর্ডে রয়েছে। যদিও তিনি নৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য ইহুদী ও খৃষ্টান সূত্রকে অনেক খানি কাজে লাগিয়েছেন, তথাপি এই গ্রন্থে সূক্ষ্মতা ও মৌলিকত্ব রয়েছে। পরবর্তী লেখকদের দ্বারা বর্ণিত 'পন্থা' (তরিকা) অর্জিত গুণাবলী (মাকামাত) ও আধ্যাত্মিক অবস্থা (আহ্ওয়াল) সমবায়ে গঠিত। প্রথম পর্যায়টি হচ্ছে অনুতাপ বা অবস্থান্তর। এরপর পর্যায়ক্রমিকভাবে অন্য পর্যায়গুলি আসে। যেমন পরিহার, দারিদ্র, ধৈর্য, আল্লাহ্য় বিশ্বাস। প্রত্যেকটি পরবর্তীটির প্রস্তুতিমূলক। বিস্তারিত ক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি একই ধরনের। শিষ্যরা 'হৃদয়ের কাজকে' 'অনুসারীদের কাজের' উপর ও নিয়তকে কার্যের উপর স্থান দেওয়ার এবং মনোযোগের সঙ্গে ধর্মীয় বিধান পালনের সময় জরুরী বিধিগুলিকে একটি গভীরতর সত্যের প্রকাশ বা প্রতীক হিসাবে মনে করার শিক্ষা লাভ করে। অসঙ্গতিমূলক প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও এসব মূলনীতি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মুসলিম

www.waytojannah.com

বিধি–বিধানে প্রবিষ্ট হয়েছে এবং যে নীতিশাস্ত্র মহান ধর্মতাত্ত্বিক ইমাম গায্যালী রহমাতুল্লাহি আলায়হি (ওফাত ১১১১) বিশ্লেষণ করেছেন এবং সাদীর (ওফাত ১২৯১ খৃ.) ন্যায় জনপ্রিয় নীতিবিদগণ প্রতিফলিত করেছেন তার ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছেন। নিজেদের ভালবেসেছেন বলে সূফীদের অভিযুক্ত করা না গেলেও একথা সত্য যে, তারা আল্লাহ্‌র প্রতি প্রেম প্রদর্শন করতে গিয়ে কখনো কখনো তাদের প্রতিবেশীদের বিশেষত যারা তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত নন, তাদের ক্ষতি সাধন করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের ফানাফিল্লাহ্‌র ধারণা তাঁর সৃষ্ট জীবকে ভালো না বেসে আল্লাহ্‌কে ভালবাসা তাদের জন্য অসম্ভব করে তোলে।

হিজরী তৃতীয় শতকের সূফীগণ ইলমে তাসাওউফ সামগ্রিকভাবে বিকশিত করেন। হযরত যুননুন মিসরী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ইসলামে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের (মারিফা) তথা পরমানন্দের মোহাবিষ্ট অবস্থার জ্ঞানের প্রচলন করেন। এটি বুদ্ধিভিত্তিক প্রচলিত জ্ঞান (ইল্‌ম) থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আল্লাহ্‌কে কিভাবে জানেন এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমি তাঁকে তাঁর মাধ্যমেই জানি।' ডায়োনিশিয়াসের ন্যায় তিনি ঘোষণা করেন যে, 'আপনি যা কিছু কল্পনা করতে পারেন আল্লাহ্ হচ্ছেন তার বিপরীত' এবং 'কেউ আল্লাহ্‌কে যত বেশি জানে তত বেশি তাঁর (আল্লাহ্‌র) মধ্যে বিলীন হয়।' এরপর থেকে আমরা নির্বাচিত ব্যক্তির জন্য সংরক্ষিত মতবাদের উপযোগী প্রতীক পদ্ধতি ও পরিভাষার ক্রমবর্ধমান ব্যবহার দেখতে পাই। তারা উপলব্ধি করেন যে, এসব গূঢ় রহস্য কোন অপবিত্র কানে দেওয়া উচিত হবে না। পারস্যবাসী বিস্তামের আবূ ইয়াযিদ (বায়যীদ বুস্তামী) সম্ভবত 'ভারতের অদ্বৈতবাদের দ্বারা প্রভাহিত হয়ে' লেখকের এ মন্তব্য আদৌ সঠিক নয়। হযরত বায়যীদ বুস্তামী (র) ইসলামের শাশ্বত শিক্ষায় উদ্ভাসিত ছিলেন। অন্য কোন প্রভাব দ্বারা তিনি প্রভাবান্বিত হননি। ফানা (আত্মবিলোপ) মতবাদ উদ্ভাবিত করেন। অচিরেই এর সঙ্গে এর যথার্থ পরিপূরক অংশ বাকা (আল্লাহতে স্থিতি) যুক্ত হয়। এই নিগূঢ় তত্ত্বের দ্বারা বায়যীদ বুস্তামী মঞ্জিলে মকসুদে কতটুকু উন্নীত হয়েছিলেন তা বলা দুরূহ হলেও তিনি পারস্যের পরবর্তী কালের সূফীদের কাছে সুলতানুল আবেদিনের মর্যাদা লাভ করেন। তাঁরা তাঁর বিশেষ হালতে উচ্চারিত বাক্য যেমন সুবহানী, গৌরব আমারই ইত্যাদির উচ্চারণে অবসন্ন হননি। এবং তাঁর স্বপ্নে আল্লাহ্‌র কুরসীতে আরোহণের কাহিনীও তারা বলে থাকেন। তাঁর নীতিমূলক প্রচবনগুলির মধ্যে রয়েছে, 'সৃষ্টজীবগুলি অবস্থাসমূহের অধীন, কিন্তু আরিফের কোনো অবস্থা নেই। কারণ অন্য এক পরম সত্তা দ্বারা তার আমিত্ব এবং অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। ত্রিশ বছর পর্যন্ত অদৃশ্য আল্লাহ্ আমার আয়না ছিলেন, বর্তমানে আমি আমার নিজস্ব আয়না অর্থাৎ যে আমি ছিলাম এখন আর আমি নেই। কারণ 'আমি' এবং 'আল্লাহ্' আল্লাহ্‌র তৌহিদকে অস্বীকার করার শামিল। যেহেতু আমি আর নেই সেজন্য অদৃশ্য আল্লাহ্ই তাঁর নিজস্ব আয়না। আমি বলছি যে, আমি

www.waytojannah.com

Contents

আমার নিজস্ব আয়না, কারণ আমার কণ্ঠ দ্বারা আল্লাহ্ই কথা বলছেন এবং আমি উধাও হয়েছি।' সাপ যেমন তার খোলস থেকে আসে তেমনি আমিও বায়যিদত্ব থেকে এসেছি। এরপর আমি তাকাই। আমি দেখতে পাই যে, প্রেমিক, প্রেমাস্পদ এবং প্রেম এক। কারণ একাত্মতার জগতে সব কিছু এক হতে পারে।' যারা আধ্যাত্মিক 'নেশাকে' গাম্ভীর্যের চাইতে প্রাধান্য দান করেন তারা বায়যিদের অনুরাগী হলেও তাদের বিরুদ্ধবাদীরা বাগদাদের জুনাইদের রীতি অনুসরণ করেন। তাঁর 'মিলনের' মতবাদ তার শিষ্য বিখ্যাত হাল্লাজ মুসলিম বিশ্বে আপসহীন বাস্তবতার সঙ্গে প্রয়োগ ও প্রদর্শন করেন। এটি বিস্ময়কর নয় যে, হাল্লাজকে যখন ধর্মদ্রোহিতার গুরুতর অপরাধে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় তখন জুনাইদ বিচক্ষণতার সঙ্গে তাঁকে অস্বীকার করেন। তাঁর '*কিতাবুত তাওয়াসিন*' গ্রন্থে এই মতবাদ সন্নিবেশিত হয়েছে। তীক্ষ্ণ ব্যাঙ্গাত্মক *আনাল হক* 'আমি সত্য (আল্লাহ্)' সূত্রটি বাদ দিলেও এটি মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত মর্মবিদারক হতো। *আনাল হক* উক্তির মধ্য দিয়ে লেখক এক কথায় মতবাদটি তুলে ধরেছেন, কিন্তু এটি এতো মৌলিক, গভীরতাপূর্ণ ও ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে, এর প্রধান ধারণাগুলি তুলে ধরার জন্য এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতিপয় সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা চালানো উচিত। এ ধরনের প্রচেষ্টা প্যারিস বিশ্ববিদ্যায়ের প্রফেসর ম্যাসিগ্নন কর্তৃক বিচ্ছিন্ন হাল্লাজীয় রচনা পুনরুদ্ধার ও ব্যাপক পর্যালোচনার মাধ্যমে কেবলমাত্র সাম্প্রতিককালে সম্ভব হয়েছে।

হাল্লাজের মতে, আল্লাহ্ প্রেমময়, তিনি মানুষকে তাঁর সুরত অনুযায়ী এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন যে, তাঁর সৃষ্টজীব একমাত্র তাঁকে ভালবেসে একটি আধ্যাত্মিক রূপান্তর লাভ করবে, নিজের মধ্যে পবিত্র অনুভবের সন্ধান পাবে এবং এভাবে পরম সত্তার ইচ্ছা ও ফিতরতের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেব। একথা পরিষ্কার যে, হাল্লাজ যে একাত্মতার কথা বলেছেন এবং ব্যক্তিগতভাবে যে একাত্মতার অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তাকে মুসলিম এবং ইউরোপীয় লেখকগণ প্রায়ই সর্বেশ্বরবাদ হিসাবে উল্লেখ করলেও তা সর্বেশ্বরবাদ ছিল না। তিনি একথা বোঝানোর জন্য যে *হুলুল* শব্দটি ব্যবহার করেছেন তা খৃস্টান অবতারবাদের ক্ষেত্রে তার সহ-ধর্মাবলম্বীদের মনেও সংশ্লিষ্ট ছিল না। তার নিজের ক্ষেত্রে তিনি এই অর্থ প্রয়োগ করেছেন বলে মনে না হলেও এতে অসাধারণ ধরনের অন্যান্য এমন কতিপয় সাদৃশ্য রয়েছে যার ফলে সূফীদের মধ্যে তিনিই যীশু খৃস্টের মননের নিকটতর হন। তিনি এক ধরনের গৌরবান্বিত ও আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত মানুষ যার ব্যক্তি সত্তাকে রূপান্তরিত ও সারবত্তাসম্পন্ন করা হয়েছে এবং যিনি আল্লাহ্‌র সাক্ষী ও প্রতিনিধি হিসাবে সমুপস্থিত থেকে তাঁর মধ্য থেকে *আল-হক* প্রতিভাত করেছেন। এই *আল-হক* হচ্ছেন স্রষ্টা যাঁর মধ্য দিয়ে তিনি টিকে আছেন এবং 'সৃষ্টিমূলক সত্য' যাঁর মধ্যে তার সামগ্রিক সত্তা নিহিত। এ ছাড়া প্রফেসর ম্যাসিগননের মন্তব্য অনুযায়ী, হাল্লাজ আধ্যাত্মিক মিলনকে 'সৃষ্টিমূলক

www.waytojannah.com

শব্দের' (কুন, হও) সঙ্গে মিলন হিসাবে কল্পনা করেন। *কুরআনের* এই শব্দটি যীশু খৃষ্টের জন্ম ও পুনরুত্থানের পক্ষে প্রযোজ্য। উপরিউক্ত মিলন 'আল্লাহর আদেশসমূহের ঘনিষ্ঠ ও গভীর উপলব্ধির মাধ্যমে' সাধিত হয়। স্বর্গীয় আদেশ এরূপ স্থায়িভাবে প্রতিপালনের ফল হচ্ছে অধ্যাত্মবাদীর আত্মার মধ্যে স্বর্গীয় সত্তার আবির্ভাব, যা 'আমার প্রভুর আদেশ থেকে' (কুরআন ১৭ ঃ ৮৭) অগ্রসর হয় এবং সেখান থেকে ঐ ব্যক্তির প্রতিটি কার্যকে 'সত্যিকারের স্বর্গীয় কার্যে' পরিণত করে। দুঃখ-কষ্ট বরণ ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জনের শিক্ষা কতো প্রকৃষ্টভাবে তিনি লাভ করেছেন একথা প্রমাণ করতেও হাল্লাজ ব্যর্থ হননি। ৯২২ খৃষ্টাব্দে বাগদাদে তার প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হয়। যখন তাকে শূলে চড়ানোর জন্য নিয়ে আসা হয় এবং তিনি শূল ও পেরেক দেখতে পান তখন জনসাধারণের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তিনি উচ্চ কণ্ঠে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করেন। তার মুনাজাতের শেষ কথাগুলি ছিল ঃ

> এবং তোমার ধর্মের জন্য গভীর আবেগে এবং তোমার অনুগ্রহ পাওয়ার আকাঙক্ষায় এই যে তোমার যেসব বান্দা আমাকে হত্যা করার জন্য সমবেত হয়েছে, হে প্রভু! তাদের ক্ষমা করো, এবং তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করো, কারণ নিশ্চয়ই তুমি আমার কাছে যা প্রকাশ করেছ তা যদি তাদের কাছে প্রকাশ করতে তাহলে তারা যা করেছে তা করতো না; এবং তুমি তাদের কাছ থেকে যা গোপন রেখেছ তা যদি আমার কাছ থেকে গোপন রাখতে তাহলে আমি এই নিদারুণ ক্লেশ ভোগ করতাম না। তুমি যা কিছু করো সমস্ত গৌরব ও প্রশংসা তোমার এবং তুমি যা কিছু ইচ্ছা করো সমস্ত গৌরব ও প্রশংসা তোমার!

ইসলামে যেখানে নিজেদের কৃতকর্মের দ্বারা মানুষের বিচার করা হয় সেখানে প্রচলিত বিশ্বাসের ব্যতিক্রম বিশ্বাসের জন্য বিধি অনুযায়ী কার্যকরভাবে শাস্তি দেওয়া যায় না, এবং ধর্মীয় বিধানের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সত্যের সংঘাত যতো তীব্রই হোক না কেন, অধ্যাত্মবাদী যতদিন পর্যন্ত তার সঙ্গী মুসলমানদের সঙ্গে নামায-রোযা অব্যাহত রাখেন ততদিন পর্যন্ত অত্যন্ত গুরুতর কিছু না ঘটাই স্বাভাবিক। একথা স্বীকৃত যে, হাল্লাজ যথাবিহিতভাবে তাঁর ধর্মীয় কর্তব্য পালন করতেন। পবিত্র হৃদয়ের অত্যন্ত বিনয় ও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে সত্যিকারের ধর্মের লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য যে 'মৌল পরিমাণ' ধর্ম চর্চা করা দরকার তিনি কখনও তার নিন্দা করতেন না। অবশ্য তিনি কখনো তোষামোদও করতেন না। ইসলামী বিধানের প্রতি এটিই ছিল বহু সূফীর আদর্শ মনোভাব, এবং দু-ই প্রভুর প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য, মনে হয় এটিই ছিল তাদের প্রকৃষ্টতম পন্থা। কিন্তু হাল্লাজ তার বিবেকের সঙ্গে আপস করার জন্য অনেক বেশি আকুল ছিলেন। মুসলিম ধর্মমত ও রাষ্ট্রের সরকারী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে তিনি অচিরেই যে আল্লাহর সঙ্গে একাত্ম হন তার কাছ থেকে প্রাপ্ত ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জুনাইদের মত শুধু মতবাদ সর্বস্ব ছিলেন না ; 'কারমাতিয়ানদের' সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল বলে সন্দেহ করা হতো; তিনি ঈমানদার

www.waytojannah.com

এবং কাফির নির্বিশেষে সকলের মধ্যে তাঁর বিশ্বাস প্রচার করতেন; এবং সর্বোপরি 'প্রামাণ্য' অলৌকিক বিষয় প্রদর্শন করে মানুষকে তার মতে আকৃষ্ট করতেন। এসব যুক্তিতে যথাযথভাবেই তাঁকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালের সূফীদের অভিমত অনুযায়ী 'তিনি স্বর্গীয় প্রভুত্বের রহস্য প্রকাশ করেছেন' এটি তাঁর অপরাধ ছিল না, বরং তাঁর অপরাধ এই ছিল যে, তিনি একটি আভ্যন্তরীণ আহবানে সাড়া দিয়ে এমন একটি সত্য প্রকাশ করেছেন এবং সক্রিয়ভাবে প্রতিপন্ন করেছেন যা ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃংখলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়। অন্যান্য অধ্যাত্মবাদীও এই সত্যের সন্ধান পায়। হাল্লাজ এই সত্যকে অবলম্বন করে বেঁচেছিলেন এবং এরি জন্য মৃত্যুবরণ করেন। তাই কবিতার যে চরণগুলির মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর প্রেমাস্পদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন কিংবা তাঁর (আল্লাহ্‌র) সঙ্গে পরিপূর্ণ একাত্মতার অনুভূতি প্রকাশের চেষ্টা করেন সেগুলি এতো আন্তরিক ও কোমল যা সূফীবাদে কদাচিৎ দেখা যায়।

> তোমার আর আমার মধ্যে একটি 'এটি আমি' টিকে আছে যা আমাকে যন্ত্রণা দেয়। ওগো, দয়াময়, আমার মধ্য থেকে এই 'আমি' সরিয়ে নাও! আমি তিনি, যাকে আমি ভালবাসি, এবং যাকে আমি ভালবাসি তিনি হচ্ছেন আমি, আমরা দুটি সত্তা এক দেহে বাস করছি। তুমি আমাকে দেখলে তাকে দেখো, এবং তুমি তাকে দেখলে আমাদের উভয়কে দেখো।

প্রসঙ্গক্রমে আমি বলতে পারি যে, চারটি বাক্যের দ্বিতীয় বাক্যটি কোন সর্বেশ্বরবাদী লিখতে পারে না। একই মনোভাবের অদ্বৈতবাদমূলক প্রকাশ জিলির উক্তিতেও দেখা যায়, 'দুটি দেহে বাস করলেও আমরা এক—এরই সত্তা।' জালালুদ্দিন রুমীর চরণেও তাই দেখা যায়।

> মুহূর্তটি আনন্দের যখন আমরা প্রাসাদে বসে থাকি, তুমি আর আমি; দুটি আকার এবং দুটি ছবি কিন্তু একটি আত্মা, তুমি আর আমি।

অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা সত্ত্বেও কোন কোন বিশেষ মুহূর্তে এবং কোন এক বিশেষ অর্থে হাল্লাজ নিজেই আল্লাহ হয়েছেন বলে যে ঘোষণা করেন তা ঐ সব ব্যক্তিকে বিস্মিত করবে না যারা এরূপ মন্তব্য করেছেন ঃ তর্কশাস্ত্রের আপাত বিরোধী সত্যগুলো প্রায়ই অধ্যাত্মবাদের সত্য। মৃত্যুর পর তার মূল মতবাদ বহুকাল টিকে না থাকলেও এটি গভীর কল্পনা বিকাশের একটি ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে, যেমন—পরিপূর্ণ মানুষের প্রকৃতি সংক্রান্ত কল্পনা। ইবনুল আরাবীর রচনায় এবং পারস্যের আধ্যাত্মিক কাব্যে এটি বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু আমরা সেখানে তার চরিত্র কিংবা নিম্নোক্ত পদ্যে তিনি তার যে বিষাদময় ব্যক্তিগত সংকট তুলে ধরেছেন তা উপলব্ধির কোন সূত্র খুঁজে পাই না।

> আল্লাহ তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন, তার পিছনের দিকে তার হাত দুটি বেঁধে, এবং তাকে বলেন, 'সাবধান হও, সাবধান হও, অন্যথায় তুমি পানিতে ভিজে যাবে!'

www.waytojannah.com

Contents

অন্যদিক দিয়ে তুলনামূলকভাবে প্রাণহীন হলেও হাল্লাজের মৃত্যুর পরবর্তী শতকে সূফী মতবাদের ওপর সর্বপ্রথম ধারাবাহিক ও সাধারণ রচনা প্রকাশিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আবু নাসর আস–সাররাজের *'কিতাবুল লুমা'* ও আবু তালেব আল মাক্কীর *কুতুউল কুলুব* উল্লেখযোগ্য। এ গুলিতে যেসব সূত্র বিলুপ্ত হয়েছে সেগুলি থেকে সংগৃহীত বহু মূল্যবান উপাদান সংরক্ষিত আছে। তখন থেকে সূফীবাদ ইসলামের ভিত্তিভূমি থেকে সর্বেশ্বরবাদ ও বিশ্বাসবাদের[১] দিকে সরে যেতে শুরু করে। এই প্রবণতার পিছনে কাজ করেছে গ্রীক দার্শনিক চিন্তাধারার বিশেষ করে 'নিঃসরনের' চিন্তাধারার ক্রমবর্ধমান প্রভাব। পারস্যের অধ্যাত্মবাদী আবু সাঈদের (৯৬৭–১০৪৯ খৃ.) জীবন ও উক্তিসমূহের মধ্যে এটি সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'সত্যিকারের সাধক জনসাধারণের মধ্যে যাতায়াত করেন, তাদের সঙ্গে আহার করেন ও নিদ্রা যান, বাজারে কেনাবেচা করেন, বিয়ে করেন এবং সামাজিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেন এবং কখনও এক মুহূর্তের জন্যও আলাহ্কে বিস্মৃত হন না।' তিনি সমস্ত সৃষ্টজীবকে 'স্রষ্টার দৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেখেন' এবং দান ও প্রীতিমূলক দয়ার এমন ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেন—যেখানে একজন মুসলমানের হৃদয়ে আনন্দ সৃষ্টির চাইতে আল্লাহকে পাওয়ার আর কোন উত্তম পন্থা তিনি জানতেন না। ধর্মীয় বিধানের সঙ্গে সাধকের সম্পর্ক বিষয়ে তিনি যা বলেন তার সঙ্গে হাল্লাজের তুলনা হতে পারে; কিন্তু মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি ও রীতির ক্ষেত্রে পার্থক্য অনেক ব্যাপক। হাল্লাজ যেখানে আগ্রহের সঙ্গে বিধান রক্ষা করতে গিয়ে এর আদেশসমূহের প্রতি আনুগত্য এবং তার সত্তার মধ্যে অনুভূত উচ্চতর শক্তির প্রতি আনুগত্যের মধ্যে সমাধানের অতীত সংঘাতের মুকাবিলা করেন, সেখানে আবু সাঈদ বিধানকে বন্ধনের এমন একটি অবস্থা হিসাবে মনে করেন যা পন্থা অনুসারীদের জন্য প্রয়োজনীয়, কিন্তু তা লক্ষ্যে পৌঁছার পর অপ্রয়োজনীয়। তাঁর মতে আল্লাহ্র সঙ্গে একাত্মতা কোন প্রাসঙ্গিক বা সাময়িক অভিজ্ঞতা নয় বরং ব্যক্তিসত্তা বিলোপের ও স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্য লাভের একটি স্থায়ী ফলশ্রুতি। কথিত আছে যে, তিনি তার শিষ্যদের কাবায় হজ্জ যাত্রা নিষিদ্ধ করেন, কারণ কাব্যকে তিনি নিন্দার সঙ্গে 'একটি প্রস্তর ভবন' হিসাবে উল্লেখ করেন। আরো কথিত আছে যে, কোন এক সময় মু'আজ্জিনের আযান শোনার পর তিনি এই বলে দরবেশদের আধ্যাত্মিক নৃত্য *(জজবা)* বন্ধ করতে অস্বীকার করেন, এটিই হচ্ছে আমাদের 'ইবাদতের রীতি'। আক্ষরিকভাবে সত্য না হলেও এসব কাহিনী আদর্শ স্থানীয়। ১০৪৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত কুশায়েরীর দীর্ঘ উপদেশাত্মক পত্রে প্রাচীনতর ধারার সূফীদের শ্রদ্ধা–ভক্তির সঙ্গে তার সময়কার অধ্যাত্মবাদীদের শ্রদ্ধা–ভক্তির পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমোক্তদের

---

১. *এন্টিনোমিয়েনিয়ম*, খৃষ্টান সম্প্রদায় বিশেষের এরূপ মতবাদ যাতে বলা হয় যে, আত্মার মুক্তির জন্য নৈতিক বিধানের প্রতি আনুগত্য নয়, বরং কেবল বিশ্বাসই প্রয়োজন। –অনুবাদক।

www.waytojannah.com

মতবাদ বিশৃস্ততার সঙ্গে *সুন্নাহ*[১] পালনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং শেষোক্তদের বিশৃংখলা ও কপটতা ছিল। ত্রিশ বছর পর *কাশফুল মাহজুব*-এর রচয়িতা ঘোষণা করেন যে, তার সমসাময়িক ব্যক্তিরা তাদের ইন্দ্রিয়াসক্তিকে 'বিধি' নাম প্রদান করেন এবং তাদের অর্থহীন কল্পনাকে 'স্বর্গীয় জ্ঞান' তাদের হৃদয়াবেগ ও জৈবিক আত্মার ভালবাসাকে 'স্বর্গীয় প্রেম', ধর্মদ্রোহিতাকে 'দারিদ্র', সন্দেহবাদকে 'পবিত্রতা' এবং প্রত্যক্ষ ধর্মের প্রতি অবিশ্বাসকে 'আত্মপরিহার' নামে অভিহিত করেন। একদিকে অগণিত অনুসারীসহ সাধকরা ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করেন। অপরদিকে নিজেদের মধ্যে দ্বিধা-বিভক্ত গোঁড়া মতাবলম্বীরা আন্তরিকভাবে *কুরআনকে* আঁকড়ে রেখে কিংবা বিধিগত ও অনুষ্ঠানগত খুঁটিনাটি নিয়ে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়ে বা ধর্মতাত্ত্বিক মতবাদকে বুদ্ধিবৃত্তির নিরস আলোকে বিশ্লেষণ করে, যে আভ্যন্তরীণ প্রাণ চেতনা ধর্মকে বাস্তবে পরিণত করে তার সঙ্গে দ্রুত সংস্রবহীন হতে থাকে। বহু আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান মুসলমানের মনে এই আত্ম জিজ্ঞাসা দেখা দেয় যে, এই অবস্থা কতোদিন চলতে থাকবে। মুসলমান সম্প্রদায়কে টুকরো টুকরো না করে 'বিশ্বাসের' যে গুরুত্বপূর্ণ দিক তা কি সংরক্ষণ করা যায় না? ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষের হস্তক্ষেপে এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় এবং তিনি হচ্ছেন মধ্য যুগীয় ইউরোপে আবু হামেট এবং আল গাযেল নামে পরিচিত আবু হামিদ গাযযালী (১০৫৮-১১১১ খৃ.)।

গাযযালীর সূফীবাদে দীক্ষা সম্পর্কে তাঁর স্বয়ং কথিত কাহিনী অপরূপ। সংক্ষেপে কাহিনীটি হচ্ছে যে, যৌবনে তিনি সন্দেহবাদী ছিলেন, কিন্তু একটি আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা তাঁর এই মানসিক পীড়া নিরাময় করে। তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি পূর্ণাঙ্গ সত্যের সন্ধানে নিয়োজিত করেন। দর্শনশাস্ত্র ও জ্ঞানগর্ভ ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, সেখানে কোন আলোর সন্ধান পাওয়া যাবে না। অকাট্য ধর্মীয় কর্তৃত্বের মতবাদ অনুসারী তালিমীদেরও পরীক্ষা করে তিনি দেখেছেন যে, এতেও কোন কাজ হবে না। এর পর তিনি হারিস আল-মুহাসিবী ও তৃতীয় হিজরী শতকের প্রাচীন সাধকদের রচনার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। এসব রচনা পড়তে পড়তে তার কাছে সত্য উদ্ভাসিত হয়। তিনি বলেন, 'আমি পরিষ্কারভাবে দেখতে পাই যে, তাদের (সূফীদের) কাছে যা অনন্য তা বই থেকে জানা যাবে না। কেবল আশু অভিজ্ঞতা, মোহাবিষ্ট অবস্থা এবং আভ্যন্তরীণ রূপান্তরের মাধ্যমেই তা লাভ করা যায়।' অপর কথায় আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের মাধ্যমেই তা পাওয়া যায়। তিনি আরো দেখতে পান যে, তাঁর নিজস্ব মুক্তি বিপন্ন। তাঁর বৈষয়িক সম্ভাবনা ছিল উজ্জ্বল। তাই তা পরিহার করতে গিয়ে তাকে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়।

---

১. মহানবীর নির্দেশিত ও অনুসৃত রীতি। -অনুবাদক।

www.waytojannah.com

Contents

এই সাধনায় তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে এবং অবশেষে তিনি 'আঘাতে জর্জরিত নিঃস্ব অবস্থার একজন মানুষ হিসাবে' আল্লাহ্র আশ্রয়ে গিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেন। তিনি কখনও ফিরে না আসার কঠোর সঙ্কল্প নিয়ে যখন বাগদাদ ত্যাগ করেন তখনো তার বয়স চল্লিশে পৌঁছেনি।

সত্য তখন অধ্যাত্মবাদীদের মধ্যে নিহিত ছিল। এই সত্য সম্পর্কে গায্যালীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই বিরাট ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের প্রেরণা যোগায়। এতোদিন পর্যন্ত যেসব মহল অধ্যাত্মবাদের প্রতি বিরূপ ছিল তাদের মধ্যে এই পুনরুজ্জীবন সূচিত করার ক্ষেত্রে তাঁর *লিহ্য়া* প্রভৃতি গ্রন্থের চাইতে তার দৃষ্টান্ত কোন অংশে কম অবদান রাখেনি। অতঃপর সূফীগণ সুনিশ্চিতভাবে ইসলামের আওতাধীন থাকে, কারণ গায্যালী ও তাঁর পরবর্তী অধিকাংশ মুসলমানের মতে সাধকদের মধ্যে যে সব সত্য প্রতিভাত হয় তা সর্বপ্রকার বাস্তব জ্ঞানের সূত্র ও ভিত্তি হিসাবে নবীদের ওপর প্রতিভাত সত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু একই সময়ে তিনি এ কথাও জোর দিয়ে বলেন যে, সাধকদের সাধনা, নবীদের কার্যকলাপ থেকে উদ্ভূত এবং তা সব সময় হযরত মুহাম্মদের সর্বময় কর্তৃত্বের মুখাপেক্ষী। তার বিধান অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। আত্মা সম্পর্কে গায্যালীর মতবাদ হচ্ছে, এটি এমন একটি সারবস্তু যেখানে আল্লাহ্ তাঁর নিজস্ব সত্তা ও বৈশিষ্ট্যসমূহকে প্রতিফলিত করে– এমন একটি আয়না যা 'স্বর্গীয় স্ফুলিঙ্গ' দ্বারা আলোকিত হয়। এই মতবাদ অত্যন্ত সাহসী অধ্যাত্ম্যবাদীকেও ধর্ম বিশ্বাস বিরোধী ধ্যান–ধারণার পথে পরিচালিত করার সম্ভাবনা থাকলেও তিনি নিজে তার থেকে দূরে ছিলেন। সম্ভবত ব্যক্তিগতভাবে তিনি যা চিন্তা করতেন তা বইতে তিনি যা শিক্ষা দিতেন তার সীমা ছাড়িয়ে যায়। অবশ্য দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি তাঁর '*মিশকাতুল আনওয়ার*' গ্রন্থে বলেছেন যে, আল্লাহ্ হচ্ছেন সূর্য এবং সূর্যের চারপাশে শুধু সূর্যের আলোই আছে।' কিন্তু ইসলামে সর্বেশ্বরবাদমূলক ভাষা ব্যবহারের অর্থ এই নয় যে, লেখকও একজন সর্বেশ্বরবাদী। গায্যালী (র) একাত্মতার মতবাদকে কোন কোন সময় চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেলেও তিনি এ কথা কখনও বিস্মৃত হন না যে, আল্লাহ্ই হচ্ছেন স্রষ্টা যাঁর একান্ত ইচ্ছায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। সূফীবাদের কাছে তার ঋণ ছিল যেমন বিরাট, তেমনি সে ঋণ তিনি পুরোপুরি পরিশোধও করেন। এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ সূফী মনে করেন এবং যুক্তিযুক্তভাবেই মনে করেন যে, তিনি যতোটা ইসলামের 'ক্যাথলিক চার্চের' (গোঁড়া মতাবলম্বী) সদস্য ততোটা তাদের একজন নন, এবং সেখানেই তার হৃদয়–নিঃসৃত শ্রদ্ধাভক্তি, নৈতিক প্রেরণা, ঐতিহ্যের প্রতি দৃঢ় আস্থা এবং তারা যতোই সন্দেহ করুক, তার সমালোচনামূলক ও বস্তুভিত্তিক দার্শনিক পদ্ধতি সুনিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি গোঁড়া মতবাদকে আধ্যাত্মিকতায় রূপান্তর করার ব্যাপারে অনেকখানি সাফল্য অর্জন করেন। কিন্তু অবস্থার স্বাভাবিকত্ব বিবেচনা করলে অধ্যাত্মবাদকে গোঁড়া মতবাদের রূপান্তরের ক্ষেত্রে তার প্রচেষ্টা একই পরিমাণে

www.waytojannah.com

সফল হওয়া অসম্ভব ছিল। তিনি রক্ষণশীল মতবাদের শক্তিশালী ও যথেষ্ট সহনশীল একটি দর্শককে তার মতবাদে আকৃষ্ট করেন। এরা আগত দিনের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ে একটি প্রতিরোধ শক্তি হিসাবে কাজ করে। কিন্তু অতঃপর এর পরিচালিকা শক্তি আসে অন্য একটি মহল থেকে, এবং যে ধ্যান–ধারণা এটিকে অপ্রতিরোধ্যভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নেয় এবং ভবিষ্যতে এর মধ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে তার সঙ্গে গায্যালীর ধ্যান–ধারণার মিল কদাচিৎ ছিল। নতুন মতবাদের বহু অনুসারী মহানবীর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি জ্ঞাপন করলেও এ সত্য লুকাতে পারেন না যে, তাদের আধ্যাত্মিক সূত্র মক্কা নয়, বরং এথেন্স ও আলেকজান্দ্রিয়া। গায্যালী (র)–এর সঙ্গে সঙ্গে সূফীবাদের একটি যুগের অবসান হয়। অধ্যাত্মবাদ এতোদিন *কুরআন* ও *হাদীসের* ভিত্তিতে বিধিসম্মত ইবাদতের বিপরীত আল্লাহ্ ও আত্মার সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্কের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারা এটিকে আংশিকভাবে *কুরআন* থেকে এবং আংশিকভাবে অ্যারিস্টটল ও নিওপ্ল্যাটোনিস্টদের[১] কাছ থেকে প্রাপ্ত উপাদানের সাহায্যে গঠিত একটি ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। ইসলামের বন্ধনশক্তি যে পরিমাণ দুর্বল হয় সে পরিমাণে বাইরের উপাদানগুলি প্রাধান্য লাভ করে, এবং খিলাফতের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এসব উপাদান পুরোপুরি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। এরই ফল একটি সর্বেশ্বরবাদী দর্শন, যা শত শত বছর পরেও মুসলিম বিশ্বের একটি বিরাট অংশের ওপর তার কর্তৃত্ব অব্যাহত রেখেছে এবং জালালুদ্দীন রুমী, হাফিজ ও পারস্যের অন্যান্য সূফী কবির ব্যাখ্যা অনুযায়ী এমন বহু লোককে মুগ্ধ করেছে যাদের কাছে এর মূল লেখক ইবনুল আরাবী (১১৬৫–১২৪০) অত্যন্ত দুর্বোধ্য বলে মনে হবে। তার প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়ার আগে আমরা এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারি। দ্বাদশ শতকে মুসলিম ধর্মীয় জীবনে একটি বিরাট সংগঠনের সূচনা হয়। এ সময় পাশাপাশি মধ্যযুগীয় খৃস্টান জগতের সন্ন্যাস ব্যবস্থারও সূত্রপাত হয়। ইতিপূর্বে বিখ্যাত অধ্যাত্মবাদীরা শিষ্যদের চারপাশে জড়ো করতেন। কোন কোন সময় তারা একটি আস্তানায় *(খানকাহ্)* একত্রে বসবাসও করতেন। কিন্তু এ ধরনের ব্যবস্থায় যুক্তিসিদ্ধ সম্বন্ধ না থাকায় ধীরে ধীরে তা বিলুপ্ত হয়। কোন একজন শায়খ (আধ্যাত্মিক তাপস)–এর প্রতি ব্যক্তিগত অনুরাগের দ্বারা অনুপ্রাণিত 'অনুসন্ধানীদের এসব মুক্ত সংগঠনের স্থলে অতঃপর স্থায়ী ভ্রাতৃত্বমূলক সম্প্রদায়ের *(তরীকাহ্)* উদ্ভব হয়। প্রতিটি সম্প্রদায় মহানবী (সা) থেকে শুরু করে এর প্রতিষ্ঠাতা পর্যন্ত আধ্যাত্মিক সাধকদের একটি ধারাবাহিক দীর্ঘ সূত্র উল্লেখ করেন। বিভিন্ন রীতির (তরীকাহ্) আনুষ্ঠানিকতাও বিভিন্ন রকমের এবং মতবাদ ও ধর্মীয় বিধানের প্রতি মনোভাবের ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এর সদস্যভুক্ত

১. নিওপ্ল্যাটোনিজম যীশুখৃষ্টের জন্মের তৃতীয় শতকে আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত একটি দর্শনতত্ত্ব। এতে প্ল্যাটো ও অন্য কয়েকজন গ্রীক দার্শনিকের মতবাদের সঙ্গে ইহুদী ও খৃস্টান নীতি শাস্ত্রের সাধারণ ধারণাসমূহ এবং নিকট প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদের সংমিশ্রণের চেষ্টা করা হয়। –অনুবাদক।

www.waytojannah.com

Contents

হওয়ার জন্য কৌমার্যের কোন শর্ত ছিল না। সমাজের সকল শ্রেণীর সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে দরিদ্র শ্রেণীর বহু লোক এর সদস্য হতো এবং তারা ভালো-মন্দ দুভাবেই সমাজে বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করতো। কোন কোন ইউরোপীয় সমালোচক এর মধ্যে কাল্পনিক সর্বেশ্বরবাদের সঙ্গে বাস্তব নীতিহীনতার সংমিশ্রণ দেখতে পেলেও প্রাচ্যের মানসিকতার ক্ষেত্রে তা সরাসরি প্রযোজ্য নয়। তাদের জীবনে সূফী সর্বেশ্বরবাদকে যেভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তার মধ্যে সাধারণত স্বর্গীয় সত্তা ও নৈতিক বাধ্যবাধকতার একটি মতবাদ নিহিত। অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে যে, ইসলামে প্রামাণ্যভাবে একটি স্বীকৃত মতবাদ না থাকায় অধ্যাত্মবাদীরা সেখানে স্বাধীনতা ভোগ করেন এবং সে অবস্থায় অনেকেই এই মতবাদের অপপ্রয়োগ করেন।

মুসলিম অধ্যাত্মবাদীদের (সূফী) মধ্যে সবচাইতে চিন্তাশীল প্রতিভার অধিকারী মুহীউদ্দিন ইবনুল আরাবী স্পেনের মুর্সিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৪০ খৃষ্টাব্দে দামেস্কে ইন্তিকাল করেন। তার বিপুল রচনাবলীর মধ্যে তাঁর সার্বজনীন দর্শন ব্যবস্থা গভীরভাবে প্রতিফলিত। এর মধ্যে অত্যন্ত বিখ্যাত গ্রন্থগুলি হচ্ছে *ফুতুহাতুল মাক্কিয়্যাহ* (মক্কার প্রত্যাদেশসমূহ) এবং *ফুসূসুল হিকাম* (জ্ঞানের কৌটাসমূহ)। এসব রচনার অধিকাংশই দুর্বোধ্য ও উদ্ভট। তবুও যারা এগুলি অধ্যয়ন করেন তাদের কেউই লেখকের বুদ্ধি ও কল্পনা শক্তিতে বিস্মিত না হয়ে পারেন না। আবার আবদুল করিম জিলির (মৃ. ১৪১০ খৃ.) ন্যায় কেউ কেউ তার রচনাকে তার চাইতেও সহজ ও সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। নিম্নোক্ত বিবরণে তার অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি থেকে কিছু কিছু তুলে ধরা হলো।

ইবনুল আরাবী আগাগোড়া একজন অদ্বৈতবাদী। তাঁর মতবাদকে যে নামে অভিহিত করা হয় *(ওয়াহদাতুল ওজুদ, অস্তিত্বের একত্ব)* তাতেই একথা যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর মতে আল্লাহ্‌র জ্ঞানের মধ্যে ধারণা হিসাবে সববিছুর অস্তিত্বই পূর্ব থেকে ছিল। সেখান থেকেই এগুলি নিঃসরিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত সেখানেই ফিরে যায়। কোন কিছুই *এক্সনাইহিলো* (অনস্তিত্ব) থেকে সৃষ্ট নয়। যার অভ্যন্তরীণ দিক আল্লাহ্ কেবল তারই বাহ্যিক দিক বিশ্ব। প্রত্যেক ব্যাপার বাস্তবতার এক একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করলেও 'মানুষ' হচ্ছে এমন একটি ক্ষুদে বিশ্ব যার মধ্যে সর্বপ্রকার আসমানী বৈশিষ্ট্যের মিলন ঘটেছে এবং কেবল 'মানুষের' মধ্যেই আল্লাহ্ 'নিজের' সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হন। নস্টিসিজম[১] নিওপ্ল্যাটোনিজম, খৃষ্ট ধর্ম এবং অন্যান্য সূত্র থেকে আহরিত উপাদানগুলির সংমিশ্রণে গ্রথিত এই মতবাদ ইবনুল 'আরাবী প্রবর্তিত ব্যবস্থার মূল বিষয়। এটি মূলত

১. আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদসমূহের এমন একটি ব্যবস্থা যাতে খৃষ্ট মতবাদের সঙ্গে গ্রীক ও প্রাচ্য দর্শনসমূহের সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। কয়েকটি প্রাথমিক খৃষ্টান সম্প্রদায় এটি প্রচার করেন, কিন্তু তাদের ধর্মদ্রোহী বলে বর্জন করা হয়।—অনুবাদক।

www.waytojannah.com

একটি লগোস[১] মতবাদ। আসমানী সত্তা বস্তুর মধ্যে মূর্ত হয়েছে এবং মানুষের সত্যিকার ধারণায় তা প্রকাশ করা হয়েছে যার প্রথম মূর্ত প্রতীক হযরত আদম (আ)। আল্লাহর মূর্ত প্রতীক এবং প্রকৃতির মূল আদর্শ হিসাবে পূর্ণাঙ্গ 'মানুষ' *(আল-ইনসানুল কামিল)* একই সময়ে আল্লাহর সুষমা ও মহাজাগতিক মূলনীতির মধ্যবর্তী সত্তা, যার দ্বারা বিশ্ব প্রাণবন্ত ও পরিপুষ্ট হয়। অবশ্য সর্বোৎকৃষ্ট পরিপূর্ণ মানুষ হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ (সা)। ইবনুল 'আরাবীরও বহু আগে ইসলামে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পূর্বে অস্তিত্বের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি আসমানী আলো (নূর মুহাম্মদ) হিসাবে আল্লাহ্ সর্বপ্রথম তার আত্মিক সত্তা সৃষ্টি করেন। সেটিই হযরত আদমের মধ্যে এবং তার পরবর্তীকালে নবী হিসাবে হযরত মুহাম্মদের চূড়ান্ত আবির্ভাব পর্যন্ত বিভিন্ন যুগে আবির্ভূত প্রত্যেক নবীর মধ্যে মূর্ত হয়। অবশ্য শিয়াদের মতে এটি পরবর্তীকালে হযরত মুহাম্মদ (সা) থেকে হযরত আলী (রা) ও তাঁর বংশভুক্ত ইমামদের মধ্যে মূর্ত হয়। অপরদিকে সূফীরা বিশ্বাস করেন যে, এটি অতঃপর আধ্যাত্মিক সাধকদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। ইবনে আরাবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তাঁর সত্যিকার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী *হাকিকাতুল হাকিক* হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ওরিজেন[২] লগোসের বিবরণ দিতে গিয়ে একই ধরনের উক্তি করেছেন। এ হিসাবে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা) বিশ্বসৃষ্টির মাধ্যমে *(আল হাককুল মাখলুকু বিহি)* পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রতিনিধি (খলীফা) এবং যার ওপর এর অস্তিত্ব নির্ভরশীল ও যার দরুন এটিকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই মূল দণ্ড *(কুত্‌ব)*। তিনি সব আসমানী প্রত্যাদেশের অতুলনীয় সূত্র ও প্রবাহ পথ; কারণ হযরত আদম (আ) যখন মাটির অবয়ব তখন তিনি ছিলেন নবী। এটি সেন্ট পলের এবং যীশুখৃষ্ট সংক্রান্ত চতুর্থ সুসমাচারের (ফোর্থ গসপেল) রচয়িতার মতবাদের প্রতিধ্বনির মত শোনায় এবং হয়তো কিছুটা তাই। যে কোনভাবেই হোক, ইবনুল 'আরাবী খৃষ্ট ধর্মের প্রতি অদ্ভুত ধরনের সহানুভূতি প্রদর্শন করেন এবং *কালিমা* শব্দ যীশুখৃষ্ট এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) উভয়ের জন্য প্রয়োগ করেন। অবশ্য একান্তভাবে তাদের প্রতি প্রয়োগ করেননি। সম্পূর্ণরূপে একত্বমূলক অধ্যাত্মবাদ প্রায় অপরিহার্যভাবে সর্বেশ্বরবাদের দিকে কিংবা সাধক ভজনের দিকে, কিংবা ইসলামে যেমনটি দেখা যায়[৩] তেমনি উভয়ের একটি সম্মিলিত মতবাদের দিকে আকৃষ্ট করে। রসূল কিংবা সাধক নিছক আসমানী বৈশিষ্ট্য ছাড়াও কেবল ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার পাত্র হিসাবে থাকেন, যার মধ্যে এবং মধ্য দিয়ে আল্লাহ নিজেকে পরিচিত করেন। আল্লাহর একত্বকে ক্ষুণ্ন না করে গভীর ধর্মীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা

---

১. খৃষ্টান ধর্মতত্ত্বে আল্লাহর বাণী; ত্রিত্বের (ট্রিনিটি, পিতা, পুত্র ও পরমাত্মা) দ্বিতীয় সত্তা যীশুখৃষ্ট। গ্রীক দর্শনে সেই যুক্তি যাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ামক নীতির ভিত্তি হিসাবে মনে করা এবং যা কথার দ্বারা সুস্পষ্ট। -অনুবাদক।

২, খৃষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদ, গুরু ও লেখক; আলেকজান্দ্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন (জীবিতকাল আনু, ১৮৫-২৫৪ খৃ.) -অনুবাদক।

৩. অভিমতটি একান্তভাবে লেখকের- অনুবাদক।

www.waytojannah.com

চরিতার্থ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে ইসলামী লগোস মতবাদের উদ্ভব হয়েছে বলে মনে হয়। খৃস্টানরা আল্লাহর মধ্যে যেখানে বিভিন্ন সত্তার পার্থক্য সৃষ্টি করেন সেখানে এটি বিভিন্ন দিকের পার্থক্য সৃষ্টি করে। *বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের দিক দিয়ে* পূর্ণাঙ্গ মানুষ তথা ইনসানে কামিল আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করেন। তাই মহানবী (সা)-এর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি কোন কোন ক্ষেত্রে এমন ভাষায় প্রকাশ করা হয় যা স্বয়ং তিনিই শিরক মনে করতেন। যেমন 'আমাদের প্রভু মুহাম্মদের নূরের (আলো) জন্য না হলে পৃথিবীতে কোন রহস্যই উদ্‌ঘাটিত হতো না, কোন ঝর্ণাই বেগবান হতো না, কোন নদীই প্রবাহিত হতো না।' সূফীরা তাঁকে 'আল্লাহর প্রেমাস্পদ' বলেন, এবং তিনি তাদের মধ্যে প্রতিটি আসমানী দানের বিতরণকারী যারা তাঁকে ভালবাসেন এবং তাঁর সত্তার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে বেঁচে থাকেন।

অবশ্য ইবনুল 'আরাবীর মতে যে বহু আকারের মধ্যে আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ করেন মহানবী (সা) ও সাধকদের জনপ্রিয় ভজন তারই অন্যতম। তিনি বলেন, সত্যিকারের সূফী তাঁকে (আল্লাহ্‌কে) সব ধর্মের মধ্যেই খুঁজে পাবেন।

আমার হৃদয় যে কোন আকার ধারণে সক্ষম ঃ
সন্ন্যাসীর জন্য মঠ, প্রতিমার জন্য মন্দির,
দ্রুতগামী হরিণের চারণভূমি, ভক্তের জন্য কাবা,
তওরাতের টেবিল আর কুরআনের রিহল,
প্রেমই আমার বিশ্বাস, তাঁর উটগুলি
যে দিকেই যাক, একমাত্র সত্যিকারের বিশ্বাস আমার।

অধ্যাত্মবাদের আল্লাহর তুলনায় ধর্মের আল্লাহ সীমাবদ্ধ, তাই কারো নিজস্ব ধর্মমতের প্রশংসার কিংবা অন্যের ধর্ম মতের নিন্দার মধ্য দিয়ে অজ্ঞতা ও অন্যায় প্রদর্শন করা হয়। এমন কি কাফের এবং মূর্তিপূজকরাও তাঁর নিজস্ব প্রতিমূর্তিতে আল্লাহ্‌র দ্বারা সৃষ্ট। তাঁর বান্দাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের দাবি বড়ো' হওয়া সত্ত্বেও আইন তাদের মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করে। আত্মা স্বর্গীয় সত্তার একটি রীতি-প্রকৃতি, এই সত্যের আলোকে ইবনুল আরাবী এরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, মানুষের কাজসমূহ আত্মসংকল্প প্রসূত। কিন্তু তার ব্যবস্থায় সাধারণ অর্থে স্বাধীন চিন্তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌ নিজেই তার বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজনে সক্রিয় হন। আর সেজন্য এও প্রয়োজনীয় যে, তার বিভিন্ন রকমের সীমাহীন বৈশিষ্ট্য যে সব বস্তুর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় সেগুলির মধ্যেও সীমাহীন প্রতিক্রিয় সৃষ্টি করবে। এর সঙ্গে আলো ও অন্ধকার, ভালো ও মন্দ এবং যে সব বিপরীত জিনিসের ওপর জ্ঞানের সম্ভাবনা নির্ভরশীল তার সব কিছু সংশ্লিষ্ট। যেহেতু মন্দ হিসাবে মন্দের অস্তিত্ব নেই, সে জন্য নরক একটি সাময়িক অবস্থা মাত্র। তাই প্রত্যেক পাপীই শেষ পর্যন্ত রক্ষা পাবে।

www.waytojannah.com

ইবনুল 'আরাবীর মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা আমাদের স্পিনোযার[১] কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু এরূপ অভিমত প্রকাশ করা বিপজ্জনক হবে যে, স্পেনীয় ইহুদী স্পেনীয় মুসলমানের চিন্তা–ধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কারণ তার গূঢ় কার্যকলাপ প্রায়ই এ সত্যকে প্রচ্ছন্ন রাখে যে, তিনিও একজন গভীর এবং মৌলিক চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু ইবনুল আরাবী কোন কোন মধ্যযুগীয় খৃষ্টান চিন্তাবিদকে অবশ্যই প্রভাবিত করেছেন। প্রফেসর আসিন পালাসিওস সম্প্রতি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি দোযখ, বেহেশ্‌ত ও স্বর্গীয় অন্তর্দৃষ্টির যে সব বর্ণনা দিয়েছেন তার বহু অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য দান্তের রচনায় এতো ঘনিষ্ঠভাবে প্রতিফলিত হয়েছে যে, তাকে কিছুতেই আকস্মিক বা ঘটনাক্রমিক বলা যায় না। 'নারকীয় অঞ্চলসমূহ জ্যোতিঃশাস্ত্রের আকাশসমূহ আধ্যাত্মিক গোলাপের বৃত্তগুলি, স্বর্গীয় আলোকবর্তিকার চারদিকে ফেরেশতাদের নির্ধারিত স্থানগুলি, এয়ীসত্তার *(ট্রিনিটি)* প্রতীক তিনটি বৃত্ত–দান্তে ঠিক ইবনুল 'আরাবীর ন্যায় একইভাবে বর্ণনা করেছেন।' দান্তে আমাদের বলেন, কিভাবে তিনি বেহেশতে ক্রমেই যত উপরে উঠছিলেন ততোই বিয়েট্রিসকে[২] সুন্দর থেকে সুন্দরতর দেখে তার প্রেম প্রগাঢ়তর এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টি গভীরতর হয়। প্রায় একশ বছর আগে লিখিত ইবনুল 'আরাবীর একটি কবিতায় একই ধারণা দেখতে পাওয়া যায় *(তারজুমানুল আশওয়াক, নং ৫৫)*

> তাঁর (প্রেমাস্পদ) সঙ্গে মিলনে আমার মধ্যে এমন কিছুর সৃষ্টি হয় যা আমি কখনো কল্পনা করিনি......
>
> কারণ আমি এমন এক আকার দেখি যার সৌন্দর্য, যতোই আমরা মিলিত হই ততই দীপ্তিমান ও মহিমামণ্ডিত হয়ে ওঠে,
>
> ফলে সেই প্রেম থেকে কোন অব্যাহতি নেই যা পূর্ব নির্ধারিত পরিমাণে তার প্রতিটি লাবন্য বৃদ্ধির অনুপাতে বৃদ্ধি পায়।

আরো উল্লেখযোগ্য যে, ইবনুল 'আরাবীরও একজন 'বিয়েট্রিস' ছিলেন, এবং তিনি ছিলেন মাকিনুদ্দিনের পরমাসুন্দরী ও রুচিশীল কন্যা নিযাম। তিনি তার সম্মানে আধ্যাত্মিক গীতি কবিতা রচনা করায় কেলেঙ্কারির সৃষ্টি হয়। তাই সমালোচকদের ভুল নিরসনের জন্য তিনি এসব কবিতার একটি ভাষ্য রচনা করেন। একইভাবে 'দান্তে তাঁর *কনভিটোতে* চৌদ্দটি প্রেম সঙ্গীতের গূঢ় অর্থ বিশ্লেষণ করার ইচ্ছা ঘোষণা করেন। কারণ প্রথম দিকে রচিত এসব গানের বিষয়বস্তু এরূপ ভুল ধারণার সৃষ্টি করে যে, এগুলিতে আধ্যাত্মিক প্রেমের চাইতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রেমই বর্ণিত হয়েছে।' সংক্ষেপে বলতে গেলে সাধারণ ক্ষেত্রে ও বিশেষ ক্ষেত্রে এতটা সাদৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে যে, তার কেবল একটি উপসংহারই

---

১. ওলন্দাজ দার্শনিক (১৬৩২–১৬৭৭); তার মতে আল্লাহই একমাত্র সারবস্তু যার দুটি দিক রয়েছে, চিন্তা ও সম্প্রসারণ। –অনুবাদক।

২. পুরো নাম বিয়েট্রিস পোর্টিনারী; ফ্লোরেন্সের জনৈক সুন্দরী, দান্তের প্রেমিকা যিনি তাঁর ডিভাইন কমেডিতে অমরত্ব লাভ করেছেন।– অনুবাদক।

www.waytojannah.com

সম্ভবপর। মুসলমানদের ধর্মীয় কাহিনী *মিরাজ* বা মহানবীর স্বর্গারোহণের সঙ্গে মুসলিম ঐতিহ্যবাদীদের এবং ফারাবী, ইবনে সিনা, গাযযালী ও ইবনুল 'আরাবীর ন্যায় লেখকের জনপ্রিয় ও দার্শনিক ধ্যান–ধারণা এমন একটি সাধারণ সাহিত্য সংস্কৃতির ভাণ্ডার সৃষ্টি করেছে, যার সঙ্গে ত্রয়োদশ শতকে ইউরোপের শ্রেষ্ঠমনা ব্যক্তিরা পরিচিত হন। আরবরা যেভাবে পারস্য ও সিরিয়ার গ্রীক সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হন ততোটা গভীরভাবে না হলেও স্পেন ও সিসিলির আরব বিজয়ীরা সেখানে একইভাবে প্রভাব সৃষ্টি করেন। উভয় ক্ষেত্রেই প্রভাব সৃষ্টির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া প্রায়ই দুঃসাধ্য। কারণ সুদীর্ঘকাল যাবত দুটি জাতি পরস্পর দৈনন্দিন মেলামেশার মধ্যে বসবাস করলেও তাদের মধ্যে জ্ঞানের যে যোগাযোগ অব্যাহত থাকে তার বিস্তারিত বিষয় লিখিতভাবে সংরক্ষণ করা যায় না।

এবারে সেই প্রাচ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক যেখানে ইতিমধ্যেই পারস্যে অধ্যাত্মবাদের স্বর্ণ যুগ শুরু হয়। 'রাত্রিকে দিনের ন্যায়' এটিও এমন এক যুগের অনুসরণ করে যে যুগের হত্যালীলা ও ধ্বংসযজ্ঞ অবর্ণনীয়। এ সময় মঙ্গোলরা এশিয়ায় বর্বতার স্বাক্ষর হিসাবে রেখে যায় কেবল বিভীষিকা, সীমাহীন দুর্দশা ও বিশৃংখলা। ব্যক্তি বিশেষের ন্যায় গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী দুর্দশাগ্রস্ত জাতিগুলিও চায় নিরাময়ের উপায়। স্বভাবতই নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে ক্লান্ত পারস্য স্বস্তির সন্ধানে তাদের শরণাপন্ন হয় যারা তাকে একদিকে এমন সব আদর্শ জিনিস প্রদান করে যা পৃথিবী থেকে উধাও হয়েছিল বলে মনে হয়—শান্তি–শৃংখলা, নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার, পরোপকার, প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামাজিক সদগুণাবলী যা যে কোন সংগঠিত জাতীয় জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। অপর দিকে তারা পারস্যকে চিরস্থায়ী শান্তি ও আনন্দের একটি অধ্যাত্মবাদীর অন্তর্দৃষ্টিও দান করে। এই অন্তর্দৃষ্টি ঐসব পবিত্র ব্যক্তি লাভ করেন যারা নিজেদের মধ্যে একমাত্র বাস্তব ও চিরস্থায়ী আধ্যাত্মিক জগতের সন্ধান করেন। সূফী কবিরা এই চিত্র তুলে ধরার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তারা যেভাবে এই দায়িত্ব সম্পাদন করেন তাতে পারস্যের আধ্যাত্মিক কাব্য এমন সব দেশেও খ্যাতি লাভ করে যেখানে খুব কম লোকই পারস্য ভাষা পড়তে পারে।

এই চিত্রের জ্ঞানদীপ্ত পটভূমি রচনা করেন ইবনুল 'আরাবী। আমরা দেখতে পাবো যে, তার প্রভাবে সূফীবাদ ততোটা হৃদয় ও বিবেকের ব্যাপার না হয়ে এমন একটি কল্পনামূলক দর্শনে রূপায়িত হচ্ছে যার সঙ্গে প্রাথমিক অধ্যাত্মবাদীদের অনুপ্রেরণা সৃষ্টিকারী নৈতিক ও ধর্মীয় অনুভূতির সম্পর্ক নেই। অতঃপর তিনি আর আদর্শ সাধক নন, যিনি প্রার্থনা ও আশা–আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে আল্লাহর অনুসন্ধান করতেন এবং অত্যন্ত কষ্টসাধ্য সাধনার পর একমাত্র স্রষ্টার ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভর করে তার দুর্বোধ্য অনুগ্রহে নিজস্ব রূপান্তরের মধ্যে তাঁকে (আল্লাহকে) খুঁজে পেতেন। তিনি বরং পুরোপুরি দিব্যজ্ঞান ও

www.waytojannah.com

Contents

রহস্যজ্ঞানের অধিকারী যার কাছে কোন রহস্যই গোপন থাকে না। তিনি পরিপূর্ণ মানুষ যিনি নিজেকে আল্লাহ বা লোগোসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করেন।

আমি সেই দিন ছিলাম যখন কোন নাম ছিল না,
কিংবা নামের সঙ্গে প্রদত্ত অস্তিত্বের কোন চিহ্ন ছিল না।
আমার দ্বারাই নামগুলি ও নামের অধিকারীরা দৃশ্যমান হয়
সেই দিন যখন 'আমি' এবং 'আমরা' ছিলাম না।

এই কবিতার বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনা করার আগে এর অন্তর্নিহিত দার্শনিক মতবাদ সংক্ষেপে তুলে ধরা উচিত।

অবিনশ্বর কেবল আল্লাহ্ মহান সত্তা। তাঁর সিফাতসমূহ তাঁর মহান জাত থেকে পৃথক করে চিন্তা করা হয়, কিন্তু বাস্তবে সেগুলি তাঁরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্র বৈশিষ্ট্যগুলির যে সমষ্টিকে আমরা বিশ্ব জগত বলি তা চির পরিবর্তনশীল রঙের জগৎ, এ সবই তাঁর কুদরত। আল্লাহ্ ছাড়া কোন অস্তিত্ব নেই। আল্লাহর ইচ্ছাতেই তাদের উদ্ভাসিত করে সেখান থেকেই তারা একটি সাপেক্ষ অস্তিত্ব লাভ করে। উপরে বিভিন্ন জিনিসের পরিকল্পনার মধ্যে মানুষের স্থান এবং দায়িত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তার (মানুষের) মধ্যে আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক জগত মিলিত হয় এবং সে বিশ্বজগতের কেন্দ্রে অবস্থান করে যার সে আত্মা। কিন্তু তার দৃশ্যমান দিকে সে 'অনস্তিত্বের অন্ধকারে অন্ধকারাচ্ছন্ন'। তার দৈহিক স্নেহ-মমতা তাকে বন্দী করে রাখে। তাই সে মনে করে যে, সে আল্লাহ থেকে পৃথক। অনুভব ও যুক্তির দ্বারা সমর্থিত হলেও এই বিভ্রম সূফী দর্শনের প্রথম মূলনীতিকে অস্বীকার করে। সূফী মূলনীতি শিক্ষা দেয় যে, সর্বপ্রকার অস্তিত্ব এবং সর্ব প্রকার ক্রিয়া আল্লাহর কুদরতেরই প্রকাশ। এর দ্বারা কি বোঝায় তা কেবল এ সম্পর্কে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সূফীরাই উপলব্ধি করতে পারেন। অবশ্য প্রতীকের মাধ্যম ছাড়া তারা অন্যকে তা বোঝাতে পারেন না। যে প্রেমমূলক কবিতার মধ্যে এর ছায়া প্রতিফলিত হয় তাতে জ্ঞানের মধ্য দিয়ে যা বোঝা যায় না তার ইঙ্গিত কল্পনায় পাওয়া যায়। তাছাড়া প্রেমের আবেগ এমন এক মহাবিষ্ট অবস্থার সৃষ্টি করে যাকে সূফীরা সব সময় দিব্যজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। প্রাথমিক যুগে একটি সম্মোহিত অবস্থা সৃষ্টির জন্য *কুরআন* তিলাওয়াতকে নিয়মিত কাজে লাগানো হতো, এবং অচিরেই একই উদ্দেশ্যে প্রেমাত্মক কবিতার (প্রথম এতে কোন প্রকার আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য ছিল না) ব্যবহার শুরু হয়। উদ্দীপনা ও মোহাবিষ্ট অবস্থা সৃষ্টির জন্য সুললিত উচ্চারণ সহযোগে কিংবা সঙ্গীত ছাড়া এ ধরনের বহু প্রেমময় কবিতা সুর করে আবৃত্তি করা হতো। কোন কোন ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যে এগুলি রচনা করা হতো। অতিন্দ্রীয় সত্য তুলে ধরাই লেখকদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। নিজেদের শিল্প সুষমায় এমন একটি সুন্দর স্বপ্নময় জগত সৃষ্টি করাও তাদের লক্ষ্য ছিল, যে জগত অসীম ও অনির্বচনীয় সন্ধান দিতে, আত্মাকে জান্নাতী আবেদনে আপ্লুত করতে এবং এটিকে গভীরতম রূহানী

www.waytojannah.com

অভিজ্ঞতার জন্য প্রস্তুত করতে সক্ষম। নিম্নের দৃষ্টান্তগুলির প্রথমটি ইবনুল ফরিদের আরবী দিওয়ান (পূর্ববর্তী পৃ. ২৩২ দ্রষ্টব্য) থেকে উদ্ধৃত এবং দ্বিতীয়টি জালালুদ্দিন রুমীর পারস্য ভাষায় রচিত একটি কবিতার অংশ বিশেষ।

প্রিয়তমের সঙ্গে আমি ছিলাম একা
যখন সন্ধ্যা সমীরণের চাইতেও মৃদু গোপন রহস্য
বয়ে যায়, এবং পবিত্র অন্তর্দৃষ্টি
মঞ্জুর করা হয় আমার প্রার্থনা ক্রমে,
তা, অন্যথায় অস্পষ্ট, আমাকে সীমাহীন খ্যাতিতে অভিষিক্ত করে,
ঐ সময় বিস্ময়াবিষ্ট অবস্থায়
তাঁর সৌন্দর্য ও তাঁর রাজসিকতার মধ্যে
আমি নীরব উল্লাসিতায় দাঁড়িয়ে থাকি,
প্রতিভাত হয় তা যা আমার সত্তার মধ্যে যায় আসে।
ওই দেখো, তাঁর মুখমণ্ডলে মিশ্রিত হয়েছে
প্রতিটি মোহনীয়তা ও দীপ্তি;
সৌন্দর্যের সবখানি একত্ব লাভ করেছে
একটি পরিপূর্ণ মুখাবয়বে,
তাকে দেখে চিৎকার করবে,
'তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই এবং তিনিই সবচাইতে মহান!'

প্রেম নিকেতন

যে গৃহে ক্রমাগত বীণার ধ্বনি শোনা যায়,
তার মালিক সম্পর্কে, সেই গৃহ সম্পর্কে প্রশ্ন করছো?
এটি যদি কা'বা হয়, এই প্রতিমা–আকারের অর্থ কি?
আর যদি মেজিয়ান[১] মন্দির হয়, আল্লাহর এই নূরের অর্থ কি?
এই গৃহে যে ধন–সম্পদ তা ধারণ করার জন্য বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অথিত ক্ষুদ্র;
এই 'গৃহ' এই 'মালিক' সবই অভিনয় আর ছল।
গৃহটিকে ছুঁয়ো না, কারণ এই গৃহ একটি তিলিসমাত্;
মালিকের সঙ্গে কথা বলো না, কারণ তিনি পূর্ব রাত্রে নেশাগ্রস্ত।
এ গৃহের ধূলিকণা আর আবর্জনা কস্তুরী ও সুগন্ধী,
এ গৃহের ছাদ ও দরজা শুধু কবিতা আর সুর।
এক কথায়, যে–ই এ গৃহে প্রবেশ করেছে
সে–ই বিশ্বের সুলতান এবং কালের সুলায়মান।
হে মালিক, এ ছাদ থেকে একবার তোমার মাথা নামাও,

১. মেজাই নামে পরিচিত এবং জাদুকরি শক্তির অধিকারী বলে কথিত প্রাচীন মিডিয়া ও পারস্যের একটি পুরোহিত সম্প্রদায়ের মতাবলম্বী। –অনুবাদক।

www.waytojannah.com

কারণ তোমার সুদর্শন মুখাবয়ব সৌভাগ্যের প্রতীক।
আত্মা আয়নার ন্যায় তার হৃদয়ে তোমার অবয়ব গ্রহণ করেছে;
তার হৃদয়ে তোমার কুঞ্চিত কুন্তলের অগ্রভাগ মধুচক্রের ন্যায় নিমজ্জিত।
এই হচ্ছেন বেহেশ্‌তের প্রভু, যিনি শুক্র গ্রহ ও চাঁদের ন্যায়;
এই হচ্ছে প্রেম নিকেতন, যার সীমা বা শেষ নেই।

এসব কাসীদায় স্থান ও সময়ের উর্ধে বিচরণ করে যে আনন্দ বিহবল অবস্থায় সব কিছু দেখা যায় তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করলেও রোমান্টিক প্রেমের আর এক ধরনের পারস্য কাব্য রয়েছে যা আল্লাহ্‌র অনুসন্ধানে আত্মার ব্যথাতুর আকাঙ্ক্ষাকে বিশেষভাবে মূর্ত করেছে। এই কাব্যধারাকে পূর্ণতা দান করেছেন নিযামী (মৃ. ১২০৩ খৃ) তাই আমরা লায়লার প্রতি মজনুনের ও ইউসুফের প্রতি যুলায়খার প্রেমের ন্যায় বহু কাহিনীর আধ্যাত্মিক সংস্করণ দেখতে পাই। তৃতীয় ও অত্যন্ত বৃহৎ আর এক শ্রেণীর কাব্য রয়েছে যার প্রধান বা সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নীতিমূলক উপদেশ। এগুলির প্রাচীনতম রূপ অনেকটা ধর্মোপদেশমূলক পদ্য। এগুলিতে গয্‌নীর সানাই রচিত *হাদীকাতুল হাকীকা*–র (সত্যের বাগিচা) ন্যায় ছোট ছোট উপদেশমূলক গল্প কাহিনী, কিংবা সূফীদের একত্বে উন্নীত হবার রূপক বর্ণনা স্থান পেয়েছে। উভয় শ্রেণীর কাব্যই তাদের উচ্চতম পর্যায়ে দ্রুত বিকাশ লাভ করে ঃ প্রথমোক্তটি জালালুদ্দীন রুমীর *মসনবী*–তে এবং দ্বিতীয়টি ফরীদুদ্দীন আত্তারের *মানতিকুত্ তায়র*–এ। আত্তারের কাব্যের শিরোনামের অনুবাদ 'পাখির কথা' দেওয়া যেতে পারে। এই কাহিনীতে পাখিরা হুপু পাখির নেতৃত্বে তাদের রহস্যময় রাজা সিমুর্গের খোঁজে বের হয়। 'অনুসন্ধান' 'প্রেম', 'জ্ঞান', 'বিচ্ছেদ', 'মিলন', 'হতবুদ্ধিভাব' ও 'আত্মশূন্যতার' সাতটি উপত্যকা পার হওয়ার পর তাদের মধ্যে যে ত্রিশটি পাখি বেঁচে ছিল তাদের তাঁর উপস্থিতিতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। সেখানে তারা উপলব্ধি করে যে, 'তারা নিজেরাই সীমুর্গ, আর সীমুর্গ হচ্ছে সেই ত্রিশটি পাখি *(সী মুর্গ)*।'

তারা এই গভীর রহস্য উদঘাটনের মিনতি জানায় এবং 'আমরা–ত্ব' ও 'তুমি–ত্বের' সমাধান চায়।
সেই 'উপস্থিতি' থেকে কোন কথা ছাড়া এই মর্মে জবাব আসে, "এই সূর্যের ন্যায় 'উপস্থিতি' একটি আয়না,
যে–ই সেখানে প্রবেশ করে সে–ই নিজেকে সেখানে দেখতে পায়; দেহ ও আত্মা সেখানে একই দেহ ও আত্মা দেখতে পায়।"

কেউ হয়তো একটি অনুচ্ছেদ থেকে কবির অর্থ খুঁজে পেতে পারেন যা সে জন্যই চমকপ্রদ। কিন্তু এ ধরনের অনুচ্ছেদে যীশুখৃষ্টের ব্যক্তিত্বের মধ্যে স্বর্গীয় আত্মপ্রকাশকে সীমাবদ্ধ করায় জিলি খৃষ্টানদের দোষারোপ করেছেন।আল্লাহ্ বলেছেন, "আমি আমার সত্তা আদমের মধ্যে সঞ্চারিত করেছি।" এখানে 'আদম' নাম দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষ বোঝায়। যারা মানুষের মধ্যে আল্লাহকে দেখতে পান তাদের কল্পনা বিশ্বে সবচাইতে পূর্ণাঙ্গ। খৃষ্টানরা অনেকটা এই অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী। যীশুখৃষ্ট সম্পর্কে তাদের মতবাদ শেষ

www.waytojannah.com

পর্যন্ত যখন 'জিনিসটি বাস্তবে যা তাই হিসাবে আবিষ্কৃত হবে', তখন এরূপ জ্ঞানে পর্যবসিত হবে যে, মানবজাতি পরস্পর মুখোমুখি আয়নার ন্যায়। এর প্রত্যেকটিতে অন্য সবগুলিতে যা আছে তাই রয়েছে। সুতরাং তারা নিজেদের মধ্যে আল্লাহকে দেখবে এবং ঘোষণা করবে যে, তিনি সম্পূর্ণরূপে 'এক'।

পরম আনন্দঘন মোহাবিষ্ট অবস্থা কোন আইন জানে না, তাই 'আলাহর মানুষ অবিশ্বাস ও ধর্মের উর্ধে।' কিন্তু নিম্নতর পর্যায়ের সূফী ছাড়া কেউ এ কথাটিকে অধার্মিক ও নীতিহীন আচরণের অনুমোদন হিসাবে স্বীকার করে না। সত্যিকারের সাধক বাধ্যবাধকতা থেকে নয়, বরং ফানাফিল্লাহ্‌র অনুভূতি থেকে বিধি মেনে চলেন। আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গ পরিমণ্ডলকে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় দিক দিয়েই উপলব্ধি করতে হবে– 'এক' এবং 'বহু', 'সত্য' এবং 'বিধি'। স্রষ্টা আল্লাহ্‌র অনন্ত জীবন তাঁর কাজের মধ্যে যতোটা প্রতিভাত হয়েছে তাতে প্রবেশ না করে যা কিছু সৃষ্টজীবমূলক তার থেকে দূরে সরে যাওয়া যথেষ্ট নয়। আত্ম থেকে অতিক্রান্ত হওয়ার পর *(ফানা)* বাকাবিল্লাহ–য় উত্তরণ পূর্ণাঙ্গ মানুষের লক্ষণ। তিনি শুধু আলাহ্‌র *দিকে*, অর্থাৎ বহু থেকে একত্বে যান না, তিনি আলাহ্‌র *মধ্যে* এবং *সঙ্গে* অর্থাৎ একত্ব অবস্থাতেও অব্যাহত থাকেন। তিনি যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত থেকে যাত্রা শুরু করেন সেই জগতে আলাহ্‌র সঙ্গে ফিরে আসেন। তিনি বহুর মধ্যে একত্ব প্রতিভাত করেন। এই অবতরণে

> তিনি বিধিকে করেন বাহ্যিক পোশাক
> এবং আধ্যাত্মিক পথকে করেন আভ্যন্তরীণ পোশাক,

কারণ ধর্মীয় বিধির যাবতীয় কর্তব্য পালন করতে গিয়ে তিনি মানবজাতির জন্য সত্য নিয়ে আসেন এবং প্রদর্শন করেন। যেসব (সাহাবা) মুসলিম সাধকের মধ্যে অনেকে আত্মার পরিচালকও ছিলেন তাঁরা মতবাদ ছাড়াও, যারা এখনো প্রাথমিক দক্ষতা অর্জন করেননি তাদের উচ্চতর জ্ঞান প্রদানের ব্যাপারটি সাধারণত উত্তমভাবে উপলব্ধি করেন। তাঁরা সেন্টপলের ন্যায় 'একদল' লোকের জন্য প্রয়োজনীয় দুধ এবং অন্যদের জন্য অনুমোদিত ভালো মাংসের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেন। এই 'দ্বিবিধ সত্যের' মতবাদের ভিত্তিতে তারা আল্লাহ সম্পর্কে 'কুরআনের ধারণার' সঙ্গে সর্বেশ্বরবাদী দর্শনের সমন্বয় সাধনে সক্ষম হন এবং এমন একটি মহান নৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলেন যার চূড়ান্ত ভিত্তি হচ্ছে, মন্দই অবাস্তব।

মওলানা জালালুদ্দীন রুমীর *মসনবী–ই–মা'নবীতে* বা 'আধ্যাত্মিক শ্লোকে' পারস্য সূফীবাদের *ভেল্টানশাউউং*[১] অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। মওলবী (মেভলেভী) দরবেশ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এই মহান সাধক ১২৭৩ খৃষ্টাব্দে কেনিয়ায় (আইকোনিয়াম) ইন্তিকাল করেন। *মসনবী* 'পারস্যের *কুরআন*' বলে অভিহিত করা হয়। বস্তুত এর রচয়িতা

---

১. জার্মান শব্দ যার অর্থ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও জীবন সম্পর্কে ব্যক্তি বিশেষের দর্শন বা ধারণা।– অনুবাদক।

www.waytojannah.com

নবীদের কাছে প্রেরিত ওহীর (প্রত্যাদেশ) গভীর তাৎপর্য বিশ্লেষণের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। কিন্তু যে কেউ তাঁর রচনার প্রতি এলোপাতাড়িভাবে নজর দিলে দেখতে পাবেন যে, এর উপদেশমূলক মতবাদ নীতিমূলক গল্প, ক্ষুদ্র উপাখ্যান, উপকথা, রূপকথা এবং প্রচলিত কাহিনী দ্বারা সুশোভিত এবং তা মধ্যযুগীয় ধর্মীয় জীবন ও চিন্তাধারার সামগ্রিক পরিসরে পরিব্যাপ্ত। অথচ তাঁর গীতি কবিতাগুলি এমন একজন অধ্যাত্মবাদীর দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত যার দৃষ্টিতে আল্লাহ ছাড়া আর কিছু প্রতিভাত হয় না। *মসনবীতে* দেখা যায় যে, তিনি এমন একজন সুদক্ষ উৎসাহী শিক্ষক যিনি তাদের কল্যাণে আল্লাহর কাছে পৌঁছার পথ বিশ্লেষণ করছেন যারা সেপথে যাত্রা শুরু করেছে। প্রথমদিকের চরণগুলিতে মূল বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে। সেখানে 'মওলবী দরবেশদের পবিত্র বাদ্যযন্ত্র' নলের বাঁশি আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন আত্মার প্রতিনিধি।

ওই শোন, কত তীব্র নলের বাঁশিতে
বিরহির ব্যথাদীর্ণ সুর।
'জর্জরিত আমি নলের শয্যায়,
আমার গান কাঁদায় নরনারী,
দিতে চায় প্রেমের বেদনা আবেগ,
আমি চাই দরদী হৃদয়।
দূর দূরান্তে কেঁদে বেড়ায় হতভাগ্য
তার সেই সুখ আর ঘরের সন্ধানে।'

কবিতাটিকে 'প্রেমের দ্বারা ধর্মীয় ভাবাবেগ পূতকরণের একটি প্রচেষ্টা' হিসাবে যথার্থভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। জালালুদ্দীনের মতে যে বিশ্বাস নিজেকে 'যুক্তিযুক্ত' বলে অভিহিত করে এবং জ্ঞানদীপ্ত প্রমাণ ছাড়া যাতে সন্তুষ্ট হওয়া যায় না তা সাদৃশ্য, রীতিনীতি এবং সম্মানজনক অবস্থা থেকে উদ্ভূত বিশ্বাসের ন্যায়ই মূল্যহীন।

ভাগ্যবান জানার সূচনা করে এবং প্রমাণ চায় না;
তর্কশাস্ত্র আসে শয়তান থেকে এবং প্রেম আদম থেকে।

আল্লাহর কাছে আচার অনুষ্ঠান ও ধর্ম মতের মূল্য নেই। তিনি মসজিদ, গির্জা বা মন্দিরে বাস করেন না বরং পবিত্র হৃদয়ে বাস করেন। অত্যাবশ্যকীয় জিনিস হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ নৈতিক রূপান্তর যা কেবল গভীর বিশ্বাস এবং আকুল প্রার্থনার মাধ্যমে লাভ করা যায়। জালালুদ্দীন আল্লাহর মঙ্গলত্বে এবং মানুষের পাপময়তায় গভীর বিশ্বাসী ছিলেন। তাই স্রষ্টার ক্ষেত্রে মন্দের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে গিয়ে তিনি মানুষের ক্ষেত্রে তা স্বীকার করেন। আল্লাহ্র ব্যাপারে যে পর্যন্ত 'তাঁর' পূর্ণতা প্রতিভাত হয় সে পর্যন্ত সব ভালো; ঠিক যেমনি শিল্পীর ক্ষমতার ব্যাপারে কুৎসিত ও সুন্দর নির্বিশেষে যতদূর পর্যন্ত তার দক্ষতার স্বাক্ষর বহন করে ততদূর ভালো, কিন্তু তাই বলে তার নিজস্ব কুৎসিৎ দিক নয়। কিন্তু *মসনবী*, অমিল হচ্ছে–

www.waytojannah.com

মিল যা বোঝা যায় না,

সব আংশিক অমঙ্গল সার্বিক মঙ্গল,

এই অভিমত যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিফলিত করলেও পারস্যের এই অধ্যাত্মবাদী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিজস্বতার বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রামের শিক্ষা দেন। তিনি এটিকে 'সাত দরজার একটি দোযখ' এবং 'সব প্রতিমার মা' হিসাবে উল্লেখ করেন। মানুষ অন্যের মধ্যে যে মন্দ দেখতে পায় তা তার নিজেরই প্রতিফলন।

তুমি সেই দুষ্কৃতকারী, এবং ঐ আঘাতগুলি তুমি তোমাকেই হানছো; সেই মুহূর্তে তুমি তোমাকেই অভিশাপ দিচ্ছ।

তুমি তোমার মধ্যেকার মন্দ পরিষ্কার দেখতে পাও না, অন্যথায় তুমি আত্মার সমগ্র শক্তিতে নিজেকে ঘৃণা করতে।

কবির রচনার অনেকখানি স্থান জুড়ে রয়েছে আবেগপ্রবণতা ও অসৎ গুণাবলীর দক্ষ বর্ণনা। তিনি এরূপ বাস্তবতার সঙ্গে তা আলোচনা করেছেন যা মাঝে মাঝে তার অনুবাদকদের বিব্রত করে। অদৃষ্টবাদের যুক্তির জবাব দিতে গিয়ে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, স্বর্গীয় মাধ্যমের প্রতিক্রিয়া হলেও আমাদের কার্যকলাপ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছায় পরিচালিত। তাই এগুলির জন্য আল্লাহকে দায়ী করার কোন অধিকার আমাদের নেই। পাপীরা যদি সচেতন হয় যে, বাধ্য হয়ে তারা কাজ করছে তাহলে তারা কেন এতটা স্বেচ্ছায় এতে বাধ্য হয় এবং তাহলে কেন তারা পরবর্তীকালে লজ্জিত ও অপরাধী বোধ করে? তবুও এটি চূড়ান্ত সমাধান হতে পারে না। পূর্ণাঙ্গ প্রেম ছাড়া পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা অসম্ভব এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সঙ্গে মানুষের ইচ্ছার মিলনেই তা নিহিত।

প্রেমের কারণে 'বাধ্যবাধকতা' কথাটি আমাকে অস্থির করে তোলে;

যে ভালবাসে না কেবল সেই 'বাধ্যবাধকতা' দ্বারা বন্দী হয়।

এটি 'বাধ্যবাধকতা' নয়, আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ,

কোন মেঘ নয়, চাঁদের উজ্জ্বল আলো;

আর যদি 'বাধ্যবাধকতাও' হয় তা সাধারণ বাধ্যবাধকতা নয়,

এটি আমাদের পাপে প্রলুব্ধকারী আত্ম-ইচ্ছার বাধ্যবাধকতা নয়।

যে নৈতিক উদ্দেশ্য *মসনবী* রচনায় প্রেরণা সৃষ্টি করে দার্শনিক অনুচ্ছেদগুলিতেও তার প্রভাব দেখা যায়। এসব অনুচ্ছেদে অস্তিত্বের প্রতিটি ধাপের মধ্য দিয়ে 'একক সত্তার' নিঃসরণ বর্ণনা করা হয়েছে। এই পদ্ধতি আত্মার বিবর্তনে সুসংবদ্ধ রূপ গ্রহণ করেছে। আত্মা সার্বিক কারণের রূপ নিয়ে বৈষয়িক জগতে অবতীর্ণ হয়; খনি, উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে; মানুষের মধ্যে যৌক্তিকতার অধিকারী হয়; সামগ্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার শিকার হয়; শাস্তি ভোগ করে, ফেরেশতাদের পরিমণ্ডলে আরোহণ করে; এবং অনন্ত 'এক'-এর সঙ্গে পুনর্মিলিত না হওয়া পর্যন্ত তার আধ্যাত্মিক উন্নয়ন অব্যাহত

www.waytojannah.com

থাকে। এটি সেই 'একত্বেরই' আয়না। এই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আত্মা উপলব্ধি করে যে, তার বিচ্ছিন্নতার সমস্ত অভিজ্ঞতা 'যে উপাদানের দ্বারা স্বপ্ন তৈরি হয় তাই'।

প্রথমে সে আবির্ভূত হয়েছে প্রাণহীন রাজ্যে;
সেখান থেকে এসেছে উদ্ভিদ জগতে এবং যাপন করেছে
উদ্ভিদ জীবন বহু বছর, মনেও করেনি
কি ছিল সে; তারপর সামনে এগোয়
প্রাণীর অস্তিত্বে এবং এবারেও সে
স্মরণ করেনি কোন কিছু সেই উদ্ভিদ জীবনের,
কেবলমাত্র যখন সে অনুভব করে প্রবল ইচ্ছায় আকৃষ্ট,
সেদিকে মনোরম ফুলের ঋতুতে,
শিশুরা যেমন অনুসন্ধান করে স্তনের, এবং কেন জানে না।
আবার সেই বিজ্ঞ স্রষ্টা যাকে তুমি জানো
সে তাকে প্রাণীত্ব থেকে উন্নীত করে
মানুষের রাজ্যে ; এমনিভাবে রাজ্য থেকে রাজ্যে
এগুতে এগুতে, সে হয়েছে বুদ্ধিমান,
চতুর, তীক্ষ্ণ জ্ঞানী, যেমনটি সে বর্তমানে।
অতীতের কোন স্মৃতিই তার মধ্যে থাকে না,
এবং বর্তমান আত্মা থেকেও সে পরিবর্তিত হবে।

সে নিন্দ্রা নিমজ্জিত হলেও আল্লাহ তাকে ছেড়ে যাবে না
এই বিস্মৃত অবস্থায়। জেগে ওঠে, সে
একথা ভেবে হাসবে কি দুর্যোগের স্বপ্নইনা সে দেখেছে;
এবং বিস্মিত হবে কিভাবে তার অস্তিত্বের সুখী অবস্থা
সে ভুলে গেছে এবং উপলব্ধি করেনি যে ঐসব
দুঃখ ও বেদনা নিদ্রা, ছল এবং
ব্যর্থ বিভ্রান্তির ফল। তাই এ বিশ্ব
স্থায়ী মনে হয়, যদিও এটি কেবল নিদ্রিতের স্বপ্ন;
যে, যখন নির্ধারিত 'দিন' আসে তখন, মুক্তি পায়
তার ছায়ার ন্যায় সঙ্গী অশুভ কল্পনা থেকে,
এবং সহাস্যে তার অপচ্ছায়ার ন্যায় দুঃখ কষ্টকে তাড়ায়
যখন সে দেখতে পায় তার চিরস্থায়ী গৃহ।
নিশ্চিত হও, 'বিচারের দিন' হিসাব-নিকাশ করবে
তুমি যা কিছু ভালো বা মন্দ করেছো
এই জীবনে, এবং ব্যাখ্যা করবে তোমার সব স্বপ্ন।

Contents

হে অত্যাচারী যে ক্ষত-বিক্ষত করেছো নিরীহকে,
তুমি এই গভীর নিদ্রা থেকে জাগবে
নেকড়ে হয়ে, তোমার রিপুগুলি একটির পর একটি
ক্ষুধার্ত নেকড়ে হয়ে, ক্ষত-বিক্ষত করবে তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।[১]

স্থানাভাবে এই বিরাট ও বহুদিকসম্পন্ন কবিতা থেকে আরো উদ্ধৃতি দেওয়া গেলো না। এতে এমন এক শক্তি ও গভীর দৃষ্টি নিয়ে পারস্যের আধ্যাত্মিকতার মূল সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে যার সমপর্যায়ে কখনো কেউ পৌঁছতে পারেনি। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিকতা, বাকবহুলতা এবং প্রায়ই অস্পষ্টতার দরুন খুব কম পাঠকই গভীরভাবে এটি পড়ে। লেখকের মধ্যে আধুনিক বিশ্বের পরশ পাওয়া যায় এবং মধ্যযুগের জ্ঞানদীপ্ত ধর্মতাত্ত্বিক গায্যালীর চাইতেও তার বক্তব্য ব্যাপকতর। সূফীদের স্বভাব হচ্ছে উর্ধ্বে বিচরণ, আর বিধিপন্থীদের কাজ হচ্ছে সেই বৃদ্ধার অনুসরণ যে রাজার শিকারী বাজ পাখিকে হাতে পেয়ে তার ডানা ও নখর দুটি কেটে দেয়। অবশ্য ইসলামে এ ধরনের শাস্তি কার্যকর করা কঠিন, এবং সূফীবাদও মুসলিম সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরেই এর যুক্তিযুক্ত বিকাশের পথ অনুসরণ করে। এই স্বাধীনতা উভয় পক্ষের জন্যই সামগ্রিকভাবে সুবিধাজনক ছিল। এতে উভয় পক্ষের মধ্যে অপরিহার্য সংঘাতের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত হয় এবং পারস্পরিক সহনশীলতা গড়ে ওঠে। কোন কোন রোমান ক্যাথলিক লেখক এটিকে কতিপয় রোগ বলে যেভাবে উল্লেখ করেন সে ক্ষেত্রে অন্তত ইউরোপের ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পূর্ববর্তীকালে আরোপিত প্রতিকার ব্যবস্থা এতে রয়েছে। আমরা দেখেছি যে, সূফীগণ তাদের মতবাদে নিহিত বিপদ সম্পর্কে নিজেরাই সচেতন ছিলেন। তারা ধীরে ধীরে তাদের সেসব বিশেষজ্ঞের নির্দেশ অনুযায়ী একটি সুশৃংখল ব্যবস্থা গড়ে তোলেন যারা সকলের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও আনুগত্য অর্জন করেন। এঁরা হচ্ছেন দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সাধকদের একটি উর্ধ্বতন স্তর যার শীর্ষদেশে রয়েছেন একজন কুত্‌ব্ (অক্ষ)। সূফীদের বিশ্বাস অনুযায়ী এঁরাই বিশ্বের আধ্যাত্মিক শাসন পরিচালনা করেন। তাদের দায়িত্ব অনেক বেশি, কারণ প্রত্যেক সূফীই কার্যত একজন শেখের *(পীর)* কাছ থেকে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। স্বয়ং প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের তারা ভ্রাতৃসংঘ *(তরীকা)* বহির্ভূত মনে করেন। কিন্তু সাধকসুলভ গুণাবলীর প্রশ্নে না গিয়েও বলা যায়, যারা মোহাবিষ্ট অবস্থা সৃষ্টির স্বকল্পিত পন্থায় পরম আনন্দময়তার চর্চা করেন এবং এতোটা অনুপ্রাণিত বোধ করেন যে, তাদের ব্যক্তিসত্তা আল্লাহ্য় বিলীন হয়েছে, তাদের কাছে প্রচলিত নৈতিকতার নিয়ম-রিধিতে বা বিশ্বের অন্য কিছুতে কি আসে যায়? তাদেরকে অর্থহীনভাবে সাধারণ মানদণ্ডে বিচার না করে বরং তাদেরকে গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত। আদর্শের প্রতি তাদের অকৃত্রিম গভীর অনুরক্তি কিংবা তারা যে প্রকৃত সত্যের

১. ত্রয়োদশ শতকের রুমীর বক্তব্যের সঙ্গে হিন্দুদের জন্মান্তর বাদ এবং উনবিংশ শতকের ডারউইনের বিবর্তনবাদ তুলনীয়।-অনুবাদক

www.waytojannah.com

Contents

কথা তুলে ধরেন তা স্বীকার করতেই হবে। তারা পাপ–পংকিলতার আবর্ত থেকে নিজেদের দূরে রাখতে পারে, তাদের আমল তাদের পাপ স্খলন করে দেয়। এটাও স্বীকার করতে হবে যে, মুরাকাবা–মুশাহাদার মাধ্যমে তারা উচ্চ মকামে উন্নীত হয়। মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছে কি না সেটা বলা দুরূহ হলেও তারা যে পরিচ্ছন্ন ধর্মানুভূতি এবং উচ্চতর নৈতিকতা লাভ করে তা ইসলামই তাদের দিয়েছে।

আর এ নিকলসন

www.waytojannah.com

দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব

মুসলমানদের সাধারণ অভিমত হচ্ছে, খিলাফতের স্বর্ণযুগে দর্শন শাস্ত্রের বিশ্বব্যাপী যেসব ব্যবস্থা সমৃদ্ধিলাভ করে তা ছিল আরব ও ইসলামী দর্শন। মুসলিম জ্ঞান চর্চা কেন্দ্রগুলি ছিল ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পথিকৃৎ ও আদর্শ। ইসলাম ইউরোপীয় সভ্যতার জন্মদাতা ও প্রতিপালক এরূপ দাবি সম্বলিত উপরোক্ত অভিমত প্রচারমূলক সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যেসব আধুনিক মুসলিম পণ্ডিত মধ্যযুগের মুসলিম রীতিনীতির বিকাশ ও ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন তাদের রচনার মধ্যেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তা দেখা যায়। পাশ্চাত্য সাহিত্যেও বিভিন্ন সময়ে 'আরব দর্শনের' উল্লেখ দেখা যায়। কোন কোন পাশ্চাত্য লেখক 'আরব' দর্শনকে সুস্পষ্টভাবে প্রাচীনদের অভিমতের এরূপ একটি জগাখিচুড়ি বলে মনে করেন, যাতে বিভিন্ন ধরনের সব কিছুর জ্বলন্ত সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। তাদের মতে 'আরব' দর্শন বলে কোন কিছু নেই; আরবী ভাষাভাষী লোকেরা শুধুমাত্র সিরীয় খৃস্টান ও হাররানের সুসভ্য পৌত্তলিকদের মধ্যে প্রচলিত গ্রীক দর্শনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এর সঙ্গে পারস্য ও ভারত থেকে ধার করা কিছু কিছু উপাদান যুক্ত করেন।

এ কথা সত্য যে, আরব দর্শনের সামগ্রিক কাঠামো, সম্ভাবনা ও উপাদানের সূত্র আরবরা যে সব সুসভ্য সাম্রাজ্য জয় করেছে তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়, এবং তাদের ব্যবস্থায় গ্রীক দর্শনের প্রাধান্য দেখা যায়। অতি সাম্প্রতিককালে যা কিছু বলা হয়েছে এ সম্পর্কে প্রাথমিক মুসলিম পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে কোন ভুল বোঝাবুঝি ছিল না। বসরার যে সুদক্ষ ও বহুমুখী প্রতিভাধর লেখক *আল-জাহিয* (মৃত ৮৬৯ খৃ.) পরবর্তীকালে মুসলিম স্পেনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সৃষ্টি করেন, তিনি গ্রীকদের জ্ঞানদীপ্ত অবদানের কাছে তাঁর স্বধর্মাবলম্বীদের ঋণের কথা উদারভাবে স্বীকার করেন। প্রাচীনদের যেসব গ্রন্থে তাদের বিস্ময়কর জ্ঞান অমরত্ব লাভ করেছে এবং যেগুলিতে ইতিহাসের বিভিন্নমুখী শিক্ষা প্রতিফলনের মাধ্যমে অতীতের জীবনকে আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে, আমরা যদি সেগুলি আয়ত্ত করতে না পারতাম, আমরা যদি এর মাধ্যমে তাদের অভিজ্ঞতায় অমূল্য অবদানের সঙ্গে পরিচিত হতে না পারতাম, তাহলে জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা অত্যন্ত ক্ষুদ্রতর হতো এবং আমাদের একটি সত্যিকার প্রেক্ষিত লাভের উপায় অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হতো।' তদুপরি দার্শনিকগণ এবং জ্ঞানদীপ্ত ধর্মতাত্ত্বিকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের মতবাদের সূত্র গোপন রাখার কোন চেষ্টা করেননি। ইসলামসম্মত নয় এমন জ্ঞান ও

www.waytojannah.com

সংস্কৃতি বিকাশে বাধাদানে সচেষ্ট যেসব ব্যক্তি কুরআন ও মহানবী (সা)–এর হাদীসকে আঁকড়ে থাকতেন সাহিত্যের কোন ছলনাই তাদের ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করতে পারেনি। কারণ হযরত মুহাম্মদ (সা)–এর আমলে অপরিচিত ছিল তথা শরীয়ত ও সুন্নাহ বিরোধী সর্বপ্রকার জ্ঞান চর্চা বাতিল বলে গণ্য হয়। অপসংস্কৃতি ও বিদআতের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালিত হয়। *এন এক্সপোজার অব গ্রীক ইনফ্যামীজ এণ্ড এ সিপ অব রিলিজিয়াস কাউন্সেলস* এবং *ওক্যুলার ডেমোনস্ট্রেশন অব দি রিফিউটেশান অব ফিলোসফি ইন দি কুরআন* প্রভৃতি গ্রন্থ শিরোনামে তাদের নিজস্ব কাহিনীর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এরূপ একটি কাহিনী প্রচলিত হয় যে, জনৈক বিখ্যাত দার্শনিক তাঁর মৃত্যু শয্যায় ভুল স্বীকার করে তার নিজস্ব মতবাদ প্রত্যাহার করেন, এবং তাঁর সর্বশেষ উক্তি ছিল, 'সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ সত্য বলেছেন এবং ইবনে সিনা একজন মিথ্যাবাদী।'

আবার একথাও সত্য যে, মানুষের সামগ্রিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী চিন্তাবিদদের অবদানের অতিরিক্ত হিসাবে আরবরা যে প্রত্যক্ষ অবদান রেখেছেন তা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবুও কেউ যদি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করতে পারে যে, মুসলিম সভ্যতা যতোটা উত্তরাধিকারী হয়েছে তার চাইতে তেমন কিছু বা আদৌ কিছু দিতে পারেনি, তাহলেও একথা অস্বীকার করা অন্যায় হবে যে, এই সভ্যতা দার্শনিক চিন্তাধারার এমন এক বিশেষ সংশ্লেষ ঘটিয়েছে যা এর ফকীহ্ ও আলিমগণের নিজস্ব প্রবর্তনা। এবং জ্ঞানের জন্য জ্ঞান চর্চার যে উৎসাহ–উদ্দীপনা বিশাল মুসলিম জাহানের সর্বত্র বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে উজ্জীবিত করে তা ছোট করে দেখা অত্যন্ত অন্যায় হবে। 'আরব দর্শন' প্রাচ্যবিদদের কাছে সুনির্দিষ্ট অর্থ বহন করে।[১] তারা জানে যে, আলকিন্দী নামে কেবল একজন খাঁটি আরব দার্শনিক সমস্যা পর্যালোচনায় অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেন। তারা এও জানে যে, অ্যারিস্টটলিয়ান ও নিও–প্লাটোনিক চিন্তাধারার যে অদ্ভুত ও বহু ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যহীন সংমিশ্রণকে শ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিকরাও বিশ্বজগতের একটি যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাকে প্রকৃষ্টভাবে আরব দর্শন বলা যায়। কিন্তু তা ইসলামী দর্শন নয়। এর অগ্রনায়করা প্রায়ই নামেমাত্র মুসলমান ছিলেন, কিংবা তারা ছিলেন প্রচলিত ধর্মমতে আত্মস্বীকৃতভাবে অবিশ্বাসী, যার দরুন নিজেদের মতামতের জন্য হয় তাদের জীবন দিতে হয়েছে, না হয় তাদের স্বাধীনতা হারাতে হয়েছে।

মঙ্গোলরা প্রাচ্য জ্ঞানের প্রজ্বলিত আলো এমনভাবে ছারখার করে দেয় যে, প্রাচ্য সে অবস্থা কখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি, এবং গ্রন্থাগারগুলি ও ঐতিহ্য যেভাবে ধ্বংস করা হয়েছে তাতে কখনো পারবে বলে মনে হয় না। আরবরা যদি মঙ্গোলদের মত বর্বর হতো তাহলে ইউরোপীয় রেনেসাঁ একশ বছরের বেশি পিছিয়ে যেতো। মুদ্রণ শিল্প

১. অন্যদের কাছেও ঃ তুলনা কাইচারের নিবন্ধ রেমুণ্ডাস লুলুস আণ্ড সাইন স্টেলাং যুর অ্যারাবিশেন ফিলোসফি।

www.waytojannah.com

আবিষ্কারের আগে একজন জ্ঞানান্বেষীর জীবন সবসময় বিরক্তি ও নৈরাজ্যে পরিপূর্ণ ছিল। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত, এমন কি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও, বহু ছাত্রকে একজন শিক্ষকের সন্ধানে এক হাজার মাইল বা তার চাইতেও বেশি পথ ভ্রমণ করতে হতো। তরুণরা একজন পছন্দ মতো উস্তাদের সংস্পর্শে যাওয়ার জন্য কার্যত কপর্দকহীন অবস্থায় গৃহ ত্যাগ করে স্পেন থেকে মক্কা পর্যন্ত কিংবা মরক্কো থেকে বাগদাদ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ভ্রমণে বের হতো।

প্রসঙ্গত মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উদ্ভব সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। প্রথম ছিল বাগদাদের বিখ্যাত নিযামী বিশ্ববিদ্যালয়। নর্ম্যানদের ইংল্যাণ্ড বিজয়ের এক বছর আগে ৪৫৭ হিজরী সালে ওমর খৈয়ামের বন্ধু নিযামুল মুল্ক ও তুর্কী উযির আল্প্ আরসালান এটি প্রতিষ্ঠা করেন। অচিরেই নিশাপুর, দামেস্ক, জেরুজালেম, কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া ও অন্যান্য স্থানে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও গড়ে ওঠে। লক্ষণীয় যে, এগুলি প্রায় এমন শহরে গড়ে ওঠে যা ইসলামের অভ্যুদয়ের আগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য বিখ্যাত ছিল। ইতিমধ্যে ইউরোপে দশম শতকে সালের্নো[১] (ইটালীতে) একটি ভেষজ শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। এই শিক্ষা কেন্দ্রটি যদি প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন গ্রীক ভেষজ শিক্ষা কেন্দ্রের অব্যাহত প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকে তবে তার কারণ হচ্ছে যে, একাদশ শতক পর্যন্ত দক্ষিণ ইটালী বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের একটি অংশ ছিল। এমন কি নর্ম্যান বিজয়ের পরও এই এলাকাটি গ্রীক ভাষাভাষী একটি বিরাট জনসংখ্যা আধ্যুষিত ছিল। অপর দিকে সিসিলির নর্ম্যান বিজয়ীরা আরবী জ্ঞানচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং তারা এতটা পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামী রীতিনীতি প্রবর্তন করেন যাতে এরূপ সিদ্ধান্ত এড়িয়ে যাওয়া দুষ্কর যে, এই কেন্দ্রের ওপর আরব ভেষজ বিজ্ঞানের অত্যন্ত শক্তিশালী প্রভাব ছিল এবং তা সৃজনশীল না হলেও সংরক্ষণশীল ছিল।[২] যেকোন অবস্থাতেই মুসলিম চিকিৎসকগণ বিপুল সংখ্যক স্যারাসেন অধিবাসীর চিকিৎসা করতেন। প্রাচীনতম লেখকদের রচনায় দেখা যায় যে, তারা আরব চিকিৎসকদের রচনা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন না।

সালের্নো সহজ ও সত্যিকারভাবে একটি চিকিৎসা বিদ্যালয় ছিল, বিশ্ববিদ্যালয় নয়। বলোগনা, প্যারিস, মন্টপেলিয়ার ও অক্সফোর্ডের ন্যায় প্রাচীনতম খৃষ্টান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উদ্ভব হয় দ্বাদশ শতকে। ইউরোপে প্রথম 'আরব্য' বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম জ্ঞানচর্চার ভিত্তিতে গড়ে উঠলেও মুসলিম উদ্যোগে গড়ে ওঠেনি এবং এটি অনেক

---

১. দ্রষ্টব্য ঃ রাশডালের দি ইউনিভার্সিটিস অব ইউরোপ ইন দি মিডল এজেস, ১, অধ্যায় ৩, এবং ক্যাম্ব্রিজ মিডিয়েভ্যাল হিস্টোরি, ৬ষ্ঠ, পৃ. ৫৬০।

২. গিলম লি বন (২য়) অধিকাংশ স্যারাসেন অধ্যুষিত প্রজাদের আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নামায আদায় করার জন্য উৎসাহিত করেন। তার উত্তরাধিকারীরা স্যারাসেনদের অর্থ, দরবারের অনুষ্ঠান, প্রাসাদের উৎকীর্ণ লিপি, প্রশাসন ব্যবস্থা এমন কি হেরেমের রীতিনীতিও অনুকরণ করেন। ডেস্‌ক্রিপশন ডি এল' আফ্রিক এট ডি এল' এসপাগনে পার ইদ্রিসী, সম্পাদনা ডোযী ও ডি গোয়েজি, ইন্ট, পৃ. ১।

পরে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞ আলফন্সো (১২৫২–৮১) তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী আবু বকর আর রিকুতিকে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁর জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে রিকুতি খৃস্টান, ইহুদী মুসলমানদের সর্বপ্রকার বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দান করতেন।

কিন্তু সবচাইতে গৌরবোজ্জ্বল মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ১২৩৪ খৃস্টাব্দে বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত আল মুসতানসিরিয়াহ। 'আমাদের বলা হয় যে, বাইরের দৃশ্যে, কারুকার্য ও আসবাবপত্রের সৌকর্যে, প্রশস্ততায় এবং এর পবিত্র ভিত্তি স্থলের ঐশ্বর্যে মুসতানসিরিয়াহ ইতিপূর্বে ইসলামে পরিদৃষ্ট সব কিছুকে ছাড়িয়ে যায়। এতে সুন্নী সম্প্রদায়ের চারটি মাযহাবের প্রত্যেকটির জন্য একটি করে চারটি শরীয়ত বিধির শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। প্রতি কেন্দ্রে প্রধান হিসাবে ছিলেন একজন অধ্যাপক। প্রত্যেক অধ্যাপক তার অধীনস্থ পঁচাত্তর জন শিক্ষার্থীকে *(ফকীহ্)* বিনা বেতনে শিক্ষা প্রদান করতেন। চারজন অধ্যাপককে মাসিক বেতন দেওয়া হতো। এবং তিনশ শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে মাসে একটি করে সোনার দীনার দেওয়া হতো। তদুপরি কলেজের বিশাল রন্ধনশালা থেকে বাসিন্দাদের সবাইকে প্রত্যহ রুটি ও গোশত পরিবেশন করা হতো। ইবনুল ফুরাতের মতে মুসতানসিরিয়াহ্‌তে একটি গ্রন্থাগার ছিল------তাতে বিভিন্ন বিজ্ঞান সংক্রান্ত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী ছিল। সেগুলি এমনভাবে সাজানো ছিল যে, শিক্ষার্থীরা সহজেই সেগুলি পড়তে পারতেন। কেউ এসব পাণ্ডুলিপি নকল করতে চাইলে তাও সহজে করতে পারতেন। প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের কাগজ কলম সরবরাহ করা হতো। শিক্ষার্থীদের জন্য প্রদীপ, কলেজ ভবনকে আলোকিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জলপাই তেল এবং খাবার পানি ঠাণ্ডা করার জন্য সংরক্ষিত স্থানের কথাও উল্লেখ করা হয়। বিশাল প্রবেশ কক্ষে.....একটি ঘড়ি ছিল.....নিঃসন্দেহে সেটি ছিল এক ধরনের পানি ঘড়ি। এতে নামাযের নির্দিষ্ট সময় ঘোষণা করা হতো এবং দিনে ও রাতে কতোটা সময় অতিক্রান্ত হয়েছে তা সূচিত হতো। কলেজের অভ্যন্তরে শিক্ষার্থীদের বিশেষ ব্যবহারের জন্য একটি হাম্মাম.....নির্মাণ করা হয়। সেখানে একটি হাসপাতালে একজন চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়। প্রতিদিন সকালে কলেজ পরিদর্শন করা এবং যারা রুগ্ন তাদের ব্যবস্থাপত্র দেওয়া তার দায়িত্ব ছিল। মাদ্রাসার বড় বড় গুদামে প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানীয় ও ওষুধপত্র মজুদ থাকত।[১] আর এসবই ছিল ত্রয়োদশ শতকের সূচনায়।

একাদশ শতকে জ্ঞান চর্চার সূত্র অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং আমরা বর্তমানে যতদূর জানতে পেরেছি তাতে এটুকু উল্লেখ করা নিরাপদ হবে যে, স্পেনে মুসলিম পণ্ডিতদের ভূমিকার বিরাট গুরুত্ব ইউরোপের খৃস্টান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ প্রভাব সৃষ্টির চাইতে বরং ব্যক্তি বিশেষদের শিক্ষাদানের মধ্যেই নিহিত ছিল। অবশ্য প্রাচ্য

---

১. বাগদাদ ডিউরিং দি আব্বাসাইড ক্যালিফেট, জি লি স্ট্রেঞ্জ, অক্সফোর্ড, ১৯০০, পৃ. ২৬৭ এফ।

www.waytojannah.com

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তুলনায় ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অনগ্রসর ছিল এবং মধ্যযুগীয় পণ্ডিতদের প্রামাণিক সাক্ষ্য সম্বলিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম জ্ঞানবিজ্ঞান তাদের অধ্যয়নের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত উপাদান সরবরাহ করে। *দি লিগেসি অব ইসরাইলে* এবং এই গ্রন্থের অন্যান্য অধ্যায়ে এসব পণ্ডিতদের অনেকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। জন অব সলসবারি[১] স্পেনীয়দের এবং যারা আফ্রিকা ও মুসলিম প্রাচ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয় তাদের অবদানের কথা তাঁর পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেন। রজার বেকন (আনু. ১২১৫–৯২) লিখেছেন, 'ফিলোসফিয়া অ্যাব......অ্যারাবিকো ডিডাকটা এস্ট এট ইডিও নাল্লাস ল্যাটিনাস স্পিয়েন্টিয়াম স্যাক্রে স্ক্রিপচুরে এট ফিলোসফিয়ে পোটেরিট আট ওপোর্টেট ইন্টোলিজার লিংগুয়াস এ কুইবাস সান্ট ট্রান্সলেটে'। কিভাবে আরব লেখকরা তার এই বক্তব্য সমর্থন করেন তাও তিনি বলেন। কিন্তু দুভার্গ্যবশত পূর্ববর্তী শতকগুলির খৃস্টান পরিব্রাজকগণ মুসলিম শাসনাধীন কিংবা মুসলিম প্রভাবাধীন দেশগুলি পরিভ্রমণের পর সেখান থেকে কি নিয়ে এসেছেন তা আমাদের জানান নি। দশম ও একাদশ শতকে মুসলমানরা যেসব বিষয়ে অধ্যয়ন করতেন এবং একাদশ ও দ্বাদশ শতকের খৃষ্টান ছাত্রদের অনুরূপ অধ্যয়নের তুলনা করলে এরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যাবে যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে এতোদিন পর্যন্ত যা মনে করা হতো তার চাইতে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক ছিল। অবশ্য সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ধারাবাহিক অধ্যয়নের বিশেষ ধরন, শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক, বেতন ও বিশেষ দানের প্রশ্ন, শান্তি শৃংখলা রক্ষা, ডিগ্রি দান বা শিক্ষাদানের লাইসেন্স প্রদান এবং বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বহুবিধ কার্যকলাপ, শিক্ষাকেন্দ্র বাগদাদেই হোক আর অক্সফোর্ডেই হোক কমবেশি একই রকমের ছিল, ফলে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া না গেলে একথা দৃঢ়ভাবে বলা বিপজ্জনক যে, খৃস্টান বিশ্ববিদ্যালয় একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে মুসলিম আদর্শে গড়ে ওঠে। মুসলিম অধ্যাপক কর্তৃক তাঁর নামে ও কর্তৃত্বে শিক্ষা প্রদান কিংবা কোন নির্দিষ্ট দলিলের বিষয়বস্তু পুনঃ প্রকাশের একটি *ইজাযা* বা লাইসেন্স দানের ন্যায় বহু ক্ষেত্রে সাদৃশ্য রয়েছে। ডিগ্রির প্রাচীনতম রূপ মধ্যযুগীয় *লাইসেনসিয়া ডসেণ্ডির* সঙ্গে এই রীতির সুস্পষ্ট মিল রয়েছে।[২] অপর দিকে যথাযথ অনুমোদন প্রাপ্ত একজন অধ্যাপকের কাছে যথেষ্ট সময় পর্যন্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত না হয়ে কারো অধ্যাপক হওয়া উচিত নয়, এরূপ নীতির জন্য যে সুস্পষ্ট নজীর থাকা প্রয়োজন সেরূপ নজীরের ক্ষেত্রেও মিল ছিল। অন্যান্য সাদৃশ্যপূর্ণ বাহ্যিক দিকগুলি হচ্ছে, বিশেষভাবে সংগঠিত বহু বিদেশী নাগরিকের উপস্থিতি এবং শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ না করে অবৈতনিকভাবে শিক্ষা প্রদান।

১. ম্যাটালজিকাস, ৪র্থ, ৬। এই রেফারেন্সের জন্য আমি ক্লিমেন্ট সি জে ওয়েব–এর কাছে ঋণী।
২. অবশ্য একই ধরনের কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স প্রদান করতেন না।

www.waytojannah.com

Contents

বিনামূল্যে জ্ঞানের আলো বিতরণের এই মহানুভব রীতি এখনো কায়রোর বিখ্যাত আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে অব্যাহত রয়েছে। এখানে মুসলিম বিশ্বের সকল এলাকা থেকে আগত শিক্ষার্থীরা *মাযহাব* অনুযায়ী পৃথক পৃথক এলাকায় অবস্থান করে এবং তাদের ব্যয়ভার আংশিকভাবে দান–সদ্‌কার সাহায্যে এবং পরিচালকমণ্ডলীর মঞ্জুরি মাধ্যমে নির্বাহ করা হয়।[১]

সরকারী অনুবাদকরা তাদের কাজ শুরু করার পূর্ববর্তী শতকে ল্যাটিন পণ্ডিতগণ ব্যক্তিগত পর্যায়ে যেভাবে স্পেন থেকে আরব জ্ঞান আহরণ করেন তা *দি লিগেসি অব ইসরাইল*[২]–এ অত্যন্ত নিপুণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইউরোপে ভ্রাম্যমাণ পণ্ডিতগণ আরব চিন্তাধারা প্রচার করেন। কিন্তু তাদের রচনা বর্তমানে পাওয়া যায় না। যেসব সূত্রে ইবনে সিনা, গাযযালী ও ইবনে রুশদের রচনা ল্যাটিন ভাষায় পৌঁছে তা সর্বজন পরিচিত হলেও তার পূর্ববর্তী শতকসমূহে এসব চিন্তাধারার অধিকতর সূক্ষ্ম প্রবেশ কেবল অনুমানের বিষয়, এটি প্রমাণ করা যায় না।

দ্বাদশ শতকের প্রাথমিক বছরগুলিতে সেগোভিয়ার আর্কডীকন ডোমিনিক গুণ্ডিসালভাসের অনুবাদের মাধ্যমে ইবনে সিনা, আল–ফারাবী ও গাযযালীর রচনার মধ্য দিয়ে খৃষ্টান পাশ্চাত্য অ্যারিস্টটলের সঙ্গে পরিচিত হন। গুণ্ডিসালভাস তাঁর নিজস্ব জ্ঞান বিশ্বকোষে প্রধানত আরব সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করেন।[৩]

অ্যারিস্টটলকে পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য আরবদের কাছে ঋণী বলে প্রায়ই যে মন্তব্য করা হয় তা কিছুটা বিশ্লেষণ করা দরকার। এ কথা বলা যেতে পারে যে, অ্যারিস্টটল যে একজন দার্শনিক ছিলেন গুণ্ডিসালভাসের সময় পর্যন্ত তাতে কেউ সন্দেহ করবেন না।

---

১. রাশডাল লিখেছেন ঃ 'আইনের (শরীয়ত) একটি বিষয় বা গ্রন্থ "পাঠ করার" জন্য অথবা অপর কথায় একটি পাঠ্যক্রম সমাপ্তির জন্য অধ্যক্ষের (রেক্টর) লাইসেন্স ব্যক্তিবিশেষকে ব্যাচেলারে উন্নীত করে।' এবং 'একজন শরীয়ত বিশেষজ্ঞ চার বছর "শ্রবণের" পর একক একটি বিষয় সম্পর্কে ভাষণ দিতে পারেন। "শ্রবণ" ও "পাঠের" বিশেষ অর্থ আরবীতে অনুরূপ বিশেষ ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলেও এই সাদৃশ্য এবং পাঁচ–ছয় বছরের শিক্ষালাভের পর ছাত্র–শিক্ষককে চাকরিতে নিয়োগের তেমন কোন তাৎপর্য নেই, এবং কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্ভবত স্বতঃস্ফূর্তভাবে এর উদ্ভব হয়েছে। রহস্যজনক বাক্কেলরিয়াস শব্দটি (ব্যাচেলার শব্দের মূল ল্যাটিন রূপ, যার উদ্ভব সম্পর্কে অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারিও কোন সন্তোষজনক বিশ্লেষণ দিতে পারেনি) কোন আরবী সূত্র খুঁজে পাওয়া গেলে এ ব্যাপারে দৃঢ় যুক্তি দেওয়া যেতো। মূলত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাচেলার বলতে এরূপ ছাত্রকে বোঝানো হতো বলে মনে হয়, যে মাষ্টার স্কুলে পড়ানোর অনুমতি পেতো। আমি কোন আরবী লেখকের মধ্যে সঠিক অর্থ খুঁজে না পেলেও বিহাক্কে–আল রিওয়ায়া ('অন্যের কর্তৃত্বে শিক্ষা দেওয়ার অধিকার') কথাটি বাক্কেলরিয়েটের অর্থের ইঙ্গিত দেয় এবং এর সঙ্গে মোটামুটি ধ্বনিগত মিলও দেখা যায়। অবশ্য এই শব্দটির প্রাচীনতম ব্যবহার ব্যাপ্সন ডি রোল্যান্ডে রয়েছে বলে জানা যায়। এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত করা গেলে একথা বলা যাবে যে, মূল আরবী শব্দকে ব্যাচেলরে' রূপান্তর করা হয়েছে। আরবীতে ডিগ্রীধারীর জন্য নয়, পদের জন্য শব্দ ব্যবহার করা হয়।

২. চার্লস ও ডরোথিয়া সিংগারের নিবন্ধ দ্রষ্টব্য, পৃ. ২০৪ এফ।

৩. আরো দ্রষ্টব্য দি লেগ্যাসি অব ইসরাইল, পৃ. ২৫৪–৬।

www.waytojannah.com

বেকনের মতে বোইথিয়াসই[১] সর্ব প্রথম অ্যারিস্টটলকে পাশ্চাত্যের সঙ্গে পরিচিত করেন। তাঁর *ক্যাটিগরিজ* ও *ডিইন্টারপ্রিটেশান* অনুবাদ এবং সে সঙ্গে তর্কশাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব রচনা ও ভাষ্য ইউরোপে কার্যত প্রায় ১১৫০ খৃ. পর্যন্ত অ্যারিস্টটলিয়ান জ্ঞানের সামগ্রিক রূপ তুলে ধরে। সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে পাশ্চাত্যে অ্যারিস্টটলকে যতোটা জানতেন বাস্তবিক পক্ষে তার চাইতে বেশি প্ল্যাটো সম্পর্কে জানতেন না; অথচ খৃস্টান চিন্তাধারায় প্ল্যাটোর দর্শন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিফলিত। *মেটাফিজিক্স*–এর প্রাচীনতম (কিন্তু অসম্পূর্ণ) সংস্করণ বাইজেন্টিয়াম থেকে আনু. ১২০০ খৃস্টাব্দে প্যারিসে পৌঁছে। কয়েক বছর পর আরবী থেকে অনূদিত অসম্পূর্ণ সংস্করণ পৌঁছে। ১২৬০ খৃ. পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ রচনা পণ্ডিতদের হাতে পৌঁছেনি। *নিকমাচিয়ান এথিক্স* প্রথমে গ্রীক সূত্রসমূহ থেকে এবং তারপর আরবী থেকে পাওয়া যায়। এটি সর্বশেষ ১২৫০ খৃস্টাব্দের দিকে সামগ্রিকভাবে সরাসরি গ্রীক থেকে অনূদিত হয়।

অতএব; একথা বলা যেতে পারে যে, আরবী চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর অ্যারিস্টটলের রচনার প্রতি ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সর্বপ্রথম যতোটা আগ্রহের সৃষ্টি হয় ততোটা পরিমাণে অ্যারিস্টটলের দর্শন পুনরুদ্ধারের জন্য পাশ্চাত্য আরবদের কাছে ঋণী। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আরব চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে দর্শনের প্রতি তাদের আগ্রহ উদ্দীপনা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেই ইউরোপীয়রা অ্যারিস্টটলের রচনায় মনোযোগী হয়। বস্তুত, প্রথম কার্যকর প্রভাব যদি আরবদের না হতো তাহলে এ সত্যটির বিশ্লেষণ কিভাবে করা যায় যে, অ্যারিস্টটল যুগের পর যুগ ধরে ইবনে রুশদের নামে পরিচিত দার্শনিক রচনায় মিশে ছিলেন? ইবনে রুশদ নিজে গ্রীক জানতেন না; তাঁর পূর্ববর্তীদের অনুবাদের ওপর নির্ভর করেন। তাঁর দর্শন ব্যবস্থা ইহুদীদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল এবং তা খৃস্টান চিন্তাধারায় এতো গভীরভাবে প্রবেশ করে যে, খৃস্ট ধর্মীয় মতবাদের জন্য তা একটি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। অ্যারিস্টটলকে তার ভাষ্যকার থেকে পৃথক করার ব্যাপারে এবং আরব বিশ্লেষণের সমালোচনায় সেন্ট টমাসই বিশেষভাবে উদ্যোগী হন।

আরব দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের উদ্ভব এবং বিকাশের চাইতে পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় এর প্রভাবের প্রশ্ন আমাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু দর্শন প্রচারের ইতিহাসে আরবদের স্থান কোথায় তা বুঝতে হলে এর ব্যবস্থা ও উদ্ভবের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া অপরিহার্য। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এ ধরনের পর্যালোচনায় দর্শনকে ধর্মতত্ত্ব থেকে পৃথক করা অসম্ভব না হলেও দুঃসাধ্য। দর্শন ও ধর্মতত্ত্বকে একটি বিষয় হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষে উত্তম যুক্তি রয়েছে। কারণ আমরা যাকে মেটাফিজিক্স (অধিবিদ্যা) হিসাবে জানি অ্যারিস্টটল নিজেই তাকে 'প্রথম দর্শন' ও 'ধর্মতত্ত্ব' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। গ্রীকদের মধ্যে একেশ্বরবাদের উদ্ভব ধর্মীয় মহলে নয়, বরং দার্শনিক মহলেই হয়েছে। ইসলামে দুটি বিষয়ের উদ্ভব ও বিকাশের আলোচনায় এই সত্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি ধরে

১. রোমান দার্শনিক ও রাষ্ট্রনীতিক (আনু. ৪৮০–৫২৪ খৃ)। –অনুবাদক

www.waytojannah.com

নেওয়া হয় যে, খৃষ্টান–উত্তর যুগে দর্শন প্রধানত মানুষের যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং ধর্মতত্ত্ব যা কেবল প্রত্যাদেশ দ্বারা প্রমাণ করা যায় এরূপ অনন্ত আধ্যাত্মিক সত্য প্রচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল, তাহলে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব এ ধরনের পার্থক্যকে বৈধ হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে। সেন্ট টমাস আকিনাস এবং ডান্স স্কটাস উভয়েই দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের পার্থক্য স্বীকার করেন এবং প্রত্যেকটিকেই তাদের নিজস্ব পর্যায়ে সর্বেসর্বা বলে মনে করেন; এবং তাদের পূর্ববর্তী আরবদের ন্যায় তারা যুক্তি এবং প্রত্যাদেশ উভয়টিকেই প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু কোন্‌টি মেটাফিজিক্সের অন্তর্ভুক্ত এবং কোন্‌টি প্রত্যাদেশমূলক ধর্মের অন্তর্ভুক্ত এ ব্যাপারে সবাই সব সময় একমত নয়। রজার বেকন দর্শনতত্ত্ব পর্যালোচনা সমর্থন করতে গিয়ে এই প্রশ্নে তার মনোভাব সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন এবং এরূপ ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, প্রাচ্য সূত্রসমূহই তার মনকে আকৃষ্ট করেছে। তিনি বলেছেন, 'দার্শনিকদের মধ্যে মেটাফিজিক্স ধর্মতত্ত্বের একটি অংশ হিসাবে বিবেচিত। তাঁরা এটিকে নৈতিক দর্শনের সঙ্গে একযোগে *সায়েনশিয়া ডিভাইনা*[১] ও *থিওলোজিয়া ফিজিকা* নামে অভিহিত করেন। অ্যারিস্টটলের *মেটাফিজিক্সের* প্রথম ও একাদশ খণ্ডে এবং ইবনে সিনার *মেটাফিজিক্সের* নবম ও দশম খণ্ডে তা লক্ষণীয়। মেটাফিজিক্স আল্লাহ্, ফেরেশতা এবং এ ধরনের স্বর্গীয় ব্যাপার সংক্রান্ত বহু বিষয় পর্যালোচনা করে।[২] আবার 'কল্পনামূলক দর্শনের চূড়ান্ত পর্যায় হচ্ছে সৃষ্ট জীবের মাধ্যমে স্রষ্টা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।[৩] খৃষ্টানদের অবশ্যই একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, 'দর্শন নিজেই নরকের নির্বুদ্ধিতায় পরিচালিত করে, কাজেই এটি অবশ্যই স্বয়ং অন্ধকার ও কুয়াশা।'[৪]

আরব পণ্ডিতদের মধ্যে বৃহত্তর পরিমাণে কোন মতৈক্য ছিল না। ইবনে সিনা 'অস্তিত্বকে অস্তিত্ব হিসাবে' মেটাফিজিক্সের যথাযথ বিষয়রূপে গুরুত্ব আরোপ করেন। অপর দিকে অ্যারিস্টটলের উপর ঘনিষ্ঠভাবে নির্ভরশীল ইবনে রুশদ জোর দিয়ে বলেন যে, আল্লাহ এবং বুদ্ধিমত্তাই এর উপযুক্ত এলাকা। অতএব, মেটাফিজিক্স ও ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে ল্যাটিন পণ্ডিতদের কাছে সর্বাধিক পরিচিত দুজন আরব দার্শনিক সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদ পোষণ করেন। ইবনে রুশদ বিশ্বাসের প্রত্যাদেশ সংক্রান্ত মতবাদ ছাড়া সবকিছু যুক্তির বিচারে ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।

এবারে মুসলমানদের দর্শন চর্চার উদ্ভব প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই যে, যেসব আরব প্রাথমিক খলীফাদের বিজয়ী বাহিনীর সৈনিক ছিলেন তাদের সঙ্গে বর্তমানকালের আরবদের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল। তবে প্রথমোক্তদের

---

১. ইবনে সিনার মেটাফিজিক্স সংক্রান্ত বইটির নাম *ইল্‌মুল ইলাহিয়্যাত*, যার অর্থ 'স্বর্গীয় ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের জ্ঞান।'

২. ওপাস মাজুস, ফিলগ্, ৩য় অধ্যায়।

৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৮ম অধ্যায়।

৪. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১৯তম অধ্যায়।

www.waytojannah.com

মধ্যে খাঁটি বেদুইনের বৈশিষ্ট্য সম্ভবত যথেষ্ট পরিমাণে বেশি ছিল। অবশ্য আধুনিক দার্শনিকরা এ জন্যে খুব আশান্বিত না হওয়ারই কথা। ঐসব লোকের মধ্যে যেকোন প্রকার জ্ঞান চর্চার প্রতি তেমন উল্লেখযোগ্য আগ্রহ ছিল না। জ্ঞান চর্চার কেবল প্রেরণাই নয়, উপাদানও তাদের বাইরে থেকে আহরণ করতে হতো। প্রথম দুই–এক যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর যখন বিজয়ী শ্রেণীকে একটি পৃথক ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবে টিকে থাকার অধিকার সপ্রমাণ করতে হয়, তখন তাদের মধ্যে এই প্রেরণা আসে। নবাগতরা যতোদিন পর্যন্ত অস্ত্রের দ্বারা শাসন করেন, মরুভূমির সর্বপ্রকার কিংবা অন্তত অধিকাংশ সুস্পষ্ট রীতিনীতি বজায় রাখেন এবং একটি পৃথক আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেন ততোদিন পর্যন্ত কোন প্রকার জ্ঞানদীপ্ত যুক্তির প্রয়োজন ছিল না। এ কথা বিশেষ করে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ সিরিয়ায়, যখন তাদের খৃষ্টান প্রতিবেশীরা তাদের 'এরিয়ান'[১] প্রবণতা সম্পন্ন একটি নতুন সম্প্রদায় বলে মনে করতো, এবং আরবরা নিজেরাও যখন ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসের প্রতি প্রশ্রয়মূলক মনোভাব পোষণ করতো তখনো প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই মরুভূমির সেমিটিক ও কৃষিভূমির সেমিটিকদের মধ্যে পার্থক্য ঘুচে যায়। যেসব আরব রোমানদের অতিরিক্ত সেনাবাহিনীতে কাজ করতো তারা হাজারে হাজারে খলীফাদের সেনাবাহিনীতে যোগদান করে। সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া ও মিসরে আরবদের প্রায়ই অভিনন্দিত করা হতো, কারণ তারা রাজকীয় জোরজবরদস্তির অবসান ঘটায় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অবাঞ্ছিত চাপ থেকে মতবাদ বিচ্ছিন্ন খৃষ্টান সম্প্রদায়গুলিকে অব্যাহতি দেয়। তারা স্থানীয় আশা–আকাঙ্ক্ষা ও ভাবাবেগের প্রতি বিদেশীদের চাইতে বেশি সমঝোতা–মূলক মনোভাব প্রদর্শন করে। ইসলাম সর্বপ্রথম অস্পষ্টতামূলক ছিল। 'এক আল্লাহ্‌র' প্রতি এর সহজ বিশ্বাস খৃষ্টান বিশ্বাসের সঙ্গে কোন পরস্পর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়নি। কিন্তু যখন দুটি ধর্মের পরস্পর বিরোধী ও বিতর্কমূলক দিকগুলি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তখনি ইসলাম নিজস্ব মূল সুর খুঁজে পায় এবং সেটিকে সোচ্চার করার জন্য বিভিন্ন সূত্রের সন্ধান করে।

ভোটাধিকারমূলক কর (পোল–ট্যাক্স) থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যথা সময়ে বহু ইহুদী ও খৃষ্টান ইসলাম গ্রহণ করে। সকল অমুসলমান একেশ্বরবাদীদের কাছ থেকে কিংবা যারা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে ধর্মগ্রন্থের অধিকারী ছিল তাদের কাছ থেকে এই কর আদায় করা হতো।[২] এঁরা বাইজেন্টাইন ও পারস্য সংস্কৃতির অধিকারী ছিল। এ ধরনের ব্যাপক ধর্ম ত্যাগ গির্জা কর্তৃপক্ষকে আতঙ্কিত করে এবং তারা যুক্তির মাধ্যমে ইসলামের মূল ভিত্তিতে আঘাত হানার জন্য এগিয়ে আসে। 'আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্য কি? তিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ একথার অর্থ কি? তাঁর সঙ্গে তাঁর জ্ঞানের সম্পর্ক কি? তিনি যদি কোন অপরিবর্তনীয়

---

১. আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রীক ধর্মতত্ত্ববিদ এরিয়াসের (জীবিতকাল আনু. ২৮০–৩৩০ খৃ.) মতবাদ। তাঁর মতে যীশু খৃষ্ট আল্লাহর সত্তা দ্বারা তৈরি নয়, তিনি কেবলমাত্র সৃষ্ট জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। –অনুবাদক

২. আমি দি লেগ্যাসি অব ইসরাইলে (পৃ. ১২৯) ইহুদীদের প্রভাব বর্ণনা করেছি।

www.waytojannah.com

Contents

ফরমান দ্বারা সব কিছু পূর্ব নির্ধারিত করে থাকেন তাহলে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও দায়িত্ব কোথায় নিহিত? খৃষ্টান যাজক সম্প্রদায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যেসব সমস্যা নিয়ে বিতর্ক করছিলেন এগুলিও তাঁর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁরা ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব নিয়ে এসব প্রশ্ন সমাধানের দায়িত্ব মুসলমানদের হাতে তুলে দেন, এবং এগুলি সেখানেও পূর্বের ন্যায় একই পরিমাণে তিক্ততা ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। এমন এক সময় ও এলাকা ছিল যখন কর্তৃত্বমূলক কণ্ঠে এসব প্রশ্ন উত্থাপন বন্ধ করা যেতো। কিন্তু অধিকতর আগ্রহী ও বুদ্ধিমান শ্রেণীর লোকেরা কোন না কোন ধরনের জবাব চায়। যেসব জবাব দেওয়া হতো তা প্রথমে ছিল থমকে দেওয়ার মত এবং পরীক্ষামূলক। যে জাতির প্রশাসক শ্রেণী দর্শনের অস্তিত্ব সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন না তাদের কাছে এসব জবাবের ভাষা এবং ধ্যান–ধারণা নতুন ও অদ্ভুত মনে হয়। দামেস্কের সেন্ট জন যুক্তি দেওয়ার সময় তার মুসলিম প্রতিপক্ষকে মুরুব্বীয়ানার সুরে নিবৃত্ত করতে পারতেন। কিন্তু মুসলমানরা তাদের প্রতিপক্ষ গ্রীক যুক্তি–কৌশলের অস্ত্রের একচ্ছত্র অধিকারী হয়ে থাকবে এই অবস্থা দীর্ঘকাল পর্যন্ত মেনে নিতে পারেনি। তারা গ্রীক ও সিরীয়দের রচনার চিন্তাধারার সঙ্গে ধীরে ধীরে নিজেদের পরিচিত করে তোলেন। আমরা এই প্রাথমিক যুগ সম্পর্কে লোক পরম্পরায় কেবল এটুকুই জানতে পেরেছি যে, এ সময় বিভিন্ন দার্শনিক রচনা আরবীতে অনূদিত হয়। আমরা প্রাথমিক চিন্তাশীল ধর্মতত্ত্ববিদদের এমন কিছু কিছু উক্তিও পেয়েছি যাতে দেখা যায় যে, দার্শনিক সন্দেহ তখনি তাদের মধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করেছে।

আব্বাসীয় খলীফা আল–মামুনের (১৯৮–২১৮ হিঃ, ৮১৩–৩৩ খৃ) পৃষ্ঠপোষকতায়ই দর্শনশাস্ত্র প্রকৃতপক্ষে তার নিজস্ব রূপ লাভ করে। যেখানে নিষ্ঠাবান মুসলমানরা বিশ্বাস করেন যে, সমগ্র বিশ্বজগতের পূর্বেই *আল কুরআন* শাশ্বত সেখানে এই খলীফার মতে *কুরআন* যথাসময়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও স্বীকারোক্তিমূলক–ভাবে '*মুতাযিলা*'[১] তথা উদারপন্থী ধর্মতাত্ত্বিকদের মতবাদের অনুসারী ছিলেন। অতএব, একথা ধরে নেওয়া যায় যে, মুসলমানরা দীর্ঘকাল যাবত গ্রীক চিন্তাধারা ও খৃষ্ট ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। আল মামুন বাগদাদে পণ্ডিত ব্যক্তিদের একটি জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে গ্রীক জ্ঞান–বিজ্ঞানের চর্চা ও গ্রীক রচনার অনুবাদ ব্যাপকভাবে অব্যাহত থাকে। অনুবাদ কার্যের দায়িত্বে নেস্টোরিয়ান[২] চিকিৎসাবিদ হুনাইন ইবনে ইসহাক আল ইবাদী (৮০৯–৭৩) এবং তার পরিবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। হুনাইন কেবল বাগদাদেই জ্ঞান সাধনা করেননি। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে

---

১. দ্রষ্টব্য পৃ. ২৭৮

২. ধর্মদ্রোহিতার দায়ে বিতাড়িত সিরীয় বিশপ ও কনস্টান্টিনোপলের আর্চবিশপ (৪২৮–৪৩১) নেস্টোরিয়াসের মতবাদের অনুসারী; এই মতবাদের মূলকথা হচ্ছে, যীশু খৃষ্টের মধ্যে আল্লাহ ও মানুষের দুটি বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটলেও তা একক সত্তায় রূপায়িত হয়নি।–অনুবাদক।

www.waytojannah.com

প্রাচীন বিশ্বের সর্বপ্রকার জ্ঞান আহরণের জন্য এবং গ্রীকভাষা সম্পর্কে কার্যোপযোগী উত্তম জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য আলেকজান্দ্রিয়ার পথে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন সফর করেন। আরবীতে চিকিৎসাশাস্ত্র ও অঙ্কশাস্ত্রের গ্রন্থাবলী অনুবাদ ছাড়াও হুনাইন *অ্যারিস্টটলের ক্যাটিগোরিজ, ফিজিক্স* ও *ম্যাগনা মোরালিয়া* অনুবাদ করেন। তিনি প্ল্যাটোর *রিপাবলিক ল'জ* এবং টিমায়ুসও অনুবাদ করেন, যদিও এ গুলির অনুবাদ সব সময় পূর্ণাঙ্গ ছিল না। তাঁর পুত্র ইসহাক (মৃ ৯১০) সম্ভবত *মেটাফিজিক্স, ডি অ্যানিমা, ডি জেনারেশন এট করাপশন* এবং হার্মেনিউটিক্স এবং সে সঙ্গে আফ্রোডিসিয়াসের আলেকজান্ডার ও অন্যদের ভাষ্যগুলিও আরবীতে অনুবাদ করেন। এগুলির সঙ্গে হুনাইনের ভ্রাতুষ্পুত্র হুবাইশের অনূদিত গ্রন্থগুলি যোগ করা হলে আরবী ভাষার বাইরে সমসাময়িক জ্ঞানভাণ্ডারের তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু অবশিষ্ট থাকে না। ক্লাসিক্যাল যুগের কাব্য, নাটক ও ইতিহাসের প্রতি আরবদের তেমন আগ্রহ ছিল না।

এ পর্যন্ত কোন স্বাধীন চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায় না এবং এ গুলিকে 'আরব দর্শন' বলারও কোন যুক্তি নেই। জ্যাকবাইটরা এদের প্রতিষ্ঠিত অনুবাদ চর্চার ধারা অব্যাহত রাখেন। কেবল একটি ক্ষেত্র ছাড়া তাদের স্বাধীন মূল্যবোধের দাবি তাদের পূর্ববর্তীদের চাইতে উন্নততর ছিল না। এই ব্যতিক্রম হচ্ছে আত্মা ও সত্তার পার্থক্য সম্পর্কে জনৈক কুস্তা ইবনে লুকা রচিত একটি গ্রন্থ। ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হওয়ার পর এই গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য অবদান সৃষ্টি করে।

আরবদের প্রথম ও সর্বশেষ দার্শনিকের রচনা এই যুগেরই আওতায় পড়ে, তিনি হচ্ছেন আবূ ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আলকিন্দি। তাঁর পরিবারের মূল আবাস ভূমি আরব উপদ্বীপের দক্ষিণাঞ্চল। ৮৫০ খৃস্টাব্দে তিনি কুফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং বসরা ও বাগদাদে শিক্ষা লাভ করেন। মূল ভাষায় তার রচনা খুব বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় না, কিন্তু ক্রেমোনার জেরার্ড ও অন্যান্যের ল্যাটিন অনুবাদে যথেষ্ট পরিমাণে তা দেখা যায়। এখানে আমরা অঙ্কশাস্ত্র, জোতিষশাস্ত্র, আলকেমী ও আলোক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করবো না। তার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে তাঁর নামে ও কর্তৃত্বে অনূদিত একটি গ্রন্থ, যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের পরবর্তী সামগ্রিক ধারাকে প্রভাবিত করে। অবশেষে সেন্ট টমাস অ্যাকিনাস এটিকে দর্শনের ক্ষেত্র থেকে বিতাড়নের প্রয়াস পান এবং এ ব্যাপারেও তিনি আরব সূত্রেরই সাহায্য গ্রহণ করেন। আলোচ্য গ্রন্থে আরবীতে নিম্নোক্ত রচনাসমূহের সমাবেশ ঘটেছে ঃ 'দার্শনিক অ্যারিস্টটলের বইয়ের প্রথম অধ্যায় যাকে গ্রীক ভাষায় *থিওলোজিয়া* (উসূলূজিইয়া) বলা হয় এবং যাতে রবুবিয়ত বা পালনবাদ (রুবূবিইয়া) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। টায়ারের (লেবানন) অধিবাসী প্রফিরিয়াসের ভাষ্য যা এমেসার আবুল মাসিহ্ ইবনে আবদুল্লাহ না'ঈমা আরবীতে অনুবাদ করেন, এবং যা আবূ ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক

www.waytojannah.com

আল–কিন্দী (তাঁর উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক!) আহমদ ইবনে আল মু'তাসিম বিল্লাহর জন্য মূল রচনার সঙ্গে মিলিয়ে সংশোধন করেন।[১] এর থেকে একথা পরিষ্কার যে, এই বইটি মূলত অ্যারিস্টটলের রচনা বলে দাবি করা হলেও এর মধ্যে সমাবিষ্ট লেখা সম্পর্কে প্রকাশ্যে বলা হয়েছে যে, এটি প্রফিরির একটি ভাষ্য। সম্ভবত পরবর্তী সময়ে *থিওলোজি* তখনি অ্যারিস্টটলের বলে দাবি করা হয়েছে যখন নিওপ্লাটোনিজমের আধ্যাত্মিক প্রবণতা ইসলামে দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত হয় এবং যখন আল–ফায়লাসূফ (অতুলনীয় দার্শনিক) হিসাবে অ্যারিস্টটলের কর্তৃত্ব সর্বেসর্বা ছিল। বইটি কোন দিক দিয়েই ভাষ্য নয়। বরং প্লটিনাসের *ইনিয়াডের* (নবগ্রন্থ) ৪র্থ–৬ষ্ঠ খণ্ডের উপর ভিত্তি করে রচিত।

এই বইতে উল্লেখিত আত্মা সম্পর্কিত মতবাদগুলি বিভিন্ন ব্যক্তিগত সংশোধনীর মাধ্যমে আরব দর্শনের ধারার মধ্য দিয়ে যেভাবে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যেতে পারে। আত্মা *(নাফ্‌স্‌)* একটি খাঁটি বুদ্ধিসত্তা *(জাউহার 'আকলি)* যা অশরীরী এবং অমর। এ বুদ্ধির জগৎ থেকে অনুভূতি ও বাস্তবতার জগতে অবতীর্ণ হয়েছে। এই বুদ্ধিসত্তা চিরন্তনভাবে বুদ্ধির জগতে বাস করে। সেখান থেকে তা বিলীন হতে পারে না। কিন্তু এটি যখন তার মধ্যে উপস্থিত আকারসমূহ সৃষ্টির ইচ্ছা পোষণ করে তখন তার খাঁটিত্ব ও আবেগহীন চিন্তাশক্তি হ্রাস পায়। এটি যে পর্যন্ত অনুভূতির জগতে তার ইচ্ছা পূরণ না করে সে পর্যন্ত ইচ্ছা বেদনার জন্ম দেয়। আত্মা এই ইচ্ছা দ্বারা গঠিত। তাই আত্মা হচ্ছে চিন্তাশক্তি ঃ কখনও এটি একটি দেহের অভ্যন্তরে থাকে এবং কখনও দেহের বাইরে থাকে। এই বিশ্বে চিন্তাশক্তি আত্মার মাধ্যমে সক্রিয় হয়। সকল প্রাণীর আত্মা 'একটি ভুল পথ গ্রহণ করেছে।' একটি উদ্ভিদ–আত্মাও রয়েছে যা জীবন দ্বারা বিভূষিত। এটিও অন্যান্য আত্মার ন্যায় একই সূত্র থেকে উৎসারিত হয়। মানব আত্মার তিনটি অংশ রয়েছে ঃ উদ্ভিদ, প্রাণী ও বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন। দেহ বিনাশের পর আত্মা দেহ ত্যাগ করে। যে খাঁটি আত্মা নিজেকে বিশ্ব থেকে অদৃশ্য রেখেছে সেটি তৎক্ষণাৎ কোন প্রকার বিলম্ব না করে বুদ্ধিসত্তাসমূহে ফিরে যাবে। অপরদিকে যেসব আত্মা এই বিশ্বে নিজেদের কলুষিত করেছে এবং দেহের আকাঙ্ক্ষার বস্তু হয়েছে সেগুলি কষ্টকর প্রচেষ্টার পর কেবল তাদের মূল অবস্থা লাভ করবে। আত্মা যখন বুদ্ধির জগতে ফিরে আসে তখন কি স্মরণ করে, এই প্রশ্নের জবাবে জবাব দেওয়া হয় যে, এটি কেবল তাই চিন্তা করে ও করে যা ঐ বিশ্বে উপযুক্ত। এটি তার পূর্ববর্তী কাজকর্ম, পূর্ববর্তী ইচ্ছা বা পূর্ববর্তী দর্শন স্মরণ করবে না তার প্রমাণ হচ্ছে যে, তার দৃষ্টি যখন স্বর্গীয় বিশ্বের ওপর নিবদ্ধ থাকে তখন এই বিশ্বেও এটি অস্থায়ী ব্যাপারসমূহের প্রতি কোন আগ্রহ দেখায় না। স্বর্গীয় জগতে সর্ব প্রকার জ্ঞান সময়ের উর্ধ্বে, তাই আত্মাও সময়ের উর্ধ্বে। অতএব এই বিশ্বে যেসব জিনিস চিন্তা করা হয় আত্মাও সময়ের উর্ধ্বেই তা জানে।

---

১. সম্পাদনা ঃ এফ ডাইটিরিচি, লিপযিগ, ১৮৮৩।

www.waytojannah.com

আত্মার কার্যক্ষমতা একটি সহজ সত্তার প্রতিফলন, এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে আত্মার বিভিন্নমুখী কার্যক্রমকে যুক্তি হিসাবে খাড়া করানো যায় না। আত্মার কার্যক্রম বিভিন্ন সময়ে প্রতিভাত হয়, কারণ দৈহিক সত্তাগুলি এর কার্যক্রম এক এবং একই সময়ে গ্রহণ করতে পারে না। চিন্তাশক্তি হচ্ছে সবকিছু এবং এর সত্তা সবকিছু উপলব্ধি করে, তাই এটি যখন তার নিজস্ব সত্তা দেখে তখন সব কিছু দেখে।

আল্লাহ্ বুদ্ধির কারণ, বুদ্ধি আত্মার কারণ, আত্মা স্বভাবের কারণ, আর স্বভাব সকল প্রকার স্বতন্ত্র জিনিসের কারণ। একটি জিনিস আরেকটি জিনিস ঘটাতে পারলেও আল্লাহই সবকিছুর কারণ, কেননা তিনিই হচ্ছেন কারণের স্রষ্টা। রুক্ষ পাথরের সঙ্গে খোদাই করা পাথরের যে সম্পর্ক অনুভূতি এবং বুদ্ধির দুটি জগতের মধ্যেও তেমনি সম্পর্ক। আত্মার মধ্যে যে সৌন্দর্য নিহিত সেখান থেকে স্বভাবের মধ্যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়।

অপ্রধান কারণসমূহের ফল তারকা জগতের কোন ইচ্ছা থেকে আসে না। দেহ আত্মার হাতিয়ার মাত্র। আত্মার জন্য দেহের যখন আর কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না তখন আত্মা দেহ ত্যাগ করে এবং দেহ ধ্বংস ও বিচ্ছিন্ন হয়। আত্মার কারণেই মানুষ যা আছে তাই হয়েছে। আত্মা চিরকাল একই অবস্থায় থাকে। কখনো কলুষিত বা বিলুপ্ত হয় না।

অ্যারিস্টটলের সূত্র থেকে যেসব ধ্যান–ধারণা নেওয়া হয়েছে এগুলি তার কয়েকটি মাত্র। এখানে একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষণীয় যে, পরবর্তী আরব দার্শনিকরা এমন একটি দলিলের প্রামাণিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার কথা চিন্তা করেননি যাতে এমন বহু বিবরণী রয়েছে যা তারা স্বেচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করেন। অ্যারিস্টটলের মতবাদের প্রামাণ্য সূত্রের এই বিকৃতি প্রাচ্য থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পাশ্চাত্যে বিভ্রান্তি ও মতানৈক্যের সৃষ্টি করে। সেন্ট টমাস এই অবস্থা থেকেই খৃস্টান জগতকে মুক্ত করেন। অবশ্য অ্যারিস্টটলের মতবাদের অংশ হিসাবে প্রচলিত একটি সামগ্রিক ব্যবস্থা যে সন্দেহ ও জটিলতার সৃষ্টি করে তার থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে বহু লোক তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য নিওপ্ল্যাটোনিক মতবাদে নিহিত অধ্যাত্মবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অপর দিকে অসংলগ্ন দর্শনের টুকরো টুকরো সংযোজনের ফলে আন্তরিকভাবে সত্যাসুসন্ধানী মুসলমানদের মনে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় তার থেকেই তারা তাদের এতসব লেখকের প্রচারিত দর্শনের প্রতি ঘৃণা ও অসহনশীল মনোভাব পোষণ করেন।

দার্শনিক (ফায়লাসূফ, বহুবচনে ফালাসিফা) বলতে আরবরা এমন সব লোক মনে করতেন যাদের প্রাথমিক ব্যাপার ধর্মতত্ত্ব নয়, বরং দর্শন। আল–শাহ্রাস্তানী (মৃ. ১১৫৩) বলেছেন যে, দু–একটি বিষয় ছাড়া সকল ক্ষেত্রে তারা অ্যারিস্টটলের পন্থা অনুসরণ করেছেন এবং সে দু–একটি বিষয়ও তারা প্ল্যাটো ও প্রাচীনতর দার্শনিকদের কাছ থেকে ধার করেছেন। নিওপ্ল্যাটোনিক মতবাদসমূহকে বাস্তবিকই অ্যারিস্টটলের মতবাদ বলে মুসলমানদের যে বিশ্বাস ছিল তার আলোকে এই বক্তব্য বিচার করতে হবে।

www.waytojannah.com

আল–শাহরাস্তানী তাঁর আরব দার্শনিকদের তালিকা আলকিন্দী ও হুনাইন ইবনে ইসহাক থেকে শুরু করে আবূ আলী ইবনে সিনায় শেষ করেন। তিনি বলেন, অধিকাংশের মতে ইবনে সিনার অন্তর্দৃষ্টি ও বিচারশক্তি সবচাইতে তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি যদি আরো কিছুকাল বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনি নিঃসন্দেহে এই সঙ্গে অ্যারিস্টটলের সবচাইতে বিজ্ঞ ভাষ্যকার স্পেনীয় দার্শনিক ইবনে রুশদের (মৃ ১১৯৮) নাম যোগ করতেন। এঁদের পদার্থ বিদ্যা অ্যারিস্টটলের চার কারণের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। যেসব আকার ও বৈশিষ্ট্যের দ্বারা জীবের পার্থক্য করা যায় তারা তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং এসব আকার ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তারা জীবের মূলনীতি আবিষ্কারের চেষ্টা করেন।

বিশ্বজগত সম্পর্কে আল–কিন্দীর নিজস্ব মতবাদ *দি থিওলোজি অব অ্যারিস্টটল* (অ্যারিস্টটলের ধর্মতত্ত্ব)–এর অনুরূপ ছিল। স্বর্গীয় বুদ্ধিমত্তাই বিশ্বের অস্তিত্বের কারণ ঃ এর কার্যকলাপ স্বর্গীয় মণ্ডলসমূহের মাধ্যমে পার্থিবজগতে প্রতিফলিত হয়। বিশ্ব–আত্মা আল্লাহ ও জীবের বিশ্বের মাধ্যম। এই বিশ্ব–আত্মাই স্বর্গীয়মণ্ডলসমূহ সৃষ্টি করেছে। মানব আত্মা বিশ্ব–আত্মারই একটি নিঃস্বরণ। তাই মানুষের মধ্যে একটি দ্বিত্ব রয়েছে ঃ আত্মা যতক্ষণ পর্যন্ত দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তা স্বর্গীয় মণ্ডলের দ্বারা প্রভাবিত হয়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত এটি তার আধ্যাত্মিক মূল উদ্ভবের প্রতি অনুগত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্ত ও স্বাধীন। স্বাধীনতা এবং অমরত্ব উভয়টি কেবল বুদ্ধির জগতেই লাভ করা যায়। তাই সেটি লাভ করতে হলে মানুষকে আল্লাহ ও বিশ্ব সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে বুদ্ধি শক্তির বিকাশ সাধনে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

অসাধারণ তথ্যাভিজ্ঞ জীবনীকার ইবনে খাল্লিকানের মতে প্রাথমিক মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন আল–ফারাবী (মৃ ৩৩৯ হিঃ, ৯৫০ খৃ.)। তিনি মূলত ছিলেন তুর্কী। তিনি অ্যারিস্টটলের ওপর এবং তার স্বধর্মাবলম্বীরা প্ল্যাটোর যেসব রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন সেগুলির ওপর অত্যন্ত সরসভাষ্য রচনা করেন। তাঁর *দি সোল, দি ফ্যাকাল্টিজ অব দি সোল* এবং *দি ইন্টেলিজেন্স*–এর উপর রচিত গ্রন্থগুলি ল্যাটিনভাষীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। আল–কিন্দী ও আল–ফারাবী *ইনটেলেক্টাস অ্যাজেন্স্*–এর সমস্যাটি তাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যান। অ্যারিস্টটল তার মানবিক মনের মতবাদকে তাঁর ক্ষমতা ও কাজ এবং সম্ভাবনা ও বাস্তবতার বৈষম্যের মতবাদের আওতায় নিয়ে আসেন। তাঁর কাছে মানবিক কারণ (মধ্যযুগে এটিকে *ইনটেলেকটাস* বলা হতো) কেবল জ্ঞানের একটি সক্ষমতা ছিলো ঃ কখনো এটি জানে বা চিন্তা করে এবং কখনো করে না। তাহলে এমন একটি প্রকৃত কিছু অবশ্যই আছে যা সম্ভাবনাময় মানবিক চিন্তাশক্তিকে বাস্তবতায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এবং এটি অবশ্যই স্বয়ং *আল–ফা'আল* (সক্রিয়) চিন্তাশক্তি। কিন্তু এই সক্রিয় বা সৃজনশীল চিন্তা শক্তি কি ? মানব আত্মার সঙ্গে, যে বুদ্ধিমত্তা পরিমণ্ডলকে পরিচালিত করে তার সঙ্গে এবং আল্লাহর সঙ্গে এর কি সম্পর্ক ?

www.waytojannah.com

আল-ফারাবী চিন্তা শক্তিকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন, ক্ষমতায় নিহিত চিন্তা-শক্তি, কাজে নিহিত চিন্তাশক্তি, অর্জিত চিন্তাশক্তি এবং মাধ্যম চিন্তাশক্তি। তৃতীয়টির দ্বারা তিনি বোধগম্য ব্যাপারসমূহ উপলব্ধির মুহূর্তে চিন্তাশক্তির সক্রিয় অবস্থা বোঝাতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। মাধ্যম চিন্তাশক্তি দ্বারা তিনি বস্তুর মধ্যে অবস্থান করে না এমন একটি খাঁটি আকার বুঝিয়েছেন। এটিই সম্ভাবনাময় চিন্তাশক্তিকে বাস্তবে এবং বোধগম্য সম্ভাবনাকে প্রকৃত উপলব্ধিতে পরিণত করে।

প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার আগে একথা বলা যেতে পারে যে, ইবনে রুশদের মতে সক্রিয় চিন্তাশক্তি এবং সম্ভাবনাময় চিন্তাশক্তি সকল মানুষের মধ্যে এক। এ ধরনের বিশ্বাস ব্যক্তিগত অমরত্ব ও স্বতন্ত্র সত্তার বিনাশমূলক। সেন্ট টমাস অ্যাকিনাস এর ঘোর বিরোধিতা করেন। তার মতে সম্ভাব্য বা সম্ভাবনাময় চিন্তাশক্তি এবং সেসঙ্গে সক্রিয় চিন্তাশক্তি প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তির আত্মার একটি অংশ, তাই মানব জাতির সমষ্টির মধ্যে সক্রিয় চিন্তাশক্তি ও সম্ভাব্য চিন্তাশক্তির সংখ্যা একই রকম। ইবনে সিনা আল-ফারাবীর অনুসরণে সকল মানুষের মধ্যে সম্ভাবনাময় চিন্তাশক্তি না হলেও সক্রিয় চিন্তাশক্তির ঐক্যের পক্ষে অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু সেন্ট টমাস অ্যাকিনাস যথার্থভাবেই দেখেছিলেন যে, এটি স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকের নিজস্ব কাজের ওপর তার নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

আল-ফারাবীর মধ্যে আমরা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের পক্ষে ঐসব যুক্তি দেখতে পাই, যেগুলি *টিমায়স* ও *মেটাফিজিক্স* থেকে উদ্ভূত। মুসলমানদের সর্বপ্রকার পণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় কষ্টসাধ্যভাবে বারবার এগুলির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এগুলি হচ্ছে প্রয়োজনীয় ও সম্ভাবনাপূর্ণ, সীমাহীনভাবে ধারাবাহিক কারণের অসাধ্যতা এবং এর মধ্যে ও এর পক্ষে আবশ্যিকভাবে নিহিত প্রথম কারণের স্বতঃসিদ্ধতা। আল-ফারাবী, 'বিশ্ব অনাদি' এই মতবাদের একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন, কিন্তু ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্মমতে এরূপ ধারণা পাপ। তিনি সবকিছুকে একত্রিত রাখার গতি হিসাবে সময়ের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা উল্লেখযোগ্য।

আল-ফারাবী থেকেও পাশ্চাত্যে অনেক বেশি পরিচিত একটি নাম হচ্ছে ইবনে সিনা (আবূ আলী আল হুসায়ন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সিনা, ৯৮০-১০৩৭)। তাঁর পরিবার বুখারা থেকে আসে। মৃত্যুর পর দার্শনিক রচনার চাইতে চিকিৎসা বিষয়ক রচনার জন্য তিনি সমধিক খ্যাতি লাভ করেন। তিনি জনপ্রিয় রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং যেকোন বিষয়কে নিজস্ব পন্থায় সংক্ষেপে ও সুষ্ঠুভাবে বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে পারতেন। এ কারণেই তিনি ইবনে রুশদের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত পাশ্চাত্যে আরব দার্শনিক চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হিসাবে যথার্থভাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ল্যাটিনভাষীরা আবূ রুশদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে ইবনে সিনাকে জানতেন। টলেডোর আর্চবিশপ রেমণ্ড ১১৩০ ও ১১৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, তাঁর আর্কডিকন ডোমিনিক গুণ্ডিসালভাস ও সেভিলের

www.waytojannah.com

জুয়ান আভেলডেথকে এসব রচনা অনুবাদের নির্দেশ প্রদান করেন। ইবনে সিনার রচনা সাধারণভাবে তাঁর পূর্ববর্তীদের অনুরূপ হলেও তাঁর মতবাদসমূহ অনেক বেশি সুস্পষ্টভাবে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। খাঁটি বুদ্ধিসমূহ প্রয়োজনীয় অস্তিত্ব থেকে উৎসারিত হয়েছে। এগুলি সহজ সারবস্তু এবং পরিবর্তনশীল নয়। এসব সুন্দর জিনিস সব সময় প্রয়োজনীয় অস্তিত্বের দিকে ফিরেছে। তারা অনন্তকাল পর্যন্ত স্বর্গীয় ধ্যানের জ্ঞানদীপ্ত আনন্দে বিভোর থেকে সেই অস্তিত্বের অনুকরণের চেষ্টা করেছে। ইবনে সিনা তাঁর পূর্ববর্তীদের মতবাদের যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন তা পাশ্চাত্যে অত্যন্ত শক্তিশালী প্রভাব সৃষ্টি করে এবং তাঁর রচনাসমূহ ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হওয়ার পরই এই প্রভাব সৃষ্টি হয়।[১]

ইবনে সিনা পাশ্চাত্যকে যে অসংখ্য শব্দ ও ধ্যান–ধারণা দিয়ে গেছেন তার একটি হচ্ছে *ইনটেনশিও*[২]। এর আরবী শব্দ হচ্ছে *মা'কুলাত*, অর্থাৎ চিন্তাশক্তি দ্বারা যা বোঝা যায়, বোধগম্য ব্যাপারসমূহ। ইনটেনশন্স' (অভিপ্রায়সমূহ) দুই প্রকারের ঃ কোন জিনিসের প্রাথমিক ধারণা, যেমন একটি গাছ এবং বিশ্বজগতের জটিল ধারণার আলোকে কোন জিনিসের দ্বিতীয় যা যৌক্তিকতামূলক ধারণা। ইবনে সিনার মতে দ্বিতীয় অভিপ্রায় হচ্ছে যুক্তির বিষয়, যার মাধ্যমে মানুষ জানা থেকে অজানার পথে এগিয়ে যায়। এই মতবাদকে অবলম্বন করে আলবার্টাস্ ম্যাগনাস[৩] জ্ঞানদীপ্ত দার্শনিক ঐতিহ্যের অন্যতম ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিচিত হন।

ইবনে সিনা তার নিজের জন্য ও ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য এমন একটি সমস্যা তুলে ধরেন যাতে তাঁর নিপুণ উদ্ভাবন শক্তির চূড়ান্ত প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি এই মূলনীতি নির্ধারণ করেন যে, এক ও অবিভাজ্য থেকে কেবলমাত্র এক অস্তিত্বের উদ্ভব হতে পারে।[৪] তাই এরূপ বক্তব্য অনুমোদনযোগ্য নয় যে, আকার ও বস্তু সরাসরি আল্লাহ্ থেকে উদ্ভুত হয়; কারণ তাতে এরূপ মনে করার অবকাশ রয়েছে যে, স্বর্গীয় সত্তার দুটি পৃথক আকৃতি রয়েছে। বস্তুত, বস্তু আল্লাহ্ থেকে আসছে এরূপ চিন্তা করা উচিত নয়। কেননা এটিই হচ্ছে বহুত্ব ও বিভিন্নতার মূলনীতি।

ইবনে সিনা আবারো বলেন, আমরা এরূপ বলতে পারি না যে, একটি প্রয়োজনীয় অস্তিত্ব কোন চূড়ান্ত কারণ না থাকার দরুন এই অর্থে একটি উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবিত হয় যে, সে নিজের কারণের চাইতে অন্য কিছুর কারণে কাজ করছে। যদি সে তাই করতো তাহলে তার কাজে এমন একটি অস্তিত্বের বিবেচনা প্রাধান্য পেতো যা তার চাইতে

---

১. তুলনা, *লেগ্যাসি অব ইসরাইল*, পৃ. ২১১।

২. এই শব্দটি সম্পর্কে নিউ ইংলিশ ডিক্‌শনারির সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩. মূল নাম আলবার্ট ভন বল্‌ফুস্টাট ((১১৯৩?–১২৮০); ব্যাভেরিয়ার জ্ঞানদীপ্ত দার্শনিক ঃ তাঁকে ইউনিভার্সাল ডক্টর বলা হতো। –অনুবাদক।

৪. নিঃসন্দেহে এই মতবাদের এবং অন্যান্য বহু মতবাদের সূত্র প্লটিনাস। প্লটিনাস নিজেও একত্ব থেকে বহুত্বের নিঃসরণ প্রদর্শনের অসুবিধা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

www.waytojannah.com

নিকৃষ্টতর। তাহলে সেক্ষেত্রে স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্য সৃষ্টির প্রয়োজন হতো ঃ (ক) জিনিসের ভালো গুণ যার জন্য সেটি বাঞ্ছিত; (খ) সেই ভালো গুণের স্বর্গীয় জ্ঞান, এবং (গ) সেই ভালো গুণ অর্জন বা সৃষ্টির স্বর্গীয় অভিপ্রায়। অতএব, প্রয়োজনীয় অস্তিত্ব স্বরূপ আল্লাহ্ এবং বহুত্বের বিশ্বের মধ্যে মাধ্যম হিসাবে কোন কিছু স্বতঃসিদ্ধভাবে থাকতে হবে। তাই সমস্যাটি হচ্ছে, একটি জটিলতাপূর্ণ বিশ্বজগত ও একজন সহজ স্রষ্টাকে কিভাবে বুঝতে হবে।

ইবনে সিনা প্রয়োজন ও সম্ভবের ধারণার সঙ্গে চেতনা ও জ্ঞানের ধারণার সমন্বয়ের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। প্রথমটি খাঁটি চিন্তাশক্তির সূচনা করে এবং প্রথম অস্তিত্ব থেকে তার অস্তিত্ব লাভ করে। কাজেই এটি প্রয়োজনীয়। কিন্তু এটি স্বয়ং সম্ভাব্য ব্যাপার, কেননা প্রথম কারণের কারণ ঘটানোর কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। এভাবে বিশ্বজগতে একটি দ্বিত্বের উদ্ভব হয় যার দ্বারা প্রথম কারণ ব্যাহত হয়নি। এবং এই দ্বিত্ব থেকে ত্রিত্বের আবির্ভাব ঘটে। সেখান থেকে ক্রমান্বয়ে নিঃসরণ আসতে থাকে, যার সমাপ্তি ঘটে চন্দ্রের পরিমণ্ডলে। সেখানে চাঁদের চিন্তাশক্তি একটি সর্বশেষ খাঁটি চিন্তাশক্তির জন্ম দেয় এবং এর থেকেই মানুষের আত্মা ও চারটি উপাদানের সূচনা হয়। এখানেই ইবনে সিনা গুরুতর অসুবিধার সম্মুখীন হন। তিনি যে মূলনীতিকে পরিমণ্ডলে স্থাপন করেন তা হারিয়ে ফেলেন। আর সেই মূলনীতি হচ্ছে, 'এক থেকে কেবলমাত্র একই এগিয়ে যেতে পারে।' উপাদানগুলি একটি সাধারণ স্তর। সমন্বিত হওয়ার দরুন বস্তুগতভাবে এক হতে পারে, কিন্তু সেগুলির আকার কি? তিনি 'চারটি উপাদানের' অস্তিত্ব খাঁটি বুদ্ধিশক্তির অভ্যন্তরে একটি জ্ঞানের মধ্যে আরোপ করেছেন, যেখানে তারা আল্লাহর চিন্তায় চার। তাঁর মূলনীতিকে রক্ষার প্রচেষ্টায় এবং একই সময়ে বহুত্বের অবকাশ রাখার জন্য ইবনে সিনা এরূপ মতবাদের অবতারণা করেন যে, বস্তুকে কোন একটি বিশেষ আকার দেওয়ার জন্য 'প্রস্তুত' বা 'বিন্যাস' করা হয়েছে। পরিমণ্ডলসমূহের গতির মাধ্যমে এই বিন্যাস এমনভাবে সূচিত হয়েছে যে, যে বস্তুটি তার যথাযথ আকার স্থাপন করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, আকার শুধুমাত্র তাকে অধিকার বা গ্রহণ করে। বহু মুসলিম দার্শনিকের মতে সৃষ্টির ক্রম এভাবে গঠিত হয়েছে ঃ

'প্রথম মূলনীতি' অর্থাৎ আল্লাহ।

'প্রথম চিন্তাশক্তি' এর অস্তিত্ব ও মূল জানা।

'দ্বিতীয় চিন্তাশক্তি'.....	নবম পরিমণ্ডলের (ক) আত্মা
(ক) প্রয়োজন	ও (খ) অবয়ব।
(খ) সম্ভব	
হিসাবে এটিকে জানা।	

www.waytojannah.com

Contents

'তৃতীয় চিন্তাশক্তি'...... (ক) প্রয়োজন (খ) সম্ভব হিসাবে এটিকে জানা।	শনির পরিমণ্ডলের (ক) আত্মা ও (খ) অবয়ব
এবং এমনিভাবে যে পর্যন্ত	
'চন্দ্রের পরিমণ্ডল'.........	চন্দ্রের পরিমণ্ডলের আত্মা ও অবয়ব
'সক্রিয় চিন্তাশক্তি'.........	মানবিক আত্মা ও চারটি উপাদান।

জ্ঞান চর্চার অগ্রগতি সম্পর্কে পূর্ব ধারণা থাকা সত্ত্বেও রজার বেকন তাঁর সময়ে দার্শনিক জ্ঞানের অবস্থা সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন (১২৯২) তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। 'অ্যারিস্টটলের দর্শনের অধিকাংশ (পাশ্চাত্যে) কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। তার কারণ পাণ্ডুলিপিসমূহ অজ্ঞাত ও অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ছিল, অথবা বিষয়বস্তু দুর্বোধ্য বা বিস্বাদ ছিল, কিংবা প্রাচ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল। মুসলিম যুগ পর্যন্ত এই অবস্থা অব্যাহত থাকে এবং এই যুগে ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ ও অন্যরা অ্যারিস্টটলের দর্শনকে ব্যাপকভাবে তুলে ধরেন। বোইথিয়াস গ্রীক ভাষা থেকে তর্কশাস্ত্র ও অন্যান্য বিষয়ের কিছু কিছু রচনা অনুবাদ করলেও মাইকেল দি স্কট নিজস্ব বিশ্লেষণসহ অ্যারিস্টটলের 'প্রকৃতি' ও 'মেটাফিজিক্স' সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহের কোন কোন অংশ অনুবাদ করার পর তার সময় থেকেই ল্যাটিনভাষীদের কাছে অ্যারিস্টটলের দর্শন অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে দেখা দেয়। তাঁর বিশাল ও ব্যাপক জ্ঞানের ধারক হাজার হাজার গ্রন্থের মধ্যে খুব সামান্যই বর্তমান সময়ে (ঐ সময়) পর্যন্ত ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং তারও কম বিষয় সাধারণভাবে ছাত্রদের কাজে লাগছে। অ্যারিস্টটলের অনুকরণকারী ও ব্যাখ্যাতা এবং দর্শনশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ইবনে সিনা বিশেষভাবে দর্শন সম্পর্কে তিন খণ্ডে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তাঁর *দি সাফিসিয়েন্সি* (প্রাচুর্য) গ্রন্থের ভূমিকায় একথা উল্লেখ করেছেন। একটি অ্যারিস্টটলের জ্ঞান বিতরণ কেন্দ্রের পেরিপ্যাটিটিক[১] দার্শনিকদের প্রামাণ্য বিবরণের ন্যায় জনপ্রিয় ছিল। দ্বিতীয়টি সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন যে, দর্শনের খাঁটি সত্য অনুযায়ী যা 'বিরুদ্ধবাদীদের বর্শার আঘাত কে ভয় করে না'। জীবনসায়াহ্নে সমাপ্ত তৃতীয়টিতে তিনি প্রথম দিকে লিখিত গ্রন্থগুলি বিশ্লেষণ করেন এবং প্রকৃতি ও শিল্পের অধিকতর অস্পষ্ট বাস্তব দিকগুলির সমাবেশ ঘটান। এসব বইয়ের মধ্যে দুটি অনূদিত হয়নি। ল্যাটিনভাষীরা 'আস্‌সিফা' (বা 'আসসেফা') তথা *বুক অব সাফিসিয়েন্সি*[২] নামে পরিচিত গ্রন্থটির কয়েকটি অংশ পেয়েছেন। তাঁর পরে আসেন সুদৃঢ় জ্ঞানের অধিকারী ইবনে রুশ্‌দ। তিনি তাঁর পূর্বসূরিদের বহু বক্তব্য

১. অ্যারিস্টটলের যেসব অনুসারী তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের সময় 'লাইসিয়াম' নামে এথেন্সের একটি উদ্যানে ইতস্তত বিচরণ করতেন। – অনুবাদক।
২. এটি একটি ভুল অনুবাদ। আমার মনে হয় ডি এস মার্গোলিয়োথ সম্পাদিত অ্যানালেকটা ওরিয়েন্টালিয়া গ্রন্থে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম লিবার স্যানাশনিস নামে সঠিক শিরোনাম প্রদত্ত হয়।

www.waytojannah.com

সংশোধন করেন এবং নিজে বহু নতুন দর্শন তত্ত্ব তুলে ধরেন। কিন্তু কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর লেখারও সংশোধনী দরকার এবং বহু ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের প্রয়োজন। অবশ্য "ইকলিযিয়াসটিযে"[১] হযরত সুলাইমানের উক্তি অনুযায়ী "বহু বই তৈরির ব্যাপারে এর কোন শেষ নেই"।[২] বেকনকে একজন তীক্ষ্ণ কটুভাষী মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে এবং তিনি কোন কোন সময় তাঁর যুগের জ্ঞানের সঙ্গে তাল বজায় রাখতে গিয়ে অবশ্যই ব্যর্থ হয়েছেন। এতদসত্ত্বেও তার অব্যবহিত পূর্ববর্তীকাল সম্পর্কে তাঁর এই বক্তব্যের মূল্য রয়েছে।

মুসলিম স্পেন প্রাচ্যের মুসলমানদের বিবদমান সবগুলি সম্প্রদায়ের একটি বিশ্বস্ত দর্পণ ছিল। দার্শনিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের বিভিন্নতা যেভাবে গ্রীক রীতিনীতির প্রাচীন কেন্দ্রগুলিকে উত্তপ্ত করে তোলে এখানেও তেমনি ধরনের বহু বিতর্কের সৃষ্টি হয়। তাই এখানে আবশ্যিকভাবে ঐসব চিন্তা নায়কের কিছু কিছু বিবরণ তুলে ধরা দরকার, যাদের শিক্ষা প্রাথমিক স্পেনীয় দর্শন ও জ্ঞান চর্চায় গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে। বেকনের কোন কোন বক্তব্য এখনো যথার্থ। মুসলিম দর্শনের একটি ইতিহাস লেখার এখনো সময় আসেনি। এমনকি ইউরোপ ও মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন লাইব্রেরির সংশ্লিষ্ট উপাদান সম্বলিত সবগুলি পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করে পণ্ডিত ব্যক্তিদের হাতে দেওয়ার পরও, এগুলির বিষয়ভিত্তিক বিবরণ তৈরি ও বিস্তারিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর সুবিশাল বিষয়বস্তুর সাধারণ পর্যালোচনার ভিত্তি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। বর্তমানে আমাদের জ্ঞানে বহু শূন্যতা রয়েছে। এগুলি ধীরে ধীরে পূরণ হচ্ছে। কিন্তু মধ্যযুগীয় আরব দর্শনের প্রায় প্রতিটি বিষয় নতুন করে আমাদের অবগতিতে আসার সঙ্গে সঙ্গে তা পাশ্চাত্যের মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা বিকাশের ওপর নতুন নতুন আলোক সম্পাত করে। মুসলিম প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সঙ্গে ধর্মীয় বন্ধনে এমন ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ হয় যা রাজনৈতিক অনৈক্য ছিন্ন করতে পারেনি। একসময় যখন পাশ্চাত্যের ইসলাম প্রাচ্যের ধ্যান-ধারণার প্রবাহের জন্য উন্মুক্ত হয় তখন চিন্তাধারা ও জ্ঞান চর্চার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এমন একটি ঐক্য তথা সাধারণ স্বার্থ গড়ে ওঠে যা বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের বিচ্ছিন্ন জ্ঞানসাধকদের সমঝোতার একটি জ্ঞানদীপ্ত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে। ইউরোপ বর্তমানে এ ধরনের বন্ধন হারিয়ে ফেলেছে। মুসলিম *ফ্যাচজেনোসেন* (ভ্রাতৃত্ব বন্ধন?) একটি সাধারণ ভাষায় চিন্তা করার, লেখার ও কথা বলার এক অকল্পনীয় সুবিধা ভোগ করে, তাই আমাদেরকে স্পেনের মুসলিম চিন্তানায়কদের--যাঁরা হিজরীর তৃতীয় শতকের আগে সক্রিয় হননি--পূর্ববর্তী অবস্থা--প্রাচ্যে অনুসন্ধান করতে হবে।

---

১. হযরত সুলায়মান কর্তৃক লিখিত ওল্ড টেস্টামেন্টের একটি গ্রন্থ।–অনুবাদক
২. ফিলোসফিএই, ১৩ শ।

www.waytojannah.com

স্পেনে খৃস্টান যাজক সম্প্রদায় দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেন, তাই খৃস্টানরা অভিযানকারী মুসলমানদের শিক্ষক হওয়ার পরিবর্তে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 'মুযারেবিক'[১] সাহিত্য অত্যন্ত দুর্বল ও ক্ষয়শীল ছিল, তাই সেখানে মধ্যযুগীয় জ্ঞান চর্চার বীজ অনুসন্ধানের চেষ্টা বৃথা। স্পেন প্রায় তিন শতাব্দীকাল পর্যন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠাবান মুসলিম দেশ ছিল, এবং মু'তাযিলা পন্থী আল জাহিযের রচনাকালের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে কোন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মতাত্ত্বিক বা যুক্তিভিত্তিক জ্ঞানচর্চার সন্ধান পাওয়া যায় না। আল–জাহিয প্রাচীন বিশ্বে পরিচিত প্রায় সকল বিষয়ে অত্যন্ত চিন্তাশীল গ্রন্থ রচনা করেন। যেসব স্পেনীয় আরব প্রাচ্যে তাঁর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য শুনতেন তাঁরা তাঁকে স্পেনে নিয়ে আসেন। অচিরেই অধিকতর চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মু'তাযিলা মতবাদে আকৃষ্ট হন এবং ধর্মীয় নিষ্ঠামূলক শিক্ষা সমালোচনার সম্মুখীন হয়।

হিজরীর প্রথম শতক থেকেই মানুষের ইচ্ছার সঙ্গে আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতার সম্পর্ক নিয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়। আমাদের নিজস্ব 'পেলেজিয়াস'[২] এই সমস্যাটি তুলে ধরেন এবং এতো গভীরভাবে আলোচনা করেন যে, তার প্রচারিত মতামত শীঘ্রই একটি নতুন ধর্মদ্রোহিতার পর্যায়ে পৌছে। গ্রীক ধর্মতাত্ত্বিকরা এই সমস্যাটিকে সামগ্রিকভাবে একটি বিতর্কমূলক বিষয় হিসাবে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেন। 'পূর্ব নির্ধারণ' ও 'স্বাধীন ইচ্ছা' অত্যন্ত বিতর্কমূলক প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। এখান থেকেই এটি একটি সংক্রামক ব্যাধি হিসাবে মুসলিম ধর্মমতে প্রবেশ করে। যারা এরূপ অভিমত পোষণ করেন যে, আল্লাহ্ মানুষের কাজ পূর্ব–নির্ধারণ করতে পারেন না, কারণ তিনি একটি নৈতিক সত্তা যাকে অবশ্যই যা ন্যায্য তা করতে হয়, তারা মু'তাযিলা বা বিচ্ছিন্নতাবাদী রূপে পরিচিত। যারা কুরআন ও হাদীসের প্রতি অকুণ্ঠ নিষ্ঠামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে পরবর্তীকালে তাদেরও এই নামে অভিহিত করা হয়। প্রাচ্যে এসব উদারনৈতিক ধর্মতাত্ত্বিকদের ভাগ্যে কি ঘটেছে তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু পরবর্তীকালের যে মুসলিম চিন্তাধারা পশ্চিম ও দক্ষিণ ইউরোপে প্রবেশ করে সেই চিন্তাধারাকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কতটা প্রভাবিত করেছে তা আমরা আলোচনা করবো। আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতার চিরন্তন মূলনীতির ন্যায় কতিপয় মতবাদে অবিচলতা সভ্য জগতে মু'তাযিলাদের বিরাট অবদান সৃষ্টির ক্ষেত্রে ততোটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেনি[৩], বরং ধর্মতত্ত্ব মনের অনুসন্ধানের বিষয় হওয়া উচিত, তাদের এই দাবিই সেখানে সব চাইতে বেশি অবদান রেখেছে। 'সর্ব মহান

১. স্পেনে মুসলিম শাসনাধীন খৃস্টানদের আরবী ভাষা। –অনুবাদক।
২. চতুর্থ শতাব্দীর বৃটিশ সন্ন্যাসী; তিনি মৌল পাপের মতবাদ অস্বীকার করে এরূপ মতবাদ প্রচার করেন যে, মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা রয়েছে। –অনুবাদক।
৩. এ ক্ষেত্রে তারা কোন নতুনত্বের প্রবর্তক ছিলেন না, বরং সাদেক বা ন্যায়পরায়ণতার একটি প্রাচীন সেমিটিক ধারণা তুলে ধরেন। এই ধারণা একত্ববাদের চাইতেও অনেক প্রাচীন। মুতাযিলা নাম দ্বারা মূলত এমন ব্যক্তিকে বোঝাতো যার মতে একজন মরণশীল পাপী বিশ্বাসীদের সংঘবদ্ধতা থেকে 'বিচ্ছিন্ন' হয়।

www.waytojannah.com

আল্লাহ বলেছেন', এরূপ উক্তি দ্বারা তাদের মুখ বন্ধ করা যেতো না। তারা বরং 'আল্লাহ' ও 'বলেছেন' এই দুটি কথার তাৎপর্য দাবি করতেন। চরমপন্থীরা এ ধরনের মনোভাবের মধ্যে বিপদ দেখতে পান এবং তারা মু'তাযিলাদের প্রশ্ন করার প্রসঙ্গটিকে এতদূর টেনে নিয়ে যান যে, তা অজ্ঞেয়বাদ বা প্রকাশ্য নাস্তিকতার পর্যায়ভুক্ত হয়। ফিটস্‌জিরাল্ডের[১] বিখ্যাত চতুষ্পদীগুলিতে যে নৈরাশ্যবাদ অপরূপভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এদের অনেকেই সেই নৈরাশ্যবাদের শিকার হন। কিন্তু সন্দেহ ও নৈরাশ্যবাদ মনের এমন অবস্থার ইঙ্গিত দেয় যাকে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই ক্ষতিকর বলে মনে করে। কিন্তু মু'তাযিলাদের আন্দোলনের শক্তি তাদের মধ্যে নিহিত ছিল যারা ইসলামী ধর্মতত্ত্বকে একটি দৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠার জন্য সাধনা করেন। তাঁরা জোর দিয়ে বলেন যে, এর ভিত্তি যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, এবং তারা যাকে দর্শনের পরিপন্থী হিসাবে জানেন তার কোন কিছুই *ডি ফাইডি*[২] হিসাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। আমরা যদি আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে মু'তাযিলাদের বাদানুবাদের বিপুল রচনার মধ্যে শুধু নামের বিরোধ দেখি, তাহলে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গটিকে অত্যন্ত ছোট করে দেখা হবে। গিবনও খৃস্টান সম্প্রদায়কে একটি যুক্ত স্বরধ্বনির জন্য বিশ্বকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করার দায়ে অভিযুক্ত করে একইভাবে সেই প্রসঙ্গটিকে খাটো করে দেখেন।

কুরআন এর অনুসারীদের আল্লাহর একটি মতবাদের জন্য উপাদান সরবরাহ করেছেন একথা বলা যায় না।[৩] কুরআন আল্লাহকে 'জ্ঞানী', 'শক্তিশালী', 'জীবনদাতা' 'মৃত্যু আনয়নকারী' প্রভৃতি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এতে আল্লাহ্‌কে তাঁর 'আরশে' উপবিষ্ট বলা হয়েছে এবং তার প্রতি মানুষের গঠন আরোপ করা হয়েছে। মু'তাযিলারা এ ধরনের বর্ণনাকে আলঙ্কারিক বলে মনে করেন,—-মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে আল্লাহর প্রতি নিছক মানবত্ব আরোপ। 'ক্ষমতা', 'ইচ্ছা', 'জ্ঞান', 'শ্রবণ', 'দর্শন', 'বাকশক্তি' ও 'জীবন' এই সাতটি প্রশংসাসূচক বৈশিষ্ট্যকে পৃথক পৃথক গুণাবলী রূপে স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যেভাবে আরোপ করা হয়েছে তাকে বহুদেববাদের সমতুল্য বলে নিন্দা করেছেন। কেউ কেউ এতোটা পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছেন যে, আল্লাহর প্রতি কোনকিছু আরোপ করা যায় না। অন্যরা কেবল এসব গুণের কোন কোনটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। স্পেনীয় আরবদের জ্ঞান সাধনার কাছে অত্যন্ত ঋণী ডান্‌য স্কোয়েসের মতে 'প্রথম সত্তা' জীবন্ত, সক্রিয়, বুদ্ধিমান এবং ইচ্ছাশক্তির অধিকারী ছিল।

বাকশক্তির অধিকারী আল্লাহ বলতে কি বোঝায়, এরূপ আলোচনা মৌলিক হয়ে পড়ে এবং এর ফলে মু'তাযিলাদের ওপর পার্থিব হাতের দমনক্রিয়া প্রবল হয়ে ওঠে।

---

১. ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত অনুবাদকারী ইংরেজ কবি।– অনুবাদক।

২. মূলত ল্যাটিন শব্দ, যার অর্থ–বিশ্বাস, কিন্তু রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় এতদ্বারা এমন একটি সত্য বোঝায় যাকে প্রত্যাদেশ হিসাবে গণ্য করা হয়।– অনুবাদক।

৩. অভিমতটি একান্তভাবে লেখকের।– অনুবাদক।

www.waytojannah.com

মু'তাযিলারা যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, বাকশক্তি যদি একটি স্বর্গীয় গুণ হয়ে থাকে তাহলে তা অবশ্যই চিরন্তন এবং সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টির আগে তার অস্তিত্ব ছিল। অন্যথায় আল্লাহ যখন সময়মত কথা বলেন, তখন তাঁর মধ্যে এই পরিবর্তন আসে যে, 'তিনি' আগে যা ছিলেন না 'তিনি' তা হয়েছেন, এবং আল্লাহ সম্পর্কে 'হওয়া' আরোপ করা যায় না। অতএব, বাকশক্তি বা কথা যদি স্বর্গীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহর বাণী হিসাবে কুরআন অবশ্যই সৃষ্টি-পূর্ব। কিন্তু তা অসম্ভব, কারণ এটি প্রকাশ্যত সৃষ্ট বিশ্বের একটি জিনিস, যথাসময়ে ও যথাস্থানে প্রকাশিত ও লিখিত হয়েছে। এরূপ ইঙ্গিত কখনো কখনো তার দেশভিত্তিক এবং সম্পূর্ণ স্থানীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আয়াতসমূহে পাওয়া যায়। আল্লাহ্র গুণাবলী তাঁর অস্তিত্বের অনুরূপ এবং তাঁর সৃষ্ট জীবের সঙ্গে 'তাঁর' সম্পর্কে সৃষ্টি ও সংরক্ষণের ন্যায় কতিপয় কার্য পরিচালনামূলক বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটালেও সেগুলি কেবল সময়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

খলীফা আল মামুন নিজেও মু'তাযিলা ছিলেন। তিনি একটি সময়ের জিনিস হিসাবে কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। দুর্ভাগ্যবশত মু'তাযিলারা যখন ক্ষমতাসীন ছিলেন তখন অসহনশীল মনোভাব প্রদর্শন করেন। যেসব নিষ্ঠাবান মুসলমান পূর্ব থেকে কুরআনের অস্তিত্বের মতবাদে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন এবং মহানবীর বিপুল সংখ্যক *হাদীস* অনুসরণে এর সুষ্ঠু আক্ষরিক বিশ্লেষণ দান করেন, মু'তাযিলারা তাদের ওপর নির্যাতন চালান। এই একই নির্যাতন পরবর্তীকালে তাদের ওপরও আপতিত হয়।

অবশ্য হিজরী চতুর্থ শতকে এটা যথেষ্ট পরিমাণে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, মু'তাযিলাদের দাবির ব্যাপারে কিছুটা সুযোগ দেওয়া দরকার। মানুষের মনে কিছুটা অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়, তাই প্রচলিত দর্শনের আলোকে বিশ্বাসের মতবাদসমূহ পুনঃ পর্যালোচনা জরুরী হয়ে পড়ে। দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তারা গোঁড়া মতবাদমূলক *কালাম* বা জ্ঞানদীপ্ত দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। এঁরা হচ্ছেন বাগদাদের আবুল হাসান আল আশ'আরী[১] (আনু. ৯৩২) এবং সমরকন্দের আবুল মনসূর আল-মাতুরিদি (মৃ ৯৪৪)। *কালাম* একটি কল্পনামূলক বিজ্ঞান। এতে একান্তভাবে না হলেও বিশেষভাবে ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাপার আলোচনা করা হয়। *মুতাকাল্লিমুন* অর্থাৎ *বক্তাগণ* এবং সেন্ট টমাসের ভাষায় *লকুয়েন্টিজ কালাম*-এর নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দেন ঃ 'বিশ্বাসের মূলনীতিসমূহের এবং ধর্মতাত্ত্বিক গুণাবলীর সমর্থনে জ্ঞানদীপ্ত প্রমাণসমূহের বিজ্ঞান।' মূলত *মুতাকাল্লিমুন* শব্দটি নিষ্ঠামূলক ও অনিষ্ঠামূলক নির্বিশেষে যেকোন মতবাদের লোকদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হতো। কিন্তু

১. আল-আশ'আরী নিজস্ব পন্থায় যে ব্যবস্থা তুলে ধরেন তা সর্বপ্রথম জার্মানীতে প্রকাশিত হয়। এটি পণ্ডিতদের হাতে না আসা পর্যন্ত আল-আশ'আরী তার নিজস্ব মতবাদ কতোটা সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা সম্ভবপর নয়।

www.waytojannah.com

Contents

পরবর্তীকালে যারা ইসলামের নিষ্ঠামূলক দিকের অবিচল সমর্থক ছিলেন তাদের ক্ষেত্রে এই শব্দটি বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হয়।

মু'তাযিলা মতবাদ বহু বছর পর্যন্ত স্পেনে অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি, কারণ জনসাধারণের মনে এরূপ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, এটি ধর্মদ্রোহিতামূলক। তাছাড়া একটি ফাতিমীয় গোপন সংগঠন সমগ্র মুসলিম চিন্তাধারার জন্য বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। ফলে দার্শনিকরা গোপনে দর্শন চর্চা করতে বাধ্য হন। স্পেন ইবনে মাসাররা, ইবনুল আরাবী ও ইবনে রুশ্দ নামক যে তিনজন প্রভাবশালী চিন্তানায়কের জন্ম দেয় তাদের উপর নিও-প্ল্যাটোনিক, সুডো-এসপেডোক্লিয়ান[১] ও অ্যারিস্টটলিয়ান রচনার সূত্র থেকে আগত দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব পর্যালোচনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। এদের মধ্যে প্রথম দুজন ছিলেন অধ্যাত্মবাদী। তারা খৃস্টান সন্ন্যাসীদের সূত্র থেকে লব্ধ তাদের প্রাচ্যের স্বধর্মাবলম্বীদের কঠোর সাধনার পথ অবলম্বন করেন এবং এর সঙ্গে একটি সর্বেশ্বরবাদী কল্পনামূলক দর্শনের সংমিশ্রণ ঘটান।

এঁদের মধ্যে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসাররা ২৬৯ হিজরীতে তথা ৮৮৩ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কর্ডোভার অধিবাসী আবদুল্লাহ মু'তাযিলা মতবাদের উৎসাহী অনুসারী ছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে তিনি তাঁর মতবাদ গোপন রাখেন। পুত্রের বয়স যখন তরুণ তখন তিনি ইন্তিকাল করেন, কিন্তু তার আগেই তিনি পুত্রের মধ্যে কল্পনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও কঠোর সাধনামূলক জীবনের প্রেরণা সৃষ্টি করে যান। তাই ইবনে মাসাররা তাঁর বয়স ত্রিশ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই সিয়েরা ডি কর্ডোভার পার্বত্য অঞ্চলে গমন করেন এবং সেখানে শিষ্যবর্গ পরিবৃত হয়ে গূঢ় ধর্মতত্ত্ব পর্যালোচনা ও প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। পার্থিব ক্ষমতার ভয়ে গোপনীয়তা অবলম্বনের ফলে তাঁর মতবাদ এমন এক গভীরতা লাভ করে যা অধিকতর ব্যাপকভাবে প্রচারিত মতবাদে কদাচিৎ দেখা যায়। এর ফলে ইবনে মাসাররা ও তার মতবাদ পরবর্তী শতকসমূহে একটি স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করে। যথাসময়ে জানাজানি হয়ে পড়ে যে, ইবনে মাসাররা যেখানে গিয়ে আস্তানা প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেখান থেকেই ইসলামের মৌলিক ধারণার পক্ষে বিপজ্জনক মতবাদ প্রচারিত হচ্ছে। তাই নাস্তিকতার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার আশংকায় ইবনে মাসাররা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে মক্কায় হজ্জ যাত্রার অজুহাত প্রদর্শন করে দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সহনশীল ও বিদ্যোৎসাহী তৃতীয় আবদুর রহমান মসনদে আরোহণ না করা পর্যন্ত তিনি আরব থেকে স্পেনে প্রত্যাবর্তন করেননি। তিনি যখন আর একবার একজন শিক্ষাগুরু হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তখন তার শিক্ষার গূঢ়তামূলক বৈশিষ্ট্য আরো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বহির্বিশ্বের কাছে তিনি এমন একজন ধার্মিক

---

১. এম্পেডোক্লিজ নামক খৃ. পূ. ৫ম শতকের জনৈক গ্রীক দার্শনিকের কল্পিত দার্শনিক মতবাদ। –অনুবাদক

www.waytojannah.com

ও কঠোর সংযমী তাপস ছিলেন, যিনি গভীর অনুতাপমূলক সাধনা ও ভক্তির পথ অনুসরণ করেন। তাঁর সাধারণ শ্রোতাদের কাছে তিনি এমন একজন অধ্যাত্মবাদী ছিলেন, যার উক্তিসমূহ সর্বপ্রকার নিষ্ঠাহীন বক্তব্য থেকে মুক্ত ছিল। কিন্তু তাঁর প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত আভ্যন্তরীণ ভক্তদের মহলে তিনি গূঢ় সত্যের এমন একজন গুরু ছিলেন যার বক্তব্যে গভীর ও রহস্যজনক তাৎপর্য ছিল। এই বক্তব্য শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক নির্ধারিত ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারেন। ইবনে মাসাররা পাশ্চাত্যে সর্বপ্রথম ইচ্ছাকৃতভাবে সাধারণ কথাসমূহের অস্পষ্টতামূলক ব্যবহার প্রবর্তন করেন এবং তাঁর এই দৃষ্টান্ত পরবর্তীকালের অধিকাংশ মরমী লেখক অনুসরণ করেন। তাঁর পদ্ধতি এতটা সার্থক হয় যে, তিনি যখন ৯৩১ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন তখন সন্দেহাত্মক ধর্মতত্ত্বের গুরু হিসাবে নয়, বরং মহান সাধক ও কঠোর ধার্মিক হিসাবে তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেন।

ইবনে মাসাররার কোন লিখিত রচনা পাওয়া যায় নি ; কিন্তু জনৈক বিজ্ঞ স্পেনীয় প্রাচ্যতত্ত্ববিদ তাঁর ব্যবস্থার মৌল বৈশিষ্ট্যগুলি সমন্বিত করার উদ্দেশ্যে এর উপাদান সংগ্রহ করেন।[১] এসব উপাদান থেকে দেখা যাবে যে, ইবনে মাসাররা এমপেডোক্লিজের প্রচারিত দর্শনের একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। মুসলমানরা এমপেডোক্লিজকে গ্রীসের সাতজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের প্রথম হিসাবে মনে করেন। রূপকথা অনুযায়ী তিনি হযরত দাউদ, হযরত সুলায়মান ও হযরত লুকমানের একজন শ্রোতা ছিলেন। তাই নীতিমূলক বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ হিসাবে তাঁকে নির্ভরযোগ্য ধারায় বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেন। অথচ তার জন্ম হয় যথা সময়ের বাইরে।

নিওপ্ল্যাটোনিজম সম্পর্কে ইবনে মাসাররার মতবাদ ও প্রাচ্যের মতবাদের প্রধান পার্থক্য আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রথম বস্তু হিসাবে একটি 'প্রধান বস্তু বা উপাদানের' (*উনসুর* বা *আল হাইয়ুলা আল আউয়াল*) স্বতঃসিদ্ধতায় নিহিত। এই উপাদানটি আধ্যাত্মিক এবং এর প্রতীক হচ্ছে আল্লাহর সিংহাসন।

ইবনে মাসাররা যেসব ধ্যান–ধারণা সর্বপ্রথম পাশ্চাত্যে প্রচার করেন, তা পরবর্তী শতকগুলিতে বিপুল প্রভাব সৃষ্টি করে। মালাগার আভিসেব্রোন (ইবনে জাবিরোল, আনু. ১০২০–১০৫০ বা ১০৭০খৃ.), টলেডোর জুদাহ্ হা–লেভি, গ্রানাডার মোসেস ইবনে এজরা, কর্ডোভার জোসেফ ইবনে সাদিক, সামুয়েল ইবনে তিব্বন, শেম তোব ইবনে জোসেফ ইবনে ফালকিরা প্রমুখ ইহুদী পণ্ডিত এমপেডোক্লিজের কল্পিত দর্শনের প্রধান মতবাদগুলি অনুসরণ করেন। অবশ্য তারা ইবনে মাসাররার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় না।

---

১. প্রফেসর এম আসিন, আবেনমাসাররা ওয়াইসু এস কুয়েলা, মাদ্রিদ, ১৯১৪।

www.waytojannah.com

মধ্যযুগের ইহুদীদের দার্শনিক চিন্তাধারার বিষয় ইতিপূর্বে এই সিরিজের *দি লেগ্যাসি অব ইসরাইল*-এ (পৃ. ১৮৯ এফ) আলোচিত হলেও এখানে আরবদের কাছে ইহুদীরা কতোটা ঋণী তা আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত হবে। এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, অ্যারিস্টটলের কোন হিব্রু অনুবাদ কখনো হয়নি। ইহুদীরা আল ফারাবী, ইবনে সিনা এবং ইবনে রুশ্‌দের রচনাবলীর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যেই সন্তুষ্ট ছিল। ইহুদী জাতি আরব সংস্কৃতি দ্বারা কতো গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল এত দ্বারা তাই বোঝা যায়। হিব্রু পণ্ডিতগণ সম্ভবত অ্যারিস্টটলের আরবী অনুবাদের দিকে আড়ভাবে তাকান এবং উপরোল্লিখিত লেখকদের যে সব প্রকৃত অর্থবহ শব্দান্তর ও ভাষ্য স্বীকৃতি লাভ করেছে সেগুলি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মু'তাযিলারা বিশেষভাবে ইহুদী চিন্তাবিদদের উপর গভীর প্রভাব সৃষ্টি করেন। বস্তুত কোন একটি *কালাম* গ্রন্থের প্রসঙ্গ থেকে এর রচয়িতা ইহুদী না মুসলমান তা বলা কোন কোন সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। আল্লাহ্ সম্পর্কে আশ'আরীর যে নিষ্ঠামূলক অভিমতে প্রাকৃতিক বিধিসমূহের কার্যক্রম এবং কারণ ও ফলের সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করা হয়েছে তা খৃস্টানদের উপর যতোটা প্রভাব সৃষ্টি করেছে ইহুদীদের উপর তার চাইতে বেশি প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি।

সা'আদিয়া বেন জোসেক আল-ফাইয়ুমী (৮৯২-৯৪২) থেকে শুরু করে জোসেফ আলবো (১৩৮০-১৪৪৪) পর্যন্ত ইহুদী দর্শন তারা আরবদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যেসব সমস্যা ও যুক্তি লাভ করেছে সেগুলির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিল। যারা তাদের সময়কার দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে সাধারণভাবে তাল বজায় রাখেন তাদের কোন তালিকা দেওয়ার প্রয়োজন নেই।[১] এদের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন মোসেস মাইমোনাইডস (১১৩৫-১২০৪)। তাঁর আরব *মুতাকাল্লিমুন*-এর তীক্ষ্ণ সমালোচনা সেন্ট টমাস আকিনাস অবাধে ব্যবহার করেন। মাইমোন্যইড্‌স আল্লাহর অস্তিত্ব, একত্ব ও অনবয়বত্ব প্রমাণের জন্য পুনরায় অ্যারিস্টটল পর্যন্ত ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে আল-ফারাবী ও ইবনে সিনার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন।

আভিসেব্রোনের *ফন্স্ ভিটাই* গ্রন্থটি দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধে অ্যাভেনডিথ ও ডোমেনিক গুণ্ডিসালভাস কর্তৃক আরবী থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হওয়ার পর খৃস্টান পণ্ডিতদের একাংশের মধ্যে তিনি বিস্ময়কর খ্যাতি অর্জন করেন। ফ্রান্সিসকান পন্থীরা সামগ্রিকভাবে *ফন্স্ ভিটাই* দ্বারা প্রভাবিত হয়, কিন্তু ডোমিনিকানরা সেন্ট টমাস আকিনাসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এর মতবাদসমূহের তীব্র সমালোচনা করে। গুণ্ডিসালভাস স্বয়ং তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন। *দি ইউনিটেট* গ্রন্থে তিনি বিশ্লেষণ করেন যে, আল্লাহ ছাড়া প্রত্যেক জিনিসই বস্তু ও আকার দ্বারা গঠিত। *ডি প্রসেশান মুণ্ডি* ও *ডি অ্যানিমায়* তিনি

---

১. আরো দ্রষ্টব্য দি লেগ্যাসি অব ইসরাইল, পৃ ১৯২-২০২ এবং বিশেষভাবে পরবর্তী ৪৩৭।

www.waytojannah.com

স্পেনীয় আরব দার্শনিকদের সর্বেশ্বরবাদমূলক মতবাদসমূহ প্রচার করেন। *ফন্‌স্‌ ভিটাই* এতোটা বাদানুবাদের উর্ধ্বে ছিল যে, বহু খৃস্টান লেখক এর লেখককে একজন আরব মনে করতেন। অপরদিকে গিলম ডি'ওভার্নি মনে করতেন যে, তিনি আরব দর্শন সম্পর্কে গভীরভাবে অভিজ্ঞ একমাত্র খৃস্টান যিনি *ভারবুম ডি* মতবাদ সম্পর্কেও গভীর জ্ঞান রাখতেন। অবশ্য গিলম আধ্যাত্মিক সত্তাসমূহ বস্তুর দ্বারা তৈরি, আভিসেব্রোনের এই মতবাদের অনুসারী ছিলেন না। তাই যুক্তিযুক্তভাবেই এরূপ মনে করা যায় যে, আভিসেব্রোনের রচনার সঙ্গে আংশিক পরিচয়ের ভিত্তিতেই তিনি তাকে সবচাইতে মহান দার্শনিক বলে অভিহিত করেন।

হেইলসের আলেকজাণ্ডারও আভিসেব্রোনের প্রধান বস্তুর মতবাদ গ্রহণ করেন এবং বলেন যে, ফেরেশতারা বস্তু ও আকার দ্বারা গঠিত। স্পেনীয় ইহুদীর কাছে তিনি এই ধারণার জন্যও ঋণী যে, প্রত্যেক সক্রিয় ও নিষ্ক্রীয় সম্পর্ক যথাক্রমে আকার ও বস্তুর ইঙ্গিত দেয়।

আভিসেব্রোন তাঁর রচনার শিরোনাম প্রদান করেন *সোর্স অব লাইফ* (জীবনের উৎস), কারণ এতে সব ব্যাপারের পিছনে মূলনীতির একটি গূঢ় জ্ঞানের ইঙ্গিত রয়েছে বলে দাবি করা হয়। এই জ্ঞান মূর্খ ও নির্বোধদের কাছে গুপ্ত এবং যেসব দার্শনিক স্বর্গীয় রহস্য সম্পর্কে কল্পনা করেন তাদের কাছে প্রতিভাত। অতএব, বিশ্বজগতের বিশ্লেষণ বিভিন্ন জিনিসের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনার মাধ্যমে নয় বরং সেই মূলনীতির জ্ঞানের দ্বারা করা যায়, যে মূলনীতি অনুসারে সেগুলির উদ্ভব হয়েছে। বেকন আলোকপ্রদ জ্ঞানের ব্যাপার জানতেন এবং তিনি দর্শনকে একটি স্বর্গীয় আলোকের প্রভাবের মাধ্যমে উদ্ভূত হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন।

পেরিপ্যাটেটিক (অ্যারিস্টটলের দর্শন সংক্রান্ত) জ্ঞানচর্চার পুনরাবির্ভাবের ফলে স্পেনীয় আরব মতবাদের প্রতি বহু খৃস্টান পণ্ডিতের বিরোধিতা আরো শক্তিশালী হয়। যাঁরা ঐসব মতবাদের সমর্থক ছিলেন তাদের প্রাচীন ধর্মগুরুদের নির্ভরযোগ্য ধারা অনুসরণে উদ্যোগী হওয়ার জন্য বাধ্য করা হয়। তাই সেন্ট টমাস বহু যুক্তিতর্ক দিয়ে দেখান যে, সেন্ট অগাস্টিন আধ্যাত্মিক অস্তিত্বে সুস্পষ্টভাবে বস্তু আরোপ করেননি। তিনি সম্ভবত দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া শুধুমাত্র বাতিল করার উদ্দেশ্যে আভিসেব্রোনের মতবাদসমূহ বিশ্লেষণ করেন। তাঁর *ডি সাবস্ট্যানটিস সেপারেটিস* এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, আধ্যাত্মিক অস্তিত্বসমূহ বস্তুর তৈরি একথা প্রমাণ করা অসম্ভব, তিনি আল্লাহ্‌র অব্যবহিত সৃষ্টিমূলক কার্যকলাপের স্থলে নিঃসরণের মতবাদ প্রত্যাখ্যানের জন্য বহু যুক্তি তুলে ধরেন।

পাশ্চাত্যে বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করেছে এরূপ আরেকজন লেখক হচ্ছেন আবূ হামিদ ইবনে মোহাম্মদ আত্‌তুসী আল গায্‌যালী। ডাক নাম ছিলো *হুজ্জাতুল ইসলাম*, 'ইসলামের

www.waytojannah.com

Contents

নিঃসন্দেহ প্রমাণ'। তার বৈচিত্রময় জীবন জ্ঞানচর্চা ও ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে তার সময়কার অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। তিনি পালাক্রমে দার্শনিক, জ্ঞানসাধক, ঐতিহ্যবাদী, সন্দেহবাদী ও অধ্যাত্মবাদী ছিলেন। তাঁর আন্তরিকতা ও সুদৃঢ় নৈতিক উদ্দেশ্য প্রশ্নাতীত ছিল। তিনি স্বধর্মাবলম্বীদের মধ্যে নৈতিকতা বোধের উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য অব্যাহতভাবে যে সাধনা করে যান তার তুলনা তার জাতির মধ্যে বিরল। ইসলামে তাঁর মর্যাদা খৃষ্টান জগতে সেন্ট টমাস আকিনাসের মর্যাদার সঙ্গে কিছুটা তুলনীয়। তাঁর ধর্মতাত্ত্বিক গ্রন্থগুলি পাঠ করতে গিয়ে কিছুটা সচেষ্টভাবে স্মরণ করতে হয় যে, ত্রিত্ব (ট্রিনিটি) ও অবতারের (ইনকার্নেশন) প্রসঙ্গ বাদ দিলে তিনি একজন মুসলমান।

প্রাথমিক বয়সে তিনি ধর্মতত্ত্ব ও শরীয়তী চর্চাকে কর্ম জীবন হিসাবে গ্রহণ করেন। বিশ বছর বয়সের আগেই তিনি যেসব ধর্ম বিশ্বাসকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা হয়, সেগুলি সম্পর্কে প্রশ্ন করতে থাকেন এবং বিভিন্ন ধর্মতাত্ত্বিক সমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান কার্য শুরু করেন। নিশাপুরে তাঁকে অধ্যাপকের সহকারী নিয়োগ করা হয় এবং সেখান থেকে তিনি বাগদাদের নিযামী একাডেমীতে যোগদান করেন। এখানে একজন আইন বিশেষজ্ঞ হিসাবে তার ভাগ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে কয়েক বছর পর্যন্ত বিশ্বাস ও যুক্তির দ্বন্দ্বে জর্জরিত হওয়ার পর তিনি মানসিকভাবে অত্যন্ত ভেঙে পড়েন এবং নির্জনতা ও শান্তির সন্ধানে রাজধানী ত্যাগ করেন। সুশৃংখল চিন্তাশক্তি পুনরুদ্ধারের পর তিনি চারটি পন্থায় নতুন করে জ্ঞান সাধনা শুরু করেন যা তাকে সত্যের পথে পরিচালিত করে ঃ ১. জ্ঞানদীপ্ত ধর্মতত্ত্ব; ২. তা'লিম অনুসারী যারা একজন অভ্রান্ত গুরুতে বিশ্বাস করেন; ৩. 'অ্যারিস্টটলিয়ান' দার্শনিকবৃন্দ এবং ৪. সূফী বা আধ্যাত্মবাদী, যারা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্‌কে পরম আনন্দঘন মুহূর্তে আধ্যাত্মিকভাবে উপলব্ধি করা যায়। তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এর সবগুলি পন্থা অনুসরণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত একজন অধ্যাত্মবাদী হয়ে ওঠেন। আল গায্‌যালীর আধ্যাত্মিক তীর্থ ভ্রমণ এমন একটি চমকপ্রদ কাহিনী যা বিস্তারিত বিষয়ের মধ্যেই উপলব্ধি করা যায়। আমাদের কাছে এর গুরুত্ব হচ্ছে এই যে, আল গায্‌যালী দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের কতিপয় ব্যবস্থা সম্পর্কে নতুন করে পর্যালোচনা শুরু করেন এবং এই পর্যালোচনার ফল তার রচনায় প্রতিফলিত হয়। এসব রচনা ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। তর্কশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ও মেটাফিজিক্সের ওপর লিখিত তাঁর গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু দ্বাদশ শতকে টলেডোর অনুবাদকদের মাধ্যমে জানা যায়। কিন্তু আল-গায্‌যালীর মেটাফিজিক্স সম্পর্কিত বক্তব্য একই বিষয়ে আভিসেব্রোনের বক্তব্যের ন্যায় প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। শেষোক্ত বক্তব্য স্পেনীয় চিন্তাধারার প্রধান প্রবাহ হিসাবে ল্যাটিন পণ্ডিতদের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইবনে রুশ্‌দ ও সেন্ট টমাস কর্তৃক তার অসারতা প্রতিপন্ন না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

www.waytojannah.com

রেমাণ্ড লাল ও রেমাণ্ড মার্টিন নামে দুজন স্পেনবাসীর প্রসঙ্গ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। রেমাণ্ড লালের দর্শনের উৎস সম্পর্কে যে বিতর্ক দেখা দিয়েছে তা এই অধ্যায়ের শুরুতে যে বিষয়টির অবতারণা করা হয় তা সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে। স্পেনীয় প্রাচ্যবিদরা দাবি করেন যে, তারা রেমাণ্ড লালের রচনায় আরব প্রেরণার বহু দৃষ্টান্ত দেখতে পান। অপরদিকে কতিপয় আধুনিক ফরাসী পণ্ডিত জোর দিয়ে বলেন যে, তার ব্যবস্থার উৎস অগাস্টিনের মতবাদে এবং খৃষ্ট ধর্মের ক্লাসিক্যাল ঐতিহ্যে দেখতে পাওয়া যায়। যেখানে বাদানুবাদ তীব্র হয়ে ওঠে সেখানে 'সাধারণ জ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি' প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু সম্ভবত অনেকেই একমত হবেন যে, বাস্তব বিষয়গুলি এই অধ্যায়ের সাধারণ উপসংহারকে যথার্থ প্রমাণ করে ঃ খৃষ্টান ইউরোপে যে ক্লাসিক্যাল ঐতিহ্য বিলীন হয় কিংবা অস্পষ্টতায় ঢাকা পড়ে ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতায় তার পুনরাবির্ভাব ঘটে এবং আরবদের, অ্যারিস্টটলের ও প্রাচীন খৃষ্টান ধর্ম–গুরুদের রচনার উৎসাহমূলক চর্চার সূত্রপাত করে।

একটি *রিপ্রোচ ডি'অ্যারাবিজম'* (আরবদের নিন্দাবাদ?) লেখার প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে না, কারণ যারা অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রাচীনদের জ্ঞান–বিজ্ঞান মোটামুটিভাবে তুলে ধরেছেন খৃষ্টান পণ্ডিতরা তাদেরই সাহায্য সহায়তা গ্রহণ করেন। আরব পুনর্জাগরণ যুগের খৃষ্টানরা আরবদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণে কোন প্রকার কৃত্রিম লজ্জাবোধ করেননি। আবার ন্যায়নীতির খাতিরে একথাও স্বীকার করতে হয় যে, আরবরাও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্যের যতোটা গৌরব প্রদর্শন করা দরকার তার চাইতে বেশি প্রদর্শন করেননি। ল্যালের প্রায় সমসাময়িক আল সিরার ইবনে তুমলুস (মৃ. ১২২৩) কোন প্রকার অতি দাম্ভিকতা নিয়ে একথা বলেননি ঃ 'জ্যামিতি, পাটিগণিত, জোতির্বিজ্ঞান ও সঙ্গীতে মুসলিম জ্ঞানসাধকগণ তাদের প্রাচীন পূর্বসূরিদের অতিক্রম করে গেছেন। কিন্তু মানুষ বর্তমানে প্রাচীনদের তুলনায় পূর্ণতর জ্ঞানের অধিকারী একথা জোর দিয়ে বলা গেলেও ন্যায়ের খাতিরে আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, প্রাচীনদের অনেক রচনা স্বভাবত ধ্বংস হয়ে গেছে।' ইবনে তুমলুস যে বক্তব্য রেখেছেন আধুনিক পণ্ডিতরা তা অনুমোদন করেন।[১] তার অভিমতের মধ্য দিয়ে এমন একজন জ্ঞানসাধকের ন্যায়ানুগ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে যিনি পূর্বসূরিদের অবদানের নিন্দা না করে বরং তা বড় করে দেখান। মুসলিম চিন্তানায়করা প্রকৃত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যতোটা সাফল্য অর্জন করেছেন মেটাফিজিক্সের ক্ষেত্রেও ততোটা সাফল্য লাভ করেন, তার এই দাবি নিশ্চিত যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আরব পোশাকে অ্যারিস্টটলের মতবাদের কি অবস্থা হয়েছে তা আমরা দেখেছি।

১. ১০ম, ১১শ ও দ্বাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

www.waytojannah.com

আরব বলে অভিহিত করা যায় দার্শনিক মতবাদের এরূপ কোন উল্লেখযোগ্য প্রামাণ্য বিষয় না থাকায় অব্যবহিত পূর্ব সূত্রের প্রশ্নটি অযথা জটিলতা লাভ করে। লাল একটি প্রাচ্য জ্ঞানচর্চা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি আরবীতে লিখতেন এবং কথা বলতেন, তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল জ্ঞানদীপ্ত যুক্তির ভিত্তিতে স্যারাসেনদের চাইতে খৃষ্টানদের বিশ্বাসের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা এবং কথিত আছে যে, তিনি তিউনিসের আরবদের মধ্যে তার মতবাদ প্রচার করতে গিয়ে শহীদ হন--এই ব্যাপারগুলি যে কেউ বিবেচনা করবেন তিনি সম্ভবত এও অনুভব করবেন যে, লালের জীবন থেকে সরাসরি আরব প্রভাব বাদ দেওয়ার অর্থ তাঁর উচ্ছ্বাসময় সহানুভূতির ক্ষেত্রকে অযথা সঙ্কীর্ণ করা। তিনি এমন এক যুগে বাস করেন (১২৩৫–১৩১৫) যখন পাশ্চাত্য তার দর্শনের প্রকৃত উৎসের সন্ধানে পিছনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং তিনি মুসলিম দার্শনিকদের উপর কি পরিমাণে নির্ভর করেন তা কেবল চূড়ান্ত মৌল তথ্যের গভীর পর্যালোচনার মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব। তাঁর রচনার ধর্মতাত্ত্বিক বা গভীর ভক্তিমূলক ক্ষেত্রে তিনি অবশ্যই আরবদের কাছ থেকে অনেক কিছু ধার করেছেন। তাঁর *হাণ্ড্রেড্ নেম্‌স অব গড* (আল্লাহর শত নাম) সংক্রান্ত গ্রন্থটি একথাই প্রমাণ করে। অপর দিকে *ব্ল্যাংকোয়েনা* গ্রন্থে তিনি *মারবুট* বা দরবেশদের এরূপ পন্থা অনুমোদন করেছেন যেখানে কতিপয় শব্দের ছন্দমূলক আবৃত্তির (জেকর) মাধ্যমে উত্তেজক ভক্তি ও আনন্দাবিষ্ট অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাই অধিকতর স্বাভাবিকভাবে এরূপ অনুমান করা যায় যে, লাল যে ভাষা, অভ্যাস ও অস্তিত্বের আদর্শ প্রবর্তন করেছেন এবং এসব ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বে যা প্রচলিত ছিল তার মধ্যে সাদৃশ্যের পিছনে পূর্ববর্তী কালের খৃষ্টান সন্ন্যাসীদের প্রভাবের চাইতে তার সমসাময়িক মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনের প্রতি তার গভীর নিরীক্ষা ও আগ্রহই বেশি দায়ী।

ইউরোপে *'অর্ডার অব দি পিচার্স'* (ধর্ম প্রচারক সংস্থা) কর্তৃক ১২৫০ সালে টলেডোতে সর্বপ্রথম প্রাচ্য শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্মপ্রচারে শিক্ষার্থীদের যথাযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে এখানে আরবী এবং বাইবেল ও রাব্বিদের হিব্রু ভাষা শিক্ষা দেওয়া হতো। এই কেন্দ্রেরই সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন রেমাণ্ড মার্টিন। তিনি সেন্ট টমাসের সমসাময়িক ছিলেন। মার্টিন আরব লেখকদের সম্পর্কে এতোটা জ্ঞান অর্জন করেন যে, সম্ভবত আধুনিক যুগ পর্যন্ত এক্ষেত্রে আর কেউ তার সমকক্ষ ছিলেন না। তিনি কেবল কুরআন এবং হাদীসের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন না, আল ফারাবী থেকে শুরু করে ইবনে রুশদ পর্যন্ত প্রধান প্রধান মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদ এবং দার্শনিকদের রচনা থেকেও উদ্ধৃতি দেন। এসব উদ্ধৃতিতে তিনি তাদের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক মন্তব্য করেন। *সুম্মা কন্‌ট্রা জেন্টাইল্‌স্* এবং *সুজিও ফিডি এডভার্সাস মওরস* এট জুডাইডস *'অর্ডার অব দি প্রিচার্স'* প্রধানের আদেশে রচিত হওয়ায় এগুলির একটি সাধারণ সূত্র ছিল।

www.waytojannah.com

রেমান্ড মার্টিন আল গায্যালীর *তাহাফুতুল ফালাসিফা* বা 'দার্শনিকদের সামঞ্জস্যহীনতা'–এর তাৎপর্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন। মুসলিম দার্শনিক ও পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে যুক্তিমূলক এই গ্রন্থটি থেকে অনেকখানি তিনি তাঁর *পুজিও ফিডির* অন্তর্ভুক্ত করেন। এর পর থেকে খৃষ্টানরা তাদের বহু জ্ঞানগর্ভ রচনায় আল গায্যালীর *ক্রিয়েশিয়ো এক্সনি হিলো*–এর পক্ষে প্রদত্ত যুক্তিসমূহ, আল্লাহ সব খুঁটিনাটি বিষয়ও জানেন এরূপ প্রমাণ এবং মৃতব্যক্তির পুনরুজ্জীবনের মতবাদ তুলে ধরেন। রেমান্ড মার্টিন দার্শনিকদের প্রতি আল গায্যালীর আক্রমণ সংক্রান্ত অংশ *রুইনা সিউ প্রেইসিপিটিয়াম ফিলোসফারাম* অনুবাদ করেন। খৃষ্টান পণ্ডিতরা যখন থেকে আল–গায্যালীর রচনা পড়ার সুযোগ পান তখন থেকে তাঁর মানসিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি তাদের আকৃষ্ট করে। এখনো পর্যন্ত তাঁরা এসব রচনা অভিনিবেশ সহকারে পর্যালোচনা করেন। মার্টিনের *পুজিও* প্রাচ্যের জ্ঞান জগতে অবাধে বিচরণ করে, তাই এটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একজন আধুনিক পণ্ডিত শিক্ষিত পাঠকদের জন্য যেভাবে গ্রন্থ রচনা করেন, ঠিক তেমনিভাবে মার্টিন ওল্ড টেস্টামেন্ট, টালমুড এবং মাইমোনাইড্সের হিব্রু সংস্করণের হিব্রু ভাষা হিব্রুতেই দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরেন। আল গায্যালী, আররাযী এবং ইবনে রুশদের দৃষ্টান্তসমূহ তিনি ল্যাটিন ভাষায় তুলে ধরেন এবং যে গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেই গ্রন্থের নামও সব সময় উল্লেখ করেন।

আল গায্যালী অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ওহী, ইলহাম ও ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আরোপিত যুক্তির স্থান সম্পর্কেও একটি গ্রন্থ রচনা করেন।এতে প্রদত্ত যুক্তি ও সিদ্ধান্ত–সমূহের সঙ্গে সেন্ট টমাসের *সুম্মার* বহু সাদৃশ্য রয়েছে। এর একটি মাত্র ব্যাখ্যাই দেওয়া যেতে পারে। *সুম্মা কন্টা জেন্টাইলস* এবং *পুজিও ফিডি* উভয়টিই ডোমিনিকান সম্প্রদায়ের জেনারেল রেমান্ড ডি পিনাফোর্টের অনুরোধে লিখিত হওয়ায় তাদের একটি সাধারণ সূত্র রয়েছে। *সুম্মা* ও *পুজিওর* কোন কোন অধ্যায়ের সাদৃশ্য এই ইঙ্গিত প্রদান করে। অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ যে কয়েকটি প্রশ্নে সেন্ট টমাস ও আল–গায্যালী একমত সেগুলি হচ্ছে–– আসমানী বিষয়গুলি সম্পর্কে সত্য বিশ্লেষণ বা প্রদর্শনে মানবিক যুক্তির মূল্য, আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণের সম্ভাব্যতা ও আবশ্যকতার ধ্যান–ধারণা আল্লাহ্র পরিপূর্ণতায় 'তাঁর' একত্বের ইঙ্গিত, পরম সুখকর দৃষ্টির সম্ভাবনা, স্বর্গীয় জ্ঞান ও স্বর্গীয় সরলতা, *ভারবুম মেনটিস* হিসাবে আলাহ্র বাণী, নবীদের উক্তিসমূহের প্রমাণ হিসাবে অলৌকিক ব্যাপারসমূহ; মৃত্যু থেকে পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাস।

আমরা লক্ষ করেছি যে, সেন্ট টমাস মাঝে মাঝে বিভিন্ন মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদদের মতামত উল্লেখ করেছেন। তাই *কন্টা জেনটাইলসের* ৩য় খণ্ডের ৯৭ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন ঃ 'প্রথমত তাদের সেই ভুল যারা বলেন যে, সবকিছু কোন কারণ ছাড়া আল্লাহ্র শুধুমাত্র ইচ্ছার ফল। এটি স্যারাসেনদের আইনে *(উট রাব্বি ময়সিস ডিসিট)* মুসলিম

www.waytojannah.com

ধর্মতত্ত্ববিদদের *(লকুয়েন্টিয়াম)* ভুল। তাদের মতে আগুন কেন শীতল না করে উত্তপ্ত করে তার একমাত্র কারণ, সেটি আল্লাহ্‌র তেমন ইচ্ছা। দ্বিতীয়ত আমরা ঐসব লোকের ভুল অনুমোদন করি না যারা জোর দিয়ে বলেন যে, প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী আল্লাহর ব্যবস্থা থেকে কারণের উদ্ভব হয়।

সেন্ট টমাস মোসেসের (মাইমোনাইডস, গাইড টু দি পারপ্লেক্সড্) যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার থেকে একথা স্পষ্ট যে, এ ক্ষেত্রে আশ'আরী পন্থী ও মুতাযিলাপন্থীদের সম্পর্কে তার তথ্যের সূত্র সরাসরি আরবরা নন। কিন্তু উপরোল্লিখিত কারণে মাইমোনাইড্‌স্‌ই সম্ভবত তাঁর জানার একমাত্র সূত্র ছিল। বুদ্ধিদীপ্তির দিক দিয়ে আল গায্‌যালী এই অ্যাঞ্জেলিক ডক্টরের সমকক্ষ না হলেও তাদের মধ্যে অনেক কিছু সাধারণ ছিল। তাদের উদ্দেশ্য, তাদের সহানুভূতি, তাদের স্বার্থ মূলত একই ছিল। উভয়েই রায় দেওয়ার আগে বিরুদ্ধপক্ষের অনুকূলে বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করেন। উভয়ই তাঁদের বিশ্বাসের যুক্তিযুক্ত বক্তব্য তুলে ধরার জন্য সুস্মা পেশ করার যথাসাধ্য প্রয়াস পান। এবং উভয়েই আল্লাহ্‌র আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে সেই পরম আনন্দের সন্ধান পান, যা তাদের স্বীকৃতি অনুযায়ী তাদের পূর্ববর্তী সাধনায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।[১]

ইবনে বাজ্জা ও ইবনে তুফাইলের প্রসঙ্গে না গিয়ে আমরা উপসংহারে ইবনে রুশদের প্রসঙ্গ আলোচনা করবো *চেইল গ্র্যান কমেন্টো ফিও*। আবুল ওয়ালিদ ইবনে রুশদ (হিজরী ৫২০–৯৫ অর্থাৎ খৃ ১১২৬–৯৮) প্রাচ্যের চাইতে ইউরোপ ও ইউরোপীয় চিন্তাধারার সঙ্গে বেশি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইটালীতে তার প্রভাব ষোড়শ শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, এবং বিখ্যাত আচিল্লিনি ও পম্পোনায্‌যি বিতর্কের সূচনা করে। আধুনিক পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের উদ্ভব না হওয়া পর্যন্ত ইউরোপীয় চিন্তাধারায় ইবনে রুশদের মতবাদ একটি জীবন্ত প্রেরণা হিসাবে অব্যাহত থাকে। আরবী রচনা বিলুপ্ত হলেও ল্যাটিন ভাষা তার একাধিক রচনা সংরক্ষণ করেছে। ইউরোপে ইবনে রুশদের মতবাদ এক সময় সে যুগের প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিতদের আলোচ্য বিষয় ছিল, যদিও মুসলিম বিশ্বে তিনি কখনও নেতৃস্থানীয় মর্যাদা লাভ করতে পারেননি।

কর্ডোভার একটি আইনজীবী পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতামহ, পিতা এবং তিনি নিজে কর্ডোভার কাযী ছিলেন। আইন বিষয়ক দায়িত্ব সম্পাদনের অবসরে তিনি দার্শনিক গ্রন্থ ও ভাষ্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। কিছুকাল পর্যন্ত তিনি মরক্কোর রাজদরবারের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। কিন্তু ধর্মতত্ত্ববিদদের অব্যাহত বিরোধিতার ফলে তার পতন ঘটে। তাঁকে ধর্মদ্রোহী বলে অভিযুক্ত করা হয়, এমন কি ইহুদী হয়ে গেছেন বলে

১. সেন্ট টমাস ও আল গায্‌যালীর মধ্যে বুদ্ধিদীপ্তিতে কে বড় আল গায্‌যালীর সামগ্রিক রচনা পর্যালোচনার পরই তার যথাযথ মূল্যায়ন হতে পারে। তবে সাধারণ বুদ্ধিতে এটুকু বোঝা যায় যে, গায্‌যালীর প্রায় একশ বছরের পরবর্তী সেন্ট টমাস গায্‌যালীর দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছেন। –অনুবাদক।

www.waytojannah.com

দোষ চাপানো হয় এবং তাঁকে কর্ডোভা থেকে বহিষ্কার করা হয়। অবশ্য মৃত্যুর পূর্বে তিনি পুনরায় রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং তাঁকে মারাকেশে ডেকে পাঠানো হয়। সেখানে ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন। এখনো সেখানে তাঁর মাযার দেখা যায়।

ইবনে রুশদ কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এই মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করেন যে, দর্শনই সত্য এবং স্বর্গীয়ভাবে প্রতিভাত ধর্ম অসত্য। এজন্যে অন্য যে কারো ন্যায় ব্রাবান্টের সিগার দায়ী, কারণ তিনি যখন খৃষ্ট ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী একটি মতবাদ পেশ করেন তখন অ্যারিস্টটলকে এর সূত্র হিসাবে দাবি করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, অ্যারিস্টটলের ব্যাখ্যায় ইবনে রুশদের ভাষ্য দুর্বোধ্য। সিগারের মতে বিশ্বাস ও যুক্তি পরস্পর বিরোধী। ইবনে রুশদ প্রকৃতপক্ষে কি লিখেছেন এবং কি প্রচার করতে চেয়েছেন তার নির্ভুল ব্যাখ্যার অভাবে এটা অপরিহার্য ছিল যে, গির্জা কর্তৃপক্ষ সিগারের সঙ্গে তিনি যে সূত্র থেকে তাঁর মতবাদ গ্রহণ করেছেন তারো নিন্দা করেন। ফলে স্বাভাবিকভাবে ইবনে রুশদকেই ইবনে রুশদ মতবাদের প্রবর্তক মনে করা হয়। একইভাবে অতি সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত নেস্টোরিয়ান মতবাদের জন্য নেস্টোরিয়াস অপবাদের বোঝা বহন করেন। অ্যান্জেলিক ডক্টর তাঁর *ডি ইউনিটেট ইনটেলেক্টাস কনট্রা আভেরোইস্টস* গ্রন্থে এই মতবাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সোচ্চার ছিলেন যে, বুদ্ধির *ঐক্য পার র‍্যাশনেম* (যুক্তি হিসাবে) প্রয়োজনীয় হলেও *পার ফিডেম* (বিশ্বাস হিসাবে) দৃঢ়ভাবে পরিত্যাজ্য। ইবনে রুশদকে একজন ভুয়া পণ্ডিত হিসাবে চিহ্নিত করার পক্ষে এটিই যথেষ্ট ছিল। প্যারিসের বিশপ স্টিফেনের যে বিখ্যাত চিঠির ভূমিকায় ইবনে রুশদ পন্থীদের বহুল নিন্দিত ২১৯টি প্রস্তাবনা স্থান পায় তা স্বাধীন চিন্তা ও অবিশ্বাসের জনক হিসাবে ইবনে রুশদের উপর সীলমোহর অঙ্কিত করে।[১] অবশ্য সকল মানুষের মধ্যে আত্মা এক এবং এর অংশগুলি যেসব দেহে তারা বাস করে সেগুলির দ্বারা কেবল বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে। ইবনে রুশদের এই মতবাদ খৃষ্টান এবং মুসলমান সবার কাছে অভিশপ্ত মার্টিনের *পুজিওতে* প্রশ্নটি সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে।[২]

বর্তমানে ইবনে রুশদের রচনাবলী যখন পরীক্ষা করা সম্ভব এবং তিনি স্বয়ং তাঁর কথা বলতে পারেন তখন একথা পরিষ্কার যে, খৃষ্টান দেশসমূহে তথাকথিত ইবনে রুশদ বাদের জ্ঞানচর্চামূলক মর্যাদার জন্য তিনি আদৌ দায়ী নন, বরং একই আদর্শ, বিশ্বাসের একই সামঞ্জস্যতা এবং একই যুক্তির রক্ষাকর্তা হিসাবে ইবনে রুশদ ও সেন্ট টমাসের স্থান পাশাপাশি। তদুপরি মুসলিম পণ্ডিত ইতিপূর্বে যেসব যুক্তি প্রয়োগ করেন অ্যানজেলিক

---

১. তবুও দার্শনিক হিসাবে এবং অ্যারিস্টটলের ভাষ্যকার হিসাবে ইবনে রুশদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা উচিত। প্যারিসের যে বিশ্ববিদ্যালয় ইবনে রুশদের মতবাদের নিন্দা করে সেই একই বিশ্ববিদ্যালয় এক শতাব্দী পরে তার প্রাক্তন ছাত্রদেরকে পবিত্র শপথক্রমে ইবনে রুশদের বিশ্লেষণ ভুক্ত সেসব বিষয় শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দেয় যেগুলি অ্যারিস্টটলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ (কোড টেক্সাটাম অ্যারিস্টটেলিস এট সুই কমেন্টেটরিস.....ফার্মিটার এট ট্যাংকুয়াম সথেন্টিকাম অবজ্যার্ভেবিট)। রাশডাল, ইউনিভার্সিটিজ ১ম, ৩৬৮।

২. প্যারিস, ১৬৫১ পৃ. ১৮২।

www.waytojannah.com

Contents

পণ্ডিত স্বয়ং তার অনেকগুলি ব্যবহার করেন। ইবনে রুশদের *কিতাবুল ফালসাফা* এবং বিশেষভাবে তার *ফাসলুল মাকালী ফি মুওয়াফাকাতিল হিকমাতি ওয়াশ শারি'আ*[১]। শেষোক্ত শিরোনামের অর্থ 'দর্শন ও স্বর্গীয়ভাবে প্রতিভাত ধর্মের মধ্যে যে মিল রয়েছে তার একটি সত্যিকার ও বিশ্লেষণমূলক আলোচনা' এবং *তাহাফুতুত তাহাফুত* গ্রন্থে দার্শনিকদের প্রতি আল–গাযযালীর আক্রমণের যুক্তিপূর্ণ জবাবের সংশ্লিষ্ট অংশগুলি কষ্ট স্বীকার করে পর্যালোচনা করা হলে প্রথমেই দেখা যাবে যে, যে বিশেষ ধরনের যুক্তিবাদ পাশ্চাত্যে ইবনে রুশদবাদ হিসাবে পরিচিত ছিল ইবনে রুশদ স্বয়ং তার ঘোরতর বিরোধী। তিনি কি চেয়েছিলেন এসব পর্যালোচনার মাধ্যমে তাও বোঝা যাবে।

ইবনে রুশদ ও সেন্ট টমাসের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে সাদৃশ্য রয়েছে তা বুদ্ধিবৃত্তির ঘনিষ্ঠতার চাইতেও বেশি কিছু। খৃষ্টান ও মুসলিম পণ্ডিত উভয়েরই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল যুক্তিকে তার যথাযথস্থানে প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প প্রাচীনদের দর্শনের প্রয়োগ ও একই সময়ে পরবর্তীকালে এর যেসব সমালোচনা হয়েছে সে সম্পর্কে নিজেদের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন, এবং সন্দেহাত্মক অধ্যাত্মবাদ ও স্বর্গীয়ভাবে প্রতিভাত ধর্মবিশ্বাসের ব্যতিক্রম যুক্তিবাদের মধ্যবর্তী পন্থায় যৌক্তিকতা প্রদর্শন। তারা উভয়ে যে বিরোধিতার সম্মুখীন হন তা একই সূত্র থেকে উদ্ভূত এবং সেই সূত্রটি হচ্ছে ধর্মতত্ত্বে পেরিপ্যাটেটিক মূলনীতিসমূহ প্রয়োগের বিরোধী পক্ষ।

প্রত্যাদেশের মাধ্যমে জ্ঞাত স্বর্গীয় রহস্যে প্রবেশের পক্ষে প্রদত্ত যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করে বিশ্বাস ও যুক্তির ক্ষেত্রে অ্যানজেলিক পণ্ডিত যেসব বিখ্যাত অধ্যায় রচনা করেছেন কর্ডোভার পণ্ডিতের *অ্যাপোলজিয়া প্রো ভিটা সুয়া* গ্রন্থের সঙ্গে তার অবিকল সাদৃশ্য রয়েছে। তাদের মতে দর্শন এবং বাইবেল ও কুরআনে স্বর্গীয়ভাবে প্রতিভাত সত্যের মধ্যে সংঘাত অচিন্তনীয়। স্বর্গীয়ভাবে প্রতিভাত সত্য ও দার্শনিক সত্যের মধ্যে যদি কোথাও গরমিল থাকে তাহলে সেজন্য পাঠকের ব্যাখ্যাই দায়ী। বক্তব্য বিষয়ের সোজাসুজি ও আক্ষরিক অর্থ সবসময় সঠিক নয়, বিশেষ করে যেখানে স্রষ্টার ব্যাপারে মানবত্ব আরোপ করা হয়েছে।

সেন্ট টমাস তাঁর সিদ্ধান্তের সঙ্গে সংঘাতমূলক বিষয় সবসময় সাফল্যের সঙ্গে বিশ্লেষণ করতে পারতেন, কারণ তিনি প্রামাণ্য রূপক বিশ্লেষণ প্রদানে দক্ষ ছিলেন। কোন বিবরণ মতবাদসত্য কিনা বাইবেলই তার নিশ্চয়তা, আর বাইবেলের বক্তব্য বিষয় কিভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে একমাত্র যাজকীয় কর্তৃপক্ষই তা বলতে পারে। স্পষ্টত ইবনে রুশদ

---

১. ফরাসী ভাষায় এল গথিয়ার কর্তৃক এই রচনার অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অ্যাকর্ড ডি লা রিলিজিয়ন এট ডি লা ফিলসফি। টেক্সটি ডি ইবনে রুশদ, আলজার, ১৯০৫। স্পেনীয় ভাষায় এম অ্যাসিন কর্তৃক সেন্ট টমাসের তুলনাসহ এবং অত্যন্ত মূল্যবান ঐতিহাসিক ও সমালোচনামূলক বিশ্লেষণসহ এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। হোমেনাজে এ ডি ফ্রান্সিস্কো কডেরা, মাদ্রিদ, ১৯০৪, পৃ. ২৭১ থেকে।

www.waytojannah.com

Contents

এতোটা যেতে পারতেন না, কিন্তু তিনি তার পক্ষে যতোটা সম্ভব ততোটা অগ্রসর হতেন। যেখানে রূপক বিশ্লেষণ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে, সেখানে তাৎপর্য নিরূপণের জন্য তিনি কতিপয় নিয়ম প্রবর্তন করেন। তার মতে, বক্তব্য বিষয়ের সোজাসুজি অর্থ পরিহার করা উচিত। কিন্তু যারা মূর্খ ও অশিক্ষিত, যারা আক্ষরিক অর্থের মধ্যে নিহিত, দার্শনিক তত্ত্ব উপলব্ধি করার মতো যথেষ্ট বুদ্ধিমান নয় এবং কুরআনের বক্তব্য বিষয় আক্ষরিক অর্থে সত্য নয় এ কথা বলা হলে যাদের বিশ্বাস নষ্ট হতে পারে, তাদের ক্ষেত্রে সোজাসুজি অর্থই প্রযোজ্য। আপত্তিকারীদের জবাব দিতে গিয়ে তিনি ইজমার মতবাদ *(ইসলামের কোড ইউবিক, কোড সেম্পার, কোড অ্যাব ওমনিবাস*–এর অত্যন্ত কাছাকাছি ব্যাপার) সব সময় বৈধ বলে স্বীকার করেন না। যদি এরূপ যুক্তি দেওয়া হয় যে, কোন কোন বক্তব্য বিষয়কে সকল মুসলমান *আড পাইড ডিলালেটর্* (আক্ষরিক অর্থে) গ্রহণ করেন, অথচ অন্যান্য বিষয় রূপকভাবে ব্যাখার ব্যাপারে তারা একমত, তাহলে এক পদ্ধতি অন্যটিতে ব্যবহার করা যথার্থ হতে পারে না। এর জবাবে ইবনে রুশদ বলেন, সার্বজনীন সম্মতি যদি নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হতো তাহলে তা করা বৈধ হতো না। কিন্তু এই সম্মতি যখন কেবল অনুমানমূলক হয় তখন তা করা যেতে পারে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ছাড়া একথা কখনো নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব হয়নি যে, কোন এক যুগে যেকোন একটি প্রশ্নে সকল বিশেষজ্ঞ একমত হয়েছেন।

পেরিপ্যাটিক পর্যালোচনায় তাদের গুরুর যে স্বাধীনতা ছিল ইবনে রুশদবাদী খৃষ্টানদের সেই স্বাধীনতা ছিল না। ফলে তাদেরকে তার মতবাদসমূহ অনিশ্চিতভাবে সম্প্রসারিত করতে হয়। ইবনে রুশদ বলেছেন যে, কুরআন ব্যাখ্যার বিজ্ঞান মূর্খ জনসাধারণের জন্য নয়। তাই দার্শনিকরা যখন যুক্তির আলোকে পবিত্র বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করেন, তখন তাদেরকে তাদের স্থূল ধ্যানধারণা অনুসরণ করতে দেওয়া উচিত। স্বীকার্য যে, তার পরেও কুরআনের বাণী ও শিক্ষিত লোকদের বিশ্বাসের মধ্যে গরমিল থাকবে, কিন্তু এ ধরনের গরমিল এই বলিষ্ঠ মতবাদ অনুমোদন করতে পারে না যে, যুক্তি যাকে সত্য বলে স্বীকার করে না বিশ্বাস থেকে তার ওপর আস্থা জ্ঞাপন করতে হবে। ইবনে রুশদের নিরস ও অবিশ্লেষিত অনুবাদ এই আরব গ্রন্থকার দ্বৈতসত্যের একটি মতবাদ অনুসরণ করেন এরূপ ধারণার সৃষ্টি করে। যে সব শব্দ আলঙ্কারিক ও রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে অনুবাদকরা সব সময় তার খুঁটিনাটি তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেননি। 'রূপক উপমা' এবং 'প্রতীক' বা 'সাদৃশ্য'[১] দ্বারা ভুয়া ও কল্পিত ব্যাপার বোঝানো হতো। ইবনে রুশদ আলোচনার জন্য যেসব বিষয়বস্তু গ্রহণ করেন সে সম্পর্কে তার স্বধর্মাবলম্বীরা যাই চিন্তা করুন, তিনি রূপক বিশ্লেষণের বৈধতা প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে

১. মাজায ও মিসাল।

www.waytojannah.com

Contents

সম্পূর্ণ গোড়াপন্থী ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র এমন একটি মূলনীতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন যার অস্তিত্ব শুরু থেকে খৃষ্ট ও ইসলাম ধর্মে ছিল।[১]

সেন্ট টমাস ও ইবনে রুশদের ধর্মতত্ত্বের মধ্যে ঘটনাক্রমিক মিল অনেক, এগুলোর মধ্যে আল্লাহ্ সব খুঁটিনাটি বিষয় জানেন এরূপ অটল বিশ্বাস এবং এর সমর্থনে উত্থাপিত যুক্তিসমূহ সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। আসমানী জ্ঞান সবকিছুর কারণ, অ্যাঞ্জেলিক পণ্ডিতের এই বিখ্যাত উক্তি ইবনে রুশদের নিম্নোক্ত উক্তির প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছু নয়ঃ *আল ইলমুল কাদিমু হুওয়া 'ইল্লাতুন ওয়া সাবাবুন লিল মাউজুদ।*[২] মুসলিম পেরিপ্যাটিক দার্শনিকরা 'আল্লাহ্‌র জ্ঞানে' সব খুঁটিনাটি বিষয় রয়েছে, এ কথা এই যুক্তিতে স্বীকার করেন না যে, যদি তাই হতো তাহলে জ্ঞাত বিষয়ের পরিবর্তন জ্ঞানীর মধ্যেও পরিবর্তনের সূচনা করতো। আল গায্যালী এর জবাবে বলেছেন যে, পার্থিব জগতে যা কিছু ঘটছে আল্লাহ যদি তার সবকিছু দেখতে ও শুনতে না পেতেন তাহলে দৃষ্টি ও শ্রুতির মালিক আল্লাহ তার সৃষ্ট জীব থেকে নিকৃষ্ট হতেন।

ইবনে রুশদ ও সেন্ট টমাসের মধ্যে মিল এতো ব্যাপক যে, সেগুলি নিছক ঘটনাক্রমিকের চাইতে গভীরতর ব্যাপার। দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির ইচ্ছা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং পরিকল্পনাটি যেরূপ সাদৃশ্যমূলক পন্থায় প্রণীত হয় তাতে স্বাভাবিকভাবেই এরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় যে, ইবনে রুশদ অ্যারিস্টটলের ভাষ্যের চাইতেও অনেক বেশি মূল্যবান বিষয় খৃষ্টান পণ্ডিতদের উত্তরাধিকার সূত্রে দিয়ে গেছেন। উভয় লেখকের মধ্যেই আমরা বিশ্বাসের দার্শনিক প্রমাণের পর কুরআন বা বাইবেলের উদ্ধৃতি দেখতে পাই। উভয়ের সন্দেহাত্মক বা স্পষ্টত পরস্পর বিরোধী বিষয় উপস্থাপন করে তাদের বক্তব্য শুরু করেন। গতি ও বিশ্বের স্বর্গীয় পরিকল্পনা থেকে আমরা আল্লাহর অস্তিত্বের একই প্রমাণ দেখতে পাই। বিশ্বের একত্ব থেকে আল্লাহর একত্বের একই যুক্তি দেখতে পাই। আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য *ভায়া রিমশনিস*–এর (অপসারণ) পন্থা অনুসরণ করা উচিত, এই বক্তব্য জোরদার করার জন্য উভয়েই এটিকে *ভায়া অ্যানালজিয়েই*–তে (সাদৃশ্য) রূপায়িত করেন।

এসব সাদৃশ্যের দৃষ্টান্ত অবাধে বাড়ানো যায়, এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে এসব বহু সাদৃশ্য সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু প্রাচ্য থেকে দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ধ্যান–ধারণার যে মিছিল অব্যাহত থাকে তার গতিধারা তুলে ধরার জন্য অনেক কিছু বলা হলো। ১২১৭ খৃষ্টাব্দের পর থেকে ইবনে রুশদের ভাষ্যসমূহ মাইকেল

---

১. তুলনা ম্যাথিও ৭ ঃ ৬; সুরাহ ৩ ঃ ৫; ইবনে রুশদ ফস্‌ল্ পৃ. ৮; সুম থিওল, ১ এ কিউ ১ এ এট পাস্‌সিম।

২. দ্রষ্টব্য দামিমাতুল মাসআলাতিল্লাতি জাকারাহা আবুল ওয়ালিদ ফি ফাসলিল মাকাল। সম্পাদক আসিন, অপ. সিট, এই চিঠিটি রেমাণ্ড মার্টিন কর্তৃক অনূদিত হয়েছে এবং তার পুজিও গ্রন্থে (১ম খণ্ড ২৫তম অধ্যায়) স্থান পেয়েছে।

www.waytojannah.com

Contents

স্কটের মাধ্যমে টলেডোর পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চা কেন্দ্রে পৌছে। সেন্ট টমাস মাঝে মাঝে মাইমোনাইডসের যে বিখ্যাত গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেন তাতে ইবনে রুশদের বহু ধ্যান-ধারণা সন্নিবেশিত হয়েছে। ইবনে টমাস তার *কোয়েসচন্স্ ডিসপিউটেটেই* গ্রন্থে আল্লাহ্র জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিতর্কের ওপর ইবনে রুশদের বক্তব্য উল্লেখ করেন।

সেন্ট টমাস আকিনাসের প্রসঙ্গ আলোচনার মাধ্যমে এই অধ্যায়ের সমাপ্তি টানা যুক্তিযুক্ত হবে। কারণ তিনি 'প্রভাবের' অস্পষ্টতামূলক ধারণা যথাযথভাবে তুলে ধরেন। তার রচনায় আমরা আরব প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছি, কিন্তু এ কথা বলা সঠিক হবে না যে, তিনি আরব লেখকদের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। তাঁকে কোন বিশেষ ধারার বা শতকের ভৃত্যে পরিণত করা যায় না।[১] তার মধ্যেই সময় প্রচলিত ধ্যান-ধারণা থেকে পিছনের দিকে অতীতের খৃষ্টান ধর্মগুরুদের মতবাদে ফিরে যাওয়ার প্রবণতা এই মূল্যবান কথাটিই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আরবদের কাছ থেকে পাশ্চাত্য তার হারানো পৈতৃক সম্পদ পুনরুদ্ধার করছিল, একথা বলার অর্থ আরবদের অবদানকে অস্বীকার করা বা ছোট করে দেখা নয়। তারা জ্ঞানের আলো প্রজ্বলিত রাখেন এবং খাঁটি দার্শনিক চিন্তাধারা বিকাশে তাদের অবদান যতো কিঞ্চিৎকর হোক, ধর্মতত্ত্বে তাদের অবদান নিঃসন্দেহে সবচাইতে মূল্যবান।[২] যারা মুসলিম জ্ঞানসাধকদের মৌলিকত্ব ও বুদ্ধিদীপ্তির অভাবের কথা বলেন, আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, তারা কখনো ইবনে রুশদের রচনা পড়েন নি কিংবা আল গায্যালীর ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হন নি বরং অপরের মুখে শুনে তারা তাদের মন্তব্য প্রকাশ করেন। পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জগতের সুরক্ষিত দুর্গ আকিনাসের *সুম্মায়* ইসলাম থেকে উদ্ভূত মতবাদসমূহের উপস্থিতিই ঐসব মন্তব্যের দাঁত ভাঙ্গা জবাব।

মুসলিম প্রভাব বহু দিক দিয়ে যেভাবে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে তার প্রতি সুবিচার করতে হলে মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির একটি ইতিহাস রচনা করতে হয়। এতে সুদূরপ্রসারী বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। জাতীয় সংস্কৃতির ধারাসমূহ মানুষের চিন্তাধারার বিশাল সমুদ্রে প্রবাহিত হয়। সেগুলি মহাসমুদ্রে মিলিত হওয়ার পর সুপেয় পানিকে লবণাক্ত পানি থেকে পৃথক করা অসম্ভব না হলেও দুঃসাধ্য। প্রত্যেককে তার নিজস্ব স্বাদের উপর নির্ভর করতে হয়।

---

১. 'তিনি তার মূল সূত্রসমূহকে শুধুমাত্র একত্রে গ্রথিত করেননি। বিভিন্ন সূত্রের মধ্যে ক্রমাগত পার্থক্যের ফলে অবাধে কল্পনামূলক চিন্তায় বাধা সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেই চিন্তা করে প্রত্যেকটি বিষয় নির্ধারণ করেন এবং সাধারণ তাৎপর্য ও প্রকৃত অবস্থার সুষ্ঠু সমালোচনা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টিমূলক এক অপরূপ গ্রন্থ রচনা করেন।' ক্লিমেন্ট সি জে ওয়েব, এ হিস্টরি অব ফিলসফি, লন্ডন, ১৯১৫, পৃ. ১২০।

২. অব্যাহত সৃষ্টি ও পারমাণবিক সময় সংক্রান্ত মুসলিম পরমাণুবাদী দার্শনিকদের মতবাদ বর্তমান কালে বিশেষ কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে। দ্রষ্টব্য, মাইমোনাইডসের গাইড ফর দি পারপ্লেক্সড, অনুবাদ, এমফ্রাইড ল্যাণ্ডার, লণ্ডন, ১৯২৫, পৃ ১২০, এবং ডিবি ম্যাকডোনাল্ডের আইসিস (৯ম ঃ ২) ১৯২৭, পৃ ৩২৬।

www.waytojannah.com

মুসলিম প্রাধান্যের চারশ বছরেরও বেশি কাল সকল জ্ঞানচর্চা কেন্দ্রে ধর্মীয় ও দার্শনিক অনুসন্ধানের একটি প্রেরণা সক্রিয় ছিল। সে যুগে প্রত্যেক বণিকই কবি ছিলেন এবং সম্ভবত যে কোন কবি বণিক ছিলেন না, সে যুগের রচনায় এখনো প্রাচ্য মনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রং ও আকর্ষণ অব্যাহত রয়েছে। ভ্রমণ ও অধ্যয়ন, যুদ্ধ ও প্রেম, সঙ্গীত ও গান, সবকিছুই আল্লাহ্‌র নিয়ামত ছিল। জীবন, বিশেষ করে যারা সিংহাসনের বা রাজদরবারের অত্যন্ত কাছাকাছি বাস করতো তাদের জীবন সংক্ষিপ্ত হলেও মধুর ছিল। এমনি এক যুগে ধর্মীয় অনিশ্চয়তা থাকলেও তাতে কি আসে যায়? সন্দেহ প্রবণতা এমন এক মিস্টিক সর্বখোদাবাদ তথা *ওয়াহ দাতুল অজুদ* আশ্রয় নিতো বা নিয়েছিল, যাতে নিজের ভিতরে ও বাইরে আল্লাহকে পাওয়া যেত। অ্যাপোকালিপ্‌সবাদী[১] ও এসীনরা[২] পরম সুখাবেশ উপভোগ করতে কিংবা কঠোর সাধনা করতে পারত। তাদের এসব পন্থা ইউরোপে আলবিজেনসীজদের[৩] নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে। মেসিয়াবাদী[৪] তার *মেহদীকে* খুঁজে পান এবং গোড়াপন্থী হুরদের বাগানে তার 'সুদৃঢ় সুখ ও স্থায়ী আনন্দ' লাভ করেন।

কর্ডোভার ইবনে হায্‌ম-এর ন্যায় বেয়াড়া জ্ঞানার্থীরা ইউরোপের প্রথম ব্যাপকতামূলক রিলিজিয়ান্‌স্‌জেসচিচ্‌টে[৫] এবং ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টের প্রথম ধারাবাহিক উচ্চাঙ্গের সমালোচনা গ্রন্থ রচনা করতে পারতেন। উদ্ভট ব্যাপার বাস্তবের সঙ্গে সংমিশ্রিত হতে পারতো এবং কল্পনাশক্তি জীবনের সাধারণ ধাতুকে সোনালি আভায় রঞ্জিত করতে পারতো। এই পটভূমিতেই অবশেষে ইবনুল আরাবীর ন্যায় জ্ঞানসাধকরা *ডিভাইনা কমেডিয়ার* অনুরূপ বিস্ময়কর গ্রন্থসমূহ রচনা করেন।

ভাষার বাধা একথাই প্রমাণ করে যে, আমাদের পূর্ব পুরুষরা এই সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় জীবনের খুব সামান্য অংশই হজম করতে সক্ষম হন। তাই ইউরোপে যখন মুসলিম সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে এবং যে সমস্ত জ্ঞান তখনো হজম করা সম্ভব হয়নি, তখনি পরাজিত মুরদের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিও অদৃশ্য হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আগের যে কোন সময়ের তুলনায় ত্রয়োদশ শতকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে অনেক ঘনিষ্ঠতা লাভ করে। আমরা দেখেছি যে, ত্রিত্ব (টিনিটি) ও অবতারের (ইনকার্নেশন) মূল বিশ্বাস ছাড়া পণ্ডিতরা প্রায়ই তাদের নিজেদের বাহিনীর চাইতে বিরোধী শিবিরে অধিক সংখ্যক মিত্র

---

১. আসমানী প্রত্যাদেশে বিশ্বাসী । -অনুবাদক।

২. একটি প্রাচীন ইহুদী অধ্যাত্মবাদী সম্প্রদায় (খৃ পূ ২য় শতক থেকে খৃ ২য় শতক)। -অনুবাদক।

৩. ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলে আনু.১০২০-১২৫০ খৃ. বসবাসকারী একটি ধর্মীয় সাম্প্রদায়, যাদের ধর্মদ্রোহিতার দায়ে শেষ পর্যন্ত অবদমিত করা হয়। -অনুবাদক।

৪. মেসিয়া বা মসিহ্‌ মতবাদে বিশ্বাসী। ইহুদী মতে ইহুদীদের প্রতিশ্রুতি ও আকাঙ্ক্ষিত মুক্তিদাতা; খৃষ্টান মতে এই মুক্তিদাতা হিসাবে স্বয়ং যীশু খৃষ্ট-খৃষ্ট শব্দটির অর্থ মুক্তিদাতা; মুসলিম মতে মুসলমানদের আকাঙ্ক্ষিত ইমাম মেহদি (আ)।-অনুবাদক।

৫. তুলনামূলক ধর্মবিজ্ঞান। -অনুবাদক।

Contents

খুঁজে পেতেন। ইউরোপের গ্রন্থাগার সমূহের সবগুলি মূল্যবান উপাদান তুলে ধরা হলে এখনো দেখা যাবে যে, মধ্যযুগীয় সভ্যতায় আরবদের স্থায়ী প্রভাব এতোদিন পর্যন্ত যতোটা স্বীকৃতি লাভ করেছে তার চাইতে অনেক অনেক বেশি।

আলফ্রেড গিলুম

গ্রন্থপঞ্জী

এই নিবন্ধটি *দি লেগ্যাসি অব ইসরাইল* গ্রন্থে সি এণ্ড ডি সিঙ্গার কর্তৃক 'দি জুয়িশ ফ্যাক্টর ইন মিডিয়েভ্যাল থট' শিরোনামে লিখিত প্রবন্ধের সঙ্গে একযোগে পঠিতব্য।

এস মুন্‌ক, *মিলেঞ্জেস ডি ফিলোসফি জুইভ এট অ্যারাবে*, প্যারিস, ১৮৫৭, পুনর্মুদ্রিত ১৯২৭।

এম হর্টেন, *ডাই ফিলোসফিসচেন সিস্টেম ডের স্পেকুলেটিভেন থিওলজেন ইম ইসলাম*, বন ১৯১২।

ব্যারন ক্যারা ডি ভক্স, *গায্‌যালী*, প্যারিস, ১৯০২। এম আসিন ওয়াই প্যালসিয়স, *আলগাযেল*, যারাগোযা, ১৯০১।

এল আভেরুঈসমো টিওলোজিকো ডি স্যান্টো টমাস ডি আকিনো এক্সটাক্টো ডেল হোমেনাজে এ...কডেরা, যারাগোযা, ১৯০৪।

আবেনমাসাররা ওয়াই সু এসকুয়েলা, মাদ্রিদ ১৯১৪। (এসব রচনা অপরিহার্য।)

বেইটাযে যুর জেসচিচটে ডের ফিলোসফি ডেস মিটেলালটার্স গ্রন্থে ঃ

এম উইটম্যান, *ডাই স্টেলাং ডেস এইচএল টমাস ভন আকিন যুর আভেনসেব্রল*, মুনস্টার, ১৯০০।

যুর স্টেলাং অ্যাভেনসেব্রলস ইম এন্টউইকলাংসগাং ডের অ্যারাবিসচেন ফিলোসফি, ১৯০৫।

এ স্নাইডার, *ডাই আবেন্ডল্যান্ডিস্‌চে স্পেকুলেশন ডেস যোওল্‌ফটেন জাহ্‌রহুন্ডার্টস ইন ইহরেন ভারহান্টনিস জুর অ্যারিস্টটোলিসচেন আন্‌ড জুডিসচারটিসচেন ফিলোসফি*, ১৯১৫।

ই গিলসন, *'পুরকুই সেন্ট টমাস এ ক্রিটিক সেন্ট অগাস্টিন'*, আরকাইভস ডি হিস্টোরী ডক্‌টিনেল এট লিটারেয়ার ডু মইন এজ, প্যারিস, ১৯২৬, পৃ ৫ ও পরবর্তী।

সি আর এস হ্যারিস, *ডানস স্কটাস্‌*, অক্সফোর্ড, ১৯২৭।

ডি এল ওলিয়ারি, *অ্যারাবিক থট এণ্ড ইট্‌স্‌ প্লেস ইন হিস্টোরী*, লন্ডন, ১৯২২।

এস ভ্যানডেনবার্গ, *ডাই এপিটোম ডের মেটাফিজিক ডেস আবেররোস লিডেন*, ১৯২৪।

ক্লিমেন্ট সি জে ওয়েব, *স্টাডিজ ইন দি হিস্টোরী অব ন্যাচারাল থিওলোজি*, অক্সফোর্ড, ১৯১৫।

www.waytojannah.com

আইন ও সমাজ

প্রাচীন আরবের সামাজিক কাঠামো রক্তের সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। একই পূর্ব পুরুষ থেকে উদ্ভূত বংশধারা বা বংশধর বলে দাবিদার একটি জনগোষ্ঠী পারস্পরিক প্রতিরক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ হয়। তারা সাধারণ উপাসনা ও সাধারণ আচরণ দ্বারা একতাবদ্ধ হলেও তাদের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ বন্ধন ছিল রক্তের সম্পর্ক। খাঁটি হোক আর কল্পিত হোক এর মাধ্যমে একটি কার্যকর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের সৃষ্টি হয়। বস্তুত আরব উপজাতি ছিল একটি বিশাল পরিবার।

অন্যান্য আদিম সমাজের ন্যায় আরবেও মূল সামাজিক ইউনিট ছিল দল, কোন ব্যক্তিবিশেষ নয়। স্বতন্ত্র হিসাবে ব্যক্তিবিশেষের কোন মূল্য ছিল না, সে যে পরিবার বা দলের অন্তর্ভুক্ত থাকতো তাকেই গুরুত্ব দেওয়া হতো। পরিবার তার সামাজিক ও বৈধগণ্ডিতে সকল সদস্যের জীবনের সমষ্টি ছিল। এটি তাদের অধিকার সংরক্ষণ করতো, তাদের ক্ষতির প্রতিশোধ নিতো, তাদের অপরাধের কৈফিয়ত দিত এবং মৃত্যুর পর তাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করতো। এসব ক্ষেত্রে তারা এমন একটি রীতি (সুন্নাহ্) অনুসরণ করতো যা ছিল তাদের সর্বপ্রকার ক্ষমতার উৎস এবং স্মরণাতীতকাল থেকে অতীব মূল্যবান।

ইসলাম আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যগুলিসহ এর গাঠনিকরূপ বজায় রাখে। কেবল একটি মৌল বিষয়ে ইসলাম পরিবর্তন সাধন করে ঃ যে রক্তের বন্ধন আরব উপজাতির রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল, সমষ্টিগত বিশ্বাস তার স্থলাভিষিক্ত হয়।

আদিম সেমিটিক উপজাতির মধ্যে পূর্ব থেকে উপাসনাই ছিল উপজাতীয় জীবনের কেন্দ্র বিন্দু। দেবতা ও উপাসনাকারী উপজাতি এক ছিল। দেবতা উপজাতির মিত্রদের মিত্র এবং শত্রুদের শত্রু ছিল। উপজাতি ও মিত্রদের সঙ্গে দেবতা একাকার ও একাত্ম হয়। তাদের কাছে দেবতা পরিবর্তন আমাদের কাছে জাতিগত পরিচয় পরিবর্তনের শামিল ছিল।

তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরব সমাজের আদিম অবস্থার কথা স্মরণ করে এর ভিত্তির ওপর এমন একটি সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলেন যা এর সহজাত আবেগের গভীরতাকে নাড়া দেয়। এই সত্যটি ইবনে খলদুনের গভীর দৃষ্টি এড়ায়নি। উপজাতি ও পরিবারের ঐতিহ্যগত কাঠামো ভেঙে ফেলা হয়। বংশগত মর্যাদা, আনুগত্য ও উপজাতীয় সংঘের প্রশ্ন চিরবিদায় গ্রহণ করে। যিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন তাকে সর্বপ্রকার সম্পর্কের কথা ভুলে যেতে হয়। এমন কি ধর্মবিশ্বাসের সহচর না হলে

www.waytojannah.com

নিজস্ব আত্মীয়–পরিজনের সম্পর্কও ভুলে যেতে হয়। পুরোন বিশ্বাস আঁকড়ে থাকলে তার পরিজনদের উদ্দেশ্যে তাকে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামের ন্যায় অবশ্যই বলা হয় ঃ 'তোমাদের ও আমার মধ্যে অভিন্ন কিছু নেই।' মহানবী (সা) যে নতুন সামাজিক ব্যবস্থার উদ্বোধন করেন এটিই ছিল তার উল্লেখযোগ্য দিক।

আমরা সমষ্টিগত জীবনের সকল পরিচয় ছিন্ন করে ব্যক্তিগত জীবনের আবির্ভাব দেখতে পাই। অতঃপর মানুষকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা হয় এবং ব্যক্তি বিশেষ তার ক্ষেত্রে তার দাবি ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়। এই সচেতনতা সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক থেকে নয়, বরং তার বিশ্বাস থেকে আসে। এসব বিশ্বাসীর সমবায়ই হচ্ছে 'মুসলিম সম্প্রদায়'।

যারা মুক্তকণ্ঠে একমাত্র ইলাহ্‌র (আল্লাহ্‌) প্রতি ও প্রেরিত পুরুষ হিসাবে হযরত মুহাম্মদ (সা)–এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)–এর নৈতিক শিক্ষা অনুসরণ করে তারা অধিকারবলে হযরত মুহাম্মদের 'লোকদের' বা 'সম্প্রদায়ের' *(উম্মাহ্‌)* অন্তর্ভুক্ত হয়। এই *উম্মাহ* আত্মীয় সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন *উম্মাহ* বা উপজাতির স্থলাভিষিক্ত হয়। এই সম্প্রদায় অন্য যেকোন সম্প্রদায় থেকে পৃথক রকমের। এরা নির্বাচিত ও পবিত্র লোক যাদের ওপর সৎকর্মের বিকাশ ও অসৎকর্ম বিনাশের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। মহানবী (সা) যেভাবে আরবদের মধ্যে আল্লাহ্‌র সাক্ষী ছিলেন তেমনি এরাও পৃথিবীতে ন্যায় বিচার ও বিশ্বাসের আসন এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে আল্লাহ্‌র একমাত্র সাক্ষী।

এই সব ধ্যান–ধারণা বহু আগেই ইসলামের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক দলিলে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথম হিজরীতে মদীনায় ফরমান হিসাবে তা জারি করা হয়।

মহানবীর অনুসারীরা একটি বিরাট পরিবার ছিল। যারা একই আল্লাহ্‌র উপাসনা করে না এরূপ প্রত্যেকটি দলের বিরুদ্ধে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, 'অন্য সকলের বিরুদ্ধে একা'। মদীনার লোকদের উদ্দেশ্য করে যেমনটি হযরত আবু বকর (রা) বলেছিলেন, 'ঈমানদার ভাইগণ, গণিমতের মালের অংশীদারগণ, সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে মিত্রগণ।' এমনিভাবেই সামগ্রিক ব্যবস্থাটি একটি নৈতিক ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করে। প্রয়োজনের সময় প্রত্যেক মুসলমানকে অন্য সকল মুসলমানের সাহায্যকারী ও রক্ষাকারী হতে হবে, এই ধর্মীয় নির্দেশ অনুযায়ী এতে পারস্পরিক সাহায্যকে একটি আইনগত কর্তব্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়। হাদীসে বলা হয়েছে, 'মুসলমানরা একটি সুদৃঢ় প্রাচীরের ন্যায় একক একটি হাত যেখানে প্রাচীরের প্রত্যেকটি ইট প্রত্যেকের সহায়ক।' সরকারী ও বেসরকারী উভয় পর্যায়ে আইনের প্রত্যেকটি এলাকায় এসব ধারণার প্রতিফলন দেখা যায়। ভ্রাতৃত্বের স্বাভাবিক ফল সাম্য। আল্লাহ্‌র কাছে সবাই সমান, তাই মুসলমানরা নিজেদের মধ্যেও সবাই সমান। ঈমানদারদের মধ্যে কেবলমাত্র ঈমানে প্রাধান্যের দ্বারা কিংবা অধিকতর নিষ্ঠার সঙ্গে ঈমানের অনুশাসন পালনের দ্বারা প্রাধান্য সূচিত হয়। 'হে কুরাইশ, আল্লাহ

তোমাদের মধ্যে আভিজাত্যের অহঙ্কার এবং মূর্খতার যুগের ঔদ্ধত্য অবদমিত করেছেন। সকল মানুষ হযরত আদম থেকে এসেছে এবং আদমকে মাটি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে।' রাজনৈতিক ও সামাজিক নির্বিশেষে সামগ্রিক ব্যবস্থায় আইনের দৃষ্টিতে সাম্য একটি মৌল ভিত্তি। আবূ মুসা আল আশ'আরীর প্রতি খলীফা উমরের বিখ্যাত উপদেশ বাণীতে বলা হয়েছে, 'তোমার বিচারে ও বিচারালয়ে তাদের সবাইকে সমান দৃষ্টিতে দেখবে, অন্যথায় ক্ষমতাবানরা তোমার পক্ষপাতিত্ব আশা করবে এবং দুর্বলরা তোমার বিচারে নৈরাশ্য বোধ করবে।' নির্ভরযোগ্য হোক আর না হোক এসব বিধি প্রত্যেকটি আইন গ্রন্থে দেখা যায় এবং এগুলি ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইনের ভিত্তি।

এই সাম্যবাদী সম্প্রদায়ের এবং প্রাচীন ইসরাইলের ন্যায় বিশ্বাসের ভ্রাতৃসমবায়ের পুরো ভাগে রয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ। আল্লাহ্‌র বিধান তার লোকদের ওপর সরাসরি ও প্রত্যক্ষ। প্রাচীন আরব উপজাতিগুলির দেবতারা ছিল তাদের উপাসকদের পৃষ্ঠপোষক ও রক্ষাকর্তা। তাঁর নির্বাচিত লোকদের পৃষ্ঠপোষক ও রক্ষাকর্তা আল্লাহ্ প্রাচীন দেবতাদের স্থলাভিষিক্ত হন এবং মুসলমান সম্প্রদায়কে শাসন করেন। কোন একটি উপজাতি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তাদের নেতা যখন মহানবীকে বলেন, 'আপনিই আমাদের রাজা', তখন সঙ্গে সঙ্গে মহানবী জবাব দেন 'রাজা হচ্ছেন আল্লাহ্, আমি নই।'

ইসলাম আল্লাহ্‌র সরাসরি শাসন তথা আল্লাহ্‌র হুকুমাত। আল্লাহ্‌র দৃষ্টি তাঁর বান্দাদের প্রতি নিবদ্ধ। অন্যান্য সমাজে যাকে *সিভিটাস, পলিস,* 'স্টেট বলা হয় ইসলামে সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ সর্ব শক্তিমান এবং তিনি সাধারণের কল্যাণ করেন। তাই সরকারী কোষাগার 'আল্লাহ্‌র কোষাগার', 'সেনাবাহিনী আল্লাহ্‌র সেনাবাহিনী', এমন কি সরকারী কর্মচারীরাও 'আল্লাহ্‌র কর্মচারী'।

আল্লাহ ও ব্যক্তিগতভাবে ঈমানদারদের মধ্যে সম্পর্কও সরাসরি, কারণ আল্লাহ ও ঈমানদারের মধ্যে কোন মধ্যস্থতাকারী নেই। ইসলামে কোন যাজক সম্প্রদায়, পুরোহিত বা সংস্কার নেই। যে 'স্রষ্টা' জন্মের আগে থেকে মানুষকে জানেন এবং 'গর্দানের শিরা থেকেও মানুষের কাছাকাছি' রয়েছেন, সেই 'স্রষ্টা' ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর কি প্রয়োজন? যে মহানবী (সা) মানব জাতির কাছে আল্লাহ্‌র চূড়ান্ত বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন তার পরে অন্য কোন বিশ্লেষণকারী এবং তার ইচ্ছার প্রতিনিধি থাকতে পারে না। জীবনে মরণে আল্লাহ্‌র সামনে মানুষ একা। সে যেভাবে একজন 'আরব সৈয়দকে' সম্বোধন করতে পারতো তেমনিভাবে কোন প্রকার ভূমিকা ও আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া সবসময় আল্লাহ্‌কে সম্বোধন করতে পারে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ্‌র দৃষ্টির সামনে মানুষ একা, তার দৃষ্টিতে কোন কিছু এড়ায় না এবং তার কাছে প্রতিটি কাজ, প্রতিটি কথা, এমন কি অত্যন্ত গোপন চিন্তাও সমুপস্থিত। সেই *ডাইয়িয আইরিভে*[১] যখন প্রতিটি জীবকে তার

---

১. মূলত ল্যাটিন; হাশর বা শেষ বিচারের দিন। —অনুবাদক

www.waytojannah.com

Contents

কৃতকর্মের প্রতিদান গ্রহণের জন্য ডাকা হবে তখন সে একাই তার কৃতকর্মের জবাব দেবে, একাই আল্লাহ্‌র বিচারের মুকাবিলা করবে। 'তাঁর' সামনে সুপারিশ বা সুপারিশকারী কোন কাজে আসবে না।[১] এই অনমনীয় এবং মানুষ ও স্রষ্টার মধ্যে যে কোন হস্তক্ষেপ অসহনশীল ব্যক্তিগত একত্ববাদের তুলনায় অত্যন্ত কঠোর প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত ও একটি যাজকীয় ধর্ম বই কিছু নয়।

সর্বদ্রষ্টা বিচারকের সামনে একা ও সহায়হীন অবস্থায় আল্লাহ্‌র ক্ষমতা থেকে নিজেকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য মানুষ 'তাঁর' দয়ার কাছে 'তাঁর' কাছ থেকে 'তাঁর' কাছে নিজেকে সমর্পণ করা ছাড়া আর কি করতে পারে ? আল্লাহ্‌র কাছে মানুষের পরিপূর্ণ বিনয় ও আশা নিয়ে এই আত্মসমর্পণই সত্যিকারের ঈমান, এবং এ কারণেই ইসলাম (অর্থাৎ নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে ছেড়ে দেওয়া) একমাত্র সত্যিকারের ধর্ম, কেননা একমাত্র এটিই হচ্ছে আল্লাহ্‌র কাছে একটি ধর্মীয় আত্মা হস্তান্তর। মানুষ উপলব্ধি করে, আল্লাহকে এবং 'তাঁর' দৃষ্টিতে মানুষের অবস্থা কত তুচ্ছ। সেমিটিক জাতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই সামগ্রিক আত্মসমর্পণই ইসলামের প্রতীক এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে তার নিশান। এই শিক্ষার সঙ্গে তার নিজস্ব উপজাতির সহজাত ধর্মীয় প্রবণতার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল সে সম্পর্কে সম্ভবত হযরত মুহাম্মদ (সা) সচেতন ছিলেন, এবং তাই তিনি নিজেকে হযরত ইবরাহীমের খাঁটি ও অকলুষিত ধর্ম বিশ্বাসের 'পুনরুদ্ধারকারী' এবং সর্বশেষ নবী হিসাবে ঘোষণা করেন।

ইসলামী সমাজের মূল ভিত্তিসমূহ

আসমানী আইন (শরী'আ)। ঈমানের প্রতীকের চতুর্দিকে সমবেত এবং আল্লাহ্‌র দ্বারা শাসিত এই ভ্রাতৃসংঘের বৈশিষ্ট্য আইনের ধারণা নির্ধারণ করে। প্রাচীনদের এবং আমাদের মতে আইন হচ্ছে এমন একটি বৈধ আদর্শ যা জনসাধারণ কর্তৃক সরাসরি কিংবা তাদের প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থার মাধ্যমে অনুমোদিত হয় এবং এর ক্ষমতার উৎস হচ্ছে মানুষের যুক্তি ও ইচ্ছা এবং তার নৈতিক স্বভাব। মুসলমানদের ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত। একথা যদি সত্য হয় যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রধান ও শাসক স্বয়ং আল্লাহ তাহলে আইন আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটিই হচ্ছে বিধি যার অনুসরণে আল্লাহ তাঁর নির্বাচিত বান্দাদের আইন প্রণেতা হিসাবে এটি পরীক্ষা করবেন।

এই আইনের কাছে আত্মসমর্পণ একই সময়ে একটি সামাজিক দায়িত্ব এবং ঈমানের একটি অঙ্গও বটে। এই আইন লংঘনকারী কেবলমাত্র বৈধ ব্যবস্থাতেই হস্তক্ষেপ করে না, এতদ্বারা পাপও করে। কারণ যেখানে আল্লাহ সংশ্লিষ্ট নন সেখানে কোন অধিকারও নেই। বিচার ব্যবস্থা ও ধর্ম এবং আইন ও নৈতিকতা সেই একই ইচ্ছার দু'টি দিক। এর থেকেই

---

১. অবশ্য বহু মুসলমান হযরত মুহাম্মদ (সা)–এর কার্যকর মধ্যস্থতায় বিশ্বাস করেন।

www.waytojannah.com

মুসলমান সম্প্রদায় তাদের অস্তিত্ব ও নির্দেশনা লাভ করে। প্রত্যেকটি আইনগত প্রশ্ন স্বয়ং একটি বিবেকের ব্যাপার, এবং আইনশাস্ত্র তার ভিত্তি হিসাবে ধর্মতত্ত্বের মুখাপেক্ষী।

এই আইনের বৈশিষ্ট্য ও যথাযথ কাজ কি? কুরআনের প্রত্যাদেশ পূর্ববর্তী প্রত্যাদেশ-সমূহের দৃঢ়তা শিথিল করার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার একটি আইন এবং আল্লাহ কর্তৃক মানব জাতিকে প্রদত্ত একটি দয়ার কাজ হিসাবে নিজেকে অভিহিত করে। ইহুদী ও খৃষ্টানরা যে স্বাভাবিক আইন এবং পূর্বতন নবীদের (হযরত নূহ বা হযরত ইবরাহীম) যে আদি ধর্ম বিশ্বাস বিকৃত ও কলুষিত করেছিল ইসলাম সেটি পুনঃ প্রবর্তন করে। নতুন আইন ইহুদীরা যেসব কঠোরতা আরোপ করে এবং খৃষ্টানরা যেসব রদবদল করে সেগুলি বাতিল করে দেয় এবং মানুষের দুর্বলতা ও সহজাত দোষত্রুটি এবং জীবনের বাস্তব প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে সম্মতি ঘোষণা করে। মহানবী সাধারণত যেসব উপদেশ দিতেন তা হচ্ছে ঃ 'পন্থা সহজ করো, এটিকে কঠোরতর করো না। আল্লাহ প্রত্যেকের ওপর সে যতটা করতে সক্ষম কেবল ততোটাই আরোপ করেন।' ইসলামে আধ্যাত্মিকতার প্রবণতা থাকলেও কঠোর তপস্যার অবকাশ নেই। ইসলাম বিধিগতভাবে কঠোর তপস্যার বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ করে, কারণ এতে দেহ দুর্বল হয় এবং মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা অবদমিত হয়। ইসলাম ঈমানদারকে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত 'ভালো জিনিসগুলি' উপভোগে উৎসাহিত করে; তবে তাকে সীমা বজায় রাখতে হবে এবং কুরআনের প্রত্যাদেশের নির্দেশগুলি পালন করতে হবে। কিন্তু এসব বিধিনিষেধের সংখ্যা অসংখ্য নয় এবং সেগুলি অত্যন্ত কঠোরও নয়।

ইসলামী আইন প্রত্যেকটি বাস্তব কার্যকলাপ অনুমোদন করে এবং কৃষি, বাণিজ্য ও প্রত্যেক রকমের কাজের অত্যন্ত মর্যাদা প্রদান করে। যারা নিজেদের ভরণ-পোষণের বোঝা অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয় এই আইন তাদের নিন্দা করে। এই আইন অনুসারে প্রত্যেক লোককে তার নিজস্ব শ্রমের উৎপাদনের ওপর নির্ভর করতে হয়। অন্যের ওপর নির্ভর না করে যেকোন স্বাধীন পেশা প্রশংসনীয়। রেনান বলেন, 'লা' ইসলাম এস্ট উনে রিলিজিয়ান ডি' হোম্স্।' এই বক্তব্যের মর্ম অনুসারে আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামী আইনের প্রবণতা হচ্ছে মানুষকে কাজ করার বিস্তীর্ণতম সুযোগ প্রদান। মুসলিম আইন বিশেষজ্ঞরা যখন বলেন যে, আইনের মূল বিধি হচ্ছে স্বাধীনতা, তখন আমরা তা অবাধে মেনে নিতে পারি।

কিন্তু এই স্বাধীনতা *(ইবাহাহ)* সীমাহীন হতে পারে না। মানুষ স্বভাবত লোভী ও অকৃতজ্ঞ। অন্যের ধনের ব্যাপারে লোভ করে, নিজের ব্যাপারে কৃপণ, এবং আল্লাহ যেসব নিয়ামত দান করেছেন সে ব্যাপারে অকৃতজ্ঞ। আল্লাহ যদি প্রত্যেকের ক্ষুধা নিবারণের জন্য অবাধ সুযোগ দিতেন এবং সকলকে অবিচার ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের অনুমতি দিতেন তাহলে মানব সমাজ সম্ভব হতো না এবং ব্যক্তি বিশেষ জীবন ধারণ করতে

www.waytojannah.com

পারতো না। অতএব, আল্লাহ মানুষের কার্যকলাপের একটি সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই সীমা *(হাদ্)* হচ্ছে আমরা যাকে আইন (হুকুম) বলি ঠিক তাই। এতে কোন কোন কাজ নিষিদ্ধ করে এবং অন্যান্য কাজের তাগিদ প্রদান করে মানুষের কাজ বিভিন্ন পর্যায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এতে মানুষের আদিম স্বাধীনতাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে যাতে তা ব্যক্তিবিশেষ বা সমাজের জন্য যতোটা সম্ভব কল্যাণকর হয়ে ওঠে।

আইন স্বভাবত প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে না, বরং যেসব ব্যাপারের আইনগত তাৎপর্য রয়েছে এরূপ নির্দিষ্ট সংখ্যক বিষয়ে আইনের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে। রোমান আইন শাস্ত্রবিদগণ বলেছেন, *লেজিস ভার্চুস হায়েক এস্ট, ইম্পারারে, ভেটারে, পারমিটারে, পিউনিরে।*

ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ইসলামী আইন আইনগত হস্তক্ষেপের নিম্নোক্ত দু'টি নতুন দিক সংযোজিত করেছে ঃ 'যেসব জিনিস গ্রহণযোগ্য' এবং 'যে সব জিনিস তিরস্কারযোগ্য'। তাই আপাতত দণ্ড বিষয়ক (পীন্যাল) দিক বাদ দিয়ে আমরা সুস্পষ্ট ('পজিটিভ') আইনের সামগ্রিক ক্ষেত্রের প্রতিনিধিত্বকারী পাঁচটি শ্রেণী পাই। আকার যাই হোক ঐসব বিধির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই, অর্থাৎ জনগণের কল্যাণ *(মাসলাহা)*। তাই মূলত স্বর্গীয় ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে মানবিক এই আইন আপাতদৃষ্টিতে মনে না হলেও মানুষের মঙ্গল ছাড়া এর আর কোন লক্ষ্য নেই। কারণ যে বিজ্ঞতা ও দয়ার মূল উৎস আল্লাহ তা যেখানে প্রতিফলিত হয় না সেখানে 'তাঁর' কিছুই করণীয় নেই।

আত্মা ও দেহ সমন্বিত মানুষের জীবন দ্বিবিধ, নৈতিক এবং দৈহিক। মানব জাতির শৃঙ্খলা বিধানের জন্য আল্লাহ যেসব বিধি বা সীমা নির্ধারণ করেছেন তার কোন কোনটির সঙ্গে আত্মার জীবনের এবং কোন কোনটির সঙ্গে দেহের জীবনের সম্পর্ক রয়েছে। ধর্ম ও আইন দুটি পৃথক ব্যবস্থা হলেও তারা পরস্পরের পরিপূরক। কারণ সাধারণ লক্ষ্যের মধ্য দিয়ে তারা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং সেই লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের মঙ্গল। ঈমানের ভিত্তিগুলি আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ামক। অনন্ত জীবন লাভের জন্য মানুষকে কি বিশ্বাস করতে হবে এগুলি তা নির্ধারণ করে। সুস্পষ্ট আইন (শারি'আহ, সরল পথ) পার্থিব উদ্দেশ্যে পরিচালিত মানবিক কার্যকলাপের বিধান। এটি সেই পূর্ণাঙ্গ গঠনের সম্পূরক যার ঈমানের দিক হচ্ছে আত্মা। ঈমানের যথাযথ স্থান হচ্ছে অন্তর, অর্থাৎ মানুষের আভ্যন্তরীণ জীবন। সুস্পষ্ট আইনের যথাযথ স্থান হচ্ছে বাহ্যিকভাবে যতোটা বিস্তৃত হয় সে পর্যন্ত মানুষের কার্যকলাপ। এর কোন কোনটি ইসলামের নিম্নোক্ত মৌলিক নির্দেশসমূহ পালনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঃ আল্লাহ্র একত্ব, নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ। অন্তঃকরণ আইনজীবীদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, তাই এখানে বিশ্বাসের ('অন্তঃকরণের কার্যকলাপ') কোন প্রশ্ন নেই; বরং মুসলিম আইনের নির্দেশ অনুযায়ী ঈমানদারের পক্ষে বাধ্যতামূলক বাহ্যিক ভক্তি প্রদর্শন বা ইবাদতের মধ্য দিয়ে দেহের যেসব কার্যকলাপ সূচিত হয় সেই প্রশ্নই এখানে সংশ্লিষ্ট।

www.waytojannah.com

এসব মৌলিক নির্দেশকে (এবং এরপর সরকারী আইন অনুযায়ী যেসব কর্তব্যের কথা উল্লেখ করা হবে সেগুলিকে) 'আল্লাহ্র অধিকার' বলা হয়, কারণ এগুলির বিষয়বস্তু হচ্ছে স্রষ্টার প্রতি মানুষের কর্তব্য। ব্যক্তিগত পছন্দের ওপর তা নির্ভর করে না।

কিন্তু মানুষ বলতে কেবল আত্মা বোঝায় না, দেহও বোঝায়। তাই তার পার্থিব অস্তিত্বের প্রয়োজন মেটাতে হয়। এখানেই সামাজিক জীবনের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ সত্য নিহিত। *দুররাল মুখতার*-এ বলা হয়েছে, 'মানুষ স্বভাবত একটি রাজনৈতিক জীব।' কারণ অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় সে এককভাবে বাঁচতে পারে না। তার জন্য সাহায্য ও সহচর জীবদের সমাজের প্রয়োজন। কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তির সহজাত প্রবণতা বিভিন্ন ধরনের, তাদের প্রয়োজন অনেক এবং পৃথক ও সমষ্টিগতভাবে তাদের কার্যক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। মানুষ তার সঙ্গীদের সাহায্য কামনা করতে বাধ্য হয়। তাই বহুমুখী ও জটিলতা পূর্ণ স্বার্থ সম্পর্ক ও আদান প্রদানের উদ্ভব হয়। এগুলিই হচ্ছে সমাজের মূল ও প্রধান উৎস এবং এর হাতিয়ার হচ্ছে অর্থ। প্রাচীন গ্রীক ধ্যান-ধারণার প্রভাব কতো গভীর ও সুদূরপ্রসারী উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে তা আমরা সহজে অনুমান করতে পারি। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আমরা অর্থের ভূমিকায় এই প্রভাব লক্ষ্য করতে পারি। এই অর্থ ব্যবস্থা 'দিমাশকী'-তে বিকাশ লাভ করেছে এবং তা কিছুটা *ডাইজেস্ট*-এর (২০ খণ্ড) ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনীয়।

সামজিক জীবন থেকে উদ্ভূত সম্পর্কসমূহ সুস্পষ্ট আইনের উৎস ও যথাযথ বিষয়। পুনরুৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা থেকে যৌন মিলন ও পরিবার গঠনের উদ্ভব হয়। অতএব বিবাহ থেকে আইনগত সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ধরনের পেশা এবং ব্যক্তি বিশেষের বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ও আদান প্রদানের এমন এক জাল সৃষ্টি করে যাকে আইন শাস্ত্রবিদরা সাধারণভাবে আইনগত কার্যকলাপ রূপে উল্লেখ করেন। এগুলি আমাদের দেওয়ানী ও বাণিজ্যিক আইনের অনুরূপ। কিন্তু মুসলিম আইন ব্যবস্থায় রোমান আইনের ন্যায় এগুলিকে বিভিন্ন শাখায় পৃথক করা হয়নি। ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যুতে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন দেখা দেয় এবং এটি পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও বাটোয়ারা সংক্রান্ত বিধি দ্বারা পরিচালিত হয়। সর্বশেষে সামাজিক শৃংখলা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা থেকে একটি দণ্ড বিষয়ক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। এ বিষয়টি পরবর্তীকালে আরো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

আইন একটি সামাজিক ব্যাপার। এর একটি দিক সমাজের সঙ্গে এবং অপরদিক ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যা কিছু ব্যক্তিগত স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় তা আল্লাহ্র অধিকার হিসাবে গণ্য। কারণ ইসলামী ধারণায় আল্লাহ প্রাচীন *সিভিটাস*-এর ধারণার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। স্বাধীনতা, পৃষ্ঠপোষকতা, বিবাহ, আত্মীয়তা, সুদ নিষিদ্ধকরণ এবং দণ্ডবিষয়ক আইনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিধিসমূহ আল্লাহ্র অধিকারভুক্ত। এই বিধিগুলিকে উপেক্ষা করা যায়

www.waytojannah.com

Contents

না, কারণ এগুলি সাধারণের কল্যাণ, অথবা বলা যায় সাধারণের শান্তি–শৃংখলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ব্যক্তিগত ইচ্ছার ওপর এগুলি নির্ভরশীল নয়। অন্য শ্রেণীর সম্পর্কগুলি ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগত ব্যাপার। এগুলি মানুষের অধিকার হিসাবে অভিহিত।

আইনের মৌল ভিত্তি হিসাবে স্বাধীনতা থেকে শুরু করে মুসলিম আইন বিশেষজ্ঞগণ একটি দ্বৈত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন ঃ

১. স্বাধীনতার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই তার সীমা নিহিত, কারণ সীমাহীন স্বাধীনতার অর্থ আত্মবিনাশ––আর এই সীমাই হচ্ছে বৈধ আদর্শ বা আইন।

২. কোন সীমাই স্বেচ্ছাচারমূলক নয়, কারণ এর উপকারিতা দ্বারা কিংবা ব্যক্তি বিশেষের বা সমাজের সর্বাধিক কল্যাণ দ্বারা এটি নির্ধারিত হয়। উপকারিতা আইনের ভিত্তি এবং এটি নিজেই তার সীমা ও বিস্তৃতি খুঁজে নেয়।

এসব মূলনীতির বাস্তব দিক উপলব্ধি করার জন্য আমরা বিভিন্ন আইনগত নিয়মবিধির ওপর দৃষ্টি বুলাতে পারি। পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসাবে মানুষকে এমন এক ব্যক্তিত্ব দেওয়া হয়েছে যা অধিকার এবং কর্তব্য উভয়টি সম্পর্কেই অনুভূতিশীল। এগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে ব্যক্তিবিশেষ হিসাবে মানুষের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার অধিকার। স্বাধীনতা প্রত্যেক লোকের জন্মগত অধিকার। দাসত্ব এই বিধির একমাত্র ব্যতিক্রম। 'আদম ও হাওয়া স্বাধীন ছিলেন', এই বক্তব্য থেকে আইন শাস্ত্রবিদগণ বিভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছেন ঃ

ক. যে পরিত্যক্ত শিশুর মর্যাদা অজ্ঞাত তাকে স্বাধীন মনে করা হয়;

খ. যে স্বাধীন লোককে ক্রীতদাস হিসাবে দাবি করা হয় তার বিরুদ্ধে আইনত স্বাধীনতার বিপরীত প্রমাণ প্রদর্শিত না হওয়া পর্যন্ত সে প্রাথমিকভাবে তার স্বাধীনতা প্রমাণ করতে বাধ্য নয়;

গ. সন্দেহের ক্ষেত্রে অনুমান স্বাধীনতার পক্ষে।

স্বাধীনতার অর্থ আত্ম–পরিচালনা। সর্বপ্রকার মানবিক অস্তিত্বের সর্বময় কর্তা আল্লাহ ছাড়া স্বাধীন লোকের আর কোন প্রভু নেই। সে একমাত্র 'তাঁর' কাছেই বশ্যতা স্বীকার করবে। তাই স্বাধীনতা খুশিমত ভোগ করা যায় না। এমন কি স্বতঃস্ফূর্তভাবে দাসত্বের স্বীকৃতিও আইন বৈধ হিসাবে স্বীকার করে না। একই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আইন আত্মহত্যা নিষিদ্ধ করে এবং ধর্ম তা অনুমোদন করে না।

মালিকানা স্বত্বের মতবাদের ক্ষেত্রেও একই মূলনীতি ও পদ্ধতিগুলি প্রযোজ্য। সম্ভাবনার দিক দিয়ে যেকোন লোক যেকোন জিনিসের অধিকারী হতে পারে, কারণ মানুষের ভোগ করার জন্যই পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। সম্পত্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহ এই অধিকারের একটি সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এমনিভাবে প্রত্যেক লোক জানতে পারে যে, সম্পদের সাধারণ ভাণ্ডার থেকে আল্লাহ তার জন্য কতোটা

www.waytojannah.com

নির্ধারণ করেছেন। এমনিভাবে সামাজিক শৃংখলা বজায় রাখা হয়। কিন্তু একথা মনে করা ভুল হবে যে, অধিকার হিসাবে সম্পত্তি সীমাহীন। নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই অধিকারের সীমা এবং প্রয়োজনের সমাপ্তি নিহিত। মানুষ যাতে তার অস্বিত্ব বজায় রাখতে পারে সেজন্যই তাকে পার্থিব ধনসম্পদ দেওয়া হয়। অর্থাৎ এসব সম্পদ উদ্দেশ্যহীনভাবে কিংবা নিজের খেয়াল অনুযায়ী অপচয় না করে যাতে কাজে লাগান হয় সেটিই হচ্ছে উদ্দেশ্য। কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী মুসলিম আইন রোমান আইনের *জাস্ উটোণ্ডি এট আবটেণ্ডি* উপক্ষো করে, প্রকৃত প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় না হলে সম্পদের যে কোন ব্যবহারকে এক ধরনের অপচয় হিসাবে অভিহিত করে এবং যেকোন অপ্রয়োজনীয় উপভোগকে পাপ মনে করে। ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে অপব্যয় এক ধরনের মানসিক রোগ যা আইনগতভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। এটি ধনসম্পদের ব্যবহারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে মিতাচারের তাগিদ দেয়, কারণ এটিই হচ্ছে আইনের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এবং যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ মানব জাতিকে তার সম্পদ দান করেছেন সেই উদ্দেশ্যের সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ।

চুক্তি সংক্রান্ত ক্ষমতার ক্ষেত্রেও অপরূপ বৈশিষ্ট্যসমূহ দেখা যায়। প্রত্যেক লোকই কোন বাধ্যবাধকতায় যেতে এবং অন্যদের বাধ্যবাধকতার আওতাভুক্ত করতে সক্ষম, কারণ নিজস্ব অস্তিত্বের মাধ্যমেই তাকে এই বৈধ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই দুর্বোধ্য কর্মক্ষমতারও সীমা আছে এবং তা বিষয়টির স্বার্থ বা উপকারিতা দ্বারা নির্ধারিত হয়। শিশুদের এবং মানসিক রোগ, অমিতব্যয়িতা, অসুস্থতা বা দেউলিয়াত্বের দরুন মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের চুক্তির ওপর আরোপিত বিভিন্ন বিধি-নিষিধের মাধ্যমে এই সীমা প্রকাশ করা হয়েছে। এসব সীমাকে সাধারণত বন্ধন বা শৃংখল বলা হয়। অক্ষমের সম্পত্তিকে তার অক্ষমতার পরিণাম থেকে রক্ষা করার জন্য আইনের উদ্দেশ্য থেকেই এগুলি আরোপ করা হয়েছে। একইভাবে প্রত্যেক লোক সে অন্যের অসুবিধা সৃষ্টি করছে কিনা সে কথা বিবেচনা না করে নিজের অধিকারকে কাজে লাগাতে পারে, কারণ প্রত্যেক অধিকারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তির সুযোগ আদায়। কিন্তু নিজস্ব সুযোগ আদায়ের এই ক্ষমতারও সীমা আছে এবং তা দ্বিবিধভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ ক. কোন লোকই নিজের কোন লাভ ছাড়া অন্যদের ক্ষতিগ্রস্ত করার একমাত্র উদ্দেশ্যে অধিকার প্রয়োগ করতে পারে না; খ. অধিকার আদায় করতে গেলে অন্যরা যদি সীমার বাইরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে নিজের কল্যাণের জন্যও সে অধিকার প্রয়োগ করতে পারে না। সমগ্র ব্যবস্থার প্রত্যেকটি অংশের ক্ষেত্রেই এই বিধি প্রযোজ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ কন্যাদের ওপর পিতার কর্তৃত্ব, ক্রীতদাসের ওপর প্রভুর অধিকার, স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার এবং প্রতিবেশী সুলভ সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এই বিধি প্রযোজ্য। সবগুলি ক্ষেত্রে যে যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি

www.waytojannah.com

অনুসরণ করা হয় তা সবসময় একই ঃ একবার মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত হলে আইন কর্তৃপক্ষ একটি সীমা নির্ধারণে সতর্ক থাকেন। অন্যথায় আইন সাহায্য করার পরিবর্তে মানবজাতির শত্রু হতে পারে।

একজন মুসলমানের জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপার থেকে শুরু করে তার নৈতিক ও সামাজিক অস্তিত্বের মূলনীতি পর্যন্ত প্রতিটি অংশের জন্য বিভিন্ন বিধি সম্বলিত এই ব্যবস্থাকে 'সোজা পথ (*শারি'আহ,* শরীয়ত) বলা হয় এবং প্রত্যেক ঈমানদারকে তা অবশ্যই অনুসরণ করতে হয়।

এখান থেকেই আইন-বিজ্ঞান (*আল্-ফিকাহ্,* ফেকাহ) গুরুত্ব লাভ করেছে। মূলত ধর্মীয় বিজ্ঞান হিসাবে এটি ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত এবং যারা এর চর্চা করেন তাঁদের অত্যন্ত বিজ্ঞ হিসাবে সম্মান করা হয়। নিম্নোক্ত হানাফী সংজ্ঞা থেকে এর তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় ঃ 'আইন বিজ্ঞান হচ্ছে অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান, যার দ্বারা মানুষ পৃথিবীতে ন্যায়ানুগ জীবন যাপনে সক্ষম হয় এবং নিজেকে ভবিষ্যত জীবনের জন্য তৈরি করতে পারে।' রোমান আইনশাস্ত্রবিদরা 'রিরাম হিউম্যানারাম আট্‌ক্ ডিভাইনারাম সায়েনশিয়া' বলতে নিজেদের অনুসৃত পন্থা সম্পর্কে যা বোঝাতে চেয়েছেন এখানে তা আরো যথার্থতার সঙ্গে প্রযোজ্য।

সম্প্রদায়ের নেতা

শাসক আইনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ঃ আইনের ন্যায়ই তিনি অপরিহার্য। আমরা দেখেছি যে, আইন মানব সমাজ ও মানুষের সামাজিক স্বভাবের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি বাস্তব সামাজিক ব্যাপার কিন্তু মানুষ স্বভাবত সামাজিক হলেও দুর্ভাগ্যবশত ভালো জীব নয়। 'মানুষ পরস্পরের শত্রু' (কুরআন ২০ ঃ ১২১)। তাদের যদি তাদের সহজাত হিংসা ও লোভের অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে তারা পৃথিবীকে সম্পূর্ণ তছনছ করবে। আইন মানুষের দুষ্ট প্রকৃতির বিরুদ্ধে একটি স্থায়ী সংগ্রাম। একজন রক্ষক না থাকলে আইন নিছক ফাঁকা বুলিতে পর্যবসিত হবে।

মানুষের কল্যাণের জন্য যেসব কারণে মানুষের কার্যকলাপ সীমিত হওয়া উচিত সেই একই কারণে এও অত্যাবশ্যক যে, তাদের পরিচালিত করার জন্য একজন শাসক থাকা উচিত, যিনি প্রয়োজন বোধে তাদেরকে আনুগত্যে বাধ্য করবেন। অতএব আল্লাহ্ একজন শাসক (*ইমাম* বা *খলীফা*) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এবং তার আদেশসমূহ পালনের নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে আইনের আওতাকে পূর্ণাঙ্গতা দান করেছেন। কেবলমাত্র আল্লাহ্ই সর্বোচ্চ ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেন। কারণ কোন মানুষই মানুষ হিসাবে তার সহচরদের ওপর শাসন ক্ষমতার অধিকারী নয়। মানুষের মধ্যে পিতা ও সন্তান, শিক্ষক ও ছাত্র, প্রভু ও ভৃত্য, শাসক ও প্রজা প্রভৃতি সব রকমের কর্তৃত্বের একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে সেই আল্লাহ্‌র

www.waytojannah.com

ইচ্ছা যিনি সব ক্ষমতার উৎস এবং যিনি কিছু কিছু লোককে অন্যদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন পরিমাণে সেই ক্ষমতা অর্পণ করেন। 'আল্লাহ্ রাজা করেন এবং আল্লাহ তাদের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করেন।'

নেতা ও তাঁর নির্দেশসমূহের প্রতি আনুগত্য প্রতিষ্ঠা একটি ধর্মীয় কর্তব্য এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের জন্য অত্যাবশ্যক। কারণ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত কোন ক্ষমতা না থাকলে কোন মানব সমাজ এবং কোন ধর্ম থাকতো না। সেটি নিয়ম-শৃংখলা বিরোধী ও বিপথগামী লোকদের এমন একটি আখড়া হতো যেখানে ঈমানের সর্বোচ্চ স্বার্থসহ যেসব জিনিস জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তোলে তার সবকিছুই বিলুপ্ত হতো। কেননা জীবনের এসব জিনিসের ভিত্তি প্রত্যেকের এবং সকলের জন্য শান্তি-শৃংখলা ও নিরাপত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। 'রাজা রাষ্ট্রীয় মণ্ডপের প্রধান স্তম্ভ'। তাই এ ধরনের একজন নেতা প্রতিষ্ঠা একটি ধর্মীয় কর্তব্য। প্রয়োজনীয় গুণাবলীসম্পন্ন প্রত্যেক মুসলমানেরই এই কর্তব্যবোধ থাকা উচিত। এই কর্তব্য পরিহার করার অর্থ ঈমানদার সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। 'ঈমান ছাড়া যিনি মৃত্যু বরণ করেন তার মৃত্যু পৌত্তলিকের মৃত্যু।'

এই যুক্তিতে একই সময়ে কেবল একজন নেতাই নেতৃত্ব করতে পারেন ঃ ক. কারণ স্বর্গীয় আইনের একত্ব যিনি সে আইন বলবৎ করবেন সেই নেতারও একত্ব চায়; খ. কারণ নেতার কর্তৃত্ব যদি একাধিক লোকের হাতে যায় তাহলে সামাজিক শৃংখলা বজায় থাকতে পারে না— আল কুরআন বলেন, 'যদি একাধিক আল্লাহ থাকতেন তাহলে বিশ্বজগৎ ধ্বংস হয়ে যেত' (২১ ঃ ২২)। এই এক নেতার নিজস্ব দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় নৈতিক ও দৈহিক গুণাবলী থাকতে হবে, যেমন ঃ স্বাধীনতা—খলীফা একজন ক্রীতদাস হতে পারেন না, কারণ যিনি নিজেকে অবাধে প্রয়োগ করতে পারেন না তিনি একজন নেতার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেন না; পুরুষ—কারণ হাদীসে বলা হয়েছে, 'যে জাতির নেতা মহিলা সেজাতি সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে না'; বিধি সংগত সক্ষমতা অর্থাৎ বয়ঃসন্ধি (বালেগ) ও নৈতিকক্ষেত্রে ত্রুটিমুক্তি; দৈহিক সুস্থতা অর্থাৎ যেসব দৈহিক অপূর্ণতা তাঁর দায়িত্ব সম্পাদনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে সেগুলি থেকে মুক্তি; স্বর্গীয় আইনের জ্ঞান—এই জ্ঞান কতদূর থাকতে হবে সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে-শান্তি ও যুদ্ধের সময়ে তার ওপর অর্পিত স্বার্থসমূহ সংরক্ষণের জন্য বিচক্ষণতা ও সাহস ; নৈতিক জীবন, যা স্বর্গীয় আইন ও মুসলিম নীতিশাস্ত্রের নির্দেশসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ; সর্বশেষে উদ্ভব, অর্থাৎ কুরাইশ বংশোদ্ভূত হওয়ার ব্যাপার। মহানবী (সা) কুরাইশ উপজাতি থেকে এসেছেন। আরব পরিবারগুলির মধ্যে তাদের প্রাধান্য প্রাচীনকাল থেকে স্বীকৃত এবং তা ধীরে ধীরে প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়। এতদ্বারা একথা বোঝায় না যে, এই উপজাতির কোন বিশেষ শাখার ওপর ক্ষমতা ন্যস্ত করতে হবে ঃ এই অদ্ভুত বিধিনিষেধের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে, খলীফাকে রক্ত সম্পর্কের দিক দিয়ে আরব জাতিভুক্ত

www.waytojannah.com

হতে হবে। অতএব খিলাফত কোন বিদেশীর হাতে যাক এটি মূলনীতির বিরোধী, এবং পরবর্তীকালের (ভিন্ন জাতির) খিলাফত অবৈধ হওয়ার পিছনে এটি অন্যতম কারণ।

এসব অবশ্য প্রয়োজনীয়তা নির্দেশিত হওয়ার পর একথা পরিষ্কার যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য একজন নেতা নির্বাচন কোন সুযোগ বা হিংসাত্মক কার্যকলাপের ওপর ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে না বরং ঐসব উৎকৃষ্টতম গুণের যথাযথ প্রতিফলনের ভিত্তিতেই নেতা নির্বাচন করতে হবে। অতএব, সমগ্র মুসলিম জাতি নির্বাচক মণ্ডলী হতে পারে না। কেবল তারাই নির্বাচক হবেন যারা নিজেদের সংস্কৃতি, সামাজিক মর্যাদা, পার্থিব ব্যাপারে অভিজ্ঞতা ও নৈতিক চরিত্রের দরুন বিচারক হওয়ার উপযুক্ত। 'অসি ও মসীর অধিকারী ব্যক্তিদের' তথা উল্লেখযোগ্য সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিদের ওপর নির্বাচকের দায়িত্ব অর্পিত হবে। তাদেরকেই 'বন্ধন করার ও বন্ধন মুক্ত করার' তথা সমগ্র সম্প্রদায়ের নামে এরূপ চুক্তি সম্পাদন করার ক্ষমতা দেওয়া হয় যার ওপর রাজার ক্ষমতা এবং তাঁর প্রজাদের কাছ থেকে আনুগত্য নির্ভরশীল। আইন অনুযায়ী নির্বাচন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জনসাধারণ, কিংবা তাদের পক্ষে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণ তাদের মনোনীত ব্যক্তির ওপর সর্বোচ্চ ক্ষমতা অর্পণ করেন। এটি হচ্ছে চুক্তির প্রস্তাব (*ইকাদ*) যা নির্বাচিত ব্যক্তি গ্রহণ করার পর বাধ্যতামূলক চুক্তিতে (*আকদ*) পরিণত হয়।

হিজরীর প্রথম শতকে রীতি অনুসারে খলীফা নির্বাচনের অন্য একটি পন্থা প্রবর্তিত হয়—ক্ষমতাসীন খলীফা কর্তৃক একজন উত্তরাধিকারী নিয়োগ। এ ধরনের নিয়োগ চুক্তির প্রস্তাবের সমতুল্য। নিয়োগের প্রস্তাব গৃহীত হলে তা চুক্তিতে পরিণত হয়।

চুক্তিটি যেভাবে সম্পন্ন করা হয় তাকে *বায়'আহ্* (বায়াত) বলা হয়। এই শব্দটি দ্বারা ইতিপূর্বে কোন ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ সুসম্পন্ন করা বোঝাতো। *বায়'আহ* চিরাচরিত করমর্দনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতো। হযরত আবু বকর (রা)-এর সময় থেকে এই করমর্দন নির্বাচিত ব্যক্তির সম্মতির প্রতীক ছিল।

(ক) স্বয়ং খলীফার ক্ষেত্রে, এবং (খ) তার শাসনাধীন জনগণের ক্ষেত্রে *বায়'আহ* বা শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের প্রতিফল কি তা আলোচনা করা যাক।

(ক) পদে অভিষিক্ত হওয়ায় সম্মতি জ্ঞাপন করে খলীফা নিজের জন্য এরূপ বাধ্যবাধকতা মেনে নেন যে, তিনি স্বর্গীয় আইনে নির্দেশিত সীমার মধ্যে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। এটিই হচ্ছে তার প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য, কারণ মানব জীবনের উদ্দেশ্য এই পার্থিব জগতের স্বার্থ নয়, যা ব্যর্থ ও অর্থহীন এবং দুর্নীতি ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যার সমাপ্তি, বরং ঈমানই সত্যিকারের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যা মানুষকে অনন্ত জীবনে পরিচালিত করে।

(খ) খলীফা ইসলামের পার্থিব স্বার্থসমূহ সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যেমন সীমান্ত রক্ষা, অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, সরকারী সম্পত্তির

www.waytojannah.com

ব্যবস্থাপনা এবং ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা। এই দ্বিবিধ দায়িত্ব সম্পাদন করতে গিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতা মহানবীর প্রতিনিধি *(খলীফা) লোকাম টেনেন্স্* হিসাবে কার্যকরভাবে সক্রিয় হন।

মহানবী (সা)-এর উত্তরাধিকারিগণ যে আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তার উত্তরাধিকারী ছিলেন না। বস্তুত তাঁরা মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও পার্থিব স্বার্থসমূহের উন্নতি বিধানে মহানবীর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্বে নিযুক্ত প্রতিনিধি ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। তাঁরা নিজেরাও এটাই দাবি করতেন। হযরত আবূ বকর 'আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি' *(খালীফাতুল্লাহ)* উপাধি গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং তিনি 'আল্লাহ্‌র নবীর প্রতিনিধি' উপাধি গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট থাকেন। পরবর্তীকালে হযরত 'উমরের সময় *আমিরুল মু'মিনিন* (ঈমানদারদের নেতা) উপাধি প্রচলিত হয়। এই উপাধিতে সর্বময় ক্ষমতার প্রতিনিধির সংজ্ঞা আরো প্রকৃষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এই সংজ্ঞা অনুসারে তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী *(মালিক)* নন, বরং শব্দটির মূল তাৎপর্য অর্থাৎ *প্রাইমাস ইন্টার পারেস* অনুসারে একজন শাসক।

ইমাম নামটি দ্বারা যথাযথভাবে *অ্যান্টিস্টেস* বোঝায়। তিনি নামাযের পরিচালক। এতদ্বারা সব সময় শাসকের সর্বোচ্চ অধিকারমূলক পদ বোঝায়। তাঁর ধর্মীয় পদ অন্যান্য সবরকমের ক্ষমতার উৎস। ইসলামের ধর্মীয় অনুশাসনমূলক আইন অনুযায়ী এগুলি হচ্ছে বিচার, ধর্মযুদ্ধ *(জিহাদ)* এবং শুল্ক নিয়ন্ত্রণ। লেখকরা কোন প্রকার বিশ্লেষণ ছাড়া যখন ইমামের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন তখন তাঁরা এতদ্বারা ক্ষমতার সর্বোচ্চ উৎস রাষ্ট্রের শাসক বোঝান, যার নামে সর্বপ্রকার সরকারী কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। এসব সরকারী কার্যক্রমের কোনটিই কোন কোন কর্তৃপক্ষের ন্যায় খলীফাকে ধর্মগুরুর বা পবিত্র বৈশিষ্ট্য দান করে না।

সত্যিকার ব্যাপার হচ্ছে যে, খলীফা ধর্মীয় নেতা হিসাবে প্রধান পুরোহিত বা ধর্মগুরু নন ঃ তাঁর কোন প্রকার যাজকীয় বৈশিষ্ট্য নেই, কারণ ইসলামে কোন পুরোহিততন্ত্র কিংবা নবীসুলভ উত্তরাধিকার নেই। রাজনৈতিক ক্ষমতাবলে তিনি প্রভুও *(রব)* নন। খিলাফত সাধারণের কল্যাণের জন্য স্বর্গীয় আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন পদ নয়। এটি কল্যাণমূলক কাজ, রক্ষণ এবং পবিত্র আইন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের একটি জিম্মা। খলীফাকে প্রায়ই মেষপালকের সঙ্গে তুলনা করা হয় এবং তিনি তার চারপাশে সমবেত মেষপালের ঐক্যের প্রতীক। মেষপালক যেমন তার মেষপাল দেখাশোনা করেন, এবং শিক্ষাগুরু যেমন তার শিষ্যকে সাহায্য করেন তেমনি একটি সংস্থা হিসাবে অক্ষম মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা ও যত্নের জন্য শাসক নিয়োগ করা হয়। তিনি ঈমানদার সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধায়ক *(ওয়াকিল)*। একজন শাসক অবশ্যই তাঁর সম্প্রদায়ের কল্যাণ কামনা করবেন, 'কারণ এই উদ্দেশ্যেই জনসাধারণের ওপর শাসক প্রতিষ্ঠা করা হয়।'

www.waytojannah.com

এই মূলনীতি থেকে তার কার্যকলাপ জনসাধারণের বৈধতা ও সীমা লাভ করে। তত্ত্বাবধায়ক তার প্রভুর কাছে তিনি যা করেছেন তার সত্যিকার হিসাব নিকাশ দিতে বাধ্য, তেমনি খলীফাও আল্লাহ্‌র কাছে হিসাব নিকাশ দিতে বাধ্য। আবূ ইউসুফ (ইমাম) খলীফা হারুনুর রশীদকে লেখেন, 'যে মেষপালকে আপনার জিম্মায় দেওয়া হয়েছে তাদের তত্ত্বাবধান করার জন্য আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি.... যেহেতু মেষপালককে তার অধীনে ন্যস্ত মেষপালের হিসাব নিকাশ দিতে হয়, তাই প্রভু আপনার কাছ থেকে হিসাব নিকাশ চাইতে পারেন।'

জামা'আহ (জামাত), ইমাম—এই দু'টি সহজ কথার মধ্য দিয়ে ইসলামের সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র সম্পর্কে এর ধারণা সংক্ষেপে প্রতিফলিত হয়েছে।

রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বমূলক ও নির্বাহী ক্ষমতা খলীফার মধ্যে কেন্দ্রীভূত এবং তাঁর কাজ হচ্ছে আইন যখন সুস্পষ্ট এবং বিধিসম্মত তখন সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করা। এক্ষত্রে এটির সামান্যতম পরিবর্তনের ক্ষমতাও তার নেই। যথাযথভাবেই তাকে তা প্রয়োগ করতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আইন কখনো কোন বিচারককে দণ্ড স্থগিত রাখার ক্ষমতা দেয় না। যেসব ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট বিধি নেই সেখানে তার স্বাধীনতা কার্যত সীমাহীন। কারণ তিনি কোন সাধারণ প্রতিনিধি নন, তিনি তত্ত্বাবধায়ক। তাই আইনের বাস্তবায়ন তার বিচার শক্তির ওপর নির্ভরশীল। বিচারের ক্ষেত্রে এই স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ছাড়াও জনসাধারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বহু ব্যাপারে তার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা রয়েছে, যেমন যুদ্ধ পরিচালনা, যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ *(গনিমত)* বন্টন, খাজনা ধার্য করা, সরকারী রাজস্বের বিধি ব্যবস্থা করা, সরকারী কর্মচারী নিয়োগ।

জনসাধারণের ক্ষেত্রে *বায়'আহ* (বায়াত) গ্রহণের অর্থ তাদের নেতাকে অনুসরণ করার এবং তাঁর প্রতি অনুগত থাকার একটি অঙ্গীকার ঃ 'ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অর্থ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা', 'কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস হলেও তোমাদের নেতার প্রতি অনুগত হও।' সাহায্যের কর্তব্য *(নুসরাহ)* আনুগত্যের কর্তব্যের সঙ্গে যুক্ত এবং এতে যে ব্যক্তি অঙ্গীকারমূলক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন তিনি তার নেতার কর্তৃত্বের ওপর কিংবা মুসলমানদের নিরাপত্তার ওপর শত্রুর হামলার বিরুদ্ধে সাহায্য করার জন্য নেতা আহবান জানালে তাতে সাড়া দিতে বাধ্য।

এসব কর্তব্যের একমাত্র সীমা হচ্ছে দৈহিক বা নৈতিকভাবে সাহায্য প্রদানে অসম্ভব পরিস্থিতি। যখন কোন আদেশ মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত হয় কিংবা সুস্পষ্টভাবে স্বর্গীয় বিধানের পরিপন্থী হয়, যেমন শাসক যদি কাউকে হত্যা করার, ব্যভিচার করার, মদ্যপানের কিংবা নামায পরিহারের নির্দেশ দেন তাহলে শাসকের কর্তৃত্ব স্থগিত অবস্থায় থাকে। হাদীসে বলা হয়েছে 'পাপের প্রতি কোন আনুগত্য নয়।' খলীফা যতদিন পর্যন্ত মুসলিম সম্প্রদায়কে রক্ষার দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত ততদিন পর্যন্ত খলীফা ও জনগণের

www.waytojannah.com

পারস্পরিক অঙ্গীকার অলংঘনীয়। যেসব বিষয়ে জনসাধারণের আশা করার অধিকার আছে তিনি সেগুলি দিতে ব্যর্থ হলে তাঁর কর্তৃত্বের অবসান হয় এবং আইনত চুক্তিও বাতিল হয়ে যায়। দৈহিক অক্ষমতা কিংবা কাফেরদের হাতে বন্দী হওয়ার ন্যায় কোন পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা না থাকার দরুন এই পরিবর্তন ঘটতে পারে।

খিলাফতের যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো তাতে গোঁড়া মতাবলম্বী আইনশাস্ত্রবিদদের রাজনৈতিক পরিকল্পনা সূচিত হয়েছে। একে 'নবীসুলভ খিলাফত' আখ্যা দেওয়া হয়, যা সর্বোচ্চ ক্ষমতার একমাত্র বৈধরূপ। তাদের মতে মহানবীর প্রথম চারজন উত্তরাধিকারীর শাসনকাল ইসলামের স্বর্ণযুগ। এই চারজন খলীফাকে *খুলাফায়ে রাশিদীন* (সঠিক পন্থা অনুসারী খলীফা) বলা হয়। ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, এই সময়ের পর থেকে ইসলাম তার মূলনীতি থেকে সরে পড়ে এবং তার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। সত্যিকারের খিলাফতের স্থলে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি নিছক ক্ষমতা ও 'তলোয়ারের শাসন' যার সঙ্গে ধর্মীয় আইনের কোন সম্পর্ক ছিল না। বিভিন্নভাবে কথিত মহানবীর একটি হাদীসে বলা হয়েছে, 'আমার পরে আমীরগণ (অধিনায়ক) আসবেন, তাদের পরে রাজারা এবং তাদের পরে অত্যাচারীরা।' এই হাদীসে নিষ্ঠাবান মুসলমানদের দৃষ্টিতে খিলাফতের সংক্ষিপ্ত রূপ তুলে ধরা হয়েছে এবং তা মোটামুটিভাবে ইতিহাসের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বস্তুত ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদগণ যে খিলাফতের কল্পনা করতেন বাস্তবে কখনো তার অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু সূচনায় প্রথম দু'জন খলীফার আমলে তাদের কল্পনা প্রায় বাস্তবায়িত হয়েছিল, এবং পরিস্থিতি যদি অনুকূল হতো তাহলে উত্তম সরকারের বীজ অঙ্কুরিত হতে পারতো। কিন্তু মুসলমানদের প্রথম পুরুষ শেষ হতে না হতেই বিরাট রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বাস্তব প্রয়োজন এবং আরবদের দুর্বিনীত স্বভাব একযোগে খিলাফতকে উমাইয়াদের আমলে প্রথমে ব্যক্তিগত শাসনে রূপান্তরিত করে। অতঃপর আব্বাসীয়দের আমলে তা পারস্যের মতো রাজতন্ত্রে পরিবর্তিত হয়। বাহ্যত গোঁড়াপন্থী হলেও ভেতরে ভেতরে আব্বাসীয়দের স্বৈরতন্ত্র, হানাহানি এবং প্রশাসনিক অব্যবস্থা সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের পথে টেনে নেয়।

হিজরীর তৃতীয় শতকে খিলাফতের স্থলে সুলতান–শাসনের প্রবর্তন হয় এবং এটি অতঃপর সম্পূর্ণ আলঙ্কারিক পদে পরিণত হয়। সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ থেকে যেসব সামরিক কর্তার আর্বিভাব হয় বাস্তব কর্তৃপক্ষ হিসাবে তারাই তাদের শাসন বলবৎ করে। প্রদর্শনীমূলকভাবে তাদেরকে বৈধতা অর্পণ করে বাগদাদের খলীফাকে সন্তুষ্ট থাকতে হতো।

আইন শাস্ত্রবিদদের অপরিহার্য অবস্থান মেনে নিতে হয়। যতো কঠিন হোক প্রকৃত পরিস্থিতির যতোটা সম্ভব উন্নতি বিধানে তাঁরা সচেষ্ট হন। তারা এরূপ শিক্ষা দিতে শুরু

www.waytojannah.com

করেন যে, স্বর্গীয় আইনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলেও এবং পরিষ্কারভাবে হিংসাত্মক পন্থায় প্রতিষ্ঠিত হলেও নৈরাজ্য ও বেসরকারী হানাহানি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সরকার এখনো শ্রদ্ধা দাবি করতে পারে। এমনিভাবে শরীয়তের যে মূল লক্ষ্য সামাজিক শান্তি তা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞরা উপলব্ধি করেন যে, পুরনো পরিকল্পনা এতোটা উচ্চাশাপূর্ণ যে, তা বাস্তবে প্রয়োগ করা যায় না; অনেকেই স্বীকার করেন যে, ইমাম *শারি'আহর* বিধান অনুযায়ী সম্পূর্ণ নির্দোষ ব্যক্তি নাও হতে পারেন, খলীফার কুরাইশ বংশোদ্ভূত হওয়া অপরিহার্য নয়, এবং এমন কি একাধিক ইমামও থাকতে পারেন। বৈধভাবেই হোক আর কার্যতই হোক যিনি ক্ষমতাসীন ঈমানদারকে তার অনুগত হতে হবে। প্রকৃত ক্ষমতাসীন ব্যক্তি অত্যাচারী হতে পারেন কিংবা কেলেংকারিপূর্ণ জীবন-যাপন করতে পারেন, কিন্তু তাতে ঈমানদারের কিছুই করার নেই। 'ধৈর্যশীল হও, কাইসারের (সম্রাট) যা প্রাপ্য তা কাইসারকে দাও, যে পর্যন্ত সুবিচার না হয় সে পর্যন্ত অপেক্ষা করো।'

হিজরী পঞ্চম শতকে আল-গাযযালী তাঁর চিরাচরিত আন্তরিকতা সহকারে সমস্যাটি আলোচনা করেন। তিনি বলেন, 'আমরা যে স্বীকৃতি দিচ্ছি তা স্বতঃস্ফূর্ত নয়; কিন্তু প্রয়োজন নিষিদ্ধ জিনিসকে বৈধ করে। আমরা জানি যে, মৃত প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করা হালাল নয়, কিন্তু না খেয়ে মারা যাওয়া তার চাইতেও খারাপ। যারা বলেন যে, খিলাফত চিরকালের জন্য মৃত এবং কোন কিছু তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না আমরা তাদের জিজ্ঞেস করতে চাই : যথাযথভাবে গঠিত কর্তৃপক্ষের অভাবে নৈরাজ্য ও সামাজিক জীবনের অবসান, এবং যে ধরনেরই হোক ক্ষমতাসীন সরকারকে স্বীকৃতি দান—এই দু'টির মধ্যে কোনটি উত্তম? এই দু'টির মধ্যে আইন বিশেষজ্ঞদের শেষোক্তটিই গ্রহণ করতে হবে।'

৬৫৬ হিজরীতে (১২৫৮ খৃ) মঙ্গোলরা বাগদাদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়, খলীফাকে হত্যা করে এবং সমগ্র আব্বাসীয় পরিবারকে ধ্বংস করে। রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে দীর্ঘকালব্যাপী মৃত খিলাফতের কার্যত পরিসমাপ্তি ঘটে। এই যুগের পর ইতিহাসে মিসর ছাড়া সর্বত্র কেবলমাত্র সুলতানের উল্লেখ আছে। মিসরে খাঁটি হোক আর কাল্পনিক হোক জনৈক আব্বাসীয় খলীফার উপাধি অব্যাহত রাখা হয়। মামলুক শাসকদের সুবিধার জন্যই এই ফাঁকা পুতুলটিকে রাখা হয়। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে তুর্কীরা কায়রো অধিকারের পর এই বংশের সর্বশেষ চিহ্নটির সাক্ষাত পান। বলা হয়েছে যে, এই সর্বশেষ আব্বাসীয়র কাছ থেকে তুর্কী শাসকের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। কিন্তু আদৌ হয়ে থাকলেও এই হস্তান্তরের আইনগত কোন মূল্য নেই। কারণ খিলাফত এমন কোন মালিকানাস্বত্ব নয় যে, ইচ্ছা করলেই হস্তান্তর করা যায়। বরং এটি মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে একটি জিম্মা। অতএব, ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে না হলেও ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দ থেকে খিলাফত

www.waytojannah.com

প্রকৃতপক্ষে বিলুপ্ত হয়। দামেস্কের কাযী ইবনে জামা'আহ প্রকৃত অবস্থা ব্যক্ত করেন (আনু. ৭০০ হিজরী)। 'যে পর্যন্ত না তার চাইতে শক্তিশালী অপর একজন তাকে বহিষ্কার করে ক্ষমতা দখল করেন সে পর্যন্ত ক্ষমতাসীন শাসকের শাসন করার অধিকার থাকে। শেষোক্ত ব্যক্তি একই উপাধিতে শাসন করবেন এবং একই যুক্তিতে তাকে স্বীকৃতি দিতে হবে; কারণ যতো আপত্তিকরই হোক একবারে না থাকার চাইতে একটি সরকার থাকা উত্তম। দু'টি মন্দ জিনিসের মধ্যে কম মন্দ জিনিস আমাদের গ্রহণ করা উচিত।' মরক্কোর আইন বিশেষজ্ঞরা নিম্নোক্ত প্রবাদের মাধ্যমে সংক্ষেপে বিষয়টি তুলে ধরেন ঃ 'ক্ষমতা যার আনুগত্য তারই প্রাপ্য।'

দণ্ড বিষয়ক আইন

দণ্ড ব্যবস্থা সম্পর্কে বেশি কিছু বলার অবকাশ নেই। এই ব্যবস্থা হিব্রু আইনের ন্যায় একটি চোখের জন্য একটি চোখ, একটি দাঁতের জন্য একটি দাঁত এবং প্রতিশোধের আদিম ধারণার মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এতে কোন প্রকার কঠোরতা হ্রাস না করে বাইবেলের প্রাচীন আইনগত ধারণা অত্যন্ত আক্ষরিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এসব ধারণার একটি ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগত মূল্য রয়েছে। পরবর্তীকালের ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞগণ, এমন কি আরবের আইন বিশেষজ্ঞগণও প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণার পক্ষে কুরআনের আক্ষরিক ব্যাখ্যার বিরোধিতা করতে সাহস পাননি। তবে তাঁরা বিশ্লেষণ ও ভাষ্যের মাধ্যমে কুরআনের বক্তব্য বিষয়ের কঠোর প্রয়োগ লাঘবে সচেষ্ট হন।

ইসলামের উত্তরাধিকার

অত্যন্ত ব্যাপক অর্থেও ইসলামের উত্তরাধিকার প্রশ্ন আলোচনা কি বাঞ্ছনীয় হবে? প্রচলিত মতামত অনুযায়ী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আইনের একটি সাধারণ মিলনক্ষেত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা অর্থহীন। অটল বিশ্বাসের সুদৃঢ় কাঠামোতে আবদ্ধ ইসলামী ব্যবস্থাকে আমাদের ফর্মূলার আওতায় আনা যায় না। একটি ধর্মীয় আইন হওয়ায় এটি আমাদের ধ্যান-ধারণার বিপরীত এবং সে অনুযায়ী এর উন্নতি বিধান করা অসম্ভব। এক্ষেত্রে দুটি পৃথক এলাকার মধ্যে সাধারণত বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করা হয়। এই ব্যবস্থা সম্পর্কে খৃষ্ট ধর্ম ও অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইসলামেও একটি বিশেষ ধর্ম বিশ্বাস রয়েছে যা এর সমর্থকগণের প্রকাশ্য আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে না। কিন্তু এটিকে কঠোরতায় ভারাক্রান্ত করা সমীচীন হবে না, যেমনি সমীচীন হবে না খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ আনা। প্রত্যেক বড় বড় ধর্মীয় ব্যবস্থায় নিছক বিশ্বাসের বাইরেও কিছু কিছু জিনিস রয়েছে। সেন্ট টমাস আকিনাস অত্যন্ত ন্যায়ভাবেই বলেছেন ঃ 'আইনের যে মূল লক্ষ্য সাধারণ মঙ্গল ব্যক্তি, ঘটনা ও যুগ অনুযায়ী তার বিভিন্ন রকমের বহু উৎস থাকে।' ইসলামের চিন্তাবিদগণ এই বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করেছেন। আল্লাহ্‌র

Contents

প্রত্যাদেশের মূলনীতির সঙ্গে অ্যারিস্টটলের রাজনৈতিক মতবাদের সংমিশ্রণে আরব বিজ্ঞানে এমন একটি ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে যার সঙ্গে মধ্যযুগীয় খৃষ্ট ধর্মের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। এগুলি স্বাভাবিক এবং আকর্ষণীয়। এগুলি সম্পর্কেই আমরা সংক্ষেপে আলোকপাত করবো।

আমরা দেখেছি যে, সমাজ একটি আবশ্যকীয় বাস্তব বিষয়। এটি কোন বিশৃংখলাপূর্ণ আখড়া নয়, বরং একটি সাধারণ উদ্দেশ্য ও পারস্পরিক সাহায্য-সহায়তার বন্ধনে গ্রথিত একটি সমষ্টি। এখান থেকেই রাষ্ট্রের সামাজিক ও নৈতিক ধারণার উদ্ভব হয়েছে ঃ 'সরকারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে ইহকালে সমৃদ্ধির পথে এবং পরকালে মুক্তির পথে পরিচালিত করা।' এই উদ্দেশ্যই আইন দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছে 'আইনের কাঠামো সমাজের কাঠামো দ্বারাই নির্ধারিত হয় এবং বস্তুত এখান থেকেই এর বৈধতার উদ্ভব।'

মুসলমানরা এর সূচনা যেভাবে প্রদর্শন করেছেন তা খৃষ্টান মতবাদেরই অনুরূপ। ইতিহাসের প্রত্যুষে এমন এক মুহূর্ত ছিল যখন মানবজাতি একটি একক দল ছিল। অমঙ্গল সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় তারা স্বাভাবিক আইনের নির্দেশ অনুযায়ী একটি শান্তিপূর্ণ নৈরাজ্যে বাস করতো। কাবিল[১] পাপ করার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণযুগের অবসান হয়। মানুষের রিপুগুলি প্রবল হয়ে ওঠে এবং এতে সামাজিক বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়, সত্যিকারের বিশ্বাস নষ্ট হয় এবং বিশেষ বিশেষ আইনের প্রবর্তন হয়। আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে অমঙ্গল প্রতিরোধ, তার এই দু'টি প্রধান মূলনীতি ঃ সাম্য ও শুভেচ্ছা।

১. সাম্য ঃ মহানবী (সা) বলেছেন, 'সাদা লোক কালো লোকের ওপরে নয়, কিংবা কালো লোক পীত লোকের ওপরে নয়। তাদের স্রষ্টার কাছে সব মানুষই সমান। মুসলমানরা আল্লাহ্র চোখে সমান, একটি বিরাট পরিবারের সদস্য, যেখানে উচ্চ নীচ বলতে কেউ নেই। বরং সবাই ঈমানদার এবং সবাই আইনের দৃষ্টিতেও সমান। এবং এই সাম্য এমন এক সময়ে ঘোষণা করা হয় যখন সমগ্র খৃষ্টান জগতে কার্যত এটি অজ্ঞাত ছিল।

২. সকলের জন্য সমান এই আইন *শুভেচ্ছার* (গুড ফেইথ্) ওপর প্রতিষ্ঠিত। মুসলমানদের অবশ্যই অঙ্গীকার রক্ষা করতে হবে। মালিকের সম্মতি ছাড়া কেউই অন্যের অর্থ-সম্পদ থেকে আর্থিক সুবিধা আদায় করতে পারে না। 'তোমার সততায় যাদের আস্থা আছে তাদের প্রতি সততা প্রদর্শন করো', যারা তোমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করো না'--এসব হাদীস এবং অন্যান্য আরো বহু হাদীস মুসলিম আইনের সাধারণ বিধির অন্তর্ভুক্ত। শুভেচ্ছার এই ধারণা আবশ্যিকভাবে নৈতিকতার অন্তর্ভুক্ত এবং এটিকে সার্বজনীন বৈশিষ্ট্যে উন্নীত করা হয়েছে। শুভেচ্ছার যে

---

১. ইংরেজি *কেইন*, হিব্রু *কাইন;* হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র, সে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হাবিলকে (ইংরেজি আবল) হত্যা করে।-অনুবাদক।

www.waytojannah.com

সামন্ততান্ত্রিক ও জার্মান ধারণা ব্যক্তিগত ভক্তি থেকে উদ্ভূত তার চাইতে এটি আমাদের মনে অধিক রেখাপাত করে। তাই এই ব্যবস্থাটি মানুষের ইচ্ছার ব্যাপকতর পরিসর সৃষ্টি করে এবং আক্ষরিক বক্তব্যের চাইতে মনোভাবের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। যেভাবেই প্রকাশিত হোক না কেন, মানুষের ইচ্ছা একটি বৈধ বন্ধন সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট। মুসলিম আইনে কোন কাজের বৈধতা বা অবৈধতা আকারের উপর কদাচিৎ নির্ভরশীল। এর সঙ্গে জার্মান পদ্ধতির সীমাহীন আনুষ্ঠানিক *মাইনিউশিই*[১] তুলনীয়। আইন পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে *'কনসেনসাস সোলাস অবলিগাট'* বিধিটি মৌলিক।

সামাজিক কল্যাণের সুযোগ বিধানের ব্যবস্থা থাকায় মুসলিম আইন আমাদের নিজস্ব আইনের ন্যায় মূলত প্রগতিশীল। ভাষা ও যুক্তির সৃষ্টি হিসাবে এটি একটি বিজ্ঞান। এটি অপরিবর্তনীয় নয় এবং নিছক ঐতিহ্যের উপরও নির্ভরশীল নয়। বিখ্যাত আইন বিশেষজ্ঞ মহলগুলি এ ব্যাপারে একমত। হানাফীরা বলেন, 'আইনের বিধি অপরিবর্তনীয় নয়। এটি ব্যাকরণ ও যুক্তিশাস্ত্রের বিধিগুলির অনুরূপ নয়। এটি সাধারণত যা ঘটে তা প্রকাশ করে এবং যে অবস্থায় ঘটেছে সেই অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এটি পরিবর্তিত হয়।'

প্রয়োগের ব্যাপারে আইন পরিবর্তিত হতে পারে। মালিকী ও হানাফী পন্থীরা এ প্রশ্নেও একমত। 'প্রয়োজনীয়তাই আইনজীবীর বিধি।' এই নমনীয়তার কারণ আরবরা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে। এটি আবার প্রথাও বটে। সমাজসমূহ জীবন্ত সংস্থা এবং যতোদিন এগুলির অস্তিত্ব থাকে ততোদিন পরিবর্তনও অব্যাহত থাকে। 'হযরত আদমের সময় মানুষের অবস্থা ছিল দুর্বল ও শোচনীয়। বোন ভাইয়ের কাছে বৈধ ছিল এবং আল্লাহ অন্যান্য বহু ব্যাপারে প্রশ্রয় দেন। সমাজ যখন অধিকতর সম্পদশালী ও বহু সংখ্যক হয় তখন বিধি–নিষেধের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়।' ইসলামের ইতিহাসের ধারায় জীবনের এই অব্যাহত রূপ দেখা যেতে পারে।

আমরা দেখতে পাবো যে, মহানবী (সা)–এর সাহাবাগণ (সহচরগণ) কোন বিধি নিষেধের অনুমোদন ছাড়াই প্রয়োজনীয়তার যুক্তিতে বিভিন্ন রকমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কোন নজীর দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, কুরআন লিপিবদ্ধ করতে হবে। তারা সরকারের বিভিন্ন শাখার জন্য পদ সৃষ্টি করেন, মুদ্রা তৈরি করেন, কারাগার নির্মাণ করেন। একই প্রয়োজনীয়তার যুক্তিতে আইন বৈধ সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ওপর কঠোর শর্ত আরোপ করে, যদিও হাদীসে তা দেখা যায় না।...এই কারণেই আইন প্রয়োজনীতা দেখা দেওয়ায় ঋণ প্রভৃতি চুক্তিসমূহের বিস্তারিত বিশ্লেষণ প্রদান করেছে।...'

মুসলিম আইন বিশেষজ্ঞগণ প্রচলিত রীতিকে যে বিরাট ক্ষমতা প্রদান করেছেন এগুলিই হচ্ছে তার মূল ভিত্তি। এটি এক ধরনের অলিখিত বিধি যার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, এমনকি পরিবর্তনের ক্ষমতাও রয়েছে। 'মুসলমানরা যা অনুমোদন করেন

---

১. মূল *ল্যাটিন* শব্দ একবচন *মাইনিউশিয়া*, শব্দগত অর্থ ক্ষুদ্রত্ব; ছোটখাটো বা তুলনামূলকভাবে গুরুত্বহীন বিস্তারিত বিষয়। –অনুবাদক।

www.waytojannah.com

আল্লাহ্ও তা অনুমোদন করেন।' প্রয়োজনীয়তা যখন সামঞ্জস্যপূর্ণ ও স্থায়িত্বমূলক হয় এবং আইনের সাধারণ বিধির পরিপন্থী না হয় তখন আইনের ন্যায়ই তা ক্ষমতাবান এবং তা আইনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়।

হানাফীপন্থীরা বলেন, 'প্রয়োজনীয়তা কঠোর বিধি অনুযায়ী যা গ্রহণযোগ্য হতো না এমন বহু জিনিস পুনরায় গ্রহণযোগ্য করার পথ উন্মুক্ত করেছে।' দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ঋণ গ্রহণকারীর সুবিধা বিধানের উদ্দেশ্যে বন্ধকের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আদিম যুগের অধিকাংশ অর্থনীতিতে সুদপ্রথা অত্যন্ত দ্রুত কঠোর শোষণমূলক চড়া সুদে রূপান্তরিত হতো বিধায় তাত্ত্বিকভাবে নিষিদ্ধ হলেও ঋণের ওপর লভ্যাংশ প্রকারান্তরে স্বীকৃত রীতিতে পরিণত হয়েছে। আরো উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন উৎপাদনের অংশের জন্য শ্রমিক নিয়োগ, দালাল বা শহরের ঘোষকের সঙ্গে চুক্তি। মুসলিম আইনের আক্ষরিক তাৎপর্য অনুযায়ী এসব কাজের অনিশ্চয়তার দরুন এবং এগুলিতে যে ক্ষতির ঝুঁকি আছে তার দরুন এগুলি বাতিল হওয়ার কথা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আইনের দুটি গোঁড়াপন্থী মহল (মাযহাব) এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

আইন কেবল রীতি গ্রহণই করে না এর পরিবর্তনসমূহও অনুসরণ করে।

'সাধারণ বিধি হচ্ছে যে, যেসব আইন প্রয়োজন বা রীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলি রীতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। একদিকে একথা বলা যেতে পারে ঃ আমাদেরকে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা অনুসরণ করতে হবে, জ্ঞান না থাকায় এবং প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব না থাকায় আমরা আইন তৈরি করতে পারি না। আমাদের কাছে যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় সেগুলির সমাধান বইতে যা পাওয়া যায় তার ভিত্তিতেই করতে হবে। কিন্তু অপরপক্ষে যেসব আইন প্রাচীন রীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই রীতি একবার পরিবর্তিত হলে সেসব আইন প্রয়োগ করার অর্থ জনমতের বিরুদ্ধে যাওয়া। প্রকৃত সত্য হচ্ছে যে, যদি কোন আইন কোন বিশেষ যুগের রীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে যে অবস্থায় সেই আইনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আইনটিরও পরিবর্তন করতে হবে।'

রাজা বা শাসকই হচ্ছেন এই পরিবর্তনের প্রধান উৎস। তিনি একজন জিম্মাদার, তাই প্রচলিত আইনকে তিনি তাঁর নিজস্ব কর্তৃত্বের স্থলাভিষিক্ত করতে পারেন না। কিন্তু তিনি একটি স্বীকৃত ব্যবস্থার স্থলে অপরটিকে গুরুত্ব প্রদান করতে পারেন। তিনি কোন রীতিকে এতোটা প্রচলিত করতে পারেন যাতে সেটি শেষ পর্যন্ত আইনে পরিণত হয়। সর্বশেষে প্রয়োজন বোধে তিনি অবস্থার তাগিদে এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন যা কল্যাণাশ্রয়ীদের পক্ষে একজন উত্তম জিম্মাদারের অবশ্যই করা উচিত। এতদ্বারা কি এ কথা বোঝায় যে, মুসলিম আইন বিকাশে ধর্মীয় ধারণার কোন অবদান নেই? চিন্তার যে শক্তিশালী ঐক্য ইসলামের প্রধান শক্তি সে সম্পর্কে এরূপ ধারণা অত্যন্ত ভুল হবে। আইন বিজ্ঞান ধর্মতত্ত্বের একটি অংশ মাত্র। এমন কি ধর্মতত্ত্ব সম্ভবত খৃষ্ট ধর্মের চাইতেও অধিক

www.waytojannah.com

Contents

পরিমাণে নগরভিত্তিক রাষ্ট্রের ক্লাসিক্যাল ধারণাকে ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু এই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমাদের ভুল পথে যাওয়া উচিত হবে না। বিষয়টির প্রতি গভীরতর দৃষ্টি প্রদান করে আমরা দেখতে পাবো যে, মুসলিম আইনশাস্ত্রবিদদের ব্যাখ্যা আমাদের নিজস্ব ব্যাখ্যার অনুরূপ। আল্লাহর অধিকার ও মানুষের অধিকারের মধ্যে যেটুকু পার্থক্য আছে তা হচ্ছে সরকারী আইন ও ব্যক্তিগত আইনের পার্থক্য।

ধর্মীয় ধারণার নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বিরাট এক প্রভাব রয়েছে, কিন্তু তা সাধারণত যা মনে করা হয় তা নয়। এই প্রভাব ধর্মীয় ধারণা আইনে যে নৈতিক প্রবণতা প্রদান করেছে তার মধ্যে নিহিত। অর্থাৎ আইনগত বিধি ও নৈতিক বিধি-নিষেধের মধ্যে যে সংযোগ রয়েছে ধর্মীয় ধারণা সেখানে প্রায়ই একটি মিশ্রণ হিসাবে কাজ করে। অংশীদারিত্ব ঋণ, সাক্ষীর চরিত্র, প্রভু ও ভৃত্যের সম্পর্ক, বাদী ও বিবাদী এবং বৈধ সম্পর্কের বিষয়বস্তু সমন্বিত প্রতিটি প্রচলিত রীতি ও বাণিজ্যিক চুক্তি একটি নৈতিক বৈশিষ্ট্য লাভ করে এবং এক দিক দিয়ে নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থের চাইতে উন্নত ব্যাপার হিসাবে বিবেচিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমানত এক ধরনের সহায়তা ও পারস্পরিক সাহায্য, কারণ এতদ্বারা কেউ সম্পত্তির মালিককে তার সম্পত্তি সংরক্ষণে সাহায্য করে; এটি অনুমোদিত। কারণ আল্লাহ বলেছেন ঃ উত্তম কাজে পরস্পরকে সাহায্য করো'। এবং মহানবী (সা) বলেছেন, 'আল্লাহ মানুষকে সাহায্য করে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তার ভাইকে সাহায্য করে।' যে লোক জেনে-শুনে এরূপ অর্থ গ্রহণ করে যা তার নিজের নয় সে দুই ধরনের বাধ্যবাধকতায় জড়িয়ে পড়ে ঃ সে আল্লাহর কাছে দোষী এবং যে তার প্রবণতার শিকার তার কাছে দোষী হয়। যে ঋণ গ্রহণকারীর ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা আছে সে যদি ঋণ পরিশোধ না করে তাহলে সে গুরুতর পাপে পাপী, এবং সে কারণে সে তার আধ্যাত্মিক মুক্তিকে বিপন্ন করে। প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের ব্যাপারে মহানবী (সা) কতিপয় অপরূপ উক্তি করে গেছেন। 'প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হও। তার অবগুণ্ঠন অপসারণ করো। অপরের ক্ষতি পরিহার করো। তার প্রতি দয়ার দৃষ্টিতে তাকাও। তাকে যদি ক্ষতি করতে দেখ, ক্ষমা করে দাও। তাকে যদি তোমার উপকার করতে দেখ, তোমার কৃতজ্ঞতা জানাও।'

এই মনোভাবের তাৎপর্য এই যে, অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রকৃতপক্ষে একটি কর্তব্য সম্পাদন হিসাবে বিবেচিত হয়। কারণ অধিকার যদি ন্যায্য হয় তাহলে সে অধিকার 'পাপ ছাড়া বাদ দেওয়া' যায় না। যে তার সম্পত্তি অনধিকারমূলকভাবে করায়ত্তকারীর কাছ থেকে দাবি করে সে একটি নৈতিক দায়িত্বও পালন করে। কারণ সে যদি নীরব থাকে তাহলে সে এতদ্বারা অন্যায়ভাবে অধিকারকারীর পাপ অব্যাহত রাখায় সাহায্য করে। মহানবী (সা) বলেছেন, 'অন্যায়কারী হলেও তোমার ভাইকে সাহায্য করো। এ ক্ষেত্রে সাহায্য করার অর্থ তাকে অন্যায় থেকে বিরত রাখা।' কিন্তু প্রত্যেকের অধিকার যদি তার ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া নৈতিক কর্তব্যও হয় তাহলে এই অধিকারের কতিপয় সীমা রয়েছে যা নৈতিক

www.waytojannah.com

আইন ও সামাজিক স্বার্থ দ্বারা নিরূপিত হয়। শান্তিপূর্ণ মীমাংসা ও আপোস সর্বত্রই অত্যন্ত প্রশংসনীয় হিসাবে বিবেচিত। প্রতিশোধ নিষিদ্ধ। ঋণ গ্রহণকারীর বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ আইনের পরিপন্থী এবং অধিকারের অপপ্রয়োগ। কোন লোকই অপরের সুস্পষ্ট ক্ষতি সাধিত হতে পারে এমনভাবে তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারে না।' এসব ব্যাপারে মুসলিম আইন বিশেষজ্ঞদের আমরা যতোটা অনুমান করতে পারি তার চাইতে অনেক সূক্ষ্ম অনুভূতি রয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নোক্ত ব্যাপারগুলি নিষিদ্ধ ঃ যে পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রস্তাব করা হয়েছে তার শত্রুকে ওকালতনামা প্রদান। যে পশুর প্রতি নির্দয় ব্যবহারের জন্য খ্যাত তাকে কোন ভারবাহী পশু ভাড়া দেওয়া, এমন কোন লম্পটের কাছে তরুণী ক্রীতদাসী বিক্রয় করা যে তাকে অসৎ কাজে ব্যবহার করতে কিংবা তার ওপর ব্যভিচার করতে পারে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আইনের সীমা এবং পরিমাণ নৈতিকতার মাপকাঠিতে নিরূপিত হয়।

তাই একথা যথার্থভাবেই বলা হয়েছে ঃ 'যেখানে আল্লাহ্‌র অংশ নেই সেখানে মানুষের কোন অধিকার নেই। আল্লাহ্‌র অংশ হচ্ছে, প্রত্যেককে তার প্রাপ্য প্রদান করার এবং অন্যের মালিকানায় হস্তক্ষেপ না করার জন্য তাঁর নির্দেশ।' এমনিভাবে আমরা খাঁটি অধিকারের এমন এক পর্যায় দেখতে পাচ্ছি যা প্রত্যেক সভ্য সমাজের সাধারণ ভিত্তি।

মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহের দিক দিয়ে এটিই হচ্ছে মুসলিম আইন ব্যবস্থা। বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে এটি যথার্থভাবেই একটি উন্নত শ্রেণীর মর্যাদা দাবি করতে পারে। এর সমৃদ্ধিকালের সমসাময়িক প্রাথমিক সামন্ততান্ত্রিক আইনের বর্বরতামূলক ও রূঢ় রীতিনীতির তুলনায় এর স্থান ছিল অনেক অনেক উঁচুতে।

মুসলিম আইনে যে জিনিসটির অভাব, অন্যান্য প্রতিটি ক্ষেত্রেও সে জিনিসটির অভাব দেখা যায় এবং তা হচ্ছে অধিকতর সুসংবদ্ধ চেতনা। নৈরাজ্যের প্রতি প্রবণতা এবং সংগঠনে ও নিয়ম-শৃংখলা বিধানে মৌলিক অসামর্থ্য যেমন আরবদের রাজনৈতিক অক্ষমতার কারণ ছিল, তেমনি তাদের আইন ব্যবস্থায় দুর্বলতার উৎসও ছিল এসব বৈশিষ্ট্য। দুর্বলতার আর একটি কারণ হচ্ছে, আরবরা তাদের ব্যবস্থা মৌলভিত্তিকে মাত্রাতিরিক্তভাবে অতিরঞ্জিত করেন। ন্যায়বিচার পারস্পরিক অধিকার বিনিময়ের মধ্যে নিহিত। এই ধারণাকে তারা এবং আমাদের ধর্মীয় আইন বিশেষজ্ঞরা চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যান। এক্ষেত্রে অ্যারিস্টটলের দর্শনে যতখানি ধর্মীয় বিশ্বাস রয়েছে ততোটা অবদান সৃষ্টি করে। যে কোন প্রকারের সুদ নিষিদ্ধকরণ, যে কোন রকমের বিপদের ঝুঁকি অনুমোদন, চুক্তির মধ্যে সর্বপ্রকার অনিশ্চয়তা পরিহার, এক কথায় মুসলিম আইনের সবগুলি বিশেষ দিক সেই একই সূত্র থেকে উদ্ভূত এবং একই সাধারণ ধারণার ওপর নির্ভরশীল। সবগুলি ক্ষেত্রেই সাম্যের বিধি এবং সে সঙ্গে ন্যায়বিচার ব্যাহত হয়। আইনজীবীকে কেবলমাত্র ভারসাম্য বজায় রাখার কথা চিন্তা করতে হয়। অর্থাৎ আমাদের ধর্মীয় আইনের

www.waytojannah.com

বিশেষজ্ঞদের ন্যায় তারা আইনের কঠোর প্রয়োগ ব্যাহত হতে পারে এরূপ প্রতিটি কৌশল এড়িয়ে যান।

এই উদ্দেশ্য সাধনের অব্যাহত প্রচেষ্টা অতিরিক্ত নিয়ম বিধির সৃষ্টি করে। ধর্মীয় আদেশসমূহকে যদি আপাতদৃষ্টিতে অধিকতর যুক্তিযুক্ত কাল্পনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কমবেশি পরিহার করা না হতো, কিংবা সেগুলিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ না রাখা হতো তাহলে গুরুত্বহীন খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি এ ধরনের দৃষ্টি প্রতিটি কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতো।

আরব আইন থেকে আমরা প্রত্যক্ষভাবে যা লাভ করেছি তার মধ্যে *'লিমিটেড পার্টনারশীপের' (কিরাদ)* ন্যায় আইনগত ব্যবস্থাসমূহ এবং বাণিজ্যিক আইনের কতিপয় খুঁটিনাটি বিষয় রয়েছে। কিন্তু এগুলি বাদ দিলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আরব আইনের কতিপয় অংশের উচ্চ নৈতিক মান আমাদের আধুনিক ধ্যানধারণা বিকাশে অনুকূল অবদান সৃষ্টি করেছে। মুসলিম আইনের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য এখানেই নিহিত।

ডেভিড ডি স্যান্টিলানা

www.waytojannah.com

Contents

বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিদ্যা

১. *প্রাথমিক যুগ ৭৫০ খৃ পর্যন্ত...*
২. *অনুবাদের যুগ প্রায় ৭৫০ থেকে প্রায় ৯০০ পর্যন্ত...*
৩. *সুবর্ণ যুগ প্রায় ৯০০ থেকে প্রায় ১১০০ পর্যন্ত...*
৪. *পতন যুগ প্রায় ১১০০ থেকে...*
৫. *উত্তরাধিকার...*

মুসলিম বিজ্ঞানের রত্নভাণ্ডারগুলি সবেমাত্র উন্মুক্ত হতে শুরু করেছে। একমাত্র কনস্টান্টিনোপলেই লক্ষ লক্ষ পাণ্ডুলিপি সমন্বিত ৮০টিরও বেশি মসজিদ গ্রন্থাগার রয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে কায়রো, দামেস্ক, মসুল ও বাগদাদে এবং পারস্যে ও ভারতে আরো বহু সংগ্রহ। খুব কম সংখ্যক পাণ্ডুলিপিরই তালিকা তৈরি করা হয়েছে এবং তার চাইতেও অনেক কমসংখ্যক পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তু বর্ণনা বা সম্পাদনা করা হয়েছে। এমন কি স্পেনের এসকোরিয়াল লাইব্রেরীতে মুসলিম পাশ্চাত্যের জ্ঞান সাধনার যেসব সম্পদ সঞ্চিত রয়েছে সেগুলির ক্যাটালগ তৈরিও এখনো সম্পন্ন হয়নি। বিগত কয়েক বছরে যে বিপুল পরিমাণ উপাদান উদ্ধার করা হয়েছে তা আমাদের পূর্ববর্তী ধারণাসমূহ অনেকখানি পাল্টে দিয়েছে এবং মুসলিম বিশ্বে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রাথমিক ইতিহাসের উপর নতুনভাবে ব্যাপক আলোকপাত করেছে। তাই চিকিৎসা বিদ্যা ও বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদানের একটি মোটামুটি চিত্রও বর্তমানে বড়জোর পরীক্ষামূলক হতে পারে।

১. প্রাথমিক যুগ, ৭৫০ খৃ. পর্যন্ত

সপ্তম শতকে আরবরা যখন সর্বপ্রথম একটি প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করে তখন নিজেদের ধর্মীয় ও সামাজিক আদর্শ ছাড়াও তাদের নিজস্ব বলতে ছিল সঙ্গীত ও ভাষা। আরবদের সমৃদ্ধ ও নমনীয় ভাষা নিকট প্রাচ্যের বৈজ্ঞানিক ভাবধারায় পরিণত হয়, যেমনটি হয়েছিল ল্যাটিন ভাষা পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যম।

প্রাক ইসলাম ও ইসলামের প্রাথমিক যুগের আরবী কাব্যে দেখা যায় যে, বেদুইনরা তাদের বিশাল উপদ্বীপের জীবজন্তু, গাছপালা ও বিভিন্ন ধরনের পাথর সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। আরব কবিরা তাদের বহনকারী উট ও ঘোড়ার গুণাবলী বর্ণনায় অনুরাগমূলক জ্ঞানের পরিচয় দেন এবং তাদের বিবরণী থেকে পরবর্তী শতকসমূহে একটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণীর সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। চিকিৎসা, স্বাস্থ্য রক্ষা ও আবহাওয়া তত্ত্ব সম্পর্কে

www.waytojannah.com

তাদের জ্ঞান অত্যন্ত মৌলিক ছিল। কুরআনে রোগের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়নি। কেবলমাত্র সামাজিক উদ্দেশ্যেই সেখানে স্বাস্থ্য রক্ষার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। ইসলামের প্রথম কয়েক শতকে কুরআনের বিশ্লেষণমূলক হাদীস ও ভাষ্য থেকে অধিকতর বিস্তারিত উপাদান পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলির বিষয়বস্তুর তেমন বৈজ্ঞানিক মূল্য নেই। কারণ এগুলিতে শুধুমাত্র বিভিন্ন রোগ ও সেগুলির প্রতিকার ব্যবস্থার তালিকা দেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে জাদুবিদ্যা প্রয়োগ, অশুভ প্রভাবের বিরুদ্ধে মাদুলি ও কবচ ব্যবহারের বর্ণনা এবং প্রতিরোধমূলক প্রার্থনার সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে।

আরবরা যখন বাইযেন্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে তার কয়েক শতক আগে থেকেই গ্রীক বিজ্ঞানের নির্জীব অবস্থা বিরাজ করছিল। এটি আরব পণ্ডিতদের হস্তগত হয়। তারা অ্যারিস্টিটল, হিপোক্রেটিস, গ্যালেন, টলেমী, আর্কিমিডিস ও অন্যান্যের রচনাবলী নকল করেন কিংবা সেগুলির ভাষ্য তৈরি করেন। গ্রীক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ঐতিহ্য নিম্নোক্ত লেখকদের রচনাবলীতে অত্যন্ত জীবন্তভাবে সংরক্ষিত ছিল ঃ আলেকজান্দ্রিয়ায় বসবাসকারী আমিডার এইটিয়স (আনু. ৫৫০) ও এজিনার পল (আনু. ৬২৫); রোমে বসবাসকারী ট্রাল্লেসের আলেকজাণ্ডার (৫২৫–৬০৫) এবং কনস্টান্টিনোপলের থিওফিলস্ প্রটোসপাথারিয়স (আনু. ৬৪০)।

আরব অভিযানের আগে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মিসরের রাজধানীতে প্রাচীন জ্ঞান চর্চার কিছুটা ক্ষীণ পুনরুজ্জীবন ঘটে। এখানে গ্যালনের প্রধান প্রধান রচনাবলী থেকে নিষ্কাশনের মাধ্যমে চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার একটি নতুন ভিত্তি তৈরি হয়।। আলেকজান্দ্রিয়াবাসী জোহানেস ফিলোপোনাস অ্যারিস্টটলের মতবাদের সাহসী প্রবক্তা ছিলেন। পূর্ববর্তী সময়ে আলেকজান্দ্রিয়ার জ্ঞানবিদগণ হিপোক্রেটিসের নাম সম্বলিত রচনাবলীর সংক্ষিপ্তসার তৈরি করেন। অবশ্য মিসরে এদিকে গোঁড়াপন্থী খৃষ্টানরা বসবাস করতো এবং অপরদিকে গূঢ়বাদ ও রহস্যবাদের চর্চা হতো। তাই সেখানকার মাটি কোন প্রকার বিজ্ঞান চর্চার অনুকূল ছিল না।

উপরোক্ত কারণে মিসর গ্রীক ও আবরদের চিকিৎসা বিদ্যা ও বিজ্ঞানের মধ্যবর্তী বাহক হিসাবে সক্রিয়তার পরিচয় দিতে পারেনি। এ জন্যে আমাদেরকে প্রাচীন সিরীয় (সিরিয়াক) ভাষাভাষী বিশ্বের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। তৃতীয় শতক থেকে পরবর্তীকালে প্রাচীন সিরীয় বাগধারা পশ্চিম এশিয়ার শিক্ষিত মহলে ধীরে ধীরে গ্রীক ভাষার স্থলাভিষিক্ত হয়। সিরীয়–গ্রীক সভ্যতার বাহক ছিল প্রধানত নেস্টোরিয়ানরা। এই খৃষ্টান সম্প্রদায় কনস্টান্টিনোপলের প্যাট্রিয়ার্ক নেস্টোরিয়াস কর্তৃক ৪২৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪৩১ খৃষ্টাব্দে ইফেসাস কাউন্সিল–এর অনুসারীদের ধর্মদ্রোহী বলে ঘোষণা করে এবং তখন থেকে তারা এডেসায় হিজরত করেন। সেখান থেকেও বাইযেন্টাইন সম্রাট যেনো ৪৮৯ খৃষ্টাব্দে তাদের বহিষ্কার করেন। অতঃপর তারা দেশত্যাগ করে সাসানীয় শাসনাধীন

www.waytojannah.com

পারস্য চলে যান। সেখানে তাদের সাদরে গ্রহণ করা হয়। ধর্ম প্রচারের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা আরো পূর্বদিকে এশিয়ার কেন্দ্রস্থলে অগ্রসর হন, এমন কি সুদূর পশ্চিম চীনে গিয়েও পৌঁছেন।

একটি মেডিক্যাল স্কুলসহ নেস্টোরীয় বিজ্ঞান কেন্দ্র এডেসা থেকে মেসোপটেমিয়ার নিসিবিসে স্থানান্তরিত হয় এবং সেখান থেকে ৬ষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে দক্ষিণ–পশ্চিম পারস্যের জুন্দিশাপুরে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে একটি হাসপাতাল ছাড়াও চতুর্থ শতকে সাসানীয় সম্রাট কর্তৃক একটি একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। বিখ্যাত সম্রাট খসরু নওশিরওয়ান (৫৩১–৭৯) এই শহরটিকে ঐযুগের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত করেন। ৫২৯ খৃষ্টাব্দে জাস্টিনিয়ান কর্তৃক দর্শন চর্চা বন্ধ করে দেওয়ার পর গ্রীক পণ্ডিতগণ এথেন্স ত্যাগ করে এখানে সিরীয় পারসিক ও ভারতীয় সাধকদের সঙ্গে মিলিত হন। এমনিভাবে বিভিন্ন ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদের একটি বৈজ্ঞানিক সংমিশ্রণ ঘটে যা পরবর্তীকালে মুসলিম চিন্তাধারা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। খসরু চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীর সন্ধানে তাঁর নিজস্ব চিকিৎসককে ভারতে প্রেরণ করেন। এসব সংগৃহীত গ্রন্থ পাহলভী ভাষায় (মধ্যযুগীয় পারস্য ভাষা) অনূদিত হয়। এ ছাড়া গ্রীক ভাষা থেকে অন্যান্য বহু বৈজ্ঞানিক রচনা পারস্য বা প্রাচীন সিরীয় ভাষায় অনূদিত হয়। মহানবীর সমসাময়িক কালের জুন্দিশাপুর মেডিক্যাল স্কুলের জনৈক শিক্ষার্থী আরবদের প্রথম বৈজ্ঞানিকভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসাবিদ। কুরআনের বিশ্লেষণমূলক হাদীস বিশেষজ্ঞগণ তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন।

প্রাচীন সিরীয় ভাষাভাষী বিশ্বে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ছিলেন রেশ–আইনার অধিবাসী সার্জিয়াস (মৃ. ৫৩৬)। তিনি নেস্টোরিয়ান ছিলেন না, বরং মনোফিজাইট[১] খৃষ্টান পুরোহিত ও তার জন্মস্থান মেসোপটেমিয়ার প্রধান চিকিৎসাবিদ ছিলেন। তিনিই চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত গ্রীক রচনা প্রাচীন সিরীয় ভাষায় অনুবাদ শুরু করেন। তাকে গ্যালেনের বহু গুরুত্বপূর্ণ রচনার অনুবাদক হিসাবে উল্লেখ করা হয়। অমার্জিত হলেও তাঁর রচনা দুই শতাব্দীরও বেশিকাল পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়ায় চিকিৎসা বিদ্যা সংক্রান্ত গ্রীক ঐতিহ্য বজায় রাখে। এই সময় গ্রীক চিকিৎসা বিদ্যার ওপর ভিত্তি করে পণ্ডিত ব্যক্তিরা চিকিৎসা সংক্রান্ত তাদের নিজস্ব গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। এগুলির মধ্যে সবচাইতে পরিচিত হচ্ছে আহরনের *প্যাণ্ডেক্টস* (সার সংগ্রহ)। ইসলামের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার একজন খৃষ্টান পাদ্রী ও চিকিৎসক ছিলেন। সম্ভবত তিনি গ্রীক ভাষায় মূল গ্রন্থ রচনা করেন যা সিরীয় ও পরবর্তীকালে আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। আহরনের রচনা

১. ল্যাটিন ও গ্রীক মনোফিজাইটিস; যিনি বিশ্বাস করেন যে, যীশুখৃষ্টের একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে কিংবা তার মধ্যে মানবিক ও স্বর্গীয় বৈশিষ্টের সমন্বয় ঘটেছে।–অনুবাদক

www.waytojannah.com

বর্তমানে বিলুপ্ত, কিন্তু এতে খুব সম্ভব প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞানে অজ্ঞাত বসন্ত রোগের সর্বপ্রথম বর্ণনা স্থান পায়।

ইসলামের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ববর্তী শতকগুলিতে প্রকৃতি বিজ্ঞান সংক্রান্ত রচনাবলী কদাচিৎ দেখা যায়। এ সময়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনাই প্রাধান্য পায়। কিছুটা প্রাথমিক যুগে প্রাচীন সিরীয় ভাষায় অ্যারিস্টটলের *পারভা নেচারালিয়া* এবং বিশ্বজগৎ সম্পর্কে ও আত্ম সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের রচনা হিসাবে কল্পিত কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া জীবজন্তু এবং তাদের রূপকথার শক্তি ও গুণাবলী সম্পর্কে *ফিজিওলগাস* শিরোনামে একটি খৃস্টান ধর্মতাত্ত্বিক গ্রন্থও রচিত হয়। একই ভাষায় গবাদি পশু প্রজনন, কৃষি ও পশু চিকিৎসা সম্পর্কে এবং আলকেমী সম্পর্কেও বিভিন্ন গ্রীক রচনা প্রকাশিত হয়। প্রাচীন সিরীয় ভাষায় ধাতু বিদ্যার কারিগরি পদ্ধতি সম্পর্কেও কিছু কিছু ছিঁটেফোটা রচনা পাওয়া যায়। সাসানীয় শাসনামলে আলকেমী ও জ্যোতিষশাস্ত্রেরন প্রধান কেন্দ্রগুলি সম্ভবত পারস্যের পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলির বড় বড় শহরে ছিল। এখানে চীনা ও ভারতীয় প্রভাবে একটি নতুন সভ্যতা গড়ে ওঠে।

আরবরা যখন উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়া অধিকারভুক্ত করে তখন তারা বাইযেন্টাইন ও পারস্য প্রশাসন এবং বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের এতটুকু ক্ষতি সাধন করেনি। জুন্দিশাপুরের একাডেমী নতুন মুসলিম সাম্রাজ্যের বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র হিসাবে অব্যাহত থাকে। উমাইয়াদের আমলে (৬৬১–৭৪৯) এখান থেকেই রাজধানী দামেস্কে বিদ্বজন, বিশেষ করে চিকিৎসাবিদদের আগমন ঘটে। এরা অধিকাংশই ছিলেন আরবী নামযুক্ত খৃস্টান বা ইহুদী। মাসারজাওইহ্ নামক জনৈক পারস্যবাসী ইহুদীই আহরনের *প্যান্ডেক্টস্* আরবীতে অনুবাদ করেন এবং তিনিই সম্ভবত আরবী ভাষায় প্রাচীনতম বিজ্ঞান গ্রন্থের রচয়িতা। অবশ্য উমাইয়া খলীফাদের দরবারের বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইতিহাস প্রায় সম্পূর্ণ নীরব।

২. অনুবাদের যুগ, প্রায় ৭৫০ থেকে প্রায় ৯০০ পর্যন্ত

৭৫০ খৃস্টাব্দের দিকে আব্বাসীয়দের উত্থান মুসলিম শাসনের বৃহত্তম শক্তি, গৌরব ও সমৃদ্ধির যুগের সূচনা করে। একেবারে সূচনাতেই মুসলমানদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে যিনি প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য উভয় ক্ষেত্রেই মধ্যযুগীয় বিজ্ঞানে ছায়ার ন্যায় বিরাজমান। ইনি হচ্ছেন আস–সুফী (অধ্যাত্মবাদী) নামে পরিচিত জাবির ইবনে হাইয়ান এবং মধ্যযুগীয় ল্যাটিন সাহিত্যে *জেবের*। তাঁর পিতা কুফার জনৈক আরব ঔষধ বিশেষজ্ঞ শিয়া সম্প্রদায়ের শহীদ হিসাবে মৃত্যুবরণ করেন। জাবির চিকিৎসকের পেশায় নিয়োজিত ছিলেন, কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর কোন রচনা আমরা পাইনি। অবশ্য এই নিবন্ধ রচয়িতা সম্প্রতি বিষ সম্পর্কিত কিছু রচনা উদ্ধার করেছেন যা জাবিরের বলে

www.waytojannah.com

Contents

কথিত। জাবির আরবী আলকেমীর[১] জনক হিসাবে বিখ্যাত। কিন্তু এই নিবন্ধ রচনার সময় আমরা এমন কিছু প্রমাণ পেয়েছি যাতে দেখা যায় যে, জাবিরের বলে কথিত রচনাসমূহ দশম শতকের। যাই হোক, এ বিষয়টি আমরা যথাস্থানে (পৃ.....) আলোচনা করবো।

জাবির সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি হারুনুর রশীদের শক্তিশালী উজীর বারনিকী পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ৮০৩ খৃষ্টাব্দে এই পরিবারের পতনের সংশ্লিষ্ট ঘটনার সঙ্গে তাকেও জড়িত করা হয়, এবং তিনি তাঁর পিতার জন্মস্থান কুফায় নির্বাসিত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। কথিত আছে যে, এখানে তাঁর মৃত্যুর দুই শত বছর পরেও তার গবেষণাগারের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

দ্বিতীয় আব্বাসীয় খলীফা আল মনসুরের সময় (৭৫৪–৭৫) পুনরায় গ্রীক জ্ঞান–বিজ্ঞান অনুবাদের কাজে হাত দেওয়া হয় এবং জুন্দিশাপুরই ছিল তার কেন্দ্রস্থল। খলীফা যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন সেখান থেকেই 'বাখ্‌ত ঈশু' (যীশু পরিত্রাণ করেছেন) নামক খৃষ্টান পরিবারের জুরজিস্‌কে (জর্জ) ডেকে পাঠান। জুরজিস্ সেখানকার বিখ্যাত হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। পরবর্তীকালে খলীফা আল হাদী (মৃ. ৭৮৬) ও হারুনুর রশীদ (মৃ. ৮০৯) একই পরিবারের অপর একজন সদস্যের কাছ থেকে চিকিৎসকের ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করেন। সাত পুরুষ পর্যন্ত 'বাখ্‌ত ঈশু' পরিবারের চিকিৎসাবিদগণ তাদের খ্যাতি অক্ষুণ্ন রাখেন এবং সর্বশেষ খ্যাতিমান চিকিৎসক একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জীবিত ছিলেন। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, 'বাখ্‌ত ঈশু' পরিবারের প্রথম চিকিৎসাবিদের কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়েই খলফীাগণ তাঁদের সাম্রাজ্যের চিকিৎসকদের মধ্যে গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রচারের নির্দেশ প্রদান করেন।

নবম শতক ছিল অনুবাদ কাজের সর্বাধিক তৎপরতার যুগ। সার্জিয়াসের রচনার প্রাচীন সিরীয় ভাষার অনুবাদ সংশোধন করে নতুন গ্রন্থ রচিত হয়। প্রধানত নেস্টোরিয়ান খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী অনুবাদকগণ গ্রীক, প্রাচীন সিরীয়, আরবী, এমনকি পারস্য ভাষায়ও দক্ষ ছিলেন। অধিকাংশ অনুবাদকই প্রথমে প্রাচীন সিরীয় ভাষায় লেখেন। অবশ্য অর্ধ শতাব্দীকাল পর্যন্ত হারুনুর রশীদের উত্তরাধিকারীদের চিকিৎসক শ্রদ্ধেয় ইউহান্না ইবনে মাসাওইহ্ (মৃ. ৮৫৭) চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে আরবীতে কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন। সাধারণত খৃষ্টান শিষ্য ও বন্ধুবান্ধবদের জন্য প্রাচীন সিরীয় ভাষায় এবং যেসব মুসলিম পৃষ্ঠপোষক জ্ঞানচর্চা করতেন তাদের জন্য আরবীতে গ্রন্থ রচনা করা হতো।

খলীফা আল মামুনের রাজত্বকালে (৮১৩–৩৩) নতুন জ্ঞানচর্চা তার প্রথম সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে। খলীফা অনুবাদ কার্যের জন্য বাগদাদে একটি নিয়মিত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

১. আরবী আল কিমিয়া; মধ্যযুগের রসায়নশাস্ত্র যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিকৃষ্ট ধাতুসহ স্বর্ণে পরিণত করা এবং চিরকৌমার্যের একটি ধন্বন্তরী আবিষ্কার; অলৌকিকভাবে একটি জিনিসকে আরেকটি জিনিসে পরিবর্তনের একটি পদ্ধতি বা ক্ষমতা।–অনুবাদক।

www.waytojannah.com

করেন। এর সঙ্গে একটি গ্রন্থাগারও ছিল। এখানকার অন্যতম অনুবাদক হুনাইন ইবনে ইসহাক (৮০৯–৭৭) ছিলেন বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন দার্শনিক এবং ব্যাপক পাণ্ডিত্যসম্পন্ন চিকিৎসাবিদ। এই শতকের অনুবাদকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্রণী। তার সম্প্রতি প্রকাশিত *মিসিভ* (বাণী) থেকে আমরা জানতে পারি যে, তিনি কার্যত গ্যালেনের বিপুল রচনা সম্ভার সামুগ্রিকভাবে অনুবাদ করেন। এর মধ্যে গ্যালেনের রচনার প্রাচীন সিরীয় ভাষায় একশটি এবং আরবী ভাষায় উনচল্লিশটি চিকিৎসাশাস্ত্র এবং দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ রয়েছে। পুত্র ইসহাক ও ভ্রাতুষ্পুত্র হুবাইশসহ তাঁর শিষ্যগণ প্রাচীন সিরীয় ভাষায় তেরোটি এবং আরবী ভাষায় ষাটটি গ্রন্থ রচনা করেন। শিষ্যদের মধ্যে পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এমনিভাবে মুসলিম বিশ্ব গ্রীক বৈজ্ঞানিক লেখকদের বিপুল রচনার সামগ্রিক উত্তরাধিকার লাভ করে।

গ্যালেনের মতবাদসমূহের প্রতি হুনাইনের বিশেষ অনুরাগ সর্বত্র সুস্পষ্ট। মধ্যযুগে প্রাচ্যে এবং পরোক্ষভাবে পাশ্চাত্যেও হুনাইনই গ্যালেনকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। হিপোক্রেটিসের রচনাবলী সম্পর্কে আমরা সেই পরিমাণ অবহিত হইনি। হুনাইন স্বয়ং তার *অ্যাফারিজমস* (সারগর্ভ উক্তিসমূহ) অনুবাদ করেন। এই রচনাটি পরবর্তীকালের আরবদের কাছে একটি ক্লাসিক্যাল গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয় এবং তারা প্রায়ই এ সম্পর্কে মন্তব্য করেন। হিপোক্রেটিসের অন্যান্য রচনার অধিকাংশই তার শিষ্যরা অনুবাদ করেন। এসব অনুবাদ প্রায়ই গুরু নিজেই সংশোধন করতেন। হিপোক্রেটিসের ওপর গ্যালেন যেসব ভাষ্য রচনা করেন তার প্রায় সবগুলি হুনাইন স্বয়ং প্রাচীন সিরীয় ও আরবী ভাষায় রূপান্তরিত করেন। এ ছাড়াও হুনাইন ওরিবাসিয়াসের (৩২৫–৪০৩) বিশাল *সিনপসিস্*, পল অব ইজিনার *সেভেন বুক্স্* এবং *ডায়োস্কিউরাইডসের* (মৃ. আনু. ৬০) অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী *ম্যাটেরিয়া মেডিকা* অনুবাদ করেন। শেষোক্ত গ্রন্থটি তার পূর্ববর্তী অনুবাদক সঠিকভাবে অনুবাদ করেন নি। স্পেনে দশম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই রচনা পুনরায় আরবীতে অনূদিত হয়। (...পৃ. দ্রষ্টব্য) ডায়োসকিউরাইড্সের এসব আরবী অনুবাদের অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলংকৃত আরবী পাণ্ডুলিপি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। হুনাইনের আরবী অনুবাদের মধ্যে অন্যান্য গ্রীক চিকিৎসাবিদ এবং পশু চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের রচনাও রয়েছে। তিনি অ্যারিস্টটলের পদার্থ বিজ্ঞান সংক্রান্ত কতিপয় রচনা এবং গ্রীক ওল্ড টেস্টামেন্টও *(দি সেপচুয়াজিস্ট)* আরবীতে অনুবাদ করেন। হুনাইনের বহু অনুবাদ এখনো পাণ্ডুলিপি আকারে রয়েছে এবং এগুলি বিশেষভাবে কনস্টান্টিনোপলের গ্রন্থাগারগুলিতে সংরক্ষিত। এগুলি ভাষার উপর অবাধ ও নিশ্চিত দক্ষতা, মূল গ্রীক ভাষার সহজ রূপান্তর এবং কোন প্রকার শব্দবাহুল্য ছাড়া অত্যন্ত সঠিকভাবে ভাব প্রকাশের স্বাক্ষর বহন করে। তার নিপুণতার প্রাধান্য এতোই সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত যে, বহু ছোটখাটো অনুবাদক তাদের রচনা এই মহান গুরুর নামে প্রচার করেন।

www.waytojannah.com

হুনাইনের নিজস্ব রচনাও প্রায় তার অনুবাদের ন্যায়ই বহু ও ব্যাপক। এগুলির মধ্যে গ্যালেনের বিভিন্ন রচনার বহু সংক্ষিপ্তসার ও ভাষ্য এবং ছাত্রদের জন্য পাঠ্যপুস্তক আকারে দক্ষতামূলক উদ্ধৃতি ও সংরক্ষিত পুনর্বিবরণ রয়েছে। আরব ও পারস্যবাসীর মতে তার সব চাইতে বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে প্রশ্ন ও জবাবের আকারে একটি সার গ্রন্থ। *কোয়েস্চান্‌স্ অন মেডিসিন* (চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী) এবং চক্ষু চিকিৎসার ওপর প্রাচীনতম ধারাবাহিক পাঠ্যপুস্তক *টেন ট্রীটিজেস অন দি আই* (চক্ষু সম্পর্কে দশটি নিবন্ধ)।

হুনাইন ইবনে ইসহাকের কতিপয় সমসাময়িক জ্ঞানবিদও 'বিরাট' অনুবাদক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। এ ছাড়াও ছিল তাঁর নব্বই জনের মতো শিষ্য যারা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলী অনুবাদ করেন। প্রথমোক্তদের মধ্যে রয়েছেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হুবাইশ, পুত্র ইসহাক (মৃ. ৯১০), প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ ও অঙ্কশাস্ত্রবিদ এবং মেসোপটেমিয়ার হাররানের অধিবাসী সাবিত ইবনে কাররা (৮২৫–৯০১) এবং কুসতা ইবনে লুকা (লিউকের পুত্র কনস্ট্যান্টাইন, আনু ৯০০.)। নবম শতকের অধিকাংশ চিকিৎসাবিদের ন্যায় সাবিত ছাড়া এরা সবাই খৃষ্টান ছিলেন। সাবিত নিজেও ছিলেন একজন পৌত্তলিক 'সাবিয়ান' বা নক্ষত্র উপাসক। হুনাইন ও হুবাইশ প্রায় একান্তভাবে চিকিৎসাবিষয়ক রচনাবলী অনুবাদ করেন এবং তাদের সহকর্মীরা জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রীক রচনাবলী অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেন। এরা সবাই নিজস্ব গ্রন্থও রচনা করেন, যার সংখ্যা শত শত। নবম শতকের প্রথমার্ধে প্রাচীন সিরীয় ভাষার রচনা প্রাধান্য লাভ করে, কিন্তু অতঃপর আরবী রচনা ব্যাপকতা লাভ করে। এই অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জুন্দিশাপুরের প্রাচীন জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়। এখানকার প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ ও বিজ্ঞানীরা একে একে বাগদাদে ও খলীফাদের মোহনীয় আবাস স্থল সামাররায় স্থানান্তরিত হন।

৮৫৬ খৃষ্টাব্দের দিকে খলীফা আল মুতাওয়াকিল পুনরায় বাগদাদে গ্রন্থাগার ও অনুবাদ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এর পরিচালনা ভার দেওয়া হয় হুনাইনের ওপর। খৃষ্টান জ্ঞানবিদদের গ্রীক পাণ্ডুলিপির সন্ধানে বিভিন্ন দেশ সফর করার জন্য এবং অনুবাদের উদ্দেশ্যে এগুলি বাগদাদে নিয়ে আসার জন্য খলীফাগণ এবং তাদের পদস্থ ওমরাহগণ সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাই হুনাইন নিজে গ্যালেনের বর্তমানে বিলুপ্ত এবং ঐ সময়েও অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য একটি রচনা সম্পর্কে বলেন, "আমি গভীর আগ্রহ নিয়ে এটির সন্ধান করি এবং এই উদ্দেশ্যে মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিসর এবং সর্বশেষে আলেকজান্দ্রিয়া সফর করি। এতো কিছু করেও আমি কোন কিছুর সন্ধান পাইনি। অবশেষে দামেস্কে আমি এর প্রায় অর্ধেক উদ্ধার করি।" তিনি বলেন যে, তিনি সব সময় একটি গ্রীক গ্রন্থের অন্ততপক্ষে তিনটি পাণ্ডুলিপির সাহায্য গ্রহণের চেষ্টা করতেন যাতে সবগুলি মিলিয়ে প্রকৃত বিষয়বস্তু উদ্ধার করা যায়––একজন সম্পাদকের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ আধুনিক ধারণা।

www.waytojannah.com

বাগদাদে মেডিক্যাল শিক্ষা সম্পর্কে হুনাইনের সম্প্রতি প্রকাশিত *মিসিভ অন দি গ্যালেনিক ট্রান্সলেশন্স* গ্রন্থে দেখতে পাই যে, ৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সেখানে গ্রীক ঐতিহ্যসমূহ পুরোপুরি জীবন্ত হয়ে ওঠে। গ্যালেনের *টুয়েন্টি বুকস* কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হতো তিনি তার একটি চিত্র তুলে ধরেন। 'আলেকজান্দ্রিয়ার মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রদের অধ্যয়ন এসব বইর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং আমি আমার তালিকায় যে ধারাবাহিকতা অনুসরণ করেছি তা বজায় রাখা হতো। আমাদের সময়ে আমাদের খৃষ্টান বন্ধুরা যেভাবে প্রাচীনদের গ্রন্থাবলী থেকে একটি নির্দিষ্ট মানের পাঠ্য বিষয় আলোচনা করার জন্য প্রত্যহ স্কুল (উসকুল) নামে পরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে মিলিত হয়। তারাও তেমনি প্রত্যহ একটি মানের পাঠ্য বিষয় অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করার জন্য মিলিত হতো। গ্যালেনের অন্যান্য বইগুলি একটি পরিচিতিমূলক আলোচনার পর তারা নিজেরাই পড়তেন, যেমনটি বর্তমানে আমাদের বন্ধুরা প্রাচীনদের বইগুলির বিশ্লেষণসমূহ পড়ে থাকেন।' এ সময়ে এবং এর পরবর্তীকালে বাগদাদের স্কুল ও মসজিদগুলিতে শিক্ষা দানের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

গ্রীক রচনা ও রচনার অংশবিশেষের অনুবাদ ছাড়াও অনুবাদকগণ এগুলির সারগ্রন্থ তৈরি করেন এবং এরই একটি রূপ হচ্ছে 'প্যাণ্ডেক্টস' যা আরবদের জ্ঞানচর্চার একটি আদর্শ বৈশিষ্ট্য। এগুলি সামগ্রিক চিকিৎসা শাস্ত্রের পুনর্বর্ণনামূলক যাতে মাথা থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত দেহের পীড়াগুলি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হয়। এসব প্যাণ্ডেক্টস–এর অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়েছে। অবশ্য কিছুকাল আগে কায়রোতে এর একটি পুনঃ প্রকাশিত হয়। এটি চিকিৎসাবিদের চাইতে অনুবাদক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে খ্যাত সাবিত ইবনে কাররা (পৃ.........) কর্তৃক রচিত। এটি একত্রিশটি অংশে বিভক্ত। আলোচিত বিষয়গুলি হচ্ছে স্বাস্থ্য–বিজ্ঞান, 'গোপন' ও সাধারণ রোগসমূহ, যেমন চর্মরোগ। এর পরের শাখাটি বিরাট––মস্তক থেকে শুরু করে বক্ষদেশ, পাকস্থলী এবং অন্ত্র হয়ে দেহের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিভিন্ন অংশের রোগ। এরপর সংক্রামক ব্যাধি সংক্রান্ত আলোচনা, যার মধ্যে বসন্ত এবং হামও রয়েছে। এখানে বিভিন্ন ধরনের বিষ সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর আবহাওয়ার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তারপর ভাঙা ও মচকানো, খাদ্য ও পথ্য এবং সর্বশেষে যৌন বিষয়াদি আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেক রোগের স্বরূপ, কারণ, লক্ষণ এবং চিকিৎসা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বাহুল্য বর্জিত ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। বহু গ্রীক ও প্রাচীন সিরীয় ভাষার লেখকের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

আর এক ধরনের চিকিৎসা বিষয়ক বই আরব জ্ঞানীদের প্রিয় ছিল। এগুলি হচ্ছে প্রশ্ন ও জবাবের আকারে মুখস্থ করার বই। এধরনের শত শত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় এবং আরবী চিকিৎসা বিজ্ঞানকে জ্ঞানদীপ্ত করে তোলার পিছনে এগুলির বিরাট অবদান রয়েছে। চিকিৎসা শাস্ত্র ছাড়া বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রীক রচনাবলী অনুবাদ সম্পর্কে আমাদের তথ্যসূত্র

www.waytojannah.com

Contents

কিছুটা সঙ্কীর্ণ। অ্যারিস্টটলের বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাবলী অধিকাংশই প্রাচীন সিরীয় ও আরবী ভাষায় অজ্ঞাত পরিচয় অনুবাদকরা অনুবাদ করেছেন। মহান দার্শনিকের *ফিজিক্স, মীটিওরলজি ডি অ্যানিমা, ডি সেন্‌সু, ডি সীলো, ডি জেনারেশন এট্ করাপশন হিস্টোরিয়া অ্যানিমালিয়াম* এবং সে সঙ্গে উদ্ভিদবিজ্ঞান, খনি বিজ্ঞান ও যন্ত্রকৌশল বিজ্ঞান সংক্রান্ত ভুয়া গ্রন্থাবলী এসব ভাষাতেই পাওয়া যায়। অ্যাপালনিয়াস অব তিয়ানা (আবররা 'বিল ইয়ানুস' বলতেন) কর্তৃক রচিত *সিক্রেট অব ক্রিয়েশন* ও বিখ্যাত *ডি কসিস*–এর ন্যায় কতিপয় নিও–প্লাটোনিক গ্রন্থ এবং গ্রীক বিজ্ঞানীদের অন্যান্য সন্দেহজনক রচনা আরবী ভাষায় পাওয়া যায়। ভুয়া নামে আলকেমী সম্পর্কিত বহু গ্রীক রচনাও অনূদিত হয়েছে। অবশ্য নবম শতকে রসায়ন সম্পর্কে কোন অগ্রগতির রেকর্ড নেই। হুনাইন ও আল কিন্দীর (মৃ. আনু. ৮৭৩) ন্যায় দুজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আলকেমী চর্চার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তারা এটিকে প্রতারণামূলক বলে আখ্যায়িত করেন।

এবারে অনুবাদ থেকে এ যুগের মৌলিক রচনার প্রসঙ্গে আসা যাক। পদার্থ বিদ্যায় সব চাইতে উল্লেখযোগ্য পণ্ডিত হচ্ছেন আল–কিন্দী। তার রচনার সংখ্যা অন্যূন ২৬৫টি এবং তিনি আরবদের মধ্যে প্রথম মুসলিম দার্শনিক। তিনি আবহাওয়া তত্ত্ব সম্পর্কে অন্ততপক্ষে পনেরটি গ্রন্থ রচনা করেন। সুনির্দিষ্ট ওজন, জোয়ার ভাটা, আলোক–বিজ্ঞান এবং বিশেষত আলোর প্রতিফলন সম্পর্কে তার একাধিক গ্রন্থ এবং সঙ্গীতের ওপর আটটি গ্রন্থ রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত আল–কিন্দীর বৈজ্ঞানিক রচনার অধিকাংশই বিলুপ্ত। একটি ল্যাটিন অনুবাদের মাধ্যমে সংরক্ষিত তাঁর *অপটিক্স* (আলোক বিজ্ঞান) রজার বেকন ও অন্যান্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীকে প্রভাবিত করে।

মেসোপটেমিয়া ও মিসরে সেচ ব্যবস্থা এবং পানি সরবরাহ ও যোগাযোগের জন্য খাল–ব্যবস্থা সৃষ্টি হওয়ায় কৌশলবিজ্ঞানের দ্রুত বিকাশ ঘটে। কৌশলগত যন্ত্রবিজ্ঞান বিপুল আগ্রহের সৃষ্টি করে এবং পানি উত্তোলন, পানি চালিত চাকা, ভারসাম্য ও জল–ঘড়ি সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচিত হয়। যন্ত্রবিজ্ঞান সম্পর্কে *বুক অব আর্টিফিসেস* নামে প্রাচীনতম গ্রন্থ প্রকাশিত হয় আনুমানিক ৮৬০ খৃষ্টাব্দে। এর রচয়িতা হচ্ছেন মূসা ইবনে শাকিরের পুত্র মোহাম্মদ, আহমদ এবং হাসান। তারা অনুবাদকদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই গ্রন্থটিতে একশ কৌশলগত নির্মাণের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে যার মধ্যে বিশটির ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। যথা উষ্ণ ও শীতল জলের নৌযান এবং নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত জলকূপের বিবরণ। অধিকাংশই আলেকজান্দ্রিয়ার নায়কের (টলেমী?) যন্ত্রকৌশলের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি সাঙ্গিতিক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা সমন্বিত পানপাত্রের ন্যায় বৈজ্ঞানিক শৌখিন বস্তুর বর্ণনা।

প্রকৃতির ইতিহাসের ক্ষেত্রে অষ্টম শতকে এক ধরনের বিশেষ রচনার উদ্ভব হয়। এটি জীব–জন্তু, উদ্ভিদ ও বিভিন্ন ধরনের পাথরের বর্ণনামূলক রূপ গ্রহণ করে। সাহিত্য সৃষ্টির

www.waytojannah.com

উদ্দেশ্যে রচিত হলেও প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়। এ ধরনের রচনার অত্যন্ত যশস্বী গ্রন্থকারদের অন্যতম হচ্ছেন বসরার বিখ্যাত আরবী ভাষাতত্ত্ববিদ আল-আসমাই (৭৪০-৮২৮ খৃ.)। তিনি *অন দি হর্স, অন দি ক্যামেল, অন দি ওয়াইল্ড অ্যানিম্যালস, অন দি প্ল্যান্টস এণ্ড ট্রীজ, অন দি ভাইন এণ্ড পাম ট্রি* এবং *অন দি মেকিং অব ম্যান* শিরোনামে গ্রন্থ রচনা করেন। অন্যান্য কয়েকজন লেখকও অনুরূপ গ্রন্থ রচনা করেন। ইবনে ওয়াহশিয়্যার (আনু. ৮০০ খৃ.) *নাবাটিয়ান এগ্রিকালচার* গ্রন্থটি অনেক বিতর্কের সৃষ্টি করে। এতে জীবজন্তু এবং উদ্ভিদ ও সেগুলির চাষ সম্পর্কে কিছু কিছু মূল্যবান তথ্য রয়েছে। এসব বিবরণের সঙ্গে রূপকথা এবং ব্যাবিলনীয় ও অন্যান্য সেমিটিক সূত্রের জাল অনুবাদ যুক্ত করা হয়েছে। বাইযেন্টাইন পণ্ডিত ক্যাসিয়াননাস ব্যাসাসের (আনু. ৫৫০) কৃষি সংক্রান্ত (জিওপোনিকা) রচনার প্রাচীন সিরীয় ভাষার সংস্করণ বিভিন্ন পণ্ডিত আরবীতে অনুবাদ করেন।

অ্যারিস্টটলের সন্দেহজনক রচনা *মিনার‍্যালজির* (ধাতু বিদ্যা) আরবী সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর বহু মুসলিম লেখক বিভিন্ন ধরনের পাথর বিশেষ করে মূল্যবান পাথর সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন, যা 'জহুরী' নামে একটি বিশেষ শ্রেণী সৃষ্টি করে। এগুলি পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যে অনুবাদ ও অনুকরণ করা হয়। আমরা জাবির থেকে আল-কিন্দী পর্যন্ত যাদের নাম উল্লেখ করেছি তাদের প্রায় সবাই এ ধরনের পুস্তিকা রচনা করেন। আল-কিন্দী এ ছাড়াও অস্ত্রের জন্য লৌহ এবং ইস্পাতের ব্যবহার সম্পর্কে ছোট ছোট বই লেখেন। খলীফা শাসিত সাম্রাজ্যের সঙ্গে তুর্কীস্থান, ভারত, পূর্ব আফ্রিকার উপকূলবর্তী এলাকা প্রভৃতি পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলীয় দেশগুলির ক্রমবর্ধমানভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে দুষ্পাপ্য ও মূল্যবান পাথর এবং সেগুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ বৃদ্ধি পায়। পাথরের কোন কোন আধুনিক নাম এখনো আরবী বা পারস্য ভাষার সঙ্গে সেগুলির সম্পর্কের স্বাক্ষর বহণ করে। যেমন *বিযোর* (আরবী বেযহর, ফারসী পেদ-যহর, বিষ ক্ষয় বা বিষ থেকে রক্ষা করা) এমনিভাবে গ্রীকদের কাছে অপরিচিত বহু উদ্ভিদ, ঔষধের উপাদান এবং অন্যান্য জিনিস আমরা পারস্যবাসীদের মাধ্যমে পাই, যেমন সাণ্ডা দ্বীপপুঞ্জের[১] ক্যামফর (কর্পূর পারস্য ভাষা থেকে উদ্ভূত একটি আরবী শব্দ) ও গালাঙ্গন রুট (আদা জাতীয় মূল, চীনা *কাওলিয়াং চ্যাং* থেকে পারস্য ভাষায় খুলিন জান), তিব্বতের মাস্ক (কস্তুরী), ভারতের ইক্ষু[২] এবং ভারত মহাসাগরের উপকূলের অম্বর জাবির ইবনে হাইয়ান থেকে পরবর্তীকালে বহু আরবী লেখক চিকিৎসাবিদ ঔষধ-বিজ্ঞান ও বিষ-বিজ্ঞান সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন। মুসলিম

১. সুণ্ডা এবং সোয়েণ্ডাও বলা হয়, সুমাত্রা, জাভা, বালি লম্বোক, সুমবাওস্তা প্রভৃতি সহ ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত দ্বীপসমষ্টি। -অনুবাদক

২. সংস্কৃত শর্করা, ফারসী সক্কর, আরবী সুককার এবং ইংরেজি সুগার।-অনুবাদক

www.waytojannah.com

বিশ্বে ৮ম শতকে চীন থেকে কাগজের প্রচলন হয় এবং ৭৯৪ খৃষ্টাব্দে বাগদাদে প্রথম কাগজের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. সুবর্ণ যুগ প্রায় ৯০০ থেকে প্রায় ১১০০ পর্যন্ত

অনুবাদ যুগের শেষের দিকে মুসলিম বিশ্বের চিকিৎসাবিদ ও বিজ্ঞানীগণ গ্রীক বিজ্ঞানের একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে সক্ষম হয়। ইতিমধ্যে পারস্য ও ভারতীয় চিন্তাধারা এবং অভিজ্ঞতাও তাদের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। তারা গ্রীক বিজ্ঞানীদের রচনা আয়ত্ত করলেও সেগুলি অত্যন্ত মৌলিক ছিল না। তাই এরপর থেকে তাঁরা নিজস্ব সম্পদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার জন্য এবং সেগুলির বিকাশ সাধনের জন্য উদ্যোগী হন।

বিজ্ঞান, বিশেষত চিকিৎসা-বিজ্ঞান খৃষ্টান ও সাবিয়ানদের হাত থেকে দ্রুত মুসলমানদের হাতে চলে যায়। তারা অধিকাংশই ছিলেন পারস্যবাসী। চিকিৎসা শাস্ত্রের ক্ষেত্রে প্রাচীন সূত্রসমূহ থেকে সংকলিত *প্যাণ্ডেক্ট্স*-এর স্থলে আমরা বিশ্বকোষ আকারের বড় বড় রচনা দেখতে পাই। এগুলিতে পূর্ববর্তী যুগসমূহের জ্ঞান অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে শ্রেণীবিন্যাস করে আধুনিক জ্ঞানের পাশাপাশি সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

এই নতুন যুগের প্রথম এবং নিশ্চিতভাবে শ্রেষ্ঠতম লেখক হচ্ছেন আররাযী, তিনি ল্যাটিন পাশ্চাত্যে 'রাযেস' (আনু. ৮৬৫-৯২৫) নামে পরিচিত। পারস্যবাসী মুসলমান রাযী আধুনিক তেহরানের নিটবর্তী রাই শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

রাযী নিঃসন্দেহে মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম এবং সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ ছিলেন। তিনি বাগদাদে হুনাইন ইবনে ইসহাকের জনৈক শিষ্যের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। এই শিক্ষক গ্রীক, পারস্য ও ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তরুণ বয়সে রাযী আলকেমী চর্চা করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তার খ্যাতি যখন পশ্চিম এশিয়ার সকল অঞ্চলের শিষ্য ও রোগী আকর্ষণ করে তখন তিনি একান্তভাবে চিকিৎসাশাস্ত্রে আত্মনিয়োগ করেন। তার জ্ঞান ছিল সর্বব্যাপক এবং বৈজ্ঞানিক অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি ২০০টিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেন, যার অর্ধেক চিকিৎসাশাস্ত্র সংক্রান্ত।

রাযীর চিকিৎসা বিষয়ক রচনার মধ্যে ক্ষণস্থায়ী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বহু সংক্ষিপ্ত রচনা ছিল। অধিকাংশ পাঠকের কাছে কিছুটা নিরস মনে হলেও এগুলির শিরোনামে মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে। হালকা রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে *দক্ষ চিকিৎসকরাও যে সকল রোগ নিরাময় করতে পারেন না সে বিষয় সম্পর্কে, সন্ত্রস্ত রোগীরা কেন দক্ষ চিকিৎসকদেরও সহজে ছেড়ে যায়; জনসাধারণ কেন দক্ষ চিকিৎসকদের চাইতে হাঁতুড়ে বাকপটু চিকিৎসকদের বেশি পছন্দ করে; শিক্ষিত চিকিৎসকদের চাইতে মূর্খ চিকিৎসক, সাধারণ লোক এবং মেয়েরা কেন বেশি সাফল্য লাভ করেছে।* অন্যান্য সংক্ষিপ্ত রচনায় তিনি পৃথক পৃথক রোগের বিষয় আলোচনা করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ পিত্তাশয় ও মূত্রাশয়ের

www.waytojannah.com

পাথর সংক্রান্ত রোগ। এই দুটি রোগই নিকটপ্রাচ্যে অত্যন্ত সাধারণ ছিল। শব ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কেও তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। রাযীর সবচাইতে বিখ্যাত রচনা হচ্ছে *বসন্ত ও হাম রোগ প্রসঙ্গে।* এটি প্রথম দিকে ল্যাটিন ভাষায় এবং পরবর্তীকালে ইংরেজিসহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। ১৪৯৮ খৃ. থেকে ১৮৬৬ খৃ. পর্যন্ত চল্লিশ বারেরও বেশি এই বইটি মুদ্রিত হয়। এতে উপরোক্ত দুটি রোগ সম্পর্কে সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট বিবরণ দেওয়া হয়েছে। একটি উদ্ধৃতি থেকে মূল রচনার পর্যবেক্ষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

বসন্তরোগ দেখা দেওয়ার আগে ক্রমাগত জ্বর হয়। পিঠে ব্যথা হয়, নাক চুলকায় এবং ঘুমের মধ্যে শরীর কাঁপে। এই রোগ দেখা দেওয়ার প্রধান লক্ষণগুলি হচ্ছে ঃ জ্বরসহ পিঠ ব্যথা, সমস্ত শরীরে কাঁটা ফোটার ন্যায় ব্যথা, মুখে রক্ত সঞ্চার, সময় সময় সঙ্কোচন, চোখেমুখে লালের আভা, শরীরে খিঁচুনিভাব, মাংস শিহরণ, শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট ও কাশিসহ গলা ও বুকে ব্যথা, মুখের ভিতর শুকিয়ে যাওয়া, গাঢ় লালা নির্গমন, কণ্ঠস্বরে কর্কশতা, মাথা ধরা ও ঝিমঝিম করা, উত্তেজনা, উদ্বেগ, বমির উদ্রেক এবং অস্থিরতা, বসন্তের চাইতে হামের ক্ষেত্রে উত্তেজনা, বমির উদ্রেক ও অস্থিরতা বেশি প্রকাশ পায়। আবার হামের চাইতে বসন্তে পিঠ ব্যথা বেশি হয়।'

গুটি বসন্ত পুরোপুরি বিকশিত হওয়ার পর রাযী গুটিগুলির কিভাবে চিকিৎসা করতে হবে তার সুষ্ঠু ও বিস্তারিত পরামর্শ দেন। প্রাচ্যে এখনো সাধারণত এই রোগে গুটিগুলির দরুণই শরীরে দাগ থেকে যায়।

রাযীর বৃহত্তম চিকিৎসা গ্রন্থ এবং সম্ভবত কোন চিকিৎসাবিদ কর্তৃক কখনো লিখিত সব চাইতে বিস্তারিত গ্রন্থটি হচ্ছে *আল-হাওউই*, অর্থাৎ 'পূণাঙ্গ বই'। এতে গ্রীক, প্রাচীন সিরীয় ও প্রাচীন আরবের চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্যাবলী সামগ্রিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। রাযী আজীবন চিকিৎসা সংক্রান্ত যেসব বই পড়েছেন সেগুলি থেকে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি সংগ্রহ করেছেন এবং সেই সঙ্গে চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে তার সামগ্রিক অভিজ্ঞতাও একত্র করেছেন।জীবনের শেষ বছরগুলিতে এগুলির সংমিশ্রণেই তিনি এই বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন। আরবী জীবনী গ্রন্থগুলি এ সম্পর্কে একমত যে, তিনি তাঁর এই রচনা সমাপ্ত করতে পারেন নি। মৃত্যুর পর তার শিষ্যরাই এই রচনা সম্পন্ন করেন। *হাওউই* বিশটিরও বেশি খণ্ডে বিভক্ত ছিল। কিন্তু বর্তমানে মাত্র ১০টির মতো খণ্ড পাওয়া যায় এবং এগুলির আট-দশটি সাধারণ গ্রন্থাগারে বিচ্ছিন্নভাবে রয়েছে। রাযীর মৃত্যুর অর্ধশতাব্দী পরে কেবল দুটি পূর্ণাঙ্গ কপির কথা জানা যায়। কিন্তু আমি আনুমানিক ১০৭০ খৃস্টাব্দে লিখিত 'বখত ঈশু' বংশের জনৈক চক্ষু বিশেষজ্ঞের একটি গ্রন্থে এরূপ মন্তব্য দেখতে পাই যে, তিনি *হাওউইর* চক্ষু চিকিৎসা সংক্রান্ত পাঁচটি কপি পর্যালোচনা করেছেন। প্রত্যেক রোগের ক্ষেত্রে রাযী প্রথমে সমস্ত গ্রীক, সিরীয়, আরব, পারস্য ও ভারতীয় লেখকদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন এবং শেষের দিকে নিজস্ব মতবাদ ও অভিজ্ঞতা প্রদান করেন। তিনি চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাঁর গভীর পর্যবেক্ষণমূলক বহু উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তও তুলে ধরেন।

www.waytojannah.com

আনজু[১] রাজ বংশের প্রথম চার্লসের পৃষ্ঠপোষকতায় জিরজেন্টির সিসিলীয় ইহুদী চিকিৎসাবিদ ফারাজ ইবনে সালিম (ফাররাগুট) ল্যাটিন ভাষায় *হাওউই* অনুবাদ করেন।

তিনি এই বিশাল দায়িত্ব ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত করেন। তিনি *আল হাওউই* শিরোনামটি *কন্টিনেন্স*-এ পরিবর্তন করেন। অতঃপর *লাইবার কন্টিনেন্স* (দ্রঃ লিগেসি অব ইসরাইল পৃ. ২২১) নামে রাযীর এই বৃহত্তম রচনাটি পরবর্তী শতকসমূহে অসংখ্য পাণ্ডুলিপি আকারে প্রচারিত হয়। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ থেকে এটি বার বার মুদ্রিত হয়। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই বিশাল ও মূল্যবান রচনাটির পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও এর বিভিন্ন অংশের বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাই ইউরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানে এর প্রভাব অসামান্য।

চিকিৎসাশাস্ত্র ছাড়াও রাযী ধর্মতত্ত্ব., দর্শন, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা এবং 'প্রকৃতি বিজ্ঞানের' উপর গ্রন্থ রচনা করেন। সর্বশেষ বিষয়ে বস্তু, স্থান, সময়, গতি, পুষ্টি, বৃদ্ধি, পচন, আবহাওয়াতত্ত্ব, আলোক বিজ্ঞান ও আলকেমী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। রাযীর আলকেমী সংক্রান্ত রচনার গুরুত্ব মাত্র কিছুকাল আগে থেকে জানা যায়। তাঁর বিখ্যাত *বুক অব দি আর্ট (অব আলকেমী)* গ্রন্থটি সাম্প্রতিককালে জনৈক ভারতীয় রাজার লাইব্রেরীতে আবিষ্কৃত হয়েছে। আংশিকভাবে জাবিরের ন্যায় একই সূত্রসমূহের ওপর নির্ভরশীল হলেও উপাদানসমূহের সঠিক শ্রেণীবিন্যাস এবং রাসায়নিক পদ্ধতি ও সরঞ্জামের সুস্পষ্ট বর্ণনায় রাযী জাবিরকে ছাড়িয়ে যান। তাঁর বর্ণনায় আধ্যাত্মিকতার কোন প্রভাব নেই। জাবির এবং অন্যান্য আরব আলকেমী বিশেষজ্ঞগণ যেখানে খনিজ পদার্থকে 'বডীজ' বা 'দেহ' (স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি), 'সোল' বা 'সার' (গন্ধক, আর্সেনিক ইত্যাদি) এবং 'স্পীরিট্স' বা 'চেতনা' (পারদ, স্যাল অ্যামেনিয়াক ইত্যাদি), এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন সেখানে রাযী আলকেমীর উপাদামগুলিকে উদ্ভিদ, প্রাণী কিংবা খনিজ পদার্থে শ্রেণী বিন্যাস করেছেন। এই ধারণাটি তাঁর কাছ থেকেই আধুনিককালে প্রবর্তিত হয়। ধাতব পদার্থের শ্রেণীকে তিনি সার, দেহ, পাথর, ভিট্রিয়লস, সোহাগা ও লবণের পর্যায়ে পুনরায় শ্রেণী বিন্যাস করেছেন। তিনি পরিবর্তনশীল 'দেহ' ও অপরিবর্তনীয় 'সার'-এর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে গন্ধক, পারদ, আর্সেনিক ও সালমিয়াককে শেষোক্ত পর্যায়ভুক্ত করেছেন।

পাশ্চাত্যে আইজাক জুডিয়াস (৮৫৫-৯৫৫) নামে পরিচিত একজন বিশিষ্ট লেখক রাযীর সমসাময়িক ছিলেন। এই মিসরীয় ইহুদী তিউনিসিয়ার কাইরওয়ানের ফাতিমীয় শাসকদের চিকিৎসক ছিলেন। যাঁদের রচনা সর্ব প্রথম ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয় তিনি তাদের অন্যতম। আফ্রিকান কনস্ট্যান্টাইন ১০৮০ খৃষ্টাব্দের দিকে এই দায়িত্ব সম্পাদন

---

১. পশ্চিম ফ্রান্সের একটি প্রাচীন এলাকা; কতিপয় রাজবংশ তাদের পরিচয় হিসাবে এই এলাকার নামটি গ্রহণ করেন।-অনুবাদক।

www.waytojannah.com

করেন। এই রচনা পাশ্চাত্যের মধ্যযুগীয় চিৎিসাশাস্ত্রে অনেক প্রভাব সৃষ্টি করে এবং সপ্তদশ শতকেও এটি পঠিত হয়। রবার্ট বার্টন (১৫৭৭–১৬৪০) তাঁর *অ্যানাটমি অব মেল্যাঙ্কলী* গ্রন্থে এখান থেকে অবাধে উদ্ধৃতি দেন। আইজাকের *অন ফিভার্স, অন দি ইলিমেন্টস, অন সিম্পল্ ড্রাগস এণ্ড অ্যালিমেন্টস* শিরোনামের গ্রন্থগুলি এবং সর্বোপরি তাঁর *অন ইউরিন* গ্রন্থটি বহু শতাব্দী পর্যন্ত চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রাধান্য বজায় রাখে। কেবলমাত্র একটি হিব্রু অনুবাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত *গাইড ফর ফিজিশিয়ান্স* শিরোনামে তার একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতে চিকিৎসা পেশার উন্নত নৈতিক আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে। এই রচনার কোন কোন সারগর্ভ উক্তি প্রণিধানযোগ্য ঃ 'কোন চিকিৎসক দুঃসময়ের শিকার হলে নিন্দা করার জন্য তোমার মুখ খুলো না, কারণ প্রত্যেকেরই নিজস্ব সময় আছে।' 'তোমার নিজস্ব দক্ষতাই তোমাকে গৌরবান্বিত করুক' 'অন্যের অপমানের মধ্যে সম্মান প্রত্যাশা করো না।' 'গরীবের কাছে গিয়ে তার চিকিৎসা করাকে অবহেলা করো না, কারণ এর চাইতে মহৎ কাজ আর কিছু নেই।' 'রোগীকে নিরাময়ের আশ্বাস দিয়ে আশ্বস্ত করো, কারণ তুমি যদি নিশ্চিত নাও হও এতে তুমি তার স্বাভাবিক শক্তি সঞ্চয়ে সাহায্য করবে।' প্রাচ্যের রোগীদের সঙ্গে আচরণের ব্যাপারে একটি বাস্তব উপদেশ অপরূপ ঃ 'অসুস্থতা যখন বৃদ্ধি পেতে থাকবে কিংবা চরম পর্যায়ে পৌঁছবে তখন তোমার পারিশ্রমিক চাইবে, কারণ সুস্থ হওয়ার পর তুমি তার জন্য যা করেছ সে তা অবশ্যই ভুলে যাবে?

আইজাকের সবচাইতে বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন ইবনে আল–জাযযার (মৃ. ১০০৯) নামক জনৈক মুসলমান। তাঁর প্রধান রচনা *প্রভিঝন ফর দি ট্রাভেলার* প্রথম দিকেই ল্যাটিন (ভিয়াটিকাম), গ্রীক (ইফোডিয়া) ও হিব্রু ভাষায় অনূদিত হয়। আভ্যন্তরীণ রোগসমূহের উত্তম বিবরণী সম্বলিত এই রচনাটি মধ্যযুগীয় চিকিৎসকদের অত্যন্ত প্রিয়। কিন্তু এর অনুবাদক কনস্ট্যান্টাইন প্রকৃত গ্রন্থকারের স্থলে নিজের নামেই এটি প্রচার করেন (পৃ....... দ্রষ্টব্য)

আলকেমী সংক্রান্ত যেসব রচনার সঙ্গে 'জাবিরের' নাম জড়িত তা দীর্ঘকাল পর্যন্ত পণ্ডিতদের কাছে একটি হেঁয়ালী ছিল। এই 'জাবির' ও অষ্টম শতকের অধ্যাত্মবাদী 'জাবির' যদি একই ব্যক্তি হন, তাহলে তিনি কিভাবে তখনো পর্যন্ত আয়ত্তের বাইরে আলকেমী সংক্রান্ত গ্রীক রচনার জ্ঞান লাভ করেন তা উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য। অবশ্য আগেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, বর্তমানে এরূপ প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, জাবিরের নামযুক্ত রচনাবলী দশম শতকের প্রথম দিকে প্রকাশিত হয়েছে। মনে হয় এগুলি তথাকথিত 'ব্রিদ্রেন অব পিউরিটি' (ইখওয়ানুস সাফা) জাতীয় কোন গোপন সংস্থার কারসাজি। 'জাবিরের' চিকিৎসা সংক্রান্ত রচনায় গ্রীক গ্রন্থকারদের কেবল উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর রচনা পদ্ধতির সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই এবং এতে জ্ঞানচর্চার একটি পৃথক

www.waytojannah.com

ধারা সুস্পষ্ট। সিরীয় ও ভারতীয় ঔষধের নাম কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু পারস্য ভাষার বিভিন্ন অর্থবোধক শব্দ প্রচুর। তাই আমরা ধরে নিতে পারি যে, এই বিশেষ গ্রন্থটিতে গ্রীক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং পারস্যের ঔষধ ও বিষ সংক্রান্ত বাস্তব জ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটেছে। যাই হোক এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এটি প্রাক মুসলিম ও মুসলিম যুগের বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের একটি সুদীর্ঘ ধারার সর্বশেষ যোগসূত্র।

'জাবির' আরব আলকেমীর জনক হিসাবে বিশ্ব বিখ্যাত। সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে, আল–কিমিয়া শব্দটি মিসরীয় *কাম–ইট* বা *কিম–ইট* (কৃষ্ণ) থেকে উদ্ভূত। কারো কারো মতে এটি গ্রীক *কিমা* (গলিত ধাতু) থেকে উদ্ভূত। মিসরীয় ও গ্রীক পণ্ডিতদের প্রতিষ্ঠিত মতামত অনুযায়ী এই 'বিজ্ঞানের' মৌলিক বক্তব্য বিষয়গুলি হচ্ছে (ক) সব ধাতুই বাস্তবে এক, তাই শেষ পর্যন্ত একটিকে আরেকটিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব; (খ) স্বর্ণ 'সব চাইতে খাঁটি' ধাতু এবং তার পরেই হচ্ছে রৌপ্য; এবং (গ) এমন একটি উপাদান রয়েছে যা অব্যাহতভাবে নিকৃষ্ট ধাতুকে খাঁটি ধাতুতে পরিবর্তিত করতে সক্ষম। পরীক্ষা–নিরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে এ সব ধারণার একটি মূল্যবান তাৎপর্য থাকলেও দুর্ভাগ্যবশত এতে অতিরিক্ত কল্পনার একটি প্রবণতাও রয়েছে। তাছাড়া গ্রীক জ্ঞান–বিজ্ঞানের কেন্দ্র আলেকজান্দ্রিয়ায় এবং বস্তুত মুসলিম সাম্রাজ্যের সর্বত্র নস্‌টিক[১] ও নিওপ্লাটোনিক মতবাদ থেকে এমন কতিপয় আধ্যাত্মিক প্রবণতার উদ্ভব হয় যা পরীক্ষা–নিরীক্ষার মনোভাবের ওপর অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। আলকেমী 'জাবিরের' হাতে পরীক্ষা–নীরিক্ষামূলক গবেষণার বিষয় ছিল। কিন্তু এর মধ্যে উদ্ভট কল্পনা ও কুসংস্কারমূলক চর্চার এমন একটি প্রবণতা দেখা দেয় যাতে এটি প্রতারণামূলক কার্যকলাপেও পরিণত হয়।

আলকেমীর ওপর 'জাবিরের' প্রায় একশটি গ্রন্থ রয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলি কুসংস্কারের বিভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু অন্যান্য রচনা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, লেখক পরীক্ষা–নিরীক্ষার গুরুত্বকে পূর্ববর্তী রসায়নবিদদের তুলনায় অধিকতর সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন এবং তা অধিকতর সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তাই এ বিষয়ে মতবাদ ও চর্চার ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেন। ইউরোপীয় আলকেমী ও রসায়ন শাস্ত্রের সমগ্র ঐতিহাসিক ধারায় তাঁর প্রভাব সুস্পষ্ট।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 'জাবির' বাষ্পীয়করণ, পরিস্রাবণ, উর্ধ্বপাতন, গলিতকরণ, পরিশ্রুতকরণ এবং স্বচ্ছকরণের উন্নত পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করেন। তিনি বহু রাসায়নিক উপাদান তৈরির পদ্ধতিও বর্ণনা করেন, যেমন *সিনাবার* (হিঙ্গুল), আর্সেনিয়াস অক্সাইড প্রভৃতি। কিভাবে প্রায় খাঁটি গন্ধক দ্রাবক ফিটকিরি, ক্ষার, সাল–অ্যামোনিয়াক ও

১. নস্টিকবাদের অনুসারী, এটি আধ্যাত্মিক ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদের এমন একটি মিলিত পদ্ধতি যাতে খৃষ্ট ধর্মকে গ্রীক ও প্রাচ্যের দর্শনসমূহের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।কারণ প্রাচীন খৃষ্টান সম্প্রদায় এর প্রবক্তা ছিল এবং তাদের ধর্মদ্রোহী আখ্যা দেওয়া হয়। –অনুবাদক।

www.waytojannah.com

সল্টপিটার পাওয়া যেতে পারে এবং ক্ষারের সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে গন্ধকের তথাকথিত 'লিভার' 'মিল্ক' তৈরি করতে হবে ইত্যাদি বিষয় তিনি জানতেন। তিনি যথেষ্ট খাঁটি মারকিউরী অক্সাইড ও সাবলিমেট এবং সীসা ও অন্যান্য ধাতুর অ্যাসিটেট তৈরি করেন এবং কখনো কখনো এ গুলিকে স্বচ্ছ করেন। তিনি অশোধিত সালফিউরিক ও নাইট্রিক এসিড তৈরির এবং এ দুটির সংমিশ্রণে আকোয়া রিজিয়া[১] মিকচারের সাহায্যে সোনা ও রূপা দ্রবণের ব্যাপারে অবগত ছিলেন।

'জাবিরের' আরবী রচনা থেকে বেশ কয়েকটি পরিভাষামূলক শব্দ ল্যাটিন ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় ভাষাসমূহে প্রচলিত হয়েছে যেমন *রিয়ালগার*[২], তুঁতিয়া (যিঙ্ক অক্সাইড), *আলকালী*, অ্যান্টিমনি *(আরবী ইসমিদ)* এবং ডিস্টিলেশন যন্ত্রের যথাক্রমে উপরিভাগে ও নিম্নভাগে ব্যবহৃত অ্যালেমবিক[৩] ও অ্যালিউডেল[৪]। 'জাবিরের' রচনায় গ্রীকদের নিকট পরিচিত একটি নতুন রাসায়নিক পদার্থ *সাল অ্যামোনিয়াক*-এর উল্লেখ রয়েছে। গ্রীকদের *অ্যামোনিয়াকন* হচ্ছে খনিজ লবণ। মনে হয় একটি নতুন ধরনের লবণের ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য সিরীয়রা প্রাচীন নামটির পরিবর্তন সাধন করেছেন। 'জাবিরের রসায়ন সংক্রান্ত বিপুল রচনা বিশেষত তাঁর বিখ্যার্ত গ্রন্থ *বুক অব দি সেভেন্টি* প্রকাশিত হওয়ার পরই রসায়ন শাস্ত্রে তার প্রতিভার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাবে। সত্তুরটি নিবন্ধ সম্বলিত এই রচনা কিছুকাল আগ পর্যন্ত কেবল একটি নিকৃষ্ট ও অসমাপ্ত ল্যাটিন অনুবাদের মাধ্যমে পরিচিত ছিলো। এই নিবন্ধকারের তাঁর প্রায় পূর্ণাঙ্গ মূল আরবী রচনা দেখার সৌভাগ্য হয়েছে।

রসায়ন সংক্রান্ত যেসব রচনার সঙ্গে 'জাবিরের' নাম যুক্ত হয়েছে সেগুলি অচিরেই ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। ১১৪৪ খৃষ্টাব্দে রবার্ট অব চেস্টার নামক জনৈক ইংরেজ *বুক অব দি কম্পজিশন অব আলকেমী* শিরোনামে এ ধরনের প্রথম অনুবাদ সম্পন্ন করেন। ল্যাটিন ভাষায় *বুক অব দি সেভেন্টির* অনুবাদ *জিরার্ড অব ক্রিমোনার* (মৃ. ১১৮৭...পৃ. দ্রষ্টব্য) অন্যতম কৃতিত্ব। ইংরেজী অনুবাদক রিচার্ড রাসেল (১৬৭৮) *সান অব পারফেকশন* গ্রন্থটি মূলত 'জাবিরের' রচনা বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁকে 'সবচাইতে বিখ্যাত আরব যুবরাজ ও দার্শনিক জেবের' হিসাবে উল্লেখ করেন। সম্প্রতি ডঃ ই জে হমইয়ার্ডের রচনা থেকে ল্যাটিন লেখকদের 'জেবের' ও আরব আলকেমী বিশেষজ্ঞ 'জাবের যে একই ব্যক্তি তার স্বপক্ষে বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে।

---

১. আক্ষরিক অর্থ রাজকীয় পানি; এটি সোনা ও প্লাটিনাম দ্রবণে সক্ষম বলে এই নামে অভিহিত।–অনুবাদক।

২. মূল আরবী রাহজ আল–গার (রাহজ) গুঁড়া+আল–গার, গুহাবা খনি), কমলা রঙের খনিজ পদার্থ, আতসবাজি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।–অনুবাদক।

৩. মূল আরবী আল–আণবিক–অনুবাদক

৪. মূল আরবী আল–উস্‌লি।–অনুবাদক

www.waytojannah.com

চিত্র-৮৬. পানি ফুটানোর পাতনযন্ত্র

চিত্র-৮৭. মিশ্রণের প্রতীকী আকৃতি। একটি আধুনিক আরব রাসায়নিক মিশ্রণ-এর দুটি নকশা

www.waytojannah.com

খলীফা শাসিত প্রাচ্য এলাকায়ও একদল বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদের আবির্ভাব ঘটে। এঁদের মধ্যে আমরা প্রথমেই ল্যাটিন লেখকদের কাছে হ্যালি (আলী) আব্বাস (মৃ. ৯৯৪) নামে পরিচিত একজন পারস্যবাসী মুসলিম চিকিৎসাবিদের প্রসঙ্গ আলোচনা করবো। তিনি *দি হোল মেডিক্যাল আর্ট* (সামগ্রিক চিকিৎসাশাস্ত্র) শিরোনামে একটি অপরূপ ও সুসংবদ্ধ বিশ্বকোষ রচনা করেন। ল্যাটিন লেখকদের কাছে এটি *লাইবার রিজিয়াস (আল–কিতাবুল মালিকী)* নামেও পরিচিত। এতে চিকিৎসাশাস্ত্রের তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক উভয় দিকই তুলে ধরা হয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্র সংক্রান্ত গ্রীক ও আরবী রচনাবলীর সমালোচনা সম্বলিত একটি চমকপ্রদ অধ্যায়ের মাধ্যমে রচনাটির সূচনা করা হয়। প্রথমদিকে গ্রন্থটি দুবার ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে বিশ্ববিখ্যাত ইবনে সিনার *ক্যানন* এটির স্থলাভিষিক্ত হয়।

বিশ্বজনীনভাবে পাশ্চাত্যে আভিসিনা (৯৮০–১০৩৭) নামে পরিচিত আবু 'আলী আল–হুসাইন ইবনে সিনা মুসলিম বিশ্বের মহাজ্ঞানী পণ্ডিতদের অন্যতম। কিন্তু তিনি দার্শনিক ও পদার্থ বিজ্ঞানী হিসাবে যতোটা খ্যাতি লাভ করেন, চিকিৎসাবিদ হিসাবে ততটা খ্যাত ছিলেন না। এতদসত্ত্বেও ইউরোপীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাঁর বিপুল প্রভাব ছিল। ইবনে সিনা তাঁর বিশাল *ক্যানন অব মেডিসিন (আল–কানুন ফিত্‌তিব্ব)* গ্রন্থে গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে আরব অবদানের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। এটি আরব চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুসংবদ্ধ চূড়ান্ত রূপ এবং শ্রেষ্ঠ রচনা। চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই বিশ্বকোষ সাধারণ চিকিৎসা, সহজ ওষুধপত্র, মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেহের সকল অংশের রোগ, বিশেষ রোগনিরূপণ ব্যবস্থা এবং ওষুধ প্রস্তুত প্রণালী তুলে ধরা হয়েছে।

ক্যাননে শ্রেণীবিন্যাসের যে পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে তা অত্যন্ত জটিল। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য চিকিৎসা চর্চায় উপশ্রেণী সৃষ্টির যে বাতিক দেখা দেয় তার জন্য এই পদ্ধতি অংশত দায়ী। জিরার্ড অব ক্রিমোনা দ্বাদশ শতকে ল্যাটিন ভাষায় গ্রন্থটি অনুবাদ করেন এবং তাঁর অনূদিত অসংখ্য পাণ্ডুলিপি আকারে পাওয়া যায়। এর চাহিদা কত ব্যাপক ছিল নিম্নোক্ত তথ্য থেকে তা বোঝা যায়। পঞ্চদশ শতকের শেষ ত্রিশ বছরে এটি ষোল বার প্রকাশিত হয় এবং তার মধ্যে পনেরটি সংস্করণ ল্যাটিন ভাষায় এবং একটি হিব্রু ভাষায়। ষোড়শ শতকে এটি বিশ বারেরও বেশি পুনঃপ্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির বিভিন্ন অংশের যেসব সংস্করণ বেরিয়েছে সেগুলি এই হিসাবে ধরা হয়নি। ল্যাটিন হিব্রু ও বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় পাণ্ডুলিপি আকারে ও মুদ্রিতভাবে যেসব ভাষ্য প্রকাশিত হয়েছে তা অসংখ্য। সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত এটি ব্যাপকভাবে মুদ্রিত ও পঠিত হয়। চিকিৎসাশাস্ত্র সংক্রান্ত আর কোন রচনা সম্ভবত এতোবেশি পঠিত হয় নি। প্রাচ্যে এখনো এটি প্রচলিত।

চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর ইবনে সিনার আরো প্রায় পনেরটি রচনার বিষয় জানা যায়। এই সঙ্গে তিনি ধর্মতত্ত্ব, মেটাফিজিক্স, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্বের ওপর একশটির মতো

২২—

www.waytojannah.com

গ্রন্থ রচনা করেছেন। পারস্য ভাষায় কতিপয় কবিতা ছাড়া এর প্রায় সবগুলিই আরবীতে লিখিত। দশম শতকে পারস্য ভাষা নতুনভাবে গুরুত্ব লাভ করে। 'যুবরাজ ও চিকিৎসাবিদদের নায়ক' ইবনে সিনার হাতে মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রাচ্যে তার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে। পশ্চিম পারস্যের হামাদানে এই মহান চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকের মাজারে এখনো পর্যন্ত বহু ভক্তের সমাবেশ ঘটে।

প্রাচ্যের মুসলিম বিশ্ব যখন চিকিৎসা শাস্ত্রে ধীরে ধীরে প্রাধান্য অর্জন করতে থাকে তখন মুসলিম পাশ্চাত্যও এই বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসাবে বিকাশ লাভ করে। স্পেনে কর্ডোভার খলীফা তৃতীয় আবদুর রহমান ও দ্বিতীয় আল-হাকামের গৌরবোজ্জ্বল রাজত্বকালে হামদে বিন সাফরুত (মৃ. আনু . ৯৯০) নামক জনৈক ইহুদী একই সময়ে মন্ত্রী, রাজ দরবারের চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি তরুণ বয়সে সন্ন্যাসী নিকোলাসের সহায়তায় ডায়োসকিউরাইডসের *মেটিরিয়া মেডিকার* অপরূপ পাণ্ডুলিপি আরবীতে অনুবাদ করেন। এটি বাইযেন্টাইন সম্রাট সপ্তম কনস্ট্যান্টাইনের কাছ থেকে কূটনৈতিক উপহার হিসাবে প্রেরিত হয়। পরবর্তীকালে রাজদরবারের চিকিৎসক ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস লেখক ইবনে জুলজুল এই অনুবাদটি সংশোধন করেন এবং এর উপর একটি ভাষ্য রচনা করেন।

ল্যাটিন লেখকদের কাছে আবুল কাসিম (আবুল কাসেম? মৃ. আনু. ১০১৩) নামে পরিচিতি মুসলিম লেখকও কর্ডোভায় রাজ দরবারের চিকিৎসক ছিলেন। তিনি ত্রিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত *মেডিক্যাল ভেড মিকাম (আত-তাসরিফ)* নামে পরিচিত একটি বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। সর্বশেষ অধ্যায়ে তিনি অস্ত্রোপচার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এর আগে পর্যন্ত বিষয়টি মুসলিম লেখকদের কাছে উপেক্ষিত ছিল। আবুল কাসিমের শল্যচিকিৎসা বিষয়ক নিবন্ধটি প্রধানত পল অব ইজিনার ষষ্ঠ গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে রচিত হলেও তিনি এতে বহু বিষয় সংযোজিত করেছেন। তার রচনায় বিভিন্ন চিকিৎসা সরঞ্জামের চিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। এটি অন্যান্য আরব লেখককে প্রভাবিত করে এবং বিশেষ করে ইউরোপ শল্যচিকিৎসার ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। এটি প্রথম দিকে ল্যাটিন, প্রভেন্সাল ও হিব্রু ভাষায় অনূদিত হয়। বিখ্যাত ফরাসী শল্যচিকিৎসক গাই দ্য চৌলিয়াক (১৩০০-৬৮) তাঁর অন্যতম রচনায় ল্যাটিন অনুবাদটি পরিশিষ্ট হিসাবে প্রদান করেন।

একাদশ শতকে মিসর, সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ায় ব্যাপকভাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞান চর্চা হয়। ল্যাটিন লেখকদের কাছে হ্যালি রোডোয়াম নামে পরিচিত কায়রোর আলী ইবনে রিদওয়ান মিসরের চিকিৎসা-বিজ্ঞান চর্চার একটি সুন্দর বিবরণী তৈরি করেন। তিনি গ্যালেন ও গ্রীক লেখকদের অনুসারী ছিলেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, প্রাচীনদের রচনাবলী পর্যালোচনার মাধ্যমেই ভালো চিকিৎসাবিদ হওয়া যায়। এই মতবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর সমসাময়িক বাগদাদের ইবনে বুতলান (মৃ. আনু. ১০৬৩) এক সুদীর্ঘ ও প্রচণ্ড বিতর্কের

www.waytojannah.com

সূচনা করেন। গ্যালেনের *আর্স–পার্ভা* সম্পর্কে ইবনে রিদওয়ানের ভাষ্য এবং ইবনে বুতলানের *সিনপটিক ট্যাবলস অব মেডিসিন* নামক জ্ঞানদীপ্ত রচনা ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়।

মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই যুগের আলোচনা সমাপ্ত করার আগে অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আরো কতিপয় রচনা সম্পর্কেও আমাদের আলোচনা করা দরকার।

যেসব সহজ ঔষধপত্র বড় বড় বিশ্বকোষে স্থান পেয়েছে এবং অন্য লেখকরা যেগুলি সম্পর্কে বিষয়ভিত্তিক পৃথক পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন প্রথমে এসব রচনার বিষয় আলোচনা করা যাক। এসব নিবন্ধ এখনো প্রাচ্যে অত্যন্ত সমাদৃত। পারস্যের হেরাতের অধিবাসী আবু মানসুর মুওয়াফফাক পারস্য ভাষায় ৯৭৫টি ঔষধের বর্ণনা দিয়েছেন। *দি ফাউণ্ডেশন্স অব দি টু প্রপার্টিজ অব রেমেডিজ গ্রন্থে* ৫৮৫ টি ঔষধের বর্ণনা রয়েছে। গ্রীক ও প্রাচীন সিরীয় তথ্য ছাড়াও এতে ঔষধ সংক্রান্ত আরব, পারস্য এবং ভারতীয় তথ্যও সন্নিবেশিত হয়েছে। তাছাড়া এটি আধুনিক পারস্য গদ্যের প্রথম কীর্তি–স্তম্ভ। আরবী ভাষায়ও একই ধরনের বহু গ্রন্থ রয়েছে। এগুলির মধ্যে আমরা বাগদাদ ও কায়রোর মাসাওয়িহ আল মারিদিনী (মৃ. ১০১৫) ও স্পেনের ইবনে ওয়াফিদের (মৃ. আনু ১০৭৪) রচনাসমুহের বিষয় উল্লেখ করতে পারি। তাঁরা উভয়েই তাদের রচনার ল্যাটিন অনুবাদের মাধ্যমে অত্যন্ত পরিচিত এবং উভয়ের রচনাই একযোগে পঞ্চাশ বারের বেশি মুদ্রিত হয়েছে। ল্যাটিন ভাষায় এই রচনা 'মিসিউ' দি ইয়ংগার কর্তৃক *ডি মেডিসিনিস ইউনিভার্সালিবাস এট পার্টিকুলারিবাস* শিরোনামে এবং *আবেনগিউফি*, কর্তৃক *ডি মেডিকামেন্টিস সিমপ্লিসিবাস* শিরোনামে অনূদিত হয়েছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অপর একটি শাখা চক্ষু চিকিৎসা ১০০০ খৃষ্টাব্দের দিকে চূড়ান্ত বিকাশ লাভ করে। ল্যাটিন লেখকদের কাছে জেসু হ্যালি নামে পরিচিত বাগদাদের খৃষ্টান চক্ষু চিকিৎসক আলী ইবনে ঈসা ও 'ক্যানামুসালী' নামে পরিচিত মসুলের মুসলিম চক্ষু চিকিৎসক আম্মার এ বিষেয়ে দুটি অপরূপ গ্রন্থ রচনা করেন। তারা গ্রীক চক্ষু চিকিৎসা রীতির সঙ্গে বহু নতুন বিষয়, চক্ষু অস্ত্রোপচার সংক্রান্ত নতুন তথ্যাবলী এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সংযোজন করেছেন। উভয় রচনাই ল্যাটিনভাষায় অনূদিত হয়। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে ফ্রান্সে চক্ষু চিকিৎসা চর্চার রেনেসাঁর সূত্রপাত না হওয়া পর্যন্ত এই দুটি রচনা চক্ষু রোগের ওপর সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ ছিল।

বিজ্ঞানে আমরা *আলকেমী* চর্চায় 'রাযী ও জাবিরের' অবদানের বিষয় উল্লেখ করেছি। সে যুগের শ্রেষ্ঠতম দুজন মনীষী ইবনে সিনা ও আল বিরুনী দৃঢ়ভাবে এ বিষয়টির বিরোধিতা করেন। অপর দিকে আমরা পাহাড়, পাথর ও খনিজ পদার্থের গঠন সম্পর্কিত একটি রচনার জন্য ইবনে সিনার কাছে ঋণী। এতে ভূকম্পন, বায়ু, জল, তাপমাত্রা,

www.waytojannah.com

চিত্র-৮৮. ইবনে সিনার 'এনাটমির' ওপর ভাষণ দেওয়ার দৃশ্য। ডঃ ম্যাক্স মেয়ারহফের সংগ্রহে চতুর্দশ শতাব্দীতে পারস্যে সংকলিত 'মনসুর-এর এনাটমি' নামক গ্রন্থের ষোড়শ শতাব্দীর পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধৃত।

www.waytojannah.com

পাললিক গঠন, শুষ্কতা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হওয়ায় ভূতত্ত্বের ইতিহাসের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ

'গুরু' (আল-উস্তাদ) হিসাবে অভিহিত আবূ রায়হান মোহাম্মদ আল-বিরুনী (৯৭৩-১০৪৮) একজন পারস্যবাসী চিকিৎসাবিদ, জ্যোতির্বিদ, অঙ্কশাস্ত্রবিদ, পদার্থ বিজ্ঞানী, ভূগোলবিদ ও ইতিহাসবিদ ছিলেন। মুসলিম বিজ্ঞান চর্চার সুবর্ণ যুগের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী খ্যাতিসম্পন্ন যেসব জ্ঞানী পণ্ডিতের নাম জড়িত তিনি তাঁদের মধ্যে সম্ভবত সব চাইতে খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর *ক্রনলজি অব এনসেন্ট নেশন্স*-এর ভারতীয় বিষয় পর্যালোচনা উৎকৃষ্ট ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে জানা যায়। অঙ্কশাস্ত্র সংক্রান্ত তাঁর অধিকাংশ রচনা এবং অন্যান্য বহু রচনা এখনো প্রকাশিত হয়নি। পদার্থ বিজ্ঞানে তার বৃহত্তম অবদান হচ্ছে, প্রায় সঠিকভাবে আঠারোটি মূল্যবান পাথর ও ধাতুর সুনির্দিষ্ট ওজন নিরূপণ। আল-বিরুনীর মণি-মুক্তা সংক্রান্ত অসম্পাদিত একটি বিরাট গ্রন্থ অপরূপ পাণ্ডুলিপি আকারে এসকোরিয়াল লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। এতে স্বাভাবিক, বাণিজ্যিক ও চিকিৎসার দৃষ্টিকোণ থেকে বিপুল সংখ্যক পাথর ও ধাতুর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও তিনি ঔষধ বিজ্ঞানের *(সাইদালা)* ওপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ভারতীয় ও চীনা পাথর এবং ঔষধপত্রের উৎস সম্পর্কে তার অসম্পাদিত রচনা থেকে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে।

আল মাসুদীকে (মৃ. কায়রোতে, আনু. ৯৫৭ খৃ.) এক দিক দিয়ে 'আবরদের প্লিনি'[১] বলা যায়। তাঁর *মেডোজ অব গোল্ড* গ্রন্থে তিনি একটি ভূমিকম্প, মরু সাগরের পানি এবং প্রথম বায়ু চালিত কলের (উইণ্ড মিলস) বর্ণনা দিয়েছেন। শেষোক্তটি সম্ভবত মুসলমানদের আবিষ্কার। তিনি বিবর্তনবাদের মূলতত্ত্বসমূহও প্রদান করেন।

দশম শতকে মেসোপটেমিয়ায় প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত দার্শনিক সংস্থা 'ব্রিদরেন অব পিউরিটি' *(ইখওয়ানুস সাফা)* বায়ান্ন খণ্ডে একটি বিশ্বকোষ রচনা করে। এর সতেরটি খণ্ডে প্রধানত গ্রীক রীতিতে প্রকৃতি বিজ্ঞান আলোচনা করা হয়েছে। আমরা এতে খনিজ পদার্থের গঠন, ভূকম্পন, জোয়ার ভাটা, আবহাওয়াতত্ত্ব ও বিভিন্ন উপাদানের আলোচনা দেখতে পাই। আকাশ মণ্ডলও সেখানকার বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কের আলোকে এসব বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। বাগদাদের গোঁড়া ধর্মীয় নেতারা এই প্রতিষ্ঠানকে ধর্মবিরোধী আখ্যায়িত করা সত্ত্বেও তাদের এই রচনা সুদূর স্পেন পর্যন্ত প্রচারিত হয় এবং সেখানে এটি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে। মুসলিম দেশসমূহে প্রায়ই জল-ঘড়ি তৈরি করা

১. পুরো নাম গাইয়াস প্লিনিয়াস সেকান্ডাস, রোমান প্রকৃতি বিজ্ঞানী ও গ্রন্থকার, জীবিতকাল ২৩-৭৯ খৃ। জ্যেষ্ঠ প্লিনি নামে পরিচিত -অনুবাদক।

www.waytojannah.com

হতো। হারুনুর রশীদের জনৈক রাজকীয় দূত এ ধরনের একটি ঘড়ি শার্লেমনকে[১] উপহার প্রদান করেন।

জনৈক তুরস্কবাসী মুসলমান বিখ্যাত দার্শনিক আল-ফারাবীর (মৃ. আনু. ৯৫১ খৃ.) নাম তার *অন মিউজিক* (সঙ্গীত প্রসঙ্গে) গ্রন্থের জন্য অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার। এটি সঙ্গীত তত্ত্বের ওপর প্রাচ্যের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ রচনা। তিনি বিজ্ঞানের শ্রেণী বিন্যাস সম্পর্কেও একটি গুরুত্বপূর্ণ বই লেখেন। শ্রেণী বিন্যাস সংক্রান্ত অনুরূপ দুটি গ্রন্থ পরবর্তীকালে রচিত হয়। এর একটি হচ্ছে *কীজ অব সায়েন্সেস*। মোহাম্মদ আল-খাওয়ারিযমী ৯৭৮ খৃষ্টাব্দে এটি রচনা করেন। অপরটি ইবনে আন-নাদিমের বিখ্যাত রচনা *ফিহ্‌রিস্ত আল'উলুম* বা ইনডেক্স অব সায়েন্সেস (৯৮৮)। শেষোক্তটির মাধ্যমে আমরা ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলিম (এবং গ্রীক) বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারি।

বসরার আবূ আলী আলহাসান ইবনে আল হাইসাম (আল হাযেন, ৯৬৫ খৃ.) আলোক বিজ্ঞানের চূড়ান্ত বিকাশ সাধন করেন। তিনি কায়রো গিয়ে ফাতিমীয় খলীফা আল হাকিমের (৯৯৬-১০২০) অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। এখানে তিনি নীল নদের বার্ষিক প্লাবন নিয়ন্ত্রণের একটি পদ্ধতি আবিষ্কারে সচেষ্ট হন। এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি খলীফার কোপানল থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আত্মগোপন করেন এবং আল হাকিমের মৃত্যু পর্যন্ত পাগলামির ভান করেন। এর মধ্যেও সময় করে তিনি কেবল অঙ্কশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যা-সংক্রান্ত প্রাচীন গ্রন্থাবলীই নকল করেননি, এ সমস্ত বিষয়ে এবং তার মূল পেশা চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে মৌলিকভাবে বহু গ্রন্থও রচনা করেন। তার প্রধান রচনা *অন অপটিকস* (আলোক-বিজ্ঞান প্রসঙ্গে) মূল আরবী রচনা বিলুপ্ত হলেও এর ল্যাটিন অনুবাদ পাওয়া যায়। চক্ষু দৃশ্যমান বস্তুর ওপর দর্শনমূলক আলো বিকিরণ করে--আল-হাইসাম ইউক্লিড ও টলেমীর এই মতবাদের বিরোধিতা করেন। তিনি আলোকরশ্মির প্রক্ষেপণ ও প্রতিফলনের বিভিন্ন কোণের পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ আলো ও বর্ণ এবং দৃষ্টি সংক্রান্ত বিভ্রম ও প্রতিফলনের উদ্ভব প্রক্রিয়া আলোচনা করেন। তাঁর নাম এখনো তথাকথিত 'আল হাযেন'স প্রোব্লেমের' সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'একটি গোলাকার ফাঁপা জিনিসের মধ্যে এরূপ স্থান নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত নলাকার আয়না, যে স্থান থেকে নির্ধারিত অবস্থানের একটি বস্তু নির্ধারিত অবস্থানের একটি চক্ষুর ওপর প্রতিফলিত হবে।' এটি একটি চতুর্ঘাত (ফোর্থডিগ্রী) সমীকরণের সৃষ্টি করে যা আল-হায়সাম একটি পরাবলয়ের (হাইপারবোলা) মাধ্যমে সমাধান করেন।

আল হায়সাম স্বচ্ছ মাধ্যমের (বায়ু,পানি) মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মির প্রতিসরণ ও (রিফ্র্যাকশন) পরীক্ষা করেন। গোলাকার অংশসমূহের (পানি ভর্তি কাচের পাত্র) সাহায্যে

---

১. ফ্রাঙ্কদের রাজা (৭৬৮-৮১৪), পাশ্চাত্যের সম্রাট (৮০০-৮১৪); জীবিতকাল ৭৪২-৮১৪ ; ছোট রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ঃ চার্লস দি গ্রেট উপাধি লাভ করেন। -অনুবাদক

www.waytojannah.com

বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিনি তাত্ত্বিকভাবে বর্ধনশীল পরকলা (ম্যাগনিফাইং লেন্স) আবিষ্কারের প্রায় কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেন। তিন শত বছর পর এই জিনিসটি বাস্তবে পরিণত হয় এবং ছয়শত বছরেরও পরে স্নেল ও ডেসকার্টিস-এর ওপর ভিত্তি করে 'সাইন্‌স বিধি' প্রতিষ্ঠা করেন। রজার বেকন (ত্রয়োদশ শতক) এবং আলোক বিজ্ঞানের ওপর পোল ভিটোল্লিয়ো প্রমুখ মধ্যযুগের সকল পাশ্চাত্য লেখক প্রধানত আল হায়সামের *অপটিকাই থেসওরাস*-এর উপর ভিত্তি করেই তাদের গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচনা লিওনার্দো দা ভিনচি এবং জোহান কেপলারকেও প্রভাবিত করে। শেষোক্ত লেখক তার আলোক-বিজ্ঞান সংক্রান্ত মৌলিক রচনার নিম্নোক্ত শিরোনাম প্রদান করেন। *অ্যাড ভিটেলিউনেম প্যারালিপমেনা* (ফ্রাঙ্কফুর্ট ১৬০৪)।

প্রাচ্যের লেখকগণ আল-হায়সামের *অপটিকসের* উপর বহু ভাষ্য রচনা করলেও তাঁর অধিকাংশ উত্তরাধিকারী তাঁর দৃষ্টিতত্ত্ব প্রবর্তন করেননি। মুসলিম বিজ্ঞান চর্চার পরবর্তী যুগের চক্ষু চিকিৎসাবিদগণও তা করেননি। অবশ্য আল-বিরুনী ও ইবনে সিনা স্বতন্ত্রভাবে ও পুরোপুরি আল-হায়সামের সঙ্গে একমত হন যে, 'চক্ষু থেকে কোন আলোকরশ্মি নিঃসরিত হয় না এবং বস্তুর সংস্পর্শে গিয়ে সেটিকে দৃশ্যমান করে না, বরং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর আকার চক্ষুর মধ্যে প্রবেশ করে এবং এর স্বচ্ছ অবয়বের (অর্থাৎ লেন্স) দ্বারা রূপান্তরিত হয়।'

আল-হায়সাম ফিজিক্যাল অপটিক্‌স সম্পর্কেও কয়েকটি পুস্তিকা লেখেন। এগুলির মধ্যে *অন লাইট* (আলো প্রসঙ্গে) উল্লেখযোগ্য। তিনি আলোকে এক ধরনের আগুন মনে করেন যা পরিমণ্ডলের একটি গোলাকার সীমা পর্যন্ত প্রতিফলিত হয়। *অন টোয়াইলাইট ফেনোমেনা* গ্রন্থে তিনি হিসাব করে দেখন যে, এই পরিমণ্ডল ইংরেজী মাইল অনুসারে প্রায় দশ মাইল উচ্চতাসম্পন্ন। বইটি বর্তমানে কেবল ল্যাটিন ভাষায় পাওয়া যায়। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থে রামধনু, জ্যোতির্মণ্ডল এবং বৃত্তাকার ও অর্ধ-বৃত্তাকার আয়নার বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এসব গ্রন্থ এবং ছায়া ও গ্রহণ সম্পর্কিত অন্যান্য গ্রন্থ অত্যন্ত উন্নতমানের অঙ্কশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। নিজস্ব হিসাব-নিকাশের ভিত্তিতে তিনি ধাতব আয়না তৈরি করেন। এসব রচনার অধিকাংশই আল-হায়সামের জীবনের শেষ দশ বছরের অবদান। *অন দি বার্নিং গ্লাস* শিরোনামের মৌলিক পর্যালোচনাটিও এই সময়কার। এতে তিনি এমন একটি 'ডায়োটিক' (লেন্সের প্রতিসরণ ক্ষমতা নিরূপণ পদ্ধতি) সৃষ্টি করেন যা গ্রীকদের চাইতে অনেক বেশি উন্নত। এতে প্রতিমূর্তিকে কেন্দ্রীভূত করা, পরিবর্তন করা ও উলটপালট করার এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে গোলাকৃতি ও বর্ণগঠনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গভীর ও নির্ভুল ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে। আল-হায়সাম ইউক্লিড ও টলেমীর আলোক বিজ্ঞান সম্পর্কিত রচনা, অ্যারিস্টটলের *ফিজিক্স* এবং অ্যারিস্টটলীয় *প্রোব্লেম্যাটা* সম্পর্কে একটি ভাষ্যও রচনা করেন। তিনি জানালার খড়খড়িতে সুন্দর একটি ছিদ্রের মধ্য

www.waytojannah.com

Contents

দিয়ে বিপরীত দিকের দেওয়ালের উপর সূর্য গ্রহণের সময় সূর্যের প্রতিমূর্তির অর্ধ চন্দ্রাকার রূপ অবলোকন করেন। এটি *ক্যামেরা অবসকিউরা* প্রথম রেকর্ড।

মুসলিম বিজ্ঞানের এই সুবর্ণ যুগে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথম দিকেই *হাসপাতালসমূহ* সম্ভবত জুন্দিশাপুরের প্রাচীন ও বিখ্যাত একাডেমী হাসপাতালের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়। পারস্য ভাষার *বিমারিস্তান* শব্দটি হাসপাতালের নাম হিসাবে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র প্রচলিত হয়। আমরা নির্ভরযোগ্য সূত্রে এ ধরনের কমপক্ষে চৌত্রিশটি প্রতিষ্ঠানের তথ্য পেয়েছি। এগুলি পারস্য থেকে মরক্কো পর্যন্ত এবং উত্তর সিরিয়া থেকে মিসর পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কায়রোতে ৮৭২ খৃষ্টাব্দে গভর্নর ইবনে তুলুন কর্তৃক প্রথম হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটি পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। পরবর্তীকালে এখানে আরো হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাগদাদে হারুনুর রশীদের নির্দেশে নবম শতকের সূচনায় প্রথম হাসপাতালের সৃষ্টি করা হয়। একাদশ শতকে ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালের কথা জানা যায়। মুসলিম ঘটনাপঞ্জী-সমূহে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক তথ্যসমূহ অত্যন্ত সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এগুলির কেবল বাজেটই নয় চিকিৎসক, চক্ষু চিকিৎসক এবং বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতনের বিষয়ও জানা যায়। প্রধান চিকিৎসক ও শল্যচিকিৎসকগণ ছাত্র ও গ্রাজুয়েটদের উদ্দেশে ভাষণ দিতেন, তাদের পরীক্ষা গ্রহণ করতেন এবং ডিপ্লোমা *(ইজাযা)* প্রদান করতেন। চিকিৎসক, ভেষজ বিশেষজ্ঞ এবং নরসুন্দরদের পরীক্ষা করা হতো। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শিশু চিকিৎসকগণ পল অব ইজিনার অ্যানাটমী ও সার্জারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা হতো। হাতেকলমে শিক্ষা প্রদানেরও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। হাসপাতালে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য দুটি বিভাগ ছিল। প্রত্যেক বিভাগের নিজস্ব ওয়ার্ড ও ডিসপেন্সারী ছিল। কোন কোন হাসপাতালের নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল। বহু চিকিৎসককে একজন গুরুর অধীনে শিক্ষানবীস হিসাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। এবং এই গুরু প্রায়ই পিতা বা পিতৃব্য ছিলেন। অন্যরা কোন বিখ্যাত চিকিৎসকের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য ভিন্ন দেশে সফরে যেতেন। স্পেনের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, কাডিযে জনৈক চিকিৎসককে সেখানকার গভর্নরের উদ্যোগে নিয়োগ করা হয়। তিনি বিভিন্ন দেশ সফর করে ঔষধ তৈরিতে ব্যবহারের জন্য যেসব দুষ্প্রাপ্য গুল্ম সংগ্রহ করেন উক্ত উদ্যানে সেগুলির চাষ করতেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ছাড়া অন্যান্য বিজ্ঞান প্রধানত মসজিদে শিক্ষা দেওয়া হতো। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এসব বিষয় উদারভাবে পণ্ডিতদের এখতিয়ারে ছেড়ে দেওয়া হতো। খলীফা, রাজা ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা একাডেমিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার নজীরও রয়েছে। আরবী ঘটনাপঞ্জীসমূহে এসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে প্রচুর তথ্য দেওয়া হয়েছে।

www.waytojannah.com

প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ মসজিদে কেবল ধর্মতাত্ত্বিক গ্রন্থ নয়—দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের লাইব্রেরীও ছিল এবং এখনো বহু স্থলে রয়েছে। আমরা ইতিমধ্যেই খলীফা আল মামুন কর্তৃক ৮৩০ খৃষ্টাব্দের দিকে বাগদাদে 'জ্ঞান ভবন' *(দারুল হিকমাত?)* প্রতিষ্ঠার বিষয় উল্লেখ করেছি। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আল-মুতাওয়াক্কিল এবং তার দরবারের বহু ওমরাহও একই পথ অনুসরণ করেন। খলীফার বন্ধু ও সচিব আলী ইবনে ইয়াহইয়ার (মৃ. ৮৮৮) পল্লী ভবনে একটি সুন্দর গ্রন্থাগার ছিল। কায়রোতে ফাতিমীয় খলীফা আল হাকিম ৯৯৫ খৃষ্টাব্দে একটি 'বিজ্ঞান ভবন' প্রতিষ্ঠা করেন। এর সঠিক বাজেট জানা যায়। নিষ্ঠামূলক ধর্মতত্ত্ব প্রাধান্য লাভ করার পর ধর্মদ্রোহিতার বিপদের কথা চিন্তা করে এটি বাতিল করা হয়।

প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য হিসাবে মক্কা ও মদীনায় তীর্থ যাত্রা বিজ্ঞান চর্চা প্রসারে সহায়তা করে। ভারত, স্পেন, এশিয়া মাইনর ও আফ্রিকার যেসব জ্ঞানার্থী হজ্জে যেতেন তাদের স্বভাবতই বহু দেশ হয়ে যেতে হতো। এসব দেশে তাঁরা বিভিন্ন মসজিদ ও একাডেমী পরিদর্শন করতেন এবং সেখানকার বিখ্যাত পণ্ডিতদের সঙ্গে জ্ঞান চর্চামূলক মতবিনিময় করতেন। এ ছাড়া বিখ্যাত শিক্ষকদের শিক্ষা কোর্স অনুসরণের জন্য বহু শিক্ষার্থী তিউনিস থেকে পারস্য কিংবা কাস্পিয়ান সাগরের উপকূল থেকেও কর্ডোভায় আগমন করতেন। প্রকৃত শিক্ষা প্রদান পদ্ধতি অনেকটা বর্তমানকালের মতই ছিল। অধ্যাপক কোন একটি থামে ঠেস দিয়ে উপবেশন করতেন এবং শিষ্যরা চক্রাকারে তাঁর চারদিকে জড়ো হতেন। প্রাচীনকাল থেকে বিখ্যাত কায়রোর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশাল হিপোস্টাইল[১] হলের অভ্যন্তরে পর্যটকগণ এখনো এ ধরনের বিশ-ত্রিশটি দল দেখতে পারেন। এটি সম্ভবত গ্রীস ও কর্ডোভার শিক্ষা প্রদান প্রণালীর সত্যিকারের চিত্র এখনো অক্ষুণ্ন রেখেছে।

৪. পতন যুগ, প্রায় ১১০০ থেকে

ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রচলিত ধর্মমতের প্রতি নিষ্ঠা বিজ্ঞানচর্চা সহ্য করলেও আমরা একথা বলতে পারি যে, বিখ্যাত ধর্মীয় গুরু আল-গাযযালীর (মৃ. ১১১১) পর থেকে নির্যাতন এই সহনশীলতার স্থলাভিষিক্ত হয়, 'কারণ এগুলি (বিজ্ঞান চর্চা) বিশ্ব সৃষ্টি ও স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস নষ্ট করে।' বড় বড় স্বাধীন চিন্তাবিদের আবির্ভাব রোধে এই মনোভাব একমাত্র কারণ না হলেও এদের দমিয়ে রাখার পিছনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল, দ্বাদশ শতকে একটি অচলাবস্থা বিরাজ করে। এ সময়ে রাযী, ইবনে সিনা ও 'জাবিরের' রচনাবলী পুনঃপ্রকাশিত হয়। সংক্ষিপ্ত করা হয় এবং এগুলির উপর ভাষ্য রচনা করা হয়। কিন্তু কোন বিশিষ্ট ও স্বাধীন রচনা কদাচিৎ দেখা যায়।

---

১. মূল গ্রীক শব্দ *হিপোস্টাইলস্ (হিপো,* নীচে+*স্টাইলস* স্তম্ভ); স্তম্ভ শ্রেণীর উপর ছাদ বিশিষ্ট।—অনুবাদক।

www.waytojannah.com

চিকিৎসাবিদদের ক্ষেত্রে ইহুদীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা এবং বিশেষ করে বাগদাদ, কায়রো ও স্পেনের রাজদরবারে ক্রমবর্ধমান হারে তাদের চিকিৎসা বিজ্ঞান চর্চা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এর কারণ,সম্ভবত ইহুদীরা ইসলামের নিষ্ঠামূলক মতবাদের বিধিনিষেধ থেকে তুলনামূলকভাবে মুক্ত ছিল। রাজ দরবারের এরূপ আদর্শস্থানীয় বিশিষ্ট ইহুদী চিকিৎসাবিদ, দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন মাইমোনাইডস (১১৩৫–১২০৪)। তিনি স্পেনে জন্মগ্রহণ করেন এবং কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় কায়রোতে মহান সালাহ্উদ্দিন ও তাঁর পুত্রদের অধীনে অতিবাহিত করেন। চিকিৎসাশাস্ত্র সংক্রান্ত তার শ্রেষ্ঠ রচনা হচ্ছে *অ্যাফোরিজম্স।* এতে তিনি স্বয়ং গ্যালেনের মতামতের সমালোচনা করেন। দরবারের চিকিৎসক হিসাবে তিনি সুলতানের জন্য স্বাস্থ্য–বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলি ইসলামের পরবর্তী শতকসমূহের চিকিৎসাশাস্ত্র সংক্রান্ত আদর্শ রচনা। কায়রোর দরবার অন্যভাবে উদার হলেও সেখানে গভীর নিষ্ঠামূলক ধর্মীয় মতবাদের প্রভাব কতখানি ছিল তার প্রমাণ মাইমোনাইডসের একটি পুস্তিকার শেষের দিকে প্রদত্ত ক্ষমা প্রার্থনামূলক বক্তব্য থেকে বোঝা যায়। মনের অবসাদ দূর করার জন্য তিনি সুলতানকে নিষিদ্ধ মদ্যপান ও সঙ্গীত উপভোগের পরামর্শ দেন, আর সে জন্যই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সুলতানের কাছে ক্ষমতা প্রার্থনা করেন।

মাইমোনাইডসের বয়সে তরুণ সমসাময়িক মুসলিম পণ্ডিত আবদুল লতিফ বিখ্যাত জ্ঞানীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য এবং মিসর দেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য বাগদাদ থেকে কায়রো সফর করেন এবং এ সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত বিবরণী প্রদান করেন। মিসরের ১২০০ থেকে ১২০২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্পের বর্ণনা দেওয়ার পর তিনি কায়রোর উত্তর–পশ্চিমে অবস্থিত একটি প্রাচীন গোরস্থানে তাঁর অস্থিতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণার একটি চমৎকার বিবরণী প্রদান করেন। নিম্নের চোয়াল এবং মেরুদণ্ডের নিম্নস্থ অস্থি সম্পর্কে গ্যালেন যে বিবরণ দিয়ে গেছেন তিনি তা পরীক্ষা করে সংশোধন করেন।

এই যুগে ঔষধ বিজ্ঞানের ওপর বহু গ্রন্থ রচিত হয়। এগুলিতে সাধারণ ওষুধের বিষয় কিংবা যৌগিক ওষুধের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণ ওষুধ সংক্রান্ত রচনার জন্য ইবনে আল–বাইতার (মৃ. ১২৪৮) সবচাইতে বিখ্যাত। অপর শ্রেণীর রচনাসমূহকে *আক্রাবাজিন* (গ্রীক *গ্রাফিডিয়ন*–এর অপভ্রংশ, যার অর্থ ছোট ছোট পুস্তিকা) বলা হতো। ল্যাটিন পাণ্ডুলিপিসমূহে এবং *গ্রাবাডিনের* ন্যায় প্রথম দিকে মুদ্রিত বইগুলিতে এই শব্দটি প্রায়ই উহ্য। ইবনে আল–বাইতারের রচনাটির নাম হচ্ছে *এ কালেকশন অব সিম্পল ড্রাগস।* তিনি স্পেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরের উপকূল থেকে ওষুধ তৈরির বহু লতাগুল্ম ও উপকরণ সংগ্রহ করেন, প্রায় ১৪০০টি উপকরণের বিবরণী প্রদান করেন এবং ১৫০ জনেরও বেশি প্রাচীন ও আরব লেখকের বর্ণিত উপাদানের সঙ্গে সেগুলির তুলনা করেন। এই রচনা অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও পর্যবেক্ষণের স্বাক্ষর বহন করে এবং এটি উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ওপর আরবদের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ।

www.waytojannah.com

যৌগিক ওষুধ সংক্রান্ত পরবর্তীকালের আরবী গ্রন্থগুলি এখনো মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ওষুধ প্রস্তুতকারকদের কাছে সমাদৃত। বর্তমানে সব চাইতে জনপ্রিয় বইগুলির মধ্যে ইহুদী কোহেন আল আত্তার (১৪শ শতক) লিখিত *ম্যানেজমেন্ট অব দি ড্রাগ স্টোর* এবং দাউদ আল আনতাকী (মৃ. ১৫৯৯) রচিত *মেমোরিয়্যাল*–এর নাম উল্লেখযোগ্য। দুটি গ্রন্থই কায়রোতে রচিত হয়। এসব গ্রন্থের বহু প্রাচীন ও জটিলতাপূর্ণ প্রস্তুত প্রণালী ইউরোপীয় ওষুধ প্রস্তুত কারখানাগুলিতে প্রবর্তিত হয়। এমনিভাবে বহু যৌগিক ওষুধের নাম প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে প্রচলিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ মধুসহযোগে গাঢ় করা ফলের রস *রব*, ওষুধ জাতীয় সুগন্ধী পানীয় *জুলেপ* (পারস্যভাষায় *গুলাব*, গোলাপ জল) এবং *সিরাপ* (আরবী *শরাব*)–এর নাম উল্লেখযোগ্য।

চতুর্দশ শতকের শুরুতে চিকিৎসা বিষয়ক মুসলিম লেখকদের রচনায় জাদু ও কুসংস্কারমূলক চর্চার বিষয় ধীরে ধীরে প্রবেশ করে। এদের চিকিৎসা–বিষয়ক জ্ঞান প্রায়ই ধর্মীয় রচনা থেকে উদ্ভূত হয়। এর ফলে এসব উপাদানের সাধারণ মানের আরো অবনতি ঘটে।

স্পেনে চিকিৎসাবিদদের মধ্যে দর্শন প্রবণতা প্রাধান্য লাভ করে। দুজন মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে জুহর (আভেনযোয়ার) ও ইবনে রুশদ (আভেররোস) এই শ্রেণীর আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তি। ইবনে জুহর (মৃ. সেভিলে ১১৬২ খৃ.) আল মোহেড রাজদরবারে একজন অভিজাত চিকিৎসক ছিলেন। তিনি শল্যচিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসকদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। সাধারণ চিকিৎসা পেশার চাইতে তিনি চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করতেন। তার প্রধান রচনা *ফ্যাসিলিটেশন অব ট্রিটমেন্ট*–এর আরবী *আত–তাইসির* নামে পরিচিত ছিল। এটি ১২৮০ খৃ. ভেনিসে জনৈক ইহুদীর সহায়তায় প্যারাভিসিয়াস কর্তৃক *থেইসির* শিরোনামে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। এখানেই পরবর্তীকালে এটি বারবার মুদ্রিত হয়। প্রধানত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে রচিত হওয়ায় বইটিতে চিন্তার স্বাধীনতার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্ভবত এই কারণেই গ্রন্থটি ইউরোপের তুলনায় আরবদের কাছে কম জনপ্রিয়তা লাভ করে।

ইবনে জুহরের শিষ্য ও বন্ধু ইবনে রুশদ (মৃ. মরক্কোতে ১১৯৮ খৃ.) অ্যারিস্টটলীয় শ্রেষ্ঠতম দার্শনিকদের অন্যতম ছিলেন। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের ওপরও ১৬টি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে *জেনারেল রুল্স অন মেডিসিন* (কুলিয়্যাত ফিত–তিব্ব) গ্রন্থটির ল্যাটিন অনুবাদ অত্যন্ত জনপ্রিয়। ১২৫৫ সালে পাডুয়ান ইহুদী বোনাকোসা *কলিজেট* শিরোনামে এটি অনুবাদ করেন। ইবনে জুহরের *থেইসিরের* সঙ্গে এটি কয়েকবার মুদ্রিত হয়। তার গ্রন্থের সর্বত্র, বিশেষ করে দ্বিতীয় খণ্ডের যেখানে তিনি ভাষাতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব আলোচনা করেছেন সেখানে ইবনে রুশদ নিজেকে একজন অ্যারিস্টটলীয় চিন্তাবিদ হিসাবে প্রকাশ

www.waytojannah.com

করেছেন। তিনি প্রায়ই রাযী ও ইবনে জুহরের মতামতের সঙ্গে হিপোক্রেটিস ও গ্যালেনের মতামতের তুলনামূলক আলোচনা করেন।

'ব্লাক ডেথ' নামে পরিচিত চতুর্দশ শতকের প্লেগ মহামারী স্পেনের মুসলিম চিকিৎসকগণকে ধর্মীয় সংস্কার থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ প্রদান করে। ধর্মীয় সংস্কার অনুযায়ী প্লেগকে সংক্রামক ব্যাধি মনে না করে আল্লাহ্র একটি শাস্তি মনে করা হতো। প্রখ্যাত আরব রাষ্ট্রনীতিবিদ, ঐতিহাসিক ও চিকিৎসাবিদ গ্রানাডার ইবনে আল-খাতিব (১৩১৩-৭৪) তাঁর *অন প্লেগ* নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই রোগের বর্ণনা দান করেন। এই গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে তুলে ধরা হচ্ছে ঃ

'অভিজ্ঞতা, পর্যালোচনা এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ থেকে ; পোশাক, ব্যবহৃত পাত্র ও কানের দুলের মাধ্যমে সংক্রমিত হওয়ার বিশ্বাসযোগ্য বিবরণী থেকে এক ঘরের লোকদের দ্বারা অন্য ঘরের লোকদের মধ্যে এটির প্রসার থেকে ; কোন রোগাক্রান্ত দেশ থেকে আগত ব্যক্তিদের মাধ্যমে রোগমুক্ত সামুদ্রিক বন্দরে সংক্রমণ থেকে ...বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের ....এবং আফ্রিকার ভবঘুরে বেদুইন উপজাতিদের সংক্রমণমুক্ত অবস্থা থেকে সংক্রমণের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।...অতএব এই বক্তব্যকে অবশ্যই মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে যে, হাদীস থেকে যে প্রমাণ গ্রহণ করা হয়েছে তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণের সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ হলে তার সংশোধন করতে হবে।'

অত্যন্ত গোঁড়ামির যুগে এই বক্তব্য যথেষ্ট দুঃসাহসের পরিচায়ক। মুরীয় চিকিৎসাবিদ ইবনে খাতিমা (মৃ. ১৩৬৯) ১৩৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দে স্পেনের আলমেরিয়ায় যে প্লেগ মহামারী দেখা দেয় সে সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। চতুর্দশ শতক থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে ইউরোপে প্লেগ সংক্রান্ত যে অসংখ্য বই সম্পাদিত হয় সেগুলির তুলনায় এই গ্রন্থটি অনেক বেশি উন্নতমানের। তিনি বলেন ঃ

'আমার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল এই যে, কোন ব্যক্তি যদি রোগীর সংস্পর্শে আসে তাহলে সে সঙ্গে সঙ্গে একই লক্ষণযুক্ত রোগে আক্রান্ত হয়। প্রথম রোগীর যদি শ্লেষ্মার আকারে রক্ত নিঃসরিত হয় দ্বিতীয় রোগীরও তাই হবে...প্রথম রোগীর কুঁচকি, বগল ইত্যাদি স্থানে যদি গ্রন্থিস্ফীতি দেখা দেয় তাহলে দ্বিতীয় রোগীরও ঠিক একই স্থানগুলিতে গ্রন্থিস্ফীতি দেখা দেবে। প্রথম রোগীর যদি আলচার হয়, দ্বিতীয় রোগীরও তাই হবে। দ্বিতীয় রোগীও একইভাবে অন্যদের মধ্যে রোগ ছড়ায়।'

এসব লেখকের শিক্ষার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, গ্রীক চিকিৎসাবিদরা রোগের সংক্রমণ বৈশিষ্ট্যের মতবাদের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি এবং এ বিষয়টি অধিকাংশ মধ্যযুগীয় লেখকের রচনায়ও প্রায় কোন গুরুত্ব পায়নি।

চিকিৎসা শাস্ত্র ছাড়া বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পতন যুগে বহু গ্রন্থ রচিত হয়। কিন্তু তার মধ্যে অবনতির লক্ষণও কম সুস্পষ্ট নয়। একাদশ শতকের পর আলকেমীর উপর আরবী ও পারস্য ভাষায় প্রায় চল্লিশটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু উক্ত বিষয়ে এসব রচনার নতুন অবদান অতি সামান্য। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ইতিহাসের অত্যন্ত

www.waytojannah.com

প্রতিভাবান আরব দার্শনিক এবং তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠতম বুদ্ধিজীবী ইবনে খালদুন (মৃ. ১৪০৬) আলকেমীর ঘোর বিরোধী ছিলেন।

মিনার‍্যালজি (ধাতু–বিজ্ঞান) আলকেমীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখে। মূল্যবান পাথর সংক্রান্ত প্রায় পঞ্চাশটি আরবী গ্রন্থের নাম জানা যায়। এগুলির মধ্যে সবচাইতে বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে শিহাবুদ্দিন আত তিফাশীর (মৃ. কায়রোতে, ১১৫৪ খৃ.) *ফ্লাওয়ার্স অব নলেজ অব স্টোনস।* এতে পঁচিশটি অধ্যায়ে সমসংখ্যক মূল্যবান পাথর সম্পর্কে ব্যাপক তথ্য প্রদান করা হয়েছে। এসব পাথরের উৎস, ভৌগোলিক এলাকা, খাঁটিত্ব, মূল্য এবং ওষুধ ও অন্যান্য প্রয়োজনে এগুলির ব্যবহারের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। প্লিনি ও অ্যারিস্টটলীয় ভুয়া গ্রন্থ ছাড়া তিনি কেবল আরব লেখকদের উদ্ধৃতি প্রদান করেন।

য্যুলজি (প্রাণীতত্ত্ব) সম্পর্কে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম গ্রন্থ হচ্ছে মোহাম্মদ আদ–দামিরীর (মৃ. কায়রোতে ১৪০৫ খৃ.) *লাইফ অব অ্যানিমালস* (জীব–জন্তুর জীবন)। লেখক একজন ধর্মীয় শিক্ষক ছিলেন। তাই তার গ্রন্থটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত নয়, বরং বিভিন্ন রচনা থেকে তিনি তাঁর তথ্যসমূহ সংকলিত করেছেন। বইটি নিছক পাণ্ডিত্যপূর্ণ হলেও প্রাচ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করে। এর বিভিন্ন অংশে লোকগাথা, জনপ্রিয় ওষুধ এবং বর্ণগত মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। কিন্তু এতে সব সময় অসংলগ্ন বর্ণনার প্রাচুর্যও দেখা যায়।

বিশ্বতত্ত্ব সম্পর্কে আরব ও পারস্যের পণ্ডিতরা যেসব বিশ্বকোষ রচনা করেছেন তাঁর সবগুলিতেই জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও পাথর সংক্রান্ত বিভাগ রয়েছে। এগুলির মধ্যে যাকারিয়া আল কাযউইনীর (মৃ. ১২৮৩) বিশ্বকোষটি সবচাইতে বিখ্যাত। কিন্তু এর সম্পাদনা এখনো অসমাপ্ত অবস্থায় রয়েছে। এই রচনার বহু পাণ্ডুলিপি অপরূপভাবে চিত্র শোভিত।

পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে বেশ কিছু সংখ্যক বই এবং বিশ্বকোষের বিভাগ রয়েছে। কিন্তু এর অধিকাংশ রচনাতেই দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির আলোচনা করা হয়েছে।

ওজন ও পরিমাপ, বিশেষত দাঁড়িপাল্লা সম্পর্কিত পর্যালোচনায় পরবর্তী শতকসমূহে মুসলমানরা বিশেষ তৎপর ছিলেন। এ সম্পর্কে মূলত গ্রীক ক্রীতদাস এবং মার্ভের (পারস্য) অধিবাসী আল খাযিনী (প্রায় ১২০০ খৃ.) *দি ব্যালেন্স অব উইজডম* নামে একটি বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। এর কয়েকটি অংশমাত্র সম্পাদিত রয়েছে। সাবিত ইবনে কাররা তথাকথিত ‘রোমান’ দাঁড়িপাল্লা বা তুলাদণ্ড সম্পর্কে যে অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করেন আল–খাযিনী তা অব্যাহত রাখেন। এ ছাড়াও তাঁর রচনার মধ্যে সুনির্দিষ্ট ভার এবং খাদের সুনির্দিষ্ট ওজন সম্পর্কে মূল্যবান অভিমতসমূহ পাওয়া যায়। পানি পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলের যত কাছাকাছি হয় তার ঘনত্বও ততো বেশি হয়। এই বিষয়টি নিয়েও আল–খাযিনী আলোচনা করেন এবং রজার বেকন কর্তৃক বিষয়টি তুলে ধরার আগেই তিনি তা তুলে ধরেন।

www.waytojannah.com

পানি বিজ্ঞান সংক্রান্ত স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা (হাইড্রস্ট্যাটিক অটোম্যাটন) সম্পর্কে এবং পানি, পারদ, ওজন কিংবা জ্বলন্ত মোমবাতির সাহায্যে পরিচালিত ঘড়ি সম্পর্কে অসংখ্য চিত্র সম্বলিত অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। আল–জাযারী ১২০৬ খৃষ্টাব্দে মেসোপটেমিয়ায় যন্ত্রবিজ্ঞান ও ঘড়ি সম্পর্কে একটি বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। মুসলিম বিশ্বে এটি সর্বাধিক প্রচারিত। একই সময়ে (১২০৩ খৃ.) পারস্যবাসী রিদওয়ান তাঁর পিতা মুহাম্মদ ইবনে আলী কর্তৃক দামেস্কের অন্যতম ফটকের কাছে নির্মিত জল–ঘড়ির বর্ণনা দান করেন। এর নির্মাণ–কৌশল সমগ্র মুসলিম বিশ্বে বহুলভাবে প্রশংসিত হয় এবং এর স্মৃতি ষোড়শ শতক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এসব বিষয়ের গ্রন্থকারগণ আর্কিমিডিস, অ্যাপোলোনিয়াস ও টেসিবিয়াসের প্রসঙ্গ উল্লেখ করলেও তাদের নিজস্ব যান্ত্রিক ব্যবস্থার সঠিক বর্ণনা অনবদ্য।

আলোক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন পারস্যবাসী কামালউদ্দীন (মৃ. আনু. ১৩২০)। তিনি *ক্যামেরা অবস্‌কিউরা* সম্পর্কে আল–হায়সামের পরীক্ষা–নিরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করেন এবং এটির উন্নতি সাধন করেন। বৃষ্টির ফোঁটার মধ্যে সূর্যালোকের প্রতিসরণ পরীক্ষা করার জন্য তিনি কাঁচের অভ্যন্তরে আলোকরশ্মির গতিপথও পর্যবেক্ষণ করেন। এর ফলে তিনি প্রাথমিক পর্যায়ের ও দ্বিতীয় পর্যায়ের রামধনুর উদ্ভব বিশ্লেষণে সক্ষম হন।

কায়রোর জনৈক ধর্মতত্ত্ববিদ ও বিচারক শিহাবুদ্দীন আল–কারাফী (মৃ. আনু. ১২৮৫) আলোক বিজ্ঞান সম্পর্কে যে গ্রন্থ রচনা করেন তাতে সাধারণ লোক হয়েও বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহের অপূর্ব নজীর সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চাইতে কাল্পনিক পদ্ধতিতে আলোকবিজ্ঞান সংক্রান্ত পঞ্চাশটি সমস্যা আলোচনা করেন। এর মধ্যে তিনটি এ জন্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এগুলিতে সিসিলীস্থ ফ্রাঙ্কদের সম্রাট ও রাজা' মুসলিম পণ্ডিতদের উদ্দেশ্যে যে সব প্রশ্ন রাখেন সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইনিই হচ্ছেন হহেনস্টওফেনের দ্বিতীয় ফ্রেডারিক। তিনি ১২২০ থেকে ১২৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে স্পেন ও মিসরের মুসলিম পণ্ডিতদের জন্য বিভিন্ন দার্শনিক ও জ্যামিতিক সমস্যা তুলে ধরেন। আলোক বিজ্ঞান সংক্রান্ত তার তিনটি প্রশ্ন হচ্ছে ঃ দাঁড় ও বল্লম আংশিকভাবে পানিতে থাকলে সেগুলিকে বাঁকানো মনে হয় কেন? দিগন্তের কাছাকাছি এলে ক্যানোপাসকে[১] বড়ো দেখায় কেন? চোখে ছানি পড়ার প্রাথমিক অবস্থায় এবং অন্যান্য চক্ষুরোগে দৃষ্টির সামনে কালো কালো দাগ ভাসমান দেখায় কেন?

সর্বশেষে আমরা মুসলিম চিকিৎসাশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি জীবনীমূলক রচনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথমে ইবনে আল–কিফতির (মৃ.

---

১. দক্ষিণ আকাশের 'আর্গো' তারকাপুঞ্জের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র।–অনুবাদক

www.waytojannah.com

দামেস্কে, ১২৪৮ খৃ.) *হিস্টরি অব ফিলোসফার্স* (দার্শনিকদের ইতিহাস) উল্লেখযোগ্য। এতে গ্রীক, সিরীয় ও মুসলিম চিকিৎসাবিদ, জ্যোতির্বিদ ও দার্শনিকদের ৪১৪টি জীবনী স্থান পেয়েছে। আরবরা গ্রীক সাহিত্যের যে জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন এটি তার একটি তথ্য–খনি এবং প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার যেসব তথ্য ক্লাসিক্যাল সূত্রে পাওয়া যায় না এতে তার অনেক কিছু পাওয়া যায়। ইবনে আবি উসাইবিয়ার (মৃ. ১২৭০) *ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন্স অন দি ক্লাসেস অব ফিজিসিয়ান্স* (চিকিৎসাবিদদের শ্রেণী সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য) গ্রন্থটিও কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি স্বয়ং অত্যন্ত জ্ঞানী চিকিৎসাবিদ ও চক্ষু চিকিৎসক ছিলেন এবং প্রধানত কায়রোতে বসবাস করতেন। তিনি ছয়শরও বেশি চিকিৎসাবিদের জীবনী রচনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। এসব তথ্য তিনি আংশিকভাবে যেসব রচনা বর্তমানে পাওয়া যায় না সেগুলি থেকে এবং আংশিকভাবে চিকিৎসা বিষয়ক হাজার হাজার গ্রন্থের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়মূলক জ্ঞান থেকে সংগ্রহ করেছেন। আরব চিকিৎসাশাস্ত্রের আধুনিক ইতিহাস এই গ্রন্থটির উপর ভিত্তি করে রচিত।

আরব চিকিৎসা শাস্ত্রের ওপর মিসরের আদিম অধিবাসী *(কপ্ট)* ও আরমেনীয়দের নির্ভরশীলতার পরিচয় তাদের বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে পাওয়া যায়। স্থানাভাবে এগুলির বিশ্লেষণ পরিহার করা হলো।

৫. উত্তরাধিকার

এবারে আরব বিজ্ঞানের রত্নভাণ্ডার থেকে পাশ্চাত্যে এর প্রসারের প্রসঙ্গে আসা যাক। চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের উত্তরাধিকার গ্রীসেরই উত্তরাধিকার। গ্রীক উত্তরাধিকারের সঙ্গে বহু নতুন জিনিস যুক্ত হয়েছে এবং সেগুলি প্রধানত ব্যবহারিক। পারস্যবাসী রাযী একজন প্রতিভাবান চিকিৎসাবিদ হলেও তিনি হার্ভি[১] ছিলেন না। আরব আবদুল লতিফ অ্যানাটমীর গভীর অনুসন্ধানী হলেও ভেসালিয়াসের[২] সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যায় না। মুসলমানরা হিপোক্রেটিস ও গ্যালেনের সামগ্রিক রচনার সুন্দর অনুবাদের অধিকারী ছিলেন। হুনাইনের ন্যায় বুদ্ধিমান ও বহু ভাষাভাষী পণ্ডিতরা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণসহ সবকিছু সুন্দরভাবে উপলব্ধি করেন ও তুলে ধরেন। কিন্তু মুসলিম চিকিৎসাবিদদের অতিরিক্ত সংযোজন প্রায় সম্পূর্ণরূপে রোগ চিকিৎসা ও নিরাময়ের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। গ্রীকদের মতবাদ ও চিন্তাধারা অবিকল থাকে। সাবধানতার সঙ্গে সুবিন্যস্ত করার পর সেগুলিকে সম্পদ হিসাবে মওজুদ করা হয়। একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, মানুষের বা জীবন্ত প্রাণীর দেহ ব্যবচ্ছেদ মুসলমানের জন্য

---

১. পুরো নাম উইলিয়াম হার্ভি। ইংরেজ চিকিৎসাবিদ, যিনি রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন।–অনুবাদক।

২. পুরো নাম ভেসালিয়াস আদ্রিয়াস, ১৫১৪-১৫৬৪, ইটালীতে বসবাসকারী ফ্লেমিশ অ্যানাটমিস্ট।–অনুবাদক।

www.waytojannah.com

কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। ফলে এতদসংক্রান্ত পরীক্ষা–নিরীক্ষা প্রায় অসম্ভব ছিল এবং এ কারণে গ্যালেনের শব ব্যবচ্ছেদ ও শারীর বৃত্ত সংক্রান্ত ভুলত্রুটি সংশোধন করা যায়নি। অপরপক্ষে মুসলমানরা পারস্য, ভারত ও মধ্য এশিয়ার পণ্ডিতদের চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার এবং ওষুধ ও ধাতব পদার্থের জ্ঞান সংক্রান্ত বিশেষ ধারার অভিজ্ঞতা থেকে প্রেরণা লাভ করেন। এর ফলে তাঁরা রসায়ন শাস্ত্রে কিছুটা অগ্রগতি লাভ করেন। অবশ্য আলকেমীর উন্নয়নে গ্রীসের ও প্রাচ্যের অবদান কতখানি সে সম্পর্কে যথার্থ অভিমত প্রদানের মত তথ্য এখনো আমরা পাইনি।

অন্যান্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্রীকদের কোন কোন শ্রেষ্ঠ রচনা মুসলমানদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ থিওফ্রেসটাসের *উদ্ভিদ বিজ্ঞানের* কথা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব অবদান উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এখানেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব নিহিত। মুসলিম মনীষীরা গভীর পর্যবেক্ষণশীল হলেও তাদের চিন্তাধারা সীমাবদ্ধ ছিল। একথা প্রাণী বিজ্ঞান, খনিজ বিজ্ঞান এবং যন্ত্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মুসলিম বিজ্ঞান সাধনার গৌরব আলোক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিহিত। এখানে ইবনে হায়সাম (আল হাযেন) ও জনৈক কামাল উদ্দিনের গাণিতিক দক্ষতা ইউক্লিড ও টলেমীর দক্ষতাকে ম্লান করে দিয়েছে। বিজ্ঞানের এই বিভাগে তাঁরা বাস্তব ও স্থায়ী অবদান রেখে গেছেন।

১১০০ খৃষ্টাব্দের দিকে মুসলমানদের চিকিৎসাশাস্ত্র ও বিজ্ঞান চর্চায় যখন স্থবিরতার সৃষ্টি হয় তখন এগুলি ল্যাটিন অনুবাদের মাধ্যমে ইউরোপে প্রচারিত হতে শুরু করে। চার্লস সিঙ্গার তাঁর *শর্ট হিস্টোরী অব মেডিসিন* গ্রন্থে সন্ন্যাসীদের এই সময়কার চিকিৎসা চর্চার বিবরণ দান করেন ঃ 'দেহ ব্যবচ্ছেদ ও শারীর তত্ত্বের অবসান ঘটে। রোগ নিরূপণ ব্যবস্থা একটি রুক্ষ অবান্তর বিধিতে পর্যবসিত হয়। উদ্ভিদ বিজ্ঞান ওষুধের তালিকায় স্থান গ্রহণ করে। নানা প্রকার কুসংস্কারমূলক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। চিকিৎসাশাস্ত্র কতিপয় সূত্র সংগ্রহের পর্যায়ে নেমে আসে এবং তার সঙ্গে নানাপ্রকার জাদুমন্ত্র যুক্ত হয়। যে বৈজ্ঞানিক ধারা চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রাণরস তা উৎস স্থলেই শুকিয়ে যায়।'

ইউরোপের কেবল একটি কোণে ন্যাপলসের অদূরে সালের্নোতে একটি মেডিক্যাল স্কুলে গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্রের কিছুটা স্বাক্ষর দেখা যায়। এখানেই তিউনিসীয় সংসার বিবাগী ভবঘুরে আফ্রিকান কনস্ট্যান্টাইন ক্যাম্পেনিয়ার বিখ্যাত মন্টি ক্যাসিনো কনভেন্টে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণের আগে কয়েক বছর অতিবাহিত করেন। তিনি সেখানে ১০৭০ খৃষ্টাব্দের দিকে অনুবাদ কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং আমৃত্যু (১০৮৭) তা অব্যাহত রাখেন। কনস্ট্যান্টাইনের ল্যাটিন অনুবাদ ত্রুটিপূর্ণ, বিভ্রান্তিকর, আরবী পরিভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতা–প্রসূত এবং প্রায়ই দুর্বোধ্য। এগুলি মধ্যযুগের বর্বর–ল্যাটিন রচনার সমতুল্য। এতদসত্ত্বেও এসব অনুবাদ মধ্যযুগীয় ইউরোপের অনুর্বর ভূমিতে সর্বপ্রথম গ্রীক জ্ঞান–বিজ্ঞানের বিচ্ছিন্ন বীজ বপনের কৃতিত্ব দাবি করে।

www.waytojannah.com

কনস্ট্যান্টাইন নির্লজ্জভাবে অন্যের রচনা চুরি করতেন। তিনি আরবী থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করার পর বহু গ্রন্থ নিজের রচনা হিসাবে দাবি করেন। অবশ্য আমাদের এ কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, ঐ যুগে গ্রন্থকারদের স্বত্বের প্রশ্নটিতে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হতো না। তিনি হুবাইশের অনুবাদ থেকে গ্যালেনের ভাষ্যসহ হুনাইনের আরবী অনুবাদ থেকে হিপোক্রেটিসের *অ্যাফোরিজম্স* ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। এ ছাড়া গ্যালেনের বহু রচনাসহ হিপোক্রেটিসের *প্রোগনস্টিকা* ও *ডায়েটা একিউটোরাম* গ্রন্থ দুটিও অনুবাদ করেন। কনস্ট্যান্টাইনের রচিত বলে প্রচারিত ডি *অকিউলিস* গ্রন্থটির ভাষ্য থেকে ঐ যুগের বৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে। এটি পরবর্তীকালে সম্ভবত সিসিলীতে জনৈক ডেমিট্রিয়াস কর্তৃক পুনরায় ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশিত হয়। অথচ এটি ছিল মূলত হুনাইনের *দি টেন টিটীজ অন দি আই* (চক্ষু সম্পর্কে দশটি নিবন্ধ)। অবশ্য কনস্ট্যান্টাইনই সর্বপ্রথম গ্রীক বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার সঙ্গে পাশ্চাত্যকে পরিচিত করেন। এ ছাড়া তিনি হ্যালি (আলী) আব্বাস ও আইজ্যাক জুডিয়াসের রচনা অনুবাদের দায়িত্ব তাঁর উত্তরাধিকারীদের উপর ন্যস্ত করেন। কনস্ট্যান্টাইন রাযীর আলকেমী সংক্রান্ত গ্রন্থ *লিবার এক্সপেরিমেন্টোরাম* ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। মন্টি ক্যাসিনোর সন্ন্যাসীদের মধ্যে তার অনেক শিষ্য ছিল। এদেরই একজন ছিলেন 'স্যারাসেন' নামে পরিচিত জোহানেস অ্যাপলেসিয়াস। তিনি আরবী রচনা ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদে কনস্ট্যান্টাইনকে সাহায্য করতেন।

কনস্ট্যান্টাইনের জীবিতকালে স্পেন ও সিসিলী উভয় স্থানেই খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সক্রিয় সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। ১০৮৫ খৃষ্টাব্দে পাশ্চাত্যে মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের বৃহত্তম কেন্দ্র টলেডো স্পেনীয় খৃষ্টানের অধিকারভুক্ত হয়। মুরীয় সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পর্যবেক্ষণ করার জন্য এবং *আর্টেস অ্যারাবাম* (আরব শিল্পকলা) সম্পর্কে শিক্ষা লাভের জন্য নতুন রাজধানীতে ল্যাটিন শিক্ষার্থীদের সমাগম হতে থাকে। যারা এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পরবর্তীকালে অনুবাদ কার্যের মাধ্যম হিসাবে কাজ করতেন তারা ছিলেন ইহুদী ও সাবেক মুসলিম প্রজা (মোযারেব)। এই গ্রন্থ সিরিজের অন্য একটি গ্রন্থ চার্লস ও ডরোথিয়া সিঙ্গার এ ধরনের সহযোগিতার একটি প্রাণবন্ত চিত্র তুলে ধরেন। এতে বিভিন্ন মতবাদের বৈজ্ঞানিক সংমিশ্রণের একটি অদ্ভুত ধারণা পাওয়া যায়। টলেডোতে আগমনকারী প্রথম বিশিষ্ট ইউরোপীয় বিজ্ঞানী ছিলেন ইংরেজ গাণিতিক ও দার্শনিক বাথের অ্যাডেলার্ড। অপরদিকে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত স্পেনীয় ইহুদী পেট্রাস আলফন্সী ইংল্যাণ্ড গিয়ে প্রথম হেনরীর চিকিৎসক পদে বরিত হন এবং সর্বপ্রথম মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার করেন। উভয় পণ্ডিত ব্যক্তিই দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধে আরবদের জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গাণিতিক রচনাবলী ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। এরপর অনেকেই তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন।

দ্বাদশ শতকে টলেডোতে যে বিজ্ঞান চর্চার প্রসার হয় তা বহু দিক দিয়ে তিনশ বছর আগের বাগদাদের অনুবাদ যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। খলীফা আল মামুন যেভাবে

www.waytojannah.com

'জ্ঞান ভবন' (বাইতুল হিকমত) প্রতিষ্ঠা করেন ঠিক তেমনিভাবে আর্কডিকন ডোমিনিকো গুণ্ডিসালভির নির্দেশে আর্কবিশপ রেমাণ্ড টলেডোতে একটি অনুবাদ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। টলেডোতে ইহুদীরা বাগদাদের বহু ভাষাভাষী খৃস্টান ও সাবিয়ান[১] অনুবাদকদের ভূমিকা গ্রহণ করেন। এসব ইহুদী আরবী, হিব্রু, স্পেনীয় এবং কোন কোন সময় ল্যাটিন ভাষাও জানতেন। সাবিয়ান সাবিত ইবনে কাররা যেমন গ্রীক রচনাবলী আরবীতে অনুবাদ করেন, তেমনি খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত ইহুদী আভেন ডেথ (ইবনে দাউদ, অর্থাৎ দাউদের পুত্র) আরবদের বহু গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিঃশাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। হুনাইন ইবনে ইসহাক আরবদের জন্য দার্শনিক, গাণিতিক, পদার্থ বিজ্ঞানী ও চিকিৎসাবিদদের রচনাবলী অনুবাদের মাধ্যমে যে অবদান রাখেন ক্রিমোনার জিরার্ড ল্যাটিন ভাষীদের জন্য সেই একই অবদান সৃষ্টি করেন।

জিরার্ড ১১১৪ খৃস্টাব্দে ইটালীর ক্রিমোনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি টলেমীর *আল মাজেস্ট*–এর সন্ধানে টলেডো আগমন করেন। ১১৭৫ খৃস্টাব্দে তিনি এই গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। শীর্ঘই তিনি আরবী অনুবাদকদের মধ্যে সবচাইতে খ্যাতি ও মর্যাদা লাভ করেন। একজন স্থানীয় খৃস্টান ও ইহুদী অনুবাদ কাজে তাঁকে সাহায্য করেন। ১১৮৭ খৃস্টাব্দে পরলোকগমনের পূর্ববর্তী দুই দশকে তিনি প্রায় আশিটি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। এর মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রীক ও আরব জ্ঞান–বিজ্ঞানের রত্নভাণ্ডার উন্মোচিত করে তিনি তার বহু অনুসারীকে এই দৃষ্টান্ত অনুকরণে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি ইউরোপে 'আরববাদের' সত্যিকার জনক।

চিকিৎসাশাস্ত্রে আমরা জিরার্ডের কাছে নিম্নোক্ত রচনাসমূহ অনুবাদের জন্য ঋণী ঃ হিপোক্রেটিস ও গ্যালেনের রচনাবলী, হুনাইনের প্রায় সমগ্র অনুবাদ, আল–কিন্দীর রচনাসমূহ, ইবনে সিনার বিশাল *ক্যানন* এবং আবুল কাসিমের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী সার্জারী। পদার্থ বিজ্ঞানে তিনি আরবী থেকে অ্যারিস্টটলের বহু রচনা অনুবাদ করেন। এগুলির মধ্যে অ্যারিস্টটলের সন্দেহজনক রচনা *ল্যাপিডারী* (মনিকার) এবং আল–কিন্দী, আল ফারাবী, আইজ্যাক জুডিয়াস ও সাবিতের রচনাবলী রয়েছে।

টলেডোর ক্যাননও (পাদরি) এ ব্যাপারে অবদান রাখেন। তিনি বয়সে তরুণ হলেও সম্ভবত জিরার্ডের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি হিপোক্রেটিসের *এয়ার্স* (বায়ু), *ওয়াটার্স* (পানি) ও প্লেসেস (স্থান) সম্পর্কিত রচনাবলী এবং গ্যালেনের বহু রচনা অনুবাদ করেন। এর সবগুলিই তিনি হুবাইশ ও হুনাইনের আরবী সংস্করণ থেকে অনুবাদ করেন। স্পেনের মুর্সিয়ায় বসবাসকারী ইটালীর আলেস্‌সান্দ্রিয়ার পণ্ডিত রাফিনো গুনাইনের বিখ্যাত *কোয়েস্চন্স মেডিকা* অনুবাদ করেন। টর্টোসার জনৈক ইহুদী আব্রাহাম আবুল কাসিমের *লিবার সার্ভিটোরিজ* ও সেরাপিন দি ইয়ংগারের *ডি সিম্পলিসিবাস* অনুবাদে জেনোয়ার সিমনকে সাহায্য করেন।

---

১. প্রাচীন সাবা (বাইবেলের শেবা)–এর অধিবাসী নক্ষত্র উপাসক একটি সেমিটিক উপজাতি।–অনুবাদক।

www.waytojannah.com

Contents

আবুল কাসিমের রচনার অন্যান্য অংশ ভ্যালেনসিয়ার জনৈক বেরেংগার ও ভিলানোভার আর্নল্ড (মৃ. আনু. ১৩১৩) কর্তৃক অনূদিত হয়। শেষোক্ত ব্যক্তি স্পেনে চিকিৎসাবিষয়ক রচনার সর্বশেষ বিখ্যাত অনুবাদক। ইবনে সিনা, আল কিন্দী, ইবনে জুহর ও অন্যদের রচনাবলী অনুবাদের জন্য আমরা তার কাছে ঋণী।

১৩০ বছর পর্যন্ত মুসলিম শাসনাধীন সিসিলি ১০৯১ খৃষ্টাব্দে সুনির্দিষ্টভাবে নর্ম্যানদের কর্তৃত্বাধীনে যায় এবং এ সময় থেকে আরব বিজ্ঞান প্রসারের একটি উর্বর কেন্দ্রে পরিণত হয়। অধিবাসীদের মধ্যে গ্রীক, আরবী ও ল্যাটিন কথ্য ভাষা হিসাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি, বিশেষ করে ইহুদীরা এই তিনটি ভাষার সাহিত্যও আয়ত্ত করেন। প্রথম রজার থেকে দ্বিতীয় ফ্রেডারিক পর্যন্ত রাজণ্যবর্গ, ম্যানফ্রেড ও আনজু বংশীয় প্রথম চার্লস ভাষা ও ধর্ম নির্বিশেষে জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের পালের্মোতে জড়ো করেন। টলেডোর ন্যায় এখানেও একদল বিজ্ঞ অনুবাদক গ্রীক ও আরবী থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদের কাজ শুরু করেন। প্রধানত জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিত শাস্ত্রের উপর এসব অনুবাদকার্য সম্পন্ন হয়।

দ্বাদশ শতকে সিসিলীতে চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর কোন গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ সম্পাদিত হয়নি। কিন্তু পরবর্তী শতকে আনজু বংশীয় চার্লসের রাজত্বকালে (১২৬৬-৮৫) আমরা বিখ্যাত ইহুদী অনুবাদক 'ফারাগুটের' (ফারাজ ইবনে সেলিম) সঙ্গে এবং রাযীর কনটিনেন্‌স-এর অনুবাদের সঙ্গে (পৃ. ৩২৪) পরিচিত হই। তিনি ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পন্ন করেন, যাতে একটি স্বাভাবিক জীবন কালের অর্ধেক ব্যয়িত হয়।

রাজা চার্লসের নির্দেশে মোসেস অব পালের্মো নামক অপর একজন ইহুদীকে ল্যাটিন অনুবাদক হিসাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তার অনুবাদের মধ্যে আমরা কেবল অর্শরোগ সম্পর্কে একটি কল্পিত হিপোক্রেটিক রচনার অনুবাদ দেখতে পাই। দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের প্রিয়ভাজন মাইকেল স্কট (মৃ. ১২৩৫) অ্যারিস্টটলের জীববিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিজ্ঞান সংক্রান্ত সামগ্রিক রচনা, বিশেষত ইবনে সিনার ভাষ্যসহ *ডি অ্যানিমালিভাস*-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ আরবী ও হিব্রু থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। শেষোক্ত গ্রন্থটি তিনি ১২৩২ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের নামে উৎসর্গ করেন।

সবাই জানেন, দ্বিতীয় ফ্রেডারিক প্রাণীবিজ্ঞানে অত্যন্ত আগ্রহশীল ছিলেন। তিনি হাতী, আরব দেশীয় এক কুঁজ বিশিষ্ট উট, সিংহ, চিতাবাঘ, বাজ পাখী, পেঁচা প্রভৃতি পোষা প্রাণী সংরক্ষণের জন্য তার সম্পদ ও মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কাজে লাগান। এগুলি সঙ্গে নিয়ে তিনি ভ্রমণে বের হতেন। সম্রাট *ডি আর্টি ভেনাণ্ডি* নামে শিকার সম্পর্কে স্বয়ং একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এটি প্রধানত মাইকেল স্কটের রচনার উপর এবং একই লেখকের অ্যারিস্টটলের প্রাণীবিদ্যার অনুবাদের উপর ভিত্তি করে রচিত। (আলোক বিজ্ঞানে ফ্রেডারিকের আগ্রহ সংক্রান্ত বিষয় ৩৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

www.waytojannah.com

Contents

ইউরোপে মুসলিম বিজ্ঞান প্রচারে ক্রুসেডের প্রভাব বিস্ময়করভাবে অতি সামান্য। এই আন্দোলনের মধ্যে যে একটি মাত্র রচনার সন্ধান পাওয়া যায় তা পিসার জনৈক স্টিফেনের লেখা। তিনি সালের্মো ও সিসিলিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি এন্টিয়কে আগমন করেন এবং সেখানে ১১২৭ খৃষ্টাব্দে হ্যালি (আলী) আব্বাসের *লিবার রিগালিস* অনুবাদ করেন। এতে তিনি আফ্রিকান কনস্ট্যান্টাইন কর্তৃক একই রচনার পূর্ববর্তী অনুবাদের তীব্র সমালোচনা করেন।

আমরা ধরে নিতে পারি যে, আংশিকভাবে ক্রুসেডের প্রভাবেই ত্রয়োদশ শতকে ইউরোপের সর্বত্র হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব হাসপাতাল তখন আর কেবল পাদ্রিদের তত্ত্বাবধানে ছিল না। এগুলি সম্ভবত দামেস্কের সমসাময়িক সেলজুক শাসক নূরুদ্দীনের এবং কায়রোতে মামলুক সুলতান আল–মানসুর কালাউনের প্রতিষ্ঠিত অত্যন্ত সুন্দর *বিমারিস্তানগুলির* অনুকরণ। পরবর্তী শতকের ইউরোপীয় পর্যটকগণ শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। কিছুকাল বিলুপ্ত হওয়ার পর আমরা এগুলির পুনরুজ্জীবন দেখতে পাই। পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট ত্রয়োদশ শতকের সূচনায় ইটালীর রোমে সান স্পিরিটো হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন এবং এরই অনুকরণে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। নবম লুই ১২৫৪–৬০ খৃষ্টাব্দে ক্রুসেড থেকে অপ্রীতিকর অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের পর প্যারিসে 'লেস কুইন্‌যে ভিংগ্‌ট্‌' আশ্রম ও হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠা করেন। মূলত তিনশ গরীব অন্ধের জন্য এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে এর সঙ্গে চক্ষু রোগের একটি হাসপাতাল সংযুক্ত করা হয়। এটি বর্তমানে ফরাসী রাজধানীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতাল।

ক্রুসেডের সময় যেসব মুসলমান ফ্রাঙ্ক চিকিৎসকদের সংস্পর্শে আসেন তাঁরা শেষোক্তদের পেশাগত মানের তীব্র নিন্দা করেন। সিরীয় যুবরাজ উসামা তার আরব খৃষ্টান চিকিৎসক সাবিতের বিবরণের ওপর ভিত্তি করে যেসব কাহিনী বর্ণনা করেন তাঁর থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ১১৪০ খৃষ্টাব্দের দিকে সাবেত এ ধরনের দুটি ঘটনা অবলোকন করেন যাতে জনৈক ফ্রাঙ্কের বর্বরোচিত অস্ত্রোপচারের ফলে দুজন রোগীই মারা যায়।[১]

কয়েকজন ল্যাটিন অনুবাদক উত্তর ইটালীতে অনুবাদ চর্চা করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে পিসার বুরগুণ্ডিও সরাসরি গ্রীক থেকে গ্যালেনের রচনাবলী অনুবাদ করেন (আনু. ১১৮০)। ১২০০ খৃষ্টাব্দের দিকে পিস্টোয়ার একারসিয়াস হুবাইশের আরবী সংস্করণ থেকে গ্যালেনের *ডি ভিরিবাস এলিমেন্টোরাম* অনুবাদ করেন। ১২৫৫ খৃষ্টাব্দে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত ইহুদী বোনাকোসা পাদুয়ায় ইবনে রুশদের *কলিজেট* ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন।

১. তৃতীয় ক্রুসেডের সময় মিসরের সুলতান সালাহ্উদ্দিন কর্তৃক ছদ্মবেশে ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম রিচার্ডের (সিংহ–হৃদয়) দুরারোগ্য ব্যাধি চিকিৎসার কাহিনী প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। –অনুবাদক।

www.waytojannah.com

১২৮০ খৃষ্টাব্দে ইহুদী জ্যাকবের সহায়তায় প্যারাভিসিয়াস ভেনিসে ইবনে রুশদের *তাইসির* অনুবাদ করেন।

অন্য অনুবাদকদের সময় ও সূত্র অপরিজ্ঞাত। দৃষ্টান্তস্বরূপ ক্যানামুসালীর (আম্মার) চক্ষু বিজ্ঞানের অনুবাদক ডেভিড হার্মেনাসের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া অজ্ঞাতনামা লেখকদের বহু ল্যাটিন অনুবাদ রয়েছে। এগুলি মাইমোনাইডস, ইবনে সিনা, জাবের, রাযী, আল হায়সাম প্রমুখের রচনা। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আলকেমী সংক্রান্ত অধিকাংশ রচনাই অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের অনুবাদ।

ষোড়শ শতক পর্যন্ত এই অনুবাদকার্য পুরাদমে অব্যাহত থাকে। এই প্রসঙ্গে একজন বিশিষ্ট অনুবাদক হিসাবে ইটালীর আঁদ্রে আল পাগোর (মৃ. ১৫২০) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ইবনে সিনার *ক্যানন, অ্যাফোরিজমি, ডি এনিমা, ইবনে রুশদ* ও জোহানেস সেরাপিয়নের ছোটখাটো রচনা এবং ইবনে কিফতির জীবনীমূলক শব্দকোষ অনুবাদ করেন। এমনকি ষোড়শ শতকের পরেও বহু অনুবাদ সম্পন্ন হয়। এগুলি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিশেষ করে উত্তর ইটালী ও ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।

এমনিভাবে গ্রীক ও আরবী রচনার শত শত অনুবাদ ইউরোপের উযর বৈজ্ঞানিক ভূমিতে আবির্ভূত হয়। এগুলি ফসলদায়ী বৃষ্টির ভূমিকা গ্রহণ করে। কনস্ট্যান্টাইনের অনুবাদের প্রভাবে সালের্নোতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশিষ্ট শিক্ষকদের একটি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। দেহব্যবচ্ছেদ চর্চা পুনরুজ্জীবনের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শল্যচিকিৎসা সম্পর্কে উৎকৃষ্ট পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশিত হয়। যে স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা এতোদিন ধাত্রীদের একচেটিয়া ব্যাপার ছিল তা বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনার বিষয়-বস্তু হয়। চক্ষুরোগ চিকিৎসা ভবঘুরে হাতুড়ে চিকিৎসকদের হাত থেকে শিক্ষিত চিকিৎসকদের চর্চার অধীনে আসে।

দ্বাদশ শতক থেকে বেশ বিছুসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেগুলি নতুন জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এগুলির মধ্যে বলোনিয়া (উত্তর ইটালী), পাদুয়া (উত্তর-পূর্ব ইটালী), মোনপলিয়া (দক্ষিণ ফ্রান্স) ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাইযেন্টাইন আলেকজান্দ্রিয়া ও খলীফা আমলের বাগদাদের ন্যায় সামগ্রিকভাবে প্রাচীন লেখকদের রচনা পাঠ শিক্ষাদানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কারণ এসব রচনা অবশেষে ল্যাটিন ভাষায় পাওয়া যেত। তখনো পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান প্রচলিত হয়নি। উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, পদার্থ বিদ্যা ও আলকেমী চর্চা সামগ্রিকভাবে গ্রীক-আরব ঐতিহ্য অনুসরণ করে। ষোড়শ শতক শেষ হওয়ার পরেই বলোনিয়ায় সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে মানুষের দেহ-ব্যবচ্ছেদ করা হয় এবং বৈধ পদ্ধতি প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই তা করা হয় (সিংগার)। দেহ-ব্যবচ্ছেদ ও শরীর তত্ত্বের ক্ষেত্রে ইবনে সিনা গ্যালেনের যেসব ভুলভ্রান্তি তুলে ধরেন এতে তার সংশোধন করা হয়নি; কারণ ময়নাতদন্তের চাইতে ঐতিহ্যই শক্তিশালী থাকে।

www.waytojannah.com

অবশ্য ব্যবহারিক দিকে অস্ত্রোপচার, স্বাস্থ্য রক্ষা এবং সম্ভবত সর্বোপরি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়। মোনপোলিয়ার শল্যচিকিৎসক গাই দ্য চৌলিয়াক কাটাছেঁড়া ও চোখের ছানির নিন্দিত অস্ত্রোপচারে উদ্যোগী হন। মিলানের ল্যানফ্রাঙ্কি ফ্রান্সে বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানে রক্তকণিকা ব্যাণ্ডেজ করার ও ক্ষতস্থানে জোড়া দেওয়ার উন্নত পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। উত্তর ইটালিতে কিছুকাল যাবত না পাকিয়ে বা পুঁজ বের না করে মদ্যযুক্ত পট্টি ব্যবহারের মাধ্যমে কাটা ঘায়ের চিকিৎসা প্রচলিত ছিল।

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃতি বিজ্ঞানের কেন্দ্র ছিল। টলেডো থেকে ইবনে রুশদের ভাষ্যসহ প্রবর্তিত অ্যারিস্টটলীয় বিজ্ঞান ছিল সেখানকার বিজ্ঞান চর্চার ভিত্তি। রজার বেকন ও তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিদ্বন্দ্বী বলস্টাটের আলবার্ট (আলবার্টাস ম্যাগনাস) এখানে বড় বড় মুসলিম বিজ্ঞানীর রচনা ব্যাখ্যা করতেন। রজার বেকনের আলোক বিজ্ঞানের মতবাদ কিভাবে আল হাইসামের *থেজারাস অপটিকা*–এর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আলবার্ট তার *মিনারেলিবাস*–এ জাবের ও অন্যান্য আরব লেখকের আলকেমী মতবাদের পুনরাবৃত্তি করেন। তিনি কেবল তার প্রাণীবিদ্যা ও উদ্ভিদ বিদ্যা সংক্রান্ত পর্যালোচনায় কিছুটা মৌলিকত্বের পরিচয় দেন। কিন্তু এসব ক্ষেত্রেও তিনি আরবী অনুবাদের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল ছিলেন। ভিন্সেন্ট দ্য বুভা রচিত বিশ্বকোষ *স্পেকুলাম নেচারেল*–এ জাবেরের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আর্নল্ড অব ভিলানোভা ও রেমাণ্ড লালের নামে যেসব আলকেমী সংক্রান্ত গ্রন্থ রয়েছে সেগুলি জাবেরের উদ্ধৃতিতে পরিপূর্ণ। জ্যোতিঃশাস্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরব আলকেমী ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে তার প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখে।

ষোড়শ শতকের পরে, বিশেষ করে উত্তর ইটালীতে চিকিৎসা শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরবীর চাইতে গ্রীক ভাষা থেকে অনুবাদ অধিক থেকে অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে। কোন প্রকার মৌলিক পার্থক্য না থাকা সত্ত্বেও 'গ্রীকবাদ' 'আরববাদের' বিরোধী ছিল। যতোদিন পর্যন্ত প্রাচীনদের গ্রন্থাবলী প্রায় এককভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তি ছিল ততোদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানের মতবাদ প্রাধান্য বজায় রাখে। পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর চিকিৎসাশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের উপর গ্রীক–আরবী রচনা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বারংবার মুদ্রিত হয়। ১৫৩০ থেকে ১৫৫০ খৃস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে আরববাদ তার মরণাঘাত লাভ করে। একই সময়ে কোপারনিকাস[১] কর্তৃক জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিপ্লব সাধিত

---

১. পুরো নাম নিকোলাস কোপারনিকাস (১৪৭৩–১৫৪৩), পোলিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিম্নোক্ত মতবাদের প্রবক্তা ঃ গ্রহসমূহ সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে; পৃথিবী তার কক্ষপথে আবর্তিত হওয়ার দরুণই নক্ষত্রসমূহের উদয়াস্ত বোঝা যায়।–অনুবাদক।

www.waytojannah.com

হওয়ায় প্যারাসেলসাস[১] আলকেমী ও চিকিৎসাশাস্ত্র সংশোধন করেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের গ্যালেন ও ইবনে সিনা পরিহার করে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে ফিরে আসার জন্য অবিরামভাবে তাগিদ দেন ঃ *এক্সপেরিমেন্টএট রেশিও অক্টোরাম লকো মিহি সাফ্রেগানটার!* ১৫৪৩ খৃস্টাব্দে *কোপারনিকাসের ডি রিভল্যুশনিবাস অর্বিয়াম কালেস্টিয়াম* প্রকাশিত হওয়ার একই বছরে আঁদ্রিয়াস বিসালিয়াস তার মৌলিক নতুন অ্যানাটমি সম্পাদিত করেন। এই বছর চিকিৎসাশাস্ত্র ও বিজ্ঞানে মধ্যযুগের সমাপ্তি সূচনা করে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে আরব বিজ্ঞানের সরাসরি প্রভাবেরও কার্যত পরিসমাপ্তি ঘটে।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও আরববাদ অব্যাহত থাকে। ১৫২০ খৃস্টাব্দেও ভিয়েনায় এবং ১৫৮৮ খৃস্টাব্দে ফ্রাঙ্কফুর্ট অন দি ওডারে চিকিৎসাশাস্ত্র সংক্রান্ত পাঠ্যসূচী প্রধানত ইবনে সিনার *ক্যানন* ও রাযীর *অ্যাড আলমানসোরেম*-এর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এমন কি ফ্রান্স এবং জার্মানীতে সপ্তদশ শতকেও কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি আরব জ্ঞানচর্চা অব্যাহত রাখেন। এদিকে উত্তর ইটালীতে গ্রীকবাদী ও আরববাদীদের মধ্যে সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। আধুনিক বিজ্ঞান পদ্ধতির আবির্ভাবে উভয় পক্ষ পর্যুদস্ত না হওয়া পর্যন্ত এই সংগ্রাম চলতে থাকে। ঊনবিংশ শতকের সূচনা পর্যন্ত আরব ভেষজ-বিজ্ঞান টিকে ছিল। ইবনে আল-বাইতারের *সিমপ্লিসিয়া*-এর ল্যাটিন অনুবাদ ১৭৫৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ক্রিমোনায় মুদ্রিত হয়। সেরাপিয়ন ও মেসিউ দি ইয়ংগারের গ্রন্থাবলী ১৮৩০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত পঠিত হয় এবং ইউরোপীয় ভেষজ বিজ্ঞানে ব্যবহারের জন্য সংক্ষিপ্ত করা হয়। ১১৮৪ খৃস্টাব্দে মেচিযার কর্তৃক গ্রীক, আরবী ও পারস্য সূত্র থেকে চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে যে আরমেনীয় গ্রন্থ সংকলিত হয় তা ১৮৩২ খৃস্টাব্দেও ভেনিসে পুনর্মুদ্রিত হয়। প্রাণীবিদ্যা সংক্রান্ত ১৮৩৮ খৃস্টাব্দের একটি প্রাচীন জার্মান গ্রন্থে আমি 'গেকো' নামক প্রাচ্য দেশীয় একটি নিরীহ অথর্ বিষাক্ত গিরগিটি সম্পর্কে যাবতীয় রূপকথা দেখতে পেয়েছি। এসব কাহিনী আদ-দামিরির *লাইফ অব অ্যানিমেল্স* গ্রন্থে দেখা যায়।

চিকিৎসা শাস্ত্রের কোন কোন শাখায় গ্রীক-আরব ঐতিহ্য দীর্ঘকাল যাবত অব্যাহত থাকে। এমনকি ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও এগুলির চর্চা হয়। ভেসালিয়াস নিজেই চোখের অস্ত্রোপচার সম্পর্কে গ্যালেন ও ইবনে সিনার কতিপয় ভুলভ্রান্তি অপরিবর্তিত রাখেন এবং এগুলি আনুমানিক ১৬০০ খৃস্টাব্দের আগে পর্যন্ত সংশোধিত হয়নি। একটি জমাট তরল পদার্থ হিসাবে নয় বরং লেনযের সুদৃঢ় অস্বচ্ছতা হিসাবে ছানির প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ১৬০৪ খৃস্টাব্দে ফরাসী চিকিৎসাবিদ পিয়ের ব্রিসো আবিষ্কার করেন। আলেকজান্দ্রিয়ার অ্যান্টিলস কর্তৃক বর্ণিত এবং রাযী ও আলী ইবনে ঈসা কর্তৃক প্রচারিত সুঁইয়ের সাহায্যে প্রাচীন পদ্ধতিতে ছানির অস্ত্রোপচার ইংল্যাণ্ডে ১৭৮০ খৃস্টাব্দের দিকেও পার্সিভ্যাল পট কর্তৃক এবং জার্মানীতে ১৮২০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত অনুসৃত হয়।

---

১. পুরো নাম ফিলিপাস ওরিওলাস প্যারাসেলসাস (১৪৯৩/-১৫৪১), সুইজারল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণকারী জার্মান চিকিৎসাবিদ ও আলকেমী বিশেষজ্ঞ।-অনুবাদক।

www.waytojannah.com

Contents

মুসলিম প্রাচ্যে প্রাচীন বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসা বিষয়ক ঐতিহ্য এখনো জনপ্রিয় চিকিৎসা হিসাবে এবং গ্রাম্য নরসুন্দরদের মধ্যে পুরোপুরি প্রচলিত। এই গ্রন্থকার যেদিন এই কথাগুলি লিখছিলেন ঠিক সেদিনই কায়রোতে জনৈক ভবঘুরে সুদানী হাতুড়ে ডাক্তারকে অ্যান্টিলস ও ইবনে সিনার নির্দেশ অনুযায়ী কোন এক ব্যক্তির ছানি অস্ত্রোপচার অবলোকন করেন। মরক্কো থেকে ভারত পর্যন্ত দেশী ভেষজবিদগণ চিরাচরিত অভ্যাসবশত আরব চিকিৎসাবিদদের *আকরাবাজিন্‌স* (পৃ. ৩৩৮) অনুসরণ করে তাদের ওষুধ তৈরি করেন।

পূর্বাপর বিষয় বিবেচনা করে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, গ্রীকদের দিবা অবসানের পর মুসলিম চিকিৎসাশাস্ত্র ও বিজ্ঞান গ্রীক সূর্যের আলো বিকিরণ করে এবং তা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রজ্বলিত হয়ে মধ্যযুগীয় ইউরোপের গভীর তমসাচ্ছন্ন রাত্রিকে আলোকিত করে। কোন কোন উজ্জ্বল নক্ষত্র তাদের নিজস্ব আলোও প্রদান করে। রেনেসাঁর নতুন দিনের আবির্ভাবে এই চন্দ্র এবং নক্ষত্রগুলিও বিলুপ্ত হয়। যেহেতু সেই মহান আন্দোলনের দিকনির্দেশে ও প্রবর্তনে তাদের অবদান রয়েছে সেজন্য যুক্তিযুক্তভাবেই একথা দাবি করা যেতে পারে যে, তারা আমাদের মধ্যেই রয়েছে।

ম্যাক্স মেয়ারহফ

কয়েকটি আলোচ্য গ্রন্থ

এই নিবন্ধটি *দি লেগ্যাসি অব ইসরাইল* গ্রন্থের সি. এণ্ড ডি সিঙ্গার লিখিত দি জুইশ ফ্যাক্টর ইন মিডিয়েভ্যাল থট' নিবন্ধটির সঙ্গে একযোগে পড়া উচিত।

১. আরব চিকিৎসাশাস্ত্র ও বিজ্ঞান

এফ উস্টেন ফিল্ড, *গেশিচ্‌টে ডের অ্যারাবিশেন আরযটে আণ্ড নেচারফরশের গটিনজেন,* ১৮৪০। এই গ্রন্থটি উপরোক্ত বিষয়ে এখনো যথাযথ মানের একটি অপরিহার্য রচনা। এরই ন্যায় অপরিহার্য রচনা হচ্ছে এল লেকলার্ক *হিস্টোরী ডি লা মেডিসিন অ্যারাবে,* ২ খণ্ড, প্যারিস, ১৮৭৬ এবং সি ব্রোকেলম্যান, *গেশিচ্‌টে ডের অ্যারাবিশেন লিটারেটার,* ২ খণ্ড, ওয়েমার ১৮৯৮–১৯০২। যেসব রচনায় বিস্তারিত বিষয় স্থান পেয়েছে সেগুলি হচ্ছে, ব্যারন কারা ডি ভক্স, *লেস পেনসিউর্স ডি এল ইসলাম,* ৫ খণ্ড, প্যারিস, ১৯২১–৬, জোসেফ হেল, *দি অ্যারাব সিভিলাইযেশন,* কেম্ব্রিজ, ১৯২৬ ; এম মেয়ারহফ, *লে মণ্ডে ইসলামিক,* প্যারিস, ১৯২৬ ; ডি ল্যাসি ওলিয়ারী *অ্যারাবিক থট এণ্ড ইটস্‌ প্লেস ইন হিস্টরি,* লণ্ডন, ১৯২৬। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি মূল্যবান ঃ ই জি ব্রাউন, *অ্যারাবিয়ান মেডিসিন,* কেম্ব্রিজ, ১৯২১ ; ই জে হোমইয়ার্ড, *বুক অব নলেজ কনসার্নিং কান্টিভেশন অব গোল্ড বাই আবুল কাসিম মুহাম্মদ ইবনে আহমদ,* প্যারিস, ১৯২৩ ; এবং *আভিসেনা ডি কনজিলেশন এট কনগ্লুটিনেশন ল্যাপিডাম,* প্যারিস, ১৯২৭; ও ভন লিপম্যান, *এন্টস্‌টেহাং আণ্ড অসব্রিটাং ডের আলকেমী,* বার্লিন ১৯১৯; এইচ সুটার, *ডাই ম্যাথেমেটিকার আণ্ড অ্যাস্ট্রোনোমেন ডের অ্যরাবের,* লিপযিগ, ১৯০০; জে বেরেণ্ডেস, *ডাই ফার্মাসী বি ডেন আলটেন কালচারভোলকার্ন,* ২ খণ্ড হ্যালে, ১৮৯১ ; জে স্টিফেনসন, *জুলজিক্যাল সেকশন অব দি নুযহাতুল কুলুব অব ...আলকাযউইনি,* লণ্ডন, ১৯২৮; এইচ ডুহেম, *লি সিস্টেম ডু মণ্ডে,* ৫ খণ্ড, প্যারিস,

www.waytojannah.com

Contents

১৯১৩–১৭; জে হির্শবার্গ, *গেশিচটে ডের অজেন হিল কুণ্ডে বি ডেন অ্যারাবার্ন*, লিপযিগ ১৯০৫; আবু মনসুর মুযাফফাক, *লিবার ফাণ্ডামেন্টোরাম ফার্মাকোলজিয়েক*, সম্পাদনা আর সেলিগম্যান, ভিণ্ডোবোনে, ১৮৩০–৩,জি বার্জস্ট্রেসার, *হুনাইন ইবনে ইসহাক উবার ডাই সিরিশেন আন্ড অ্যারাবিশেন গ্যালেনিবারসেটযাঙ্গেন*, লিপজিগ, ১৯২৫ । ও সি গ্রুনার, *এ ট্রিটীজ অন দি ক্যানন অব মেডিসিন অব আবিসিনা* লণ্ডন, ১৯৩০।

২. পাশ্চাত্যে প্রচার ও প্রভাব

অপরিহার্য আলোচ্য গ্রন্থ হচ্ছে এম স্টাইনশ্লাইডার, *ডাই ইউরোপাইশেন উবারসেটযাঙ্গেন আউস ডেম অ্যারাবিশেন বিস মিটে ডেস ১৭ জাহ্রহাণ্ডার্টস*, ২ খণ্ড, ভিয়েনা, ১৯০৪–৫। অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থগুলি হচ্ছে ই ইউডম্যান, *বেইট্রাজ জুর গেশিচ্টে ডের নেচারউইসেনশাফটেন*, আর্লানজেন, ১৯০৪–২৯; জি সার্টন *ইনট্রডাকশন টু দি হিস্টোরি অব সাইন্স*, বাল্টিমোর, ১৯২৭; এবং লিন থর্নডাইক, *হিস্টোরী অব ম্যাজিক এণ্ড এক্সপেরিমেন্টাল সাইন্স* ২ খণ্ড, ২য় সং, কেমব্রিজ, ম্যাস, ১৯২৭। যেসব রচনায় বিস্তারিত বিষয় স্থান পেয়েছে সেগুলি হচ্ছে –চার্লস সিঙ্গার, *ফ্রম ম্যাজিক টু সাইন্স*, লণ্ডন, ১৯২৮; এবং *স্টাডিজ ইন দি হিস্টোরি এণ্ড মেথড অব সাইন্স*, ২য় খণ্ড, অক্সফোর্ড, ১৯২১; সি এইচ হ্যাসকিন্স, *স্টাডিজ ইন দি হিস্টরি মিডিয়েভ্যাল সাইন্স*, ২য় সংস্করণ, কেমব্রিজ, ম্যাস, ১৯২৭; বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি মূল্যবান ঃ চার্লস সিঙ্গার, *শর্ট হিস্টোরি অব মেডিসিন*, অক্সফোর্ড ; ম্যাক্স নিউবার্জার, হিস্টোরি অব মেডিসিন, ২ খণ্ড, অনুবাদ অক্সফোর্ড ১৯১০–২৫; ডি ক্যাম্পবেল, অ্যারাবিয়ান মেডিসিন ২ খণ্ড, লণ্ডন, ১৯২৬ ; এফ. এইচ. গ্যারিসন এন ইনট্রডাকশন টু *দি হিস্টরি অব মেডিসিন*, ৪র্থ সংস্করণ, ফিলাডেলফিয়া, ১৯২৯ ; ই জে হোমইয়ার্ড, *কেমিস্ট্রি টু দি টাইম অব ড্যাল্টন*, অক্সফোর্ড, ১৯২৫; ই ডার্মস্টেড্টার, *ডাই আলকেমী ডেস জেবের*, বার্লিন, ১৯২২; ডরোথিয়া ওয়েলি সিঙ্গার. *ক্যাটালগ অব ল্যাটিন এণ্ড ভার্নাকুলার আলকেমিক্যাল ম্যানাসক্রিপ্টস ইন গ্রেট ব্রিটেন এণ্ড আয়ারল্যাণ্ড*, ৩ খণ্ড ব্রাসেল্স্, ১৯২৮–৯; এইচ, শেলেনয, *গেশিচ্টে ডের ফার্মাযী*, বার্লিন, ১৯০৪ ; জুলিয়াস রাস্কা, *অ্যারাবিশে আলকেমিস্টেন*, ২ খণ্ড, হাইডেলবার্গ ১৯২৪; জে রাস্কা, *টে বুলা স্মারাজডিনা*, হাইডেলবার্গ, ১৯২৬ ; জি সোভি, *দি বুক অব আল জাখিরা*, কায়রো ১৯২৮; হির্শবার্গ, *ডাই অ্যারাবিশেন অগেনারযিটে*, ২ খণ্ড, বার্লিন ১৯০৪–৫; ম্যাক্স মেয়ার হফ, *দি টেন ট্রিটিজেস অন দি আই, বাই হুনাইন বি ইসহাক*, কায়রো, ১৯২৮; ই উইডম্যান, আল–কিমিয়া, এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম ২ খণ্ড, ১৯২৭ (লিডেন ও লণ্ডন); এল লেকলার্ক, *ট্রেইটে ডেস সিম্পল্‌স পার ইবনে আল বেইথার*, ৩ খণ্ড, প্যারিস ১৮৭৭; জয়কর, *আল–দামিরীস হায়াতুল হায়ওয়ান*, এ যুলজিক্যাল লেক্সিকন, ২ খণ্ড, লণ্ডন ও বোম্বে ১৯০৬–৮; এম. বার্থেলট, *লা কিমি আউময়েন* –এজ ৪ খণ্ড, প্যারিস ১৮৯৫ ; জে রাস্কা ও পি ক্রাউস, *ডার যুসাম্মেনব্রাচ* ডার আশারির লিজেণ্ডে, বার্লিন, ১৯৩০ এই অংশটির পরিবর্তন, সংশোধন ও এ সম্পর্কে কতিপয় পরামর্শ দানের জন্য চার্লস সিগারের কাছে গ্রন্থকার অত্যন্ত ঋণী।

www.waytojannah.com

সঙ্গীত

যে দুস্তর ব্যবধান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সঙ্গীত শিল্পকে বিচ্ছিন্ন রেখেছে তা বিবেচনা করলে ইউরোপীয় সঙ্গীতে কোন আরব বা মুসলিম উত্তরাধিকারের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য। ইউরোপীয়রা সঙ্গীতকে উল্লম্বভাবে এবং আরবরা সমান্তরালভাবে দেখে, সাধারণভাবে বলতে গেলে যে হার্মনিক (সমস্বর) ও মেলডিক (সুস্বর) মূলনীতি যথাক্রমে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সঙ্গীত শিল্পের মধ্যে নিহিত এটিই হচ্ছে তার বোধগম্য পার্থক্য। তাছাড়া স্বর, ছন্দ ও মেলডিকে সুশোভিত করার ব্যাপারে আরবদের যেসব ধারণা রয়েছে তা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। অবশ্য দশম শতকের আগে দুটি শিল্পের পার্থক্য তেমন বিরাট ছিল না। বস্তুত দুটিকে একটি সাধারণ পর্যায়ে নিয়ে আসা যেতো বলে তাদের মধ্যেকার পার্থক্য ছিল অতি সামান্য। কোন এক সময় উভয়েরই একই পিথাগোরিয়ান স্বরগ্রাম ছিল। উভয়টিই কিছুটা গ্রীক ও সিরীয় উপাদানে গঠিত ছিল। সর্বোপরি বর্তমানে আমরা হার্মনি বলতে যা বুঝি তা অজ্ঞাত ছিল। এ দুটির মধ্যে যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল তা হচ্ছে, আরবরা এক ধরনের পরিমাপমূলক (মেনসুর‍্যাল) সঙ্গীত পদ্ধতির অধিকারী ছিল এবং তাদের মেলডিকে সুশোভিত করার একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা ছিল। এই দুটিই যথাসময়ে পাশ্চাত্য সঙ্গীতকে প্রভাবিত করে।

সেমিটিক তত্ত্ব এবং প্রাচীনতর কালের চর্চা হচ্ছে আরব সঙ্গীতের উৎস। প্রকৃত ভিত্তি না হলেও এ দুটি গ্রীক সঙ্গীত তত্ত্ব ও চর্চাকে প্রভাবিত করেছে। ইসলামের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে আরব রাজ্য আল-হিরা ও গাসসান নিঃসন্দেহে যথাক্রমে পারস্য ও বাইজেন্টাইন রীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই দুটি সাম্রাজ্যে সম্ভবত পিথাগোরিয়ান স্বরগ্রাম প্রচলিত ছিল। মূলত সেমাইটরাই এই স্বরগ্রামের উৎস।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে আমরা দেখতে পাই যে, তৎকালীন রাজনৈতিক কেন্দ্র আল-হিজাযে পরিমাপমূলক সঙ্গীত প্রচলিত ছিল। এটিকে ইকা বা ছন্দ বলা হতো, প্রায় একই সময়ে ইবনে মিসজাহ (মৃ. আনু. ৭০৫-১৪) নামক জনৈক সঙ্গীতজ্ঞ সঙ্গীতের একটি নতুন মতবাদ প্রবর্তন করেন। এই মতবাদে পারস্য ও বাইযেন্টাইন উপাদান ছিল। কিন্তু পরলোকগত ড. জে পি এন ল্যাণ্ড মন্তব্য করেন ঃ 'পারস্য ও বাইযেন্টাইন উপাদান জাতীয় সঙ্গীতকে ছাড়িয়ে যায়নি, বরং নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন আরব ভিত্তিভূমির ওপর এগুলি গ্রথিত হয়।' এই পদ্ধতির স্বরগ্রাম পিথাগোরিয়ান বলে মনে হয়। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে

www.waytojannah.com

বাগদাদের পতন পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। (এখানে জানা প্রয়োজন যে, আরবী সঙ্গীত প্রসারিত হলেও ইসলামে সঙ্গীত বৈধ নয়।–সম্পাদক)।

ইতিমধ্যে কতিপয় পরিবর্তন সাধিত হয়। স্বরগ্রামে এগুলি এতোটা গোলযোগপূর্ণ ছিল যে, ইসহাক আল মাউসিলি (মৃ. ৮৫০) এই মতবাদকে এর সাবেক পিথাগোরিয়ান আদর্শ পুনর্গঠিত করেন। আল ইস্ফাহানী (মৃ. ৯৬৭) পর্যন্ত এই পদ্ধতি অব্যাহত ছিল। তার সময় থেকে পুনরায় উপরোক্ত ধ্যানধারণা সমূহের আবির্ভাব ঘটে। এই শেষোক্ত ধ্যানধারণা হচ্ছে যালযালিয়ান ও খুরাসানিয়ান স্বরগ্রাম। প্রাচীনতর পদ্ধতিকে ভিত্তি হিসাবে সংরক্ষণে প্রাচীন গ্রীক মতবাদ সহায়তা করে। অ্যারিস্টটল, অ্যারিস্টক্সেনাস, ইউক্লিড, নিকোমেচাস, টলেমী ও অন্যদের রচনা অনুবাদের মাধ্যমে এই মতবাদের সংমিশ্রণ ঘটে। এসব আমদানি সত্ত্বেও আমরা আল–কিন্দী (মৃ. আনু. ৮৭৪), আল ইসফাহানী ও ইখওয়ানুস সাফার (১০ম শতক) মাধ্যমে জানতে পারি যে, আরব পারস্য ও বাইযেন্টাইন সঙ্গীত পদ্ধতি তাদের আলাদা সত্তা বজায় রাখে। একাদশ শতকের দিকে পারস্য ও খোরাসানী ধ্যানধারণা প্রবর্তিত হয় এবং তা বিশেষভাবে সঙ্গীতের মেজাজের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালে সাইফুদ্দিন আবদুল মুমিন (মৃ. ১২৯৪) নামক জনৈক তাত্ত্বিক একটি নতুন তত্ত্ব প্রবর্তন বা পদ্ধতিবদ্ধ করেন (পদ্ধতিবাদী তত্ত্ব)। অপরদিকে মধ্য যুগ শেষ হওয়ার আগে এক–চতুর্থাংশ স্বর পদ্ধতি (কোয়ার্টার টোন সিস্টেম) নামে অপর একটি স্বরগ্রাম প্রবর্তিত হয়। এটি বর্তমানে প্রাচ্যের আরবদের মধ্যে দেখা যায়। আরব সঙ্গীত পারস্য ও বাইযেন্টাইন চর্চার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, একথা আরবরা প্রকাশ্যে স্বীকার করেন। অপরদিকে পারস্য এবং বাইযেন্টিয়ানবাসীরাও আরব সঙ্গীত শিল্প থেকে বহু কিছু ধার করেছেন।

সঙ্গীত চর্চা

আরবদের কাছে সঙ্গীতের অর্থ কি *সহস্র ও এক রজনীতে* তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে। অবশ্য এই শিল্পের প্রতি আরবদের গভীর অনুরাগের পরিচয় ইবনে ‘আবদ রাব্বিহির ইউনিক নেথলেস আল ইসফাহানীর *গ্রেট বুক অব সাংস* ও *আল নুওয়াইবির দি এক্সটিমি নীড* গ্রন্থে প্রকৃষ্টভাবে পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত দুটি দশম শতকে ও শেষোক্তটি ত্রয়োদশ শতকের রচনা। দুর্ভাগ্যবশত এগুলি এখনো কেবল আরবী ভাষাতেই পাওয়া যায়। এখানে আমরা দেখতে পাই যে, শৈশবের দোলনা থেকে সমাধি পর্যন্ত, শিশুর ঘুমপাড়ানি গান থেকে অন্ত্যেষ্টিগাথা পর্যন্ত সঙ্গীত আরবদের নিত্যসঙ্গী। সুখ, দুঃখ, কর্মমুখরতা, খেলাধুলা, যুদ্ধ–বিগ্রহ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রভৃতি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব সঙ্গীত ছিল। ঐ সময়কার প্রায় প্রত্যেক সচ্ছল আরবের নিজস্ব গায়িকা ছিল। বর্তমানে আমাদের (ইউরোপের) ঘরে ঘরে যেমন ‘পিয়ানোফোর্টি’ বাদ্যযন্ত্র দেখা যায়, তারাও ছিল ঠিক তাই।

www.waytojannah.com

অবশ্য আমরা এখানে প্রধানত জনগণের সঙ্গীতের ব্যাপারে আলোচনা করছি না। যেমনটি ইবনে খালদুন (মৃ. ১৪০৬) বলেছেন, শিল্পী না হলে প্রকৃত পক্ষে কোন শিল্পেরই সূচনা হয় না। আমরা প্রাক ইসলামিক যুগে এক শ্রেণীর পেশাদার সঙ্গীত শিল্পীর সন্ধান পাই। ইসলামে 'গান শোনা' নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও খিলাফতের আমলে এই শ্রেণীর সঙ্গীত শিল্পীরা অত্যন্ত সমাদৃত ছিলেন। বস্তুত আরবরা সঙ্গীতের সকল শাখায় যেভাবে এর চর্চা করেন তার তুলনায় অন্য যেকোন দেশের ইতিহাসে সঙ্গীত চর্চা তুচ্ছ।

আরবদের কাছে সব সময় নির্ভেজাল যন্ত্রসঙ্গীতের চাইতে কণ্ঠ সঙ্গীত অধিকতর সমাদৃত ছিল। এর পিছনে কবিতার প্রতি বিশেষ অনুরাগ কিছুটা দায়ী। অবশ্য যন্ত্র সঙ্গীতে আইনগত বিধিনিষেধও এর অন্যতম কারণ। গীতি কবিতা বা কাসিদা ছাড়াও কণ্ঠসঙ্গীতের পদ্যরীতির মধ্যে *কিত্'সা* বা খণ্ড কবিতা, *গযল* বা প্রেমের গান এবং অধিকতর জনপ্রিয় *মাওয়াল* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্যে *যাজাল* ও *মুওয়াশশাহ*–এর ন্যায় শেষোক্ত রীতিগুলি প্রবর্তিত হয়েছে। বিশেষ ধরন বা স্বরগ্রামে গঠিত মেলডি পরিমাপমূলক অর্থাৎ ছন্দযুক্ত *(ইকা')* হতে পারে, অথবা নাও হতে পারে। প্রত্যেক সঙ্গীত শিল্পী মিলযুক্তভাবে কিংবা স্বরাষ্টকে (অকটেভ) গাইতেন বা বাজাতেন। আমরা যে আকারে হার্মনি বুঝি তা অজ্ঞাত ছিল। এর স্থলে আরবরা মেলডিকে সুশোভিত করতেন। এতে সময় সময় যুগপৎভাবে চতুর্থ, পঞ্চম অথবা অষ্টমে মেলডির একটি স্বর ধ্বনিত হতো। এই পদ্ধতি তারকিব বা যৌগিক নামে পরিচিত ছিল। মেলডি পদ্ধতির সঙ্গে যেসব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হতো তার মধ্যে আবশ্যিকভাবে ছিল লিউট (বীণা, আরবী *আল–'উদ*, ইংরেজী নাম এখান থেকে উদ্ভূত) প্যাণ্ডোর *(তানবুর)*, সন্টারি *(কানুন)* কিংবা বাঁশি (কাসাবা, নাই)। অপর দিকে ড্রাম *(তবল)*, ট্যাম্বোরিন *(দফ)*, কিংবা ওয়ান্ড *(ক্বাদিব)* সঙ্গীতের ছন্দ জোরদার করে তুলতো। এ ছাড়াও ছিল অনেক ছোটখাটো বাদ্যযন্ত্র, কিন্তু এগুলি প্রায়ই কণ্ঠ সংগীতের গৌরচন্দ্রিকা কিংবা বিরতিকালীন যন্ত্র সঙ্গীত হিসাবে ব্যবহৃত হতো। সম্ভবত সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গীত রীতি ছিল *নাউবা*। এতে কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের কতিপয় সুরের সমন্বয় করা হতো। এই রীতি বিশেষভাবে পাশ্চাত্যে বিকাশ লাভ করে। এ পর্যন্ত যেসব সঙ্গীতের বিষয় আলোচনা হয়েছে তাকে মোটামুটি কক্ষ সঙ্গীত (চেম্বার মিউজিক) বলা যেতে পারে। কারণ মাঝে মাঝে আমরা অত্যন্ত বড় বড় বাদক দলের (অর্কেস্ট্রা) কথা পড়ে থাকলেও সাধারণত এদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত ছোট।

কোন মিছিল বা সামরিক মহড়ার উপযোগী মুক্তাঙ্গনের সঙ্গীতে সাধারণত নিম্নোক্ত ধরনের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হতো; রীডপাইপ *(যামর, সারনাই)*, সিঙ্গা (বাক্) রণভেরী *(নাফির)*, ড্রাম *(তবল)*, দামামা *(নাক্কারা, কাস'আ)* এবং করতাল *(কাঁসা)*। মুসলমানদের সামরিক মহড়ায় সামরিক বাদকদল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি সামরিক কৌশলের একটি বিশেষ দিক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। পদস্থ সামরিক অফিসারদের

www.waytojannah.com

অধীনে বাদকদল থাকতো এবং এসব দলের আকার তাঁদের মর্যাদা অনুসারে নির্ধারিত হতো, যেমনটি নির্ধারিত হতো সামরিক *নাউবা-য়* ভেরী নিনাদের সংখ্যা।

সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি, বিশেষ করে শেষোক্তটির প্রতি ধর্মীয় নিন্দাবাদ থাকা সত্ত্বেও সঙ্গীতের আধ্যাত্মিক প্রতিফল সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। সূফীরা এটিকে পরম আনন্দাবিষ্টতার মধ্য দিয়ে প্রত্যাদেশ লাভের একটি পন্থা হিসাবে দেখেন। দরবেশ ও তাপসরা এরই মাধ্যমে তাদের আনুষ্ঠানিকতা নিয়ন্ত্রণ করে। আল গাযযালী বলেছেন, 'আনন্দাবিষ্টতার অর্থ এমন অবস্থা যা সঙ্গীত শ্রবণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়।' অন্যত্র তাঁর *মিউজিক এণ্ড এক্সট্যাসি* গ্রন্থে তিনি নিম্নোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে সাতটি কারণ প্রদর্শন করেন; আনন্দাবিষ্ট অবস্থা সৃষ্টিতে স্বয়ং কুরআনের চাইতেও গানের ক্ষমতা বেশি। *সহস্র ও এক রজনীতে* বলা হয়েছে ঃ 'কারো কারো সঙ্গীত হচ্ছে মাংস এবং অন্যদের কাছে ওষুধ।' 'সঙ্গীতের প্রভাবের' মতবাদ থেকেই এই অহমিকার সৃষ্টি হয়েছে। *ঈথস,* (বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মনোভাব), পরিমণ্ডলের ঐকতান এবং সংখ্যাতত্ত্বের মূলনীতিতে বিশ্বাসের সঙ্গে এই মতবাদ বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাঙ্গিতিক আরোগ্য বিজ্ঞানের এই মতবাদ ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

স্বাধীন লোকদের মধ্যে উৎসব উপলক্ষে সর্ব প্রকার বাদ্যযন্ত্র দেখা যেতো। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে তাম্বুরা বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। ভবঘুরে চারণেরও নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র ছিল। তিনি সাধারণত একটি মৃদঙ্গ *(তবল)* ও বাঁশি *(শাহীন)* বহন করতেন। এক হাতে মৃদঙ্গ বাজাতেন এবং অপর হাতে বাঁশির ছিদ্রে অঙ্গুলি চালনা করতেন। মাথায় ছোট ছোট ঘন্টা বাধা মুকুট পরতেন এবং সুরের তালে তালে মাথা আন্দোলিত করতেন।

সমরকন্দ থেকে আটলান্টিক পর্যন্ত সঙ্গীতের পরিভাষা প্রাচ্যে সঙ্গীত চর্চায় আরবদের প্রত্যক্ষ অবদানের যথেষ্ট প্রমাণ বহন করে।

বাদ্যযন্ত্র

আরবীতে বাদ্যযন্ত্রের নাম অসংখ্য এবং এখানে তার এক-দশমাংশ নিয়ে আলোচনা করাও সম্ভব নয়। আরবরা বাদ্যযন্ত্র তৈরিকে ললিত কলায় উন্নীত করেন। বাদ্যযন্ত্র তৈরি সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং সেভিলের ন্যায় কতিপয় শহর বাদ্যযন্ত্র তৈরিতে খ্যাতি অর্জন করে। শুধু বীণাই বিভিন্ন শ্রেণীর ও আকারের ছিল। প্রাক-ইসলামী যুগের বীণা *(মিযহার)* ছিল চামড়ার পেটওয়ালা। তাদের ক্লাসিক্যাল বীণা *('উদ কাদিম)* অনেকটা আধুনিক ম্যাণ্ডেলিনের মতো ছিল। এ ছাড়া এ জাতীয় বৃহত্তর আকারের বাদ্যযন্ত্রকে বলা হতো পূর্ণাঙ্গ বীণা, *('উদ কামিল)*। তাদের *শাহরুদ* ছিল আধুনিক আর্কলি উট। এ ছাড়া আমরা বেশ কয়েকটি বড় আকারের বাদ্যযন্ত্রের ছবি দেখতে পাই। তাদের প্যাণ্ডোর[১]

---

১. ব্যাণ্ডোরও বলা হয়, অনেকটা আধুনিক গিটারের ন্যায় একটি প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র; ব্যাঞ্জো ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত।—অনুবাদক

www.waytojannah.com

Contents

শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বৃহদাকারের *তানবুর তার্কি* থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র আকারের *তানবুর বিগিল্‌মা* পর্যন্ত বহু রকমের বাদ্যযন্ত্র ছিল। এ ছাড়া ছিল *মুরাব্বা'* নামে পরিচিত গিটার। এটি ছিলো চেপ্টা বক্ষযুক্ত আয়তাকার বাদ্যযন্ত্র। পরবর্তীকালে এটি কিতারা নামে পরিচিত হয়। আমাদের কাছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাদের বক্রাকারের বাদ্যযন্ত্র। প্রথমে এগুলি তাদের শ্রেণীগত *রাবাব* নামে পরিচিত ছিল। এগুলিও বড় ছোট এবং বিভিন্ন আকারের দেখা যায়। এর মধ্যে *কামানজা* ও *গিশাক* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খোলা তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল হার্প *(জাঙ্ক, সান্‌জ)*, সন্টারী *(কানুন, নুয্‌হা)* এবং ডালসিমার *(সিন্‌তির)*।

কাঠের বায়ু চালিত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ছিল বহু আকারের বাঁশি। প্রায় তিন ফুট লম্বা *নাইবাম* থেকে শুরু করে এক ফুট ও তার চাইতেও কম লম্বা *শাব্বাবা* এবং *জুয়াক*। আর একটি বাঁশির নাম ছিল *সাফফারা*। নলের বাঁশির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল *যাম্‌র, সারনাই, যুলামী* ও *গাইতা*। এই জাতীয় *বাক্‌* ছিলো ধাতুর তৈরি।

তাম্বুরা বা খঞ্জনি জাতীয় বাদ্যযন্ত্রকে সাধারণত দফ্‌ বলা হতো। এটি বিশেষভাবে বর্গাকৃতির ছিল। গোলাকার বাদ্যযন্ত্রগুলি আকার ও নির্মাণ কৌশল অনুযায়ী *তার, দাইরা* ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্রগুলিও *তবল, নাক্কারা, কাস'আ* ইত্যাদি বহু ধরনের ছিল। করতালের নাম ছিল কাঁসা। থালা আকৃতির চেপ্টা ছোট করতালকে *সিন্‌জ্‌* বলা হতো।

আরবদের মধ্যে বায়ু চালিত অর্গ্যান *(অর্গানাম)* এবং পানি চালিত অর্গান *(হাইড্রলিস)* উভয়টিই প্রচলিত ছিলো। এছাড়া তাদের মধ্যে সম্ভবত *অর্গানিষ্ট্রামও (দুলাব)* প্রচলিত ছিল। শেষোক্তটি মধ্যযুগীয় ইউরোপে সুপরিচিত ছিল এবং দেখতে অনেকটা আধুনিক হার্ডিগার্ডির মতো ছিল। এ জাতীয় আরেকটি বাদ্যযন্ত্র ছিল *এশাকোয়েল (আল-শাকিরা)*।

বিভিন্ন বিবরণ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আরবরা বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভাবক এবং সংস্কারক ছিলেন। আল-ফারাবী (মৃ. ৯৫০) সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি *রাবাব* ও *কানুনের* উদ্ভাবক (? সংস্কারক) ছিলেন, আল-যুনাম (৯ম শতকের প্রথম ভাগ) *নাই যুনামী* বা *যুলামী* নামে প্রচলিত বায়ুচালিত বাদ্যযন্ত্র তৈরি করেন; যালযাল (মৃ. ৭৯১) '*উদ আল শাব্বুত* প্রবর্তন করেন; দ্বিতীয় আল-হাকাম (মৃ. ৯৭৬) নলের *বাক*-এর সংশোধন সাধন করেন; যিরিয়াব (৯ম শতকের প্রথম ভাগ) নতুন ধরনের বীণা প্রবর্তন করেন; আল-বাইয়াসি ও আবুল মাজদ (১১শ শতকে) উভয়েই ছিলেন অর্গ্যান নির্মাতা; এবং সফিউদ্দিন আবদুল মুমিন (মৃ. ১২৯৪) *নুয্‌হা* নামে একটি বর্গাকৃতির সন্টারী ও *মুগনি* নামে অপর একটি বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার করেন।

নবম শতকের প্রথম দিক থেকে এক ধরনের স্বরলিপি প্রচলিত থাকলেও অধিকাংশ শিল্পী শ্রবণের মাধ্যমে তাদের সঙ্গীত আয়ত্ত করেন। কোন কোন সুরকার বিশ্বাস করতেন

www.waytojannah.com

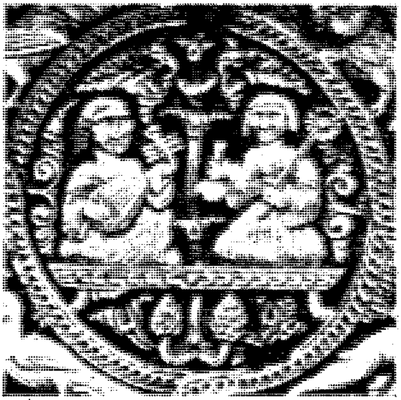

চিত্র-৮৯. দশম থেকে একাদশ শতাব্দীর স্পেনো মূরীয় যন্ত্রশিল্পীর প্রতিকৃতি (লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া এবং অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত অভ্র নির্মিত বাক্স থেকে সংগৃহীত)।

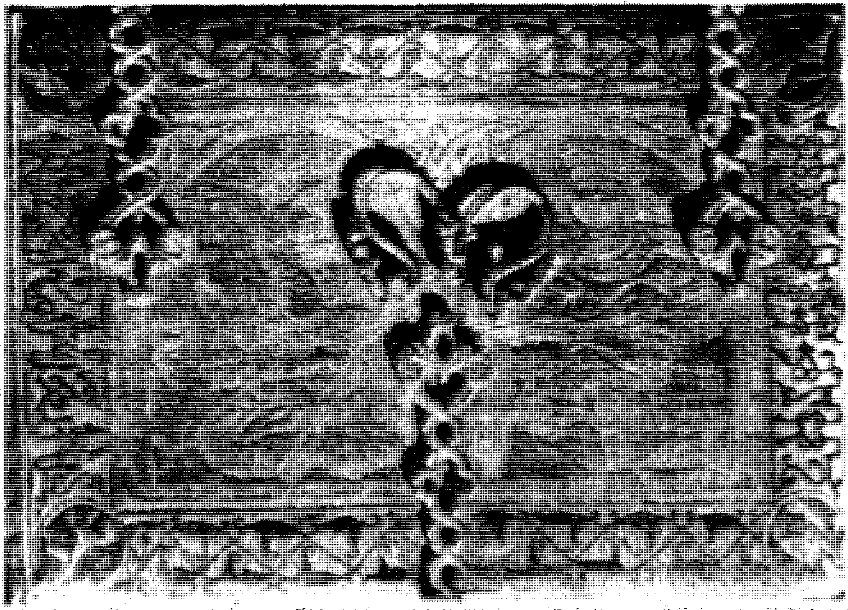

চিত্র-৯০. "উদ" "জামর"
"জাংক" "রাবাব"
দ্বাদশ শতাব্দীর পারস্য যন্ত্রশিল্পীর প্রতিকৃতি (ভেনিসের সেন্ট মার্কো প্রাদেশিক অধিকর্তা ভবনের রৌপ্য নির্মিত জুয়েলারী বাক্স থেকে সংগৃহীত)

www.waytojannah.com

যে, জ্বিনের প্রেরণায়ই তারা সঙ্গীত রচনা করেন। আরব চারণ কবিদের পোশাক-আশাক ও চেহারা-সুরত বিশেষভাবে লক্ষণীয়। লম্বা চুল, চিত্রিত চেহারা ও হাত এবং উজ্জ্বল রং এই শ্রেণীর গায়কদের বৈশিষ্ট্য। এরা ইসলামের প্রাথমিক যুগের মেয়েলী স্বভাবসুলভ *মুখান্নাসুন*-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে অনেকেই ছিল *এভিরাতি*। কেউ কেউ শাস্তি হিসাবে এই পেশায় নিয়োজিত হতো এবং অন্যরা সম্ভবত বালকদের কণ্ঠ জনপ্রিয় ছিল বলে এই পেশা গ্রহণ করতো। খলীফার দরবার থেকে গায়কদের পৃষ্ঠপোষকতা করা হতো। কেবল শিল্পী হিসাবে নয়, শিল্পীকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যেও এরূপ পৃষ্ঠপোষকতা করা হতো। সঙ্গীত পেশার সূত্রে শিল্পী বহু পরিবারে যাতায়াত করতো। সেখানে মদের পেয়ালার সংস্পর্শে অনেক গোপন রাজনীতি প্রকাশ হয়ে পড়তো। তাছাড়া মতামত প্রচারে গানের চাইতে কার্যকর মাধ্যম আর কিছু ছিল না। আরবদের অনুকরণকারী প্রভেন্সের ধর্মদ্রোহী ট্রুবাডুরদের *জংলাররাও*[১] এভাবে নিজেদের প্রচার কার্য চালাতো।

সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ রচয়িতা

আরবী সাহিত্যের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে সঙ্গীত বিষয়ক রচনা। সঙ্গীতের ইতিহাস, গান সংগ্রহ, বাদ্যযন্ত্র, সঙ্গীতের বৈধ দিক, সৌন্দর্য বোধ এবং সঙ্গীতজ্ঞদের জীবনী এসব রচনার অন্তর্ভুক্ত। এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম লেখক হচ্ছেন আল-মাসউদী (মৃ. আনু. ৯৫৭) এবং আল-ইসফাহানী (মৃ. ৯৬৭)। প্রথমোক্ত লেখকের *মেডোস অব গোল্ড* (সোনার ময়দান) গ্রন্থে আমরা প্রাথমিক যুগে আরব সঙ্গীত চর্চার চমকপ্রদ তথ্যাবলী জানতে পারি। তার অন্যান্য রচনায় বাইরের দেশের সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। একুশ খণ্ডে রচিত আল ইসফাহানীর বিশাল গ্রন্থ *গ্রেট বুক অব সংস* (বৃহৎ সঙ্গীত গ্রন্থ) অধিকতর মূল্যবান। ইবনে খলদুন এটিকে 'আরবদের *দিওয়ান*' নামে আখ্যায়িত করেছেন। এই লেখক সঙ্গীত সম্পর্কে আরো চারটি গ্রন্থ রচনা করেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আল-ওয়াররাক-এর (মৃ. ৯৯৫-৬) *দি ইনডেক্স* (নির্দেশক) গ্রন্থটি সঙ্গীত তত্ত্ব ও সঙ্গীত বিজ্ঞানের লেখকদের এবং সঙ্গীত বিষয়ক সাধারণ রচনাসমূহের একটি তথ্যখনি।

পাশ্চাত্যে আমরা প্রায় একই ব্যাপার দেখতে পাই, ইবনে 'আবদ রাব্বিহি'র (মৃ. ৯৪০) *দি ইউনিক নেকলেস* (অনন্য কণ্ঠস্বর) গ্রন্থ প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতজ্ঞদের জীবনী এবং গোঁড়াপন্থীদের বিরোধিতার মুখে জোরালভাবে সঙ্গীত চর্চা সমর্থন পেয়েছে। ইয়াহইয়া আল খুন্দুজ আল মুরসী (১২শ শতক) প্রাচ্যের আল ইসফাহানীর অনুকরণে একটি *বুক অব*

---

১. মধ্যযুগীয় ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের চারণ কবি যারা আবৃত্তি বা গানের মাধ্যমে জনসাধারণের চিত্তবিনোদন করতো।
—অনুবাদক

www.waytojannah.com

সংস (সঙ্গীত গ্রন্থ) রচনা করেন। ইবনুল 'আরাবী ও অন্যরা সঙ্গীতের বৈধতা প্রতিপন্ন করে গ্রন্থ রচনা করেন এবং সে সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে বহু তথ্য পরিবেশন করেন।

বাগদাদের পতনের পর (১২৫৮) সঙ্গীত বিষয়ক 'বিশিষ্ট লেখকদের' প্রায় বিলুপ্তি ঘটে। তাদের স্থলে একদল ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞের আবির্ভাব হয়। তারা সঙ্গীতের বৈধতার পক্ষে বা বিপক্ষে নানা প্রকার যুক্তি তুলে ধরেন। সঙ্গীত সম্পর্কে পূর্বের ন্যায় যে দু'-একটি রচনা দেখা যায় সেগুলি হচ্ছে ইবনে খালদুনের (মৃ. ১৪০৬) *প্রলেগোমেনা* (উপক্রমণিকা) এবং আল-ইবশিহির (মৃ. ১৪৪৬) *মুসতাতরাফ*।

সঙ্গীত তত্ত্ববিদ

সঙ্গীত তত্ত্বের যে প্রথম লেখক সম্পর্কে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে অবগত রয়েছি তিনি হচ্ছেন ইউনুস আল-কাতিব (মৃ. আনু. ৭৬৫)। তার পরেই রয়েছে আরবী ছন্দশাস্ত্রের সুবিন্যাসকারী ও প্রথম শব্দকোষ সঙ্কলক আল খলিল (মৃ. ৭৯১)।

দি ইনডেক্স (দশম শতকের শেষভাগে) তার *বুক অব নোটস* (স্বরলিপি গ্রন্থ) ও *বুক অব রীদমস* (ছন্দ গ্রন্থ) তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ইবনে ফিরনাস (মৃ. ৮৮৮) স্পেনে যা প্রবর্তন করেছেন, সেগুলি সম্ভবত আল খলিলের মতবাদ। ইবনে ফিরনাস 'আন্দালুসে সর্বপ্রথম' সঙ্গীত বিজ্ঞান শিক্ষা দেন। ইসহাক আল-মাউসিলি (মৃ. ৮৫০) 'প্রাচীন আরব পদ্ধতি' পুনর্বিন্যস্ত করেন এবং *বুক অব নোটস এণ্ড রীদমস* (স্বরলিপি ও ছন্দ গ্রন্থ) গ্রন্থে তাঁর মতবাদসমূহ তুলে ধরেন।

অষ্টম থেকে দশম শতকের মধ্যে সঙ্গীত-তত্ত্ব ও স্বর-বিজ্ঞান সম্পর্কিত বহু গ্রীক রচনা আরবীতে অনূদিত হয়। পিথাগোড়াসের বলে কথিত একটি রচনা ও প্ল্যাটোর *টিমিয়াস* আরবী ভাষায় পাওয়া যায়। শেষোক্ত গ্রন্থটি ইউহান্না ইবনে আল বাডরিক (মৃ. ৮১৫) কর্তৃক এবং পুনরায় হুনাইন ইবনে ইসহাক (মৃ. ৮৭৩) কর্তৃক অনূদিত হয়। অ্যারিস্টটলীয় রচনার মধ্যে আরবরা *প্রোব্লেমাটা* ও *ডি অ্যানিমার* অধিকারী ছিলেন। উভয়টিই হুনাইন ইবনে ইসহাক অনুবাদ করেন। *ডি অ্যানিমা* সম্পর্কে গ্রীক লেখকদের যেসব ভাষ্য আরবীতে প্রচলিত ছিল সেগুলি থেমিস্টিয়াস ও সিমপ্লিসিয়াসের রচনা। প্রথমোক্তটির অনুবাদকও হুনাইন। তিনি গ্যালেনের ডি *ভসে* গ্রন্থটিও অনুবাদ করেন। এসব রচনা থেকেই আরবরা স্বরতত্ত্ব সম্পর্কে তাদের অধিকতর বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা লাভ করেন।

অ্যারিস্টোজেনাস আরবীতে *দি প্রিন্সিপালস (অব হার্মনী)* ও *অন রীদম* নামক দুটি রচনার জন্য বিখ্যাত। প্রথমোক্ত শিরোনাম থেকে এই অভিমত পাওয়া যাচ্ছে যে, আমরা বর্তমানে *এলিমেন্টস্ অব হার্মনি* নামে যে গ্রীক রচনার সঙ্গে পরিচিত তা মূলত দুটি রচনার সমষ্টি ছিল--*প্রিন্সিপাল্স্* এবং *এলিমেন্টস্*। আরবীতে সঙ্গীত সম্পর্কে ইউক্লিডের নামে দুটি রচনা রয়েছে- *দি ইন্ট্রোডাকশন টু হার্মনি* এবং *দি সেকশন অব দি ক্যানন*। গ্র্যাণ্ড বুক অন

২৪—

www.waytojannah.com

মিউজিক নামক একটি গ্রন্থে এবং অন্যান্য কতিপয় সংক্ষিপ্ত সারমূলক পুস্তিকায় *নিকোমেচাসের* রচনা পড়া হতো। এতে মনে হয় এই বিরাট গ্রন্থটি তারই রচনা। তিনি তার *ম্যানুয়েল অব হার্মনিতে* এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। গ্রীক রচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, শেষোক্ত গ্রন্থটি তাঁর বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত রচনার সমাবেশ। তাঁর *ইনট্রোডাকশন টু অ্যারিথমেটিক* নামক যে গ্রন্থটিতে প্রসঙ্গক্রমে সঙ্গীত সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে তা সাবিত ইবনে কাররা (মৃ. ৯০১) কর্তৃক অনূদিত হয়েছে। *বুক অন মিউজিক* গ্রন্থে টলেমীর রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। এটি সম্ভবত বর্তমানে আমাদের জ্ঞাত *ট্রিটিজ অন হার্মনি*। আরবী ভাষায় অন্যান্য যেসব গ্রীক রচনা আমাদের হস্তগত হয়েছে সেগুলি হচ্ছে আর্কিমিডিস ও অ্যাপোলোনিয়াস পার্গিয়াসের রচনা বলে কথিত পানিচালিত অর্গ্যান সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী। এ বিষয়ে আরবীতে মুরতাস বা মুরিসতাস নামে পরিচিত জনৈক লেখকের রচনাও রয়েছে। তিনি বায়ুচালিত অর্গ্যান, *হাইড্রলিস* এবং চাইমস সম্পর্কেও গ্রন্থ রচনা করেন।

আরবীতে সঙ্গীততত্ত্ব সম্পর্কে যেসব প্রাচীনতম রচনায় গ্রীক লেখকদের প্রভাব দেখা যায়, সেগুলি আল–কিন্দীর (মৃ. আনু. ৮৭৪) রচনাবলী। তিনি সঙ্গীততত্ত্ব সম্পর্কে সাতটি গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলির মধ্যে চারটি না হলেও অন্তত তিনটি সংরক্ষিত আছে ঃ *দি এসেনসিয়াল্স্ অব নলেজ ইন মিউজিক* ; *অন দি মেলডীজ* ; *দি নেসেসারী বুক ইন দি কমপোজিশন অব মেলডীজ,* এবং অপর একটি আল সারাখসী (মৃ. ৮৯৯) ও মানসুর ইবনে তালহা ইবনে তাহির তাঁর শিষ্য ছিলেন। সমসাময়িক তাত্ত্বিকরা ছিলেন সাবিত ইবনে কাররা (মৃ. ৯০১), মুহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আল–রাযি (মৃ. ৯২৩) এবং কুসতা ইবনে লুকা (মৃ. ৯৩২)। এদেরই পরে আবির্ভাব ঘটে আরব তাত্ত্বিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম আল–ফারাবীর। তাঁর সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থাবলী হচ্ছে *গ্র্যাণ্ড বুক অন মিউজিক, স্টাইলস ইন মিউজিক* এবং *অন দি ক্লাসিফিকেশন অব রীদম্*। এ ছাড়া তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক তার দুটি বিখ্যাত সংক্ষিপ্ত সার গ্রন্থেও সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা করেন– *দি ক্লাসিফিকেশন অব দি সায়েন্সেস* এবং *দি অরিজিন অব দি সায়েন্সেস*। আল ফারাবী বলেছেন যে, তিনি গ্রীকদের সঙ্গীত বিষয়ক রচনায় বিশেষত এসব রচনার আরবী অনুবাদে, নানা প্রকার ল্যাকিউনা (শূন্যতা) ও অস্পষ্টতা দেখেই তাঁর *গ্র্যাণ্ড বুক অন মিউজিক* রচনা করেন। তার পরবর্তী লেখক হচ্ছেন অঙ্ক শাস্ত্রের ওপর শ্রেষ্ঠতম আরব গ্রন্থকার আল–বায়যানী (মৃ. ৯৯৮)। তার গ্রন্থটি হচ্ছে *কমপেণ্ডিয়াম অন দি সায়েন্স অব রীদম*। একই সময়ে বিশ্বকোষ রচয়িতা ইখওয়ানুস সাফা (১০ম শতক) ও মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল খারিযমীর (১০ম শতক) নামও উল্লেখযোগ্য। ইখওয়ানুস সাফার সঙ্গীত সম্পর্কিত রচনা ব্যাপকভাবে পঠিত হয়। *কীজ অব দি সায়েন্সস*–এর লেখক আল খারিযমীর অন্যতম রচনা সঙ্গীত তত্ত্বের দ্বার উন্মুক্ত করে।

www.waytojannah.com

সঙ্গীত সম্পর্কে বিশেষভাবে বিখ্যাত লেখক ছিলেন ইবনে সিনা বা আভিসেনা (মৃ. ১০৩৭)। আল–ফারাবীর পরে সঙ্গীত তত্ত্ব সম্পর্কে আরবী ভাষায় তাঁর অবদান সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর *শিফা'* ও *নাজাত* গ্রন্থে এর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি *ইনট্রোডাকশন টু দি আর্ট অব মিউজিক* নামেও একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ ছাড়া তার *ডিভিশন্স অব দি সায়েন্সেস* গ্রন্থে সঙ্গীত বিষয়ক কয়েকটি সংজ্ঞা দেখা যায়। তাঁর শিষ্য ইবনে যাইলা (মৃ. ১০৪৮) *বুক অব সাফিসিয়েন্সী ইন মিউজিক* গ্রন্থটি রচনা করেন। ইবনে সিনার সমসাময়িক লেখক এবং বিখ্যাত গাণিতিক ও পদার্থ বিজ্ঞানী ইবনে আল–হায়সাম ইউক্লিডের *কমেন্টারী অন দি ইনট্রোডাকশন টু হার্মনি* ও *কমেন্টারী টু দি সেকশন অব দি ক্যাননি*–এর দুটি ভাষ্য রচনা করেন। তিনি মিসরে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন। এখানে আর একজন প্রতিভাবান লেখক আবুল সাল্‌ত্‌ উমাইয়া (মৃ. ১১৩৪) একটি *ট্রিটীজ অন মিউজিক* গ্রন্থ রচনা করেন। দ্বাদশ শতকের অন্য তাত্ত্বিকরা হচ্ছেন ইবনে আল–নাক্কাশ (মৃ. ১১৭৮), আল বাহিলী এবং তাঁর পুত্র আবুল মাজ্‌দ (মৃ. ১১৮০) ও ইবনে মান'আ (জন্ম ১১৫৬)। ত্রয়োদশ শতকে আরো বিখ্যাত তাত্ত্বিকদের আবির্ভাব ঘটে। আলমউদ্দীন কাইসার (মৃ. ১২৫১) মিসর ও সিরিয়ায় অত্যন্ত খ্যাতিমান গাণিতিক ছিলেন। তিনি বিশেষভাবে সঙ্গীততত্ত্বের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। আরো পূর্বে নাসির উদ্দিন (মৃ. ১২৭৪) অনুরূপ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সঙ্গীত সংক্রান্ত খণ্ড রচনা সংরক্ষিত আছে।

মুসলিম স্পেনে ফিরনাসের পর আমরা মাসলামা আল–মাজরিতি (মৃ. ১০০৭) ও আল–কিরমানীর (মৃ. ১০৬৬) রচনা দেখতে পাই। এঁরা ইখওয়ানুস–সাফার রচনাসমূহ জনপ্রিয় করেন। অন্য তাত্ত্বিক ছিলেন মুহাম্মদ ইবনে আল–হাদ্দাদ (মৃ. ১১৬৫) এবং জনৈক ইহুদী আবুল ফজল হাসদাই (১১শ শতক)। সঙ্গীত তত্ত্বের ওপর অধিকতর প্রতিভাবান লেখক ছিলেন ইবনে বাজ্জা বা আভেমপেস (মৃ. ১১৩৮)। পাশ্চাত্যে তাঁর সঙ্গীত সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রাচ্যে আল–ফারাবীর গ্রন্থের ন্যায়ই জনপ্রিয় ছিল। ইবনে রুশদ (মৃ. ১১৯৮) বিখ্যাত কমেন্টারী অন অ্যারিস্টটলস্ ডি অ্যানিমা রচনা করেন। এতে স্বর তত্ত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত বুদ্ধি–দীপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। ত্রয়োদশ শতকে বিখ্যাত সঙ্গীত তত্ত্ববিদ ইবনে সাব'ইন (মৃ. ১২৬৯) ও তাঁর সমসাময়িক আল রাকুতির রচনা দেখা যায়। শেষোক্ত ব্যক্তি খৃষ্টানদের হাতে মুর্সিয়ার পতনের পর তাদের দ্বারা কোয়াড্রিভিয়াম[১] শিক্ষাদানের জন্য নিয়োজিত হন।

ত্রয়োদশ শতকে সফিউদ্দিন আবদুল মুমিন (মৃ. ১২৯৪) কর্তৃক নতুন পদ্ধতিবাদী ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিখ্যাত *শারাফিয়্যা* ও *বুক অব মিউজিক্যাল মোড্‌স* গ্রন্থে তাঁর মতবাদসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। হাজি খলীফার মতে তিনি সঙ্গীততত্ত্ব লেখকদের মধ্যে

১. চতুর্কলা, মধ্যযুগে সাতটি 'লিবারেল আর্টসের' উচ্চতর পর্যায়ের চারটি আর্টস যথা––পাটিগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা ও সঙ্গীত। নিম্নতর পর্যায়ের অপর তিনটিকে *ট্রিভিয়াম* (ত্রিকলা) বলা হতো, যথা––ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র ও অলঙ্কার শাস্ত্র।–অনুবাদক

www.waytojannah.com

Contents

'প্রথম সারির' ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। অতঃপর যাদের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে তাদের অধিকাংশই তাঁর অনুসারী ছিলেন। শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আল মারহুম (আনু. ১৩২৯) *দি জুয়েলস অব অ্যারেঞ্জমেন্ট ইন দি নলেজ অব দি মেলডীজ* শিরোনামে কাব্যে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে কারা (মৃ. ১৩৫৮) *দি এণ্ড অব দি ইনকোয়ারী ইন টু দি নলেজ অব দি মেলডীজ এন্ড রীদম্স* নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

শাহ শূজা'র (১৩৫৯-৮৪) নামে উৎসর্গকৃত *মাউলানা মুবারকশাহ কমেন্টারী অন দি মিউজিক্যাল মোড্স* নামক গ্রন্থটি অধিকতর প্রভাব সৃষ্টি করে। এটি সফিউদ্দিন আবদুল মুমিনের মতবাদের ওপর লিখিত অসংখ্য ভাষ্যের অন্যতম। একই পৃষ্ঠপোষকের নামে উৎসর্গীকৃত অপর একটি গ্রন্থ হচ্ছে *ডিসকোর্সেস অন দি সায়েন্সেস* নামে পরিচিত একটি বিশ্বকোষ। এর একটি অংশ সঙ্গীত সংক্রান্ত। এটি সম্ভবত আল-জুরজানি (মৃ. ১৩৭৭) কর্তৃক রচিত।

আমর ইবনে খিজর আল কুর্দী (মৃ. ১৩৯৭) *দি ট্রেজার অব দি ইনকোয়ারী ইন টু দি মোড্স্ এণ্ড দি রীদমস* গ্রন্থের রচয়িতা। ইবনে আল-ফানারী (মৃ. ১৪৩০) তাঁর বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিশ্বকোষে সঙ্গীতের বিষয়ও পর্যালোচনা করেছেন। শামসুদ্দিন আল 'আজামীর (১৫ শতক) একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে *এপিস্ল্ অন দি সায়েন্স অব দি মেলডীজ*। আল-লাজিক্বী (মৃ. ১৪৪৫) *দি ফাতহিয়্যা* নামে পরিচিত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেন। হাজি খলীফা এই লেখককে সফিউদ্দিন আবদুল মুমিন ও আবদুল কাদির ইবনে গাইবির সমতুল্য মনে করেন। পদ্ধতিবাদী ধারার প্রতিষ্ঠাতার রচনাসমূহের পর সর্বশেষ এবং সম্ভবত সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ রচনা হচ্ছে অজ্ঞাত পরিচয় লেখকের *মুহম্মদ ইবনে মুরাদ টিটিজ*[১] (আনু. ১৪২১-৫১)। এটি বর্তমানে বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

আরব তাত্ত্বিকদের মূল্য

কোয়াড্রিভিয়াম-এ দক্ষ হওয়ার দরুন অধিকাংশ আরব তাত্ত্বিকই অঙ্কশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন। গ্রীক রচনাসমূহ তাদের জন্য সঙ্গীতের যে কাল্পনিক মতবাদ ও স্বরের যে বাস্তব ভিত্তি তুলে ধরেন তার অনুকরণে এদের অনেকেই নিজস্ব পন্থায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। এটিই হচ্ছে তাদের রচনার অন্যতম চমকপ্রদ দিক। তাদের একাধিক বার আমরা এরূপ বলতে দেখেছি যে, তারা অমুক অমুক মতবাদকে বাস্তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন যে, তার মধ্যে ভুলত্রুটি রয়েছে। সফিউদ্দিন কর্তৃক আল-ফারাবী ও ইবনে সিনার সংজ্ঞাসমূহের সমালোচনা এ ধরনের অনুসন্ধিৎসার মনোভাব প্রতিভাত করে। পূর্বসূরিরা যতো বিখ্যাত ব্যক্তিই হোন তাদের বক্তব্য নির্ভুল না হলে তিনি সবিনায় তা মেনে নেবেন না।

---

১. এটি সুলতান মুহাম্মদ ইবনে মুরাদের নামে উৎসর্গিত হওয়ায় আমি এই নামে আখ্যায়িত করেছি।

www.waytojannah.com

আমরা দেখেছি যে, আল ফারাবী ও ইবনে সিনা উভয়েই গ্রীকরা যা শিক্ষা দিয়েছেন তার উন্নতি ও বিকাশ সাধন করেন। আরব জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যেভাবে টলেমী ও অন্যান্য গ্রীক লেখকের ভুলত্রুটি সংশোধন করেন তেমনিভাবে আরব সঙ্গীততত্ত্ববিদরাও গ্রীক শিক্ষকদের বক্তব্য সংশোধন করেন। আল ফারাবীর *গ্র্যাণ্ড বুক অন মিউজিক*–এর পরিচিতি গ্রীক সূত্র থেকে আমরা যা কিছু পেয়েছি তার থেকে উন্নত না হলেও সুনিশ্চিতভাবে তার সমকক্ষ। স্বরের বাস্তবভিত্তিক মতবাদের ক্ষেত্রে বিশেষত স্বরের শূন্য মণ্ডলীয় বিবরণ সংক্রান্ত প্রশ্নের ক্ষেত্রে আরবরা নিশ্চিতভাবে বেশ কিছুটা অগ্রগতি সাধন করেছেন। বস্তুত এটি খুবই সম্ভব যে, আরব তাত্ত্বিকদের রচনা যখন একটি যথাযথ 'সমালোচনা পন্থায়' *(অ্যাপারেটাস ক্রিটিকাস)* সম্পাদিত হবে তখন তাতে গ্রীক লেখকদের বহু বিতর্কিত বক্তব্যের স্বরূপ জানা যাবে।

আরব তাত্ত্বিকরা স্বরের পরিমাপসহ বাদ্যযন্ত্রসমূহের যে সতর্ক বর্ণনা প্রদান করেছেন তাতে আমরা তাদের ব্যবহৃত সঠিক স্বরলিপি জানতে পারি। আমরা আল কিন্দী, আল–ফারাবী, আল খারিযমী ও ইখওয়ানুস–সাফা কর্তৃক বর্ণিত বীণা, প্যাণ্ডোর, হার্প ও বায়ুচালিত বাদ্যযন্ত্রসমূহ সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হই। ইউরোপে এ ধরনের কোন প্রচেষ্টার শত শত বছর আগে তারা এগুলির সূক্ষ্ম বিবরণ প্রদান করেছেন। তাঁরা যালযালের 'নিউট্রাল থার্ড' $\left(\frac{২৭}{২২}\right)$ ও 'পারস্য থার্ড' $\left(\frac{৮১}{৬৮}\right)$ সম্পর্কে যে পরীক্ষা–নিরীক্ষা চালান তাতে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, তারা কেবল গ্রীক সুর পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট ছিলেন না।

সফিউদ্দিন প্রবর্তিত পদ্ধতিবাদী ধারা সম্পর্কে স্যার হুবার্ট প্যারী বলেন যে, এটি "এ যাবত উদ্ভাবিত স্বরলিপিসমূহের মধ্যে সব চাইতে পূর্ণাঙ্গ।" হেলম হল্ট্স বলেন, "সুরের মধ্যে প্রধান স্বর হিসাবে তাদের স্বরলিপির 'ম্যাজির সেভেন্থ্' ব্যবহার একটি নতুন ধারণার সৃষ্টি করেছে। এতে সুরের স্তর বিকশিত হয়, এমন কি সম্পূর্ণরূপে একস্বর বিশিষ্ট সঙ্গীতেও তার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়।"

আরব সঙ্গীতের উত্তরাধিকার

সঙ্গীত জগতে আরবরা যে অবদান রেখে গেছেন তার সারবত্তা উপেক্ষা করার উপায় নেই। আমরা প্রাচ্যের যেকোন দিকেই তাকাই সেখানেই আরবদের ব্যবহারিক শিল্পের প্রভাব দেখতে পাই। এরূপ প্রচুর লিখিত প্রমাণ রয়েছে যে, তাদের দ্বারা পারস্য, তুরস্ক ও অন্যান্য এলাকার তাত্ত্বিকরা প্রভাবিত হয়েছে। পারস্যে আবদুল মুমিনের (১২শ শতক) *গ্ল্যাডনেস অব দি সোল*, ফখর উদ্দিন আল–রাযীর (মৃ. ১২০৯) *অ্যাসেম্বলিং অব দি সায়েন্সেস*, আল আমুলীর (১৪শ শতক) *প্রেশাস সায়েন্সেস* এবং আবদুল কাদির ইবনে গাইবীর (মৃ. ১৪৩৫) *অ্যাসেম্বলিং অব দি মেলডীজ* ও অন্যান্য রচনায় আরবদের

www.waytojannah.com

উত্তরাধিকার সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। তুরস্কে আল-ফারাবী, সফিউদ্দীন ও আবদুল কাদিরের রচনাসমূহ তুর্কী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আবদুল কাদিরের পুত্র আবদুল আজিজ ও জনৈক পৌত্র উসমানীয় সুলতানদের চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁরা যেসব গ্রন্থ রচনা করেছেন তাতে আরব ওস্তাদের ওপর তাদের নির্ভরশীলতা প্রমাণিত হয়। খিজর ইবনে আবদুল্লাহ এবং আহমদ উগলু শুকরুল্লাহর (১৫শ শতক) রচনায়ও তাই দেখা যায়। এমন কি ভারতেও আমরা আরবী গ্রন্থসমূহের অনুবাদ দেখতে পাই।

আরব সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগের ফলে পশ্চিম ইউরোপ যেভাবে উপকৃত হয়েছে তা আরো ব্যাপক। ইউরোপ দুটি পন্থায় আরব উত্তরাধিকার লাভ করে। ১. *রাজনৈতিক যোগাযোগ*, হস্তান্তর ও মৌখিক ভাষার মাধ্যমে ব্যবহারিক শিল্পের উত্তরাধিকার লাভ, এবং ২. *সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চামূলক যোগাযোগ*, আরবী থেকে অনুবাদ এবং স্পেন ও অন্যত্র মুসলিম শিক্ষা কেন্দ্রসমূহে অধ্যয়নকারী পণ্ডিতদের মৌখিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে তাত্ত্বিক শিল্পের উত্তরাধিকার লাভ।

মধ্যযুগে সঙ্গীত তত্ত্ব সম্পর্কে পর্যাপ্ত পরিমাণে আরবী রচনা থাকা সত্ত্বেও ল্যাটিন বা হিব্রু অনুবাদের মাধ্যমে আমরা তার অতি সামান্যই পেয়েছি। গ্রীক রচনার মধ্যে জোহানেস হিসপালেনসিস্ (মৃ. ১১৭৫) অনূদিত অ্যারিস্টটলের *ডি অ্যানিমা* এবং গ্যালেনের *ডি ভসের* ত্রয়োদশ শতকের একটি পাণ্ডুলিপি আরবী থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত। আরবদের রচনার মধ্যে আল-ফারাবীর দুটি বিশ্বকোষ জোহানেস হিসপালেনসিস্ ও *জিরার্ড অব ক্রিমোনা* (মৃ. ১১৮৭) কর্তৃক যথাক্রমে *ডি সায়েন্টিস* ও *ডি অটু সায়েন্টিয়ারাম* শিরোনামে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। জোহানেস হিসপালেনসিস অনূদিত ক*মপেণ্ডিয়াম অব অ্যারিস্টটল্স ডি অ্যানিমার* মাধ্যমে ইবনে সিনাও ল্যাটিন ভাষায় পরিচিত। আঁদ্রিয়াস আলপাগাস (মৃ. ১৫২০) কর্তৃক এটি পুনরায় অনূদিত হয়। তিনি *ডি ডিভিশন সায়েন্টিয়ারাম* শিরোনামে ইবনে সিনার বিশ্বকোষও ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল ইবনে রুশদের (মৃ. ১১৯৮) *গ্রেট কমেন্টারী অন অ্যারিস্টটল্স ডি অ্যানিমা*। মাইকেল স্কট (মৃ. ১২৩২) এটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন।

আরবী থেকে বহু হিব্রু অনুবাদও পশ্চিম ইউরোপে পরিচিত হয়। আমরা ইসাইয়া বেন আইজাক অনূদিত *কমেন্টারী অন দি ক্যানন* গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত। অতএব ইউক্লিডের *সেকশন অব দি ক্যানন*ও স্পষ্টত আরবী থকে হিব্রু ভাষায় অনূদিত হয়। মোসেস ইবনে তিব্বন (মৃ. ১২৮৩) *প্রোব্লেমাটা* অনুবাদ করেন। ভ্যাটিক্যানেও আব্রাহাম ইবনে হাইয়া (মৃ. ১১৩৬) কর্তৃক আরবী থেকে অনূদিত একটি সঙ্গীত গ্রন্থ পাওয়া যায়। আবুস সাল্ত উমাইয়ার *ট্রিটিজ অন মিউজিক* গ্রন্থটিও সম্ভবত হিব্রু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আল-ফারাবীর *গ্র্যাণ্ড বুক অন মিউজিক*-এর পরিচিতি ইবনে আকনিন (১১৬০-১২২৬) কর্তৃক প্রশংসিত হয়। টর্টোসার শেম-তোব আইজাক (মৃ. আনু. ১২৬৭) ইবনে রুশদের *মিড্ল*

www.waytojannah.com

কমেন্টারী অন অ্যারিস্টটল্‌স ডি অ্যানিমা অনুবাদ করেন। কালোনিমাস বেন কালোনিমাস (মৃ. আনু. ১৩২৮) আল–ফারাবীর *ক্লাসিফিকেশন অব দি সায়েন্সেস* অনুবাদ করেন।

সাহিত্যভিত্তিক যোগাযোগের মাধ্যমে সঙ্গীতে আরব উত্তরাধিকারের প্রমাণ প্রথম দৃষ্টিতে কনস্ট্যান্টাইন দি আফ্রিকানের (মৃ. ১০৮৭) রচনায় দেখা যায়। তিনি ছিলেন ল্যাটিন ভাষায় প্রাথমিক আরবী অনুবাদকদের অন্যতম। তিনি তাঁর *ডি হিউম্যানা নেচারা* ও *ডি মর্বোরাম কগ্‌নিশন* গ্রন্থে গ্রহের প্রভাব এবং সঙ্গীতের নিরাময়মূলক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আরব মতবাদসমূহ প্রবর্তন করেন। ইবনে সিনার একটি প্রবাদবাক্য ছিল '*ইন্টার অমনিয়া এক্সারসিটিয়া স্যানিটাটিস ক্যান্টারে মিলিয়াস এস্ট*।'

গুণ্ডিসাল ভাসের (সমৃদ্ধিকাল ১১৩০–৫০) *ডি ডিভিশন ফিলোসফিয়া* গ্রন্থে সঙ্গীত বিষয়ক একটি অংশ ছিল। এই অংশটি তিনি আল–ফারাবীর *ডি সায়েন্টিস* ও ডি অর্টুসায়েন্টিয়ারাম থেকে সম্ভবত স্বয়ং অনুবাদ করে উদ্ধৃত করেছেন। অ্যারিস্টটলের ছদ্ম নামে প্রচলিত *ডি মিউজিকা* এবং ভিন্সেন্ট ডি বুভাইসের (মৃ. ১২৬৪) *স্পেকুলাম ডকট্রিনেল* গ্রন্থ দুটিতেও একই সূত্র থেকে ধার করা হয়েছে। শেষোক্ত গ্রন্থে বোইথিয়াস, সেভিলের ইসিডোর এবং আরেযযোর গিডোর সঙ্গে আল–ফারাবীর উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। জোহানেস এজিডিয়াসের (আনু. ১২৭০) *আর্স মিউজিকার* একটি সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায় যে, এরও সূত্র ছিল আল ফারাবী। এই স্পেনীয় তাত্ত্বিক কনস্ট্যান্টাইন দি আফ্রিকানের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। রবার্ট কিল ওয়ার্ডবি (মৃ. ১২৭৯), রাইমুণ্ডো লাল (মৃ. ১৩১৫), সিমন টানস্টেড (সমৃদ্ধিকাল ১৩০০–৬৯) এবং অ্যাডাম ডি ফুল্ডা (আনু. ১৪৯০) প্রভৃতির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

রজার বেকন (মৃ. ১২৮০) ওপাস টের্টিয়ামের সঙ্গীতাংশে টলেমী ও ইউক্লিডের সঙ্গে আল–ফারাবীরও উদ্ধৃতি প্রদান করেন। তিনি বিশেষ করে *ডি সায়েন্টিসের* উল্লেখ করেন। সঙ্গীতের নিরাময়মূলক দিক সম্পর্কে তিনি ইবনে সিনারও উদ্ধৃতি দেন।

নিম্নোক্ত গ্রন্থকারগণও ইবনে সিনার কাছ থেকে ধার করেছেন; ওয়াল্টার অডিংটন (আনু. ১২৮০) তাঁর *ডি স্পেকুলেশন মিউজিসেস* গ্রন্থে এবং এঞ্জেল বার্ট (মৃ. ১৩৩১) তাঁর *ডি মিউজিকা* গ্রন্থে। মোরাভিয়ার জেরোম (১৩শ শতক) তাঁর *ডি মিউজিকার* একটি অধ্যায়ে আল–ফারাবী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং অন্য একটি অধ্যায় বোইথিয়াস, ইসিডোর, সেন্ট ভিক্টরের হিউগো, আরেযযোর গিওডো ও জোহানেস গার্লেণ্ডিয়ার পাশাপাশি আল–ফারাবীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। জর্জ ভ্যাল্লার *ডি এক্সপেটেণ্ডিস এট ফিউজিয়েণ্ডিস রিবাস* (১৪৯৭–১৫০১), জর্জ রাইশের *মার্গারিটা ফিলোসফিকা* (১৫০৮) এবং ক্যামেরারিয়াসের পুনঃ প্রকাশিত ডি সায়েন্টিস (১৬৩৮) থেকে দেখা যায় যে, আল–ফারাবী সপ্তদশ শতকেও পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

www.waytojannah.com

উপরে সাহিত্যের মাধ্যমে যোগাযোগের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তার অবদান তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। যে আরব মতবাদ মৌখিকভাবে প্রচারিত হয় তার গুরুত্ব বরং অনেক বেশি ছিল। ইবনে হিজারী (মৃ. ১১৯৪) বলেন, স্পেনে উমাইয়া শাসনামলে (৮ম থেকে ১১ শতক) "যে কর্ডোভা জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহান ভাণ্ডার ছিল সেখানে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিশ্বের সকল এলাকা থেকে জ্ঞানার্থীদের সমাবেশ হতো।" এখানে কোয়াড্রিভিয়ামের অন্যতম দিক সঙ্গীত তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হতো, তাই ল্যাটিন অনুবাদের মধ্যস্থতা ছাড়া ইউরোপীয় শিক্ষার্থীরা সরাসরি আরব জ্ঞানভাণ্ডার থেকে সঙ্গীত বিষয়ক জ্ঞান সঞ্চয়েরও সুযোগ পায়। মোযারেবরা (স্পেনে মুসলিম শাসনাধীনে বসবাসকারী খৃষ্টান) সম্ভবত আরবী ভাষায় কথা বলতেন। তাই আরব বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। আমরা জানি যে, রজার বেকন যখন অক্সফোর্ডে আরবীর ভুল ল্যাটিন অনুবাদ ব্যবহার করে স্পেনীয় ছাত্রদের মধ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন ছাত্ররা তাকে উপহাস করেন, কারণ তারা তাঁর কর্তৃত্ব *অ্যাব ওরিজিনী*[১] জানতেন। এটি মোটেই বিস্ময়কর নয় যে, এই *অলৌকিক পণ্ডিত (ডক্টর মিরাবিলিস)* তাঁর পূর্বসূরি বাথ-এর অ্যাডিলার্ডের (দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগ) ন্যায় তাঁর পাঠক ও শ্রোতাদের আরব চিন্তাধারার পক্ষে ইউরোপীয় চিন্তাধারা পরিহারের উপদেশ দিতেন। ইউরোপীয় তাত্ত্বিকরা কেবল মার্টিয়ানাস কাপেল্লা, বোয়েথিয়াস, ক্যাসিওডোরাস এবং ইসিওডোরের মাধ্যমে গ্রীক মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হন, অথচ আরবরা অ্যারিস্টটল, অ্যারিস্টজেনাস, ইউক্লিড, নিকোমেচাস, টলেমী ও অন্যান্য গ্রীক মনীষীর রচনার অধিকারী ছিলেন। অতএব একথা সুস্পষ্ট যে, আরবী ভাষার সঙ্গীত সংক্রান্ত উৎকৃষ্ট রচনাবলী ল্যাটিন ভাষায় থাকুক আর না থাকুক, আসল কথা হচ্ছে যে, আরবরা সঙ্গীততত্ত্বের চর্চা করেছেন এবং তার ফলে আমরা উপকৃত হয়েছি।

আরবরা সোলফেজিয়োর[২] ক্ষেত্রে ইউরোপকে প্রভাবিত করলেও একটি বর্ণমালা-ভিত্তিক স্বরলিপির কথা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না। বাদ্যযন্ত্রের স্বরলিপির (ট্যাবেলেচার) ক্ষেত্রে আরবদের অবদান অনেক সুস্পষ্ট। প্রাথমিক ল্যাটিন রচনায় এ বিষয়টিকে প্রকাশ্যভাবে স্বীকৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, আমরা *আর্স ডি পালসেশন ল্যামবুটি*-এর অধিকারী। রূপান্তরমূলক (ডায়াস্টিমেটিক) স্বরলিপির ক্ষেত্রে মুসলিম প্রাচ্যে ১২০০ খৃষ্টাব্দের দিকে এর প্রথম প্রয়োগ দেখা যায়।

ইউরোপের জন্য আরবদের সম্ভবত সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে পরিমাপমূলক (মেনসিউর‍্যাল) সঙ্গীত। কলোনের ফ্রাঙ্কেবার (আনু. ১১৯০?) আগে *ক্যান্টাস*

---

১. মূলত ল্যাটিন ; অর্থ শুরু থেকে।-অনুবাদক।

২. বাঁধাগৎ স্বরগ্রাম সাধা : যেমন সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি ; পাশ্চাত্য স্বরগ্রাম ঃ ডু-রে-মি-ফি সোল-লা-টি। -অনুবাদক

www.waytojannah.com

মেনসিউরাবিলিস বা পরিমাপ করা গান অজ্ঞাত ছিল। ইকা' (বহুবচন *ইকা'আত*) বা ছন্দ নামে এটি সপ্তম শতক থেকে আরবীয় সঙ্গীতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। আমরা আল–কিন্দীর (মৃ. আনু. ৮৭৪) একটি রচনায় এর বর্ননা পাই। ফ্রাঙ্কো ও তাঁর প্রবর্তিত ধারায় আমরা স্বরলিপির পরিমাপমূলক ব্যবস্থা ছাড়াও একটি ছান্দিক রীতি দেখতে পাই এবং এগুলি মূলত আরবদের কাছ থেকেই নেওয়া হয়েছে। ল্যাটিন গ্রন্থ *ডি মেনসিউরিস এট ডিসক্যান্টোতে,* (আনু ১২৭৩–৮০) আমরা *এলমুয়াহিম* ও *এল মুয়ারিফা* প্রভৃতি নামে বিশেষ বিশেষ ধরনের স্বরলিপির উল্লেখ দেখতে পাই। এগুলি মূলত আরবী থেকে উদ্ভুত। অপরদিকে জোহানেস ডি মুরিসের (১৪শ শতক) রচনায় *আলেনটেড* নামে একটি কৌশলের উল্লেখ রয়েছে। এই শব্দটিও মূলত আরবী। মধ্যযুগীয় যে *হকেট* শব্দটিকে রবার্ট ডি হ্যান্ডলো (আনু. ১৩২৬) স্বরলিপি ও যতির সংমিশ্রণ' বলে উল্লেখ করেছেন তা আরবী *ইকা'আত* শব্দ থেকে উদ্ভুত। তেমনি ইবনে সিনার *ক্যাননে* ল্যাটিন *আলহাশ* শব্দটি আরবী *আল ইশক*।

ব্যবহারিক শিল্পকলা

ভবঘুরে শিল্পী শ্রেণীর দরুনই আরবদের ব্যবহারিক শিল্পকলা প্রসার লাভ করে। এসব চারণ মধ্যযুগে সঙ্গীতের সত্যিকারের প্রচারক ছিলেন। পাশ্চাত্য গায়কদের জাঁকালো পোশাক, লম্বা চুল ও চিত্রিত চেহারার পিছনে সম্ভবত প্রাচ্যের প্রভাব ছিল। হবি–হর্স[১] (খেলনা ঘোড়া) ও ঘন্টা শোভিত মরিস[২] নৃত্য শিল্পীরা অবধারিতভাবে আরব চারণ শিল্পীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এমন কি থয়নট আরবিউর (১৫৮৯) সময় পর্যন্ত এসব মরিস নৃত্যশিল্পী মূরদের অনুকরণে নানারঙে তাদের চোহারা রঞ্জিত করতো। খেলনা ঘোড়ার বাস্ক[৩] নাম *যামালযাইন* সোজাসুজি আরবী *যামিল আল–যাইন*–এর (উৎসবের ঘোড়া অশ্ব) প্রতিধ্বনি। স্পেনীয় শব্দ *মাসকারা* ইংরেজী *মাসকার* (নাট্যাভিনেতা) শব্দের ন্যায় আরবী মাসখারা (ভাঁড়) শব্দ থেকে উদ্ভুত। আইবেরীয় উপদ্বীপে *যাম্বরা, যারাবান্দা, হুদা, মারিস্কা* ইত্যাদি বহু শব্দ রয়েছে যা সুস্পষ্টভাবে মূলত আরবী।

আরবদের উন্নততর সংস্কৃতি অবধারিতভাবে পশ্চিম ইউরোপে প্রতিফলিত হয়। আমরা দেখতে পেয়েছি যে, নবম শতকে স্পেনীয়রা মিল ও ছন্দের ক্ষেত্রে আরবদের অনুকরণ করছে, এমনকি দশম শতকে ইহুদীরাও এতদ্বারা প্রভাবিত হয়। স্পষ্টত কবিতার সঙ্গে যে

১. খেলনা ঘোড়া; *মরিস* নৃত্যের সময় খেলনা ঘোড়া এমনভাবে কোমর পর্যন্ত যুক্ত করা হতো যাতে মনে হতো যে, নৃত্য শিল্পী ঘোড়ায় চড়ে ছুটেছে।–অনুবাদক

২. একটি প্রাচীন লোকনৃত্যের নাম যা এক সময় ইংল্যাণ্ডে, বিশেষত মে দিবসে সাধারণ ব্যাপার ছিল। এতে রঙ বেরঙের পোশাক পরা হতো।–অনুবাদক

৩. পশ্চিত পিরেনিজ অঞ্চলে, বিশেষত উত্তর স্পেনে বসবাসকারী উপজাতি ও তাদের ভাষা।–অনুবাদক।

www.waytojannah.com

Contents

সঙ্গীত ছিল তাও তারা অনুকরণ করে, কারণ এই দুটি পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। আমরা খৃষ্টান স্পেনের *জাগলারদের* (ভেলকিবাজ) মধ্যে আরব ও ইহুদীদের দেখতে পাই। দ্বাদশ শতকে বার্সেলোনার কাউন্টরা যখন প্রভেন্সের শাসক ছিলেন তখন ট্রুবাডুর (সম্ভবত আরবী *তাররাব* 'চারণ' শব্দ থেকে উদ্ভূত) ও *জংলার*[১] আরব *আমীর* ও তার *মুঘান্নীর* ভূমিকা পুনরাভিনয় করতো।

বাদ্যযন্ত্রে ও যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে পশ্চিম ইউরোপে মুসলিম উত্তরাধিকার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সাধারণভাবে স্বীকার করা হয় যে, বেশ কিছু সংখ্যক বাদ্যযন্ত্রের নাম, এমনকি প্রকৃত আকার আরবদেরই অবদান। *লিউট, রেবেক, গিটার* ও *নাকের* শব্দগুলির মূল আরবী যথাক্রমে আল-উদ-রাবাব, কিতারা ও নাককারা—এ কথা বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত সত্য।

ইউরোপে বাদ্যযন্ত্রের বিদেশী নাম প্রবর্তিত হয়ে থাকলেও নতুন আকার প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সেসব নাম সবসময় অব্যাহত থাকেনি। সম্ভবত রাজনৈতিক চাপই এর কারণ। সুস্পষ্টভাবে বহু নতুন ধরনের আরব বাদ্যযন্ত্র প্রবর্তিত হয় এবং তখনকার ইউরোপীয় সঙ্গীত জগতে এগুলি উল্লেখযোগ্য ছিল। প্রথমত তার যুক্ত বীণা, প্যাণ্ডোর ও গিটার শ্রেণীর সর্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। এর পরে আসে বেহালা জাতীয় বিভিন্ন ধরনের বক্রাকৃতির বাদ্যযন্ত্র। এজাতীয় প্রাথমিক বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সেন্ট মেডার্ড এভাঞ্জেল (৮ম শতক) এবং লথের ও লাবিও নট্‌কার সল্টার্সের (৯ম-১০ম শতক) প্রমাণ পাওয়া যায়।

এসব বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধারও সৃষ্টি হয়। আরবদের সঙ্গে যোগাযোগের আগে তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ইউরোপীয় চারণ শিল্পীদের কেবল সিথারা[২] ও হার্প ছিল। কেবল কানে শুনেই তারা এগুলি বাজাতেন। আরবরা ইউরোপে তাদের লিউট, প্যাণ্ডোর ও গিটার আমদানির সঙ্গে সঙ্গে ফ্রেট[৩]-এর (আরবী-*ফারিদা, ফারদ* তুলনীয়) সাহায্যে ফিঙ্গার বোর্ডে স্বরলিপির নির্ধারিত স্থানসমূহও আমদানি করেন। এসব স্থান পরিমাপের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। এটি বিশেষভাবে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। বস্তুত আরব লিউটের এই ফ্রেটিংয়ের (জালি ব্যবস্থা) মাধ্যমেই ইউরোপে প্রধান রীতি প্রবর্তিত হয়।

অবশ্য আরবদের সঙ্গে যোগাযোগের সবচাইতে বৃহত্তম অবদান ছিল পরিমাপমূলক সঙ্গীত। সঙ্গীত তত্ত্ববিদরা এটি লক্ষ্য ও পর্যালোচনা করার বহু আগে চারণশিল্পীরা তা প্রচার

১. মধ্যযুগীয় ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের ভবঘুরে চারণ কবি যারা আবৃত্তি ও গান করে অন্যদের মনোরঞ্জন করতো। –অনুবাদক

২. বীণা জাতীয় প্রাচীন ইউরোপের বাদ্যযন্ত্র, জিথারের প্রাচীনরূপ। –অনুবাদক

৩. সচ্ছিদ্র বা জালির কাজ ; অঙ্গুলি চালনা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যাঞ্জো, গিটার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ফিঙ্গার বোর্ডের উপর স্থাপিত উঁচু পৃষ্ঠদেশ। –অনুবাদক

www.waytojannah.com

১-২ বুক ৩. নাক্কারা ৪. তাবল ৫. কাঁসা

চিত্র-৯১. চতুর্দশ শতাব্দীর মিসরীয় সামরিক বাদ্যযন্ত্র (বোস্টনের ললিতকলা জাদুঘরে রক্ষিত আল জাজারীর একখানি পাণ্ডুলিপি হতে সংগৃহীত)

www.waytojannah.com

করেন। দ্বিতীয়ত অন্যান্য শিল্পকলায় অ্যারাবেস্ক–এর প্রতিরূপ মেলডি 'সুশোভিত করণও' অবদানের সৃষ্টি করে। *তারকিব* বা যৌগিক নামে পরিচিত সুশোভনের এই রীতিতে চতুর্থ, পঞ্চম বা অষ্টকে যুগপৎভাবে স্বরাঘাত সৃষ্টি করা হয় এবং সম্ভবত এর মাধ্যমেই ইউরোপ সর্বপ্রথম হার্মনির পথে এগিয়ে যায়। আরো লক্ষণীয় যে, মধ্যযুগীয় সঙ্গীত রচনার অন্যতম পদ্ধতি *কণ্ডাক্টাস* শব্দটি আরবী *মাজরা* শব্দের অনুরূপ। স্পেনীয় ওস্তাদরা আরব লিউটের বিকাশ সাধন করতে গিয়েই *মিউজিকা ফিকটা* উদ্ভাবন করেন।

মঙ্গোলদের কাছে বাগদাদের পতন (১২৫৮), খৃস্টানদের গ্র্যানাডা অধিকার (১৪৯২) এবং তুর্কীদের কাছে খৃস্টানদের আত্মসমর্পণের (১৫১৭) ফলে আরবী ভাষাভাষীদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্যের অবসান হয়। দৃশ্যত শিল্প ও রাজনীতির মধ্যে ব্যবধান দুস্তর হলেও সত্যিকার ব্যাপার হচ্ছে এ দুটি পারস্পরিক ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। এই ক্ষেত্রটি ছাড়া সর্বশেষে উল্লেখিত তারিখের বহু আগে থেকেই ইউরোপ বিশ্বসংস্কৃতিতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে।

আরব ও মুসলিম মেলডিসমূহ প্রবর্তন এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীতের যন্ত্রীকরণে 'প্রাচ্যের' প্রভাব সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে প্রচেষ্টা চালানো হয়। উনবিংশ শতকে রুবিনস্টাইন, ফেলিসিয়েন ডেভিড ও সেন্ট সাইন্স এ ক্ষেত্রে পরীক্ষা–নিরীক্ষা চালান। পরবর্তীকালের সঙ্গীত রচয়িতারা ও এ ব্যাপারে নানা প্রকার প্রচেষ্টা চালান। তাদের এসব প্রচেষ্টা পর্যালোচনা করা হলে উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যাবে, কিন্তু এই নিবন্ধে সেই পর্যালোচনা হবে অত্যন্ত দীর্ঘ ও জটিলতাপূর্ণ। *ইসলাম সঙ্গীত চর্চার অনুমতি দেয় না।*– সম্পাদক

এইচ জি ফার্মার

www.waytojannah.com

জ্যোতির্বিদ্যা ও অংকশাস্ত্র

গ্রীকদের মধ্যে আমরা যে ধরনের শক্তিশালী প্রতিভা, বৈজ্ঞানিক কল্পনাশক্তি, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও চিন্তার মৌলিকত্ব দেখতে পাই তেমনটি আরবদের মধ্যেও পাওয়া যাবে বলে আমাদের আশা করা উচিত নয়। আরবরা হচ্ছে অন্য সবার আগে গ্রীকদের শিষ্য। তাদের বিজ্ঞান গ্রীক বিজ্ঞানের একটি অব্যাহত ধারা। তারা গ্রীক বিজ্ঞান সংরক্ষণ করেন, চর্চা করেন এবং কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এর বিকাশ ও পূর্ণতা সাধন করেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শিক্ষা, ভাষা জ্ঞান, দীর্ঘ জীবন, দেশ ভ্রমণ এবং বইপুস্তক ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহে যথেষ্ট সক্ষমতা অর্জন প্রভৃতি যাবতীয় দিক বিবেচনা করে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আরব বিজ্ঞানী আল-বিরুনী বলেছেন, আমাদের যুগে কোন ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে এসব সুযোগ-সুবিধা কদাচিৎ দেখা যায়। এ কারণেই প্রাচীনরা যা করেছেন তার মধ্যে আমাদের কর্মতৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এবং যতোটা পূর্ণতা সাধন করা যায় ততোটা পূর্ণতা সাধন করতে হবে। সবকিছুতে মধ্যপন্থাই হচ্ছে সবচাইতে প্রশংসনীয় পন্থা। যিনি মাত্রাতিরিক্ত কিছু করার চেষ্টা করেন তিনি নিজের এবং নিজের বিষয় সম্পত্তির ধ্বংস সাধন করেন।

অবশ্য আল-বিরুনী এখানে অত্যন্ত বিনয় প্রকাশ করেছেন। কারণ এই সিমাবদ্ধ আকাঙ্ক্ষা নিয়েও আরবরা প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরাট অবদান সৃষ্টি করেছেন। নিজেরা আবিষ্কার না করলেও তারা সংখ্যা চিহ্ন প্রবর্তন ও শিক্ষাদান করেন এবং এর মাধ্যমে প্রাত্যহিক পাটিগণিত প্রতিষ্ঠার গৌরব অর্জন করেন। তারা বীজ গণিতকে একটি সঠিক বিজ্ঞানে রূপায়িত করেন, এর উল্লেখযোগ্য বিকাশ সাধন করেন এবং বিশ্লেষণমূলক জ্যামিতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তারা অবিসংবাদিতভাবে সমতলীয় (প্লেন) ও মণ্ডলীয় (স্ফেরিক্যাল) ত্রিকোণমিতির প্রতিষ্ঠাতা। সত্যিকারভাবে বলতে গেলে গ্রীকদের মধ্যে এর অস্তিত্ব ছিল না। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তারা কয়েকটি মূল্যবান পর্যবেক্ষণ কার্য চালান। তারা এমন কয়েকটি গ্রীক রচনার অনুবাদক আমাদের জন্য সংরক্ষণ করেন যেগুলির মূল গ্রন্থ বিলুপ্ত হয়েছে। এগুলি হচ্ছে অ্যাপোলোনিয়াসের 'কনিক্স' সংক্রান্ত তিনটি গ্রন্থ, মিনিলসের *স্ফেরিক্স*, আলেকজান্দ্রিয়ার হিরোর *মেকানিক্স*, বাইযেন্টিয়ামের ফিলোর *নিউম্যাটিক্স*, ভারসাম্য সম্পর্কে ইউক্লিডের বলে কথিত একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ এবং আর্কিমিডিসের রচনা বলে পরিচিত *ক্লেপসিড্রা* (জলঘড়ি) সংক্রান্ত অপর একটি গ্রন্থ। অবশ্য এগুলির জন্য তাদের কাছে আমরা খুব বেশি কৃতজ্ঞ হতে পারি না। আরব বিজ্ঞান পাশ্চাত্যে যে প্রভাব সৃষ্টি

www.waytojannah.com

করেছে সেজন্য আমরা এর প্রতি আগ্রহশীল না হয়ে পারি না। আরবরা এমন এক যুগে উচ্চতর জ্ঞান সাধনামূলক জীবন ও বিজ্ঞান চর্চা সমুন্নত রাখেন যখন খৃষ্টান পাশ্চাত্য বর্বরতার অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিল। নবম ও দশম শতকে তাদের কর্মতৎপরতার চূড়ান্ত বিকাশ সাধিত হলেও পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। দ্বাদশ শতকে বিজ্ঞান ও জ্ঞান সাধনার প্রতি যাদের এতটুকু আগ্রহ ছিল তারা প্রত্যেকে প্রাচ্যের অথবা মুরীয় পাশ্চাত্যের শরণাপন্ন হন। আরবরা যেমন ইতিপূর্বে গ্রীক রচনা অনুবাদ করতেন তেমনি এযুগে তাদের রচনারও অনুবাদ শুরু হয়। এমনিভাবে আরবরা প্রাচীন সংস্কৃতি ও আধুনিক সভ্যতার মধ্যে একটি ঐক্যের বন্ধন ও সম্পর্ক সূত্র প্রতিষ্ঠা করেন। রেনেসাঁর যুগে জ্ঞানের অন্বেষা আর একবার মানুষের কর্মপ্রেরণাকে উদ্বেলিত করে। তাদের মধ্যে প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটে। এতে দ্রুত কার্যসম্পাদনের এবং উৎপাদনের ও উদ্ভাবনের যে পরিবেশ ও অবস্থার সৃষ্টি হয় তার কারণ হচ্ছে, আরবরা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে সংরক্ষিত ও বিকশিত করেন, গবেষণার স্পৃহাকে প্রাণবন্ত ও উজ্জীবিত রাখেন এবং ভবিষ্যতে আবিষ্কারের জন্য এটিকে নমনীয় ও উপযোগী করে তোলেন।

বিস্তারিত আলোচনার আগে একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। বিজ্ঞানের ইতিহাসে 'আরব' ও 'মুসলিম' শব্দ দুটিকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে বিবেচনা করতে হবে। যেসব জ্ঞানীগুণী মুসলিম বিশ্বে এবং মুসলমান রাজা-বাদশাহের পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞান সাধনায় দক্ষতা প্রদর্শন করেন তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ জন্মগতভাবে আরব ছিলেন না। তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক মুসলমানও ছিলেন না। গ্রীক সভ্যতার শেষের দিকে জ্ঞান-সাধনার যে কেন্দ্র মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায় ছিল তা আরব জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বাধিক সমৃদ্ধির যুগে এমন সব এলাকায় স্থানান্তরিত হয় যা বর্তমানে বহু দূরে এবং আধুনিক সভ্যতার পশ্চাদপর বলে মনে হয়। এসব এলাকা ছিল পূর্ব পারস্য (খোরাসান), অক্সাস উপত্যকার অপর প্রান্তে খাওয়ারিযম, তুর্কিস্তান এবং ব্যাকট্রিয়া।[১] দৃষ্টান্তস্বরূপ আল খাওয়ারিযমী খিবার অধিবাসী, আল-ফরগানী ট্রান্সক্সানিয়ার, আবুল ওয়াফা ও আল-বাত্তানী আল-বিরুনীর ন্যায় পারস্যের এবং আল-কিন্দী মূল আরবের অধিবাসী ছিলেন। ফারাবী ছিলেন মূলত তুর্কী, ইবনে সিনার জন্মস্থান ছিল বলখের কাছাকাছি। আল-গাযযালী ও নাসিরুদ্দিন পূর্ব পারস্যের তুস নগরীর অধিবাসী ছিলেন। ওমর খৈয়াম আরবীতে তার *আলজাবরা* রচনা করলেও আমাদের যুগে পারস্য ভাষার কবি হিসাবে সর্বাধিক খ্যাত। এসব পণ্ডিতের মধ্যে কয়েকজন উভয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। ইবনে সিনা 'আলার নামে উৎসর্গীকৃত দর্শন' (দি ফিলসফি ডেডিকেটেড টু 'আলা') শিরোনামে পারস্য ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এটি সম্ভবত পদার্থ বিদ্যার জন্য অত্যন্ত

---

১. *বলখ* নামে পরিচিত আধুনিক আফগানিস্তানের উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি প্রাচীন দেশ।—অনুবাদক

www.waytojannah.com

গুরুত্বপূর্ণ। নাসিরুদ্দিন আল তুসী একই ভাষায় নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে অত্যন্ত সুন্দর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। পারস্য ভাষায় জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কেও তিনি একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন। ইবনে রুশদ, আল-যারকালী এবং আল-বিত্‌রুজী স্পেনের অধিবাসী আরব ছিলেন।

ধর্মের ক্ষেত্রে হুনাইন ইবনে ইসহাক, তার পুত্র ইসহাক, কুসতা ইবনে লুকা প্রমুখ বড় বড় অনুবাদক খৃষ্টান ছিলেন। বিখ্যাত জ্যামিতিক সাবিত ইবনে কাররা এবং প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী আল-বাত্তিনী (আলবাতে গনিয়াস) সাবিয়ান সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। পৌত্তলিকতাবাদী এই সম্প্রদায় নক্ষত্রের পূজা করতেন। তাঁরা বিজ্ঞান চর্চা করতেন এবং মুসলমানদের শাসনাধীন দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখেন। মাশাআল্লাহ প্রমুখ কতিপয় পণ্ডিত ইহুদী ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, রেনেসাঁর যুগে ইহুদীরা তাদের অনুবাদের মাধ্যমে বিরাট অবদান সৃষ্টি করেন। ল্যাটিন পাশ্চাত্যের আরব জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারেও তারা অবদান রাখেন।

জন্মগত ও সম্প্রদায়গত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এসব পণ্ডিত ব্যক্তির মধ্যে কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল প্রতিটি ব্যাপার সহজ ও সুললিত করা। সাধারণ বা সামগ্রিকভাবে কোন কিছু সৃষ্টির মতো যথেষ্ট প্রতিভার অধিকারী না হলেও সুষ্ঠু বিন্যাসের ক্ষেত্রে তারা অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন। তাদের এই বিন্যাস ছিল যুক্তিভিত্তিক। তাদের শ্রেণী বিন্যাসে ও সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশে এমন এক নিয়ম-শৃংখলা ও সাবলীলতার সৃষ্টি হয় যার মাধ্যমে তাঁরা অগ্রগতি সাধন করেন। তাঁদের আচরণ ছিল উপদেশাত্মক। তাঁরা গ্রীকদের ন্যায় কোন শৌখিন ব্যক্তিকে কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞানে আগ্রহী কোন মিসিনাসকে[১] উদ্দেশ্য না করে বরং নিজেদের উদ্দেশ্যেই জ্ঞান-সাধনা করতেন। তাদের লক্ষ্য ছিল সকল বুদ্ধিমান শিক্ষার্থী। তাদের গ্রন্থ মাধ্যমিক বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকৃষ্ট পাঠ্য-পুস্তকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আরবরা ছিলেন ব্যবসায়ী, পর্যটক এবং আইনবিদ। তাদের মনোভাব ছিল সুনির্দিষ্ট। অতএব, তাদের বিজ্ঞানেরও লক্ষ্য ছিল ব্যবহারিক। পাটিগণিতকে তারা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে এবং ভূসম্পত্তি বাটোয়ারায় কাজে লাগাতো। জ্যোতির্বিজ্ঞানকে পর্যটকদের এবং যারা মরুভূমি পার হতো তাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হতো। নামাযের সময় নির্ধারণ, মক্কার দিক নির্ণয়, রমযানের চাঁদের প্রথম আবির্ভাব নিরূপণ প্রভৃতি ধর্মীয় প্রয়োজনেও জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা করা হয়।

আরবরা সব সময় বাস্তববাদী। স্বপ্নের জগতে কখনো তারা নিজেদের হারিয়ে ফেলেন না। তদুপরি আরবী ভাষা নিরস ও যথাযথ এবং তা ফ্রান্সের ভল্টেয়ারের স্টাইল স্মরণ করিয়ে দেয়। এই ভাষা বাগ্মীতা ও কাব্যিক বিবরণের চাইতে সঠিক ও যথাযথ

১. পুরা নাম গাইয়াস সিলনিয়াস মিসিনাস, ৭০?-৮ খৃ. পূ. রোমা রাষ্ট্রনীতিক ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ; হোরেস ও ভার্জিলের বন্ধু ; শিল্প-সাহিত্যের যেকোন উদার পৃষ্ঠপোষককে এই নামে অভিহিত করা হয়।-অনুবাদক

www.waytojannah.com

বিজ্ঞানের জন্য অধিকতর উপযোগী। এই ভাষায় তাৎক্ষণিকভাবে পরিভাষা সৃষ্টির বিরাট সুযোগ রয়েছে। আরব মনীষীরা ভারতীয়দের ন্যায় পদ্যে গ্রন্থ রচনা করেননি। ভারতীয়রা শ্লোকের মাধ্যমে তাদের *অ্যালজেবরা* রচনা করেন। আরবরা গ্রীকদের ন্যায় ঐতিহাসিক সমস্যাবলী তুলে ধরেননি। বিশাল সংখ্যা এবং সুবিস্তীর্ণ সময় নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাননি। আমরা তাদের মধ্যে হিন্দুদের ন্যায় কোন *কল্প যোগ* কিংবা *ব্রহ্ম যুগ* অথবা অত্যন্ত বিরাট সংখ্যার কোন নাম দেখতে পাই না। তারা গ্রীকদের চাইতেও অধিক সুনির্দিষ্ট। গ্রীকরা বিশাল বিশাল সংখ্যার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। *আরিনারিয়াস* থেকে এবং আর্কিমিডিসের গো-সমস্যা ও সামোসের আরিস্টার্কাসের 'বিশাল বর্ষ' থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

২

উমাইয়াদের আমলের কোন গ্রন্থ আমরা পাইনি। রেকর্ডপত্রের মাধ্যমে আরব জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস কেবলমাত্র আব্বাসীয়দের আমল থেকেই শুরু হয়।[১] এই বংশের দ্বিতীয় খলীফা আল-মনসুরের আমলে মুসলিম সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল বাইযেন্টাইন অংশ থেকে পারস্য অংশ স্থানান্তর করা হয় ঃ আল-মনসুর ৭৬২ খৃষ্টাব্দে বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। তার দরবারে বেশ কিছুসংখ্যক জ্ঞানী, প্রকৌশলী ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীর সমাবেশ ঘটে। প্রখ্যাত মন্ত্রী খালিদ ইবনে বারমাক, পারস্যবাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী নওবখ্ত এবং ইহুদী মাশাআল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নগরীর পরিকল্পনা করা হয়। ৭৭০ খৃষ্টাব্দে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইয়াকুব আল-ফাযারী মান্কা নামক জনৈক ভারতীয়কে আল-মনসুরের দরবারে হাজির করেন। মান্কা জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে হিন্দুরীতি অনুযায়ী রচিত গ্রন্থ *সিন্দহিন্দ* (সিদ্ধান্ত) পেশ করেন। ছোট আল-ফাযারী এই গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। কিন্তু এই অনুবাদ বর্তমানে পাওয়া যায় না। আল-ফাযারী ছিলেন অ্যাস্ট্রলের তৈরিকারী প্রথম মুসলমান। তিনি গোলাকার মণ্ডলের (আর্মিলিয়ারী স্ফিয়ার) ব্যবহার সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন এবং আরবদের বর্ষ অনুযায়ী বিভিন্ন তালিকা প্রস্তুত করেন। একই সময়ে গ্রীক রচনার অনুবাদ শুরু হয়। আবূ ইয়াহিয়া ইবনে বাতরিক চিকিৎসাবিষয়ক রচনা ছাড়াও টলেমীর *কোয়াড্রিপার্টিটাম* অনুবাদ করেন। মাশাআল্লাহ (মৃ. ৮১৫) একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। তিনি জ্যোতিঃশাস্ত্র, অ্যাস্ট্রলেব ও বায়ুবিজ্ঞান সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন। তার দ্রব্যমূল্য সম্পর্কিত রচনা *ডি মার্সিবাস* আরবী ভাষার প্রাচীনতম বিজ্ঞান গ্রন্থ। মধ্যযুগে

---

১. আরবদের বিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কে বিশেষ করে সাম্প্রতিক কালে বহু কিছু লেখা হয়েছে। এ জন্য সুদীর্ঘ গ্রন্থ তালিকার প্রয়োজন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে গিউথ্নার কর্তৃক প্রকাশিত *লেস পেনসিউস ডি এল, ইসলাম* নামক আমার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এরূপ একটি গ্রন্থ তালিকা পাওয়া যাবে। এই প্রসঙ্গে ইরলানজেনের অধ্যাপক ই ওয়াইড ম্যানের বিখ্যাত গ্রন্থটির কথাও উল্লেখযোগ্য। আরো তুলনীয় এইচ সূটার, *ডাই ম্যাথমেটিকার আন্ড অ্যাস্ট্রনমেন ডের অ্যারাবের আণ্ড ইবরে ওয়ারকে*, লিপযিগ, ১৯০০।

www.waytojannah.com

জোহানেস ডি লুনা হিসপালেনসিস তাঁর কতিপয় গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। ওয়াযির ইয়াহিয়া বার্মিকীর বন্ধু ওমর ইবনে ফাররুখান (মৃ. ৮১৫) বাগদাদের অন্যতম প্রকৌশলী ও স্থপতি ছিলেন। তিনি পারস্য ভাষার কয়েকটি গ্রন্থ অনুবাদ করেন এবং টলেমীর *কোয়াড্রিপার্টিটামের* টীকা রচনা করেন।

আল-মনসুরের আমলে সূচিত এই আন্দোলন তার পৌত্র আল-মামুনের আমলে আরো জোরদার হয়। আল-মামুন স্বয়ং একজন জ্ঞানী, পণ্ডিত, দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন। তিনি প্রাচীনদের রচনার সন্ধান করে সেগুলি অনুবাদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ অতঃপর ইউক্লিড ও আল মাজেস্ট[১] আরবীতে অনুবাদ করেন। হারুনুর রশিদের রাজত্বকালে তার কর্মতৎপরতা শুরু হয়। ইউক্লিডের প্রথম ছয়টি গ্রন্থ তার অনুবাদের অন্তর্ভুক্ত। আল -মামুন গ্রীকদের চাইতে ভিন্ন পদ্ধতিতে সিনজার প্রান্তরে সিরিডিয়ানের (মধ্যরেখা) একটি ডিগ্রী পরিমাপ করান, নির্দিষ্ট একটি স্থান থেকে কিছু সংখ্যক পর্যবেক্ষক উত্তর দিকে এবং কিছু সংখ্যক দক্ষিণ দিকে রওয়ানা হয়ে এক জায়গায় গিয়ে দেখতে পান যে, ধ্রুব নক্ষত্র এক ডিগ্রীতে উদিত ও অস্তমিত হচ্ছে। এরপর তারা অতিক্রান্ত দূরত্ব পরিমাপ করে দুটির গড় বের করেন। কিন্তু বাস্তবে এই গড় গ্রহণ না করে তারা দুটি মানের বৃহত্তরটি প্রবর্তন করেন। এটি ছিল বেশ বিরাট। বিশাল বৃত্তের জন্য এর পরিমাণ ছিল ৪৭.৩২৫ কিলোমিটারের অনুরূপ ৫৬$\frac{২}{৩}$ মাইল। একই সময়ে বাগদাদ এবং জুন্দিশাপুরে পর্যবেক্ষণ কার্য চালান হয়। বাগদাদে শাম্মাসিয়া তোরণের কাছে একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। সিন্দ বিন আলী নামক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত জনৈক ইহুদী এটি নির্মাণ করেন। এসব পর্যবেক্ষণ থেকেই *সিন্দহিন্দ* প্রক্রিয়ায় 'পরীক্ষিত তালিকা' বা 'আল-মামুনের তালিকা' নামে পরিচিত তালিকাসমূহ প্রস্তুত করা হয়। এ সময়কার অন্যতম জ্যোতির্বিদ ছিলেন মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্যে পরিচিত আল-ফারগানি (আল ফ্রেগানাস)। তিনি ট্রান্সঅক্সানিয়ার ফারগানার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর বহুল প্রশংসিত জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত রচনা *কম্পেন্ডিয়াম* ক্রিমোনার জিরার্ড ও জোহানেস হিসপালেনসিস কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। রিজিওমনটেনাস রেনেসাঁর যুগে এটি পর্যালোচনা করেন এবং তারই ভিত্তিতে বিখ্যাত জার্মান ধর্মতত্ত্ববিদ মেলাঙ্কথন ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে নূরেমবার্গে এর একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাশাপাশি পাটিগণিত এবং বীজগণিতেরও বিকাশ ঘটে। এটি ছিল বিশ্ববিখ্যাত আল-খওয়ারিযমীর (অর্থাৎ খওয়ারিযমের অধিবাসী ; মৃ. ৮৩৫ থেকে ৮৪৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) যুগ। পাশ্চাত্যের ল্যাটিন লেখকদের হাতে তাঁর নামটি বিকৃত হয় এবং

১. আরবী *আল মাজিসতি*, অর্থ বৃহত্তম রচনা ; আনু ১৫০ খৃষ্টাব্দে ক্লডিয়াস টলেমী কর্তৃক সঙ্কলিত জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোল সংক্রান্ত বিরাট রচনা। মধ্যযুগীয় যে কোন বিরাট রচনা। –অনুবাদক

www.waytojannah.com

Contents

এই বিকৃতি থেকেই 'আলগরিজম' (কখনো কখনো 'আলগরিদম') কথাটির উদ্ভব হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একখানি রচনা ছাড়াও তিনি ভারতীয় *(হিন্দী)* গণন পদ্ধতির ওপর একটি এবং বীজগণিতের ওপর অপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথমটি বাথের অ্যাডেলার্ড কর্তৃক এবং অপর দুটি ক্রিমোনার জিরার্ড কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। এসব ল্যাটিন অনুবাদ থেকেই তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পাটিগণিত বিষয়ক গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়।

আল খওয়ারিযমীর *অ্যালজেবরা*[১] অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সুবিন্যস্ত। দ্বিঘাত সমীকরণের বিষয় আলোচনার পর লেখক গুণ ও ভাগ সম্পর্কে আলোচনা করেন। এরপর তিনি সমতলের পরিমাপ সম্পর্কিত সমস্যাদি এবং সম্পত্তির বাটোয়ারা ও অন্যান্য আইনগত প্রশ্ন পর্যালোচনা করেন। শেষোক্ত বিষয়গুলি সাধারণত প্রথম মাত্রার সমীকরণের সমস্যা। আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত জটিল মনে হলেও এগুলিকে সংখ্যাভিত্তিক উদাহরণ রূপে তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিঘাত সমীকরণে পৌঁছার পদ্ধতিটিই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ।

লেখক ডায়োফেন্টাসের অনুসরণে ছয়টি বিষয়কে আলাদা করেন। এর মধ্যে কেবল সম্পূর্ণতার খাতিরে একটির অবতারণা করা হয়। কারণ এটি প্রথম মাত্রার সহজতম সমস্যা,অর্থাৎ $bx=c$ এরই অনুরূপ। এই ছয়টি বিষয় হচ্ছে ঃ বর্গসমূহ মূলের সমান, $ax^2=bx$; বর্গসমূহ সংখ্যার সমান $ax^2=c$; মূলসমূহ স্যখ্যার সমান, $bx=c$; বর্গ ও মূলসমূহ সংখ্যার সমান, $ax^2+bx=c$; বর্গ ও সংখ্যাসমূহ মূলের সমান, $ax^2+c=bx$; মূল ও সংখ্যাসমূহ বর্গের সমান, $bx+c=ax^2$; এই তালিকা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, এ সময়কার বিজ্ঞান তখনো চিহ্নের ব্যবহার পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পরেনি। কারণ সমান চিহ্নের উভয় পাশের সংখ্যাসূচকের বিভিন্ন অবস্থান দেখে মনে হয় এগুলির আরো সমাধান প্রয়োজন। একটি সমীকরণের দুদিকের পরস্পরমুখিতাকে আরবরা *মুকাবেলা* নামে অভিহিত করে যার অর্থ পরস্পর বিরোধিতা বা তুলনা। তারা এই শব্দটিকে সাধারণত *জবর* শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত করতো, যার অর্থ 'রেস্টিটিউশন' (পুনরুদ্ধার, ক্ষতিপূরণ)। জবর (*আল জব্‌র,* আল জেবরা) হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যাকে অপর সংখ্যার সমান করার জন্য এর সঙ্গে অন্য কিছু যোগ বা গুণ করা। এই শব্দটির দ্বারা মূলত বীজগণিতের দুটি সহজতম প্রক্রিয়া $a+x=b$ এবং $ax=b$ বোঝানো হতো বলে মনে হয়।

পরবর্তীকালে এর প্রয়োগ সম্প্রসারিত হয় এবং এত দ্বারা সমগ্র বিষয়টি বোঝানো হতো। আরো দেখা যায় যে, এর বিপরীত শব্দ হচ্ছে *হাত্* 'অবরোহণ', যার অর্থ কোন সংখ্যাকে অপর একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার সমান করার জন্য বিয়োগ বা ভাগ করা।

---

১. ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে এফ রোজেন লণ্ডন থেকে ইংরেজী পরিচিতি ও অনুবাদসহ এটি সম্পাদনা করেন।

www.waytojannah.com

Contents

$$a - x = b \; ; \; \frac{a}{x} = b$$

আল খওয়ারিযমী এমনিভাবে ছয়টি সম্ভাব্য বিষয় বিশ্লেষণের পর এগুলি সমাধানের নিয়ম উদ্ভাবন করেন। এগুলি বর্ণমালার সাহায্যে প্রকাশ করতে হয়, কারণ বীজগণিতের প্রতীক চিহ্ন (নোটেশন) তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। এরপর তিনি এই নিয়মগুলি প্রমাণ করেন। এই প্রমাণ জ্যামিতিক, কারণ আরবরা প্রধানত জ্যামিতিবিশারদ ছিলেন। তারা তখনো জ্যামিতি ছাড়া স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি বীজগণিতের অস্তিত্বের ধারণা লাভ করেননি। পরিস্থিতির বিভিন্নতার দরুন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে এই প্রমাণের পুনরাবৃত্তি হলেও এটি বেশ চমৎকার ঃ নিচে সংক্ষিপ্ত উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে।

যে সমস্যাটির সমাধান করা হবে ঃ একটি বর্গ ও ১০টি মূল ৩৯ দিরহামের সমান। এমন একটি বর্গ ধরা যাক যার পার্শ্বটির মান অজ্ঞাত ; এই বর্গটিরই মূল বের করতে হবে; ধরা যাক এই বর্গটি হচ্ছে AB ; যদি আমরা এর বাহুটিকে একটি সংখ্যা দ্বারা গুণ করি তাহলে তার গুণফল হবে সেই সংখ্যক মূল যা আমরা বর্গের সঙ্গে যোগ করতে চাই। এখানে আমাদের দশটি মূল যোগ করতে হবে; সুতরাং দশের এক–চতুর্থাংশ ২.৫ নেয়া যাক এবং বর্গ ক্ষেত্রের প্রত্যেক পাশে ৪টি সামন্তরিক CGKT অঙ্কন করা যাক ; এই বর্গ ও আয়তক্ষেত্রগুলির মান হবে ৩৯। কিন্তু কোণের মধ্যেকার ছোট বর্গক্ষেত্রগুলির প্রত্যেকটি ২.৫×২.৫ বা ৬.২৫, অর্থাৎ সবশুদ্ধ ২৫টি। তাহলে বড় বর্গক্ষেত্রটির পুরোটার মান হবে ৩৯+২৫ বা ৬৪। অতএব, এর পার্শ্ব হচ্ছে ৮। এবারে আমরা যদি কোণের ছোট বর্গক্ষেত্রগুলির বাহুর দিগুণ, অর্থাৎ ২.৫×২ বা ৫ বিয়োগ করি তাহলে বাকি থাকবে ৩, আর এটিই হচ্ছে আমাদের বাঞ্ছিত বর্গের মূল।

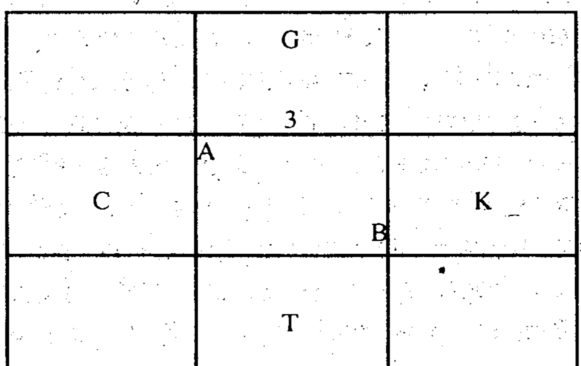

প্রশ্ন উঠতে পারে এর মধ্যে ভারতীয় ও আরবদের পদ্ধতির পার্থক্য কোথায়? এম রডেটের মতে ভারতীয়রা আরবদের চাইতে অধিক বিশ্লেষণমূলক ছিলেন, কিন্তু নিখুঁত

www.waytojannah.com

Contents

জ্যামিতি চর্চায় আরবদের সমকক্ষ ছিলেন না। ডবল চিহ্ন সম্পর্কেও ভারতীয়দের ধারণা ছিল। তারা সমীকরণের একপাশ থেকে আরেক পাশে একটি সংখ্যাকে সহজতরভাবে স্থানান্তর করতে পারতেন এবং এমনিভাবে এর সাধারণ প্রচলনের সূত্রপাত হয় কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, বর্ণনার ক্ষেত্রে তাদের ভাষা, জাঁকজমক ও পদ্ম রীতি আরবদের মতো পরিচ্ছন্ন, নিখুঁত ও বৈজ্ঞানিক সহজ–সরলতাপূর্ণ ছিল না।[১]

আল–খওয়ারিযমীর আলোচিত একটি ক্ষেত্রে ডবল চিহ্নের ধারণা দানা বাঁধতে শুরু করে বলে মনে হয়। এটি হচ্ছে ৫ নং প্রসঙ্গ ঃ $ax^2+c=bx$. তিনি বলেন, 'এ ক্ষেত্রে যোগ এবং বিয়োগ একই রকম চমৎকারভাবে প্রয়োগ করা যায়।' ষোড়শ শতক পর্যন্ত দ্বি–মাত্রিক সমীকরণের ধারণা আরব বীজগণিতজ্ঞদের ধারণার অনুরূপই ছিল। অষ্টাদশ শতকে বিখ্যাত বীজগণিতজ্ঞ পিসার লিওনার্দো পিবনাক্কি বলেন যে, তিনি আরবদের কাছে বিরাটভাবে ঋণী। তিনি মিসর, সিরিয়া, গ্রীক ও সিসিলি ভ্রমণ করে আরবীয় পদ্ধতি আয়ত্ত করেন এবং এই পদ্ধতিকে 'পিথাগোরাসের পদ্ধতির চাইতেও উন্নত' বলে স্বীকার করেন। তিনি পনের অনুচ্ছেদে একটি *লিবার অ্যাবাসাই* (গণনা পুস্তক) রচনা করেন। এর সর্বশেষ অধ্যায়ে বীজগাণিতিক গণনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পিসার লিওনার্দো দ্বিঘাত সমীকরণের ছয়টি বিষয়কে আল খওয়ারিযমী যেভাবে বর্ণনা করেছেন অবিকল সেভাবে বর্ণনা করেন। ১৫৪৫ খৃস্টাব্দে কার্ডান কর্তৃক তাঁর *আর্স ম্যাগনা* গ্রন্থে বর্ণিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ঋণাত্মক ও কাল্পনিক মূলসমূহের ধারণার কোন সুস্পষ্ট রূপ পাওয়া যায়নি।

আল খওয়ারিযমীর অন্য একটি রচনা *ডি নিউমারো ইণ্ডিকো*[২] গ্রন্থে সংখ্যার উৎস সম্পর্কে বহুল আলোচিত প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে। আরব পণ্ডিত যাকে ভারতীয় *(হিন্দী)* গণনা পদ্ধতি বলে অভিহিত করেন তা হচ্ছে সংখ্যাভিত্তিক গণনা। অথচ আমরা তৎকালে প্রাচ্যে সাধারণভাবে বর্ণমালাভিত্তিক যে গণনা প্রচলিত ছিল তার বিপরীতে এটিকে আরব গণনা পদ্ধতি বলে থাকি। এই *হিন্দী* কথা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, আরবরা সংখ্যা আবিষ্কারের দাবি করেননি কিন্তু এ থেকে আমাদের দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছা উচিত হবে না যে, ভারতেই সংখ্যার উদ্ভব হয়েছে। কারণ আমি লক্ষ্য করেছি যে, আরবী হস্তলিপিতে *হিন্দী* শব্দের সঙ্গে *হিন্দাসি* শব্দের সহজেই গোলমাল সৃষ্টি হয়। শেষোক্ত শব্দটি দ্বারা জ্যামিতি বা প্রকৌশলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় বোঝায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেখানে *হিন্দী* শব্দটির ব্যবহার দেখা যায় সেখানে *হিন্দাসি* শব্দটির প্রয়োগই প্রকৃষ্টতর মনে হয়। যেমন জ্যোতির্বিজ্ঞানে থাকে পর্যায়ক্রমিক (গ্রাজুয়েটেড) বৃত্ত বলা হয় তাকে হিন্দী বলা হয়েছে। অথচ এর অনুবাদ হওয়া উচিত ছিল সম্ভবত 'গাণিতিক বৃত্ত'। তাই সংখ্যাকে যা বলা হয়েছে তার

---

১. বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সৃষ্টিতে আরবীর অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যই সম্ভবত এর কারণ।–অনুবাদক

২. ল্যাটিন অনুবাদ প্রিন্স বন্‌কম্‌পাগনী কর্তৃক ট্রাট্টাটি ডি. *অ্যারিটমেটিকা সিরিজে* সম্পাদিত হয়, রোম, ১৮৫৭, নং ১।

www.waytojannah.com

অর্থ নিছক 'গাণিতিক চিহ্নও' হতে পারে। অপর পক্ষে পারস্যবাসীরা সংখ্যাকে বলতেন 'প্রান্তের চিত্র' (ফিগার্স অব এণ্ড)। তাদের ভাষায় এর অর্থ 'ক্ষুদ্র বা স্বল্প পরিমাপের চিহ্ন'। উপকী চেয়েছিলেন সংস্কৃত ভাষায় সংখ্যার নামের আদ্যাক্ষর থেকে সংখ্যার গঠন বের করবেন। কিন্তু এ ধরনের যোগসূত্র আদৌ সুস্পষ্ট নয়। তাছাড়া যে পাটিগণিত ব্যবস্থায় অক্ষর ব্যবহার করা হতো তা ব্যবহৃত সংখ্যার আদ্যাক্ষর ছিল না বরং তা ছিল ধারাবাহিকভাবে ব্যবহৃত বর্ণ। গ্রীক ও আরব উভয়ের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। দশম শতকে বিখ্যাত আরব পণ্ডিত আল–বিরুনী বলেছিলেন যে, 'অতি সুন্দর ভারতীয় রেখা চিত্র' থেকে সংখ্যার উদ্ভব হয়, কিন্তু এর সঠিক গঠন কি ছিল কিংবা ভারতের কোন্ এলাকায় তা প্রচলিত ছিল সে সম্পর্কে তিনি কিছু বলেননি। অপরদিকে স্পষ্টত দেখা যায় যে, অন্য যে কোন এলাকার চাইতে আরবদের মধ্যেই সংখ্যার রূপ ছিল সহজ–সরল। তাই এটিই হবে সংখ্যার মূলরূপ। প্রথম পাঁচটি সংখ্যা ১, ২, ৩, ৪, ৫ আঁচড়ের দৃঢ়বদ্ধ রূপ। অবশিষ্ট চারটি অত্যন্ত সহজভাবে উদ্ভাবিত বলে মনে হয়। শূন্য একটি ছোট বৃত্ত বা হিন্দু। খুব সম্ভব আরবরা তাদের অন্যান্য অনেক বিজ্ঞানের ন্যায় এসব চিহ্নও নিও–প্লাটোনিক ধারা থেকে লাভ করে।

আমরা জানি সংখ্যা বিজ্ঞানে শূন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সংখ্যাগুলির শক্তি বাস্তবে অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও শূন্য সেগুলিকে একক, দশক, সহস্র ইত্যাদিতে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। শূন্য না থাকলে আমাদেরকে স্তম্ভাকারে সাজানো একক শ্রেণী, দশক শ্রেণী, শতক শ্রেণী ইত্যাদি তালিকার (টেবল) মাধ্যমে প্রতিটি সংখ্যার মান প্রকাশ করতে হতো। এই তালিকাই 'অ্যাবাকাস' নামে পরিচিত। আমরা দেখতে পাই যে, শূন্য পাশ্চাত্যের কাছে পরিচিত হওয়ার অন্তত আড়াইশ' বছর আগে আরবদের কাছে পরিচিত ছিল। পঞ্চম শতকে রোমে বোইথিয়াস কর্তৃক সর্বপ্রথম অ্যাবাকাসের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু এ সময় এর ব্যবহার সম্প্রসারিত হয়নি। দশম শতকে গার্বার্ট পুনরায় এটি প্রচলিত করেন। গার্বার্ট মূরদের বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য স্পেন সফর করেন। সেখান থেকেই তিনি অ্যাবাকাসের ব্যবহার প্রসারিত করেন। কিন্তু তিনি শূন্যের ধারণার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। খৃষ্টান পাটিগণিতবিদগণ কেবল দ্বাদশ শতকেই স্তম্ভাকার শ্রেণী ছাড়া শূন্যের সাহায্যে সংখ্যা গণনা পদ্ধতির ওপর বই লিখতে শুরু করেন। এই পদ্ধতিকে আল–গরিদ্‌ম (আলগরিজ্‌ম, আল খওয়ারিযমী) বলা হতো। কিন্তু আরবদের মধ্যে প্রথম থেকেই শূন্যসহ সংখ্যার প্রচলন হয়। দশম শতকে সংখ্যা যখন সাধারণভাবে প্রচলিত হয়নি তখন 'বিজ্ঞানের চাবি, *মাফাতিহুল উলুম'* গ্রন্থের লেখক বলেন যে, যেখানে দশের শক্তি উপস্থিত থাকে না সেখানে 'শ্রেণী বজায় রাখার জন্য' ছোট্ট একটি বৃত্ত ব্যবহার করা হয়। এই ছোট্ট বৃত্তকে বলা হয় *সিফর*, 'শূন্য'। কেউ কেউ *তারকিন* নামে পরিচিত একটি ছোট্ট রেখা ব্যবহার করতেন। নাবাতিয়ান ভাষার *রিক্যন* থেকে কথাটির উদ্ভব হয়, এবং এর অর্থও শূন্য, 'খালি'।

www.waytojannah.com

Contents

উল্লেখযোগ্য যে, ল্যাটিন *সিফরা* শব্দের দুটি অর্থ রয়েছে ঃ একটি অর্থ শূন্য এবং অন্য অর্থ সাংকেতিক চিহ্ন। শূন্য অর্থে এটি স্পষ্টত আরবী *সিফর* খালি এবং সংখ্যা অর্থে এত দ্বারা লিখিত কোন কিছু, যেমন বই কিংবা রেখা চিত্র বোঝায়। অ্যালজেবরা, সাইফার, আল গরিদম প্রভৃতি শব্দের অস্তিত্ব গণনা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা ও প্রচারে আরব অবদানের স্বাক্ষর বহন করেছে।

৩

আল–মামুনের উত্তরাধিকারীদের বিশেষ করে প্রখ্যাত খলীফা মু'তাদিদের আমলে কয়েকজন বিখ্যাত আরব পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়। তাঁরা আরব জ্ঞান–বিজ্ঞানের আলোক বর্তিকা আরো প্রোজ্জ্বল করেন এবং অনেকেই মধ্যযুগে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এ সময় জ্যামিতি চর্চার অগ্রগতি সাধিত হয় এবং জ্যামিতির কণিক শাখা (শঙ্কু গণিত) সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ শুরু করে। বনু মূসা নামে পরিচিত তিনভাই এ সময়ে সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাদের পিতার নাম ছিল শাকির। জনৈক জীবনীকারের মতে তিনি যৌবনে একজন দস্যু ছিলেন এবং খোরাসানের রাস্তায় রাহাজানি করতেন। তিনি পরে খলীফা আল–মামুনের অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে ওঠেন এবং তাঁর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। এই তিন ভাই কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। সমতল ও স্ফেরিক্যাল সারফেস সম্পর্কে লিখিত তাদের একটি গ্রন্থ *লিবার টিয়াম ফ্র্যাটরাম* শিরোনামে ক্রিমোনার জিরার্ড কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। তাদের যন্ত্র বিজ্ঞান সম্পর্কিত একটি রচনা ভ্যাটিকানে সংরক্ষিত আছে। এতে প্রধানত যন্ত্র বিজ্ঞানের মূলনীতি সম্পর্কে কিংবা প্রায় একই সময়ে কুস্তা বিন লুকা কর্তৃক আরবী ভাষায় অনূদিত হিরোর অনুরূপ গ্রন্থের ন্যায় সাধারণ যন্ত্রপাতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি; এটি বরং হিরো ও ফিলোর *নিউম্যাটিক্সের* (বায়ুবিজ্ঞান) অনুরূপ। এতে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র (অটোম্যাটা) এবং অত্যন্ত সুকৌশলে তৈরি বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতির বর্ণনা রয়েছে। পরবর্তী সময়ে এই শ্রেণীর অপর একটি আরবী গ্রন্থ রচনা করেন বদিউজ্জামান আল– জাযারী। অতি সুন্দর ছোট ছোট ছবিসহ এর একটি পাণ্ডুলিপি কনস্ট্যান্টিনোপলে সংরক্ষিত রয়েছে। আরবরা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় ক্লেপসিডরা নামে পরিচিত জলঘড়ি নির্মাণে অত্যন্ত সুদক্ষ ছিলেন। স্মরণযোগ্য যে, হারুনুর রশীদ এ ধরনের একটি পানিঘড়ি শার্লেমনকে উপহার হিসাবে পাঠান।

৮৮৬ খৃস্টাব্দে একশ বছর বয়সে খোরাসানের বলখের অধিবাসী আবু মাশার ইন্তিকাল করেন। তিনি একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও জ্যোতিঃশাস্ত্রবিদ ছিলেন। *ডি. কনজাংকশনিবাস এট অ্যানোরাম রিভল্যুশনিবাসসহ* তাঁর চারটি রচনা জোহানেস হিসপ্যালেনসিস ও বাথের অ্যাডেলার্ড কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়।

মেসোপটোমিয়ার হাররানের অধিবাসী সাবিত বিন কাররাকে প্রায়ই সর্বশ্রেষ্ঠ আরব জ্যামিতিবিদ বলে মনে করা হয়। তিনি অ্যাপোলোনিয়াসের কণিক শাখার আটটি গ্রন্থের

www.waytojannah.com

মধ্যে সাতটির আরবী অনুবাদের মাধ্যমে বিজ্ঞানে বিরাট অবদান রাখেন। এর ফলে বর্তমানে বিলুপ্ত মূল তিনটি গ্রন্থ সংরক্ষিত রয়েছে। এই বিরাট দায়িত্ব পালনে বনু মূসা ভ্রাতৃত্রয় তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তারা তাকে ভাবী খলীফা মু'তাদিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন এবং তার জন্য মাসিক ৫০০ দিনার পেনশনের ব্যবস্থা করেন। সাবিত গ্রীক এবং প্রাচীন সিরীয় ভাষা জানতেন এবং এই দুটি ভাষার গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন। তিনি ইসহাক ইবনে হুনাইন কর্তৃক ইউক্লিডের *ইলিমেন্টস* ও *আলমাজেস্টের* অনুবাদ সংশোধন করেন। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যামিতি সম্পর্কে কয়েকটি ছোট ছোট পুস্তিকা বা স্মৃতিকাহিনী রচনা করেন। এতে তিনি প্রাচীন রচনাবলীর বহু বিষয় বিশ্লেষণ করেন, নতুন নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন এবং এসব রচনা পর্যালোচনার সহজ পদ্ধতি তিনি নির্দেশ করেন। তাঁর সময়ে যেসব বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচিত হতো তার প্রায় সবগুলি সম্পর্কেই তিনি আলোকপাত করেন। এসব রচনা ইউক্লিডের অনুমিতি ও অনুসিদ্ধান্ত, ইউক্লিড ও প্ল্যাটোর দৃষ্টিতে ট্রান্সভার্সাল ফিগার (ক্রিমোনার জিরার্ড কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত), যন্ত্রবিজ্ঞান, জ্যামিতিক পদ্ধতি ও অযৌক্তিক বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে অত্যন্ত প্রশংসিত ইউক্লিডের একটি পরিচিতি। সূর্য ঘড়ির কাঁটা ইত্যাদি (নোমন) ছায়া অর্থাৎ ছায়াঘড়ি (সান ডায়াল) সংক্রান্ত তার গ্রন্থটি আমাদের জানামতে এ বিষয়ে প্রাচীনতম রচনা। তাঁর ভারসাম্য বিষয়ক গ্রন্থ *লিবার ক্যারাষ্টনিস সাইড ডি স্ট্যাটেরা* ক্রিমোনার জিরার্ড কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। আরবী ভাষায় ভারসাম্য তত্ত্বের ওপর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রয়েছে ; এর মধ্যে আল-খাযিনীর গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতে ভারসমতা ও ভার সম্পর্কে অত্যন্ত উন্নত ধারণা প্রদান করা হয়েছে। বিশেষ বিশেষ ভার সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

স্পষ্টত সূর্যের উচ্চতা ও সৌরবর্ষের দৈর্ঘ নিরূপণের জন্য সাবিত বাগদাদে জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ কার্য চালান। তিনি তাঁর এই পর্যবেক্ষণ একটি গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন। তিনি মূর্তিপূজক সাবিয়ান ছিলেন এবং মূর্তি পূজার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। এই মহান পণ্ডিত মধ্যযুগে ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতির ঐতিহ্যের একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি ছিলেন।

পরবর্তী যুগে প্রাচ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানসাধক আল-বাত্তানীর আবির্ভাব ঘটে। মধ্যযুগের ও রেনেসাঁর ল্যাটিন পণ্ডিতগণ যেসব আরব মনীষীর প্রতি সর্বাধিক শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করেন তিনি তাদের অন্যতম ছিলেন। তিনি ৮৭৭ খৃ. থেকে ৯১৮ খৃ. পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর নানা প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কার্য অব্যাহত রাখেন। তিনি বিরাট একটি গ্রন্থ রচনা ছাড়াও জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য-তালিকা[১] (টেবলস)

---

১. ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে নাল্লিনো কর্তৃক আরবী ও ল্যাটিন ভাষায় সম্পাদিত। আল খওয়ারিযমীর জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থটি বাথের অ্যাডেলার্ডের সংস্করণ থেকে এইচ সুটার কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় সম্পাদিত হয় (কোপেন হেগেন,

www.waytojannah.com

সঙ্কলন করেন। এসব তথ্য তালিকায় আল-খওয়ারিযমীর ও ভারতীয় পদ্ধতিসমূহের তথ্যের উন্নতি সাধন করা হয়। নতুন চন্দ্রোদয়, ক্রান্তি বৃত্তের অবনমন (ইনক্লাইনেশন অব দি ইপলিকটিক), গ্রীষ্ম মণ্ডল (ট্রপিক) ও নাক্ষত্রিক (সাইডিরিয়্যাল) বর্ষের দৈর্ঘ, লুনার অ্যানমেলি, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ, জ্যোতিষ্কের পরিবর্তিত অবস্থান (প্যারাল্যাক্স) প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হিসাব-নিকাশ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে আল-বাত্তানী আল-খওয়ারিযমির চাইতে জটিল ও সঠিক ছিলেন। কিন্তু তাঁর সবচাইতে প্রশংসনীয় অবদান হচ্ছে, আমরা বর্তমানে যে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত (রেশিয়ো) ব্যবহার করি তার প্রাথমিক ধারণাসমূহ তিনি আবিষ্কার না করলেও জনপ্রিয় করেন। টলেমী 'কর্ড' ব্যবহার করতেন। এর হিসাব-নিকাশের জন্য তিনি অত্যন্ত বিদঘুঁটে একটি মাত্র প্রধান উপপাদ্য ব্যবহার করেন। আল-বাত্তানী কর্ডের পরিবর্তে 'সাইন' ব্যবহার করেন। তিনি ট্যানজেন্ট স্পর্শক ও কোট্যানজেন্ট ব্যবহার করেন এবং ত্রিকোণমিতির দু-তিনটি মৌলিক সম্পর্কের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সাইনকে আরবীতে *জাইব* বলা হতো, যার অর্থ 'বক্ররেখা' (ল্যাটিন ভাষায় *সাইনাস*)। বস্তুত এটিই হচ্ছে সাইন শব্দের উৎস। আরব জ্যোতির্বিদদের কাছে কোট্যানজেন্ট হচ্ছে 'নোমনের' 'সমান্তরাল ছায়া' (হরিজন্টাল শ্যাডো) এবং ট্যানজেন্ট হচ্ছে 'খাড়া ছায়া' (ভার্টিক্যাল শ্যাডো)। তারা তখনো বৃত্তের চাপ সরাসরি পরিমাপ করতে পারেননি; কিন্তু নোমনকে তারা ১২ ভাগে ভাগ করেন। আল-বাত্তানীর সমসাময়িক হাবাশ এটিকে ৬০ ভাগে ভাগ করেন। এমনিভাবে আমরা নোমনের অংশসমূহের মাধ্যমে কোট্যানজেন্টের টেবল পাই যা নিম্নোক্ত সমীকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত $\mathrm{Cot}\ \pounds \ \frac{\cos \pounds}{\sin \pounds}$ 12 কোট্যানজেন্ট থেকে শুরু করে নিম্নোক্ত ফর্মূলার মাধ্যমে সূর্যের উচ্চতা নিরূপিত হয় ঃ

$$\mathrm{Sin}\ (90\text{-}\pounds) = \frac{\mathrm{c\,lot}\ \pounds \quad .60}{\sqrt{12^2 + \cot^2 x}} 12.$$

আল-বাত্তানী এই ফর্মূলাটিও বিশ্লেষণ করেন ঃ

$$\mathrm{Sin}\ \pounds = \frac{\tan \pounds}{\sqrt{(1+\tan^2 \pounds)}} \quad \mathrm{Cos}\ \pounds = \frac{1}{\sqrt{(1+\tan^2 \pounds)}}$$

এর ফলে আমরা গ্রীকরা যে পর্যায়ে পৌঁছে তার চাইতে অনেক বহু দূরে এগিয়ে যাই এবং এতে প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বিজ্ঞান যুগের সূচনা হয়।

আল-বাত্তানীর প্রায় ৬০ বছর পরে আরেকজন প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী আবুল ওয়াফা তাঁর কাজ শুরু করেন। কয়েকজন আধুনিক বিজ্ঞানী ভেবেছিলেন যে, তাঁরা আবুল

১৯১৪)। ঐ সময় আরব জ্যোতির্বিদগণ 'আরিনের' মিরিডিয়ান থেকে দ্রাঘিমা নিরূপণ করতেন। এই নাম একটি অপভ্রংশ। প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে মধ্য ভারতের উজ্জয়িনী শহর , যেখানে ঐসময় একটি মানমন্দির ছিল। বহুকাল পরে অষ্টাদশ শতকে জয়সিংহ সেখানে মান মন্দিরটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

www.waytojannah.com

ওয়াফার *আল মাজেস্টে* তৃতীয় চান্দ্র অসমতার (লুনার ইনইকুয়েলিটি আমরা যাকে ভেরিয়েশন বা ব্যতিক্রম বলি) আবিষ্কার দেখতে পাবেন। প্রথম দুটি অসমতা ইতিপূর্বেই গ্রীকরা জানতেন। আবুল ওয়াফা সম্পর্কে প্যারিসের বিজ্ঞান একাডেমীতে সুদীর্ঘ আলোচনা চলে, যা ১৮৩৬ থেকে ১৮৭১ খৃ. পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বিখ্যাত পণ্ডিত বায়োট, অ্যারাগো, লি ভেরিয়ার ও জোসেফ বার্টর্যাণ্ড এতে অংশগ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত এটি প্রমাণিত হয়নি যে, আবুল ওয়াফা প্রকৃতপক্ষে 'ভেরিয়েশন' সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। আরব জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রথম দুটি চান্দ্র অসমতার পার্থক্য আমাদের মতো করতে পারতেন না। তারা এটি ভিন্নভাবে করতেন এবং এতে কিছুটা অনিশ্চয়তার উদ্ভব হয়।

কিন্তু ত্রিকোণমিতিতে আবুল ওয়াফার অবদান অনস্বীকার্য। তিনি ত্রিকোণমিতিকে আরো সুস্পষ্ট রূপ প্রদান করেন এবং কোণের যোগ বিষয়ক ফর্মূলা উদ্ভাবন করেন।

$$\text{Sin }(a+b)=\frac{\sin a\cos b+\sin b\cos a}{R}$$

এই সূত্রটি ঐ সময় আবিষ্কৃত হলেও ল্যাটিন বিশ্বের কাছে তা পরিচিত ছিল না এবং কোপার্নিকাসও এটি জানতেন না বলে মনে হয়। কোপার্নিকাসের শিষ্য ও গ্রন্থ সম্পাদক রীটিকাস তাঁর *ওপাস প্লাটিনাম ডি ট্র্যাঙ্গুলিস* গ্রন্থে অনেক শ্রমসাধ্য উপায়ে এটি পুনরাবিষ্কার করেন এবং তার পদ্ধতি আবুল ওয়াফার চাইতেও জটিলতর ছিল।[১] কিন্তু বিজ্ঞানে আবুল ওয়াফার অবদান এখানেই শেষ হয়নি। অত্যন্ত সুদক্ষ জ্যামিতিবিদ হিসাবে তিনি বেশ কিছু সমস্যা আলোচনা করেন। তিনি অধিবৃত্তের (প্যারাবলা) বর্গীকরণ (কোয়ডরেচার) সম্পর্কে এবং অধিবৃত্তের সমতলের পরিমাপ সম্পর্কে পরীক্ষা–নিরীক্ষা করেন। এ ছাড়া তিনি ডায়োফেন্টাসের বীজগণিত অনুবাদ করেন।

যেসব আবিষ্কার বর্তমানে আমাদের সর্বপ্রকার আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি এই দুই শতকে সেগুলির চূড়ান্ত রূপ প্রদান করা হয়। এছাড়া এ সময়ে কিছু কিছু শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব বিজ্ঞানের দর্শন এবং পদার্থ ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা চূড়ান্ত সমাধানে না গিয়ে মানসিক প্রশিক্ষণ দান করেন, ধ্যান–ধারণার দিগন্ত প্রসারিত করেন এবং ভবিষ্যত আবিষ্কারের পথ উন্মুক্ত করেন। মহাজ্ঞানী পণ্ডিতদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তিত্ব আল–কিন্দী (মৃ. ৮৭৩) আবহ বিজ্ঞান ও আলোক বিজ্ঞানের উপর গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর বৃষ্টি ও বায়ু সংক্রান্ত গ্রন্থ এবং ইউক্লিডের আলোক বিজ্ঞানের উন্নত সংস্করণ ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। আরবরা বস্তুর পতন সম্পর্কে তেমন মাথা না ঘামালেও তিনি এর সূত্র আবিষ্কারে সচেষ্ট হন। অ্যারিস্টটলের পর 'দ্বিতীয় মহাপণ্ডিত' এবং প্রাচীন দর্শন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী নিও–প্ল্যাটোনিস্ট আল–

১. আমরা আবুল ওয়াফার রচনায় ছেদকেরও (সীক্যান্ট) সন্ধান পাই, যাকে তিনি 'ছায়ার ব্যাস' (ডায়ামিটার অব দি শ্যাডো) হিসাবে উল্লেখ করেন ; এটি প্রবর্তনের জন্য সাধারণত কোপার্নিকাসকে কৃতিত্ব দেওয়া হয়।

www.waytojannah.com

Contents

ফারাবী সঙ্গীতের উপর এক অপরূপ গ্রন্থ রচনা করেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে তিনি অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেন। আল–ফারাবীর উপরোক্ত গ্রন্থে 'লগ্যারিদ্‌মসের' (সংবর্গমান) বীজ নিহিত দেখা যায়। আমরা জানি যে, অংক শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গীত শাস্ত্রের সম্পর্ক কতো গভীর। সেই পিথাগোরাসের আমলেই সঙ্গীতের তানের (কর্ড) বিভিন্ন বিরতিমূলক অংশ অষ্টক, চতুষ্টক, পঞ্চম প্রভৃতি প্রকাশের জন্য ভগ্নাংশ পর্যালোচনার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আরবদের সঙ্গীত বিষয়ক সকল তথ্যই ভগ্নাংশের সাহায্যে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে লগারিদ্‌মের ইঙ্গিত সূচিত হয়; কারণ বিরতি, ফোর্থ, স্বর, উপস্বর ইত্যাদির যোগ, যে তান (কর্ড) এগুলির সংজ্ঞা নিরূপণ করে তার গুণনের অনুরূপ এবং বিরতিসমূহের বিয়োগ এগুলির ভাগের অনুরূপ। তেমনি তারের বাদ্যযন্ত্রের সুরসমূহ ও লগারিদ্‌ম বিধির সঙ্গে যুক্ত। ইবনে সিনা ও আল–গায্‌যালী কখনো ধর্মীয় কারণে এবং কখনো পদার্থ বিজ্ঞানের প্রয়োজনে অসীম সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। একটি পশ্চাদমুখী অসীম সিরিজ কি সম্ভব? একটি সরলরেখার ওপর কি এমন একটি প্রথম বিন্দু রয়েছে যেখানে এর দিকে অগ্রসর অপর একটি সরলরেখা মিলিত হয়?—এবং পরমাণুবাদ সংক্রান্ত প্রশ্ন–একটি বর্গক্ষেত্রকে নিয়মিতভাবে পরমাণুতে বিভক্ত করলে তার বাহুর চাইতে কর্ণে কিভাবে বেশি পরমাণু থাকতে পারে? পরমাণুর সারির মধ্যে কিভাবে একটি পরমাণু অবিভাজ্য থাকতে পারে যেখানে এর উভয় পাশে সংযুক্ত রয়েছে অন্য দুটি পরমাণু? পরমাণুর দৃষ্টিকোণ থেকে কিভাবে গতি, তাপ ও আলো কল্পনা করা যায়? এগুলি ইলিয়ার যেনোর দর্শনতত্ত্বের[১] মতোই সমস্যা। 'ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস' আবিষ্কৃত হওয়ার আগে এসব প্রশ্ন মানুষের মনকে আন্দোলিত করে। অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ও অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন সমালোচক আল–বিরুনী বিভিন্ন জাতির ধারাবাহিক ইতিহাস সম্পর্কে একটি জ্ঞানদীপ্ত গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি দীর্ঘকাল ভারত সফর করেন এবং ভারতীয়দের পাটিগণিত, তাদের দাবা খেলার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং গাণিতিক ভূগোলের (প্রোজেকশন, অ্যাজিমাথ) বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেন। ত্রিকোণমিতির উৎকর্ষ সাধনেও তিনি অবদান রেখে যান।

এখন আমরা এমন এক পণ্ডিতের প্রসঙ্গ আলোচনা করবো পাঠকদের কাছে যার কোন পরিচিতির প্রয়োজন নেই; কারণ খুব কম লেখকই তাঁর মতো এতো সুনামের অধিকারী ছিলেন। তিনি হচ্ছেন কবি ও গাণিতিক বিখ্যাত ওমর খৈয়াম (ওমর ইবনে ইব্রাহিম আল–খৈয়ামী, মৃ. ১১২৩)। সাহিত্যের ন্যায় জ্যামিতিতেও তিনি অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং এক্ষেত্রে তাঁর শাণিত যুক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তাঁর *অ্যালজেবরা*[২] একটি

---

১. খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতকে গ্রীক দার্শনিক 'যেনো' ইটালীতে অবস্থিত প্রাচীন গ্রীক উপনিবেশ 'ইলিয়ায়' যে দর্শন চর্চা করতেন তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো "একক ও অপরিবর্তনীয় 'সত্তাই' হচ্ছে একমাত্র বাস্তব এবং বহুত্ব, পরিবর্তন ও গতি কেবলমাত্র মিথ্যা ও বিভ্রম।"– অনুবাদক।

২. প্যারিস থেকে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এফ উপকী কর্তৃক ফরাসী ভাষায় অনূদিত ও সম্পাদিত।

www.waytojannah.com

প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থ। এই বিজ্ঞানে গ্রীকদের মধ্যে আমরা যতোখানি দেখতে পাই তিনি তার চাইতে অনেক বেশি এগিয়ে যান। ওমর আল খওয়ারিযমীর চাইতেও অনেক বেশি অগ্রসর হন। প্রথমত সমীকরণের মাত্রার ক্ষেত্রে যেখানে আল–খওয়ারিযমী কেবল দ্বিঘাত সমীকরণ আলোচনা করেন সেখানে ওমর ত্রিঘাত সমীকরণেই অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন। তারপর বিভিন্ন সমস্যা, সম্ভব ও অসম্ভব সমাধান এবং এসব সমাধানের সীমা সম্পর্কিত আলোচনায় ওমর গ্রীকদের চাইতে অনেক বেশি অগ্রসর হন। অবশ্য ওমর সমীকরণগুলিকে সামগ্রিক সংখ্যায় সমাধানের চেষ্টা করতে গিয়ে তখনো ডায়াফেন্টাসের প্রভাব কাটিয়ে ওঠতে পারেননি। তাই তিনি অনির্দিষ্ট বীজগণিত থেকেও পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেননি। তিনি ত্রিমাত্রিক সমীকরণকে ২৭টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন এবং প্রতিটি শ্রেণীকে আবার চারটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করেন। শেষোক্ত দুটি ক্যাটাগরিতে টিনোমিয়্যাল (ত্রিপদ রাশি) ও কোয়াড্রিনোমিয়্যাল (চতুষ্পদ রাশি) সমীকরণ রয়েছে। চতুর্থ ক্যাটাগরিতে তিনটি শ্রেণী রয়েছে ঃ $x^3+bx^2=cx+d$; $x^3+cx=bx^2+d$; x^3+d+bx^2+cx. এর থেকে সমস্যার জটিলতা সম্পর্কে আমরা ধারণা করতে পারি। এসব সমস্যা আলোচনা করতে গিয়ে যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে তা হচ্ছে জ্যামিতিক বিশ্লেষণ। এটি এক ধরনের বিশ্লেষণমূলক জ্যামিতি যা ডেকার্টের[১] আগে এমন এক সময়ে উদ্ভাবিত হয় যখন কো–অর্ডিনেট (স্থানাঙ্ক) ও গাণিতিক চিহ্ন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শেষোক্ত শ্রেণীর সমাধান করা হয় দুটি হাইপারবলার (পরাবৃত্ত) সাহায্যে। এই হাইপারবলা গঠন করা হয় সমস্যার ড্যাটা অনুযায়ী এবং কোন একটি রেখার প্রতিনিধিত্বকারী বর্গসমূহের কো–ইফিশিয়েন্টকে b ধরে। এটি কোন একটি বিচ্ছিন্ন সংখ্যা ও তার মূল অনুযায়ী গঠিত একটি প্যারালেলিপাইপ্ড্ (সামন্তরিক ঘনবস্তু)–এর উচ্চতার সমান বা কম এবং সেখানে কণিক ছেদ করতে পারে কিংবা নাও করতে পারে। ওমর বলেন, 'এই শ্রেণীর বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে যার কোন কোনটি অসম্ভব। দুটি হাইপারবলার বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে এগুলির সমাধান করা হয়।' এধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হলে অ্যাপোলোনিয়াসের রচনা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এবং সেগুলি প্রয়োগে অসাধারণ দক্ষতার প্রয়োজন। ওমর গ্রীক পণ্ডিত ও তাঁর পূর্বসূরি আরব পণ্ডিতদের চাইতে পৃথক মৌলিকত্ব দাবি করেন। নিজস্ব গ্রন্থের শুরুতেই তিনি বলেন, 'এই পর্যালোচনায় আমরা অত্যন্ত জটিল ধরনের কতিপয় প্রাথমিক উপপাদ্যের ওপর নির্ভরশীল এমন সব প্রশ্নের সম্মুখীন হই, যেগুলির সমাধান করতে গিয়ে অধিকাংশ পণ্ডিত ব্যক্তিই ব্যর্থ হন। এগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন এমন কোন প্রাচীন পণ্ডিতের রচনা আমরা পাইনি।' ত্রিঘাত সমীকরণ সমাধানের এই পদ্ধতি প্রায় একই ভাবে আমরা আবার ডেকার্টের *জিওমেট্রিতেও* দেখতে পাই। আর ত্রিঘাত সমীকরণের খাঁটি বীজগাণিতিক

১. পুরো নাম রেনী ডেকার্ট (১৫৯৬–১৬৫০); ফরাসী দার্শনিক ও গাণিতিক।–অনুবাদক।

www.waytojannah.com

সমাধান রেনেসাঁর পূর্ব পর্যন্ত দেখা যায়নি। এ সময়েই আমরা সিপিয়ন ডেল ফেরো, টার্টাগালিয়া ও কার্ডানের রচনায় এর পরিচয় পাই। কিন্তু তখনো এটি এতো অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত ছিল যে, এতে অনেক বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

ওমরের *অ্যালজেবরা* অংকশাস্ত্রের এই শাখায় অগ্রগতির একটি ধাপ সূচিত করে। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তাঁর অপরূপ সংস্করণটি প্রকাশ করার পর বিজ্ঞ সম্পাদক উপকী আরব গাণিতিকদের কাছে জনপ্রিয় অন্যান্য কতিপয় সমস্যা সংগ্রহ করেন। তিনি ধারণা করেন যে, আরবরা দু'টি আনুপাতিক পদ্ধতির সমস্যা, একটি কোণকে সমানভাবে তিনভাগ করণ, একটি নিয়মিত বহুভুজ ক্ষেত্র তৈরি এবং বিশেষ করে একটি নবভুজ ক্ষেত্র তৈরি করার ন্যায় কণিক্সের বিষয় জানতেন। আরবরা একটি কোণকে সমান তিনভাগে ভাগ করার ন্যায় সমস্যার বিভিন্ন সমাধানও জানতেন। দক্ষ জ্যামিতিক সিজযী সব সমস্যার একটি বিশেষ সমাধান নির্দেশ করেন; এটি একটি হাইপারবলা ও একটি বৃত্তের পারস্পরিক ছেদের ওপর নির্ভরশীল। ইবনে লাইস নির্দেশিত নয়বাহু বিশিষ্ট বহু ভুজ নির্মাণ একটি হাইপারবলা ও একটি প্যারাবলার পারস্পরিক ছেদের ওপর নির্ভরশীল। আর্কিমিডিস একটি *'লেমা'* (দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত) প্রমাণ করতে পারেননি। (*ডি স্ফেরা এট সিলিন্‌ড্রো*, ২য়, ৬–৭), ফলে ইবনে হাইসাম ও অন্য পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ হন। আল–কূহী সমস্যাটিকে এভাবে তুলে ধরেন ঃ পরিধির এমন একটি অংশ তৈরি করতে হবে যা পরিমাণে (ভল্যুম) একটি নির্দিষ্ট পরিধির অংশের সমান এবং সারফেসের দিক দিয়ে নির্দিষ্ট পরিধির আর একটি অংশের সমান। তিনি দুটি সহায়ক (অক্সিলিয়ারী) কৌণ ও দুটি কনিক্সের সাহায্যে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এর সমাধান করেন ঃ একটি সমবাহু (ইকুইলেটারেল) হাইপারবলা ও একটি প্যারাবলা, এবং তারপর তিনি এর সীমা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

পাটিগণিতে আরবরা ম্যাজিক স্কোয়ার্স (বর্গক্ষেত্র)[১] ও 'অ্যামিকেবল' সংখ্যা সম্পর্কে কয়েকটি ব্যাপার আবিষ্কার করেন। 'নয় বাদ দিয়ে' ('বাই ক্যাস্টিং আউট দি নাইন্‌স) প্রমাণ করার পদ্ধতি, এবং 'রুল অব দি ডবল ফল্‌স্ পজিশন' (*রেগুলা ডুওরাম ফলসোরাম*, দ্বিগুণ ভুয়া অবস্থান বিধি) পদ্ধতি তারাই আবিষ্কার করেন। এসব বিষয় আমরা পুনরায় আমাদের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের পাটিগণিতে দেখতে পাই। এর একটিতে বিখ্যাত 'ফার্মাট' উপপাদ্যের বর্ণনা রয়েছে ঃ দুটি ঘনফলের (কিউব) যোগফল কখনো পূর্ণাঙ্গ সংখ্যার একটি ঘনফল হতে পারে না। কিন্তু এতে প্রমাণ দেওয়া হয়নি। আল–কার্খী (মৃ. আনু. ১০২৯) অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও সহজ জ্যামিতিক প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিক ত্রিঘাতের যোগফল

---

১. ম্যাজিক স্কোয়ার্স ট্যালিস মানে ব্যবহার করা হতো। আমি সম্প্রতি আরব জ্যোতিষী আল–বুনীর (মৃ. ১২২৫) একটি গ্রন্থে ম্যাজিক স্কোয়ার্স সমস্যার অত্যন্ত সুনিপুণ একটি সমাধান লক্ষ্য করেছি। এই সমাধান অনুসরণে যে কেউ কোন একটি বর্গক্ষেত্রের N বাহু অজ্ঞাত থাকলে, সেটি জোড় হোক আর বেজোড় হোক N+2 বাহুর বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করতে পারেন।

www.waytojannah.com

Contents

বের করেছেন, $1^3+2^3+3^3$ ------ + n^3 এবং পরবর্তীকালে সমরকন্দে উলুগ বেগের চিকিৎসক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী আল-কাশী চতুর্ঘাতের (ফোর্থ পাওয়ার্স) যে যোগফল বের করেন তা অসামান্য মেধার পরিচায়ক।

একাদশ ও দ্বাদশ শতকে স্পেনে আরব *জ্যোতির্বিজ্ঞান* সমৃদ্ধি লাভ করে। প্রাচ্যে এর চর্চা অনেক পরে হয় এবং অতঃপর মধ্যযুগীয় ইউরোপের পণ্ডিতদের মধ্যে তা অব্যাহত থাকে। স্পেনে আল-যারকালী (আর্যাচেল, জীবিতকাল ১০২৯-১০৮৭) যন্ত্রপাতি নির্মাতা হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি *সাফিহা* নামে একটি অ্যাস্ট্রলেব আবিষ্কার করেন এবং এ সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এটিকে কেন্দ্র করে একটি সামগ্রিক বিজ্ঞান সাহিত্য বিকাশ লাভ করে। মন্টপেলিয়ারের জনৈক ইহুদী এই গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। ক্যাস্টিলের রাজা আলফন্সো রোমান্স (স্পেনীয়) ভাষায় এর দুটি অনুবাদ সংস্করণ প্রকাশ করেন। পঞ্চদশ শতকে রিজিওমনটেনাস 'মহান সাফিহা যন্ত্রের' সমস্যাবলীর একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন। কোপার্নিকাস তাঁর *ডি রিভলুশনিবাস অর্বিয়াম কোয়েলেস্টিয়াম* গ্রন্থে আল-বাত্তানীর সঙ্গে আল-যারকালীরও উদ্ধৃতি প্রদান করেন। দার্শনিক ইবনে তুফাইলের (দ্বাদশ শতক) শিষ্য আল-বিত্‌রুজীর (আলপেট্রাজিয়াস) গ্রন্থের গতিবিধি সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ছিল। তাঁর রচিত একটি গ্রন্থ মোসেস বিন তিব্বন কর্তৃক হিব্রু ভাষায় এবং অতঃপর ষোড়শ শতকে কালোনিমস বিন ডেভিড কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। বিজ্ঞ ১০ম আলফন্সো কর্তৃক ত্রয়োদশ শতকে সঙ্কলিত আল ফন্‌সাইনটেব্‌ল্‌স্‌ আরব জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি বিকাশ। টলেডোর মিরিডিয়ান প্রসঙ্গে দ্রাঘিমার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এসব পণ্ডিত ব্যক্তি অবাধ ও অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকারী ছিলেন। তাঁরা টলেমীর সমালোচনায় ইতস্তত করতেন না এবং ইবনে রুশদের পর থেকে তারা স্ফিয়ারের বিবিধ ও খেয়ালীপূর্ণ তত্ত্বের বিরোধিতা করেন। তারা অধিকতর সহজ ও 'স্বাভাবিক' পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করেন। আল-বিরুনী ইতিমধ্যেই স্বীকার করেন যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের সর্বপ্রকার অনুমান আপেক্ষিক। কোপার্নিকাসের দুই হাজার বছর আগে সামোসের আরিস্টার্সাস ও ব্যাবিলনের সেল্যুকাস যা বলেছিলেন এবং পরবর্তীকালে পৃথিবীর আহ্নিকগতি সম্পর্কে কয়েকজন ভারতীয় যে মন্তব্য করেছিলেন তার প্রত্যেকটিই সমভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁরা বলেছিলেন যে, পৃথিবী 'অবয়বসমূহকে পরিহার করে' নিজস্ব কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে আবর্তিত হয়। এর মধ্যে নক্ষত্রসমূহের সর্বপ্রকার গতিবিধির বিশ্লেষণ ও হিসাব-নিকাশ রয়েছে। এ সময়কার আরব গবেষণার প্রেরণা কোন প্রকার নির্দিষ্ট মতামত বা মতবাদের দ্বারা ব্যাহত হয়নি।

প্রাচ্যে মঙ্গোল অভিযানের দুর্যোগপূর্ণ সময়ে নাসিরুদ্দীন তুসী (খৃ. ১২৭৪) নামে এক বিরাট প্রতিভার আবির্ভাব ঘটে। তিনি এশিয়া মাইনরের মারাগাহায় মঙ্গোল খানদের

www.waytojannah.com

Contents

বদান্যতায় প্রতিষ্ঠিত একটি মান মন্দিরে পর্যবেক্ষণকার্য চালান। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের যেসব তালিকা (টেবল্স্) প্রস্তুত করেন সেগুলিকে এসব বিজয়ীর নামানুসারে 'ইলখানিয়ান টেবলস' বলা হয়। মারাগাহার যন্ত্রপাতি ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আরব জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যন্ত্রপাতির সৌকর্য সাধনে অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। এর মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল আর্মিলারী স্ফিয়ার, যা প্রাচীনদের নিকটও পরিচিত ছিল। এটি সাধারণভাবে নভোমণ্ডলের (সেলেসশিয়াল স্ফিয়ার) প্রতিনিধিত্বমূলক ছিল। এতে মিরিডিয়ান, ইক্লিপটিক (ক্রান্তিবৃত্ত) ও সল্‌স্টিসের কলিউরের অনুরূপ তিনটি চক্র এবং পর্যবেক্ষণের জন্য দুটি চক্র ছিল। আরবরা টলেমী ও আলেকজান্দ্রীয় পণ্ডিতদের স্ফিয়ারের উন্নতি ও বিকাশ সাধন করেন। তাঁরা এর সঙ্গে দিগন্তে নক্ষত্রসমূহের স্থানাঙ্ক (কো-অর্ডিনেট্‌স) নির্দেশ করে দুটি চক্র এবং তারপর উচ্চতা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি চক্র যোগ করেন। ভুলভ্রান্তি নিম্নতম পর্যায়ে রাখার জন্য তাঁরা তাদের যন্ত্রপাতি যতোটা সম্ভব বড় করে তৈরির চেষ্টা করেন। এরপর তারা বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর পর্যবেক্ষণ কার্যের জন্য বিশেষ বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরি শুরু করেন। মারগাহার মানমন্দিরে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যের চক্রসম্বলিত নানা প্রকার যন্ত্রপাতি ছিল : ইক্‌লিপটিক্যাল, সলেস্টিসিয়াল ও ইকুয়েটোরিয়াল আর্মিলারী। বহুল ব্যবহৃত ইকলিপটিক্যালটিতে পাঁচটি চক্র ছিল, যার সব চাইতে বড় চক্রটি ছিল আড়াআড়িভাবে প্রায় বারো ফুট। এতে পর্যায়ক্রমিকভাবে ডিগ্রী ও মিনিট নির্দেশিত ছিল। ক্যাস্টিলের আলফন্সো যখন সবচাইতে সুন্দর ও উৎকৃষ্ট একটি আর্মিলারী স্ফিয়ার নির্মাণে উদ্যোগী হন তখন তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি আরবদেরই শরণাপন্ন হয়েছিলেন। রেনেসাঁর সময় রিজিওমন্টেনাস টলেমীর ইকলিপটিক্যাল পুনর্নির্মাণে আরবী গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেন এবং তাদের কাছ থেকেই তিনি 'অ্যালিডেড'[১] সম্পর্কে অবহিত হন। এই নামটি আরবী।

জ্যামিতিক হিসাবেও নাসিরুদ্দিন সমান দক্ষ ছিলেন। তিনি গণিত বিষয়ক অধিকাংশ প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। এগুলির সংখ্যা ষোলটি। বস্তুত মুসলিম আমলের আরো চারটি গ্রন্থসহ এগুলিতেই সেযুগের বিজ্ঞান সংক্রান্ত সামগ্রিক জ্ঞান নিহিত। শেষোক্ত চারটির মধ্যে '*ট্রীটিজ অন দি কোয়াড্রিলেটারেল*'[২] নামক গ্রন্থটি স্বয়ং নাসিরুদ্দিনের রচনা। এটি স্ফেরিক্যাল ত্রিকোণমিতির ওপর একটি প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থ। এতে তিনি প্রথমত মিনিলাউস ও টলেমীর পদ্ধতি এবং তারপর তাঁর নিজস্ব নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করে অত্যন্ত সুশৃংখল ও সুললিতভাবে এই বিষয়বস্তুকে সম্প্রসারিত করেন। তিনি যে বিধিকে 'সাপ্লিমেন্টারী ফিগার' পদ্ধতি আখ্যায়িত করেন এবং যা টলেমীর চতুর্ভুজ সংক্রান্ত উপপাদ্যের প্রয়োগ পরিহার

---

১. আরবী *আল-ইদাদাহ*, নিয়ম, বিধি; ফরাসী *আলহিডাডা*। -অনুবাদক।
২. ক্যারাথিওডোরি পাশা কর্তৃক ফরাসী অনুবাদসহ সম্পাদিত, কনস্ট্যান্টিনোপল, ১৮৯১।

www.waytojannah.com

Contents

করে, নিতান্ত সহজভাবে তা হচ্ছে এই যে, কোণগুলির 'সাইন' বাহুগুলির সাথে আনুপাতিক,

$$\frac{\text{Sin a}}{\text{Sin A}}=\frac{\text{Sin b}}{\text{Sin B}}=\frac{\text{Sin c}}{\text{Sin C}}$$

এই বিধির সঙ্গে তিনি $\text{Sin b}=\frac{\tan c}{\tan C}$ সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি 'স্পর্শক পদ্ধতি' যোগ করেন। এমনিভাবে এ সময় সমতল ও স্ফেরিক্যাল ত্রিকোণমিতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই গ্রন্থে এর প্রথম সুশৃংখল বিকাশ ও প্রকাশ লাভ করে। এই আবিষ্কারে তাঁর যেসব আরব পূর্বসূরির কিছু কিছু অবদান ছিল একটি ক্ষুদ্র অনুচ্ছেদে নাসিরুদ্দিন তাঁদের কথা উল্লেখ করেন।

সবশেষে আমাদেরকে সমরকন্দের ঐসব জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কথা অবশ্যি উল্লেখ করতে হবে, যারা ১৪৩৭ খৃষ্টাব্দে *টেবল্স অব উলুগ বেগ* শিরোনামে তৈমুর লঙ বংশের জনৈক রাজার জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন টেব্ল তৈরি করেন। এগুলি পাশ্চাত্যে অত্যন্ত প্রশংসিত হয় এবং অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়।[১]

অতএব, এ হচ্ছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরব অবদানের একটি মোটামুটি বর্ণনা। পঞ্চদশ শতকে পাশ্চাত্য প্রতিভা বিকাশের সূচনায় এর পরিসমাপ্তি ঘটে। মুসলিম বিশ্বে বুদ্ধি চর্চায় এই পূর্ণবিরতির কারণ সম্পর্কে মাঝে মাঝে প্রশ্ন ওঠে। এতো ব্যাপক কর্মকাণ্ডের পর এই নির্জীব নিষ্ক্রিয়তা কেন? কিন্তু এই প্রশ্নটি সাধারণ মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত অস্পষ্ট এমন সব সমস্যার জাল সৃষ্টি করেছে যার কোন সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক জবাব এপর্যন্ত কেউ দেননি। আমার নিজেরও দেওয়ার মতো কোন বক্তব্য নেই, আর এই উদ্দেশ্যে বিষয়টি আলোচনার চেষ্টা করা আমার উচিত হবে বলেও আমি মনে করি না।

কারা ডি ভক্স

---

১. জে গ্রীভ্স ও টি হাইড কর্তৃক পারস্য ও ল্যাটিন ভাষায় সম্পাদিত; লণ্ডন, ১৬৫০ ও ১৬৬৫। সেডিলট এসব টেব্ল্‌–এর মুখবন্ধগুলি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন (প্যারিস, ১৮৪৬)।

www.waytojannah.com

নির্ঘণ্ট

অ

অক্সফোর্ড ঃ ১২৪, ১৭৭, ১৯০, ১৯৩, ২০৭, ২৬১, ৩৭৬।
অগাস্টিন ঃ ২৮৬।
অর্গ্যান ঃ ৩৬৬।
অর্গো প্রোপ্রাইটর ঃ ২৬, ৬৮।
অর্গানিস্টান ঃ ৩৬৬।
অর্টু কী, রাজা ঃ ১৩৪।
অর্ডার অব দি পিচার্স ঃ ২৮৭।

আ

আইভরি ঃ ১৬৩, ১৬৬।
আইয়ূবী ঃ ১০২।
আইসল্যাণ্ড ঃ ১১১।
আইসোল্ডে ব্লাঞ্চ মেইন ঃ ২১৮।
আইজাক জুডিয়াস (মিসরীয় ইহুদী) ৩৩২, ৩৩৩, ৩৫৩।
আউদাগোশত ঃ ১১২।
আকবর, মির্যা ঃ ১৬৩।
আকসা, আল-মসজিদ ঃ ৬৫, ১৮৪, ১৯৮, ১৯৯।
আর্কিমিডিস ঃ ৩২১, ৩৫০, ৩৭০, ৩৮১, ৩৮৪।
আগলাবী, রাজবংশ ঃ ৬১।
আটলান্টিক ঃ ২০, ২১, ৯৪, ১১৩, ১১৮, ৩৬৫।
আর্ট অ্যাপারে (প্যারিস) ঃ ২০৭।
আর্ডিয়ান ডি লং পারিয়ার ঃ ১৭৬।
অ্যাডেলার্ড ঃ ৮২, ১০৬, ৩৭৬, (বার্থ) ৩৭৬, (ডে) ৩৮৬।
আততাব (রা) ঃ ১৫০
আর্থারীয়, কবি ঃ ৮৪।
আনাসটাসিস কোম ঃ ১৮৬।

www.waytojannah.com

আম্মাতোলিয়া ঃ ১৯৯।
আন্দালুস (সীয়) ঃ ২২, ২৪, ৯৫, ২১১, ২১২, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২২৩, ৩৬৯।
আনজু, রাজবংশ ঃ ৩৩২, ৩৫৫।
আণ্ডার হিল, মিস, (মিস্ট্রিসিজম রচয়িতা) ঃ ২৩২।
আর্নল্ড অব ভিলানোভা ঃ ৩৫৮।
অ্যান্টিলস ঃ ৩৬০।
অ্যাঞ্জেলিক মতবাদ ঃ ২৯০, ২৯১।
আঁদ্রে, মাইকেল ঃ ১৭৬।
আঁর্দ্রে আল পাগের (ইটালীয় অনুবাদক) ঃ ৩৫৭।
আদম হাওয়া ঃ ২৯৯, ৩০৪, ৩১৪, ৩১৫।
অ্যাপ্স ঃ ১৮৭।
অ্যাপোলোনিয়াস পার্গিয়াস ঃ ৩৭০।
অ্যাপেলজিয়া প্রো ভিটাসুয়া ঃ ২৯১।
অ্যাপেলনিয়াস অব তিয়ানা ঃ ৩২৮, ৩৫০, ৩৮১।
আফগানিস্তান ঃ ৯৪, ১১১, ৩৮২।
অ্যাফোজিমস ঃ ৩৪৬।
আফ্রিকা ঃ ২১, ৬০, ৬১, ৬২, ৯৪ (উত্তর) ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০২, ১০৪, ১০৫, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১৩৯, ১৭২, ১৮০, (উত্তর) ১৯৬, ২৬৩, ৩২৩, ৩২৯, ৩৪৫, ৩৪৮, ৩৫২, ৩৭৫।
আবদুর রহমান (৩য়) ঃ ২৫, (যুবরাজ) ১৬৬, ২৮১, ৩৩৮।
আবদুল করিম জিলি ঃ ২৪৫।
আবদুল লতিফ ঃ ৩৪৬, ৩৫১।
আবদুল কাদির ইবনে গাইবী ঃ ৩৭২, ৩৭৪।
আবদুল আজিজ ঃ ৩৭৪।
অ্যাবাকাস ঃ ৩৮৯।
অ্যাব ওরিজিনী ঃ ৩৭৬।
আব্বাসীয় (খেলাফত, শাসক) ঃ ১৩১, ১৩৭, ১৫১, ৩১১, ৩১২, ৩২৩, ৩৮৪।
আবু বকর (রা), হযরত ঃ ২৯৮, ৩০৮।
আবু বকর আর রিকুতি ঃ ২৬২, ৩৭১।
আবু নাসর আল-সাররাজ (লেখক) ঃ ২৩২, ২৪১।
আবু যায়েদ আল বলখী ঃ ১০৪।

www.waytojannah.com

আবুল কাসেম ঃ ৩৩৮, ৩৫৪, ৩৫৫।
আবু ইয়াযীদ (বায়েযীদ বুস্তামী) ঃ ২৩৭, ২৩৮।
আবূ তালেব আল মাক্কী ঃ ২৪১।
আবূ সাঈদ ঃ ২১৪।
আবুল ফযল হাসদাই (ইহুদী) ঃ ৩৭১।
আবুল ফিদা (ঐতিহাসিক) ঃ ১৫৯।
আবুল ফিদা (সিরিয়ার হামার যুবরাজ) ঃ ১০৪।
আবুল মাযদ ঃ ৩৬৬, ৩৭১।
আবুল ওয়াফা ঃ ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩।
আবূ ইয়াহইয়া ইবনে বাতরিক ঃ ৩৮৪।
আবূ মূসা আল-আশ্'আরী (রা) ঃ ২৯৯।
আবূ ইউসুফ, ইমাম ঃ ৩১০।
আর্বেলার্ড ঃ ৬৯।
আভিসেব্রোন, ইবনে জাবিরোল (মালাসা) ঃ ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫।
আমর ইবনে খিজর আল-কুর্দী ঃ ৩৭২।
আমাফলি ঃ ১৯৮।
আমিগর, এইটিয়স ঃ ৩২১।
আর্মেনিয়া/আর্মেনীয় ঃ ৯৪, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮৬, ১৯৫, ২০৩, ৩৫১।
আযিমেয (আল-শামাস) ঃ ২৯।
আযুলেজা ঃ ৩৩।
আরবান (২য়) ঃ ৬৩।
অ্যারাগন ঃ ২১, ২২, (মুডেজার) ৩০, ৩৬, ৫৩, ৫৬, ৬২।
আরব্য রজনী (অ্যারাবিয়ান নাইটস) ঃ ১০৮, ২০৮, ২১৯ (গ্যালাণ্ডের) ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২৩০।
অ্যারাবেস্ক (যুগ) ঃ ২০৩।
আরব আর্ট মিউজিয়াম (কায়রো) ঃ ১৩৪, ১৬২।
আরব/আরবী/আরবীয় ঃ ২০, ২৪, ২৫, ২৬, ২৯, ৩০, ৩৩, ৩৪, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫২, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৯, ৬১, ৬২, ৭১, ৭৩, ৭৪, ৭৬, ৭৮, ৮০, ৮২, ৮৭, ৯৪, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০৩, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১১০, ১১৪, ১১৫, ১২২, ১২৩, ১৪৮, ১৪৯, ১৫১, ১৬৭, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৯, ১৮১, ১৮৪, ১৮৬, ১৮৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২২২, ২২৩, ২২৬, ২২৭,

www.waytojannah.com

২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৯, ২৭১, ২৭২, ২৭৮, ২৭৯, ২৮১, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৯, ২৯২, ২৯৪, ২৯৭, ৩০৭, ৩১৪, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩১, ৩৩৫, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪১, ৩৪৭, ৩৪৯, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৬, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯।

আরিন ঃ ১০৬।

আরিনারিয়াস ঃ ৩৮৪।

আরিস্টার্কাস (সামোস) ঃ ৩৮৪।

আরিস্টার্মাস ঃ ৩৯৭।

অ্যারিস্টটল ঃ ৪৭, ৭১, ৭২, ৭৩, ৮২, ৮৭, ২৪৪, ২৬০, ২৬৪, ২৬৫, (-ীয় দর্শন) ২৬৫, ২৬৬, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৬, (-ীয়ান) ২৮১, ২৮৩, ২৮৫, ২৮৬, ২৯০, ২৯৩, ৩১৪, ৩২১, ৩২৩, ৩২৫, ৩২৮, ৩২৯, ৩৪৩, ৩৪৭, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৮, ৩৬৩, ৩৬৯, ৩৭১, ৩৭৪, ৩৭৬।

অ্যারিস্টোজেনাস ঃ ৩৬৯।

অ্যারাবেস্ক ঃ ৩৮০।

অ্যারেনা চ্যাপেলে বিসারেকশন অব ল্যাযারস (পাডুয়া) ঃ ১৭৭।

আল-আজিজ (মিসরের দ্বিতীয় ফাতিমী খলীফা) ঃ ১৬৭।

আল-আযহার ঃ ১৯৮, ২৬৪, ৩৪৫।

আযারী এম, (স্টোরিয়া ডাই মুসুলমানি ডি সিসিমিয়া রচয়িতা) ঃ ২১৭।

আল-আসীর ঃ ৮৩।

আল আসমাই ঃ ৩২৯।

আল-কাশী (উলূগবেগের চিকিৎসক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী) ঃ ৩৯৭।

আল-কামিল সাইফুদ্দীন শাবান (মিসরের মামলুক সুলতান) ঃ ১৪৫।

আল-কাযার (পেশিও ডেল ইয়েগো) ঃ ২৯, ১৯৯।

আলকেমী ঃ ৩২৩, ৩২৪, ৩২৮, ৩৩০, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৯, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯।

আল-খাযিনী ঃ ৩৪৯, ৩৯১।

আল গারিজম (দম) ঃ ৩৮৬।

আল বিরুনী ঃ ৯৮, ১০১, ৩৩৯ (আবু রায়হান মোহাম্মদ) ৩৪১, ৩৪৩, ৩৮১, ৩৮২, ৩৯৪, ৩৯৭।

www.waytojannah.com

Contents

আলবার্টস, ম্যাগনাস ঃ ১০৬।
আল ফন্সো (ক্রুসেডার, অষ্টম) ঃ ২২, ৩৮, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৬২, ২২১, ৩৫৩, ৩৯৭, ৩৯৮।
আল মাসুদী ঃ ৩৪১,
আলজোস্কানী ঃ ২৪,
আল জাফারিয়া ঃ ২৪।
আলমোহেড ঃ ২৯।
আলমোহাডেস ঃ ১৪৭।
আল মুয়ারিফাযগো ঃ ৪২
আল মুরাবাইড ঃ ৪৭।
আল গেমিন কুলটুর গ্যাচিচটে (অ্যামরাইন রচিত) ঃ ৬৮।
আলজিরিয়া ঃ ১১২, ২২৯।
আল বিজেন সিয়েন (ধর্মদ্রোহী) ঃ ৮৬।
আলগেমাইন ডিউশ ব্বায়োগ্রাফী ঃ ২২৭।
আল-জাহিয ঃ ২৫৯, ২৭৮।
আলকিন্দী ঃ ২৬০ (আবূ ইউসুফ ইয়াকূব) ২৬৯, ২৭০, ২৭২, ৩২৮, ৩২৯, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৬৩, ৩৭০, ৩৭৩, ৩৭৭, ৩৮২, ৩৯৩।
আলবার্ট ম্যাগনাস ঃ ২৭৪।
আল-হামরা ঃ ৪৫, ১৯৯।
আল্‌প আরসালান (তুর্কী উযীর) ঃ ২৬১।
আলাদীন ঃ ২২৬, ২২৭।
আলীবাবা ঃ ২২৬।
আলী (রা) হযরত, ২৪৬।
আলী ইবনে ইয়াহইয়া ঃ ৩৪৫।
আলী ইবনে ঈসা, খৃস্টান (বাগদাদের চক্ষু চিকিৎসক) ঃ ৩৩৯, ৩৫৯।
আলেকজান্দ্রিয়া ঃ ৫৮, ১০৯, ১২৩, ২৪৬, ২৬১, ২৬৭, ২৬৯, ৩২১, ৩২৩, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩৫০, ৩৫৯, ৩৮১, ৩৮২, ৩৯৮।
আলেকজান্ডার (অ্যাসেন্ট অব) ঃ ৮৪, ১০৩, ১৩৪, ২৬৯, ২৮৪, (টাল্লোস) ৩২১।
আলেপ্পো ঃ ১৯৬।
অ্যালেকট্রেড ঃ ৩৭৭।
আশ'আরী, আবুল হাসান ঃ ২৮০।
আসিন আমাও সিস (প্রফেসর) ঃ মিগুয়েস ঃ ১৯, ২০, ২৪৮, ২৮২।

www.waytojannah.com

আহমদ উগলু শুকরুল্লাহ ঃ ৩৭৪।
অ্যাস্টুরিয়া ঃ ২০।
অ্যাস্ট্রলব ঃ ১২৩, ১২৪।
অ্যাংলেড, মঁসিয়ে ঃ ২১১।
আয়ারল্যাণ্ড ঃ ২১৯।
আং বেসিন প্ল্যান্ট ডি ভয়ের পেইন্ট এলা ফ্যাকন ডি ডামাস ঃ ১৪৫।

ই

ইউরোপ/ইউরোপীয়/ইউরোপিয়ান ঃ ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৭, ৩০, ৩৭, ৪০, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫২, ৫৮, ৫৯, ৬২, ৬৮, ৬৯, ৭৩, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৯, ১০১, ১০২, ১০৫, ১০৬, ১১০, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৬, ১২০, ১২১, ১২৩, ১২৮, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৭, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৮, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৯, ১৬৭, ১৬৮, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৯০, ১৯৪, ১৯৬, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১৩, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৬, ২২৭, ২২৮। ২৩১, ২৩২, ২৪২, ২৪৯, ২৫৭, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৭৭, ২৭৮, ২৮৭, ২৮৯, ২৯৬, ৩৩২, ৩৩৫, ৩৩৭, ৩৪৭, ৩৫২, ৩৫৬, ৩৬০, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৬, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৬, ৩৭৮, ৩৮০, ৩৯৭।
ইউক্লিড ঃ ৪৭, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৫২, ৩৬৩, ৩৭১, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৮১, ৩৮৫, ৩৯০।
ইউফ্রেতিস ঃ ১১৮।
ইউয়ান রাজবংশ ঃ ১৫১।
ইউনিট্রেট, দি ঃ ২৮৩।
ইউসুফ-যুলায়খা ঃ ২৫২।
ইউনুস আল কাতিব (সঙ্গীতজ্ঞ-লেখক) ৩৬৯।
ইউহান্না ইবনে আল বাডরিক ঃ ৩৬৯।
ইকিলিযিয়াসটিডে ঃ ২৭৭।
ইখওয়ানুস সাফা ঃ ৩৩৩, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭৩।
ইটালি/ইটালীয় ঃ ২১, ২৭, ৩৪, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৫, ৭৩, ৭৮, ৮০, ৮২, ৯০, ৯১, ৯৪, ১০৪, ১০৫, ১০৯, ১১০, ১১৪, ১১৫, ১৩৩, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৫, ১৫৬, ১৬৮, ১৭৩, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৯৮, ২০১, ২০৩, ২০৫, ২১৭, ২১৮, ২২১, ২২২, ২২৯, ২৬১, ২৮৯, ৩৫৪, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯।

www.waytojannah.com

ইলিয়ানর (জিনার) ঃ ২৫।
ইদ্রিসী-আল (ভূগোলবিদ) ঃ ২৭, ৩৩, ৯৬, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১১০।
ইনক্যান্টানো, প্রাসাদ ঃ ৩০।
ইনফ্যান্টে ডন ফ্যাডারিক ঃ ৪৮।
ইনফ্যান্টে জন ক্যানয়াম ঃ ২২০।
ইনোসেন্ট (৪র্থ) ঃ ৬৬, ৭৯, (৩য়, পোপ) ৩৫৬।
ইনসানুল কামিল ঃ ২৪৬।
ইথিওপিয়া ঃ ১১০।
ইফেসাস ঃ ৩২১।
ইবরাহীম (আ), হযরত ঃ ২৯৮, ৩০১।
ইবরাহীম (ইস্ফাহানের অ্যাস্টারলব বিশেষজ্ঞ) ঃ ১২৪।
ইবশিহি-আল-(মুসতাতারাফ লেখক) ঃ ৩৬৯।
ইবনুল আরাবী ঃ ২৪০, ২৪৪, (মুহীউদ্দীন) ২৪৫, ২৪৬, ২৪৮, ২৪৯, ২৮১, ৩৬৯।
ইবনে আল কিফতী ঃ ৩৫০।
ইবনে আবি উসাইবিয়া ঃ ৩৫১।
ইবনে আবদ রাব্বিহী ঃ ৩৬৩, (ইউনিক নেথেফা নেকলেস রচয়িতা) ঃ ৩৬৩, ৩৬৮।
ইবনে আল বাইতার ঃ ৩৪৬।
ইবনে আল হাদ্দাদ ঃ ৩৭১।
ইবনে ইউনুস ঃ ৯৮।
ইবনে আন নাক্কাশ আল বাহিলী ঃ ৩৭১।
ইবনে ওয়াফিদ ঃ ৩৩৯।
ইবনে ওয়াহশিয়্যা ঃ ৩২৯।
ইবনে আকসিন ঃ ৩৭৪।
ইবনে কুযমান ঃ ৫৩, ২১৫, ২১৬,
ইবনে কালাউন, আন নাসির মোহাম্মদ ঃ ১৩২, ১৫২।
ইবনে কাররা, সাবিত ঃ ৩৯০।
ইবনে কাররা, মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ঃ ৩২৭, ৩৫৪, ৩৮৩।
ইবনে খাতিমা (মূরীয় চিকিৎসক) ঃ ৩৪৮।
ইবনে খালদূন ঃ ২৯৭, ৩৩৯, ৩৬৪, ৩৬৮, ৩৬৯।
ইবনে খুররাদাজবেহ ঃ ৯৯, ১১৩।
ইবনে গাইবী, আবদুল কাদির ঃ ৩৭৩।
ইবনে জুবাইর ঃ ২৭, ১০৪, ১০৯।

ইবনে জামাআহ (দামেশকের কাযী) ঃ ৩১৩।
ইবনে জুহর ঃ ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৫৫।
ইবনে তাহির, মানসুর ইবনে তালহা ঃ ৩৭০।
ইবনে তিব্বান, মোসেস ঃ ৩৭৪
ইবনে তুফাইল ঃ ২৭, ২২৫, ২৮৯।
ইবনে তুলুন (মসজিদ) ঃ ১৯০, ১৯৩, ৩৪৪।
ইবনে তুলমুস, আল-সিরার ঃ ২৮৬।
ইবনে দাউদ ঃ ২১৩।
ইবনুল ফরীদ ঃ ২৩২, ২৫১।
ইবনুল ফকীহ ঃ ৯৯।
ইবনে ফাদলান ঃ ১০১।
ইবনে ফানারী আল ঃ ৩৭২।
ইবনে ফাতিমা ঃ ১০৪, ১১৩।
ইবনে ফিরনাস ঃ ৩৬৯।
ইবনুল ফুরাত ঃ ২৬২।
ইবনে রাতরিক ঃ ৩৮৪।
ইবনে বাজ্জা (আবেসপেস) ঃ ২৭, ৩৭, ২৮৯, ৩৭১,
ইবনে বুতলান ঃ ৩৩৯।
ইবনে মজীদ, আহমদ ঃ ১০৮, ১০৯।
ইবনে মানআ ঃ ৩৭১।
ইবনে মাসাররা (মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ) ঃ ২৮১, ২৮২।
ইবনে মিসজাহ ঃ ৩৬২।
ইবনে যাইলা ঃ ৩৭১।
ইবনে যুহর (আভেন যোয়ার) ঃ ২৭।
ইবনে রুস্তাহ্ ঃ ৯৯, ১০৬, ১০৭।
ইবনে রুশদ (আবেরকোস) ঃ ২৭, ৬১, ৭১, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৭২, ২৭৩, ২৭৬, ২৮১, ২৮৩, ২৮৫, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ৩৪৭, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৭১, ৩৭৪, ৩৮৩, ৩৯৭।
ইবনে রিদওয়ান ঃ ৩৩৯।
ইবনে লাইস ঃ ৩৯৬।
ইবনে সাঈদ ঃ ১০৪, ১১৩।

www.waytojannah.com

Contents

ইবনে সীনা ঃ ৩৭, ৭২, ২৪৯, ২৬০, ২৬৪, ২৬৬, (আবূ আলী) ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৮৩, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪৩, ৩৪৫, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৭, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৭, ৩৮২।
ইবনে হাইসাম (আবূ আলী আল হাসান) ঃ ৩৪২, ৩৪৩, ৩৫০, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৭১, ৩৯৬।
ইবনে হাউকাল ঃ (ভূগোলবিদ) ঃ ৯৫, ১০১, ১০২, ১১০, ১১২।
ইবনে হাযম ঃ ২১৪, ২৯৫।
ইবনে হাইয়া, আব্রাহাম (ভ্যাটিক্যান) ঃ ৩৭৪।
ইবনে হিজারী ঃ ৩৭৬।
ইরান/ইরানীয় ঃ ৮৪, ১১৮, ১৭৯, ১৮৬, ২০৩।
ইরাক ঃ ৯৪, ১০৭।
ইরাটসথেনিস ঃ ৯৮।
ইসহাক ঃ ২৬৯। (আল মাউসিনী) ৩৬৩, ৩৬৯।
ইসতাখরী, আল ঃ ১০১।
ইসাবেলা ঃ ২১, ২২।
ইসাইয়া বেন আইযাক ঃ ৩৭৪।
ইস্ফাহান ঃ ১৯৮।
ইসিওডোর ঃ ৩৭৬।
ইস্ফাহানী, আল ঃ ৩৬৩, ৩৬৮।
ইসলাম/ইসলামী ঃ ১৯, ২০, ২১, ২৭, ২৯, ৫৩, ৫৯, ৬০, ৭০, ৮৭, ৯১, ৯২, ৯৫, ৯৬, ৯৮, ৯৯, ১০১, ১০২, ১০৪, ১০৫, ১০৭, ১১৪, ১১৫, ১১৮, ১১৯, ১২২, ১৩৪, ১৩৮, ১৩৯, ১৫১, ১৬৭, ১৭২, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৯, ১৮১, ১৮৪, ১৮৬, ১৮৭, ১৯৮, ২০৩, ২০৫, ২১৩, ২১৪, ২২২, ২২৩, ২৩১, ২৩৩, ২৩৫, ২৩৯, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৬, ২৫৮, ২৫৯, ২৬১, ২৬২, ২৬৭, ২৭০, ২৮৫, ২৮৬, ২৯৭, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৬, ৩০৯, ৩১১, ৩১৩, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩৪২, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৯।
ইহুদী ঃ ২১, ২২, ২৬, ২৭, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ১১৩, ১৮৪, ১৮৯, ২২০, ২৪৮, ২৬২, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৭, ২৮৯, ২৯৫, ৩০১, ৩২৩, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৮৩, ৩৯৭।
ইয়ারমুক ঃ ৫৯।
ইয়ামন ঃ ৯৪, ১৮০।
ইয়াকুবী আল ঃ ৯৯।

www.waytojannah.com

Contents

ইয়াকুত ঃ ১০৪।
ইয়াকুব আল ফাযারী (ভারতীয়) ঃ ৩৮৪।
ইয়াহিয়া বার্মিকী ঃ ৩৮৫।
ইয়াহিয়া আল খুন্দুস আল মুরসী ঃ ৩৬৯।
ইংরেজ/ইংরেজী ঃ ২৪, ৩৮, ৪১, ৭২, ১২৪, ১৭৪, ১৯৬, ২০৫, ২০৮, ২২৫, ২৩০, ২৩২, ৩৩১, ৩৫৩।
ইংল্যাণ্ড ঃ ৩৬, ৪৭, ৭৪, ৮৬, ৮৮, ১৭১, ১৯৬, ২০৩, ২০৫, ২০৮, ২২১, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৬১, ৩৫৩, ৩৫৯, ৩৭৭, ৩৭৮।

ঈ

ঈজিয়ান সাগর ঃ ১৫১।

উ

উইনচেস্টার ঃ ১৯৬।
উইলিয়াম জোন্স ঃ ২২৬।
উইলিয়াম রুব্রুকুইস ঃ ৬৬ (১ম) ৭১।
উইলিয়াম অব মোয়েরবেক (ফ্লেমিশ আর্কবিশপ) ঃ ৭৩, ৮৩।
উইলিয়াম মালমেসবারী ঃ ১২৪।
উইলিয়াম মরিস ঃ ১৫৫, ১৭৪,
উইলিয়াম অব পয়টিয়ার্স ঃ ২১৬।
উইলিবার্ড স্যাক্সন ঃ ৯৫।
উইণ্ডসর প্রাসাদ ঃ ১৫০।
উখাইদির ঃ ১৯০।
উজ্জয়িনী (ওযিনি) ঃ ১০৬।
ইবুল্লা ঃ ১০৭।
উমর, খলীফা, হযরত ঃ ৫৯, ১০৯, ১৮৪, ২৯৯।
উমাইয়া ঃ ২৩, (খিলাফত) ৩১১, ৩২৩, ৩৮৪।
উমাইয়া, আবুস সাল্ত ঃ ৩৭১, ৩৭৪।
উমারী -আল ঃ ১০৫।
উসমানিয়া তুর্কী ঃ ৬৭, ৯১, ৯২, ২০১।
উসমানীয়, খেলাফত ঃ ১৩৩, ১৪০, ১৯৯।
উসামা, সিরীয় যুবরাজ ঃ ৩৫৬।

www.waytojannah.com

Contents

এ

এইচ ক্রিস্টি, মি, (লেখক) ঃ ১৭৬
একোয়ামানিলেস ঃ ১২৮।
একহার্ট (লেখক) ঃ ২৩২।
এজিনার পল ঃ ৩২১।
এডোরা ঃ ৩৩।
এডেসা ঃ ৬৫, ৩২১, ৩২২।
এডেন ঃ ১১০।
এডওয়ার্ড (১ম) ঃ ৭৩, (স্যার মন্টেগু) ১৫৬, (কার্পেন্টার) ঃ ২৩২।
এডিসন (লেখক) ঃ ২২৫।
এথেন্স ঃ ৫৮।
এন্টিয়ক ঃ ৩৫৬।
এন্টিনোমেনিয়াম ঃ ২৪১।
এযোরিন (জোসে মার্টিনেজরুইক) ঃ ৪১।
এরিয়ান ঃ ২৬৩।
এলিজাবেথীয় যুগ ঃ ২০৩।
এলমুয়াহিম ও এলমুয়ারিফা ঃ ৩৮।
এশাকোয়েল ঃ ৩৬৬।
এশিয়া/এশিয়ামাইনর ঃ ৫৮, ৬১, ৬২, ৬৩, ৭৮, ৮২, ৯০, ৯১, ৯৪, ১০৫, ১০৭, ১১১, ১৩৮, ১৪০, ১৪৩, ১৫১, ১৫৫, ১৫৬, ১৭৪, ১৮৬, ২২৯, ৩২২, ৩২৩, ৩৩০, ৩৪৫, ৩৫২, ৩৯৭।
এসপেডোকিয়ান ঃ (সুডো) ঃ ২৮১, (ক্লিজ) ২৮২।
এসকোরিয়ান লাইব্রেরী (স্পেন) ঃ ৩২০।
এসমারেড সিসমণ্ডী ঃ ২১১।
এস্পানোলা রিসিভিটা ডি ফিলোলজিয়া ঃ ২০।
এসিন ঃ ২৯৫।

ও

ওই কাউমেন ঃ ৯৪।
ওককাস ঃ ১১১।
ওচচি ডি কেন ঃ ১৩৩।
ওডিয়ানা ঃ ৪৪।

www.waytojannah.com

ওডিভেল্লাস ঃ ৪৪।
ওডারিকাস (রোম) ঃ ১৭৪।
ওরফ্রি ঃ ১৫৫।
ওলন্দাজ ঃ ৮৯, ১০৮, ১১৫, ১৭৪।
ওফফার (মর্সিয়ার রাজা) ঃ ১২৩।
ওফফারেক্স ঃ ১২৩।
ওল্ড টেস্টামেন্ট ঃ ৭১, ২২৫, ২৮৮, ২৯৫, ৩২৫।
ওভার্নি (ফ্রান্স) ঃ ২০৩।
ওমর খৈয়াম ঃ ২০৮, ২৬১ (ওমর ইবনে ইবরাহীম আল খৈয়ামী) ঃ ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬।
ওমর ইবনে ফাররুখান ঃ ৩৮৫।
ওমান ঃ ১০৭।
ওয়ারবাক, আল, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (সঙ্গীত গ্রন্থ লেখক) ঃ ৩৬৮।
ওয়াল্টার অডিংটন ঃ ৩৭, ৩৭৫।
ওয়াকওয়াক দ্বীপ (মাদাগাস্কার) ঃ ১০৮।
ওয়ালিদ ১ম, খলীফা ঃ ১২০।
ওয়াইনার লিড (লেখক)ঃ ২১০।
ওয়ার্টফোর্ড ঃ ২২৫।
ওয়ার্টন (দি হিস্টরী অব পোয়েট্রির লেখক) ঃ ২২৬।
ওয়েলস ঃ ৭৪।
ওয়েহ্‌লেন শ্লেগার ঃ ২২৭।
ওয়েব, ক্লিমেন্ট সিজে (এ হিস্টরী অব ফিলসফীর লেখক) ঃ ২৯৪।
ওয়েলটা লিটারেচার ঃ ২২৮।
ওয়েস্ট লি ডিভান ঃ ২২৭।
ওয়েস্ট মিনিস্টার এ্যাবে ঃ ১৭৪, ২০৫।

ক

কনওয়ে ঃ ১৯৬।
কপ্‌ট ঃ ২৩।
কর্ডোভা ঃ ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯, ৩০, ৪৭, ৭০, ১২৪, ১২৭, ১৬৩, ১৬৬, ১৮৯, ১৯৬, ২৮১, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯৫, ৩৪৫, ৩৭৬।
কণ্ডেলু ক্যানো ঃ ২২০।

www.waytojannah.com

Contents

কনস্ট্যান্টিনোপল ঃ ৫৮, ৬৫, ৬৭, ৭৩, ১০৪, ১৪০, ১৪৪, ১৯৯, ২০১, ২৬৮, ৩২০, ৩২৫, ৩৯০।
কনস্ট্যান্টাইন (আফ্রিকা) ঃ ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৮, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৭৫।
কনসেসাস সোলাস অবলিগ্যাট ঃ ৩১৫।
কন্ট্রিবিউশন টুওয়ার্ডস্ এ হিস্টোরী অব অ্যারাবিকো গথিক কালচার ঃ ২১০।
কলেজিয়েটা ডি সান ইসিড রো ঃ ১৫০।
কলম্বাস ঃ ৯২, ১০৬।
কলোনিমস বিন ভেডিড ঃ ৩৯৭।
স্কটল্যাণ্ড ঃ ৩৬, ৪৭।
কাসর আল হেয়ার ঃ ১৯৫।
কার্ডি লেণ্ডাস (ইলসব্রুকের মিউজিয়াম) ঃ ১৩৪।
কার্ডিন্যাল উলসী ঃ ১৫৬, (পবিত্র বৃক্ষ) ১৭৫।
কার্ডিন্যাল যিমেনেয ঃ ৩৪।
কাশান ঃ ১৫৬।
কায়েত বে, মামলুক সুলতান ঃ ১৬৩।
কাসর ইবনে ওয়ার্দান গির্জা (সিরিয়া) ঃ ১৯০।
কাসবা, আল ঃ ৪৬।
কাযার আল ঃ ৪৬।
কালিলা-ই-ডিমনা (ভারতীয় কাহিনী) ঃ ৪৮, ৮৪, ২২১।
কাউন্ট অব বার্সেলোনা ঃ ৫২।
কাই রোয়ান ঃ ৬১, ১৮৯।
কার্নিভ্যাল (সঙ্গীত) ঃ ২১৮।
কাক্সটন (লেখক) ঃ ২২০।
কাপুয়ার জন (ধর্মান্তরিত ইহুদী) ঃ ২২১।
কাপসোনা প্যালটিনা (গির্জা) ঃ ১৯৬।
কারকাসোন ঃ ১৯৬।
কালাউন ঃ ৩৬।
কাস্পিয়ান সাগর/অঞ্চল ঃ ৭০, ১২৪, ২১৯, ৩৪৫।
কাউন্ট রবার্ট অব প্যারিস ঃ ৮৪।
কাটাল্লা এট রেডিটসে ঃ ৮৮
কান্ট ঃ ৮৯।
কাযউইনী আল ঃ ১০৫, (যাকারিয়া আল) ৩৪৯।

www.waytojannah.com

কারামতিয়া ঃ ২৩৯।
কামালউদ্দীন (পারস্যবাসী) ঃ ৩৫০, ৩৫২।
কাশফুল মাহজুব ঃ ২৪২।
কালোনিমাস বেন কালোনিমাস ঃ ৩৭৫।
কাপেল্লা ঃ ৩৭৬।
কার্ডান ঃ ৩৮৮, ৩৯৬।
কানুন আল (ফিত-তিব) ঃ ৩৭৭।
কায়রো ঃ ৬২, ৬৫, ৬৬, ৭০, ১২৭, ১৩৩, ১৩৪, ১৫৯, ১৬৩, ১৯০, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৯, ২০১, ২০৩, ২০৫, ২৬১, ২৬৪, ৩১২, ৩৩৯, ৩৪১, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৯, ৩৬০।
ক্যালে ঃ ১৫০।
ক্যাস্ট্রিল, রাজ্য ঃ ২০, ২১, ২২, ২৭, ৩৬, ৪৮, ৪৯, ৫৩, ৬২, ২২৩।
ক্যালাটায়ুদ্ভ (কালয়াত আইউব) ঃ ৩০।
ক্যাপাব্লাঙ্কা (দাবাড়ু) ঃ ৫২।
ক্যান্টিগাস ডি সান্টামেরিয়া ঃ ৫৩।
ক্যাণ্ডিয়া ঃ ৬৭।
ক্যান্টিফ্যাবল ঃ ৮৪।
ক্যাম্বালুক ঃ ৯০।
স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ঃ ২১৯।
ক্যাম্পোসান্টো ঃ ১২৮।
ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ ঃ ৯২।
ক্যান্টন ঃ ১০৭।
ক্যাথলিক চার্চ ঃ ২৪৩।
ক্যাম্পনিনি ঃ ২০১, ২০৫।
ক্যাসিয়াননা ব্যাসাস ঃ ৩২৯।
ক্যানামুসালী (মসূলের চক্ষু চিকিৎসক) ঃ ৩৩৯।
ক্যাসিও ডোরাস ঃ ৩৭৬।
ক্যাভেলেরো এল সিগার ঃ ২২২, (স্কট) ২২৯।
কিনসাই ঃ ৯১।
কিন্দি-আল ঃ ৩৭।
কিরমান ঃ ৯৪।
কিতাবুল লুমা ঃ ২৪১।

www.waytojannah.com

কিরমানী আল ঃ ৩৭১।
কিরাদ (লিমিটেড পার্টনারশীপ) ঃ ৩১৯।
ক্রিস্টো ডি লা লুয ঃ ৩০।
ক্রিস্টোফার স্লাই ঃ ৪৯।
ক্রিস্টি, এ, এইচ ঃ ২০৫।
ক্রিমিয়া ঃ ৬৬, ৯০।
ক্লিমেন্ট সানচেয ডি ভাসিয়াল ঃ ৪৯।
ক্রিমোনার জিরার্ড ঃ ৩৫৪, ৩৫৯, ৩৭৪, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৯০।
ক্রীট দ্বীপপুঞ্জ ঃ ৬৫, ৬৭, ৯৪।
কুইটিস বিয়েটা ঃ ২৭।
কুইডিস মেনটেনগা, রিকুইস ঃ ২৭।
কুবলাইয়ান ঃ ১৫১।
কুর্দ সিরকুহ ঃ ৬৫।
কুতাহিয়া ঃ ১৩৮।
কুলযুম, আল ঃ ১১০।
কুতুউল কুলুব ঃ ২৪১।
কুরাইশ ঃ ২৯৮, ৩০৭, ৩১২।
কুরআন ঃ ৭৯, ৯৭, ৯৯, ১১৫, ১২২, ২৩৩, ২৩৬, ২৩৯, ২৪২, ২৪৪, ২৬০, ২৬৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮৭, ২৯১, ২৯২, ৩০১, ৩০৬, ৩০৭, ৩২১, ৩২২।
কুসাতা ইবনে লুকা ঃ ৩২৬, ৩৮৩, ৩৯০।
কুল্লিয়াত ফিত তিব ঃ ৩৪৭।
ক্লুনিয়াক, সন্ন্যাসী ঃ ২৭।
ক্রুসেড ঃ ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭৩, ৭৪, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ১০২, ১০৫, ১০৮, ১১০, ১১৪, ১৩৩, ১৪৮, ১৭২, ১৭৬, ১৯৫, ১৯৬, ২০৩, ২০৫, ২২৯, ৩৫৬।
কূফা ঃ ২৬৯, ৩২৩, ৩২৪।
কেনিয়া ঃ ১৯৬।
কোঁদ ঃ ১৯।
ক্রেসডয়েল, মি. কে. এসি ঃ ১৯৫।
কোহেন আল আত্তার (ইহুদী) ঃ ৩৪৭।
কোপার্নিকাস ঃ ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৯৩, ৩৯৭।

www.waytojannah.com

কোরিয়া ঃ ১০৭।
কোয়াড্রিপ্যার্টিয়াম ঃ (টলেমি) ঃ ৩৮৪।
কোয়েল ডিউস স্যালভেট ঃ ২৭।

খ

খলীল, আল (প্রথম শব্দকোষ সংকলক) ঃ ৩৬৯।
খসরু নওশিরওয়ান ঃ ৩২২।
খানফু ঃ ১০৭।
খাযার সাম্রাজ্য ঃ ১১২, ১১৪।
খারেজমী আল (জ্যোতির্বিজ্ঞানী) ঃ ৯৮, ১০৬, (মোহাম্মদ ইবনে আহমদ আল) ঃ ৩৪২, ৩৭০, ৩৭৩, ৩৮২, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৯২, ৩৯৫।
খাওয়ারিজম ঃ ৯৪, ১১২।
খালিদ ইবনে বারমাক ঃ ৩৮৪।
খিবা ঃ ১১২।
খিজর ইবনে আবদুল্লাহ্ ঃ ৩৭৪।
খিলাফত (খলীফা) ঃ ২৫৯, ৩০৫, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৪।
খুশলী আল ঃ ২৫।
খুরাসানিয়ান (স্বরগ্রাম) ঃ ৩৬৩।
খোরাসান ঃ ৭২, ৯৯, ১০২।
খৃস্টান ঃ ২০, ২১, ২৩, ২৬, ২৭, ২৯, ৩৪, ৩৮, ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫৩, ৫৬, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৯, ৭০, ৭২, ৭৩, ৮২, ৮৯, ৯১, ৯২, ৯৫, ৯৮, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৯, ১১০, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২৩, ১৪৫, ১৫১, ১৬৮, ১৭২, ১৭৫, ১৭৬, (কপটিক) ১৮০, ১৮২, ১৮৪, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৯, ২১৪, ২১৯, ২২৩, ২৩১, ২৩২, (ধর্ম) ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৯, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৫২, ২৫৯, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৭১, ২৭৮, ২৮১, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৯০, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ৩০১, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৬, ৩৩০, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৬, ৩৭১, ৩৭৮, ৩৮০।

গ

গথে ঃ ২২৯।
গথিক রোমান্স ঃ ২২৫।

www.waytojannah.com

Contents

গযনী ঃ ২৫২।
গাযযালী (গার্যাল আবূ হামেট) (র) ইমাম/আল ঃ ৭২, ২৩৭, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৯, ২৬৪। (হুজ্জাতুল ইসলাম) ২৮৪, ২৮৫, ২৮৮, ২৮৯, ২৯১, ৩১২, ৩৪৫, ৩৬৫, ৩৮২।
গাইদ্য চৌলিয়াক (ফরাসী শল্য চিকিৎসক) ঃ ৩৩৮, ৩৫৮।
গাসসান ঃ ৩৬২।
গারিদম/গারিজম, আল ঃ ৩৮৯।
গাবরি (মৃন্ময়পাত্র) ঃ ১৩৮।
গারবার্ট গুভান ঃ ১২৪।
গারেট, এ ঃ ১২০৭।
গর্টরুড বেল ঃ ১৯০।
গালিভার্স ট্রাভেল ঃ ২২৫।
গ্রাণ্ডিই জেনারেল, এস্টোরিয়া ঃ ৪৯।
গ্রাফিটো (নকশা) ঃ ১৩৮।
গ্রানাডা ঃ ২১, ২৭, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৫৬, ৫৭, ১৫০, ২২৩, ৩৮০।
গ্যালেন ঃ ৩২১, ৩২২, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩৩৯, ৩৪৬, ৩৪৮, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৯, ৩৬৯, ৩৭৪।
গ্যালিসিয়া ঃ ২৪।
গিয়াসুদ্দীন জামী ঃ ১৫৬।
গিউলেটের ঃ ২২৪।
গিলস ডি ওভার্নি ঃ ২৮৪।
গ্রিফিন (নকশা) ঃ ১৩৯।
গ্রিমলেস ওসেল (লেখক) ঃ ২২৭।
গ্রীক (দর্শন/পুস্তিকা/জাতি/দৃষ্টান্ত) ঃ ৩৭, ৩৯, ৪৭, ৬০, ৭২, ৭৩, ৭৬, ৯৪, ৯৭, ৯৮, ১১৪, ১২০, ১২৩, ১৩১, ১৫১, ১৯০, ২০৯, ২১০, ২১২, ২২৯, ২৩৪, ২৩৫, ২৪৯, ২৫৯, ২৬১, ২৬৫, ২৮৬, ২৭৬, ২৭৮, ৩০৩, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৭, ৩৩৯, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৯, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৫, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬২, ৩৬৯, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৬, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৮, ৩৯৫।
গ্রীস ঃ ৬৬, ২১৯, ২৮২।
গুলিস্তাঁ ঃ ২২৭।
গুয়াডালাজারা (ওয়াদিউল হিজারা) ঃ ৩০।

www.waytojannah.com

Contents

গুণ্ডিসালভি, আর্ক ডিকন ডোমিনিযো ঃ ৩৫৪।
গুণ্ডিসালভাস ঃ ২৬৪, ২৭৩, ২৮৩, ৩৭৫।
গেইনার্ড (দুর্গ) ঃ ৭৪।
গেস্টা ফ্রাঙ্কোরাম (অজ্ঞাত নর্ম্যান লেখক) ঃ ৮৩।
গেসচিচটে সে আর্সবেন ঃ ৮৩।
গেস্টা রোমা নোরাম ঃ ২২১।
গ্রেগরিয়ান আন্দোলন ঃ ৮৬।
গ্রেইন সাগর ঃ ২১৮।
গোনযালো ডি বার্সিও ঃ ৪২।
গোবিনিউ ঃ ২৩০।
গোল্ডস্মিথ ঃ ২২৫।

ঘ

ঘানা ঃ ১১২।

চ

চার্লস (পঞ্চম) ঃ ১৪৫, (সিঙ্গার) ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৫।
চ্যানসঙ্গ ডি গেস্ট ঃ ৭২, (ডেসচেটিফ্‌স) ৮৩, (ডি-এন্টিয়ক) ৮৩।
চ্যান্টেফ্যাবল ঃ ২১৯।
চারট্রেস (ফালচার) ঃ ৭২।
চিউনী (ইটালী) ঃ ১৯০।
চিন্টস্ (সুতিকাপড়) ঃ ১৭৪।
চীন ঃ ৬৬, ৭০, ৭৮, ৯১, ৯৭, ১০২, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, (চীনা) ১১৪, ১৩৭, ১৩৮, ১৪০, ১৫১, ১৫২, ১৬৭, ৩২৯, ৩৩০, ৩৪১।
চেঙ্গিসখান ঃ ৬৬, ১৩১।

জ

জন অব মন্টি কর্ভিনো (ক্যাম্বলুকের আর্কবিশপ) ঃ ৯১।
জন ডি পিয়ান ক্যার্পাইন ঃ ৬৬।
জর্জ বার্ট ঃ ৯৬।
জঙ্গী আতাবেগ ঃ ৬৫।
জংলার (ট্রুবাডুর ধর্মদ্রোহী) ঃ ৩৬৮, ৩৭৮।
জটো (চিত্রকর) ঃ ১৭৭।

www.waytojannah.com

Contents

জাবাল কুর্য মন্টি ঃ ৪৩।
জায়হানী আল ঃ ৯৯।
জাপান ঃ ১০৭, ১০৮।
জারমিখনি ডেস (গির্জা) ঃ ১৮১।
জাকোপান ডিটোডি ঃ ২১৮
জার্মান/জার্মানী ঃ ১০৫, ১১৫, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩২, ৩১৫, ৩৫৯।
জাবির ইবনে হাইয়ান (জেজের) ঃ ৩২৩, ৩২৪, ৩২৯, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৪৫, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯।
জাস্টিনিয়ান ঃ ৩২২।
জাকোবাইট ঃ ২৬৯।
জাযযার আল ঃ ৩৩৩।
জাযারী আল ঃ ৩৫০, (বদিউযযামান) ৩৯০।
জালালুদ্দীন রূমী ঃ ২৪০, ২৪৪, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪।
জ্যাকব (ইহুদী) ঃ ৩৫৭।
জিমেনা ঃ ২৭।
জিরাল্ডা টাওয়ার ঃ ২৯।
জিপসী ঃ ৩৬।
জিব্রালবিন, সিয়েরা ডি ঃ ৪৩।
জিব্রাল ফারো ঃ ৪৩।
জিব্রাল্টার ঃ ৪৩, ৬০, ১৭৯।
জি-এল-বেন (প্যালেস এণ্ড মস্ক এট উগাইদির গ্রন্থের লেখক) ঃ ১৯০।
জিনেস পেরেয ভি হিটার গুয়েরাস সিভিলেস ঃ ২২৩।
জুহায়ের (নাট্য চরিত্র) ঃ ২২২।
জুনাইদ বাগদাদী ঃ ২৩৭, ২৩৯।
জুয়ান আভেলডেথ ঃ ২৭৪।
জুদাহ্ হা-লেভি (টলেডো) ঃ ২৮২।
জুরজিস ঃ ৩২৪।
জুদিয়া (ফেলিস্তিন) ঃ ২১৭।
জেনোয়ান ঃ ৬৩।
জেনোয়া ঃ ১০৯, ১১০, ১৭৬।
জেবেল মূসা (মরক্কো) ঃ ১৭৯।
জেদ্দা ঃ ১১০।

www.waytojannah.com

Contents

জেরোনা ক্যাথিড্রাল ঃ ১২৪, (শহর) ঃ ২০৩।
জেরোম মোরাভিয়ার ঃ ৩৭৫।
জেরুজালেম ঃ ৫৮, ৫৯, ৬২, ৬৩, ৬৫, ৬৭, ৭০, ৭১, ৭৪, ৮০, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯২, ৯৫, ১০৫, ১৮২, ১৮৪, ২৬১।
জেরার্ড অব ক্রিমোনো ঃ ১০৬।
জে স্ট্রেজিগোভস্কী ঃ ১৮৬।
জোন্স ঃ ২৩০।
জোসেফ (ইউসুফ এণ্ড যুলেখা) ঃ ২২৭।
জোসেফ আলবো ঃ ২৮৩।
জোসেফ আল ফাইয়ুমী, সাআদিয়া বেন ঃ ২৮৩।
জোসেফ ইবনে সাদিক (কর্ডোভা) ঃ ২৮২।
জোসেফ বার্টর‍্যাণ্ড ঃ ৩৯৩।
জোহান কেপলার ঃ ৩৪৩।
জোহানেস ফিলো বোনাস (আলেকজান্দ্রিয়া) ঃ ৩২১, (এ্যাপেলিয়াস) ঃ ৩৫৩, (হিসপ্যালেনসিস) ৩৭৪, (ডি, মুরিস) ৩৭৭। (ভিলুনা হিসপ্যালেনিস) ৩৮৫।

ট

টমাস অ্যাকিনাস ঃ ২৩।
টমাস নর্থ ঃ ২২১।
ট্রফস্ পয ডিভয়ের ঔভার পার ডেহর্স এ ইমেজেস এ লা ফ্যাকন ডি ডামাস ঃ ১৪৫।
টলেডো ঃ ২৭, ৩০, ৩৩, ৩৭, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৬২, ৭২, ১০৬, ২৮৫, ২৮৭, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৮, ৩৯৭।
টলেমী ঃ ৬১, ৯৭, ৯৮, ১০৩, ১০৬, ১১৩, ১২৩, ১২৪, ৩২১, ৩২৮, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৫২, ৩৬৩, ৩৭৩, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৯৩, ৩৯৮।
টার্কিস টেলস্ ঃ ২২৪।
টাটা গালিয়া ঃ ৩৯৬।
টালমুড ঃ ২৮৮।
টাসো ঃ ৮৩
টাভেনিয়ার ঃ ২২৪।
ট্রানসোক্সানিয়া ঃ ৯৪, ৯৯, ১১১।
ট্যানক্রিড ডি হার্টি ভ্যাল ঃ ৬৩।
ট্যালিসম্যান ঃ ৮৪।

www.waytojannah.com

ট্যাম্বোরিন ঃ ৩৬৪।

টিউটানিক ঃ ২১২।

ট্রিউগা ডি ঃ ৬৩।

ট্রুবাডুস, এইচ, জে ঃ ২২২।

ট্রুবাডুর ঃ ৩৮, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭।

টেরমিউলেন ঃ ৮৯।

টেরাই ট্যাঙ্কটাই ঃ ১০৫।

টেসিবিয়াস ঃ ৩৫০।

টোটা (নাভারের রানী) ঃ ২৬।

টোবাসের যুদ্ধ ঃ ৭২।

ড

ডন জুয়ান ম্যানুয়েল ঃ ৫৪।

ডলসে স্টিল নুওভো ঃ ২২২।

ডরোথিয়া (সিগোর) চার্লস ঃ ২৬৪।

ডায়হাম ঃ ৩০।

ডাউয়েন ঃ ১১৫।

ডাই কান্সট ডের ইসলামিচেন ভোলকার ঃ ২০৭।

ডামস্টার্ট ঃ ২০৭।

ডাইলিজেন্ডে ভন বারলাম এন্ড জোসাপ্ট ঃ ২২০।

ডাইরেকটেরিয়াম হিউম্যান ভিটে ঃ ২২১।

ড্যানসিগে (পোল্যাণ্ডের বন্দর) ঃ ১৫১।

ড্যানিয়েল মার্লি ঃ ৪৭।

ডায়োফেন্টাস (লেখক) ঃ ৩৮৬।

ডায়োনিসিয়াস ঃ ২৩৭।

ডায়োস কিউরাইড্স ঃ ৩২৫, ৩৩৮।

ডান্স স্কটাস ঃ ২৬৬।

ডাইয়িয আইব্রী ঃ ২৯৯।

ডালসিমা ঃ ৩৬৬।

ডি গুযাডায়রা ডি চিমবার্ট ঃ ৪৫।

ডিসিপলিনা ক্লিরিকালিস ঃ ৪৮।

ডি এল এমপ্লয় ডেস কারেকটার্স অ্যারাবেস ড্যানস এল অর্নামেন্টেশন, চেযলেস পিউপলস্ (ক্রোটিয়েশ ডি এল অক্সিডেন্ট ঃ ১৭৬।

www.waytojannah.com

ডি এল ইন্সটিটিউট, ফ্লাঙ্কয়েস ডি আর্কিওলজি ওরিয়েন্টাল (বুলেটিন) ঃ ১৯৫।
ডিয়েয-ই ঃ ২০৭।
ডিকমারেক্স ঃ ২১৯।
ডিভাইনা কমেডিয়া ঃ ২২২।
ডিভান ঃ ২২৮।
ডি হার্বিলেট ঃ ২৩০।
ডি নিউমারো ইণ্ডিকো ঃ ৩৮৮।
ডি প্রসেশান মুন্ডি ও ডি অ্যানিমা ঃ ২৮৩।
ডি সাবাট্যানটিস সেপারেটিস ঃ ২৮৪।
ডি আর্টি ভেনাণ্ডে ঃ ৩৫৫।
ডুবয়স ঃ ৮৯।
ডেভিড হার্মেনাস (চক্ষুবিজ্ঞানী) ঃ ৩৫৭।
ডেভিড কিং [হযরত দাউদ (আ)] ঃ ১০৯।
ডেগলি আগলি (পরিবার) ঃ ১৪০।
ডেরগেডাঙ্কে ডের ইন্টারনেশনালের অর্গানাইজেশন ঃ ৮৯।
ডেফো (লেখক) ঃ ২২৫।
ডেলাক্রেওয়া ঃ ২২৯।
ডোযি ঃ ১৯, ৪১, ২১৪, ২১৫।
ডোম অব দি রক (কুব্বাতুস সাখরা) ঃ ১৮৪, ১৮৬, ১৮৭।
ডোনি ঃ ২২১।

ত

তাইগ্রিস ঃ ১১৮।
তারিক ঃ ৪৪।
তাব্রিয ঃ ৬৬, ৯০, ৯১।
তাং রাজবংশ ঃ ১৫১।
তাম্বুরা ঃ ৩৬৪, ৩৬৫, (তার্কি) ৩৬৬, (বিবিলিমা) ৩৬৬।
তাহাফুতুত তাহাফুত ঃ ২৯০।
তিউনিস ঃ ১০৮, ১৮৯, ২৮৭, ৩৩২।
তিব্বত ঃ ৩২৯।
ত্রিপোলী ঃ ৬৬, ৮৩।
তুরান ঃ ৮৪।

www.waytojannah.com

Contents

তুর্কী ঃ ৫৯, ৬১, ৭২, ৮৯, ১০৮, ১১১, (তুরস্ক) ১১৬, ১৪৩, ১৪৪, ১৫২, ১৫৫, ১৫৬, ১৭১, (-স্তান) ১৮০, (-রস্ক) ১৯৬, ১৯৯ (-র্কী) ২০৩, ৩১২, (স্থান) ৩২৯, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৮০, ৩৮২।
তেহরান ঃ ৩৩০।
তৈমুর ঃ ১৩৩, ১৪৫, (লঙ) ৩৯৯।

থ

থয়নট আরবিউ ঃ ৩৭৭।
থিওফিল্‌স্ (কন্সটান্টি নোপল) ঃ ৩২১।
থিওফ্রেসটাস ঃ ৩৫২।
থেসিস্টিয়াস ঃ ৩৬৯।

দ

দাইবুল (দেবল) ঃ ১০৮।
দাউদ আঃ, হযরত ঃ ২৮২।
দাউদ আল-আনতাকি ঃ ৩৪৭।
দান্তে ঃ ২৩, ১০৭, ২২২, ২২৩, ২৪৩, ২৪৮।
দানিউব নদী ঃ ৯২।
দামেস্ক ঃ ৭৮, ১১৪, ১২৮, ১৩৩, ১৪৪, ১৫০, ১৮৭, ১৮৯, ১৯৯, ২২৪, ২৪৫, ২৬১, ৩২০, ৩২৩, ৩৫০, ৩৫৬।
দামিরী, মোহাম্মদ আদ ঃ ৩৪৯, ৩৫৯।
দারুল হিকমাত ঃ ৩৪৫।
দিল্লী ঃ ১৭৫, ১৯৬।
দিমাশ্‌কী, আল ঃ ১০৫।
দি ডিকটেস এণ্ড সেয়িংস অব দি ফিলোসফারস ঃ ২০৭।
দি ডেভেলপমেন্ট অব অর্নামেন্ট ফ্রম অ্যারাবিক স্ক্রিপ্ট ঃ ১৭৭, ২০৫।
দি ভিসন অব মিরযা ঃ ২২৫।
দুলাফ, আবু (মসজিদ) ঃ ১৯০।

ন

নরউইচ ঃ ৩০, ১৯৬।
নর্ম্যান ঃ ৬২, ৬৩, ৬৯, ৭১, (ক্যাস্টেলেশন) ৭৪, ৭৬, ১০৩, ১৫১, ১৯৮, ২১৭, ২৬১, ৩৫৫।

www.waytojannah.com

নরওয়ে ঃ ১১১।
নর্দাম্পটন শায়ার ঃ ১৫৬।
নর্দাম্পটন ঃ ২০৩।
নভেল্লি ঃ ২২১।
নস্টিসিজম ঃ ২৪৫।
নওবখ্‌ত (পারস্যের জ্যোতির্বিজ্ঞানী) ঃ ২৮৪।
নাভার ঃ ২৫, ৬২।
নাইট (যোদ্ধা) ৬৩, (ফ্রাঙ্কিশ) ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮৯।
নাসির-ই-খসরু ঃ ১০২, ১২৭।
নাসিরুদ্দীন (আল-তূসী) ঃ ৩৮২, ৩৮৩, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯।
নাদিম আন (ফিহ্‌রিস্ত আল-উমূম-এর লেখক) ঃ ৩৪২।
নাইজার নদী ঃ ১১২, ১১৩।
নাঈমা, আবুল মাসীহ ইবন আবদুল্লাহ ঃ ২৬৯।
ন্যাটিভিটি (গুহাগৃহ) ঃ ৯০।
নিউলেট ঃ ২২৪।
নিও প্ল্যাটোনিস্ট ঃ ২৪৪, (-নিজম) ২৪৫, (-নিক) ২৬০, ২৭১ (-নিজম) ২৮২, (-নিক) ৩৩৪, ৩৯৩।
নিযামী ঃ ২৫২।
নিযাম ঃ ২৪৮।
নিযামী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ২৬১।
নিযামুল মুলক ঃ ২৬১।
নিকম্যাচিয়ান এথিক্স ঃ ২৬৫।
নিকোমিচাস ঃ ৩৬৩, ৩৭৬।
নিউ টেস্টামেন্ট ঃ ২৯৫।
নিশাপুর ঃ ২৬১, ২৮৫।
নীলকান্তমণি ঃ ১৩৯।
নুয়াইবি, আল (লেখক) ঃ ৩৬৩।
নূরুদ্দীন ঃ ৮৯ (দামেশকের সেলজুক শাসক) ৩৫৬।
নেচার অব স্যারাসেনিক অর্নামেন্ট ঃ ২০৩।
নেভা (সাম্রাজ্য) ঃ ২০।
নেস্টোরিয়ান (খৃস্টান) ঃ ৬৬, ৯১, (মতবাদ) ২৯০, ৩২১, ৩২২, ৩২৪।
নোভারা ঃ ৭২।

www.waytojannah.com

প

পর্তুগাল/পর্তুগীজ ঃ ২১, ৩৩, ৩৮, ৪০, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬,৫০, ৫৩, ৫৯, ১০৮।
প্রভেন্সাল ঃ ২১১, ২১২, ২১৬, ২১৭।
পসিবিলমেন্টে স্টোরিকো ইগ্রসিমো আল-ভেরো ঃ ৮৪
প্রপুগনাকুলাম ঃ ১৯৬।
পালেরমো (সিসিলি) ঃ ৩৩, ৪৭, ৬১, ১৫১, ১৭৬, ১৯৮, ৩৫৫।
পারস্য/পারসিক ঃ ৫০, ৫৮, ৬৬, ৯১, ৯৪, ১০১, (উপসাগর) ১০১, ১০২, ১০৫, ১০৭, ১০৮, ১১০, ১১১, ১১৫, ১১৬, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১৩৩, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৪, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫৬ ; (শাহ) ১৬৩, ১৭১, ১৭৪, ১৭৬, ১৮২, ১৯৮, ১৯৯, ২০১; (খিলান) ২০১, ২০৩, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১৩, ২২০, ২২৪, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩৭, ২৪১, ২৪৪, ২৪৯, ২৫১, ২৫৫, ২৫৭, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৬, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৯, ৩৫২, ৩৬২, ৩৭৩, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৯।
পারগেটোরিও ঃ ১০৭।
পারভা-নেচারালিয়া ঃ ৩২৩।
পার্সিভ্যাল পট ঃ ৩৫৯।
প্যাট্রোনিও (মন্ত্রী) ঃ ৫৪।
প্যালিওগলি ঃ ৬৭।
প্যাভলভস্কী, এ (লেখক) ঃ ১৭৬।
প্যাস্টোরাম রোমান্স ঃ ২২৪।
প্যাঞ্জোর ঃ ৩৬৪।
প্যারিপ্যাটিটিক ঃ ২৭৬, ২৮৪, ২৯২, ২৯৩।
প্যারিস/(-বিশ্ববিদ্যালয়) ঃ ৮২, ৮৭, ৯০, ১৬৩, ১৬৬, ২০৭, ২২৪, ২৩৮, ২৬১, ২৬৫, ২৬৯, ২৯০, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৯২।
প্লাটো অব টিভলী ঃ ১০৬।
প্যালেস্টাইন চ্যাপেল ঃ ১৭৬।
পিডাল মেনেনডেয ঃ ১৯, ২০।
পিরেনিজ ঃ ২০, ৬০, ৬১, ৭২।
পিসান ঃ ৬৩।
পিটার দি হার্মিট ঃ ৮৩।
পিটরার্ক (ইটালীয় কবি) ঃ ২১৮।

www.waytojannah.com

পিকারেক্স ঃ ২২১, ২২২, ২২৪।
পিকরো (স্পেনীয় নায়ক) ঃ ২২২।
পিটার ফ্লন্টার ঃ ১৭৪।
পিসা ঃ ১৭৬।
পিয়েরেফাণ্ডস ঃ ১৯৬।
পিক্টোরিয়েল আর্ট ইন মুসলিম, এ স্টাডি অব দি প্রেস অব ঃ ১৭৭।
পিয়ের ব্রিসা (ফরাসী চিকিৎসক) ঃ ৩৫৯।
পিথাগোরিয়ান (স্বরগ্রাম) ঃ ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৯, ৩৮৮।
পিয়ানো ফোর্টি (বাদ্যযন্ত্র) ঃ ৩৬৩।
প্রুট্স্ ঃ ৭৩, ৮০, ৮৪।
পেড্রো (আল বিজেসী) ঃ ২২, (আলকামা) ৩৯, ৫৭।
প্লেটো ঃ ৭১, ২৬৫, ২৭২, ৩৬৯।
পেপিস, মি ঃ ১৫০।
পেইন্টিং ইন ইসলাম (স্যার টমাস ডাব্লু আর্নল্ড রচিত) ঃ ১৭৭।
পোয়েমা ডি ইউসুফ ঃ ৫৫
পোয়েম অব মাইসিড-দি ঃ ৪৮।
পোল ভিটোল্লিও ঃ ৩৪৩।
প্রোটেস্ট্যান্ট (ধর্ম) ঃ ৩০০।

ফ

ফন্টেন ব্লু ঃ ১৭৫।
ফস্ ভিটাই ঃ ২৮৩, ২৮৪।
ফরীদুদ্দীন আত্তার ঃ ২৫২।
ফার্ডিন্যান্ড ঃ ২১, ২২।
ফার্মার, ড ঃ ৩৬।
ফারাবী আল ঃ ৩৭, ২৪৯, ২৬৪, ২৭২, ২৭৩, ২৮৭, ৩৪২, ৩৫৪, ৩৬৬, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৯৩।
ফাতেমী, খলীফা ঃ ৬২, ১২৭, ১৩৪, ১৩৯, ১৬২, ২৮১ ; (কাইরোয়ান) ৩৩২।
ফারগানা ঃ ৯৪।
ফারস ঃ ৯৪।
ফারগানী আল ঃ ৯০, ৩৮২ (ফ্রগানাস) ৩৮৫।
ফারায়েয ঃ ২১১।

www.waytojannah.com

ফারসী ঃ ৩২৯।
ফারাজ ইবনে সালিম (সিসিলীয় ইহুদী চিকিৎসক) ঃ ৩৩২, (ফারাগুট) ঃ ৩৫৫।
ফাসলুল আকালী ফি মুয়াফাকাতিল হিকমাতি ওয়াশ শারীআ ঃ ২৯১।
ফ্রান্স/ফরাসী ঃ ১৯, ২৭, ৩৪, ৫৫, ৫৬, ৬৫, ৬৬, ৬৯, ৭৯, ৮০, ৮৬, ৮৯, ৯০, ১১৩, ১৪৫, ১৫০, ১৮১, ১৯৫, ১৯৬, ২০৫, ২০৮, ২১১, ২১৮, ২২১, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৮৩, ২৮৬, ২৯১, ৩৩২, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৯, ৩৭৮, ৩৮৩।
ফ্রান্সিসকো গিনার ঃ ১৯।
ফ্রস্কো ঃ (কলোন) ঃ ৩৭, (ফিল) ঃ ৪১।
ফ্রাঙ্ক ঃ ৬১, (ফ্রাঙ্কিশ) ঃ ৯২, ৩৫৬।
ফ্লাণ্ডার্সে ঃ ৭৯।
ফ্রাঙ্ক আর কালক ঃ ৯৫।
ফ্রান্সিসকো ডি পেলেগারিনো ঃ ১৭৩।
ফ্রান্সিস (১ম) ঃ ১৭৪।
ফ্রা অ্যাঞ্জেলিক (চিত্র) ঃ ১৭৭।
ফ্রালিপ্‌পো (চিত্র) ঃ ১৭৭।
ফ্রাঙ্কফুর্ট ঃ ৩৪৩।
ফ্রাঙ্কোবার (কলোন) ঃ ৩৭৬, ৩৭৭।
ফ্যাশিড, এ মোরেল ঃ ৪৯।
ফ্যাবলিও ঃ ২১৮।
ফিলিপ (২য়) ঃ ২২, (অগাস্টাস) ৮৮।
ফিলিস্তিন ঃ ৬৬, ৬৯, ৭৪, ৭৬, ৯০, ১৮৬, ২৬৯, ৩২৬।
ফিজিকা এট মেটাফিজিকা ঃ ৮৭।
ফিনল্যাণ্ড ঃ ১১১।
ফিসমাউলিস ক্যালি (এ নিউ হিস্টোরী অব ফ্যানিশ লিটারেচার এর লেখক) ২১৫।
ফিযজিরান্ড ঃ ২৩০।
ফিটস্‌জিরাল্ড ঃ ২৭৯।
ফুতুহাতুল মাক্কিয়াহ ঃ ২৪৫।
ফুসূহুল হিকাম ঃ ২৪৫।
ফুসতাত ঃ ১৩৪, ১৩৯, ১৪৯, ১৮২।
ফুসচেন ঃ ১৪৯।

www.waytojannah.com

ফেয ঃ ৩৬।

ফ্রেডারিক (২য়) ৪৭, ৬১, ৭০, ৭১, (১ম) ৭৬, (২য়) ৮২, ৮৬, ৮৭, ২১৭, ৩৫০, ৩৫৫।

ফ্লোরেন্স ঃ ১৪০, ১৭৪, ২০৩।

ব

বনু মূসা ঃ ৩৯০, ৩৯১।

বলখী আল ঃ ৯৯।

বলকান (রাজ্য) ঃ ২০, ২৬।

বলখ ঃ ৩৮২।

বসফরাস ঃ ৬১।

বসরা ঃ ১০৭, ২৫৯, ২৬৯, ৩৪২।

বলোগনা ঃ ২৬১।

বাইবার্স (সুলতান) ঃ ৬৬, ১৪৯।

বাইবেল ঃ ২৮৭, ২৯১।

বাইতুল হিকমত ঃ ৩৫৪।

বাইয়ামী আল (অর্গ্যান নির্মাতা) ঃ ৩৬৬।

বাইযেন্টাইন/ (-য়াম) ঃ ২৯, ৩৪, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৫, ৬৭, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮২, ৮৯, ৯৪, ৯৫, ৯৯, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১৩৪, ১৪৯, ১৫১, ১৮০, ১৮৪, ১৮৬, ১৯৬, ২০১, ২০৩, ২৬৫, ২৬৭, ৩২১, ৩২৩, ৩৩৮, ৩৫৭, ৩৬২, ৩৮১, ৩৮৪।

বাউটন হাউস ঃ ১৫৬।

বার্বার ঃ ২৩, ২৬, ৪৭, ৬১, ৭১।

বাগদাদ ঃ ২৩, ৫৯, ৭০, ৭২, ৭৮, ৯৪, ১১০, ১১৪, ১২০, ১৩১, ১৫০, ১৯০, ১৯৫, ২১৩, ২২৭, ২৩৪, ২৩৯, ২৬১, ২৬৮, ২৬৯, ৩১১, ৩১২, ৩২০, ৩২৬, ৩২৭, ৩৩০, ৩৩৯, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৫৪, ৩৫৭, ৩৬৩, ৩৬৯, ৩৮০, ৩৮৪, ৩৮৫।

বার্সিলোনা ঃ ২৬, ৩৬।

বাকরী, আল ঃ ২৭, ১০২, ১১০।

বার্থের এ্যাডেলার্ড ঃ ৪৭।

বাল্ড উইন ঃ ৬৫।

বাল্টিক সাগর ঃ ৭৯, ৮৮, ১১১।

www.waytojannah.com

Contents

বারেল্লা, আল ঃ ১৩৯।
বারনিয়া, আল ঃ ১৩৯।
বাসবেক (কন্সটান্টি নোপলের রাজকীয় দূত) ঃ ১৪৪।
বার্লিন ঃ ১৫০।
বাত্তালী, আল ঃ ৯৮, ১০৬, ৩৮৩, ৩৯২।
বাব আল-নাসর (কায়রো) ঃ ১৯৬।
বালডাচ চিনো ঃ ১৫০।
বার্নি, মিস ঃ ১৫০।
বার্নিয়ার ঃ ২২৪।
বালিংটন (ম্যাগাযিন) ঃ ১৭৬, ২০৫।
বায়রন ঃ ২২৯।
বারনিকী (পরিবার) ঃ ৩২৪
বায়েটে (বিজ্ঞানী) ঃ ৩৯৩।
বাখত ঈশু ঃ ৩২৪।
ব্যাবিলনীয় ঃ ৩২৯, ৩৯৭।
ব্যাকট্রিয়া ঃ ৩৮২।
ব্ল্যাংকোয়ের্না ঃ ২৮৭।
বিতরুজী ঃ ৩৮৩, ৩৯৭।
বিশপ স্টিফেন (প্যারিস) ঃ ২৯০।
বীটাস (অ্যাপক্যালিপ্সের টীকার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকারী) ঃ ১৭৫।
বুহাইরা, আল ঃ ৪৪।
বুলগিরিয়ান ঃ ১০১।
বুলগার ঃ ১১১, ১১২।
বুক অব ভেনাস ঃ ২১৩, ২১৪।
বুখারা ঃ ২৭৩।
বুক অব সাফিসিয়েন্সী (আশ-শিফা) ঃ ২৭৬।
বুর্ত্তা ঃ ২২৭।
ব্রুয ঃ ৭৯।
ব্রুসা ঃ ১৪০।
ব্রুনেটিয়ার ঃ ২১২, ২২৬।
বেনেডিক্ট ঃ ৬২।
বেকার, প্রফেসর (কেম্ব্রিজ মিডিয়েভ্যাল হিস্টরী লেখক) ঃ ৬২।

www.waytojannah.com

বেকফোর্ড (ব্যাথেক রচয়িতা) ঃ ২২৫।
বেলটাওয়ার ঃ ২০১।
বেকন ঃ ২৬৫, (রজার) ২৬৬, ২৭৭, ৩৫৮, ৩৭৫।
রেরেংগার ঃ ৩৫৫।
ব্রেটন, ঔপন্যাসিক ঃ ২২৪।
বোইথিয়াস (অর্গ্যানন লেখক) ঃ ৭২, ২৬৫, ২৭৬, ৩৭৫, ৩৭৬।
বোক্কাকী (লেখক) ঃ ২১৯।
বোকাডার্স ডি ওরো ঃ ২২০
বোডেল স্টেডট ঃ ২২৭।
বোখারা ঃ ৭০, ৯০।
বোরগায়েন এ জে (লেখক) ঃ ১৬৩।
বৃটিশ/ বৃটিশ মিউজিয়াম ঃ ১০৮, ১১১, ১২৩, ১২৮, ১৩১ ১৩২, ১৪৫, ৩৭২।
বৌদ্ধ ঃ ৪৯, ১৯৩।

ভ

ভল সাইরেল ঃ ৮৩।
ভলগা ঃ ১১১, ২১৯।
ভল্টেয়ার ঃ ২২৭, ৩৮৩।
ভারত (-তীয়) ঃ ৭০, ৭৮, ১১১, ১১৩, ১১৪, ১১৬, ১৩৪, ১৭৪, ১৭৯, ১৯৩, ১৯৬, ১৯৯, ২০১, ২১৮, ২১৯, ২২৪, ২২৭, ২২৮, ২৩৭, ২৫৯, ৩২০, ৩২২, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৩৯, ৩৪১, ৩৪৫, ৩৫২, ৩৬০, ৩৮৪, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯৩, ৩৯৪।
ভারবুম, ডি (মতবাদ) ঃ ২৮৪।
ভাস্কো ডা গামা ঃ ১০৮, ১৭৪।
বার্জিল সলিস ঃ ১৭৪।
ভার্জিলিয়াস মারো (ব্যাকরণবিদ) ঃ ২১০।
ভ্যালেন্সিয়া ঃ ২৭, ৪১, ১৪০।
ভিয়েনা ঃ ২৬, ৩৫৯।
ভিক্টোরিয়া এণ্ড আলবার্ট মিউজিয়াম ঃ ১৩২, ১৫৬, ১৬৩।
ভিক্টোরিয়া (যুগ) ঃ ১৭৪।
ভিন্সিগথ ঃ ১৮০।
ভিক্টর হিউগো ঃ ২২৯।

www.waytojannah.com

ভিটে লিউ নেম প্যারালিপ মেনা, অ্যাড ঃ ৩৪৩।

ভিসেন্ট দ্য বুভা (স্পকুলাম নেচারেল বিশ্বকোষ প্রণেতা) ঃ ৩৫৮, ৩৭৫।

ভিলোনোভার, আর্নল্ড ঃ ৩৫৫।

ভূমধ্য সাগর ঃ ২০, ৫৮, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৭, ৭০, ৭১, ৭৯, ৯০, ৯২, ৯৫, ৯৭, ৯৯, ১০১, ১০৭, ১০৯, ১১০, ১১৫, ১৭২, ১৭৫, ২১১, ৩৪৬।

ভেনিস (-য়ান) ঃ ৬৩, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৭৯, ৮৮, ৯০, ৯১, ১৪৫, ১৫৬; (সেন্ট মার্কস ট্রেজারী) ১৬৭, ১৬৮, ১৭১, ১৭৬, ১৯৯, ৩৪৭, ৩৫৯।

ভেরো-আল, ভেরিসিমিলি ঃ ৮৪।

ভেরোনা ঃ ১৩৩।

ভেসালিয়াস ঃ ৩৫১, ৩৫৯।

ভেন্টান সাউউ ঃ ২৫৩।

ম

মরিস্কোপ ঃ ২১, ২২৪।

মদিনাতুয-যাহরা ঃ ৩৩।

মরক্কো ঃ ৩৬, ১০৪, ১১২, ১১৩, ২৬৯, ২৮৯, (মারাকেশ) ২৯০, ৩৪৪, ৩৪৭, ৩৬০।

মসূল ঃ ৫৯, ৬৫, ৭০, ৮৯, ১৩১, ১৩৩, ১৫০, ১৯৮, ৩২০।

মক্কা ঃ ৬০, ৯৪, ৯৬, ৯৮, ৯৯, ১০২, ১০৪, ১১৯, ১৮২, ১৯৪, ২৬১, ২৮১, ৩৪৫।

মনসূর-আল ঃ ৬২ (আব্বাসীয় খলীফা), ৩২৪, ৩৮৪, ৩৮৫, (কালাউন) ৩৫৬।

মঙ্গোল (সাফ্রাজ) ঃ ৬৫, ৬৬, ৮২, ৯০, ৯১, ১০৫, ১১৬, ১৩১, ১৩২, ১৩৯, ১৫১, ২১৯, ২৪৯, ২৬০, ৩১২, ৩৮০, ৩৯৭।

মর‍্যাল ফিলোসফি অব ডোনি ঃ ২২১।

মদীনা ঃ ৯৪, ১৮১, ১৮২, ১৮৪, ১৯০, ২৯৮, ৩৪৫।

মনসুরা-আল ঃ ৯৪।

মসলিন (কাপড়) ঃ ১৫০।

মন্টোকিউ (লেখক) ঃ ২২৪।

মহানবী (সা) ঃ ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৪৭, ২৪৯, ২৬০, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০৭, ৩০৯, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৭, ৩২২।

মসনবী ঃ ২৫৩, ২৫৪।

মনোফিজাইট ঃ ৩২২।

www.waytojannah.com

মন্টপেলিয়ার ঃ ২৬১।
মার্কিন (আমেরিকান) ঃ ১৯, ৪২, ৯০, ১০৬, ২০৮।
মাক্কারী আল ঃ ২৬।
মাকামাত ঃ ২২১, ২২২।
মায়মুনাইড ঃ ২৭।
মাইকেল স্কট ঃ ৪৭।
মাদ্রিদ ঃ ৫৩, ১৬৩, ২৮২, ২৯১।
মামলুক সুলতান ঃ ৬৬, (শাসক) ৩১২।
মার্কোপলো ঃ ৯১, ২১৯।
মামুন-আল ঃ ৯৭, ৯৮, ১০৩, (আব্বাসীয় খলীফা) ২৬৮, ২৮০, ৩৪৫, ৩৫৩, ৩৮৫, ৩৯০।
মাসুদী আল ঃ ১০১, ১০২, (সউ) ৩৬৮।
মালদ্বীপ ঃ ১০৪।
মাকরিযী আল ঃ ১০৫, ১২৭, ১৩৪, ১৬৭।
মালিণ্ডি ঃ ১০৮।
মার্টন কলেজ লাইব্রেরী ঃ ১২৪।
মাহমুদ ইবনে সানকার ঃ ১৩১।
মাহমুদ আলকুর্দী ঃ ১৩৩।
মার্টিনাস পেট্রাস ঃ ১৭৪, (-য়ানাস) ৩৭৬।
মাশহাদ ঃ ১৮৪।
মাটোলানা (গির্জা) ঃ ১৯৬।
মার্টিন এস. ব্রিগ্‌স ঃ ২০৭।
মাশা আল্লাহ (ইহুদী বিজ্ঞানী) ঃ ৩৮৪।
মাইনো মাইডস ঃ ২৮৯, ৩৪৬, ৩৫৭।
মালিকী মাযহাব ঃ ৩১৫।
মাসাওয়িহ আল মারদিনী ঃ ৩৩৯।
মাসলামা ইবনে মাজরিতি ঃ ৩৭১।
মাজেস্ট আল ঃ ৩৮৫।
মাতুরিদী, আবুল মানসূর আল ঃ ২৮০।
ম্যারিনো স্যানুটো ঃ ১০৫।
ম্যাক্সভ্যান বার্চেন ঃ ১৩১।
ম্যানচেস্টার ঃ ১৭৪, ২১৮।

www.waytojannah.com

Contents

ম্যাসিঙ্গার (দি গার্ডিয়ান লেখক) ঃ ২২১।
ম্যাণ্ডেলিন, স্যার জন ঃ ২১৯, ৩৬৫।
ম্যাচিকলেশন ঃ ১৯৫, ১৯৬।
ম্যাচি কোলিশ ঃ ১৯৬।
ম্যাকাইল, প্রফেসর ঃ ২১৭।
ম্যানেকেনিয়ান ঃ ২৩৪।
ম্যাসিপনন, প্রফেসর ঃ ২৩৮।
ম্যাটালজিকৃস্ ঃ ২৬৩।
মিউজিও পলডিপেয যোলি (মিলান) ঃ ১৫৬।
মিল্লাস জে এম ঃ ২১৮।
মিসর (-রীয়) ঃ ৫৮, ৬১, ৬৬, ৮২, ৯০, ৯৪, ৯৫, ৯৯, ১০২, ১০৫, ১১২, ১১৩, ১১৮, ১১৯, ১২৭, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৫, ১৪৯, ১৭১, ১৮০, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৮, ২০১, ২২০, ২৬৭, ৩১২, ৩২১, ৩২৬, ৩২৮, ৩৩৮, ৩৪৪, ৩৪৬, ৩৫১, ৩৭১, ৩৮২, ৩৮৮।
মিরাজ (মহানবীর) ঃ ২২২।
সিং (চীনের রাজবংশ) ঃ ৯১।
মিশকাতুল আনওয়ার ঃ ২৪৩।
মিসিনাস ঃ ৩৮৩।
মুদিজ্জার ঃ ২৯, ৩৩।
মুহাম্মদ (সা) হযরত ঃ ৪৯, ৬৫, ১১১, ২৪৬, ২৪৭, ২৬০, ২৯৮, ৩০০।
মুকতাদির , আল ঃ ১০১।
মুতাওয়াক্কিল আল ঃ খলীফা) ঃ ৩২৬, ৩৪৫।
মুতাসিম, খলীফা ঃ ১৩১, (বিল্লাহ, আহমদ ইবনে) ঃ ২৭০।
মুতাযিলা ঃ ২৬৮, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮৩।
মুঘল সম্রাট ঃ ১৩৪।
মুবাশশির ইবনে ফাতিক ঃ ২২০।
মুবারক শাহ্ মাউলানা ঃ ৩৭২।
মুওয়াহহিদুন আল (-আল মোহাডেস) ঃ ২৬, ২৭।
মুতামিদ (কবি) ঃ ২৬।
মুতাদিদ, খলীফা ঃ ৩৯০, ৩৯১।
মুলুক আল তাওয়াইদ (রিইস ডি টাইফাস) ঃ ২৬।
মুকাদ্দাসী আল (মাকদিসী) ঃ ২৫, ১০১, ১০২।

www.waytojannah.com

Contents

মুযারিব (মুসতা'রিব) ঃ ২৪, ২৬।
মুযারাবা ঃ ২৫, ২৭, ২৯।
মুরাবাইড (মুরাবিতুন-আল) ২৬, ২৭।
মুয়াশ শাহ (ছন্দ) ঃ ২১৫।
মুওয়াফফাক (পারস্যের হেরাতের অধিবাসী) ঃ ৩৩৯।
মুসলিম /মুসলমান ঃ ২০ ২১, ২২, ২৩, ২৫, ২৬, ২৭, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪৩, ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫২, ৫৩, ৫৬, ৫৮, ৬০, ৬২, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৭০, ৭২, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৯, ৯২, ৯৪, ৯৫, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৭, ১২৮, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৭, ১৩৮, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৮, ১৪৯, ১৫১, ১৫২, ১৫৯, ১৬২, ১৬৭, ১৬৮, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৯, ১৮১, ১৮৪, ১৮৯, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৮, ১৯৯, ২০১, ২০৭, ২০৮, ২১৪, ২১৫, ২১৭, ২১৯, ২২২, ২২৮, ২৩০, ২৩১, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৯, ২৪৩, ২৪৫, ২৪৮, ২৪৯, ২৫৩, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৭১, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৭, ২৭৮, ২৮১, ২৮২, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯২, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৮, ২৯৯, ৩০১, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩২০, ৩২২, ৩২৩, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৭, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৬০, ৩৬২, ৩৬৪, ৩৭৪, ৩৮০, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৯৮, ৩৯৯।
মুসতানসিরিয়াহ ঃ ২৬২।
মূর/মূরীয় ঃ ১৯, ২২, ২৩, ২৯, ৩০, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৪১, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৮০, ২০৫, ২১৫, ২২৩, ২৩০, ২৯৫, ৩৫৩, ৩৮২।
মূসা ইবন নুসায়র ঃ ২৩।
মেসোপটেমিয়া ঃ ৯৪, ৯৫, ৯৯, ১০৪, ১১০, ১৩১, ১৩৪,১৩৭, ১৪৪, ১৮০, ১৮২, ১৯০, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৮, ১৯৯, ২০৫, ২৩৩, ২৬৭, ৩২২, ৩২৬, ৩২৮, ৩৩৮, ৩৫০।
মেলেডিক (সুস্বর) ঃ ৩৬২, ৩৬৪, ৩৮০।
মেডার্ড এভাঞ্জেল, সেন্ট ঃ ৩৭৮।
মেটেরিয়া মেডিকা ঃ ৩২৫, ৩৩৮।
মোরিয়া ঃ ৯০।
মোরিয়ার ঃ ২৩০।

www.waytojannah.com

মোহামেডান আর্কিটেকচার এটসেটরা ঃ ১৯৩, ২০৩, (ইন ইজিপ্ট এণ্ড প্যালেস্টাইন) ২০৭।
মোহাম্মদ (২য়, হামার সুলতান) ঃ ১৫৯।
মোসেস ইবনে এজরা (গ্রানাডা) ঃ ২৮২।
মোসেস মাইমোনাডাইস ঃ ২৮৩।

য

যামোরা (গির্জা) ঃ ১৬৩।
যাজাল আল (ছন্দ) ঃ ২১৫।
যালযাল ঃ ৩৬৬।
যালযালিয়ান (স্বরগ্রাম) ঃ ৩৬৩।
যারাক্‌লি আল ঃ ৩৮৩, ৩৯৭।
যীশুখৃস্ট ঃ ২৩৮, ২৫২, ২৬৭, ২৬৮, ২৯৫, ৩২৩।
যুয়ুশী আল (মাদ্রিদ) ঃ ১৯৯।
যুলাম/যুনাম ঃ ৩৬৬।
যেনো (বাইযান্টাইন সম্রাট) ঃ ৩২১।
যোরোয়াস্ট্রিয়ান ঃ ২৩৪।

র

রবার্ট বার্নস ঃ ২২৫, (অব চেষ্টার) ৩৩৫, (বার্টন) ৩৩৩, (ডি হ্যাণ্ডলো) ৩৭৭।
রবার্টস অ্যাংলিকাস ঃ ৪৭।
রজার (২য়) ঃ ৭০, ১০৩, ১১৪, ১৭৬।
রজার বেকন ঃ ১০৬।
রবিনসন ক্রুসো ঃ ২২৫।
রস আমাডিস ডি গাউলা ঃ ২২৩।
রাশিয়া ঃ ১১১।
রাই (রাজেশ) ঃ ১৩৯।
রাবাত ঃ ১৯৬।
রাক্কাহ ঃ ১৯০।
রাহিব ঃ ২৩৫।
রাযেশ ঃ ৩৩০।
রাযী আল ঃ ২৮৮, ৩৩১, ৩৩২, ৩৪৫, ৩৪৮, ৩৫১, ৩৫৫, ৩৫৭, ৩৫৯, (মুহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া) ৩৭০, (ফখরুদ্দীন) ৩৭৩।

www.waytojannah.com

র‍্যাসেলাস ঃ ২২৫।
রিকস্কু ইস্টা ঃ ২১।
রিবেরা, অধ্যাপক ঃ ২৩, ২১৬, ২১৭।
রিচার্ড (১ম) ঃ ৭৪।
রিভিউ আর্কিও লজিক পত্রিকা ঃ ১৭৬।
রিচমন্ড ই. টি ঃ ২০৭।
রিভয়রা জিটি ঃ ২০৭।
রিপ্রোচ ডি অ্যারাবিজম ঃ ২৮৬।
রিদওয়ান (পারস্যবাসী) ঃ ৩৫০।
রুবিন স্টাইল ঃ ৩৮০।
রই ডায়ায ডি বিভার ঃ ৪৮।
রেমান্ডাস লালাস (ক্যাটালোনিয়ার অধিবাসী) ঃ ৮২।
রেপাবলিকা ক্রিশ্চিয়ানা ঃ ৮৯।
রেমী, এ. জে. এফ ঃ ২২৮।
রেমব্রান্ট (পশ্চাত্য চিত্রকর) ঃ ১৭৫।
রেডিয়ার, প্রফেসর ঃ ২১৮।
রেমন্ড (আর্চ বিশপ) ঃ ২৭৩, ৩৫৪, (লাল) ২৮৬, ২৮৭, ৩৫৮, (রাইমণ্ড) ৩৭৫, (মার্টিন) ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৯৩।
রেনান ঃ ৩০১।
রোডস দ্বীপ ঃ ৬৭।
রোম ঃ ১০৪, ২০৩, ৩৫৬।
রোমাণ্ড সলিড ঃ ২১৮।
রোমানেস্ক (ভবন) ঃ ২৯, ১৮০।
রোমান ঃ (গথ) ২৪, (ক্যাস্টোকানো ২৪, ৪৬, ৫৭, ৬১, (সম্রাট) ১৪৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮৪, ১৮৬, (টাওয়ার) ১৮৭, ১৯৬, (ক্যাথলিক) ২৩৩, ২৫৭, ২৬৫, ২৬৭, ৩০২, ৩০৫, (আইন) ৩০৬।
রোমান্স ঃ ১৯, ২০, ২৪, (আল-আজমিয়া) ২৫, ৩৮, ৪২, ৪৩, ৫৫, ৫৯, ৭৪, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৫, ২১৭, ২১৯, ২২৪, ২২৫, ৩৯৭।

ল

লণ্ডন ঃ ১৬৬, ১৯৩, ২০৭।
লগোস ঃ ২৪৬।

www.waytojannah.com

লাগুনা ডিলা জান্ডা ঃ ৪৪।
লা ভিডা এস সুয়েনো ঃ ৪৯।
লাস্টার্ড পটারী ঃ ১৩৮।
লাইল্যাক টেবী ঃ ১৫০।
লা ফ্লিউর, ডিলা সায়েন্স ডি পোট্রেকচার; প্যাট্রন্স ডি ব্রকারি ফ্যাকন এরাবিক এট ইটালিক ঃ ১৭৪।
লা যিযা (গির্জা) ঃ ১৯৬।
লা কিউবা (গির্জা) ঃ ১৯৮।
লা ভাউট (গির্জা) ঃ ২০৫।
লাইট অব ক্যানোপাস, দি ঃ ২২১।
লা-ফন্টেন ঃ ২২১।
লাইডার ডেস মিরযা শফী ঃ ২২৮।
লাল্লারুখ ঃ ২৩০।
লাজিকী আল ঃ ৩৭২।
ল্যাপিড বরিড ঃ ৫০।
ল্যাপিস লাজিউলাই ঃ ১৪৮।
ল্যানফ্রঞ্চি (মিলানের চিকিৎসক) ঃ ৩৫৮।
ল্যাটিন কমেন্টারীজ অব এশিয়াটিক পোয়েট্রি ঃ ২২৭।
ল্যাটিন ঃ ২০, ২৫, ২৬, ৩০, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৪, ৪৭, ৫০, ৫৫, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬৩, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৯০, ৯১, ১০৬, ১৪৫, ২০৮, ২০৯, ২১২, ২১৮, ২২০, ২২১, ২২২, ২৬৪, ২৬৯, ২৭২, ২৭৪, ২৭৬, ২৮৩, ২৮৫, ২৮৮, ২৯৯, ৩১৫, ৩২০, ৩২২, ৩২৩, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৫, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪২, ৩৪৬, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৭, ৩৫৯, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৮৫, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯৩, ৩৯৭, ৩৯৯।
লিওন ঃ ২৬, ৪৯, ৬২, ১৫০।
লিবানার বীটাস ঃ ২৯।
লিবরা ডিল্স এংগানোস ই অ্যাসোয়ামিয়েন্টস ডি লাস মুজারেস ঃ ৪৮।
লিব্রো ডি এনজেম্পলস পর এ বিসিকিটোস ঃ ৪৯।
লিব্রো ডি লস গ্যাটোস ঃ ৪৯, (এঙ্গালস) ২২০।
লিব্রো ডি লস জুয়েবাস ঃ ৫০।
লিব্রো ডি বুয়েন্স আমোর ঃ ৫৪।

লিও (নবম) ঃ ৭৩, ১১৩।
লিওনার্ডো ফিবনাক্কিও (বীজগণিতবিদ) ঃ ৮২, (পিবনাস্কি) ৩৮৮।
লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (শিল্পী) ঃ ১৭৩, ৩৪৩।
লিপাই (ফ্রান্স) ঃ ২০৩, ২০৫।
লিজেণ্ড অব সেন্ট ব্রেণ্ডান ঃ ২১৯।
লিজেন্ড অব টুণ্ডাল ঃ ২২২।
লি ভেরিয়ার (বিজ্ঞানী) ঃ ৩৯৩।
লুকমান (আ) হযরত ঃ ২৮২।
লুসেনা ঃ ৫২।
লুসিগনান ঃ ৬৬।
লুইটপ্রান্ড (ক্রিমোনা) ঃ ৭৩।
লুই (৭ম) ঃ ৮৮, (সেন্ট) ৮৯।
লুভার ঃ ১৫১।
লেগ্যাসি অব ইসরাঈল ঃ ৪৭, ৪৯।
লেভ্যারেন্ট বন্দর ঃ ২১৯।
লেটার্স পার্সেনস্ ঃ ২২৪।
লোপেয রুই ঃ ৫২
লোহিত সাগর ঃ ৬১, ৯৭, ১০৮।

শ

শার্লেমেন ঃ ৮৪, ৯০, ১৭১, (ফ্রাঙ্করাজা) ৩৪২।
শামান (ধর্ম) ঃ ৯১।
শাটো গাইলার্ড ঃ ১৯৬।
শাটিলন ঃ ১৯৬।
শারডেন ঃ ২২৪।
শাহ শূজা ঃ ৩৭২।
শামসুদ্দীন আল আজামী ঃ ৩৭২।
শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আল মারহুম (লেখক) ঃ ৩৭২।
শাম্মাসিয়া তোরণ (বাগদাদ) ঃ ৩৮৫।
শিয়া (সম্প্রদায়) ঃ ৬১, ৩২৩।
শিলার ঃ ২২৯।
শিভ্যলরি ঃ ৯০, ২১২।

www.waytojannah.com

Contents

শিহাবুদ্দীন আল কারাফী (কায়রো) ঃ ৩৫০।
শ্রীলঙ্কা ঃ ১০৪, ১০৮।
শেখ সাদী ঃ ২২৭
শেমতোব ইবনে আইজাক ঃ ৩৭৪।
শেমতোব ইবনে জোসেফ ইবনে ফালাকিরা (কর্ডোভা) ঃ ২৮২।
শ্লেগেল ঃ ২২৭।

স

সমরকন্দ ঃ ৭০, ৯০, ৩৬৫, ৩৯৯।
সং অব রোল্যাণ্ড ঃ ৭২, ৮৩।
সল্‌স্‌বারি ঃ ২৬৩।
সফিউদ্দীন, সাইফুদ্দীন আবদুল মুমিন (তাত্ত্বিক) ঃ ৩৬৩, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩।
সল্টারি ঃ ৩৬৪, ৩৬৬।
সল্টার্স ঃ ৩৭৮।
সন্ত ঃ ৭২, ২৩০, (সাইকেল) ঃ ২৭৬, ২৯৪, ৩৫৫।
সারাগোসা ঃ ২৯, ৩০, ৬২।
সান মিগুয়েল ডি এস্কালাভা ঃ ২৯।
সান্টামেরিয়া লা ব্ল্যাংকা ঃ ৩৩।
সারভ্যান্টিষ ঃ ৫৭।
সার্ডিনিয়া ঃ ৬২, ৯৪।
সাল্লাহউদ্দীন ঃ ৬৫, ৬৬, ৮৩, ৮৬, ৮৮, ৮৯, ১৯৬।
সান্টিকুস ডি ঃ ৮৩।
সাসটেনটেশনেস টেরেই হি রোসলি মিটানেই (কর) ঃ ৮৮
সাসানীয় (রাজবংশ) ঃ ৯৯, ১০১, ১৩৮, ১৪৯, ১৭৫, ১৯০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩।
সাইপ্রাস দ্বীপ ঃ ৬৭, ৯০, ৯৪।
সামানীয় ঃ ১০৩, ১১১।
সাইমুর ঃ ১০৮।
সাহারা ঃ ১১১।
সাফাভী (রাজবংশ) ঃ ১৩৩, ১৫২, ১৫৬।
সামাররা, রাজপ্রাসাদ/মসজিদ ঃ ১৩৭, ১৯০, ১৯৩, ১৯৫।
সালের্নো ঃ ১৯৮।
সাদী ঃ ২৩৭।

www.waytojannah.com

Contents

সাদ ইবনে জুদাই ঃ ২১৪।
সাবিয়ান ঃ ৩৫৪, ৩৮৩, ৩৯১।
সামুয়েল ইবনে তিব্বন (কর্ডোভা) ঃ ২৮২।
সাবিত (খৃস্টান চিকিৎসক) ঃ ৩৫৬।
সারাখসী আল ঃ ৩৭০।
সান্ডা দ্বীপপুঞ্জ ঃ ৩২৯।
সারে (তাতারী দেশ) ঃ ২১৯।
স্লাভোনিক ঃ ৫৯।
স্যারাসেন /স্যারাসেনিক (মতবাদ) ঃ ৮৪, ৮৫, ১৯৬, ১৯৮, ১৯৯, ২০১, ২০৩, ২০৫, ২১৭, ২৮৭, ২৮৮।
স্যাঙ্কাটিস ডি স্টোরিয়া চেল্লা লিটারেচুরা ইটালিয়ামা ঃ ৮৪।
স্ক্যাণ্ডেনেভিয়া ঃ ১১১, ১১২।
স্যালডিন এইচ ঃ ২০৭।
স্ট্যালাকাইট ঃ ১৯৮, ২০১।
সালাদীন এম ঃ ১৯৮।
স্প্যানিশ ইসলাম (সেলেস রচিত) ঃ ২১৪।
সিড (সৈয়দ) ঃ ১৯, ২৭, ৪২, ৪৮, (কাম্পিডোর) ঃ ৭২
সিড হামেট বেনেন জেলি ঃ ২২৩।
সিনাগগ ঃ ৩৩।
সিদি হামেতি বেন এনজেলি ঃ ৫৭।
সিয়েথা ঃ ২০৩।
সিন্ধ ঃ ১০৮, ১১৩।
সিন্দবাদ ঃ ১০৮ (বুক অব) ঃ ২২০, ২২৪।
সিসারিও জি ঃ ২১৭।
সিউটা ঃ ১০৯, ১১৩।
সিজিলমাসো ঃ ১১৩।
সিলভেস্টার (২য়) ঃ ১২৪।
সিরাভ ঃ ১০৭।
সিরিয়া/সিরীয় ঃ ২৩, ৫৯, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৫, ৭০, ৭১, ৭৩, ৭৪, ৭৮, ৮২, ৮৩, ৮৮, ৯৪, ৯৮, ১১১, ১১৩, ১১৮, ১৩৩, ১৩৭, ১৪০, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৮, ১৪৯, ১৭৩, ১৮০, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৯, ১৯০, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৮, ১৯৯, ২০৩, ২০৫, ২১৯, ২৫৯, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬,

www.waytojannah.com

৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩১, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪৪, ৩৪৬, ৩৫১, ৩৬২, ৩৮৮।
সিপিয়ান ডেল পেরো ঃ ৩৯৬।
সিগার ঃ ২৯০।
সিমন টানস্টেড ঃ ৩৭৫।
সিমপ্লিসিয়াস ঃ ৩৬৯।
সিসিলি ঃ ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৩, ৭৬, ৮৪, ৯৪, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৯, ১১৪, ১৫১, ১৬২, ১৬৭, ১৭২, ১৯৬, ১৯৮, ১৯৯, ২১৭, ২৪৯, ৩৫৩, ৩৫৫, ৩৫৮।
স্পিনোযার ঃ ২৪৮।
স্টিফেন ঃ ৩৫৬।
স্টীল (লেখক) ঃ ২২৫।
সুয়েজ ঃ ৭৩, ৯৯, ১০৮, ১১০, ১১৩।
সুদান ঃ ৯৫।
সুলায়মান ঃ ১০৭, ১৭২, (আ) হযরত ঃ ২৭৭, ২৮২।
সুইডেন ঃ ১১১।
সেভিল ঃ ২৬, ২৭, ২৯, ৩৩, ১৯৬, ২২৩, ২৭৩, ৩৪৭।
সেলজুক ঃ (তুর্কী) ৬২, (সাম্রাজ্য) ৬৫, ৯২, ১০২, (সুলতান) ১৪৮, ১৯৬।
সেল্যুকাস ঃ ৩৯৭।
সেভেন সেজেস অব রোম ঃ ২২০।
সেমেটিক ঃ ৩২৯, ৩৬২।
সেন্ট পিটার ঃ ১৪৫, ২০৩।
সেন্ট পল ঃ ১৪৫, ২০২।
সেন্ট লুই ঃ ৬৬, ১৭১।
সেন্ট পিয়ের আব্বে ডি ঃ ৮৯।
সেন্ট প্যাট্রিক্স পারগেটরী ঃ ২২২।
সেন্ট সাইন্স ঃ ৩৮০।
সেন্ট টমাস ঃ ২৩২, ২৬৫, (আকিনাস) ২৬৬, ২৬৯, ২৭০, ২৭৩, ২৮০, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯৩, ২৯৪, ৩১৩।
স্পেন/ স্পেনীয় ঃ ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৭, ২৯, ৩০ ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫৩, ৫৪, ৫৬, ৬১, ৬২, ৬৮, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৮০, ৮২, ৯২, ৯৪, ৯৯, ১০১, ১০২, ১০৪,

www.waytojannah.com

১০৯, ১১২, ১১৪, ১৩৯, ১৪০, ১৬৭, ১৭২, ১৭৯, ১৮১, ১৮৯, ১৯৬, ১৯৯, ২০৫, ২১১, ২১২, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৮, ২২০, ২২১, ২২৩, ২২৭, ২৩২, ২৪৫, ২৪৮, ২৪৯, ২৬১, ২৬৩, ২৬৪, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮১, ২৮২, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ৩৪১, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৬৯, ৩৭১, ৩৭৬, ৩৭৮, ৩৮৩, ৩৯৭।

স্টৌফিক (ছন্দ) ঃ ২১৫।

হ

হল্যাণ্ড ঃ ১৭৫।

হলবিন (ছবি) ঃ ১৫৬।

হামাদান ঃ ৭২, ৩৩৮।

হাসকিন্স সি-এ প্রফেসর ঃ ৮২।

হামাদানী আল ঃ ১০১।

হাদীস ঃ ১১৫।

হাকাম আল ঃ ১২৭ (২য়) ১৬৬, ৩৩৮, ৩৬৬।

হানফার, শূজা ইবনে ঃ ১৩১।

হালাগু (খান) ঃ ১৩১, ১৫১।

হারুনুর রশীদ, খলীফা ঃ ১৩৭, ১৫০, ১৭১, ৩১০, ৩২৪, ৩৪২, ৩৪৪, ৩৮৫।

হাফীজ কবি ঃ ১৫৬, (হাফিয) ঃ ২২৭, ২৪৪।

হারকিউলিসের পিলার ঃ ১৭৯।

হাকিম, আল (মসজিদ) ঃ ১৯৮।

হাসলাক, ডাবলু-এফ ঃ ২১৭।

হাওয়ার জি. মণ্ডেন ঃ ২২০।

হাই ইবনে ইয়াকযান ঃ ২২৫।

হার্ডার ঃ ২২৭, ২২৯।

হাকিম, আল, (ফাতিমীয় খলীফা) ঃ ৩৪২, ৩৪৫।

হাব্রেড ; নেমস অব গড ঃ ২৮৭।

হানাফী ঃ ৩১৫, ৩১৬।

হারিস আল মুহাসিবী ঃ ২৩৬, ৩৪২।

হাল্লাজ, মনসুর ঃ ২৩৮, ২৪০।

হাদীকাতুল হাকীকা ঃ ২৫২।

হাররান ঃ ২৫৯, ৩২৬।

www.waytojannah.com

হার্মেনিক (সমস্বর) ঃ ৩৬২।

হার্প ঃ ৩৬৬।

হাজী, খলীফা ঃ ৩৭১।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ঃ ৩৮৫।

হ্যান্স প্রুটস ঃ ৬৮, ৬৯।

হ্যাম্পটন কোর্ট ঃ ১৫৬।

হ্যানকিন, ডাঃ এ এইচ (দি ড্রইং অব জিওম্যাট্রিক প্যাটার্ন ইন স্যারাসেনিক আর্ট-এর লেখক) ঃ ১৬৩।

হ্যামিল্টন ঃ ২২৫।

হ্যাভেল, ই বি (ইণ্ডিয়ান আর্কিটেকচার-এর লেখক) ঃ ১৯৩।

হ্যামার ঃ ২২৭।

হ্যালি (আলী) আব্বাস (পারস্যবাদী মুসলিম চিকিৎসক) ঃ ৩৩৭, ৩৩৮, (জেসু) ৩৩৯, ৩৫৩, ৩৫৬।

হিটার-আর্ক প্রিস্ট ঃ ৩৬, ৪২, ৫৪, ৫৫, ৫৬।

হিটাইন (যুদ্ধ) ঃ ৬৫।

হিন্টারল্যাণ্ড ঃ ৭৯।

হিশাম ঃ ১২৭ (খলীফা) ১৮৯।

হিট্টাইট স্মৃতিসৌধ ঃ ১৪৮।

হিরা ঃ ১৮২, (আরব রাজ্য) ৩৬২।

হিস্পানো মোরেস্ক ঃ ১৯৯।

হিব্রু ঃ ২৮৭, ২৮৮, (আইন) ৩১৩, ৩৩৩, ৩৩৭, ৩৭৪।

হিপোক্রেটিস ঃ ৩২১, ৩২৫, ২৪৮, ৩৫১, ৩৫৩, ৩৫৪।

হিউগো, সেন্ট ভিক্টর ঃ ৩৭৫।

হিস্প্যানিক চিন্তাধারা ঃ ২২।

হিস্টোরিয়া দ্যা লা দোমিনাসিয়ান দ্যালস অ্যারাবেস এন এসকালা ঃ ১৯।

হিস্টোরিয়া হিরো সে লিমিটানা ঃ ৮৩।

হিস্টরি অব থিংস ডান ইন দি পার্টস্ ওভারসিজ ঃ ৮৩।

(এ) হিস্টরি অব দি মুহাম্মাডান প্রিন্সেস ফ্রম দি এপিয়ারেন্স অব দি প্রফেট ঃ ৮৩।

হিস্টরি অব দি ফিলোসফার্স ঃ ৩৫১।

হিস্টরি ডি লার্ট টি আই-২ সি পার্ট ঃ ১৭৬।

হিস্টোরী ডেস মুসুলমানস্ ডি এল (এস পাসাবে রচিত) ঃ ২১৪।

হিস্টোরিয়া সেপ্টেস স্যাপেয়েন্টিস ঃ ২২০।

www.waytojannah.com

Contents

হিস্টোরিয়া ডেল অ্যাবেনসারেজ ঃ ২২৩।
হুনাইন ঃ ২৬৯, (ইবনে ইসহাক) ২৭২, ৩৩০, (ওরি বাসিয়াস) ৩২৫, ৩২৭, ৩৫১, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৮৩, ৩৯১।
হুবাইশ ঃ ২৬৯, ৩২৫, ৩২৬, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৬।
হুসাইন ইবন ইসহাক আল ইবাদী (নেস্টোরিয়ান চিকিৎসক) ঃ ২৬৮, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৮, ৩৫৪, ৩৬৯।
হুবার্ট প্যারী, স্যার ঃ ৩৭৩।
হেজাজ ঃ ১৭৯।
হেনরি অব ব্রাবান্ট, সেন্ট টমাস ঃ ৭৩।
হেনরি (২য়) ঃ ৮৮, ৩৫৩।
হেরাক্লিয়াস ঃ ৫৮, ৫৯।
হেল্‌ম হল্টস্‌ ঃ ৩৭৩।
হোলবিন ঃ ১৭৪।
হোলি সিপালচার ঃ ৯০, ১৮৪।

ইফাবা—২০০৭-২০০৮—প্র/৯২৭৪ (উ)—৩,২৫০

www.waytojannah.com